পতি পরম গুরু

(দ্বিতীয় খণ্ড)

বিমল মিত্র

উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির

PATI PARAM GURU, (VOL—II)
(The capitalist is the only Lord)
A novel by BIMAL MITRA.

আশ্বিন, ১৩৬৯

Published by—
UJJAL SAHITYA MANDIR
C-3, College Street Market
Calcutta-7 (1st floor) INDIA

প্রতিষ্ঠাতা ঃ
শরৎচন্দ্র পাল
কিরীটিকুমার পাল

প্রকাশিকা ঃ
সুপ্রিয়া পাল
উজ্জ্বল-সাহিত্য-মন্দির
সি-৩, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা (দ্বিতলে)

মুদ্রণে ঃ
ডায়নামিক প্রিণ্টার্স
২৪, বাগমারী রোড
কলিকাতা

প্রচ্ছদ ঃ
অমিয় ভট্টাচার্য

মানুষকে যেমন বাইরে থেকে চেনা যায় না, সংসারটাও ঠিক তেমনি। মানুষের মতন সংসারও তেমনি একটা ছদ্মবেশ পরে থাকে। তাই এ-সংসারে যেমন সুরেন আছে, তেমনি আছে দেবেশ। আবার তেমনি আছে পুণ্যশ্লোক রায়, আছে তার মেয়ে পমিলি। তেমনি আবার আছে প্রজেশ সেন। এদের সকলকে নিয়েই আমাদের সংসার। অথচ সকলে যে আসলে কী চায় তা কেউ ভালো করে জানে না। সকলেই একটা-না-একটা উদ্দেশ্য নিয়ে ছুটে চলেছে। সেই ছোটার মোহেই আচ্ছন্ন হয়ে আছে সবাই।

পুণ্যশ্লোকবাবু যখন জীবন আরম্ভ করেছিলেন, তখন জানতেন না কত দূরে তাঁকে ছুটতে হবে। কোথায় গিয়ে তার ছোটা শেষ হবে। একখানা বাড়ি কি দু'-খানা গাড়ি হলেই তখনকার মত তাঁর চাওয়া শেষ হওয়ার কথা। কিন্তু তা হয়নি। ছুটতে ছুটতে একদিন একেবারে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড পরিক্রমা করবার ইচ্ছে হলো তব। দেখলেন, ইলেকশানে দাঁড়ালে বেশ এম-এল-এ হওয়া যায়। তারপর মনে হলো মিনিস্টার হলে আরো ভালো হয়। তাহলে মিনিস্টার হতে গেলে যা করা দরকার তাই করো। তারপর মিনিস্টার হওয়ার পর দেখলেন তারও একদিন শেষ আছে। পাঁচ বছর পর পর ইলেকশানে দাঁড়াতে হয়। তখন অনেক খরচ। পাঁচ বছর ধরে সেই খরচটা সংগ্রহ করে জমাতে হয়। ইলেকশানের সময় ওই টাকা-গুলো খোলামকুচির মতন ছড়াতে হয়। তাহলে দু'হাতে টাকা সংগ্রহ কর। দু'-হাতে টাকা জমাও। যাতে পাঁচ বছর পরে ইলেকশানে জিতে আবার মিনিস্টার হতে পারো।

কিন্তু একজন মানুষের পক্ষে সব দিকে তো ঠিকভাবে নজর দেওয়া যায় না। তাঁর একটা মহা সুবিধে ছিল এই যে, গৃহিণী নেই। গৃহিণী মারা গিয়ে তাঁর উন্নতির পথ মুক্ত করে দিয়ে গেছে। ছেলেমেয়েও না থাকলে আরো ভাল হতো। নিজের কেরিয়ারের দিকে আরো বেশি করে নজর দিতে পারতেন। সুব্রত ছিল, তাকে আমেরিকা পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু পমিলি?

শেষ পর্যন্ত তারও একটা ব্যবস্থা হলো। প্রজেশের হাতেই ভার দিয়ে-ছিলেন সংসারটার।

একদিন প্রজেশকে বললেন—দেখ প্রজেশ, তোমার তো অঢেল সময়—

প্রজেশ বললে- হ্যাঁ স্যার, আমার হাতে তো অঢেল সময়, আমার তো সময়ই কাটতে চায় না—

পুণ্যশ্লোকবাবু জিজ্ঞেস করলেন—অফিস থেকে তোমার ক'টায় ছুটি হয়?

প্রজেশ বললে—বিকেল পাঁচটা সাড়ে পাঁচটা—

—তারপরে কী করো?

—কিছু না। কাজ থাকলে তো আপনার কাছেই আসি—

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—তাহলে একটা কাজ করো, আমার এই দিকটা তুমি একটু দেখ।

—কোন্ দিকটা স্যার?

—এই আমার ফ্যামিলি-এ্যাফেয়ার্স। এরা সবাই মিলে বড় ওয়েস্টেজ্

করছে। বাড়িতে দেখবার কেউ নেই। পর্মিলি তো নিজের পড়াশোনা আর ফ্রেন্ড্-সার্কেল নিয়েই আছে। চাকর-ঝি-ড্রাইভাররা সব লুটেপুটে খাচ্ছে। আমি কিছুই দেখতে পারছি না। একজন তো থাকা উচিত যে সব সুপারভাইস্ করবে—

প্রজেশ সেন বললে—ঠিক আছে স্যার, আমার ওপরে ছেড়ে দিন, আমি সব দেখাশোনা করবো—

এরপর থেকেই প্রজেশ বেশি করে পর্মিলির কাছাকাছি আসবার সুযোগ পেলে। এরপর থেকেই প্রজেশ একটা সুযোগ পেয়ে গেল জীবনে। পর্মিলি একটু বেশি ড্রিঙ্ক করে ফেললেই প্রজেশ বলতো—আমি কিন্তু মিস্টার রায়কে বলে দেবো পর্মিলি—

—নো নো প্রজেশ। কিছুতেই বলতে পারবে না।

পুণ্যশ্লোকবাবু মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করতেন—সব দেখাশোনা করছো তো প্রজেশ?

প্রজেশ বলতো—আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার। এবার সার্ভেন্ট্‌দের ইলেকট্রিক-খরচা কমিয়ে দিয়েছি স্যার। ঘরে-ঘরে সব সময় আলো জেবলে রাখতো। আমি নিয়ম করে দিয়েছি রাত দশটার পর কারো ঘরে আলো জবলবে না।

—দ্যাট্‌স্ গুড্!

—আর একটা কাজ করেছি স্যার। বাজারে আমি সব মান্থলি-একাউন্ট্ করে দিয়েছি। সব বিল্ আমি চেক্ করছি এবার থেকে। দোকানদারদের বলে দিয়েছি, আমি অর্ডার না দিলে কোনও জিনিস আসবে না।

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—ভেরি গুড্, ভেরি গুড্—আমি এবার একটু নিশ্চিন্তে কাজকর্ম করতে পারবো—

এতদিন এইভাবেই চলে আসছিল। হঠাৎ সেদিন টেলিফোন বেজে উঠলো। যথারীতি মুহুরী হরিলোচন রিসিভারটা তুললো। তারপর সেটা পুণ্যশ্লোক-বাবুকে দিলে।

—স্যার আপনার টেলিফোন।

—কে টেলিফোন করছে?

—পর্মিলি দিদিমণি!

তাড়াতাড়ি টেলিফোন নিয়ে পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—হ্যালো পর্মিলি? হোয়্যার ফ্রম?

ওপাশ থেকে পর্মিলি বললে—বাবা, আমি থানা থেকে বলছি, পুলিশ আমাকে এ্যারেস্ট করেছে—

এমনিই হয়। জীবনে যখন চারদিক থেকে শান্তির আভাস আসন্ন হয়ে থাকে, যখন জয়ের উল্লাসে কেউ উদ্দাম হয়ে ওঠে তখন কোথা থেকে অজ্ঞাতে কালবোশেখীর একটা ছেঁড়া টুকরো মেঘ আস্তে আস্তে সমস্ত আকাশটাকে ঢেকে দেয়, কাউকে তা বুঝতেই দেয় না।

সেদিন পুণ্যশ্লোকবাবুরও তাই হয়েছিল। ইলেকশানের সবে তোড়জোড় শুরু হচ্ছে। গোয়েংকাজীর কাছ থেকেও সব রকমের ভরসা পাওয়া গিয়ে-ছিল। আড়াই লাখ থেকে শুরু করে পাঁচ লাখ টাকার একটা বাজেট তৈরিও হয়েছিল। বিপদটা আসা উচিত ছিল বিপক্ষ-পার্টির দিক থেকেই। তা না এসে এল নিজের বাড়ির ভেতর থেকে।

রিসিভারটা ছেড়ে দিয়ে আবার সেটা তুললেন।

বললেন—হরিলোচন, একবার পুলিশ কমিশনারকে রিং করো তো—

এ-সব ব্যাপারে কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে অনেকবার অনেককে সাহায্য করতে হয়েছে। বিশেষ করে রুলিং-পার্টির মিনিষ্টারদের। তাঁদের হাতেই তাঁর চাকরির স্থায়িত্ব নির্ভর করে। শুধু চাকরির স্থায়িত্ব নয়, তার চেয়েও বেশি। তাঁরও একদিন রিটায়ার করবার দিন আসবে। তখন? তখন এক্সটেনশন্ চাইতে গেলে রুলিং-পার্টির কাছে গিয়েই তো দরবার করতে হবে।

পুলিশ কমিশনার টেলিফোন করলেন ডেপুটিকে। ডেপুটি টেলিফোন করলে মুচিপাড়া থানাতে। মুচিপাড়া থানার ও-সি বললে—স্যার, এখন যদি মিস্ রায়কে ছেড়ে দিই তাহলে গোলমাল বেঁধে যাবে এ-পাড়ায়।

—তার মানে?

ও-সি বললে—এ-পাড়ায় চাইনিজ্ স্মাগ্লাররা মিস্ রায়ের ওপর চটে গেছে।

—কেন?

—মিস্ রায় কোকেন-স্মাগলিং-এর ব্যবসা করতেন এদের সংগে।

—কী বলছো তুমি?

ও-সি বললে—আমি মিছে কথা বলছি না স্যার, আমার হাতে ডকুমেণ্টস্

ডেপুটি বললেন—কিন্তু তুমি জানো মিস্ রায় কার মেয়ে?

সত্যিই সে-রাত্রে তুমুল হৈ-চৈ পড়ে গেল পুলিশ মহলে। একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের মেয়ে কোকেন স্মাগ্লিং-এর মত ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছে এটা বিশ্বাস করতে অনেকেরই প্রথমে কষ্ট হলো। কিন্তু রাত যখন আরো গভীর হলো তখন পুলিশ কমিশনার নিজে পুণ্যশ্লোকবাবুর বাড়ি এসে হাজির। সংগে ডেপুটি কমিশনার, আর মুচিপাড়া থানার ও-সি।

কিন্তু তার আগেই পর্মিলি বাড়ি এসে গেছে সসম্মানে।

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—কিন্তু আমি তো ভাবতেই পারি না পর্মিলি কী করে স্মাগ্লিং-এর মধ্যে জড়িয়ে পড়লো? তাকে আপনারা কোথায় পেলেন?

মুচিপাড়া থানার ও-সি বললে—আমিও তো বস্তি রেইড্ করতে গিয়ে তাই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। কারণ ওই আড্ডায় সাধারণতঃ ছেলেরা যায় চোলাই মদ খেতে। চাইনিজরা সে-গুলো বেচে—

—ও কিছু স্টেট্মেণ্ট দিয়েছে?

ও-সি বললে—হ্যাঁ স্যার, দিয়েছে। এই যে স্টেট্মেণ্ট্টা সংগে এনেছি—

পুণ্যশ্লোকবাবু স্টেট্মেণ্টটা হাতে নিয়ে পড়তে লাগলেন। ড্রাই-ডে'তে কোথাও ড্রিংক পাওয়া যায় না বলে আমার ড্রাইভার আমাকে এখানে এনেছিল। একজন দালাল এসে টাকা নিয়ে গেল। কিন্তু তখনও বোতল আনছে না দেখে ড্রাইভার জগন্নাথ নিজেই গিয়েছিল ভেতরে। তার সন্দেহ হয়েছিল হয়ত টাকা নিয়ে উধাও হয়ে গেছে। সেই অন্ধকার জায়গায় আমার একলা বসে থাকতে ভয় লাগছিল বলে আমি গাড়ি থেকে নেমে ভেতরে গেলাম। আর তারপরেই আপনারা এসে আমাকে ধরলেন।

সমস্ত স্টেট্মেণ্টটা পড়লেন পুণ্যশ্লোকবাবু।

একটু ভেবে নিলেন। বললেন—এখন কী করতে চান?

পুলিশ কমিশনার বললেন—আমার মনে হচ্ছে কোথাও কিছু গোলমাল আছে। আপনার মেয়ে ড্রিংক করতে ওখানে যাবে কেন? আপনার মেয়ে তো

ড্রিঙ্ক করে না—

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—না, ড্রিঙ্ক কেন করতে যাবে সে?

ডেপুটি বললেন—ড্রাইভারের স্টেট্‌মেণ্টও তো নেওয়া আছে—

—সেটা দেখি—

ড্রাইভারও সেই একই রকম স্টেট্‌মেণ্ট দিয়েছে।

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—স্মাগ্‌লারদেরও তো এ্যারেস্ট করা হয়েছে। তারা কী বলছে?

ও-সি বললে—তারা বলছে তারা কিছুই জানে না। তারা তো পুরোন কালপ্রিট্‌। প্রত্যেকে বহুবার জেল খেটেছে। আমার কনষ্টেবল্‌ ওখানে যাদের পেয়েছে সকলকেই এ্যারেস্ট করে নিয়ে এসেছিল।

পুলিশ কমিশনার বললেন—আমার মনে হয় সমস্ত জিনিসটাই হাশ-আপ করে দেওয়া ভালো। সামনে ইলেকশান আসছে, এখন স্ক্যাণ্ডেল হলে গভর্ণমেণ্টের বদনাম হবে। পার্টিরও বদনাম হবে।

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—হাশ-আপ করা কি সম্ভব?

—হোয়াই নট্‌?

জিনিসটা এত সহজে মিটে যাবে পুণ্যশ্লোকবাবু ভাবতে পারেননি।

বললেন—তাহলে তাই করুন। দরকার হলে আমি না হয় এক্সসাইজ মিনিষ্টারকে টেলিফোন করে দিতে পারি।

—না, তার আর দরকার হবে না। পুলিশের হাতেই সমস্ত ক্ষমতা আছে। তারা 'হাঁ'কে না করতে পারে। দিনকেও রাত করা তাদের পক্ষে অসম্ভব নয়। এ-রকম কত কেস পুলিশের খাতায় উঠছে, আর কত কেস পুলিশের খাতা থেকে মুছে যাচ্ছে, বাইরের ক'জন আর তা জানতে পারছে।

খানিক পরেই সবাই চলে গেল। পুণ্যশ্লোকবাবু তাদের বিদায় দিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকলেন। তারপর সিঁড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে ওপরে উঠতে লাগলেন। তারপর পার্মিলির ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। পার্মিলির ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ।

বাইরে থেকে দরজায় নক্‌ করলেন একবার। কোন সাড়া-শব্দ নেই।

আবার নক্‌ করলেন।

—পার্মিলি! পার্মিলি!

অনেকক্ষণ পরে ভেতরের খিল খুললো। পার্মিলি তখন দরজাটা খুলে দিয়েই আবার বিছানায় ঢলে পড়েছে।

পুণ্যশ্লোকবাবু বিছানার কাছে গেলেন।

ডাকলেন—পার্মিলি—

ড্রেসিং গাউনটা পার্মিলির তখনও গায়ে জড়ানো রয়েছে।

আবার ডাকলেন—পার্মিলি, কী হয়েছিল সত্যি করে বলো তো? হোয়াট হ্যাপেনড্‌ এ্যাক্‌চুয়েলি?

পার্মিলি তেমনিই বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে রইল।

—পার্মিলি! পার্মিলি!

পার্মিলি এবার রেগে গেল। মুখ তুলে বললে—কেন তুমি আমায় ডিসটার্ব করছো বলো? তুমি আমাকে একটু রেস্টও নিতে দেবে না?

—কিন্তু কী হয়েছিল বলবে তো?

পার্মিলি বললে—যাও. কিচ্ছু হয়নি।

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—তুমি রাগ করছো কেন?

পর্মিলি বললে—রাগ করবো না? তোমাদের পুলিশ আমায় কেন এ্যারেস্ট করলে? তারা জানে না আমি কে?

—তা তুমি আমার নাম করলে না কেন? আমার নাম করলেই পুলিশ তোমার ছেড়ে দিত।

পর্মিলি বললে—তোমাদের পুলিশগুলোও হয়েছে সিলি ফুল। কারা দোষী তাও বুঝতে পারে না। জগন্নাথ অত করে বললে আমি মিনিষ্টার পুণ্যশ্লোক রায়ের মেয়ে, তবু শুনলে না। এ-দেশে মিনিষ্টার হয়ে তোমার কী লাভ? তোমাকে কেউ মানতে চায় না। সবাই তোমাদের কংগ্রেসকে গালাগালি দিতে লাগলো।

পুণ্যশ্লোকবাবু সে-কথার কোনও উত্তর দিলেন না। বললেন—তা তুমি ও-সব ঝামেলার মধ্যে গেলে কেন? তুমি যাবার আর কোনও জায়গা পেলে না কলকাতা সহরে?

—তা কলকাতা সহরে যাবো কোথায়? যাবার কোনও জায়গা আছে?

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—ক্লাবে যাও না কেন আগেকার মত? তুমি তো ক্লাবে ভর্তি হয়েছিলে!

পর্মিলি বললে—ক্লাবে যেতে কারো ভালো লাগে? এক মুখ, এক চেহারা। সেই তাস আর গসিপ।

পুণ্যশ্লোকবাবু মেয়ের কথা শুনে ভয় পেয়ে গেলেন। মেয়েকে ক্লাবে ঢুকিয়ে দিয়ে তিনি নিশ্চিন্তই ছিলেন এতদিন। ভেবেছিলেন তিনি নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পারবেন, ওদিকে মেয়েও তার ক্লাবের আবহাওয়ার মধ্যে অবসরের খোরাক খুঁজে পাবে। কিন্তু একী হলো? এমন যে হবে তা তো তিনি কল্পনা করতে পারেননি।

বললেন—এখন তুমি ঘুমোও, কাল আমি এ-বিষয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলবো—

পর্মিলি বললে—তোমাকে আর এ-সব নিয়ে ভাবতে হবে না, তুমি তোমার নিজের কাজ নিয়ে থাকো।

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—তুমি রাগ করছো কেন? এখুনি তো পুলিশ কমিশনার এসে সব মিটিয়ে দিয়ে চলে গেল। কোনও কেসও হবে না, কোনও এন্‌কোয়ারিও হবে না। আমি এক্সাইজ মিনিষ্টারকেও ফোন করে সব বলে দেবো।

তারপর একটু থেমে বললেন—কিন্তু ও-হ্যাবিটটা ছেড়ে দাও না। ড্রিঙ্কের হ্যাবিট কি ভালো? আমি তোমার ফাদার হিসেবেই বলছি, লোকে শুনলে আমাকেই বা কী বলবে বলো দিকিনি। ধরো যদি ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যেত তো অপোজিশান পার্টি এ্যাসেমব্লিতে তো কোশ্চেন তুলতো! তখন আমি কী জবাব দিতুম?

পর্মিলির বোধহয় তখন নেশা মাথায় গিয়ে উঠেছিল। ভালো করে কথা বলবারও ক্ষমতা ছিল না।

পুণ্যশ্লোকবাবু আবার বোঝাতে লাগলেন। বললেন—তোমার তো আমি কোনও অভাব রাখিনি পর্মিলি! বরাবর তুমি যা চেয়েছ আমি দিয়েছি। কখনও তোমার মুভ্‌মেণ্টের ওপর আমি কোনও বাধা দিয়েছি? তুমি গাড়ি চেয়েছিলে গাড়ি দিয়েছি। তুমি নিজের ব্যাঙ্ক এ্যাকাউণ্ট চেয়েছিলে, তোমাকে আমি ব্যাঙ্ক

এ্যাকাউণ্ট দিয়েছি। এখনও তুমি যা চাও সব দেবো। আর ড্রিঙ্ক যদি একান্তই করতে হয় তো বাড়িতে বসে করো না। ড্রাই-ডে বলে তুমি চাইনিজ-ডেনে যাবে তা বলে? জানো ওখানে কত খুন-খারাপি হয়?

কিন্তু যাকে লক্ষ্য করে এত কথা বলা, সে তখন হয়তো শুনতেই পাচ্ছে না। পুণ্যশ্লোকবাবু দেখলেন, পর্মিলি তখন নেশায় আচ্ছন্ন। আর কথা বাড়ালেন না।

বললেন—আমি চললুম, তুমি ঘুমোও—

বলে ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিলেন। তারপর বেড-রুমের নীল আলোটা জ্বালিয়ে দিয়ে পাখাটার স্পীড্ বাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু হয়ত ঠাণ্ডা লাগতে পারে মেয়ের। তাই চাদর দিয়ে গলা পর্যন্ত ঢেকে দিয়ে দরজাটা এ'টে বন্ধ করে দিলেন। বাইরে থেকে ঠেললেও আব খুলবে না দরজা।

তারপর নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লেন।

কিন্তু সকালবেলাই ডেকে পাঠালেন প্রজেশকে। প্রজেশ আসতেই বললেন—তুমি কোথায় থাকো প্রজেশ?

প্রজেশ বললে—কেন, পুণ্যদা, আমি তো পরশুও এসেছিলাম—

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—কিন্তু কালকে তোমার কী হয়েছিল?

প্রজেশ বললে—কালকে আমাদের অফিসের বাজেট হচ্ছিল, অফিস ছাড়তে প্রায় রাত ন'টা হয়ে গিয়েছিল, তাই আর এদিকে আসতে পারিনি—ইলেকশানের ব্যাপার বলছেন?

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—ইলেকশান নয়, পর্মিলির কথা বলছি। কালকে আবার এক সিরিয়াস কাণ্ড বাধিয়ে বসেছিল পর্মিলি। ভাগ্যিস ব্যাপারটা জানা-জানি হয়ে যায়নি, তাই রক্ষে।

তারপর গতকাল রাত্রের সমস্ত ব্যাপারটা বললেন।

সব শুনে প্রজেশ জিজ্ঞেস করলে—পর্মিলি এখন জেগেছে?

—বোধহয় না। কাল রাত্তির তিনটের সময় তো পুলিশ ছেড়ে দিলে ওকে। তুমি আজকাল সব সময় ওব কাছে-কাছে একটু থাকবে। আমি তো আমার নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকি বলে ওর দিকে দেখতে পারি না সব সময়। অন্ততঃ যতদিন ইলেকশানটা না হচ্ছে ততদিন—

—ঠিক আছে, আমি দেখি পর্মিলি উঠেছে কিনা।

সকাল থেকেই দেবেশদের পার্টি অফিসে তোড়জোড় চলছিল। আজও একটা প্রোসেশান বেরোবে দুপুরে। গ্রাম থেকে সব লোক এসেছে। চারদিকের ফ্যাক্টরি থেকেও লোকজন এনে জড়ো করা হয়েছিল। দেবেশ বীরভূম থেকে তিনশো লোক এনেছিল। তারা ষ্টেশন থেকেই লাইন বেঁধে যাত্রা শুরু করেছিল। ওদিকে হাওড়া থেকেও আর একদল আসছিল দল বেঁধে। টুলুরাও একদল মেয়ে নিয়ে তৈরি ছিল অফিসে। তারাও বেরিয়েছে। কথা ছিল সবাই এসে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে জড়ো হবে। সেখানে পূর্ণবাবু লেক্চার দেবেন। সহরের চারিদিকে দেয়ালে-দেয়ালে হাতে লেখা পোষ্টার পড়ে গেছে।

পোষ্টারে লেখা আছে—সর্বহারা মানুষের ডাকে দলে দলে ময়দানে চলুন।

ও-সব দেখে দেখে সহরের লোকের চোখ পচে গেছে। আসলে সর্বহারা মানুষের ডাক-টাক বাজে কথা। মোট কথা ভোটের প্রস্তুতি ও-সব। কিন্তু তবু ভিড় দেখলেই ভিড় হয়।

মেয়েদের মিছিলের সামনেই ছিল টুলু। সে চিৎকার করছে—ইনক্লাব জিন্দাবাদ—

সঙ্গের মেয়েরা একসুরে বলে উঠছে—ইনক্লাব জিন্দাবাদ—

হঠাৎ যেন কাকে দেখতে পেয়েই টুলু পাশের বন্ধুকে বললে—ললিতাদি, আমার ফ্ল্যাগটা একটু ধর তো, আমি আসছি—

বলে লাইন থেকে বেরিয়ে একেবারে ফুটপাথের দিকে এগিয়ে গেল। একটা চশমার দোকানের ভেতরে ঢুকে বললে—সুধীরদা, আমার চশমাটা কতদূর হ্লো?

দোকানের মালিক বললে—হয়ে গেছে,—আর একটু বাকি আছে—

টুলু বললে—তাহলে আজকে বাড়ি ফেরবার সময় নিয়ে যাবো।

—আজকে আবার কীসের ব্যাপার?

টুলু বললে—আগস্ট-বিপ্লব দিবস যে আজকে—

—কত দেরি হবে ফিরতে?

টুলু বললে—আটটার সময় তো দোকান বন্ধ হবে? তার আগেই আসতে চেষ্টা করবো, চশমাটা আজকেই দরকার, শিখা বড় কষ্ট পাচ্ছে—

—ঠিক আছে, আমি তোমার জন্যে বসে থাকবো।

টুলু চলেই যাচ্ছিল, হঠাৎ পাশের দিকে নজর পড়তে অবাক হয়ে গেছে। বললে—একি, আপনি যে?

সুরেনকে এতক্ষণ দেখতে পায়নি টুলু। কিন্তু সুরেন এতক্ষণ সব দেখছিল, সব শুনছিল।

—আপনারও কি চশমা নাকি?

সুরেন বললে—না, আমার মা মণির চশমা। সারাতে নিয়ে এসেছি।

টুলু বললে—এমন সময় দেখা হলো যে কথা বলবার সময় পর্যন্ত নেই। কেমন আছেন?

সুরেন বললে—ক'দিন ধরেই তোমার কথা ভাবছিলাম।

—আমার সৌভাগ্য! আমি তো এ ক'দিন ধরেই এখানে আসছি। আমার বাবার চোখ তো আগেই গেছে। বোনটার চোখও খারাপ হয়েছে আবার। বড় ভয় হচ্ছে তাই। ডাক্তার বলেছে তাড়াতাড়ি চশমা করতে হবে।

তারপর বললে—আচ্ছা, এখন আমার সময় নেই, আমি যাই—

সুরেন বললে—একদিন যাবো'খন তোমাদের ওখানে—

টুলু হাসলো। বললে—আমি তো সেদিন বলেইছি দেখা করার ইচ্ছেটা খাঁটি হলে একদিন-না-একদিন দেখা হবেই।

তারপর আর দাঁড়ালো না। ওদিকে প্রোসেশানটা ততক্ষণে অনেক দূরে চলে গেছে।

টুলু তাড়াতাড়ি পায়ে সেই দিকে চলতে লাগলো।

দোকানদার ভদ্রলোক বললে—আপনি টুলুকে চেনেন নাকি?

সুরেন বললে—হ্যাঁ—

দোকানদার বললে—খুব পরিশ্রম করতে পারে। অথচ...

হঠাৎ পেছন থেকে একটা হৈ-হৈ রব উঠলো। শব্দ শুনে সুরেন সেদিকে

চাইতেই দেখলে একটা চলন্ত বাসের ধাক্কা লেগে টুলু রাস্তার ওপর পড়ে গেছে। সুরেনের সমস্ত শরীরে যেন একটা ঝাঁকুনি লাগলো হঠাৎ। চশমার দোকানদার দোকান ফেলে দৌড়ে গেল সেদিকে। রাস্তার চারদিক থেকে লোক-জন ছুটে এল। চারদিকে সে এক বিশৃঙ্খল অবস্থা। সুরেনের বুকটা দুরদুর করে কাঁপতে লাগলো। সে ভিড়ের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো তাড়াতাড়ি। লোকের ভিড়ে তখন আর টুলুকে দেখা যায় না। সে তখনও রাস্তায় তেমনি করে পড়ে আছে।

—হ্যাঁ মশাই, মারা গেছে নাকি মেয়েটা?

পাশের এক ভদ্রলোক সুরেনের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলে।

সুরেন তখনও কিছুই জানে না। লোকের ভিড়ে দেখতে পেলে তো জানতে পারবে। বাসটার প্যাসেঞ্জারেরা সব নিচেয় নেমে এসেছে।

বললে—আমি জানি না।

ভিড়ের মধ্যে যখন সবাই হৈ-হৈ করে উঠেছে, সুরেন তখনও পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল। কোথায় কার কাছে যে সে টুলুর মঙ্গল-কামনা করবে ভেবে পেলে না। কার কাছে সে টুলুর জন্যে হাত জোড় করে প্রাণ ভিক্ষে চাইবে?

ততক্ষণে পুলিশ এসে গিয়েছে। পুলিশের লোকরা ভিড় সরাচ্ছে লাঠি দিয়ে। সুরেন সেদিকে চেয়ে থাকতে পারলে না। চোখ দুটো সরিয়ে নিয়ে আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রইল। কী জানি, যদি কিছু বীভৎস দৃশ্য দেখতে হয়, যদি সত্যি-সত্যিই টুলু আর না বেঁচে ওঠে।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়লো টুলুর বুড়ো অন্ধ বাবার কথা। টুলুর বোনের কথা। তার চশমার কথা। আর মনে পড়লো দেবেশের কথা। দেবেশ যদি এ-সময় কলকাতায় থাকতো!

খানিক পরে কোথা থেকে একটা অ্যাম্বুলেন্স এল। তারপর ভিড় সরে সামনেটা পাতলা হয়ে এল। আর সেই ফাঁক দিয়ে এক মুহূর্তের জন্যে সুরেন দেখলে রাস্তাটা রক্তে ভেসে গেছে। কিন্তু বেশিক্ষণ দেখা গেল না। মানুষের ভিড়ের জন্যে আবার জায়গাটা ঢাকা পড়ে গেছে। তারপর অ্যাম্বুলেন্স থেকে দু'জন লোক নেমে টুলুকে স্ট্রেচারে করে তুলে নিলে গাড়িতে। আর তারপরেই গাড়িটা ছেড়ে দিলে। সেটা সোঁ সোঁ করে কোন্ দিকে চলে গেল।

সুরেন তখনও সেখানে একভাবে দাঁড়িয়ে রইল। তার পা দুটো যেন কেউ ফুটপাথের সঙ্গে পেরেক মেরে এঁটে দিয়েছে। সে আর নড়তে পারছে না। সে যেন এই চলমান পৃথিবীতে অচল হয়ে হতবাক্ মূর্তিতে বিস্ময়-বিমূঢ় নির্জীবে পরিণত হয়েছে। তার দৃষ্টিশক্তি নেই, বধির, বাক্‌রোধ হয়ে গেছে।

হঠাৎ পাশের থেকে কে যেন ডাকলে তাকে।

সুরেন মুখ ফিরিয়ে দেখলে। সেই চশমার দোকানদার।

দোকানদার ভদ্রলোক বললে—আপনি দেখেছেন?

এতক্ষণে সুরেনের মুখ দিয়ে কথা বেরোল। বললে—কী হলো বলুন তো? টুলু বেঁচে আছে তো?

দোকানদার ভদ্রলোকের মুখটা বিমর্ষ হয়ে গেল।

বললে—কী জানি, হাসপাতালে তো নিয়ে গেল।

—বাঁচবে টুলু?

দোকানদার আকাশের দিকে আঙুল দিয়ে নির্দেশ করলে। মুখে কিছু বললে না।

সুরেন বললে—যদি না বাঁচে তো কী হবে? ওদের সংসার চালাবার যে কেউ নেই মাথার ওপর শুনেছি—

ভদ্রলোক বললে—আপনার সঙ্গে কতদিনের চেনা?

সুরেন বললে—বেশি দিনের নয়। ওদের পার্টি অফিসের দেবেশ আমার ক্লাশফ্রেন্ড্। সেখানেই আমার সঙ্গে আলাপ।

দোকানদার ভদ্রলোক শুনে চুপ করে রইল।

সুরেন জিজ্ঞেস করলে—আপনি কতদিন চেনেন টুলুকে?

ভদ্রলোক বললে—সে যখন থেকে ওরা সেই কলকাতায় এল, তখন থেকেই। তখন থেকেই টুলু চাকরির চেষ্টা করতো ঘুরে-ঘুরে। একদিন আমার দোকানে এসেছিল চাকরির খোঁজে—

প্রোসেশানটা খানিকক্ষণের জন্যে একটু বিশৃঙ্খল হয়ে গিয়েছিল। তখন সেটা আবার চলতে আরম্ভ করেছে। কারোর জন্যেই বোধহয় সংসারে কিছু আটকে থাকে না। সুরেন রাস্তাটার দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেল। এই একটু আগেই রাস্তার বাস-ট্রামের ভিড় জমে গিয়েছিল। এখন আবার সব স্বাভাবিক হয়ে গেছে। সব কিছু সচল হয়েছে। কেউ কিছু ভাবছেও না, কেউ চোখের একটু জলও ফেলছে না। সবাই যে-যার নিজের নিজের কাজে এগিয়ে চলেছে। কেউ থেমে নেই। টুলুও এদের মধ্যে সকলের সঙ্গে গা মিলিয়ে চলতে চেয়েছিল, কিন্তু তাকে থেমে যেতে হলো। হয়ত এমনিই হয়। হয়ত এমনি করেই এক-একজন মানুষ দল ছেড়ে পিছিয়ে পড়ে। তারপর আর একজন মানুষ এসে তার জায়গা দখল করে নেয়। আবার ইতিহাস তার নিজের পথে পা বাড়িয়ে দেয়।

সুরেন আর সেখানে দাঁড়ালো না।

কিন্তু চলতে গিয়েও আবার সেই চশমার দোকানটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। দোকানদার ভদ্রলোকও আবার তার নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। আরো কত টুলু আছে সংসারে। তাদের সকলের চশমাও তাকেই আবার ঠিক সময়ে ডেলিভারী দিতে হবে।

সুরেন দোকানের সামনে গিয়ে বললে—হ্যাঁ মশাই, একটা কথা জিজ্ঞেস করি আপনাকে—

দোকানদার ভদ্রলোক বললে—বলুন—

—আচ্ছা, কোন্ হাসপাতালে নিয়ে গেল টুলুকে জানেন?

ভদ্রলোক বললে—কী করে জানবো! যেখানে জায়গা পাবে, সেখানেই নিয়ে যাবে। এ তো এমার্জেন্সী কেস্!

সুরেন বললে—আচ্ছা আপনি তো ছিলেন সামনে, টুলুর জ্ঞান ছিল?

ভদ্রলোক বললে—না, অত বড় বাসের ধাক্কায় পড়ে গিয়ে কখনও জ্ঞান থাকে কারো?

—কোথায় লেগেছিল ঠিক?

ভদ্রলোক বললে—বোধহয় মাথায়। মাথা থেকেই তো রক্ত বেরোচ্ছিল—

সুরেন আর কিছু কথা বললে না। তারপর যাবার আগে জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা, কাল একবার আসবো আপনার কাছে, যদি কোনও খবর-টবর পান তো জেনে যাবো—

তারপর একটু থেমে আবার জিজ্ঞেস করলে—কিন্তু একটা কথা, ওর বাড়ির লোকেরা খবর পাবে কী করে? কে তাদের খবর দেবে?

ভদ্রলোক বললে—আমি তো ওর বাড়ি চিনি না—ওদের পার্টির অফিসে গেলে ঠিকানা পেয়ে যাবেন ঠিক—

তা বটে। পার্টির অফিসে গিয়ে টুনুর বাড়ির ঠিকানাটা নিলে ভালো হয়। পার্টির অফিসে এতক্ষণ খবরটা নিশ্চয় পেঁৗছে গেছে। তারা কি আর খবর দেবে না?

নিজের মনেই আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে সুরেন আবার বাড়ির দিকে চলতে লাগলো।

কিন্তু মনটার ভেতরে কেমন যেন খচ-খচ করতে লাগলো। বাড়িতে ফিরে গিয়েও কি শান্ত হবে মনটা? রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে যেন কেমন অস্বস্তি হতে লাগলো। পৃথিবীতে তো টুনুর জন্যে কেউ ভাবছে না। কারো তো মাথা-ব্যথা নেই তার জন্যে। বাস-ট্রামগুলো যেমন চলছিল আগে, ঠিক তেমনি করেই চলছে। ওদের পার্টির মিছিলটাও তো ওকে ফেলে চলে গেল।

মাধব কুণ্ডু লেনের মোড়ে পেঁৗছতেই কেমন একটু দ্বিধা হলো। বাড়িতে গিয়েই কি শান্তি পাবে মনে? সমস্ত মনটাই যেন পড়ে আছে টুনুর কাছে।

সুরেন আবার ফিরলো। আবার সেই একই রাস্তা। একই রাস্তা দিয়ে আবার তাকে যেতে হবে।

একটা বাসে উঠে সেই বৌবাজারের মোড়ের মাথায় নামলো সুরেন। রোজকার মত মোড়ের মাথায় লোকজন গিসগিস করছে। সেখানে নেমে বৌবাজারের ভেতরে ঢুকে খানিকটা হেঁটে যেতে হয়।

আগস্ট-বিপ্লব দিবসের ভিড় রাস্তায়। হয়ত ময়দানের মিটিং-এ চলেছে সবাই। সেখানে প্রতি বছরের মত সভা হবে। গরম-গরম লেকচার দেবে সবাই। হয়ত পূর্ণবাবু এসে গেছে ধানবাদ থেকে। সন্দীপদাও বক্তৃতা দেবে।

ফুটপাথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে খানিক দূর যেতেই হঠাৎ নজরে পড়লো পার্টি অফিসের সামনে যেন খুব ভিড়। কয়েকজন লাল-পাগড়ি পরা পুলিশও দেখা গেল।

পুলিশ কেন পার্টি অফিসের সামনে? তবে কি কাউকে গ্রেপ্তার করতে এসেছে?

কিছু বুঝতে পারলে না সুরেন।

আস্তে আস্তে অফিসের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। পুলিশ ছাড়াও আরো অনেক লোক ভিড় জমিয়েছে।

একজনকে জিজ্ঞেস করলে সুরেন—এখানে পুলিশের ভিড় কেন মশাই বলতে পারেন?

ভদ্রলোক সুরেনের দিকে চেয়ে দেখলে একবার।

আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বললে—পুলিশ তো এদের এখানে হরদম আসে।

—হরদম আসে? কেন, হরদম আসে কেন?

ভদ্রলোক বললে—এসব পলিটিক্যাল পার্টির ব্যাপার, পুলিশ আসবে না? কত রকম হামলা হতে পারে।

সুরেন বললে—কাউকে এ্যারেস্ট করছে নাকি?

ভদ্রলোক বললে—তাও করতে পারে। এদের এখেনে সবই সম্ভব। কমিউনিষ্ট পার্টির ব্যাপারে কিছু বলা যায় না।

—কেন, এরা করেছে কী যে অ্যারেস্ট করবে?

ভদ্রলোক বললে—কী করেছে তা কি কেউ বলতে পারে? গভর্ণমেণ্ট হয়ত

কিছু ভেতরে ভেতরে খবর পেয়েছে!

পার্টি অফিসের ভেতরে পুলিশের ইন্সপেক্টার ঢুকেছে। বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে গেছে পুলিশ কনস্টেবলদের। পুলিশ দেখলেই মানুষের ভিড় জমে যায় কলকাতায়। কৌতূহলী জনতা জানতে চায় কোনও রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটেছে কিনা!

সুরেন অন্য একজনের কাছে গিয়ে আবার জিজ্ঞেস করলে।

—কী হয়েছে মশাই এখানে?

সে ভদ্রলোকও ওই-রকম। কিছুই জানে না কেউ। যেন সবাই মজা পেয়েছে।

শুধু বললে—মশাই কংগ্রেসের সঙ্গে কমিউনিষ্ট পার্টির ঝগড়া তো, এ সব তো রোজকার ব্যাপার—

—কিন্তু হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই পুলিশ আসবেই বা কেন?

ভদ্রলোক যেন নির্লিপ্ত।

বললে—কী জানি মশাই। পার্টির ব্যাপার সব। আমরা আদার-ব্যাপারী, জাহাজের খবর রেখে দরকার কী বলুন।

তবু সুরেন কিছু বুঝতে পারলে না। এরা কেউ কিছু খবর রাখে না। রাখতে চায়ও না। এরা আদার-ব্যাপারী, দেশের খবরকে জাহাজের খবর বলে মনে করে।

সুরেন একবার অফিসের ভেতরে ঢুকতে গেল। কিন্তু সেখানেও পুলিশ পাহারা। সেখানে কাউকেই ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। দেবেশ কি ভেতরে আছে? দেবেশ হয়ত সিউড়ি থেকে আসেনি।

সুরেন আবার বাইরে এসে খানিক দাঁড়ালো।

কিন্তু কতক্ষণ আর দাঁড়িয়ে থাকা যায়? কতক্ষণে সার্চ শেষ হবে!

বেলা পড়ে আসছে। এইবার অফিসপাড়ার লোকদের বাড়ি ফেরার পালা। তারা ডালহৌসি স্কোয়ার থেকে বাড়ি ফেরবার পথে এখানে পুলিশ দেখে খানিক দাঁড়াবে। তারপর খানিক রোমাঞ্চের খোরাক নিয়ে আবার যে-যার বাড়ির দিকে পা বাড়াবে।

সুরেন আর দাঁড়াতে পারলে না। আস্তে আস্তে আবার হাঁটতে হাঁটতে কলেজ ষ্ট্রীটের বাস-রাস্তায় এসে দাঁড়ালো। তারপর একটা বাস আসতেই তাতে চড়ে বসলো। সে যদি এই অফিসে থাকতো তো তাকেও হয়ত পুলিশের কাছে জবাবদিহি করতে হতো। টুলু যদি থাকতো তাহলে তাকেও তেমনি পুলিশ জেরা করতো। এই-ই হয়ত পার্টির জীবন। এমনি করেই হয়ত দেশে-দেশে রাজনীতির খেলা চলছে। আর সাধারণ মানুষ আদার-ব্যাপারীর মতন জাহাজের সংসর্গ থেকে দূরে দাঁড়িয়ে থাকছে।

বাসটা আস্তে আস্তে সুরেনকে নিয়ে সোজা উত্তর দিক বরাবর চলতে লাগলো।

কিন্তু সেদিন মা-মণি ডেকে পাঠালো সুরেনকে।

ধনঞ্জয় এসে বললে—ভাগ্নেবাবু, আপনাকে মা-মণি একবার ওপরে ডাকছে—

এতক্ষণে যেন মনে পড়লো। আগের দিন কথা দিয়েছিল মা-মণির সঙ্গে

বেরোবে। কিন্তু সেই সেদিন টুলুর দুর্ঘটনার পর থেকেই মনটা কেমন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ভূপতি ভাদুড়ী বলতো—এবার থেকে আর কোথাও যাবিনে। তোর অত টো-টো করে ঘোরবার দরকারটা কী? তোর কীসের অভাব? তুই বাড়িতে বসে খাবি-দাবি আর আমার কাজকর্মগুলো শিখে নিবি। আমি থাকতে থাকতে সব শিখে নে। তোকেই তো একদিন সব চালাতে হবে।

সুরেনের সত্যিই আর কোথাও যেতে ভালো লাগতো না। কোথাও গিয়ে হবেই বা কী! সবাই নিজের নিজের ধান্দা নিয়ে ব্যস্ত। সুব্রত, সে নিজের পড়া-শোনা নিয়ে ব্যস্ত সেই আমেরিকায়। যখন সে ইণ্ডিয়ায় ফিরে আসবে, তখন হয়ত সুরেনকে আর চিনতেই পারবে না। তখন সে বিরাট চাকরি করবে হয়ত। অনেক টাকা মাইনে পাবে। বাবা বড়লোক, ছেলেও বড়লোক হবে। তাদের সঙ্গে তার কিসের সম্পর্ক! বড়-ছোটয় কখনও বন্ধুত্ব হয় না। আর পমিলি? যতই তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে মিশুক, তার জাত আলাদা। সে-জগতে সুরেনের মত লোকের প্রবেশ নিষেধ। আর ওই দেবেশ? ও-ও তো অন্য দলের। ওর পার্টি আছে। ওর পার্টির কাজ নিয়েই ও মেতে আছে! এক ছিল টুলু। সেও গেল। কী হলো তার কে জানে। হয়ত হাসপাতালের একটা লোহার খাটে শুয়ে ধুঁকছে। আর নয়তো মারা গেছে। মারা গিয়ে বেঁচেছে সে। তার বাবার হয়ত কষ্ট হচ্ছে খুব। কেউ তাকে দেখবার শোনবার নেই। অন্ধ মানুষ। বয়েস হয়েছে। ওই বয়েসে দেখাশোনা করবার একজন লোকের দরকার হয়। আর ছোট-ছোট ভাই-বোনেরা? তাদের বোঝা তারা নিজেরাই বইবে। আর পৃথিবীর কে-ই বা কাকে দেখে? মা-মণির কে আছে যে তাকে দেখছে?

দু'দিন ধরে ভূপতি ভাদুড়ীর দফতরে কাজগুলো মন দিয়ে দেখলে।

ভূপতি ভাদুড়ীর কাজগুলো এমন কিছু শক্ত নয়। ভাড়াটেদের কাছ থেকে বাড়ি ভাড়া আদায় করা। আর কার ঘরের বালি খসে যাচ্ছে, মিস্ত্রী খাটাতে হবে। এই সব খবর রাখা। ভাড়াটেরা এসে অভিযোগ করে যায়। তাদের মধ্যে কার অভিযোগের প্রতিকার করতে হবে আর কার প্রতিকার করতে হবে না, তার বিচার ভূপতি ভাদুড়ীর নিজের। সেইখানেই ভূপতি ভাদুড়ীর কৃতিত্ব।

ভূপতি ভাদুড়ী বলতো—সারাতে তো বলছেন মিত্তির মশাই, কিন্তু এই মাগ্গি-গণ্ডার বাজারে সারাই কী করে? চারখানা ঘরের জন্যে আপনি কত ভাড়া দেন সেটা ভাবুন আর এক বস্তা সিমেণ্টের কত দর সেটাও ভেবে দেখুন—

তবু মাস গেলে হাজার আড়াই টাকা শুধু বাড়ি ভাড়া থেকেই আসে। তাছাড়া আছে কিছু শেয়ার আর কোম্পানীর কাগজ। তারপর উকীল-আদালত একটা-না-একটা লেগেই আছে। তার জন্যে কোর্ট-ঘর করতে হয়। ভূপতি ভাদুড়ী গেল পঞ্চাশ বছর ধরে সেই শম্ভু চৌধুরীর আমল থেকে এই কাজই করে আসছে। এই কাজ করে করে এতদিন হাত পাকিয়ে এসেছে। এখন ভাগ্নের হাতটাও পাকিয়ে দিতে চায়।

ভূপতি ভাদুড়ী ভাগ্নের ওপর ক'দিন থেকেই খুব খুশী ছিল। বলতো—এখন হঠাৎ যদি আমি মরে যাই তো তোর কোনও অসুবিধে হবে না। দেখলি তো সব? কাজ এমন হাতি-ঘোড়া কিছু নয়, কিন্তু মাথা খাটিয়ে সব করা চাই—

সুরেন সব বুঝতো।

ভূপতি ভাদুড়ী তবু বলতো—এবার থেকে সব একা-একা করতে পারবি তো?

সুরেন বলতো—পারবো।

ভূপতি ভাদুড়ী বলতো—কোর্টে সব মুহুরী-পেশকার-উকীল টাকা খাবার যম। কী করে আমি তাদের সামলাই দেখেছিস তো?

সুরেন বলতো—দেখেছি।

ভূপতি ভাদুড়ী বলতো—এই রকম করে কাজ করবি, জানলি? পৃথিবীতে সবাই টাকা-টাকা করে হয়রাণ, সবাই টাকার পেছনে ছুটছে। এখানে একটু অসাবধান হয়েছিস কি সবাই তোর টাকা ছিনিয়ে নেবে। এটা সব সময়ে মনে রাখবি, বুঝলি?

কত তত্ত্ব কথা, কত জ্ঞানের কথা শোনাতো মামা। হায় রে, মামার কত কষ্ট করে আয়ত্ত করা সব জ্ঞান, এমন করে যে বরবাদ হয়ে যাবে তা কি মামা নিজেই জানতো! মামা কি জানতো যে সংসারে অতি সাবধানেরও একদিন হায়-হায় করবার সময় আসে। আর সাবধান না হয়েও যে এক-একজন ভাগ্যলক্ষ্মীর অকৃপণ দাক্ষিণ্যে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে তা কি মামা কোনদিন স্বপ্নেও ভাবতে পারতো!

সংসারে যার হয় তার বোধহয় এমনিতেই হয়। যার হলো না তার না হওয়ার পেছনে কোনও কারণ খোঁজাও বৃথা। যার হবে তার সাবধান হলেও হবে, সাবধান না হলেও হবে।

কিন্তু মামা তো সে-সব বুঝতো না, তাই বার বার ভাগ্নেকে জ্ঞান দিতে চাইতো, বুদ্ধি দিতে চাইতো, সংসার-অভিজ্ঞ করতে চাইত! নইলে শেষ জীবনে মামারই বা অমন দৈন্য-দশা হবে কেন?

কিন্তু সে-কথা এখন থাক।

ধনঞ্জয়ের কথাটা শুনেই মনে পড়ে গেল। বললে—মা-মণি কি তৈরী?

ধনঞ্জয় বললে—হ্যাঁ, কাপড়-চোপড় পরা হয়ে গেছে—

—গাড়ি?

ধনঞ্জয় বললে—গাড়িও তৈরি—

কবেকার ঘোড়ার গাড়ি। গাড়ি এমনিতে বেরোয় না। কালে-ভদ্রে কখনও দরকার হলে তখন ঝাড়-পোঁছ হয়। ঘোড়া দুটোও অন্য সময়ে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোয়। আর কে-ই বা চড়বে গাড়ি? গাড়ি চড়বার লোকই বা কোথায় বাড়িতে! সেই শেষবার গাড়ি বেরিয়েছিল সুখদার পাত্র দেখবার সময়ে। তারপর থেকে ধুলো-ময়লা জমছিল গাড়িতে।

এতক্ষণ খেয়ালই ছিল না। জানালা দিয়ে বাইরে চাইতেই দেখলে উঠোনে গাড়ি মজুত। দেখেই তাড়াতাড়ি জামা-কাপড় বদলে নিলে।

ধনঞ্জয় জিজ্ঞেস করলে—মা-মণি কোথায় যাবে ভাগ্নেবাবু?

সুরেন অবাক হয়ে গেল। বললে—কেন, তুই জানিস না?

—না কোথায়?

সুরেন বললে—সুখদা দিদিমণির বাড়ি। জামাইবাবুর অসুখ কিনা। কোনও খবর পাওয়া যায়নি ক'দিন ধরে। মা-মণি আর না দেখে থাকতে পারছে না।

বলে জুতো পায়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করে উঠোনে বেরিয়ে এল।

গাড়িটার কাছে গিয়ে দেখলে সুরেন। সমস্ত গাড়িটা বহুদিন পরে পরিষ্কার করা হয়েছে। তারপর অন্দরের দরজা পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরের দিকে উঠতে লাগলো। একেবারে তেতলায় ওঠবার মুখেই দেখলে মা-মণি তৈরি

হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

—এসেছিস? আমি তোর জন্যেই ভাবছিলাম। চল্—

সুরেন কাছে গিয়ে মা-মণির হাত ধরলে।

বললে—এসো মা-মণি, আমি হাত ধরছি, আস্তে আস্তে এসো—

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে মা-মণি বললে—মেয়েটার কী আক্কেল বল তো। সেদিন খবর দিয়ে গেল জামাই-এর অসুখ, টাকা নিয়ে গেল, তারপর আর একটা খবর পর্যন্ত দিয়ে গেল না!

সুরেন বললে—নিশ্চয়ই ভালো হয়ে গেছে। নইলে খবর একটা দিতই।

মা-মণি বললে—কে জানে বাবা! যেমন তেজী মেয়ে, রাগ হলে সে-মেয়ে লঙ্কা-কাণ্ড বাধিয়ে দিতে পারে।

ততক্ষণে সিঁড়ির শেষ ধাপে এসে গিয়েছিল দু'জনে। উঠোনের আলো এসে পড়েছে সেখানে। ভালো করে সব স্পষ্ট দেখা গেল। সেখানে দুখমোচন এসে দাঁড়িয়েছিল। আর ছিল ধনঞ্জয়। তরলাও মা-মণির পেছন-পেছন এসে দাঁড়িয়েছিল।

ভূপতি ভাদুড়ী সামনে এসে বললে—আমি সঙ্গে যাবো নাকি মা-মণি?

সুরেন হাত ধরে তখন মা-মণিকে গাড়ির ভেতরে উঠিয়ে দিচ্ছে।

মা-মণি গাড়িতে উঠতে উঠতে বললে—সুরেন তো মেয়ের বাড়ি জানে, তোমার সঙ্গে যাবার দরকার নেই—

বাহাদুর সিং গেট খুলেই রেখে দিয়েছিল। গাড়িটা রাস্তায় পড়বার আগেই লম্বা সেলাম দিয়ে প্রভু-ভক্তি জানালে।

বহুদিন আগে একদিন এই গাড়ি করেই মা-মণি বেরিয়ে গিয়েছিল এ-বাড়ি থেকে। সেদিন মা-মণি ছিল লাবণ্যময়ী। লাবণ্যময়ী ছিল তখন পাথুরেঘাটার দত্ত বাড়ির বউ। কিন্তু সে তো মাত্র একদিনের জন্যে। কিংবা বলা যায় এক রাত্রির জন্যে। সেই একরাত্রির মধ্যেই যে কী বিরাট বিপর্যয় ঘনিয়ে এসেছিল তার জীবনে! সে-সব বহু পুরোন স্মৃতি। কলকাতা সহরের মানুষ সে কাহিনী ভুলে গেছে। তারপর কলকাতা সহরের জীবনেই কত বিপর্যয়, কত বিপ্লব এল। দেখতে দেখতে বয়েস হয়ে গেল লাবণ্যময়ীর। দেখতে দেখতে বুড়ি হয়ে গেল লাবণ্যময়ী।

আর একদিন এমনি করেই লাবণ্যময়ী বেরিয়েছিল বাড়ি থেকে। সে সেই সুখদার বিয়ের জন্যে পাত্র দেখতে। তা সেও তো অনেক দিন হয়ে গেল।

হঠাৎ মা-মণি বললে—ভূপতির কাছে কাজগুলো বুঝে নিচ্ছিস?

সুরেন বললে—ও-কাজের আর বোঝবার কী আছে?

মা মণি বললে—তবু বুঝে নে। ভূপতি যখন থাকবে না, তখন তো তোকেই সব করতে হবে!

সুরেন বললে—আমার এ-সব ভালো লাগে না মা-মণি!

—কেন?

সুরেন বললে—আমার কেবল মনে হয় আমার জীবন এ-সব করলে নষ্ট হয়ে যাবে!

মা-মণি বললে—কেন, এ-সব করবি না তো কী করবি? এ-সব কাজ কি খারাপ কাজ? কত লোক কাজের জন্যে ছটফট করছে, কোথাও কাজ পাচ্ছে না, আর হাতে কাজ পেয়ে তোর মন ভরছে না?

সুরেন বললে—তুমি কিছু মনে কোর না মা-মণি আমি বড় কাজ কিছু

করতে চাই—

—বড় কী কাজ করবি?

সুরেন বললে—তা জানি না। কিন্তু কেবল মনে হয় এমন একটা কিছু করি যাতে লোকে চমকে ওঠে, লোকে অবাক হয়ে যায়। যাতে লোকে বলে—হ্যাঁ, ছেলেটা কাজের ছেলে!

—তা বড় কাজ করতে তোকে বারণ করছে কে? তোর জন্যে অনেক সম্পত্তি রেখে গেলুম। এ-কাজ করেও তো সে-কাজ করা যায়। কী কাজ করতে চাস তুই বল্—

সুরেন বললে—তা যদি বলতে পারতুম তাহলে তো ল্যাঠা চুকেই যেত। আমি নিজেই যে জানি না আমি কী করতে চাই।

মা-মণি বলতে লাগলো—তোর এখন কম বয়েস। সামনে তোর অনেক বয়েস পড়ে রয়েছে, অত ভাবিস কেন? আমি যদ্দিন আছি, ততদিন তোর কোনও ভাবনা নেই—

সুরেন হঠাৎ বললে—আচ্ছা মা-মণি, তোমার তো অনেক বয়েস হয়েছে, তুমিও কি জীবনে কিছু চেয়েছিলে?

মা-মণি হঠাৎ যেন এ-প্রশ্নে চমকে উঠলো। সুরেনের মুখের দিকে একবার তাকালে। কিন্তু কোনও উত্তর দিতে পারলে না এ-প্রশ্নের।

সুরেন জিজ্ঞেস করলে—কই, তুমি কিছু উত্তর দিলে না যে?

মা-মণি বললে—আমি এর কী উত্তর দেবো বল্—

সুরেন বললে—কেন, তুমি যা চেয়েছিলে জীবনে সব তুমি পেয়েছ?

—আমি?

মা-মণি মুখখানা সামনের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে সোজা অনির্দিষ্টের দিকে চেয়ে রইল।

সুরেন বললে—তোমরা কেউ ই কিছু চাওনি মা-মণি। যেমন গতানুগতিকভাবে সবাই জীবন কাটাতে চায়, তেমনিই কাটাতে চেয়েছিলে। তাই তোমাদের কিছু দুঃখ নেই—

—আমার দুঃখ নেই?

সুরেন বললে—তোমার কীসের দুঃখ, বলো! তোমার বড়জোর গয়না-গাঁটি আর টাকা-কড়ির লোভ ছিল। তা তো তুমি পেয়েইছো। এই বাড়ি-ঘর সম্পত্তি টাকা সব কিছু নিয়েই তুমি সুখী হয়েছো। সুখদা ছাড়া তোমার কিছু দুঃখই নেই। একমাত্র সুখদাই তোমাকে যা কিছু কষ্ট দিয়েছে—

মা-মণি বললে—ওরে...

কিন্তু বলতে গিয়ে যেন গলাটা আটকে গেল খানিক।

তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলতে লাগলো—তোর আর কতই বা বয়েস, তুই কতটুকুই বা জানিস। জীবনে আমি কী যে চেয়েছিলাম আর কী-ই যে পেয়েছি তা কেবল আমার অন্তর্যামীই জানেন। দেখতে দেখতে অনেক বয়েস হয়ে গেল আমার, এখন চাওয়া-পাওয়ার হিসেব-নিকেশ করতেও ভয় হয়। মনে হয় পাওনার ঘরে শূন্য দেখে যদি কান্না পায়, তাই হিসেব-নিকেশ করাও ছেড়ে দিয়েছি—

সুরেন বললে—তা কী তুমি চেয়েছিলে আর কী তুমি পাওনি সেটা বলবে তো!

মা-মণি বললে—তা কি আমি নিজেই জানি ছাই যে বলতে পারবো?

তারপর প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে দিয়ে বললে—ও-সব কথা থাক। আর কত দূর আমাদের যেতে হবে বল?

সুরেন বাইরের দিকে চেয়ে বললে—এই তো গ্রে স্ট্রীট চলছে। এইবার ডান-দিকের গলিতে ঢুকবে—

গাড়িটা গলির কাছাকাছি আসতেই সুরেন চেঁচিয়ে বললে—এইবার ডান-দিকের গলির মধ্যে ঢুকতে হবে ইউসুফ—

গাড়িটা ডানদিকে ঘুরলো। তারপর একটা বাড়ির সামনে আসতেই সুরেন চেঁচিয়ে উঠলো—থামো থামো, এইখানে থামাও—

গাড়িটা বাড়িটার সামনে থামতেই সুরেন আগে নেমে পড়লো। তারপর মা-মণিকে বললে—খুব আস্তে নামো মা-মণি—আমার হাত ধরো।

হাত ধরে মা-মণিকে আস্তে আস্তে নামিয়ে নিয়ে সুরেন বললে—এই বাড়িতেই সুখদা থাকে—

মা-মণি চারিদিকে তখন অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখছে। এই নোংরা গলির মধ্যে সুখদা থাকে কী করে! দিনের বেলা রোদও ঢোকে না এখানে, হাওয়াও না।

মা-মণি বললে—এখানে থাকলে জামাই-এর তো রোগ হবেই। এখানে কি মানুষ থাকে?

সুরেন বললে—ভেতরে যেন কাদের গলার আওয়াজ পাচ্ছি—মনে হচ্ছে ডাক্তার এসেছে—

—তাহলে অসুখ বোধহয় এখনও সারেনি। তুই দরজার কড়া নাড়—

সুরেন কড়া নাড়তে লাগলো।

ভেতর থেকে পুরুষ-গলায় আওয়াজ এল—কে?

সুরেন বললে—দরজাটা একবার খুলুন তো?

—কে দরজা ঠেলছে? নাম কী?

সুরেন বললে—আমরা মাধব কুণ্ডু লেন থেকে এসেছি—

এবার মেয়েলি গলায় আওয়াজ এল—কে? কাকে চাই?

মা-মণি এবার নিজেই বললে—ওরে মেয়ে, আমি আমি। দরজাটা খোল না বাছা। চোরও নই ডাকাতও নই, আমরা মানুষ—

কে জানে কেন, এবার দরজা খুললো।

দরজা খুলতেই দেখা গেল সুখদা। আর ঘরের ভেতরে মদের বোতল আর গেলাস নিয়ে বসে আছে নরেশ দত্ত আর কালীকান্ত বিশ্বাস।

মা-মণিকে সেই অবস্থায় দেখেই সুখদা যেন সাপ দেখার মত দশ-পা পেছনে হটে গেল।

বললে—মা-মণি!

তখনও পেছনে সুরেনকে দেখেনি সে।

মা-মণি কী যেন বলতে গিয়েছিল, কিন্তু কালীকান্তকে সেই অবস্থায় দেখে একটু সামলে নিলে। নাকে বোধহয় মদের ঝাঁঝালো গন্ধও লেগেছিল।

তারপব একটু দ্বিধা করে বললে—তুই যে সেই গেলি, আর তো কোনও খবরও দিলিনে। আমি তোর জন্যে ভেবে ভেবে মরি। তা .

ততক্ষণে কালীকান্ত তক্তপোষ ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। টলতে টলতে মা মণিব কাছে এসে মাথা নিচু করে প্রণাম করবার ভঙ্গি কবতে গেল। কিন্তু আর একটু হলেই পড়ে যেত। হঠাৎ নিজেকে সামলে নিয়েছে।

বললে—আমি কালীকান্ত মা-মণি—

বলে আর দাঁড়াতে পারলো না সেখানে। একেবারে মেঝের ওপরেই বসে পড়লো।

কিন্তু নরেশ দত্ত আর থাকতে পারলে না। বললে—এই শালা কালীকান্ত, বসে পড়লি যে? ওঠ্‌, ওঠ্‌, ভলো করে প্রণাম কর, শাশুড়ি হয় না?

বলে নিজেই কালীকান্তকে ধরে ওঠাতে এগিয়ে এল।

কাণ্ড দেখে মা-মণি পাথরের মত স্থির হয়ে সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। ওদিকে সুখদাও হিম হয়ে গেছে ব্যাপার দেখে। কিন্তু ততক্ষণে নরেশ দত্তর পায়ে লেগে একটা বোতল কাত হয়ে পড়লো তক্তপোষের ওপর, তারপর সেটা গড়াতে গড়াতে এসে ঝনাৎ করে পড়লো সিমেণ্টের মেঝের ওপর।

কিন্তু কালীকান্তর সেদিকে খেয়াল নেই। সে শাশুড়িকে প্রণাম করবেই। বললে—আপনি সরে আসুন মা-মণি, আপনাকে আমি পেন্নাম করবোই। আপনি আমার শাশুড়ি হন, ছোড়দা বলেছে—সরে আসুন—

হাত বাড়িয়ে কালীকান্ত মা-মণির পা ছুঁতে গেল। বললে—ইয়ার্কি করছেন কেন, সরে আসুন—

হঠাৎ এক কাণ্ড করে বসলো সুখদা। কোথা থেকে একটা লাঠি নিয়ে এসে দমাদম পিটোতে লাগলো কালীকান্তর পিঠে।

বললে—হারামজাদ শয়তান কোথাকার, ওঠ—

আগে থেকেই আধমরা ছিল কালীকান্ত, লাঠির ঘা খেয়ে এবার একেবারে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। তারই ওপর দুম-দুম করে লাঠি মারতে লাগলো সুখদা—

মা-মণি ঝাঁপিয়ে পড়লো সুখদার ওপর। বললে—ওরে করছিস কী? থাম থাম। মরে যাবে যে—

সুখদা বাধা পেয়ে তখন গজরাচ্ছে—ও মরুক, মরুক ও—ও মরলেই আমি বাঁচি—

মা-মণি বললে—ছি, ও-কথা বলতে নেই মা, ও-কথা মুখে আনতে নেই, ছি—

সুখদাও তেমনি। তেমনি ভাবেই কালীকান্তর দিকে চেয়ে গজরাতে লাগলো—হাজার বার বলবো। লক্ষ বার বলবো। বাড়িতে বসে বসে মদ গিলবে আর আমি মিথ্যে কথা বলে বলে টাকা যোগাড় করে আনবো। পারবো না আমি, ওর জন্যে আমি বিবেকের কাছে আর মিথ্যেবাদী হতে পারবো না—

বলে মা-মণির বুকের ওপর মুখ লুকিয়ে হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগলো।

মা-মণি সুখদাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলো—কাঁদিসনে মা। সোয়ামীর ওপর রাগ করে অমন কথা মুখে আনিসনে।

সুখদা তখনও মা-মণির বুকের ভেতর মুখ গুঁজে আছে।

নরেশ দত্ত বললে—শালার বেশ হয়েছে। মাল খেলে একেবারে বেহুঁশ হয়ে যায় শালা। কই, মাল তো আমরাও খাই, তোর মতন তো অমন বে-এক্তিয়ার হই না। ওঠ্‌ শালা ওঠ্‌, শাশুড়ির পায়ে ধর—ধর পায়ে। পা না ধরলে আমি আজ শালাকে ছাড়ছিনে।

বলে অচৈতন্য কালীকান্তর হাত ধরে টানাটানি করতে লাগলো।

মা-মণি বললে—তুমি ওকে অত টানাটানি করছো কেন বাবা? দেখছো অজ্ঞান হয়ে গেছে আমার জামাই। কে তুমি?

নরেশ দত্ত নিজেই এগিয়ে এসে মা-মণির পায়ে হাত দিয়ে মাথায় ঠেকালো। বললে—আমাকে আপনি চিনতে পারবেন না মা-মণি, আমি আপনার জামাই-এর ছোড়দা। ও শালা বরাবর ওই রকম। ওকে তো আমি ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি, মাল একটু পেটে পড়লো কি অমনি বেহুঁশ হয়ে গেল।

মা-মণি বললে—তা তোমরা ঘরে বসে ও ছাইপাঁশ খাও কেন? গেরস্থ-বাড়িতে কি ওগুলো খেতে আছে?

নরেশ-দত্ত বললে—বাড়িতে বসে কি সাধে খাই মা-মণি? শুঁড়িখানাতে যে কেবল সব মাতালদের আড্ডা। সেখানে ভদ্দরলোকে ঢুকতে পারে?

তারপর কালীকান্তর হাত ধরে আবার টানতে লাগলো—এই শালা ওঠ্, তুই ভদ্দরলোকের নাম ডোবাবি শালা, ওঠ্—ওঠ্ বলছি—

এবার তেড়ে এল সুখদা নরেশ দত্তর দিকে। বললে—তুমি যাও তো এখেন থেকে, তুমিই যত নষ্টের গোড়া। তুমিই ওকে মদ ধরিয়ে অমন মাতাল করেছ। নইলে ও তো অমন ছিল না—তুমি এখ্খুনি এ-বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও, নইলে তোমাকেও আমি লাঠিপেটা করে তাড়াবো—যাও বলছি—

মা-মণি সুখদাকে সামলে নিলে। বললে—তুই থাম সুখদা। তুই যে কী সুখে আছিস তা তো দেখছি, এই তোর সংসার, এই সংসারের জন্যে তুই সব কিছু ছেড়ে এসেছিলি? শেষকালে তোর কপালেও এই ছিল মা?

মা-মণির চোখ দু'টো জলে ভরে এল।

সুখদা মা-মণিকে জড়িয়ে ধরে বললে—সব দোষ আমারই মা-মণি, সব দোষ আমার—

মা-মণি বললে—তুই আমার ওখানে চল্, এখানে থাকলে তুই মরে যাবি, তুই আর বাঁচবি না—

তারপর নরেশ দত্তর দিকে চেয়ে বললে—তুমি তোমার ভাইকে একটু বুঝিয়ে বোল বাছা। ভদ্দরলোকের বাড়িতে এ-সব বেলেল্লাপনা করা তো ভাল নয়। আমি মা হয়ে নিজের চোখে এ-সব দেখতে পারবো না। আমি কোথায় মেয়েকে টাকা দিলুম জামাই-এর অসুখ বলে আর সেই টাকায় কিনা তোমরা দু'ভাই এই সব ছাইপাঁশ খাচ্ছো—

সুখদা তেমনিভাবে মা-মণির বুকে মুখ রেখেই বলতে লাগলো—আমাকে তোমার কাছে নিয়ে চলো মা-মণি, আমি এবার থেকে তোমার কাছে থাকবো-

মা-মণি বললে—তা আমি তো তখনই তোকে বলেছিলাম, তখন তুই ঝগড়া করে চলে এলি। আমার কথা শুনলিনে—

নরেশ দত্ত বললে—এবারকার মত আপনার জামাইকে ক্ষমা করুন মা-মণি, আমি ওকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠিক করবো। এবারকার মত আপনি ওকে মাপ করুন—

সুখদা বললে—না মা-মণি, তুমি ওর কথা শুনো না, ওই-ই যত নষ্টের গোড়া। ওই-ই তোমার জামাইকে মদ খাইয়ে ওই রকম করে তুলেছে। ওরই কথায় আমি বার বার তোমার কাছে গিয়ে মিথ্যে কথা বলে টাকা চেয়ে নিয়ে এসেছি। ওরই কথায় আমি তোমার বাড়ি ছেড়ে এখানে চলে এসেছি—

মা-মণি বললে—কাঁদিসনি মা, কাঁদিসনি, আমার সঙ্গে চল্, আমি যতদিন বেঁচে আছি ততদিন তোর কিছু ভাবনা নেই, চল্—

তারপর পেছনে সুরেনের দিকে চেয়ে বললে—ওরে, আমার গাড়ি আনতে বল্

সুরেন বললে—গাড়ি তো সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে—

মা-মণি সুখদাকে বললে—আয়, আমার সঙ্গে আয় মা। তোর কপালে সুখ না থাকলে আমি কী করবো মা? কেন মরতে আমার কথা সেদিন শুনলিনে? আমি কত দেখে-শুনে তোর বিয়ে দিতে চেয়েছিলুম। এখন কাঁদলে কী হবে বল্ তো!

বলে সুখদাকে বাইরে নিয়ে গেল।

কালীকান্ত তখনও ঘরের মেঝের ওপর বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে।

নরেশ দত্ত কাছে গিয়ে দুমদাম লাথি মারতে লাগলো—এই শালা হারামজাদা, এই শালা, ওঠ্। শালা এখন হলো তো? এই, ওঠ্ ওঠ্—

কালীকান্ত লাথি খেয়ে যেন একটু পাশ ফিরে শোবার চেষ্টা করলে।

ভূপতি ভাদুড়ী বিকেল থেকেই উসখুস করছিল। তার এতদিনের সব মতলব বুঝি ভেস্তে যায়। মা-মণি যখন যাচ্ছিল তখনই ভয় পেয়েছিল একটা-না-কিছু বিপদ ঘটে। তারপর থেকে কোনও কাজেই মন বসাতে পারেনি। একবার দফতরে বসে খাতা খুলে হিসেব-পত্র লিখেছে, আর একবার বাইরের দিকে চেয়ে দেখছে গাড়িটা এল কিনা।

—কে রে ওখানে?

—আজ্ঞে আমি দুখমোচন।

—তুই কী করছিস ওখানে সন্ধ্যেবেলা?

—আজ্ঞে কিছু করছি না।

রেগে উঠেছে ভূপতি ভাদুড়ী। বলেছে—কিছু করছিস না তো ওখানে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? বেরো ওখান থেকে, সরে যা—

অকারণে দুখমোচনকে খানিকটা বকাবকি করেও যেন কিছুটা শান্তি হলো। কিন্তু তারপর আর সময় কাটতে চায় না। এতক্ষণ সেখানে কী করছে রে বাবা। আবার জামাই-মেয়েকে বাড়িতে নিয়ে আসবে নাকি! তখনই পই-পই করে নরেশ দত্তকে বলেছিল। হারামজাদাকে অনেক টাকা খাইয়েছে ভূপতি ভাদুড়ী। নানা ফন্দি করে টাকা খেয়েছে। এবার নাকে দড়ি দিয়ে সব উসুল করে নেবে। নইলে কোর্টে গিয়ে মামলা করবে তার নামে।

কিন্তু আর বেশিক্ষণ ঘরের মধ্যে থাকা গেল না। মাথায় অশান্তি নিয়ে কাজে কখনও মন বসে? উঠোনে বেরিয়ে এল ভূপতি ভাদুড়ী। বাহাদুর সিং দাঁড়িয়ে ছিল। সরকারবাবুকে দেখেই একটা সেলাম করলে।

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—শুধু সেলাম করলে কী হবে? কাজ করতে হবে, কাজ! কাজ না করলে সবাইকে ডিসচার্জ করে দেবো—বুঝলে? বুঝলে কিছু? বলতে বলতে চলে গেল রান্নাবাড়ির দিকে।

—কোথায়, ঠাকুর কোথায়? ঠাকুর?

ঠাকুর ভেতরে রাঁধছিল। ম্যানেজারবাবুর ডাকাডাকিতে খুন্তি হাতে নিয়েই বেরিয়ে এল। বললে—হুজুর—

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—কী রান্না হচ্ছে আজ?

হঠাৎ এই প্রশ্নে ঠাকুর তো অবাক। বললে আজ্ঞে, আপনি যা যা বলে-

ছিলেন তাই রাঁধছি।

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—তোমার রান্না আজকাল খুব খারাপ হচ্ছে ঠাকুর, তোমায় আমি সাবধান করে দিচ্ছি—এখন থেকে রান্না যদি ভালো না হয় তো তোমার চাকরি থাকবে না, এই আমি বলে রাখছি—হ্যাঁ—

ঠাকুর আমতা-আমতা করে নিজের সাফাই গাইতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই ভূপতি ভাদুড়ী বাধা দিয়ে বললে—তুমি আর কথা বোল না ঠাকুর, চুপ করো, আমার কি জিভ নেই? আমি কি খেয়ে বুঝতে পারি না? আমার জিভে কি পক্ষাঘাত হয়েছে?

ওদিক থেকে বুড়োবাবু স্নান করে নিজের ঘরের দিকে যাচ্ছিল। তার দিকে নজর পড়তেই ভূপতি ভাদুড়ী ডাকলে—এই যে! এদিকে এসো—

আচমকা এই ডাকে বুড়োবাবু ভয়ে কাঁপতে লাগলো। সামনের দিকে এগোতে এগোতে বললে—আমাকে ডাকছেন?

—হ্যাঁ, তোমাকে ডাকছি না তো কি তোমার চোদ্দপুরুষকে ডাকছি? বলি এত জল নষ্ট করো কেন তুমি? কলের জল বলে কি জলের দাম নেই তুমি ভেবেছ? জলের ট্যাক্সো দিতে হয় না? জল কি এত সস্তা?

বুড়োবাবু তখন ঠান্ডায় কাঁপছে! তাড়াতাড়ি গায়ের জল মুছে ফেলতে পারলে বাঁচে।

কিন্তু ভূপতি ভাদুড়ী ছাড়বে না। বললে—সকালে সন্ধ্যেয় দুবেলা তোমার জল চাই? একবেলা চান করলে হয় না?

সামান্য জিনিস জল। তার কোনও দামই নেই বলতে গেলে। কত জল পড়ে-পড়ে নষ্টই হয়ে যায় অকারণে। কিন্তু তার জন্যে এত বকুনি কেন তা বুঝতে পারলে না বুড়োবাবু।

শুধু বললে—আজ্ঞে, বরাবরের অভ্যাস কিনা তাই—

—তা অভ্যেস বলে তুমি গেরস্থর অপ্‌চো-নষ্ট করবে? অমন বদ অভ্যেস ছাড়ো।

বুড়োবাবু বললে—আজ্ঞে তাই ছাড়বো—

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—হ্যাঁ ছেড়ে দেবে। আমি যেন কাল তোমাকে আর কলঘরে সন্ধ্যেবেলা দেখতে না পাই।

—কিন্তু সকালবেলা তো চান করতে পাবো?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—ওই অত চান করো বলেই তো তোমার গামছা অত ঘন ঘন ছিঁড়ে যায়। এবার যদি আবার গামছা ছেঁড়ে তো আর কিনে দেবো না, তখন ন্যাংটো হয়ে থাকবে—

কথাটা শুনে বুড়োবাবু কেমন যেন ভয় পেয়ে গেল।

বললে—আপনার পায়ে পড়ি ম্যানেজারবাবু, আমার একটা মাত্তোর গামছা, বুড়ো বয়েসে আমার এত হেনস্থা করবেন না, আপনার পায়ে পড়ছি আমি—

যেন দয়া হলো ভূপতি ভাদুড়ীর। বললে—যত কিছু বলিনে কাউকে তত সব বেয়াড়া হয়েছে, যত সব ভূতের আড্ডা হয়েছে বাড়িতে! এবার সক্কলকে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবো বাড়ি থেকে—

তারপর ঠাকুরকে দেখে বললে—তুমি এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী শুনছো ঠাকুর? তুমি রান্না ছেড়ে এখানে কী শুনছো? তোমার কাজ নেই?

ঠাকুর অপ্রস্তুত হয়ে আবার রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। তারপর ঠাকুর চলে যেতেই বুড়োবাবুকে বললে—যাও, ঘরে চলে যাও, শেষকালে ঠাণ্ডা লেগে

নিউমোনিয়া হলে তো আবার আমারই জ্বালা। তখন তো ওষুধ-ডাক্তারের ব্যবস্থা এই আমাকেই করতে হবে—

বুড়োবাবু কাঁদতে লাগলো তখন। বললে—মরে গেলেই তো বাঁচি ম্যানেজারবাবু, আমার যে মরণও হয় না।

ধমকে উঠলো ভূপতি ভাদুড়ী। বললে—থামো, তোমাকে আর মড়া-কান্না কাঁদতে হবে না। মড়া-কান্না কাঁদলে গেরস্থর অমঙ্গল হয় তা জানো না?

হঠাৎ গেটের কাছে গাড়ির শব্দ হতেই ভূপতি ভাদুড়ী চকিত হয়ে উঠলো। আর দাঁড়ালো না সেখানে। সোজা উঠোন পেরিয়ে একেবারে হন্ হন্ করে গিয়ে হাজির হলো সেখানে।

গাড়িটা তখন অন্দরের সিঁড়ির সামনে এসে থেমেছে।

ইউসুফ তাড়াতাড়ি ওপর থেকে নেমে এসে দরজা খুলে দিয়েছে।

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—ওরে, কে আছিস, আলোটা জ্বেলে দে—

উঠোনের বড় আলোটা জ্বলে উঠলো।

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—খুব সাবধানে নামুন মা-মণি, খুব সাবধানে—

ভেতর থেকে তরলাও খবর পেয়ে দৌড়ে এসেছে গাড়ির কাছে। সে মা-মণির হাত ধরে উঠোনে নামিয়ে নিলে। তারপর সুখদাকেও ধরে নামিয়ে নিলে।

সকলের শেষে নামলো সুরেন। নেমে তার নিজের ঘরের দিকে চলে গেল। ভূপতি ভাদুড়ী খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো সেখানে। তারপর কী যেন ভাবলে নিজের মনে। আর তারপর সোজা নিজের দফ্তরের দিকে চলে গেল। কাল সকালেই এর একটা কিছু বিহিত করতে হবে।

পার্টি অফিসের মধ্যে তখন বেশ রীতিমত হৈ-চৈ চলেছে। সামনে ইলেকশান আসছে তো বটেই। তা ছাড়া পার্টির কাজ-কর্ম নিয়েও বেশ রীতিমত সমস্যা বেধেছে। পূর্ণবাবু ধানবাদ থেকে এসেই সব খবর নিয়েছেন। ইন্টারন্যাশন্যাল অবস্থাও বেশ জটিল হয়ে উঠেছে। এ-সময়ে পার্টিকেও আরো স্ট্রং করতে হবে।

সন্দীপদা সব ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললে।

পূর্ণবাবু জিজ্ঞেস করলেন—দেবেশ ফিরেছে নাকি বীরভূম থেকে?

সন্দীপদা বললে—আজ সকালে আসার কথা, এতক্ষণে এসে যাওয়া উচিত ছিল।

পূর্ণবাবু বললেন—ধানবাদের অবস্থা খুব হোপফুল। আমাদের পকেটগুলো এবার ভালো কাজ করছে। মিটিং-এ পাঁচ হাজার লোক হয়েছিল। অথচ সেবার দেড় হাজার লোকও হয়নি—

সন্দীপদা বললে—এবার বীরভূমের দিকেও একবার আপনি যান পূর্ণদা, পুজোর আগে ওদের সঙ্গে একটু দেখা করা ভালো—

পূর্ণবাবু বললেন—কিন্তু সবাই তো চাষ-বাস নিয়েই ব্যস্ত, এখন কি আমি গেলে কিছু কাজ হবে? আর দেবেশ তো গেছে—দেবেশ আসুক, দেখি কী খবর-টবর আনে—

আগষ্ট-বিপ্লবের উৎসবটা ভালো হয়নি এবার, সেজন্যে পার্টির সব

মেম্বারদেরই মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ইচ্ছে ছিল একটা বিরাট প্রোসেশান বার করবার। কিন্তু এই আগস্ট মাসটাতে প্রোসেশানের লোক পাওয়া শক্ত। কারখানার মজুররা কিছু কিছু আসে বটে। কিন্তু ছুটি পায় না বলে সবাই আসতে পারে না। আর চাষারা ক্ষেত-খামারের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে, তারা গ্রাম ছেড়ে সহরে আসতে পারে না। যাদের ক্ষেতের কাজ শেষ হয়ে গেছে, তাদের মধ্যে কিছু কিছু লোক এসে হাজির হয়। তাদের ট্রেন ভাড়া লাগে না বটে। বিনা টিকিটেই আসে। কিন্তু এখানে আসার পর তাদের খাওয়া দিতে হয়।

শেয়ালদা ষ্টেশন থেকে দেবেশ সোজা অফিসের দিকেই আসছিল। অফিসের দরজার কাছে আসতেই মালতীদি'র সঙ্গে দেখা।

মালতীদি বললে—শুনেছ দেবেশ, কী কাণ্ড?

দেবেশ বললে—কী?

—টুলু বাসে চাপা পড়েছে?

—সে কী?

দেবেশের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হলো। এইতো বীরভূম যাওয়ার আগে টুলুকে নিয়ে গিয়েছিল সুরেনদের বাড়ি। তারপর হঠাৎ কী হলো?

সব ব্যাপারটা মালতীদিই খুলে বললে। প্রোসেশান তখনই বন্ধ করে দেবার কথা হচ্ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো প্রোসেশান চলছে চলুক। কিন্তু সেদিন ময়দানের মিটিংও তেমন জমেনি।

দেবেশ বললে—টুলু এখন আছে কোথায়?

—হাসপাতালে। মেডিকেল কলেজের হাসপাতালে—

—এখন কেমন আছে?

মালতীদি বললে—আমি কালকে দেখতে গিয়েছিলাম. এখনও অজ্ঞান হয়ে আছে, জ্ঞান হয়নি—

দেবেশ বললে—তাহলে আগে হাসপাতালেই যাই—তারপরে অফিসে আসবো। পূর্ণবাবু ফিরেছেন?

মালতীদি বললে—হ্যাঁ—

দেবেশ বললে—তাহলে পূর্ণবাবুকে আপনি বলে দেবেন, আমি হাসপাতালে টুলুকে দেখতে গেলাম—

বলে আর দাঁড়ালো না সেখানে। সেই টুলু! মনে পড়লো টুলুর কথাগুলো। এসেছিল পাকিস্তান থেকে এক কাপড়ে। তখন ছোট মেয়ে। তারপর বাবা অন্ধ হয়ে গেল। ছোট ছোট দুটো বোনকে নিয়ে কী অমানুষিক পরিশ্রম তার। বাড়ি-বাড়ি ঝি-এর কাজ করে বেড়িয়েছে। তারই মধ্যে লেখাপড়া চালিয়ে যাবার চেষ্টা করেছে। যাদবপুরের কলোনীতে উদয়াস্ত পরিশ্রম করেও ছোট পরিবারের ভরণপোষণ চালাতে পারেনি। তাই আরো পরিশ্রম করেছে, আরো রাত জেগেছে, আরো সংগ্রাম করেছে। শেষে একদিন হঠাৎ রাস্তায় আলাপ হয়েছে দেবেশের সঙ্গে। দেবেশই টুলুকে পার্টি অফিসে নিয়ে এসে ভর্তি করেছে, মাসোহারা কিছু টাকা দেবার বন্দোবস্ত করেছে। বাকি সময়টাতে পাড়ার ছোট ছেলেমেয়েদের পড়িয়েও কিছু রোজগার করছিল।

আর তারপর দেবেশের মনে পড়লো সেই সুরেনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার অনুরোধটা।

দেবেশ চেয়ে দেখেছিল টুলুর দিকে। দেবেশের মনে হয়েছিল যেন টুলু আর সেই ছোট্ট মেয়েটি নেই। সে যে কবে বড় হলো তা যেন খেয়ালই ছিল না।

সেদিন টুলুর চেহারার দিকে চেয়ে দেবেশের মনে হয়েছিল টুলু যেন বড় ক্লান্ত। জীবন-সংগ্রামে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সে।

দেবেশ বলেছিল—এবার তুই একটা বিয়ে করে ফ্যাল টুলু—

বিয়ে!

বিয়ের কথাতে টুলুর সেই সলজ্জ বিষাদটা যেন এখনও দেবেশের চোখে ভাসছে। বড় মর্মান্তিক সেই ছবিটা।

টুলু বলেছিল—আমাকে কে বিয়ে করবে দেবেশদা? আমার কী দেখে বিয়ে করবে?

যেন টুলু বুঝতে পেরেছিল এমনি করে একদিন অপঘাতে তার অন্তিম দিন ঘনিয়ে আসবে।

যাক্‌গে! এ নিয়ে ভাবলে দেবেশদের চলবে না। যেমন এসেছিল তেমনিই আবার অফিসের সামনে থেকে মেডিকেল কলেজের দিকের রাস্তায় পা বাড়ালো।

হঠাৎ সুরেনের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা!

—কী রে, তুই?

সুরেন বললে—তোর সঙ্গে দেখা করতেই তো আসছিলাম। তুই কবে এলি বীরভূম থেকে?

দেবেশ বললে—এই এখুনি—

—কান্ড শুনেছিস?

—কীসের কান্ড?

সুরেন বললে—তুই ˙ ˊনসনি কিছু? টুলু বাসের ধাক্কা লেগে পড়ে গিয়েছে—

দেবেশ বললে—আমি তো এই এখুনি শুনলুম। শুনেই হাসপাতালের দিকে যাচ্ছি। তা তুই কার কাছ থেকে শুনলি?

সুরেন বললে—শুনিনি। নিজের চোখেই দেখলুম। আমার সামনেই ঘটনাটা ঘটলো। সেই জন্যেই তো তোর কাছে আসছিলুম টুলুর খবর জানাতে। ভাবলুম তুই এ ক'দিনে নিশ্চয়ই বীরভূম থেকে ফিরে এসেছিস—

দেবেশ বললে—আমি তো কিছুই জানতুম না, ব্যাপারটা শুনেই চমকে উঠেছি। মেয়েটা খুব ভাল ছিল রে!

সুরেন বললে—টুলু যদি না বাঁচে তো কী হবে ভাই?

দেবেশ বললে—কী জানি কী হবে। যা সকলের হয় তাই-ই হবে—

তারপর হঠাৎ বললে—জানিস টুলু তোকে খুব ভালোবাসতো—

—আমাকে? ভালোবাসতো?

—হ্যাঁ রে, সত্যি!

সুরেনের যেন খুব লজ্জা হলো। বললে—কী যে বলিস তুই! আমাকে টুলু আর দেখলে কতটুকু—

দেবেশ বললে—ওইটুকুর মধ্যেই তোকে ওর খুব ভালো লেগে গিয়েছিল। তোর সঙ্গে ওর খুব মিলতো। ও তোর মতই খুব লাজুক, ভীরু টাইপের—

সুরেন কিছুক্ষণ চুপ করে দেবেশের সঙ্গে চলতে লাগলো।

হঠাৎ এক সময়ে বললে—সত্যিই আমি খুব লাজুক আর ভীরু, না রে?

দেবেশ বললে—কেন, তুই নিজের স্বভাব নিজে জানিস না?

সুরেন বললে—হয়তো সেই জন্যেই এক-এক সময় ভাবি আমার দ্বারা কিছু হবে না। আমি সংসারের কারো কোনও কাজেই আসবো না—। সেদিন টুলুর

ওই এ্যাক্সিডেন্ট্টা দেখবার পর থেকেই খুব মনটা খারাপ হয়ে আছে। তারপর বাড়িতেও আবার খুব অশান্তি চলছে—

দেবেশ জিজ্ঞেস করলে—বাড়িতে? বাড়িতে আবার তোর কীসের অশান্তি হলো?

সুরেন বললে—সেবার তো অশান্তির জন্যেই বাড়ি ছেড়ে তোদের অফিসে চলে এসেছিলুম। এবার আর এক নতুন অশান্তি হয়েছে। আমার মা-মণি তার এক আত্মীয়-মেয়েকে ঘরে এনে তুলেছে। সে মেয়েটার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তার স্বামীটা মাতাল। কিছু করে না, তাই তাকে নিয়ে বাড়িতে এনে রেখেছে—

দেবেশ বললে—তাতে তোর কীসের অশান্তি?

সুরেন বললে—আমার মামা সেই জন্যে আমার ওপর খুব রেগে গেছে। মামার ধারণা আমিই তাকে ডেকে নিয়ে এসেছি—

ততক্ষণে হাসপাতালের কাছে এসে গিয়েছিল দু'জনে।

দেবেশ জিজ্ঞেস করলে—তুই যাবি আমার সঙ্গে? টুলুকে দেখতে যাবি?

সুরেন বললে—যাবো!

দেবেশ বললে—চল্ না, দেখে আসি কী অবস্থা, জ্ঞান-ট্যান হয়েছে কিনা—

হাসপাতালে ঢুকে দেবেশ ইন্ডোরে ঢোকবার চেষ্টা করতে গেল। কিন্তু দরোয়ান ঢুকতে দিলে না। বললে—এখন ঢুকতে পাবেন না বাবু, বিকেল চারটের সময় আসবেন—

দেবেশ বললে—কিন্তু এ্যাক্সিডেন্ট্ কেস, আমার যে জরুরী দরকার। পেশেন্ট কেমন আছে আমি দেখতে চাই—

কিন্তু দরোয়ান হুকুমের চাকর। বললে—দেখুন, এখানে কী লেখা আছে—

দেয়ালের গায়ে রোগীদের সঙ্গে দেখা করবার সময়-সীমা লেখা আছে। বিকেল চারটে থেকে ছ'টা।

দেবেশ বললে—কিন্তু অতক্ষণ অপেক্ষা করা চলবে না। তার আগেই যেমন করে হোক দেখা করা চাই, নইলে সোজা স্টেশন থেকে এলুম কেন?

বলেই কোথায় চলে গেল। বললে—তুই এখানে দাঁড়া, আমি এখুনি আসছি—

রাজনীতি করা লোক, ওরা বোধহয় সব করতে পারে। হয়কে নয় করতে ওদের বেশি বেগ পেতে হয় না। কোন্ ডাক্তারকে দিয়ে স্পেশ্যাল-পারমিশন করিয়ে নিয়ে এসেছে। আর সেটা দরোয়ানকে দেখিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লো। সুরেনকে বললে—আয়—

ভেতরে লম্বা সার সার বিছানা। সবই অপারেশনের কেস। দেখলে ভয় করে। সকালবেলা সমস্ত জায়গাটা পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করা হচ্ছে। একটু পরেই ডাক্তার আসবে বলে নার্সরাও ব্যস্ত। দেবেশ বিছানার নম্বর মিলিয়ে মিলিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

একটা জায়গায় গিয়ে নম্বর মিলে গেল। রোগীকে চেনা যায় না। সমস্ত মুখে মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা।

দেবেশ সেখানে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো।

সুরেনও সেদিকে দেখতে লাগলো একদৃষ্টে। রোগীর জ্ঞান আছে কি নেই তাও ভালো করে বোঝা যায় না।

দেবেশ বললে—ঘুমোচ্ছে এখন—

সুরেন বললে—একটা কোন নার্সকে জিজ্ঞেস করলে হয় কেমন অবস্থা

রোগীর—

দেবেশ বললে—জিজ্ঞেস করে আর কী হবে! যা-হবার তা তো হবেই। বেচারা অনেক কষ্ট করেছে জীবনে, এখন আরামে মরতেও পারবে না।

মরার কথাটা কত নিস্পৃহভাবে বললে দেবেশ। বলতে তার একটু যেন কষ্টও হলো না। সুরেন ভালো করে চেয়ে দেখলে দেবেশের দিকে। দেবেশদের কি কোনও মায়া-দয়াও থাকতে নেই? এরা পলিটিকস্ করে বলে কি মানুষের দুঃখ-শোকের মর্যাদাও দেবে না? টুলুর বাড়ির লোকেদের কথাও ভাববে না? অথচ এ ক'দিন সুরেন ভালো করে ঘুমোতেও পারেনি বাড়িতে। মাঝ-রাত্রে মাঝে মাঝে আচমকা ঘুম ভেঙে গেছে। হঠাৎ ভয় পেয়ে গেছে অকারণে। মামা বলেছে—কী রে, কী হলো তোর?

সুরেন কীই বা জবাব দেবে! তার মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরোয় না। চারদিকে সব কিছুই যেন গোলমাল হয়ে যেত। কেন সুখদা জীবনে শান্তি পেল না। কেন সে বিয়ে করতে গেল সবাইকে লুকিয়ে। যদি লুকিয়ে বিয়ে করতেই গেল তো অমন স্বামীকে কেন বিয়ে করলে!

আর তারপর এই টুলু!

টুলুর সঙ্গে এই সম্পর্কটাও কেমন জটিল হয়ে উঠলো। অথচ ক'দিনেরই বা সম্পর্ক, ক'দিনেরই বা পরিচয়।

দেবেশের কথাগুলো মনে পড়লো। দেবেশ বলেছিল—জানিস সুরেন, মেয়েটা তোকে খুব ভালবাসতো।

কথাটা শুনে লজ্জা পেয়েছিল সুরেন। তাকে যে কেউ পছন্দ করতে পারে এ যেন সে ভাবতেও পারে না। প্রথম দিনের কথাগুলোও মনে পড়তে লাগলো সুরেনের। সেই যেদিন প্রথম দেবেশদের পার্টি অফিসে গিয়েছিল। তারপর সেই একদিন মাধব কুণ্ডু লেনের বাড়িতে আসা। আর শেষবার দেখা সেই চশমার দোকানে।

রাস্তাতেই সুরেন বলেছিল—জানিস দেবেশ ওর ছোট বোনটারও চোখ খারাপ—

দেবেশ বলেছিল—ওদের অবস্থায় পড়লে তুই এতদিনে আত্মহত্যা করতিস—একটা ছোট বস্তিবাড়ি, তারই ভাড়া কুড়ি টাকা—

সুরেন বলেছিল—ভগবানের কি একটু দয়া-মায়াও নেই ভাই—

দেবেশ ভগবানের নাম শুনেই চটে উঠেছিল। বলেছিল—তুই কি ভগবানে বিশ্বাস করিস নাকি?

সুরেন বলেছিল—কথার কথা বলছি—

দেবেশ বলেছিল—না, আমার কাছে ভগবানের নাম করবি না। ও-সব সেকেলে আইডিয়া নিয়ে থাকলে দেশের আর উন্নতি হবে না। বাঙালীরা ভগবান-ভগবান করেই গেল—একটু মডার্ণ হতে চেষ্টা কর্ দিকিনি, নিজে ফাইট্ করে দাঁড়াতে হবে; তুই নিজে যদি চেষ্টা না করিস, তোর ভগবান হাজার চেষ্টা করলেও তোকে দাঁড় করাতে পারবে না—

ভগবানের ওপর দেবেশের বড় রাগ ছিল। সুরেনের অত সাহস ছিল না তখন যে দেবেশের কথার প্রতিবাদ করে। তখন তো জানতো না মানুষের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে হঠাৎ কখন কোন্ অদৃশ্য শক্তি সবকিছু ওলোট-পালোট করে দেয়।

—হ্যাল্লো মিষ্টার সান্যাল?

চম্‌কে উঠে পেছন ফিরে চেয়েই দেখলে, প্রজেশবাবু। প্রজেশ সেন।

—আপনি এখানে?

প্রজেশ সেন বললে—আমি তো এখানে প্রায়ই আসি। আমাকে এখানে প্রায়ই আসতে হয়।

—হাসপাতালে আপনাদের কীসের কাজ?

প্রজেশ সেন বললে—আমরা যে কোম্পানীর মেটিরিয়্যালস্‌ সাপ্লাই করি হসপিটালে। তাই একবার দেখা করতে এসেছিলাম কর্তাদের সঙ্গে। হঠাৎ দেখলাম আপনি ঢুকছেন। আপনার সঙ্গে আমার দরকার ছিল একটা—

—আমার সঙ্গে?

প্রজেশ সেন বললে—হ্যাঁ। আপনি অনেক দিন যাননি সুকীয়া স্ট্রীটে—

—না, যাইনি। সময় করে উঠতে পারিনি।

প্রজেশ সেন একবার দেবেশের দিকে চেয়ে নিলে। তারপর জিজ্ঞেস করলে—এখানে কী করতে?

সুরেন বললে—এই যে, একজন পেশেন্ট্‌কে দেখতে—

প্রজেশ সেন টুলুর ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা চেহারাটা দেখলে। বললে—কে হয় আপনার?

সুরেন বললে—আমার নিজের কেউ নয়, আমার জানাশোনা—

প্রজেশ বললে—এ্যাকসিডেন্ট্‌ কেস? কী হয়েছিল?

—বাসের ধাক্কা লেগে পড়ে গিয়েছিল।

—ও!

তারপরে আর যেন কিছু শুনতে চাইলে না। যেন এমন ঘটনা কিছু ব্যতিক্রম নয়। রোজ রোজ এ-ধরনের ঘটনা ঘটে ঘটে এখন যেন পুরোন হয়ে গেছে। কারোর মনেই যেন আর দাগ লাগে না। প্রজেশ সেন বললে—আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল। কখন দেখা হচ্ছে?

সুরেন কাছে সরে এল। জিজ্ঞেস করলে—বলুন না—

প্রজেশ সেন বললে—এখন এখানে এ-ভাবে বলা যায় না। পর্মিলির খবর শুনেছেন?

—না!

প্রজেশ সেন বললে—পুণ্যশ্লোকবাবু আপনাকে খুঁজছিলেন।

—আমাকে?

সুরেন একটু অবাক হয়ে গেল। আমাকে পুণ্যশ্লোকবাবুর মত লোক খুঁজছেন? কেন? কী ব্যাপার?

—পর্মিলিকে পুলিশ এ্যারেস্ট করেছিল, জানেন?

সুরেন আরো অবাক হয়ে গেল। বললে—কেন? পর্মিলিকে এ্যারেস্ট করতে যাবে কেন পুলিশ? কী হয়েছিল?

প্রজেশ সেন বললে—সে অনেক কথা। আপনার সঙ্গে সেই সব কথাই বলতে চাই। দোষটা আমার নামে পড়েছে। আমিই যেন সে-ব্যাপারে রেস্‌পন্সিব্‌ল। অথচ আপনি জানেন, আপনি সাক্ষী ছিলেন সেদিন, এ-সব পর্মিলিই আমাকে শিখিয়েছে।

তবু কিছু বুঝতে পারলে না সুরেন।

জিজ্ঞেস করলে—কী চার্জে ধরেছিল পুলিশ?

প্রজেশ সেন বললে—খুব সিরিয়াস চার্জ! সব কথা এখানে দাঁড়িয়ে বলা

যায় না।

—এখন ছেড়ে দিয়েছে তো?

—হ্যাঁ, ছেড়ে দিয়েছে। ছেড়ে তো দেবেই। মিনিস্টারের মেয়ে, তাকে ছাড়বে না?

—এখন পর্মিলি কী বলছে?

—বলবে আর কী! আমার নামে দোষ দিচ্ছে—

তারপর সংক্ষেপ করে বললে—এই সব বলবার জন্যেই আপনাকে খুঁজছিলুম। একদিন ভেবেছিলুম আপনাদের বাড়ি যাবো। কিন্তু ঠিকানাটা তো ঠিক জানি না।—

সুরেন বললে—আমিই একদিন আপনার অফিসে যাবো, আপনার অফিস তো চিনি!

—ঠিক আছে। কবে আসবেন? একটু তাড়াতাড়ি আসুন—

সুরেন বললে—আচ্ছা, চেষ্টা করবো কাল-পরশুর মধ্যে যেতে, আমি নানান ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছি। বাড়িতেও ঝামেলা চলছে। তারপরে এই দেখুন না, কোথাও কিছু নেই, এই এ্যাকসিডেন্ট। খুব গরীব ফ্যামিলির মেয়ে। দেখাশোনা করবার কেউ নেই। অন্ধ বাবা, ছোট ছোট বোন; একমাত্র আর্নিং-মেম্বার ছিল সে। এখানে না-এলেও চলে না—

—চলি—

বলে প্রজেশ সেন গট্ গট্ করে জুতোর শব্দ করে বাইরের দিকে বেরিয়ে গেল। টুলুর বেডের কাছে আসতেই দেখলে, দেবেশ একজন নার্সের সঙ্গে কথা বলছে।

দেবেশ বলছে—দেখুন, একটু বিশেষ যত্ন করে দেখবেন একে। এর কেউ নেই, খুব গরীব।

নার্স বলছে—আমাদের পেশেন্ট, আপনি না বললেও আমরা আমাদের ডিউটি করবো—

কথা বলে দেবেশ চলে আসছিল। সুরেনও পেছন পেছন আসতে লাগলো। এক সময়ে জিজ্ঞেস করলে—নার্স কী বললে রে দেবেশ? বাঁচবে?

দেবেশ যেমন গম্ভীর হয়ে চলছিল, তেমনিই চলতে লাগলো। তারপর অনেক পরে বললে—হয়ত বাঁচবে না!

—সে কী? সত্যি?

দেবেশ বললে—হ্যাঁ, তাই তো শুনলুম, কপালটা আধখানা ফ্র্যাক্চার হয়ে গেছে—

সুরেন স্তম্ভিত হয়ে গেল। যার শরীরের মধ্যে কপালটাই ছিল সব চেয়ে দুর্বল জায়গা, সেটাই ফ্র্যাক্চার হয়ে গেল?

অফিসের কাজেই প্রজেশ সেনকে নানা পার্টির কাছে ঘুরে বেড়াতে হয়। অফিসের প্রোডাক্ট যেখানে-যেখানে সাপ্লাই হয় সেই সব পার্টির কাছে আসা-যাওয়া করা প্রজেশ সেনের একটা ডিউটিও বটে। পাবলিক-রিলেশন্স অফিসারের কাজের কোনও বাঁধা-ধরা নিয়ম থাকে না। ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের কোনও ভি-

আই-পি কলকাতায় এলে তাঁর সঙ্গেও ঘুরতে হয়। তাঁর কোনও অসুবিধে না হয়, তা দেখতে হয়। দরকার হলে কোম্পানীর গাড়ি দিয়ে সাহায্য করতে হয়। শুধু গাড়ি নয়, গাড়ির সঙ্গে ড্রাইভার। আর তার সঙ্গে আছে আরো অনেক অনুষঙ্গ।

ক'দিন আগে রাত্রে পুণ্যশ্লোকবাবু ডেকে পাঠিয়েছিলেন প্রজেশকে।

প্রজেশ সেন যেতেই বললেন—কী হলো, তুমি যে আর আসো না? ব্যাপার কী তোমার?

প্রজেশ সেন বললে—দিল্লী থেকে একজন ভি-আই-পি এসেছিলেন, তাঁকে নিয়ে ঘুরতে হয়েছিল—

—কে? ভি-আই-পি'টি কে?

প্রজেশ সেন বললে—সেণ্ট্রাল মার্কেটিং বোর্ডের পার্চেজিং অফিসার, বছরে প্রায় দশ লক্ষ টাকার প্রোডাক্ট কেনেন আমাদের—

—পমিলির খবর কিছু রাখো?

প্রজেশ সেন বললে—কেন, আমার তো পরশুও দেখা হয়েছে পমিলির সঙ্গে—পমিলিকে নিয়ে বেরিয়েছিলুম। নিউ মার্কেটে কিছু কেনাকাটা করে ওকে বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিয়ে গেছি।

—কিন্তু কাল? কাল ও কোথায় গিয়েছিল?

প্রজেশ সেন বললে—তা তো আমি জানি না। কাল আমি পার্চেজিং অফিসারকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলুম সমস্ত দিন। তার সঙ্গেই এক সঙ্গে হোটেলে ডিনার খেলুম, তারপরে ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেল।

পুণ্যশ্লোকবাবু খুব গম্ভীর গলায় কথা বলছিলেন। বললেন—কালকে বোবাজারের চীনে-পাড়ায় কী করতে গিয়েছিল পমিলি তুমি জানো?

—বোবাজারে? চীনে-পাড়ায়?

—হ্যাঁ। রীতিমত একটা স্ক্যাণ্ডেল করেছিল সেখানে।

—কীসের স্ক্যাণ্ডেল?

পুণ্যশ্লোকবাবু সমস্ত ব্যাপারটা বললেন। কেমন করে সেই রাত্রে এক্সাইজ মিনিষ্টারকে টেলিফোন করে পুলিশের ডি-সি'কে দিয়ে পমিলিকে ছাড়িয়ে এনেছেন তাও বললেন। এই সামনে ইলেকশান আসছে, এ-সময়ে কি আমার এইসব পেটি ব্যাপারে মাথা ঘামানোর সময় আছে? তাহলে তুমি আছ কী করতে?

প্রজেশ সেন বললে—কিন্তু আমি তো এ-সব কিছুই জানতুম না স্যার। বিশ্বাস করুন আমি এর বিন্দুবিসর্গও জানতুম না।

—কিন্তু এমন করে যে পমিলি এ্যালকোহলিক হয়ে গেল তার জন্যে কে দায়ী?

প্রজেশ সেন কিছুক্ষণ সে-কথার উত্তর দিতে পারলে না।

তারপর আস্তে আস্তে বললে—আমি বুঝতে পারছি না আপনি কী বলছেন!

—বুঝতে পারছো না মানে? তুমি বলতে চাও যে তুমি জানো না পমিলি এ্যালকোহলিক? ড্রিংক না করলে পমিলি সন্ধ্যেবেলা থাকতে পারে না?

—আপনি বলছেন কী?

—হ্যাঁ, ঠিক বলছি। পমিলি আমাকে নিজে বলেছে। তুমিই তাকে এ্যাডিক্ট করিয়েছ। তুমিই তাকে অভ্যেস করিয়েছ। তুমিই তার সর্বনাশ করেছ।

পমিলি আমাকে সব বলেছে কাল।

কথা বলতে বলতে পুণ্যশ্লোকবাবুর মুখখানা লাল হয়ে উঠলো। বললেন—চুপ করে রইলে কেন? বলো, তোমার কী বলবার আছে, বলো?

প্রজেশ তখনও চুপ।

—উত্তর দিচ্ছ না যে? জবাব দাও। তোমার জবাব শোনবার জন্যেই তোমায় আজ আমি ডেকেছি।

প্রজেশ সেন বললে—আমি কী বলবো বুঝতে পারছি না।

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—ছিলে তো রাস্তার ভ্যাগাবনড্। আমিই তোমাকে পুশ্ করে করে ভদ্রলোক করে তুলেছি। তোমার মনে নেই সে-সব দিনের কথা? তোমার শোবার জায়গা ছিল না, আমি কংগ্রেস অফিসে তোমার খাওয়া-শোওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছি। কংগ্রেসের ফান্ড থেকে তোমায় টাকা দিয়েছি মাসে-মাসে হাত-খরচের জন্যে। জামা-কাপড় দিয়েছি। তুমি যখন কংগ্রেসের টাকা সরিয়েছ, আমি সব দেখেও চোখ বুজে থেকেছি। কংগ্রেস ফান্ডের টাকা মেরে তুমি বাড়ি করেছ, তা জেনেও আমি কিছুই বলিনি। আমিই তোমায় পাবলিক-রিলেশন্স অফিসারের চাকরি করে দিয়েছি। এখন বড়লোক হয়ে তুমি সব ভুলে গেলে? আমার সংসার দেখা-শোনার ভার পর্যন্ত তোমার ওপর ছেড়ে দিয়ে আমি আমার কাজ নিয়ে থেকেছি। ভেবেছি, আর যে-ই নেমকহারামি করুক তুমি অন্ততঃ তা করবে না। কিন্তু সেই তুমি আমার এমন সর্বনাশ কেন করলে?

এক নিঃশ্বাসে অনেকগুলো কথা বলে পুণ্যশ্লোকবাবু যেন খানিকটা দম নিলেন। তারপরে ধমকের সুরে বললেন—কই, জবাব দিচ্ছ না যে, আমার কথার জবাব দাও?

প্রজেশ সেন বললে—আমি যখন একবার আপনার বিশ্বাস হারিয়েছি, তখন আমার আর কিছু বলবার নেই—

—তার মানে তুমি স্বীকার করছো তুমি দোষ করেছ?

প্রজেশ সেন মাথা নিচু করে বললে—আমি কিছু বলবো না।

—বলবে না মানে? তোমায় বলতেই হবে।

প্রজেশ সেন বললে—আমি বললেও আপনি তো বিশ্বাস করবেন না।

—কে বললে আমি তোমায় বিশ্বাস করবো না? এতদিন তোমায় বিশ্বাস করিনি? এতদিন তুমি যা বলেছ সবই তো বিশ্বাস করেছি। এমন ঘটনা কখনো ঘটেছে যে, তোমাকে সন্দেহ করে তোমার অপমান করেছি! আর আজই বা তাহলে আমাকে এত কথা বলতে হচ্ছে কেন? বলো, চুপ করে থেকো না, জবাব দাও প্রজেশ—। তুমি জানো, সংসারে আমার কেউ নেই ওই পমিলি ছাড়া। পমিলি গেলে আমার সব চলে গেল!

প্রজেশ তখনও চুপ করে আছে।

—কালকে রাত্রে ভেবে ভেবে আমার ঘুম আসেনি তা জানো? ভাবলাম, আমি এ কী করলুম! সংসারকে নেগলেক্ট করে কংগ্রেসের কাজ করতে গিয়ে আমার এই লাভ হলো? জানো, সারা রাত পমিলি কেঁদেছে! আমার বুকে মাথা রেখে কেবল কেঁদেছে!

প্রজেশ তখনও মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

পুণ্যশ্লোকবাবু আর থাকতে পারলেন না। ধমক দিয়ে উঠলেন। বললেন—তুমি কথা বলো প্রজেশ, একটা কিছু কথা বলো, আমি শুনি—

প্রজেশ সেন তেমনি মাথা নিচু করেই বললে—আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—ক্ষমা? তুমি ক্ষমা চাইলেই তখুনি সাত খুন মাফ হয়ে গেল?

প্রজেশ সেন বললে—আপনি বিশ্বাস করুন, আমি কোনও অপরাধ করিনি—

—তবু বলছো অপরাধ করোনি?

প্রজেশ সেন তেমনিভাবে মাথা নিচু করে বললে—না—

পুণ্যশ্লোকবাবু যেন অবাক হয়ে গেলেন। বললেন—তুমি পর্মিলিকে মদ খাওয়া শেখাওনি?

প্রজেশ সেন তবু তেমনিভাবে বললে—না—

বলেই মুখ ঘুরিয়ে দরজার দিকে পা বাড়ালো। বললে—আমি চলি—

ওদিক থেকে মুহুরী হরিলোচন ঢুকছিল। পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—হরিলোচন, দেখ তো, প্রজেশ সেন কোন্ দিকে যাচ্ছে; ও যেন বাড়ির ভেতরে না ঢোকে—

প্রজেশ সেন বারান্দা দিয়ে বেরিয়ে তখন দোতলার সিঁড়ি দিয়ে ওপরের দিকে উঠতে যাচ্ছিল। পেছন থেকে হরিলোচন মুহুরী ডাকলে—প্রজেশবাবু!

প্রজেশ সেন পেছন ফিরলো।

হরিলোচন বললে—আপনি ভেতরে যাবেন না, বাবু মানা করে দিলেন—

প্রজেশ সেন খানিকটা আশ্চর্য হয়ে গেল কথাটা শুনে।

তারপর বললে—ও—

আর তারপর সোজা গেট পেরিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে গেল।

অফিসের ভেতরে প্রজেশ নিজের মনেই নিজের কাজ করছিল। হঠাৎ একজন চাপরাশি এসে একটা স্লিপ্ দিলে।

প্রজেশ সেন স্লিপ্‌টা পড়ে দেখলে তাতে লেখা রয়েছে—সুরেন্দ্রনাথ সান্ন্যাল—

চাপরাশির দিকে চেয়ে বললে—বাবুকে ভেতরে নিয়ে এসো—

অনেকদিন আগে একবার এই অফিসেই এসেছিল সুরেন। সে তখন চাকরির সন্ধানে। আজ এতদিন পরে আবার এসেছে। সেই একই ঘর। কিন্তু মিস্টার সেনের চেহারায় যেন আর সে জৌলুষ নেই।

প্রজেশ সেন বললে—এসেছেন মিস্টার সান্ন্যাল! কী খাবেন, চা না কফি? বলেই কলিং-বেলটা ঘটাং করে বাজিয়ে দিলে।

সুরেন বললে—আমি তো চা কফি কিছুই খাই না—

—আরে খান খান, কফি খেলে জাত যাবে না আপনার। হাসপাতালে আপনার ফ্রেন্ড কেমন আছে আজ?

সুরেন বললে—ভালো নয়—

—কী রকম ফ্রেন্ড আপনার?

সুরেন বললে—সেদিন তো আপনাকে বলেছিলাম, ফ্রেন্ড ঠিক নয়, একটা মেয়ে, আমার পরিচিত, আমার সামনেই এ্যাক্‌সিডেন্টটা হয়েছিল কিনা। তাই মনটা বড় খারাপ হয়ে আছে। শেষ পর্যন্ত বোধহয় বাঁচবে না। কী যে হবে

ওদের—

প্রজেশ সেন বললে—কলকাতায় তো রোজই অ্যাকসিডেণ্ট হচ্ছে, সব হিসেব করতে গেলে মন আরো খারাপ হয়ে যাবে। কাজকর্ম কিছু হবে না।

একটু থেমে সুরেন বললে—আপনি বলেছিলেন আমার সঙ্গে জরুরী কথা আছে—

—বলছি, কফি আসুক।

একটু পরেই কফি এল। কফি খেতে খেতে প্রজেশ সেন বললে—এখানে বসে ঠিক কথা হবে না। চলুন, বাইরে কোথাও যাই—

—বাইরে কোথায়?

—যেখানে হোক। হয় গঙ্গার ধারে, নয়তো কোনও বারে?

—বারে? মানে মদের দোকানে? কিন্তু আমি তো ও-সব খাই না। আর খাবোও না।

প্রজেশ সেন বললে—ঠিক আছে, না-হয় আমি একলাই খাবো। আমার না খেলে চলবে না। আমি আজকাল সকালেও খাচ্ছি, বিকেলেও খাচ্ছি, সন্ধ্যে-বেলাও খাচ্ছি—

—কেন?

—চলুন, বাইরে গিয়ে বসবো। বলে প্রজেশ সেন উঠলো। সুরেনের মনে হলো প্রজেশ সেন যেন ভালো করে দাঁড়াতেও পারছে না। অফিসের কাকে যেন ডাকলে প্রজেশ সেন। ডেকে বলে দিলে সে চলে যাচ্ছে কোন্ একটা কাজে। একটা অফিসের নামও করলে।

তারপর সিঁড়ি দিয়ে নেমে নিজের গাড়িতে উঠলো। সুরেন বসলো পাশে গিয়ে। আর তারপর সেই অবস্থায় কোথা দিয়ে যে গাড়ি চালিয়ে কোথায় চলতে লাগলো তার ঠিক নেই। শেষকালে একটা বাড়িতে গিয়ে ঢুকলো। বাইরে থেকে বোঝা যায় না সেটা কোনও মদের দোকান। দোকানের মালিক চীনেম্যান। বেশ ভদ্রভাবেই অভ্যর্থনা করলে। ছোট একটা ঘর। তারই ভেতরে টেবিল চেয়ার সাজানো। চীনেম্যানটা কাচের গেলাসে কিছু মদ ঢেলে দিয়ে গেল।

—আপনি কী খাবেন, বলুন?

সুরেন বললে—আমি কিছু খাবো না, আমি বাড়িতে গিয়ে খাবো।

প্রজেশ সেন বললে—তা হয় না। কিছু খেতে হবেই। এটা দোকান নয়। এটা এই চীনেম্যানের বাড়ি। বাড়ির মধ্যেই এরা এই দোকানটা খুলেছে। যাকে-তাকে এখানে আসতে দেয় না—

কলকাতা সহরের এ-দিকটা এতদিন দেখা ছিল না সুরেনের।

প্রজেশ সেন তখন খাবারের অর্ডার দিয়ে দিয়েছে।

খেতে খেতে প্রজেশ সেন বললে—আপনাকে আমার একটা কাজ করতে হবে ভাই, আমি ভীষণ বিপদে পড়েছি—

—কী বিপদ?

প্রজেশ সেনের গলা যেন ভারি হয়ে উঠলো। বললে—পুণ্যশ্লোকবাবু আমায় বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন—

—তাড়িয়ে দিয়েছেন মানে?

—তাড়িয়ে দিয়েছেন মানে তাড়িয়ে দিয়েছেন। পমিলির সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলুম, তাও দেখা করতে দিলেন না।

—কেন? কী করেছিলেন আপনি?

প্রজেশ সেন বললে—পর্মিলি একদিন মদ খাওয়ার জন্যে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিল। দোষ হলো আমার। আমিই নাকি পর্মিলিকে মদ খাওয়া শিখিয়েছি! বিশ্বাস করুন ভাই, পর্মিলিই আসলে আমাকে শিখিয়েছে মদ খেতে। আমি গরীবের ছেলে, আমি মদ কেনবার বয়সা পাবো কোত্থেকে? আমি চিরকাল কংগ্রেসের ভলাণ্টিয়ারি করে এসেছি, খদ্দর পরেছি, চরকা কেটেছি। এখন কংগ্রেস মিনিষ্ট্রি পেয়েছে বলে খদ্দর-ফদ্দর ছেড়ে দিয়ে স্যুট পরেছি। কিন্তু আগে? আগে তো আমাকে আপনি দেখেননি! আগে দেখলে বুঝতে পারতেন। তখন আমি অন্য রকম ছিলুম—

আর একবার গ্লাসে চুমুক দিয়ে দুঃখের কাহিনী বলতে লাগলো প্রজেশ সেন—সেই আমাকে প্রথম মদ ধরালে পর্মিলি। আর আজ কিনা আমার নামে দোষ হলো?

—তা পর্মিলিকে পুলিশ ধরলো কেন? মদ খাওয়া কি বেআইনী?

প্রজেশ সেন বললে—আরে সেদিন যে ড্রাই-ডে ছিল। কোথাও মদ পায়নি, শেষকালে গেছে চোলাই মদের দোকানে। আমি সঙ্গে থাকলে ও-সব কিছু হতো না। আমি আবার সেদিন অফিসের বাজেট নিয়ে ব্যস্ত ছিলুম।

—কিন্তু তা বলে আপনাকে পুণ্যশ্লোকবাবু বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলেন?

—হ্যাঁ, একবার দেখা করতে যাচ্ছিলাম পর্মিলির সঙ্গে, তাও দেখা করতে দিলেন না। হরিলোচন মুহুরীকে দিয়ে ভেতরে যেতে বারণ করে দিলেন। এত ইন্‌সাল্‌টও আমার কপালে ছিল! তারপর থেকে মনটা এত খারাপ হয়ে গেছে যে, অফিসের কাজে মন বসছে না, কেবল মদ গিলছি ভাই। ভাবছি আত্মহত্যা না করে ফেলি!

—ছি ছি, আপনি অত মন-মরা হচ্ছেন কেন?

—মন-মরা হবো না? আপনি বলছেন কী? আপনি জানেন না পুণ্যশ্লোকবাবুর জন্যে কী না করেছি। পুণ্যশ্লোকবাবুকে মিনিষ্টার করলো কে? আমি যদি ওঁর সংসার না দেখতুম তো উনি কংগ্রেসের কাজ করতে পারতেন? ওঁর তো স্ত্রী নেই। উনি যখন বাইরে মিটিং করে করে বেড়িয়েছেন তখন আমিই তো ওঁর ছেলেমেয়েদের দেখেছি। সংসার-খরচ আমার হাত দিয়েই হয়েছে, আমি ইচ্ছে করলে কত টাকা সরাতে পারতুম বলুন তো? সরাতে পারতুম না? কিন্তু বরাবর ওঁর ভালই চেয়েছি। ওঁর উন্নতিই চেয়েছি। উনিও আমার জন্যে অবশ্য কিছু করেননি তা নয়। কিন্তু মানুষ এত আন-গ্রেটফুল হয়? এত অকৃতজ্ঞ হতে পারে?

সুরেন চুপ করে রইল। এ ব্যাপারে তার আর কী করবার থাকতে পারে!

খানিক পরে জিজ্ঞেস করলে—আর পর্মিলি? পর্মিলি আপনার সঙ্গে আর দেখা করেনি?

প্রজেশ সেন বললে—সে তো সেই ব্যাপারের পর থেকেই ভয়ানক মুষড়ে পড়েছে।

—আপনি কী করে জানলেন মুষড়ে পড়েছে?

—নিশ্চয়ই মুষড়ে পড়েছে। খুবই ন্যাচারাল। হাজার হোক একজন মেয়ে তো! মেয়েদের মন এমনিতেই একটু সেণ্টিমেণ্টাল। তার ওপর পর্মিলিকে তো আপনি চেনেন, পর্মিলি আরো মুডি।

সুরেন জিজ্ঞেস করলে—টেলিফোন করেননি কেন? যখন পুণ্যশ্লোকবাবু বাড়িতে থাকেন না, সেই সময়ে টেলিফোন করলেই পারেন!

—তাও করেছিলাম। কিন্তু আজকাল টেলিফোন ধরাও বোধহয় বারণ আছে পর্মিলির। আমি টেলিফোন করতেই রঘু টেলিফোন ধরলে। সেই রঘু আমার নাম শুনে বললে দিদিমণির অসুখ!

সুরেন অবাক হয়ে গেল শুনে।

বললে—অসুখ?

প্রজেশ সেন বললে—আরে অসুখ-টসুখ সব বাজে কথা। আসলে টেলিফোন এলে পর্মিলিকে দেওয়া হয় না, জানানো হয় না। পুণ্যশ্লোকবাবুর সেই রকম ইন্সট্রাকশান দেওয়া আছে—

—কিন্তু তাহলে কী করবেন?

প্রজেশ সেন মিনতিতে করুণ হয়ে উঠলো। বললে—ভাই, তাই আপনার শরণাপন্ন হয়েছি। এক্ষেত্রে আপনিই শুধু আমাকে বাঁচাতে পারেন। এর জন্যে আপনি যা চান আমি তাই-ই দেবো। আপনি যা করতে বলেন আমি তাই-ই করবো।

সুরেন বললে—না না, আমায় কিছু করে দিতে হবে না। আমার কিছু চাই না।

প্রজেশ সেন তখন আরো নেশা করেছে। সুরেনের হাত দুটো জড়িয়ে ধরলে হঠাৎ। বললে—না না ভাই। আমাদের অফিসেই আপনাকে একটা চাকরি দেবো, একটা ভেকেন্সি রয়েছে এখন। আপনি একদিন চাকরি চাইতেই এসে-ছিলেন, তখন ভেকেন্সি ছিল না—

—না, তাতে কী হয়েছে। সে চাকরি আপনি যখন ইচ্ছে হয় দেবেন। আপনার জন্যে নয়, আমি আমার নিজের জন্যেই পর্মিলির কাছে যাবো। পর্মিলি কেমন আছে দেখে আসবো, অনেক দিন যাইনি ওদের বাড়িতে—

—তাহলে একটা চিঠি নিয়ে যাবেন? আমি একটা চিঠি লিখে দেবো আপনাকে?

—তা দিন।

—দেখবেন যেন আর কারো হাতে চিঠিটা না পড়ে। খুব সাবধান।

সুরেন বললে—না, কারো হাতে পড়বে না। কিন্তু এখন কি আপনি লিখতে পারবেন, এই অবস্থায়?

—কেন পারবো না? আপনি ভাবছেন আমার নেশা হয়েছে? আমার নেশা হয় না। নেশা হয় পর্মিলির। একটু খেলেই বক্-বক্ করতে আরম্ভ করে। আসলে বিশ্বাস করুন, এর জন্যে পুণ্যশ্লোকবাবুই দায়ী। পর্মিলিকে মদ ধরিয়েছেন পুণ্যশ্লোকবাবু। বাড়িতে ফরেনারদের নেমন্তন্ন করে আসতেন। তাদের খাতির করবার জন্যে বোতল এনে রেখে দিতেন ফ্রিজের ভেতরে। তখন থেকেই ভাই বোনে একটু-একটু খেতো। সব দোষই পুণ্যশ্লোকবাবুর। তিনি নিজের কেরিয়ার করবার জন্যে পর্মিলিকে তাদের সঙ্গে মিশতে দিতেন। একজন আমেরিকান তো পর্মিলিকে নিয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টাও করেছিল—

সুরেন বললে—হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার মনে পড়েছে, আমি একদিন দেখেছিলাম একজন আমেরিকান সাহেবকে পর্মিলি সকলের সামনে চুমু খাচ্ছে—

প্রজেশ সেন বললে—সেবার তো আমিই বাঁচাই পর্মিলিকে। ও তো বাড়ি থেকে চলে গিয়ে সাহেবটার সঙ্গে হোটেলে উঠেছিল।

—তারপর?

সে-সব অনেক কথা। আজকে আমারই ঘাড়ে সব দোষ চাপলো? বলে আবার

গেলাসে চুমুক দিলে প্রজেশ সেন।

সুরেন বললে—চিঠিটা দিন তাহলে?

—আগে আপনার খাওয়া হোক। কই, আপনার তো কিছুই খাওয়া হলে না। সব যে পড়ে রইলো।

সুরেন বললে—আমার পেট ভরে গিয়েছে।

প্রজেশ সেন হঠাৎ বড় ঘনিষ্ঠ হয়ে এলো। সুরেনের কাছ ঘেঁষে সরে এল বললে—আমি মদ খাচ্ছি বলে আপনি আমায় ঘেন্না করছেন না তো ভাই?

সুরেন বললে—না না, ঘেন্না করবো কেন?

—কিন্তু আপনি তো জানেন, আমাকে পর্মিলিই মদ খাওয়া শিখিয়েছে পর্মিলিই আমার সর্বনাশ করেছে মিস্টার সান্যাল। আমি আগে বেশ ছিলুম আমি খদ্দর পরতুম, চরকা কাটতুম। আই ওয়াজ্ কোয়ায়েট হ্যাপি। কিন্তু পর্মিলি! পর্মিলিই আমাকে মাতাল করে দিয়েছে। সেই পর্মিলির কাছেই আর আমার যাবার উপায় নেই। এখন পুণ্যশ্লোকবাবুর কাজ উদ্ধার হয়ে গেছে কিনা, তাই আমাকে কিক্-আউট করে তাড়িয়ে দিলে—

তারপর কাঁদতে লাগলো প্রজেশ সেন।

মহা মুশকিলে পড়লো সুরেন। বললে—কাঁদছেন কেন প্রজেশবাবু, কাঁদছেন কেন? চুপ করুন। এরা কী ভাববে বলুন তো?

প্রজেশ সেন বললে—ভাবুক। ওরা চীনেম্যান, ওরা কী বুঝবে? আমার কষ্ট কেউ বুঝতে পারবে না। আমি কী করবো?

সুরেন বললে—আমি তো বলছি আপনার চিঠিটা নিয়ে আমি পর্মিলিকে দিয়ে আসবো। কেউ জানতে পারবে না। আপনি চিঠিটা লিখুন—

—লিখবো বলছেন?

সুরেন বললে—হ্যাঁ লিখুন, কোনও ভয় নেই আপনার—

প্রজেশ সেন পোর্ট-ফোলিও ব্যাগটা খুলে তার ভেতর থেকে প্যাড্ বার করলে। কলম বার করলে। তারপর চিঠি লিখতে লাগলো—

অনেক দিন পরে এইসব দেখে-শুনে সুরেন মনে মনে ভেবেছিল এ কোন্ পৃথিবীতে সে বাস করছে! এখানে কি কোথাও কারো সঙ্গে কারোর সম্পর্ক থাকতে নেই! সবাই কি এখানে বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন! স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর, ভাইয়ের সঙ্গে বোনের, বাপের সঙ্গে মেয়ের, বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর সম্পর্কের কোনও যোগসূত্র নেই? এমন কেন হলো? যেখানে সম্পর্ক আছে তাও যেন কেমন স্বার্থের দ্বারা কলুষিত! সত্যিই এ কোন্ পৃথিবী? এই পৃথিবীতে কেন সে জন্মালো?

পর্মিলির কীসের অভাব ছিল সংসারে? পুণ্যশ্লোকবাবুরই বা মিনিস্টার হওয়ার কী দরকার ছিল? অর্থ-খ্যাতি-বিলাস-ঐশ্বর্যের তো কোনও কমতি ছিল না। তাহলে কেন তিনি দৌড়লেন রাজনীতি করতে? কীসের মোহে?

আর সুখদা! সুখদার কথাও মনে পড়তো তার! পেছনে যত ষড়যন্ত্রই থাক সুখদারও বুদ্ধি-বিবেচনা কিছু কম ছিল? তাহলে কেন সে অমন করে নিজের সর্বনাশ করতে গেল কালীকান্ত বিশ্বাসকে বিয়ে করে?

অনেক দিন পরে একদিন সুরেন সুখদাকে জিজ্ঞেস করেছিল—আচ্ছা, কী মতিভ্রম হয়েছিল তোমার যে, ওই লোকটাকে বিয়ে করতে গেলে?

সুখদা বলেছিল—সে তুমি বুঝবে না।

সুরেন বলেছিল—কেন বুঝবো না, নিশ্চয়ই বুঝবো, তুমি বলোই না।

এক-এক সময় সুখদা কাঁদতো। বলতো—আমার মরণ হয় না কেন, বলতে পারো তুমি?

সুরেন বলতো—কেন মরতে তুমি ওই লোফারটাকে বিয়ে করতে গেলে বলো? কে তোমাকে মাথার দিব্যি দিয়েছিল বিয়ে করতে? বিয়ে করার দরকার কেন হয়েছিল তোমার, বলো?

সুখদা অনেকক্ষণ পরে জবাব দিয়েছিল—তোমার জন্যে।

—আমার জন্যে?

—হ্যাঁ, তোমার জন্যে।

সুরেন সেদিন অবাক হয়ে ভাবতে চেষ্টা করেছিল, সে কেমন করে দায়ী হতে পারে সুখদার বিয়ের ব্যাপারে! তার কীসের অপরাধ। সে তো কারো কোনও ব্যাপারের মধ্যেই থাকে না। থাকতে পারে না। থাকার ক্ষমতাই তার নেই।

তবু জিজ্ঞেস করলে—কিন্তু তুমি তো আমাকে কখনও কিছু বলোনি।

—কেন বলবো তোমাকে?

—বারে বা, আমার জন্যে তোমার জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল আর তুমি আমাকে কিছু বলবে না?

সুখদা বললে—থাক, ও কথা এখন থাক—

সেদিন হাজার পীড়াপীড়ি করেও আর সুখদার মুখ থেকে কোনও কথা বার করতে পারেনি সুরেন।

সুখদা বলেছিল—না, আমি কিছুতেই বলবো না। আমার সর্বনাশ করে এখন তুমি এসেছ সোহাগ জানাতে?

সুরেনের সে এক আশ্চর্য অনুভূতি হয়েছিল সুখদার কথা শুনে। নিজের মনের মধ্যেই বার বার প্রশ্নটা মাথা খুঁড়ে মরেছে। তবু কোনও সমাধান পায়নি। জীবন যে কত বিচিত্র, কত রহস্যময় সেই কথাটা ভেবে ভেবেই কেবল অবাক হয়ে গেছে। আর জীবনের অর্থ খোঁজবার জন্যে আরো বেশি করে জীবনকে পরিক্রমা করেছে। সেই পরিক্রমা যখন শেষ হলো, এই মাধব কুণ্ডু লেনের বাড়িটাও বোধহয় ভেসে তলিয়ে গেল।

কিন্তু সে আর এক কাহিনী!

আজ প্রজেশ সেনের কথাটা ভাবতে ভাবতেই রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসছিল সুরেন। অনেক রাত হয়েছে। তবু সুরেনের মনে হলো রাস্তাটা আরো লম্বা হলে যেন ভালো হতো। আরো অনেকক্ষণ ধরে ভাবতে পারা যেত। সেই সুব্রতর সঙ্গে স্কুলে পড়তে পড়তে যেদিন প্রথম ওদের বাড়িতে গিয়ে পর্মিলিকে দেখেছিল, সেইদিনটার কথাগুলো মনে পড়তে লাগলো। সেদিনকার সেই পর্মিলির সঙ্গে যে আবার একদিন সে এমন করে জড়িয়ে পড়বে, তাই-ই কি সে তখন ভাবতে পেরেছিল?

কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট ধরে সোজা আসতে আসতে মাধব কুণ্ডু লেনের ভেতরে ঢোকবার মুখেই হঠাৎ দেবেশের সঙ্গে দেখা।

- কী রে, এত রাত করে বাড়ি ফিরছিস যে? কোথায় গিয়েছিলি?

সুরেন সে-কথার উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞেস করলে—তুই এত রাতে এখানে?

দেবেশ বললে—তোর খোঁজ করতেই তো এসেছিলুম। তুই বাড়িতে নেই শুনলুম, তাই চলে যাচ্ছিলুম—তা আজ হাসপাতালে যাসনি কেন?

সুরেন জিজ্ঞেস করলে—টুলুর খবর কী বল? কেমন আছে সে?

দেবেশ বললে—সেই কথা বলবার জন্যেই তো তোর বাড়িতে এসেছিলুম,

টুলু তোর কথা জিজ্ঞেস করছিল—

সুরেন জিজ্ঞেস করলে—তাহলে টুলুর জ্ঞান ফিরেছে?

দেবেশ বললে—হ্যাঁ, ডাক্তার বেশি কথা বলতে বারণ করলে।

—আর কী বললে?

—আর কিছু বলেনি। আমি তখন দাঁড়িয়েছিলুম পাশে। চোখ খুলেই আমার দিকে নজর পড়লো। আমি জিজ্ঞেস করলুম—কেমন আছিস? তা সে-কথার কোন উত্তর দিলে না সে। শুধু আমার দিকে চেয়ে যেন কিছু বলতে চাইলে। আমি জিজ্ঞেস করলুম—কিছু বলবি? সে আস্তে আস্তে বললে—সে আসেনি? আমি জিজ্ঞেস করলুম—সে কে? টুলু বললে—তোমার বন্ধু?

সুরেন অবাক হয়ে কথাটা কিছুক্ষণ ভাবতে লাগলো।

তারপর বললে—আমার কথা কেন প্রথমে জিজ্ঞেস করলো বল তো?

দেবেশ বললে—আমিও তো তাই অবাক হয়ে গিয়েছিলুম। বাবার কথা জিজ্ঞেস করলে না, বোনদের কথা জিজ্ঞেস করলে না, পূর্ণবাবু, সন্দীপদা, কারোর কথাই জিজ্ঞেস করলে না। শুধু তোর কথা জিজ্ঞেস করলে—

—তারপর আর কী কথা হলো?

দেবেশ বললে—তখন ডাক্তার এসে আমাকে চলে যেতে বললে। আর কোনও কথা হলো না। আমিও ভাবলুম, বেশি কথা বললে যদি শরীর খারাপ হয়। তাই সোজা চলে এলুম—

সুরেন জিজ্ঞেস করলে—ওর বাড়ির লোক খবর পেয়েছে?

দেবেশ বললে—আমি খবর দিয়ে এসেছি কাল। সন্দীপদার কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়ে গিয়ে দিয়ে এসেছি। ওর অন্ধ বাবা কাঁদতে লাগলো। বোন-গুলোও কাঁদতে লাগলো। আমি যা সান্ত্বনা দেবার তা দিলাম। কিন্তু এ-ব্যাপারে কারো মন কি মানে?

সুরেন বললে—কাল আমি যাবো দেখতে। আজকেও যাবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু ভাই একটা ব্যাপারে এমন আটকে গেলাম—

—তোর আবার কী ব্যাপার?

সুরেন বললে—সেই সুব্রতর বোন পমিলিকে নিয়ে।

—সে কী? তুই এখনও সেখানে যাস নাকি?

—না, যাই না। কিন্তু একটা বিপদ হয়ে গিয়েছিল ওর। মদ খাওয়ার জন্যে পুলিশে ধরেছিল। সে এক কেলেঙ্কারি কাণ্ড। একে মিনিষ্টারের বাড়ির ব্যাপার, তার ওপর মেয়েমানুষ তো খুব মুশকিলে পড়েছে—

দেবেশ বকতে লাগলো। বললে—তুই ও-সব ব্যাপারের মধ্যে থাকিস কেন? আমি তোকে হাজার বার বলেছি, এই ইলেকশান আসছে, দ্যাখ্ না, কী হয় এবার—

—কী হবে?

—কংগ্রেস হারবে।

সুরেন অবাক হয়ে গেল। বললে—সত্যি? সত্যি হারবে?

দেবেশ বললে—তুই দেখে নিস। কংগ্রেস যদি না হারে তো আমার কান কেটে ফেলবো, এই তোকে বলে রাখলুম।

সুরেন নিজের মনেই ভাবতে লাগলো। কংগ্রেস যদি হারে তো পুণ্যশ্লোক-বাবুর কী হবে! তাহলে পুণ্যশ্লোকবাবু কী নিয়ে থাকবেন! আবার সেই কোর্টে প্র্যাকটিস্ করতে হবে। তখন পমিলিই বা কী করবে! এবার মিনিষ্টারের

মেয়ে বলে পুলিশের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে গেল, কিন্তু তখন? তখন কে বাঁচাবে?

দেবেশ হঠাৎ বললে—ঠিক আছে, অনেক রাত হয়ে গেল। এবার তুই বাড়ি যা—

দেবেশ চলে যাবার পর সুরেনও বাড়ির দিকে চলতে লাগলো আস্তে আস্তে।

অন্দর-মহলের ভেতরে মা-মণি ভোরবেলাই ঘুম থেকে উঠেছে। তরলা ঘরে আসতেই জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁ রে, সুখদা উঠেছে?

তরলা বললে—এখনও তো ওঠেনি—

মা-মণি বললে—আহা, ঘুমোক, ঘুমোক একটু। অনেক দিন ভালো করে ঘুমোতে পারেনি রে। উঠলেই জল-খাবার দিস মা তুই। ভালো করে খাওয়াস ওকে। ও তো মুখে কিছু বলবে না। ও মেয়ে তেমন নয়।

তরলা হঠাৎ বললে—ধনঞ্জয় বলছিল, কাল নাকি সেই লোকটা এসেছিল।

—কোন্ লোকটা? মা-মণি বুঝতে পারলে না।

তরলা বললে—সেই বুড়োপানা লোকটা। যে আগে আসতো ম্যানেজার-বাবুর কাছে—

—কে? কার কথা বলছিস?

তরলা বললে—সেই যে যে-লোকটা খুব মদ খেয়ে মাতলামি করে বার-বাড়িতে। একদিন মদ খেয়ে উঠোনে পড়ে গিয়েছিল। ধনঞ্জয় বলছিল সে নাকি ম্যানেজারবাবুর ঘরে এসে খুব হল্লা করেছে।

মা-মণি বললে—কই, আমি তো কিছু টের পাইনি। কখন?

তরলা বললে—সে অনেক রাত্তিরে—

—তুই ধনঞ্জয়কে ডাক তো আমার কাছে—ডেকে নিয়ে আয় এখেনে। যা—

সত্যিই নরেশ দত্তদের তখন খুবই বিপদের দিন। কালীকান্ত বিশ্বাসকে খুব একহাত নিয়েছিল নরেশ দত্ত।

নরেশ দত্ত বলেছিল—তোরই তো শালা দোষ, তোর জন্যেই তো এই হলো।

কালীকান্ত বললে—তাহলে এখন কী হবে?

শুধু যে টাকা-কড়ির ভাবনা তাই-ই নয়। তার ওপর আছে রান্না-খাওয়ার ভাবনা। বাড়িতে রান্না করবে কে? নরেশ দত্ত তার পাথুরেঘাটার বাড়ি ছেড়ে দিয়ে এখানে এসেই উঠেছিল এতদিন। এখানে এসে দৈনিক মদের খরচটা জুটতো। একটা আস্তানাও ছিল মাথা গোঁজবার মত। এককালে নিজের মুখে রাজা-উজির মেরেছে। তখন বংশ দেখিয়ে লোকের কাছে কিছু ধার-খয়রাত পাওয়া যেত। প্রথমদিকে সেই রকম করেই ঠাট বজায় রেখেছে। তারপর যখন সে-সব খতম হয়ে গেল, তখন ধাপ্পা দেওয়া শুরু হলো। মিষ্টি কথায় বড়-বড়লোকের ছেলেদের এ-লাইনে নিয়ে এসে তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে কিছু-দিন চললো। কিন্তু কিছুদিন পরে যখন তাদের পাখা গজালো তখন আর তারা পাত্তা দিতে চায় না। তখন লায়েক হয়ে যায় সবাই।

শেষকালে আরম্ভ হলো জালিয়াতি। মানে টাকা নিয়ে কার সর্বনাশ করবে

তার মতলব বার করে দেওয়া। কোর্টের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে মিথ্যে সাক্ষী সাজা। এমনি অনেক রকম ফন্দি-ফিকির করে চালাচ্ছিল নরেশ দত্ত।

এমন সময় ভূপতি ভাদুড়ী নরেশ দত্তর খপ্পরে পড়লো।

প্রথমে ভেবেছিল কাজটা সহজ হবে। কিন্তু তা যে শেষকালে এমন জটিল হয়ে উঠবে তা কে জানতো।

কালীকান্ত আবার জিজ্ঞেস করলে—তাহলে এখন কী হবে ছোড়দা?

নরেশ দত্ত বললে—এখন কেন ছোড়দার খাতির করছিস? তখন মনে ছিল না? তোকে কলকাতার বাইরে পাঠিয়ে দিলুম টাকা-কড়ি দিয়ে, তাহলে আবার কেন ফিরে এলি?

—ফিরে এলুম কি সাধে? তুমি বলেছিলে টাকা পাঠাবে, কিন্তু টাকা তো পাঠালে না তুমি, আমি তখন কী করি, কী খাই, তাই চলে এলুম—

নরেশ দত্ত রেগে গেল। বললে—তা তোকে চিরকাল টাকা পাঠাতে হবে? তুই কিছু রোজগারপাতি করবি না? তোর মদ গেলার পয়সা আমি যুগিয়ে যাবো বরাবর! আমি অত টাকা কোথায় পাবো শুনি?

—তা ভূপতি ভাদুড়ীর কাছে তুমি তো সে-বাবদ মোটা টাকা নিয়েছ?

রেগে গেল নরেশ দত্ত। বললে—আমি মোটা টাকা নিয়েছি? কে বললে তোকে? কে বললে তোকে এ-কথা?

কালীকান্ত হাসতে হাসতে বললে—তুমি রাগছো কেন ছোড়দা, তুমি যে মোটা টাকা নিয়েছ সে তো সবাই জানে!

—আমি টাকা নিয়েছি? তুই বলছিস কী?

কালীকান্ত বললে—টাকা না নিয়ে তুমি কি কাজে হাত দিয়েছ ছোড়দা? টাকা নিয়ে তুমি আমাকে ডুবিয়েছ, সুখদাকেও ডুবিয়েছ—

নরেশ দত্ত রেগে গেল। বললে—সুখদা এই কথা বুঝি তোকে বলেছে? বড় মিথ্যেবাদী তো ছুঁড়িটা—

কালীকান্ত বললে—এখন আর তার নামে দোষ দিয়ে লাভ নেই, এখন কী করা যায় তাই বলো। এখন আমার চলবে কী করে?

নরেশ দত্ত বললে—তুই শালা নিজে দোষ করে আমার ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছিস—? আমি টাকা নিয়েছি ভূপতি ভাদুড়ীর কাছে? আমি যদি ভূপতি ভাদুড়ীর কাছে টাকাই নেব তো তোকে আমি কিছু দিতুম না ভেবেছিস? মেয়েটা কি আমার কথায় ঘর থেকে বেরিয়ে এল?

কালীকান্ত বললে—তুমি তো আমাকে বলেছিলে লুকিয়ে লুকিয়ে চিঠি লিখতে—

—তাহলে আমার নামে দোষ দিচ্ছিস কেন? তুই চিঠি লিখলে সে তোর খপ্পরে পড়লো কেন? সে কেন টোপ্ গিললো?

তুমি যে তরলাকে ভেতর থেকে ঘুষ দিয়েছিলে।

নরেশ দত্ত রেগে গেল। বললে—দ্যাখ্, যা করেছি সব তোর ভালোর জন্যেই করেছি। আমার কী! আমার তো তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে। ওই অত টাকার সম্পত্তি, ওই বুড়ি মারা গেলে তো সব তুই-ই পাবি। তখন কি আমাকে ভাগ দিতে আসবি তুই? বল্ না, ভাগ দিবি?

—কী যে বলো তুমি ছোড়দা! সম্পত্তি আমি পাবার আগে যে ভূপতি ভাদুড়ী তার ভাগ্নের নামে উইল করে নেবে—এগারোখানা বাড়ি যে সব ওই ভাগ্নে বেটার নামে করে নিচ্ছে—

নরেশ দত্ত বিজ্ঞের মত হাসতে লাগলো। বললে—ওরে, ওসব আমি অনেক দেখিচি। একজন সম্পত্তি করে যায়, আর সে সম্পত্তি কে ভোগ করে তা তো নিজের জীবনেই দেখলুম। এই যে আমার ঠাকুর্দাদার সম্পত্তি, এ কি আমাদের ভোগে লেগেছে?

—তা তুমি যদি সব মেয়েমানুষ আর মদের পেছনে উড়িয়ে দাও তো তোমার ঠাকুর্দাদার কী দোষ!

নরেশ দত্ত বললে—ও-সম্পত্তিও দেখবি তেমনি ভূপতি ব্যাটার ভোগে আসবে না, সব তোর কপালে নাচছে!

—কী রকম? কালীকান্ত যেন হতাশার মধ্যে একটা আশার কথা শুনতে পেলে।

নরেশ দত্ত বললে—শিবশম্ভু চৌধুরী তো ওই মাধব কুণ্ডু লেনের বাড়িতে বসে সম্পত্তি বানিয়ে গেল। তখন কি ভেবেছিল যে, পাথুরেঘাটার দত্তবংশের নরেশ দত্ত এসে তাতে ভাগ বসাবে? কেউ স্বপ্নেও তা ভাবে?

কালীকান্ত তখন বড় বশংবদ হয়ে এসেছে! বললে—সত্যি বলছো ছোড়দা, সব সম্পত্তি আমাদের ভোগে আসবে?

নরেশ দত্ত বললে—আসবে না তো আমি আছি কী করতে? দ্যাখ্ না, ওই ভূপতি ম্যানেজারকে আমি কী-রকম নাজেহাল করি। ওকে নাকে দড়ি দিয়ে আমি ঘানিতে ঘোরাবো তবে আমার নাম নরেশ দত্ত, হ্যা—

—কিন্তু কী করে ঘানিতে ঘোরাবে? ও ব্যাটা যে মহা ধড়িবাজ লোক—

নরেশ দত্ত বললে—ও যদি ধড়িবাজ হয় তো আমি হলুম জাঁহাবাজ। ধড়িবাজের বাপ জাঁহাবাজ। আমি অমন অনেক ধড়িবাজকে পাথুরেঘাটায় কিনে সোনাগাছিতে বেচে এসেছি—দরকার হলে আমিও জাল উইল বানাবো—

—জাল উইল বানাবে?

—হ্যাঁ, তারপর মামলা চলুক হাইকোর্টে। হাইকোর্টে ফয়সলা না হয় সুপ্রীম কোর্টে যাবো। তদ্দিন ও-বাড়ি ও-সম্পত্তির ওপর রিসিভার বসবে। রিসিভার মানে জানিস তো? রিসিভারকে ঘুষ খাইয়ে এক-একটা বাড়ি জলের দরে কিনে নেব। ও আছে কোথায়!

নরেশ দত্তর প্ল্যান শুনে কালীকান্ত খানিকক্ষণ গুম্ হয়ে বসে রইল। তারপর বললে—সত্যি ছোড়দা, তুমি পারবে? শেষকালে পুলিশ কেসে না ফেঁসে যাও—

নরেশ দত্ত বললে—দূর বোকা! কোর্ট-কাছারি পুলিশ ও-সব রয়েছে কীসের জন্যে? এইসব জালিয়াতি করবার জন্যেই তো ও-গুলোকে রাখা।

—কিন্তু কেস্ হলে তো অনেক বছর লাগবে ফয়সলা হতে।

নরেশ দত্ত বললে—লাগুক, ওদিকে কেসও চলবে আর সম্পত্তিও তো রিসিভারের মারফত বেহাত হয়ে যাবে। তখন তোর ছ'খানা বাড়ি আর পাঁচখানা—

কিন্তু তখন আর নষ্ট করবার মত সময় নেই হাতে। আগের রাত্রে মেয়েটাকে নিয়ে মা-মণি চলে গেছে। সারা বাড়িটা ফাঁকা। সকালবেলা ঝি এসে বাসন মেজে দিয়ে চলে গেছে। কে উনুনে আগুন দেবে, কে চা করবে, কে ভাত রাঁধবে, কিছুরই ঠিক নেই।

নরেশ দত্ত উঠলো। বললে—আমি উঠি—

—কোথায় যাবে এখন?

—যাবো শালার ভূপতি ম্যানেজারের কাছে।

পকেটে খুচরো কিছু পয়সা ছিল তখনও। রাস্তার দোকানে বসে এক-ভাঁড় চা খেয়ে নিলে নরেশ দত্ত। তারপর খুচরো দুটো সিগারেট কিনে, একটা ধরিয়ে ফেললে। আর তারপর হাঁটতে হাঁটতে একেবারে সোজা মাধব কুণ্ডু লেনের চৌধুরীবাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়লো।

ভূপতি ভাদুড়ী তখন সবে মাত্র ধুনো-গঙ্গাজল দিয়ে দফতরের কাজকর্ম শুরু করতে যাবে, এমন সময় সশরীরে নরেশ দত্তকে দেখে আঁতকে উঠেছে। কিন্তু মুখে কিছু প্রকাশ করলে না। শুধু বললে—এ কি, তুমি এত সকালে? আবার কী মনে করে?

নরেশ দত্ত একটা চেয়ারে বসে পড়লো।

তারপর বললে—একটা দেশলাই দাও ম্যানেজার, সিগারেট পকেটে আছে, কিন্তু দেশলাই নেই—

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—তা দেশলাই চাইছো দিচ্ছি, কিন্তু সিগারেট-বিড়ি ধরিয়ে বাড়ি চলে যাও—এখন কিছু হবে না।

নরেশ দত্ত আস্তে আস্তে বাকি সিগারেটটা ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বললে—চলে যেতে তো আসিনি ম্যানেজার। যে কাজে এসেছি সে কাজ করে তবে উঠবো—

—কী কাজ শুনি? টাকা?

নরেশ দত্ত বেশ ঠাণ্ডা মাথায় বললে—তুমি শুনেছ বোধহয় ম্যানেজার, সুখদাকে তোমার মা-মণি আবার এ-বাড়িতে নিয়ে এসেছে—

—হ্যাঁ শুনেছি, তাতে কী?

নরেশ দত্ত বললে—এখন তুমি কী করবে ঠিক করেছ?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—সে আমার ব্যাপার আমি বুঝবো। তুমি তো আমার অনেক টাকা খেলে। টাকাও খেলে, আমাকেও পথে বসালে। এখন যা-করার আমি করবো। তোমাকে আর তা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না।

নরেশ দত্ত বললে—কিন্তু তা বললে তো আমার চলবে না। আমার টাকা চাই—

—এরপরেও টাকা চাইতে লজ্জা করলো না তোমার? তুমি এত বড় হারামজাদ, এরপরেও আমার কাছে টাকা চাইতে এসেছ? তুমি বেরোও এখান থেকে, বেরোও—

নরেশ দত্ত বললে—আমার সামনে রাগ দেখিও না ম্যানেজার। রাগ দেখালে আমিও রাগ দেখাতে জানি। কিন্তু তাতে তো সুবিধে হবে না। তোমারও সুবিধে হবে না, আমারও না। তার চেয়ে কাজের কথায় এসো—

—কী কাজ? তোমার সঙ্গে আবার কাজের কথা কী?

—ঠাণ্ডা মাথায় কথা বলো ম্যানেজার। তাতে তোমারই লাভ! যে উইলটা করেছ, তাতে সুখদার নামে কী-কী সম্পত্তি আছে তা বলো! ক'খানা বাড়ি সুখদার ভাগে পড়েছে বলো!

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—উইল তৈরি হয়েছে কে বললে?

—আমার কাছে চেপো না ম্যানেজার, আমি সব জানি। সব তোমার ভাগ্নেকে দিইয়েছ তা আমি জানি। কিন্তু তুমি যা ভাবছো তা হবে না। আমি ওই সুখদাকে দিয়ে ও উইল নাকচ করে অন্য উইল করাবো।

—তার মানে?

নরেশ দত্ত বললে—এবার পথে এসো ম্যানেজার। কলকাতার অনেক কাপ্তেন আমি কাত করেছি। আমি নিজেও একদিন কাপ্তেন ছিলুম। উইল কী করে জাল করতে হয় তাও আমি জানি!

ভূপতি ভাদুড়ী ক্ষেপে উঠলো—তোমার এত বড় আস্পর্ধা নরেশ, তুমি আমার দফতরে বসে উইল জালের কথা বলছো?

—হ্যাঁ বলছি! বেশি ঘাঁটালে আমি সব হাঁড়ি হাটে ভেঙে দেবো!

—খবরদার!

নিজের অজান্তেই ভূপতি ভাদুড়ী জোরে চিৎকার করে উঠলো। করেই বুঝলো এত জোরে চেঁচানো উচিত হয়নি তার। কিন্তু চিৎকারে কাবু হবার মত লোক নয় নরেশ দত্ত। চিৎকার শুনেই সেই চিৎকার ছাপিয়ে আরো জোরে হেসে উঠলো সে হো-হো করে—বললে—আবো জোরে চেঁচাও ম্যানেজার, আরো জোরে চেঁচাও, দেখি তোমার গলায় কত জোর আছে—

ভূপতি ভাদুড়ী ততক্ষণে বুঝতে পেরেছে। এক মুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিলে। গলা নিচু করে বললে—তুমি কী চাও বলো তো নরেশ, আসলে তুমি কী চাও? কিছু টাকা তো?

নরেশ দত্ত বললে—না—

—তবে?

নরেশ দত্ত বললে—ওই উইলখানা। ওই উইলখানা ছিঁড়ে ফেলে অন্য উইল করতে হবে।

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—বা রে বা। মা-মণি করলো উইল আর আমি যাবো তা বদলাতে? আর আসলে তো উইল এখনও করাই হয়নি।

নরেশ দত্ত বললে—ও-সব গল্প-গপ্পো আমার কাছে কোর না ম্যানেজার, ও-সব আমি অনেক জানি—আমাকে উইলখানা দিলে তবে আমি এখান থেকে নড়বো—

ভূপতি আর থাকতে পারলে না। বললে—তাহলে বাহাদুর সিংকে ডাকবো?

—তা ডাকো, একটা কেলেঙ্কারি হোক—

কিন্তু তা আর হলো না। ধনঞ্জয় দৌড়তে দৌড়তে এল। বললে—ম্যানেজার-বাবু, মা-মণি ডাকছে আপনাকে।

—আমাকে? আমাকে আবার এত সকালে ডাকছে কেন রে?

ধনঞ্জয় বললে—তা জানিনে, এখ্খনি ডেকেছে, দেরি করবেন না—

একে মেজাজ গরম হয়েই ছিল আগে থেকে, তার ওপর মা-মণির ডাক! তাছাড়া মা-মণি আবার সুখদাকে বাড়িতে এনে তুলেছে। সব কিছু যেন ভেস্তে যাবার জোগাড়।

নরেশ দত্ত বললে—কিছু টাকা দেবে না ম্যানেজার?

ভূপতি ভাদুড়ী বুঝতে পারলে নরেশ দত্ত কিছু হাতে না নিয়ে যাবে না। বললে—আমি আসছি এখুনি—

বলে চলে গেল। নরেশ দত্ত কাছারি-ঘরের মধ্যে খানিকক্ষণ বসে বসে সিগারেট টানতে লাগলো। সিগারেটটা শেষ হয়ে আসছিল। কিন্তু হঠাৎ নজরে পড়লো ম্যানেজারের চাবির গোছাটা একপাশে পড়ে রয়েছে। মাথাটা কেমন হঠাৎ খুলে গেল! সিগারেটের টুকরোটা ছাইদানের মধ্যে ফেলে দিয়ে চারদিকে একবার দেখে নিলে। তারপর আস্তে আস্তে উঠোনের দিকের জানালাটার পাল্লা দুটো ভেজিয়ে দিলে। পাশেই ছিল ক্যাশবাক্সটা। ওই ক্যাশ-

বাক্সটা থেকেই বহুবার টাকা বার করে দিয়েছে ম্যানেজার। বেশি হোক আর কমই হোক, কিছু টাকা সব সময়ে ওর ভেতরে থাকেই।

আর দেরি নয়। দেরি করলেই ঘরে কেউ-না-কেউ এসে পড়বে।

নরেশ দত্ত চাবির গোছাটা নিয়ে একটার পর একটা বাক্সর ফুটোর মধ্যে লাগিয়ে দেখতে লাগলো। কোনওটা লাগে না। একটা হঠাৎ খাপে খাপে লেগে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বাক্সর ডালাটা খুলে ফেলেছে নরেশ দত্ত। বাক্সটার ভেতরে মুখের কাছেই একটা ডালা। তাতে কিছু খুচরো পয়সা। আনি, দুয়ানি, সিকি, আধুলি। সেটা দু'হাত দিয়ে ধরে তুলতেই দেখা গেল কাগজপত্র, নোট-টাকা বোঝাই। ক'খানা কাগজ হাতে নিতেই দেখলে টাইপ্ করা কিছু লেখা রয়েছে তাতে।

আশ্চর্য, নরেশ দত্তর মত লোকেরও হাত কাঁপে! একটু পড়তে চেষ্টা করলে মন দিয়ে। কিন্তু হাত কাঁপছে তখন, বুকও কাঁপছে। একই জিনিসের চারটে করে কপি। সঙ্গে যা পারলে কিছু টাকাও নিলে। বেশি নেবার কিংবা বেশি ভাববার কি আর সময় আছে তখন! তারপর বাক্সর ডালাটা আবাব যেমন ছিল, তেমনি ঢাকা দিয়ে দিলে। চাবি দিয়ে বাক্সটা বন্ধ করে চাবির গোছাটা যেখানে পড়ে ছিল, তেমনি রেখে দিয়ে উঠে পড়লো।

বাইরের গেটে বাহাদুর সিং যেমন দাঁড়িয়ে থাকে তেমনি দাঁড়িয়ে ছিল।

—সেলাম বাহাদুর সিং।

লোকটা ভালো। বাহাদুর সিংও অবাক হয়ে গেছে হঠাৎ সেলাম পেয়ে। সে-ই তো সবাইকে আগে সেলাম করে, তাকে তো আগে কখনও কেউ সেলাম করে না।

—এই লেও, বকশিশ লেও।

পকেট থেকে একটা এক টাকার নোট বার করে বাহাদুর সিং-এর হাতে দিলে। বাহাদুর সিং প্রথমে বুঝতে পারেনি।

—আরে লেও লেও,—লজ্জা কোর না। বকশিশ তোমারা—

বাহাদুর সিং টাকাটা হাত বাড়িয়ে নিতে গিয়ে হাত থেকে ফস্ করে সেটা উড়ে গেল।

নরেশ দত্ত বললে—আরে গিয়া গিয়া, পাক্ড়ো পাক্ড়ো—

আর একটু হলেই টাকাটা রাস্তার নর্দমার ময়লা জলের ওপর গিয়ে পড়তো। বাহাদুর সিং বন্দুকটা নিয়ে ভারি বুট পায়ে দৌড়তে দৌড়তে ঠিক সময়ে সেটাকে ধরে ফেলেছে।

নরেশ দত্ত বললে—টাকার স্বভাবই ওই-রকম সিংজী, তুমি কী করবে? তোমাব কিছু দোষ নেই। টাকা হাতে এলেই উড়ে পালাবার চেষ্টা করে—

টাকাটা ততক্ষণে বাহাদুর ভাঁজ করে পকেটে পুরে ফেলেছে। মুখে তখন হাসি বেরিয়েছে তার। খুশীর চোটে আর একবার সেলাম করে ফেললে সে—সেলাম হুজুর—

নরেশ দত্ত চলে যেতে যেতে বললে—সেলাম- সেলাম, বহুত সেলাম। খুব হুঁশিয়ার হয়ে কাম করবে বাহাদুর, খুব হুঁশিয়ার, চার্দিকে বড় চুরি-ডাকাতি চলছে, খুব হুঁশিয়ার হয়ে কাম করবে—বলতে বলতে মুকুন্দ কুণ্ডু লেন পেরিয়ে সোজা বড় রাস্তার দিকে চলতে লাগলো। আর একবার শুধু হাত দিয়ে দেখে নিলে পকেটের কাগজগুলো ঠিক আছে কিনা! তারপর একটা সিগারেটের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে বললে—সিগারেট দেখি এক প্যাকেট—

দোকানদার একটা প্যাকেট এগিয়ে দিচ্ছিল।

নরেশ দত্ত মুখ বেঁকালো। বললে—আরে ও-সব বাজে সিগারেট নয়, গোল্ড ফ্লেক, গোল্ড ফ্লেক—

দোকানদার বললে—ও-সিগারেট আমার দোকানে নেই—

গোল্ড ফ্লেক নেই তো কীসের দোকান তোমার! বলে আবার ট্রাম-রাস্তার দিকে চলতে লাগলো। তারপর ট্রাম-বাস-রিক্সা আর জনতার ভিড়ের মধ্যে পাথুরেঘাটার সম্রাট একেবারে নিমেষের মধ্যে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল।

সুরেনের হাতে তখন অনেক কাজ। সকালবেলাই তাকে উঠতে হয়েছে। অন্য দিনও সকালে ওঠে। কিন্তু সেদিন যেন একটু বেশি সকাল-সকালই ঘুম ভেঙেছে। অথচ বেশি সকাল-সকাল ঘুম থেকে উঠে যে কী এমন রাজকার্য করবে তারও কোনও ঠিক নেই। জীবনটা যেন তার কাছে একটা বোঝা হয়ে উঠেছে। কাজ না-থাকার বোঝা। মাঝে মাঝে মামার কাছারি-ঘরে বসতো বটে, মামার কাছে কাজও বুঝে নিত! সে-কাজে বোঝবার যে কী আছে তা বুঝতে পারতো না। গোটাকতক বাড়ির ভাড়া আদায় করা। রাজমিস্ত্রী খাটানো। ভাড়াটেদের সুখ-সুবিধে দেখা। তাদের ঝগড়া মিটিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কোনও কাজ নেই। যে-ভাড়াটে ভাড়া না দিয়ে বাস করতো তাদের নামে মামলা করার কাজ একটা ছিল। কিন্তু সে তো ন'মাসে ছ'মাসে। আর তার সঙ্গে কিছু কিছু ইনকাম-ট্যাক্সের কাজ।

মামা বলতো—সব বুঝেছিস তো?

সুরেন বলতো—হ্যাঁ—

ভূপতি ভাদুড়ী রেগে যেত। বলতো—ছাই বুঝেছিস, এ-কাজ বোঝা কি অত সোজা?

সুরেন এ-কথার জবাবে কিছু বলতো না।

ভূপতি ভাদুড়ী বলতো—তুই যদি এ-সব না বুঝবি তাহলে তোর জন্যে আমি কেন এত করছি? জানিস, তোর নামে সব বাড়ি উইল করে দিয়েছে মা-মণি?

—আমার নামে উইল করেছে?

ভূপতি ভাদুড়ী বলতো—উইল কি অম্‌নি-অম্‌নি করেছে, কায়দা করে উইল করাতে হয়েছে—

সুরেন বলতো—কিন্তু কেন এত করতে গেলে তুমি আমার জন্যে?

ভূপতি ভাদুড়ী বলতো—এই শোনো ছেলের কথা! যার জন্যে চুরি করি সে-ই বলে চোর- তোরও যে দেখছি সেই রকম হলো?

সুরেন বলতো—কিন্তু কেউ যদি বলে, আমরা মা-মণিকে ঠকিয়ে তার সব সম্পত্তি হাতিয়ে নিয়েছি?

ভূপতি ভাদুড়ী বলতো—কে বলবে এ-সব কথা? কার এত বুকের পাটা? কার কাছে এ-সব কথা তুই শুনেছিস. বল্? কোন্ হারামজাদা বলেছে? তাকে একবার দেখে নিই—

এরপর সুরেন আর কথা বাড়াতো না। আস্তে আস্তে কাছারি-ঘর থেকে একটা-না-একটা ছুতো করে চলে আসত। ও-সব কথা শুনতে আর ভালো লাগতো

না তার। মা-মণির সম্পত্তি কেন সে নেবে? সে মা-মণির কে? যদি মা-মণির সম্পত্তি কেউ নেয়ই তো সুখদা নিক। সুখদারই হওয়া উচিত এইসব সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। সে কেন সুখদার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে? সে বাপ-মা হারিয়ে এই অচেনা-অজানা কলকাতায় এসে হাজির হয়েছে উদ্বাস্তু হয়ে। এই কলকাতায় এসে মানুষের এত মিছিল যে সে দেখতে পাচ্ছে, মানুষের সুখ-দুঃখের শরিক হতে পারছে, এর জন্যেই তো তার সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।

—বাহাদুর সিং!

ভূপতি ভাদুড়ীর ডাকে বাহাদুর সিং এসে হাজির হলো।

—নরেশ দত্তকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেছ?

বাহাদুর সিং বললে—হ্যাঁ হুজুর, বাবু তো রাস্তায় বেরিয়ে গেছে—

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—এই দেখ, বাবু বেরিয়ে গেল আর তুমি যেতে দিলে? যত সব আনাড়ি-অপোগণ্ড নিয়ে কাজ হয়েছে আমার—

—এই, তুই দেখেছিস?

সুরেন যাচ্ছিল পাশ দিয়ে। বললে—কাকে?

—কাকে আবার, নরেশ দত্তকে!

সুরেনের মনে পড়লো না। বললে—কই, আমি তো দেখিনি!

—তা দেখবে কেন? তাতে যে তোমার উপকার হবে! যত সব আনাড়ি-অপোগণ্ডকে নিয়ে কারবার হয়েছে আমার! একটা লোক ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, তা কারোর নজরে পড়লো না। আমি একলা কোন্ দিক সামলাবো!

তারপর নিজের দফতরে গিয়ে উঠলো। দেখলে ঘরের সব কিছু ঠিক আছে কিনা। না, কোথাও কিছু খোওয়া যায়নি। যেখানকার জিনিস সব ঠিক তেমনি আছে। ওপরে যাবার সময় হঠাৎ চলে যাওয়াতে খেয়াল হয়নি। মা-মণির সঙ্গে কথা বলতে বলতে মনে পড়লো, ঘরে নরেশ দত্ত বসে আছে, যদি কিছু খোওয়া যায়!

কাছারি-ঘরের দরজায় চাবি-তালা দিয়ে আবার অন্দর-মহলের দিকে গেল ভূপতি ভাদুড়ী। বাকি কথা শেষ করতে হবে।

কিন্তু ওদিকে নরেশ দত্ত তখন একটা চায়ের দোকানের নিরিবিলি একটা কোণ বেছে নিয়ে বসে পড়েছে। এক কাপ কড়া-লিকার চায়ের অর্ডার দিয়েছে। চা আসতেই একটা গরম চুমুক দিয়ে পকেট থেকে ভাঁজ-করা কাগজগুলো বার করলে। তারপর মন দিয়ে পড়তে লাগলো—

বসতবাড়ি, কলকাতা সহরের এগারোটা বাড়ি, কয়েক লাখ টাকার শেয়ার, মা-মণির যাবতীয় গয়না। এই-ই হচ্ছে মাধব কুণ্ডু লেনের শিবশম্ভু চৌধুরীর সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির হিসেব। নরেশ দত্ত সবটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তে লাগলো। পড়তে পড়তে আরো তেষ্টা পেয়ে গেল। চিৎকার করে বললে—ও হে আর এক কাপ চা দাও, কড়া লিকার চিনি কম—

পুরোন খদ্দের নরেশ দত্ত। নরেশ দত্ত কী রকম চা খেতে ভালবাসে তা দোকানদার জানে। তবু ও-কথাটা বলতে হয়।

—নরেশবাবু, আপনার চায়ের কিছু দাম বাকি ছিল যে!

নরেশ দত্ত চোখ তুললে। বললে—বাকি ছিল? ক'পয়সা?

দোকানদার বললে—আজ্ঞে, সাত টাকা বারো আনা—

সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট ছুঁড়ে দিলে। বললে—নাও—

দোকানদার এতটা আশা করেনি। নরেশ দত্তর কাছে ধারের টাকা তাগিদ দিয়ে দিয়েও পাওয়া দুষ্কর। সেই নরেশ দত্ত হঠাৎ এক কথায় দশ টাকার একটা নোট বার করে দেবে, এটা কারো কল্পনার বাইরে।

দোকানদার বাকি পয়সাটা ফেরত দিতে আসতেই নরেশ দত্ত বললে—ও ফেরত দেবার দরকার নেই, ওটা আমার এ্যাকাউণ্টে জমা করে নাও—

দোকানদার আরো হকচকিয়ে গেল। এমন তো হয় না কখনও! বললে—আপনি রাগ করলেন নাকি!

নরেশ দত্ত বললে—না হে, রাগ করবো কেন? রাগ করবার হক্ আছে আমার? আমি দেনদার আর তুমি পাওনাদার। দেনদারের কাছে পাওনাদার তাগাদা করবে না? তাগাদা না করলে তোমার কারবার চলবে কী করে? তুমি তো দানছত্তোর খুলে বসোনি—

দোকানদার আরো লজ্জিত হয়ে পড়লো। ধারে খাইয়ে এও এক বিপদ!

—এ তো আপনার রাগের কথা হলো নরেশবাবু!

নরেশ দত্ত শুকনো হাসি হেসে উঠলো। বললে—আরে, আমি চাই না দু'চারটে টাকার জন্যে আমায় কেউ তাগাদা করে! তুমি আরো টাকা চাও? তোমায় আমি টাকা ধার দিতে পারি। চাও তো বলো?

দোকানদার এতখানি আশা করেনি। সে তখন লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে নিজেই বিব্রত।

বললে—না না, কী যে বলেন আপনি—

নরেশ দত্ত তখন পকেট থেকে একতাড়া নোট বার করে ফেলেছে। বললে—আরে না না, তোমার লজ্জা করবার দরকার নেই। তুমি আমাকে সাত টাকা বারো আনার জন্যে তাগাদা দিলে? জানো আমি কে? কোন্ বংশের ছেলে? এখুনি ইচ্ছে করলে সাত লাখ বারো হাজার টাকা বার করে দিতে পারি? আমাকে দেখতে এই রকম বটে, ময়লা জামা ময়লা কাপড় পরে থাকি। কিন্তু ভেবো না আমি তোমার সাত টাকা বারো আনা মেরে দিয়ে পালিয়ে যাবো—

দোকানদার এত কথার পর কেঁচো হয়ে গেল।

সবিনয়ে বললে—আমি বুঝতে পারিনি দত্ত-মশাই, আমাকে মাফ করবেন।

নরেশ দত্ত বললে—হ্যাঁ, আর কখ্খনো কারোর সঙ্গে এ-রকম কোর না, বংশমর্যাদা বুঝে কথা বলবে। তুমি ছোট কারবার করে খাও, শেষকালে তোমার কারবার গুটোতে হবে—

আর কথা বাড়ালো না দোকানদার। নরেশ দত্ত চা খেয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে দোকান থেকে উঠলো। তারপর ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে রাস্তা ধরে চলতে লাগলো।

সে-সব দিনের কথা সুরেনের আজো মনে পড়ে। কোথায় গেল মা-মণি, আর কোথায়ই বা গেল সেই সুখদা! আর কোথায়ই বা গেল মা-মণির সেই লাখ-লাখ টাকার সম্পত্তি! একদিন ওই সম্পত্তি নিয়েই তো গোলযোগটার সূত্রপাত হয়েছিল। শিবশম্ভু চৌধুরী যদি অত সম্পত্তি না রেখে যেতেন তাহলে হয়ত কিছুই হতো না। সে-ও আর তাহলে কলকাতায় আসতো না। আর

কলকাতায় এসে মাধব কুণ্ডু লেনের বাড়িতে উঠতো না। উঠলেও অন্ততঃ একটা সাদাসিধে চাকরি নিয়ে বাসা ভাড়া করে সাধারণ আর পাঁচজনের মত ঘর-সংসার করতো, আর সন্তান জন্ম দিয়ে মানব-জন্ম সার্থক করতো।

ভূপতি ভাদুড়ী দেখতে পেয়েই ডেকেছিল—কী রে, এখানে নরেশ দত্তকে দেখেছিস তুই?

সুরেন বললে—না—

—না! মুখ ভেঙচে উঠলো ভূপতি ভাদুড়ী।

বললে—তা কেন দেখবে! তা দেখলে যে মামার উপকার করা হবে! যেন এটা আমার কাজ। আমার চোদ্দপুরুষ যেন এতে উদ্ধার হয়ে যাবে!

সুরেন কিছুই বুঝতে পারছিল না। বললে—আমি তো কলতলায় চান করতে গিয়েছিলাম!

—তা এত সকালে চান করতে যাবার কী দরকার ছিল? কোন্ রাজকার্য করতে যাচ্ছিস শুনি যে, একেবারে সকাল সকাল চান করে ভাত খেয়ে দৌড়তে দৌড়তে অফিস যেতে হবে?

সুরেন শুধু বললে—আমার একটা কাজ আছে—

—কাজ? তোর আবার কাজ কীসের? বল্ আড্ডা—

এর উত্তরে সুরেন কী আর করবে, চুপ করে রইল। মামাকে কী করে বোঝাবে যে আড্ডা দেওয়াও একটা কাজ তার। এই যে কলকাতা সহরের প্রাণ-স্পন্দনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা, এ কী কম কাজ? সমাজের কোন্ স্তরটা সে দেখেনি? শুধু জীবিকা-উপার্জনটাই কি যথেষ্ট? বনের বাঘ-ভাল্লুকও তো গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করে! পশুদেরও ওটা করতে বেগ পেতে হয় না। কিন্তু এই দেখা! এই দর্শন। এই দৃষ্টিপাত। ইতিহাস-বিধাতার মত নিস্পৃহ হয়ে সবকিছু যে দেখতে পাচ্ছে, এটাই কি একটা কম কাজ নাকি!

তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে সেদিন সুরেন পথে বেরিয়ে পড়লো। একেবারে সোজা গিয়ে হাজির হলো দেবেশদের পার্টির অফিসে। দেবেশ তখন ছিল।

—কী রে, এত সকালে যে? তোর তো বিকেলে আসার কথা?

সুরেন বললে—সেই কথা বলতেই তোর কাছে এলুম। আজকে সন্ধ্যেবেলা আমার আর একটা কাজ আছে! শেষকালে তুই আমার জন্যে বসে থাকবি, তাই আগে থেকে বলে গেলুম—

—কাজ? তোর আবার কীসের কাজ? তুই তো বেকার মানুষ। পরের ঘাড়ে বসে আরামসে খাচ্ছিস-দাচ্ছিস আর কাঁসি বাজাচ্ছিস!

সুরেন হাসলো। বললে—আমার মামাও তাই বলে! কিন্তু তুই তো জানিস না আমার কত ভাবনা!

—আরে রেখে দে তোর ভাবনা। যে ভাবনায় কোনও ফয়দা নেই, সে তো শুধু মেহনত!

সুরেন বললে—তুই জানিস না। তোর চেয়ে আমি অনেক বেশি দেখেছি, অনেক বেশি ভেবেছি। তোদের মত আমি জেল খাটিনি বটে, কিন্তু কষ্ট আমিও কম পাইনি! এই যে টুলু বাসের ধাক্কা লেগে হাসপাতালে মাথা ফাটিয়ে পড়ে আছে, তুই কি ভাবছিস সে জন্যে তোর চেয়ে আমি কষ্ট কিছু কম পেয়েছি? আর জানিস, সুখদা বলে একটা মেয়ে আমাদের বাড়িতে রয়েছে, ভুল করে একটা মাতালকে বিয়ে করে এখন পস্তাচ্ছে। তাতে তার যত কষ্টই হোক না কেন, আমি যে কী কষ্ট পাচ্ছি তা তোকে কী বলবো! আর দ্যাখ্ না, সেই

পর্মিলি...

দেবেশ বললে—ও কষ্টের কোনও মাথামুণ্ডু নেই। যে কষ্টের তুই প্রতিকার করতে পারবি না, সে কষ্ট নিয়ে কষ্ট পাওয়া মিথ্যে—।

—কিন্তু আমি যে ভুলতে পারি না।

—তা এত কষ্টের বোঝা নিয়ে তুই কী করবি?

সুরেন বললে—কী জানি কী করবো!

—তুই লেখক হলে তবু ও কষ্টগুলো কাজে লাগতো। তাই নিয়ে বিনিয়ে বিনিয়ে ছাইপাঁশ গল্প-উপন্যাস লিখতিস, আর বাঙলাদেশের মেয়েরা শুয়ে শুয়ে সেগুলো গিলতো!

না, দেবেশও তাকে বুঝবে না। কেউই বুঝবে না তাকে। তার মামা বুঝবে না, মা-মণি বুঝবে না, দেবেশ বুঝবে না। ওদের কাছে কিছু না বলাই ভালো।

বললে—আমি উঠি এখন, যদি পারি রাত্তিরে তোর কাছে এসে জেনে যাবো টুলু কেমন আছে।

বলে সুরেন উঠতে যাচ্ছিল, হঠাৎ একটা ফ্রক-পরা মেয়ে এসে হাজির হলো। কালো গায়ের রং। সুরেন অবাক হযে গেছে। এই সব ছোট ছোট মেয়েরাও পার্টি মেম্বার নাকি?

মেয়েটা দেবেশের কাছে আসতেই দেবেশ বললে—কী রে ফুলু, কী খবর?

ফুলু বললে—তোমার কাছে এলুম দেবেশদা, দশটা টাকা দিতে হবে। র‍্যাশান আনবার টাকা নেই।

দেবেশ জামার পকেট হাতড়াতে লাগলো—দেখি, আবার দশ টাকা আছে কিনা—

অনেক খুঁজে পাঁচটা টাকা বেরোল। তারপর সুরেনের দিকে চেয়ে বললে—তোর কাছে পাঁচটা টাকা হবে রে? এ হলো টুলুর বোন। টুলুর বোন ফুলু—

সুরেন ভালো করে নজর করে মেয়েটার দিকে দেখলে এবার। ঠিক টুলুর মতই প্রায় মুখের আদল। ফ্রক পরার বয়েস পেরিয়ে গেছে। কিন্তু শাড়ির দাম বেশি বলেই বোধহয় ফ্রক পরছে। তাড়াতাড়ি পকেট থেকে টাকা বার করে দিলে। বললে—দশ টাকার নোট আছে—

দেবেশ বললে—ঠিক আছে, এই পাঁচ টাকার নোটটা তুই নে—

ফুলু নোটটা নিয়ে চলে যাচ্ছিল।

দেবেশ বললে—তোর চশমাটা নিয়েছিস?

মেয়েটা বললে—না; দিদি ভালো হয়ে সেরে উঠলে নেব—

—তুই এখান থেকে বাসে উঠতে পারবি তো?

সুরেন বললে—আমি ওকে বাসে তুলে দিচ্ছি। তুমি একলা যেতে পারবে তো?

ফুলু বললে—বারে, আমি তো একাই এলুম এতদূর, একলা একলা আমি সব জায়গায় ঘুরতে পারি।

—বাস ভাড়া? বাস ভাড়া সঙ্গে আছে তো? না, দেবো—?

ফুলু বললে—আছে—

তরতরে মেয়ে। সুরেনও উঠলো। বললে—এসো, আমার সঙ্গে এসো—

বাইরে এসে ফুলু বললে—আমি আপনাকে চিনি।

—কী করে চিনলে?

—দিদির কাছে অনেকবার আপনার নাম শুনেছি। আপনার নামই তো

সুরেনবাবু?

সুরেন অবাক হয়ে গেল কথাটা শুনে। শুধু বললে—তোমার দিদি খুব ভালো মেয়ে। যেদিন তোমার দিদি বাসের ধাক্কা লেগে পড়ে যায়, সেদিন আমি সেখানে ছিলুম। তোমার জন্যে চশমার দোকানে গিয়েছিল—

হঠাৎ ফুলু জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা, আমার দিদি বাঁচবে?

সুরেন বললে—নিশ্চয় বাঁচবে। দিন-রাত ভগবানকে ডাকো—

ফুলু যেন অবাক হয়ে গেল। বললে—ওমা, আপনি ভগবানে বিশ্বাস করেন?

সুরেন বললে—কেন, ভগবানে বিশ্বাস করবো না কেন? ভগবান আছে, তাই বিশ্বাস করি—

—দিদি কিন্তু ভগবানে বিশ্বাস করে না তা জানেন? দিদি বলে, ভগবান থাকলে আমাদের এমন সর্বনাশ হতো না। ভগবান থাকলে আমার বাবাও অন্ধ হতো না, আর এমন করে আমাদের দেশ ছেড়ে চলেও আসতে হতো না—আর তাছাড়া আমরা এমন গরীবও হতুম না। আপনি বুঝি পশ্চিমবঙ্গের?

সুরেন বললে—হ্যাঁ--

সুরেনের মনে পড়লো তাদের স্কুলের নিতাই-এর কথা। নিতাইও ভগবানে বিশ্বাস করতো না।

ফুলু বললে—জানেন, আমি দেবেশদাকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, দেবেশদাও ভগবানে বিশ্বাস করে না। দিদিদের পার্টি অফিসের কেউই ভগবানে বিশ্বাস করে না।

রাস্তা পার হয়ে বাসের স্টপেজের দিকে ফুলু যাচ্ছিল। সুরেন হঠাৎ বললে—তুমি দোকান থেকে চশমাটা নেবে?

ফুলু বললে—কিন্তু এখন তো আমার কাছে টাকা নেই—

সুরেন বললে—আমার কাছে টাকা আছে—

—ধার নিলে কিন্তু শোধ দিতে পারবো না। তখন কিন্তু আমাকে দোষ দিতে পারবেন না।

সুরেন বললে—ধার নয়, দামটা আমিই দিয়ে দেবো।

ফুলু বললে—তা দিন—আমাদের তো এখন পরের দানের ওপরেই সংসার চলছে—

ছোট্ট মেয়ে, কিন্তু এই বয়েসেই ঘা খেয়ে খেয়ে সবকিছু শিখে পাকা হয়ে গেছে।

ফুলু রাস্তায় চলতে চলতে আবার বললে—আপনার বুঝি অনেক টাকা? আপনি বড় চাকরি করেন, না?

সুরেন বললে—সে-সব শুনে তোমার লাভ কী! তোমাকে টাকা শোধ না দিতে হলেই তো হলো!

ফুলু বললে—কেউ তো দেয় না, তাই বললাম—

সুরেন বললে—তুমি টুলুর বোন, টুলু এখন হাসপাতালে পড়ে আছে, তোমার দরকার পড়লে আমার কাছে এসে টাকা-কড়ি চেয়ে নিয়ে যেও--

--আপনার ঠিকানা কোথায় পাবো?

—দেবেশ আমার বন্ধু, দেবেশকে জিজ্ঞেস করলেই সে বলে দেবে।

হাঁটতে হাঁটতে টুলুদের সংসারের অনেক কথাই জেনে নিলে সুরেন। অভাব কাকে বলে, কাকে বলে দারিদ্র্য, তারই নিখুঁত বিবরণ দিতে লাগলো

টুলুর বোন। কী রকম করে পরের বাড়ি কাজ করে করে সংসার চালায় তারা, তারই কাহিনী। অনেক বড় বড় লোকেরা বাড়ি করেছে ওদের পাড়ায়। তাদের বাড়িতে কাজ করলে তারা সামান্য হাত-খরচও দেয়, আবার মাঝে মাঝে জামাটা-কাপড়টাও দেয়। কারোর বাড়িতে ছেলে-মেয়ে ধরা, কারোর বাড়িতে রেশন এনে দেওয়া, কিংবা ভোরবেলা হরিণঘাটার দুধের দোকানে লাইন দিয়ে দুধ এনে দেওয়া। স্বামী-স্ত্রী অনেক বাড়িতেই অফিসে চাকরি করে। বাঁধা চাকর নেই। তাদের বাড়িতে এই রকম লোক পেলে সুবিধে হয়।

ফুলু বললে—দিদির অসুখ হয়ে দেখুন না, ভীষণ অসুবিধে হয়েছে আমাদের। দিদি তবু তো বাবাকে একটু দেখতো! এখন বাবাকে দেখতে হয় বলে আমরা বাইরের কাজ করতে পারি না—

—তোমার তো আর একটা বোন আছে?

—হ্যাঁ, তার নাম মুলু। সে আমার চেয়ে এক বছরের ছোট। তাকে আমি কাজ করতে দিই না, ইস্কুলে পড়ে—

ততক্ষণে কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের সেই চশমার দোকানটা এসে গিয়েছিল। দোকানের মালিক বসেছিল সামনেই। সুরেনকে দেখেই চিনতে পেরেছে।

সুরেন বললে—এই হচ্ছে টুলুর বোন, এরই চশমা করতে দিয়েছিল আপনার দোকানে—

—ও, তা সে চশমা তো তৈরি হয়ে পড়ে আছে—

বলে চশমাটা বার করে দিলে। ফুলু পরলে চশমাটা।

—এবার বেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছো তো?

ফুলু বললে—হ্যাঁ, খুব ভালো দেখতে পাচ্ছি—

সুরেন বললে—এবার চশমা পরেই বাসে উঠে পড়ো। যাও—

—টাকা? চশমার দাম?

সুরেন বললে—সে জন্যে তোমায় ভাবতে হবে না। আমি নিজের পকেট থেকে দাম দিয়ে দেবো—

ফুলুকে বাসে উঠিয়ে দিয়ে এসে সুরেন চশমার দাম মিটিয়ে দিলে।

দোকানী ভদ্রলোক বললে—অন্য পার্টির কাছে আমি বেশি নিই, আপনি শুধু জিনিসটার দাম দিলেই চলবে। দশ টাকা আমার মেটিরিয়েলস্-এর দাম—

তারপর জিজ্ঞেস করলে—টুলু কেমন আছে?

সুরেন বললে—সেই রকমই—

তারপর যেন একটু সঙ্কোচ করে জিজ্ঞেস করলে—আপনি টুলুকে চিনলেন কেমন করে? আপনার সঙ্গে কতদিনের জানাশোনা?

সুরেন বললে—বেশিদিন নয়।

—ওদের বাড়িতে কোনও দিন গিয়েছিলেন নাকি?

সুরেন বললে—না। হঠাৎ টুলুদের পার্টি অফিসে এই ফুলুর সঙ্গে দেখা হলো, তখন ওদের বাড়ির অবস্থার কথা শুনলুম। এত কষ্ট হলো শুনে—

দোকানদার আবার জিজ্ঞেস করলে—ডাক্তাররা কী বলছে? বাঁচবে টুলু?

সুরেন বললে—কিছুই বলছে না—

তারপর একটু থেমে বললে—দেখুন, একটা কথা ক'দিন ধরে ভাবছি, টুলুর এতবড় একটা অ্যাকসিডেণ্ট্ হয়ে গেল অথচ কলকাতার ট্রাম-বাস সব ঠিক তেমনি আগেকার মত চলছে, মদের দোকানে মদ ঠিক তেমনি আগেকার মতই বিক্রী হচ্ছে, ওদের পার্টি অফিসেও কোনও অদল-বদল নেই। যা আগে

ছিল সব ঠিক তেমনি রয়েছে—

ভদ্রলোক হাসলো। বললে—তা তো বটেই, মহাত্মা গান্ধী মারা গেল, তাতে কিছু ক্ষতি হয়েছে ইণ্ডিয়ার? কারো জন্যে কিছু থেমে থাকে না। পৃথিবী নিজের পথেই গড়িয়ে চলে—

সত্যিই আশ্চর্য! রাস্তায় যেতে যেতে সেই কথাটাই সুরেনের মনে হতে লাগলো বার বার! তাহলে কীসের এই সংসার, কীসের এই টাকা! কীসের এই জীবন। কীসের জন্যে মামা এত টাকা টাকা করে ভাবছে! কীসের জন্যে সুখদা এত হাহাকার করছে! কীসের জন্যেই বা দেবেশ এত জেল খেটে মরছে! ইলেকশানে পুণ্যশ্লোকবাবুই জিতুক আর পূর্ণবাবুই জিতুক, পৃথিবী ঠিক গড়িয়ে চলবে! যেমন আগে চলছিল তেমনি করেই চলবে। কিংবা হয়ত তার চেয়ে আরো জোরে জোরে চলবে।

তাহলে? তাহলে কী?

সেদিনই বিকেলবেলা সুরেন পর্মিলিদের বাড়িতে গিয়েও সেই কথা ভেবেছিল। বাড়ির ভেতর ঢুকেই মনে হয়েছিল, এই ঐশ্বর্য, বিলাস, পদমর্যাদা যদি একদিন পুণ্যশ্লোকবাবুর চলেই যায়, তাতেও তো কোনও ক্ষতি হবে না।

পর্মিলি হঠাৎ সুরেনকে দেখে চমকে উঠেছিল। বললে—এ কী, তুমি?

সুরেন বললে—আমি লুকিয়ে লুকিয়ে তোমার কাছে এলুম কিন্তু—

পর্মিলি বললে—তার মানে?

সুরেন বললে—শুনলাম পুণ্যশ্লোকবাবু কাউকে তোমার সঙ্গে দেখা করতে দিচ্ছেন না। টেলিফোনেও কেউ তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারে না—

সত্যিই যে ঠিক লুকিয়ে লুকিয়ে সুরেন ঢুকেছিল তা নয়। বহুদিন আগে যেমন করে আসতো, তেমনি করেই এসেছিল সে। সেই সামনের গেট পেরিয়ে বাগান। বাগানের একপাশ দিয়ে রাস্তা। সুরকি বিছোন রাস্তা দিয়ে পুণ্যশ্লোকবাবুর বৈঠকখানা। কিন্তু পুণ্যশ্লোকবাবুর বৈঠকখানার ভেতরে তখন হরিলোচন মুহুরী একটা চিঠি টাইপ করছিল।

—কাকে চাই?

সুরেন পুণ্যশ্লোকবাবুর নাম করতেই হরিলোচনবাবু বললে—তিনি এখন নেই, ফিরতে দেরি হবে—

কী করবে বুঝতে পারছিল না সুরেন। প্রজেশ সেনের চিঠিটা সঙ্গে রয়েছে। সেটা পর্মিলিকে দিতে হবে। কিন্তু পর্মিলির সঙ্গে দেখা করতে গেলে দোতলায় উঠতে হবে। কেউ যদি তাকে দোতলায় উঠতে না দেয়? যদি আপত্তি করে রঘু? চারদিকে চেয়ে দেখলে কোথাও কারো সাড়া-শব্দ নেই। বাড়ির কর্তা বাড়িতে নেই, তাই আউট-হাউসে বেশ আড্ডা চলছে। শুধু গেটে দারোয়ানের ঘরে দারোয়ান তার নিজের কাজে ব্যস্ত।

কী করবে কিছু ঠিক করতে না পেরে সুরেন সিঁড়ি বেয়ে আস্তে আস্তে ওপরে উঠেছিল। তবু কেউ কিছু বললে না। বারান্দার ওপর দিয়ে এগোতে এগোতে একেবারে পর্মিলির ঘরের দিকে গেল। ঘরটার দরজার পাল্লা তখন বন্ধ। তবু সঙ্কোচ গেল না। পর্মিলি ঘরে আছে তো? গ্যারাজে পর্মিলির

গাড়িটা যখন রয়েছে তখন আর সে কোথায় যাবে?

আস্তে আস্তে ঠেলা দিতেই দরজাটা হাট হয়ে খুলে গেল।

ততক্ষণে পমিলি বিছানা থেকে উঠে পড়েছে। সুরেন দাঁড়িয়েই ছিল।

পমিলি বললে—একী, তুমি হঠাৎ?

সুরেন বললে—একটা কাজে এসেছি তোমার কাছে—

—কাজ? আমার কাছে? তুমি যে দেখছি খুব কাজের মানুষ হয়ে গেছ আজকাল!

সুরেন বললে—না, ঠিক কাজ নয়, অথচ কাজও বটে—

পমিলি বললে—অত কিন্তু করছো কেন. তোমার এই এক বরাবরের স্বভাব, কোনওদিন সোজা করে কথা বলতে পারলে না।

সুরেন বললে—তুমিই কি সোজা মেয়ে পমিলি যে তোমার সঙ্গে সোজা করে কথা বলবো! তাই কথাটা কেমন করে বলবো তাই ভাবছি—

পমিলি বললে—বলো না কী কথা বলতে চাও—

সুরেন বললে—শুনলাম পুণ্যশ্লোকবাবু নাকি তোমাকে কারোর সঙ্গে মিশতে দেয় না!

পমিলি বললে—তোমাকে এ-সব কথা কে বললে?

সুরেন বললে—প্রজেশবাবু—প্রজেশ সেন—

—কী বলেছে স্কাউন্ড্রেলটা?

সুরেন একটু থতমত খেয়ে গেল। কথাটা বলা হয়ত উচিত হয়নি তার।

—বলো কী বলেছে?

সুরেন বললে—প্রজেশবাবু তোমার সঙ্গে অনেকবার দেখা করতে চেয়েছিল, কিন্তু শুনেছে তোমাকে নাকি কারো সঙ্গে দেখা করতে দিচ্ছেন না পুণ্যশ্লোকবাবু, টেলিফোন ধরতেও বারণ করে দিয়েছেন।

—হোয়াই? হোয়াট ফর?

সুরেন বললে—আমাকে যা বললেন প্রজেশবাবু, আমি তাই-ই তোমাকে বললাম। তোমাকে একটা চিঠি দিয়েছেন প্রজেশবাবু, এই নাও—

বলে পকেট থেকে চিঠিটা বার করে এগিয়ে দিতেই পমিলি সেটা ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে টুকরো টুকরো করে কুঁচিয়ে ফেলে দিলে। সেগুলো ঘরের মেঝেতে চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো।

পমিলি রেগে বলে উঠলো—এত তার অডাসিটি যে তোমার হাত দিয়ে আমাকে সে চিঠি পাঠায়? সে কী মনে করেছে আমি তার চিঠি পড়বো? আমাকে কি সে এত ফুলিশ পেয়েছে? আমার বাবাকে সে কোন সাহসে বলে গেছে যে আমি তাকে ড্রিঙ্ক করা শিখিয়েছি?

এ সেই পুরোন ঝগড়া।

সুরেন বললে—সত্যিই বিশ্বাস করো পমিলি, এ-ব্যাপারে আমার কোনও দোষ নেই। আমার সঙ্গে একদিন মেডিকেল কলেজের হাসপাতালে দেখা হয়ে গিয়েছিল, তিনি আমায় অফিসে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তোমার কথা বলতে বলতে আমার সামনেই কেঁদে ফেললেন—

—কাঁদুক! ওর কাঁদাই উচিত! আমি ওর মড়া-কান্নায় ভুলিনি, ভুলবোও না—! আর তোমাকেও বলে রাখছি, তুমি আর কখখনো ওর চিঠি নিয়ে আমার কাছে আসবে না, ওর কথা আমার সামনে উচ্চারণ পর্যন্ত করবে না। করলে তোমাকেও আমাদের বাড়িতে আর আসতে দেবো না—

সুরেন স্তম্ভিত হয়ে রইল পর্মিলির কথা শুনে। তার কী বলবার আছে তাও বুঝতে পারলে না।

একটু থেমে বললে—মিস্টার সেন আমায় বিশেষ করে ধরলেন বলেই আমি চিঠিটা নিয়ে এলাম। আর তাছাড়া আমার কি স্বার্থ থাকতে পারে তুমিই বলো না—

পর্মিলি তখনও যেন রাগে থর-থর করে কাঁপছে।

হঠাৎ বলে উঠলো—আমি এতদিন কিছু বলিনি বলে প্রজেশের বড় সাহস বেড়ে গেছে! আমি রঘুকে বলে দিয়েছি যেন ও এলে ওকে বাড়িতে ঢুকতে না দেয়!

—প্রজেশবাবু কি তার পরে এসেছিল নাকি?

পর্মিলি বললে—হ্যাঁ, এসেছিল তো। এসেও ছিল, টেলিফোনও করেছিল। ও একটা ব্রুট; আমি ওর মুখের ওপর ওই কথা বলে দিয়েছি!

সুরেন বললে—তোমাদের দুজনের ব্যাপার অবশ্য তোমরাই জানো। কিন্তু সত্যি কী করেছিল ও বলো তো?

পর্মিলি মাথা ঝাঁকিয়ে বললে—না, না, তুমি ওর কথা আমাকে বোল না প্লীজ্! তা যাক্ গে, এতদিন কোথায় ছিলে তুমি? আসোনি কেন? কী হয়েছিল তোমার? এতদিন কী করছিলে?

সুরেন বললে—আমার আবার কী কাজ?

—চাকরি-বাকরি কিছু একটা জোগাড় হলো?

সুরেন বললে—না, প্রজেশবাবু একটা চাকরি দেবেন বলেছেন!

পর্মিলি বললে—খবরদার, ওর দেওয়া চাকরি কিছুতেই তুমি নিও না। ও চাকরি দিলে তোমাকেও এ-বাড়িতে ঢুকতে দেবো না।

সুরেন অবাক হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল পর্মিলির দিকে। পর্মিলি বললে—কী, দেখছো কী অমন করে? ভাবছো আমি মিথ্যে কথা বলছি? তুমি জানো না ও কত বড় শয়তান!

সুরেন বললে—একটা কথা শুধু তোমাকে জিজ্ঞেস করছি, কেন তোমরা মদ খাও?

পর্মিলি বললে—কেন, মদ খাওয়া কি দোষের?

সুরেন বললে—দোষের কথা বলছি না, লোকে কত রকম জিনিসই তো খায়। কিন্তু তোমরা তো জানো এটা বেশি খেলে তখন আর কিছু হুঁশ থাকে না! তখন মানুষ যা-তা করে। তখন মানুষের আর মনুষ্যত্ব বলে কিছু থাকে না—

পর্মিলি বললে—এ-সব কথা কে তোমাকে শেখালে?

সুরেন বললে—শেখাবে আবার কে? এ তো সবাই জানে!

পর্মিলি বললে—তাহলে কক্‌টেল পার্টিগুলো দেয় কেন বড় বড় লোকেরা? আমার বাবা কেন পার্টি দেয় ফরেনারদের?

সুরেন কিছু উত্তর দিলে না।

পর্মিলি বললে—আসলে ড্রিংক্ করলে দোষ নেই, মাতাল হলেই দোষ! কিন্তু আমি তো মাতাল হই না।

তারপর একটু থেমে বললে—আর যদি মাতাল একটু হই-ই তো কার কী? আমি কারো পরোয়া করি? আমি আমার নিজের টাকা খরচ করে খাচ্ছি—

সুরেন বললে—সে তুমি যা-ইচ্ছে করো, মিস্টার সেন আমাকে যা বললে

আমি তাই-ই তোমাকে বললুম। তোমার কথা বলতে বলতে মিস্টার সেন আমার সামনে কেঁদে ফেললে—

পর্মিলি বললে—তা প্রজেশ কি ভেবেছে আমি তাকে বিয়ে করবো?

—কিন্তু মিস্টার সেন সত্যিই তোমাকে ভালোবাসে পর্মিলি। তোমার সঙ্গে দেখা না করতে পেরে একেবারে ছটফট করছে—

পর্মিলি বললে—জানো, প্রজেশ লোকটা কী? আসলে ও ছিল একটা হ্যাগার্ড। ছিল একটা লোফার। ছিল অর্ডিনারী একটা কংগ্রেসের ভলান্টিয়ার। বাবাই বলতে গেলে ওকে এই পোজিশানে এনে তুলে দিয়েছে। বাবার জন্যে ও কলকাতায় একটা বাড়ি করতে পেরেছে, ভালো চাকরি পেয়েছে—এর পর আবার আমাকে চায়?

সুরেন বললে—কিন্তু একজনকে-না-একজনকে তুমি তো বিয়ে করবেই? বিয়ে তো তোমাকে একদিন করতেই হবে?

পর্মিলি বললে—সে তো আমার নিজের ব্যাপার, তার সঙ্গে প্রজেশেরও কোন কনসার্ন নেই, তোমারও নেই।

সুরেন হেসে ফেললে। বললে—আমার কথা বলছো কেন তুমি?

—তা তুমি কেন প্রজেশের হয়ে প্লীড্ করতে আসছো? প্রজেশ তোমার কে?

সুরেন বললে—ঠিক সে জন্যে আসিনি অবশ্য। শুনলুম তোমাকে নাকি পুলিশে ধরেছিল, তাই...

—এও কি প্রজেশ বলেছে?

সুরেন বললে—তার জন্যেও তো মিস্টার সেনের ঘাড়েই দোষ চেপেছে—

পর্মিলির মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গেল—স্কাউণ্ড্রেল—

সুরেন বললে—সত্যিই বিশ্বাস করো পর্মিলি, এ-ব্যাপারে আমার কোনও দোষ নেই। তাছাড়া এতে আমার কী-ই বা স্বার্থ থাকতে পারে? আমি মিস্টার সেনেরও কেউ নই, তোমারও কেউ নই। তোমাদের সঙ্গে আমার কোনও স্বার্থের সম্পর্কও নেই। আমার ওপর যেন তুমি রাগ কোর না—

পর্মিলি বললে—কিন্তু যখন এতখানি শুনেছ তখন আসল ব্যাপারটাও তোমার কিছু জানা দরকার—

বলে একটু থামলো পর্মিলি। তারপর বললে—আমাকে পুলিশে ধরেছিল অন্য কারণে।

—কী কারণে?

—আসলে আমি প্রজেশের কথাতেই ওখানে গিয়েছিলুম!

—সে কি? কিন্তু আমি তো শুনলুম অন্য রকম?

—সেই জন্যেই তো বলছি তোমাকে। মদ আমি খাই, মদ খেতে আমার ভালো লাগে। কিন্তু তা বলে আমার এত দুর্গতি হয়নি যে আমি মদের জন্যে ওই চীনেপাড়ায় যাবো! আমি প্রজেশকে খুঁজতেই ওখানে গিয়েছিলুম।

সুরেন অবাক হয়ে গেল। বললে—সে কী? কী বলছো তুমি, আমি বুঝতে পারছি না। মিস্টার সেন ওখানে যায় কী করতে?

—ড্রাই-ডে'তে ওখানে যায় সে মদ খেতে। এ-সব কথা এতদিন আমি কাউকেই বলিনি। আমার ড্রাইভার জগন্নাথই শুধু জানে, আর আমি জানি! আজ তোমাকেও বললুম। কিন্তু বাবাকে আমি এ-সব কথা বলিনি, পুলিশকেও না—

সুরেন আরো অবাক হয়ে গেল। একদিন ওই প্রজেশ ছিল সামান্য

ভলান্টিয়ার, তার থেকে এমন হলো কেমন করে? এর জন্যে কে দায়ী! পুণ্যশ্লোকবাবু, না পার্টি যখন ভলান্টিয়ার ছিল মিস্টার সেন তখন তো সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষ ছিল। তখন তো পুণ্যশ্লোকবাবুর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দেশের কাজ করেছে। তবে তার পরিণতি কেন এমন হলো?

—তুমি সত্যিই বলছো?

পর্মিলি বললে—মিথ্যে কথা বলতে যাবো কেন তোমাকে!

—তা বাবাকে কিংবা পুলিশকে এ-সব কথা বললেই পারতে!

পর্মিলি চুপ করে গেল। খানিক পরে বললে—দেখ, একবার ভেবেছিলুম বলবো! কিন্তু তারপর ভাবলাম, আমাকে পুলিশে ধরলে তবু ছাড়া পাবো, কারণ আমার বাবা আছে। কিন্তু ওকে যদি ধরে তাহলে কে ছাড়াবে? ওর যে চাকরি চলে যাবে!

মনে আছে, সুরেন সেদিন মুখে কিছু বলেনি পর্মিলিকে। কিন্তু মনে হয়েছিল পর্মিলি বোধহয় আসলে ভালবাসে মিস্টার সেনকে।

পর্মিলি বলে উঠলো—কোথায় যাচ্ছ?

সুরেন বললে—আমি এখন উঠি, তোমাকে অনেকক্ষণ বিরক্ত করে গেলাম।

—না, তুমি বোস—বলে পর্মিলি সুরেনের হাত ধরে সোফায় বসিয়ে দিলে। বললে—তোমার আর এমন কী কাজ আছে যে এখুনি না-গেলেই চলবে না।

সুরেন বললে—কিন্তু আমার নয়, তোমারই সময় নষ্ট—

পর্মিলি বললে—আমার আবার সময়ের দাম কী?

—কেন, তুমি আর কোথাও বেরোও না?

—কার সঙ্গে বেরোব?

সুরেন বললে—কিন্তু সারাদিন বাড়ির মধ্যে থাকতেই কি পারবে?

পর্মিলি বললে—হয়ত থাকতে পারবো না। এমনিতেই ক'দিন খুব খারাপ লাগছে। সারাদিন নিউজ-পেপার ঘাঁটি, রেডিও শুনি আর ঘুমোই—

সুরেন বললে—সত্যিই তো তোমার খুব কষ্ট যাচ্ছে— । গাড়ি নিয়ে একটু বেরোলেই পারো!

—কোথায় যাবো? যাবারও যে কোনও জায়গা নেই আমার।

সুরেন বললে—সে কী? কত স্কুলে পড়েছো, কলেজে পড়েছো, কত ক্লাবের মেম্বার তুমি, তোমার যাবার জায়গার অভাব?

পর্মিলি বললে—গেলে তো সবাই আমাকে লুফে নেবে। কিন্তু আমার বাবা যে মিনিস্টার, সেই জন্যেই তো সব জায়গায় যেতে পারি না। নইলে রোজই তো গাদা-গাদা নেমন্তন্নর চিঠি আসে। রোজই কোথাও-না-কোথাও পার্টি থাকে। কিন্তু আসলে আমার বাবা মিনিস্টার বলে আমায় সবাই খাতির করে, সেটা তো বুঝতে পারি। একবার বাবা মিনিস্টার হয়নি, সেবার আর অত নেমন্তন্ন হতো না—

—তাহলে সিনেমা? সিনেমায় তো যেতে পারো?

—আগে সিনেমায় খুব গিয়েছি। এখন একঘেয়ে লাগে!

সুরেন বললে—সত্যিই তোমার খুব বিপদ! তোমার সব আছে অথচ কিছুই নেই। তা এখনও মদ খাও?

পর্মিলি বললে—আগে ফ্রিজের ভেতরে মদ থাকতো, এখন বাবা আর রাখে না। তবু আমার অসুবিধে হয় না, রঘুকে বললেই আনিয়ে নিতে পারি। নিজেই বাইরে গিয়ে দোকান থেকে কিনে এনেও খেতে পারি, কিন্তু এ ক'দিন

তাও করছি না—। কী যে হয়েছে! কিছুতেই কিছু ভালো লাগছে না।

এও এক-রকমের অভাব। শুনতে শুনতে সুরেন কেমন বিহ্বল হয়ে গেল। যেন নতুন এক জগতের কথা শুনছে সে। টুলু যদি এদের টাকার কিছুটা অংশও পেতো তো তার জীবন হয়ত অন্য রকম হয়ে যেত। নরেশ দত্ত, কালী-কান্ত, সুখদা—তাদের সকলেরই তো টাকার সমস্যা। দেবেশরা তো দেশের লোকের হাতে টাকাটাই তুলে দিতে চায়, সমাজের এই কাঠামো ভেঙে নতুন এমন এক সমাজ গড়তে চায় যেখানে বড়লোক গরীবলোক থাকবে না। কিন্তু টাকা থাকতেও পর্মিলিদের এ কী শাস্তি!

হঠাৎ বাইরে নিচেয় একটা গাড়ির শব্দ হলো।

সুরেন উঠে দাঁড়ালো। বললে—ওই বোধহয় পুণ্যশ্লোকবাবু এলেন। আমি এবার চলি—

পর্মিলিও যেন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। বললে—যাবে কেন? বাবা এলে দোষ কী?

সুরেন বললে—তিনি যদি আমাকে তোমার ঘরে দেখতে পান—

সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়িতে কার জুতোর শব্দ হলো। নিশ্চয় পুণ্যশ্লোকবাবু ওপরে দোতলায় তাঁর নিজের ঘরে আসছেন। একটু ভয় করতে লাগলো সুরেনের। কিন্তু বেশি ভাববার আগেই পুণ্যশ্লোকবাবুর গলা শোনা গেল—পর্মিলি!

আর ডাকতে ডাকতেই একেবারে সশরীরে পর্মিলির ঘরে ঢুকে পড়লেন।

হয়ত মেয়েকে একটা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু সুরেনকে দেখে থমকে গেলেন।

বললেন—তুমি?

সুরেন তাড়াতাড়ি পুণ্যশ্লোকবাবুর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে হাতটা মাথায় ঠেকালো।

—তুমি তো আর কই তারপর এলে না? তোমাকে সেই ইতিহাস লেখার কথা বলেছিলুম না! চাকরি-বাকরি কিছু পেয়ে গেছ বুঝি? তা চাকরি করেই বা আর কী করবে? তুমি বিয়ে করেছ নাকি? ছেলেমেয়ে কিছু হয়েছে?...

অনেকগুলো প্রশ্নের ঝড় বয়ে গেল একেবারে। সুরেন কিছু উত্তর দেবার আগেই পুণ্যশ্লোকবাবু মেয়ের দিকে ফিরে বললেন—কেমন আছ তুমি আজ?

পর্মিলি শুধু বললে—ভালো—

—ভালো বলছো কেন, বলো খুব ভালো! সারাদিন কী করলে আজ! হাউ ডিড্ ইউ পাস্ ইওর টাইম? বাইরে কোথাও গিয়েছিলে?

পর্মিলি কিছু উত্তর দেবার আগেই সুরেন বললে—আমি তাহলে চলি এখন—

এবারে আবার সুরেনের উপস্থিতিটা নজরে পড়লো পুণ্যশ্লোকবাবুর। তার দিকে ফিরে বললেন—তাহলে কী চাকরি করছো বললে তুমি?

সুরেন বললে—কিছু চাকরি তো করছি না আমি—

—চাকরি করছো না? তাহলে চাকরি খুঁজছো?

—না, তাও না।

—তাহলে সেই ইতিহাসটা লিখছো না কেন? তোমাকে তো বলেছিলুম সব মেটিরিয়েলস্ দেবো আমি। করো না! তোমরা আজকালকার ইয়াংম্যান্, চুপ করে বসে বসে শুধু সময় নষ্ট করো কেন? হোয়াই? বাঙালীদের এই বড়

দোষ! কিছু কাজ করতে ভালো লাগে না? বি-এ পাশ করেছ, স্বাস্থ্য ভালো, শুধু শুধু গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়াবে?

তারপর একটু থেমে বললেন—এই তো সামনে আমাদের ইলেকশান আসছে, কত কাজ পড়ে রয়েছে। কাজ করবার লোক নেই। করবে তুমি?

সুরেন বললে—আমি কি পারবো?

—কেন পারবে না? রাম শ্যাম যদু মধু পারছে আর তুমি পারবে না? আর ইতিহাস লেখাও তো দেশের কাজ হে! নিজের সংসার প্রতিপালন করা সে তো বনের বাঘ-ভাল্লুকও করে। মানুষ হয়ে জন্মেছ, মানুষের সেবা করবে না? তাহলে মানুষ হয়ে জন্মালে কেন? তুমি লেখো, লিখতে শুরু করে দাও,—ভেবো না কিছু টাকা পাবে না। টাকা পাবে, ভালো টাকাই পাবে—কংগ্রেস থেকেই তোমায় টাকা পাইয়ে দেবো আমি, ভালো টাকা পাইয়ে দেবো—

সুরেন বললে—আপনি যা বলবেন তাই-ই করবো—

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—তাহলে এসো, আমার সঙ্গে এসো—

বলে ঘরের বাইরে বেরোলেন। পেছন পেছন সুরেনও বেরোল। তারপর সিঁড়ি দিয়ে নেমে আর একটা ঘরে ঢুকলেন পুণ্যশ্লোকবাবু। এ-ঘরে কখনও ঢোকেনি সুরেন। চাকর এসে তাড়াতাড়ি আলো জেলে দিয়ে গেল। বিরাট ঘরখানা। চারদিকে শুধু বই। আইনের বই আছে। কিন্তু আরো অনেক ধরনের বই। সবই সোনার জলে নাম লেখা ঝকঝকে তকতকে বাঁধানো চেহারা। দামী দামী বই সব। মধ্যিখানে একটা টেবিল। চারপাশে চেয়ার। মাঝখানের একটা বড় চেয়ারে বসলেন পুণ্যশ্লোকবাবু।

বললেন—বোস—

সুরেন বসলো আড়ষ্ট হয়ে।

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—বলো তো, ইতিহাস মানে কী? মানে মানুষের উত্থান-পতনের কাহিনী। আর তার সঙ্গে ঐতিহাসিকের দর্শন, মানে ফিলজফি! সমস্ত উত্থান-পতন দেখিয়ে তার একটা সিনথিসিস করবে। তবেই হবে ইতিহাস। লেখাপড়া সবাই জানে। কিন্তু সবাই ঐতিহাসিক নয়। এই যে কংগ্রেস আমাদের, এ-একটা স্বয়ম্ভূ জিনিস নয়। এর আগে আরো অনেক ঘটনা ঘটেছে। সেই সব দিয়ে শুরু করতে হবে। আর এ একদিন-দুদিনের কাজও নয়। টাইম লাগবে। আমি অনেকদিন থেকে ভাবছি এই ইতিহাস লেখবার কথা। প্রজেশকে আমি বলেছিলাম, কিন্তু ও একটা অপোগণ্ড, ওকে দিয়ে কোনও কাজ হবে না। পৃথিবীতে চাকরিটাকেই ও মোক্ষ বলে ধরে নিয়েছে। কিন্তু তোমার দ্বারা হবে—

সুরেন চুপ করে সব শুনতে লাগলো।

পুণ্যশ্লোকবাবু আবার বলতে লাগলেন—রোজ তুমি খেয়ে-দেয়ে আমার এখানে আসবে। আসতে পারবে?

সুরেন বললে—হ্যাঁ—

—এসে আমার এই লাইব্রেরিতে বসে বসে পড়বে। দরকার হলে তুমি বাজার থেকে বই কিনে আনবে, আমি টাকা দেবো। যত টাকা লাগে আমি দেবো। তারপর সন্ধ্যে পর্যন্ত পড়ে বাড়ি চলে যাবে। বই বেশি মোটা করো না। মোটা বই কেউ পড়তে চায় না। কারো অত সময় নেই আজকাল। দশ টাকা দামের মধ্যে হলেই ভালো! আমি তোমাকে মাসে মাসে একশো টাকা করে দেবো—

সুরেন চুপ করে রইল।

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—একশো টাকাতে তোমার চলবে তো?

সুরেন মাথা নাড়লো, বললে—হ্যাঁ—

—তাহলে কবে থেকে আসছো?

সুরেন বললে—কিন্তু আমি কি পারবো? আমি তো ও-সব কাজ কখনও করিনি—

—পারবে, পারবে! আর তা ছাড়া আমি তোমাকে লোক দেবো। তুমি যা লিখবে সে সে-সব দেখে দেবে। তোমার বানান-টানান ভুল হলে তাও সে দেখে দেবে—

সুরেন বললে—আচ্ছা, তাই-ই হবে—

—ঠিক আছে, তাহলে তুমি কাল থেকেই এসো—এসে রঘুকে বললেই সে তোমাকে এই লাইব্রেরির চাবি খুলে দেবে। দরকার মত চা দেবে, খাবার দেবে। ..

হঠাৎ হরিলোচন ঘরে এল। বললে—স্যার, গোয়েঙ্কাজী টেলিফোনে—

—ঠিক আছে, তাহলে ওই কথাই রইলো—

বলে কাঁধের খদ্দরের চাদরটা ঠিক করে নিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন পুণ্যশ্লোকবাবু। সুরেনও দাঁড়িয়ে উঠলো। তখন আর দাঁড়াবার সময় নেই। মিনিস্টার মানুষ, অনেকক্ষণ কথা বলেছেন তার সঙ্গে। ওই-ই যথেষ্ট!

সুরেন নমস্কার করলো, কিন্তু তখন আর সে নমস্কারের দিকে লক্ষ্য করারও সময় নেই তাঁর। তিনি হন হন করে বৈঠকখানা ঘরের দিকে চলে গেলেন।

সুরেন বাইরে এসে দাঁড়ালো। এ কী অদ্ভুত ঘটনা! এ তো সে চায়নি! তার এ চাকরিই বা কেমন! বেছে বেছে তাকেই বা কেন দিলেন এ কাজটা পুণ্যশ্লোকবাবু! আর কি কোনও লোক ছিল না? নাকি কোন উদ্দেশ্য আছে এর পেছনে?

হঠাৎ নজরে পড়লো পর্মিলি নামছে সিঁড়ি দিয়ে। সাজগোজ করে নিয়েছে।

সুরেনকে দেখেই পর্মিলি জিজ্ঞেস করলে—কী হলো, একলা চুপ করে দাঁড়িয়ে যে?

সুরেন এগিয়ে সামনের দিকে গেল।

জিজ্ঞেস করলে—কী, তুমি বেরোচ্ছ নাকি?

পর্মিলি বললে—কিন্তু, বাবা তোমাকে এতক্ষণ কী বলছিল? চলো, চলো, আমার সঙ্গে চলো, আমি তোমাকে পৌঁছে দিচ্ছি—

জগন্নাথ গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল গাড়ি-বারান্দার নিচে। পর্মিলি ভেতরে গিয়ে বসলো, সুরেনও বসলো ভেতরে। গাড়ি চলতে লাগলো কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট ধরে। পর্মিলি সেজেছে খুব। পাশে বসে পর্মিলির গায়ের সেন্টের গন্ধ পাচ্ছে। কিন্তু একটু আশ্চর্য ও হয়ে গেল। কই সে যে শুনেছিল পর্মিলিকে বাড়ি থেকে বেরোতে দেওয়া হয় না। তবে কি সব মিথ্যে কথা?

পর্মিলি হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে—এখন বাড়ির দিকে যাবে তো?

সুরেন শুধু বললে—হ্যাঁ—

তারপর একটু থেমে বললে—কিন্তু তুমি যে হঠাৎ বেরোলে? পুণ্যশ্লোকবাবু কিছু বলবেন না?

পর্মিলি বললে—বাবা যা বলবে আমি তা শুনতে বাধ্য নাকি?

—কিন্তু জানতে পারলে তিনি রাগ করবেন তো?

পর্মিলি বললে—তা আমার কি নিজের কোনও স্বাধীনতা নেই? আমার যেখানে খুশী আমি সেখানে যাবো, তাতে কেউ কিছু বললে, আমি শুনবো কেন?

সুরেন হঠাৎ বললে—আমাকে এখানে নামিয়ে দাও পর্মিলি, আমি এখান থেকে হেঁটে চলে যেতে পারবো—

—সে কী, তুমি এখন বাড়ি যাবে না?

সুরেন বললে—বাড়িতেই তো যাবো। কিন্তু তোমাকে অত দূর কষ্ট করে যেতে হবে না। আমার হাঁটা অভ্যেস আছে। আর তাছাড়া এখন তো বেশি রাতও হয়নি।

পর্মিলি সে-কথার উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞেস করলে—বাবা কী বললে তোমাকে?

সুরেন বললে—পুণ্যশ্লোকবাবু চান আমি কাল থেকে তোমাদের বাড়িতে রোজ আসি। এসে সেই ইতিহাসের বইটা নিয়ে কাজ আরম্ভ করি—

—তুমি রাজী হয়েছ?

—আমি হ্যাঁ-ও বলিনি, না-ও বলিনি। কাল থেকে আমার আসবার কথা আছে। এসে তোমাদের লাইব্রেরি-ঘরে বসে বই পড়তে হবে। আমাকে মাসে মাসে হাত-খরচ দেবেন সে-জন্যে!

—তা তুমি কি কাল থেকে আসছো?

সুরেন বললে—এখনও কিছু ঠিক করিনি। ভাবছি এলে হয়। আমি তো বসেই আছি বলতে গেলে। কোনও কাজই নেই আমার।

তারপর একটু থেমে বললে—এলে একটা লাভ হবে, তোমার সঙ্গে তবু দেখা হবে মাঝে মাঝে—

পর্মিলি বললে—তুমি আবার হঠাৎ রোমাণ্টিক হয়ে উঠলে যে?

সুরেন হাসলো। বললে—তা নয়। তোমাদের বাড়িতে এসে খানিকক্ষণের জন্যে অন্ততঃ সব কিছু ভুলে যাই। এইটুকুই আমার মস্ত লাভ!

—কেন? আমাদের বাড়িতে এলে সব কিছু ভুলে যাও কেন?

সুরেন বললে—তোমাদের বাড়িতে এলে মনে হয় সারা পৃথিবীটাই বুঝি তোমাদের বাড়ির মত শান্ত। কোথাও কোনও অশান্তি নেই। কোথাও দুঃখ, দারিদ্র্য হতাশা, ক্ষোভ, ঝগড়া-মারামারি কিছু নেই। এই কলকাতায় যে এত প্রোসেশান বেরোয়, এত ইনক্লাব-জিন্দাবাদ হয়, এত ট্রাম-বাস পোড়ে, এ-সহরে এত বাস-এ্যাক্সিডেণ্ট্ হয়, এ-সব তোমাদের বাড়িতে ঢুকলে বিশ্বাসই করতে ইচ্ছে হয় না—। আরো অনেক জায়গাতেই তো যাই আমি। আমাদের মাধব কুণ্ডু লেনের বাড়ির মালিকও তো বড়লোক! কই, সেখানে আমি এক দণ্ড টিকতে পারি না—

—কেন?

সুরেন বললে—সে তুমি বুঝবে না। সেখানে টাকা নিয়ে কাড়াকাড়ি চলছে। কে কার গলা কাটতে পারে সেই চেষ্টাই কেবল সেখানে হচ্ছে। তাছাড়া দেবেশ-দের পার্টি অফিসেও যাই, সেখানে আবার অন্য রকম অশান্তি। কেবল কংগ্রেসের নিন্দে। কী করে কংগ্রেসকে ইলেকশানে হারানো যায় সেই সব ষড়যন্ত্র হচ্ছে।

—কেন, কংগ্রেস কী দোষ করেছে?

সুরেন বললে—দেবেশ বলে, ব্রিটিশরা দু'শো বছর ইণ্ডিয়ায় রাজত্ব করে দেশের যা সর্বনাশ করেছে তার চেয়ে হাজার গুণ বেশি সর্বনাশ করেছে জহর-

লাল নেহরু এই আট বছর প্রাইম-মিনিস্টার হয়ে—

—সে কী?

সুরেন বললে—তাই তো বলছি। আমি কিছুই বুঝতে পারি না। চারদিকে মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দেখি আর কীসে তার প্রতিকার হয় তাই ভাবি। কেবল মনে হয় সবাই হয়ত ভুল পথে চলেছে—। এক-এক সময় আমার কী মনে হয় জানো পর্মিলি? মনে হয় আজ থেকে একশো বছর আগে জন্মালে বোধহয় বেঁচে সুখ হতো। তখন বোধহয় লোকগুলো এখনকার লোকের চেয়ে ভালো ছিল—

পর্মিলি বললে—এসব কথা ভেবো না, পাগল হয়ে যাবে—

সুরেন বললে—তা বলেছ ঠিক, পাগল হবারই অবস্থা হয়েছে আমার। আমার মামা তো আমাকে পাগলই বলে। লাখ লাখ টাকার সম্পত্তির ওপর আমার লোভ নেই দেখে মামা ধারণা করে নিয়েছে যে, আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে—

—কিন্তু লাখ লাখ টাকার লোভ তোমার নেই-ই বা কেন? তুমি কি টাকা চাও না?

সুরেন বললে—বা রে, টাকা চাইবো না কেন? কিন্তু যে-টাকা রোজগার না করে পাওয়া যায়, তার ওপর আমার লোভ নেই। সে টাকা নিলে শুধু অশান্তির সৃষ্টি হবে। আমার মনে হয় দরকারের বেশি টাকা থাকাটাই খারাপ—

তারপর পর্মিলির মুখের দিকে চেয়ে বললে—আমার পাগলামির কথা তোমার শুনতে ভালো লাগছে না, না?

পর্মিলি বললে—কে বললে ভালো লাগছে না?

সুরেন বললে—সত্যি করে বলো তো, আমার কথা শুনতে তোমার ভালো লাগে?

পর্মিলি বললে—বা রে, ও-কথা জিজ্ঞেস করছো কেন?

সুরেন বললে—কেউ আমার কথা তো এমন করে মন দিয়ে শোনে না, তাই কেমন সন্দেহ হচ্ছে! তাছাড়া তুমি হচ্ছ সোসাইটি-গার্ল। তোমার সঙ্গে আমাদের আকাশ-পাতাল তফাত! তারপরে তোমার বাবা মিনিস্টার আর আমি সামান্য একজন অজ্ঞাতকুলশীল মানুষ ছাড়া আর কিছু নই—

পর্মিলি হাসতে হাসতে বললে—তা সোসাইটি-গার্লরা বুঝি মানুষ নয়?

হঠাৎ খেয়াল হয়েছে সুরেনের। চারদিকে চেয়ে নিয়ে বললে—এ কোথায় আমাকে নিয়ে এলে তুমি পর্মিলি? এ কোন্ জায়গা?

পর্মিলি হাসতে লাগলো। বললে—ভয় নেই, আমি তোমাকে বিপদে ফেলবো না—

সন্ধ্যের অন্ধকার চারদিকে বেশ ঘনিয়ে এসেছে। কিন্তু এখানটায় আলো ঝল্‌মল্‌ করছে। গাড়ির পর গাড়ির সার দাঁড়িয়ে আছে একটার পর একটা। পর্মিলির গাড়িটা আসতেই একজন তাড়াতাড়ি এসে দরজা খুলে দিলে। তারপর হাসিমুখে অভ্যর্থনা।

—আসুন মিস্ রায়, আসুন। আপনার জন্যে আমরা সবাই অপেক্ষা করছি—

ভদ্রলোক যেন পর্মিলি ছাড়া আর কাউকে দেখতেই পেলে না। সুরেনও নামলো। এ কোথায় পর্মিলি নিয়ে এল তাকে! এখানে আসতে হবে জানলে তো সে ফরসা জামা-কাপড় পরে তৈরি হয়ে আসতো। কিন্তু এখন আর পেছিয়ে

যাওয়া সম্ভব নয়। একটা কিছু উৎসব চলেছে নিশ্চয়ই। দরজা থেকে ভেতরের ঘর পর্যন্ত কার্পেট দিয়ে মোড়া। পর্মিলিকে সবাই আপ্যায়ন করে ভেতরে টেনে নিয়ে গেল। সুরেনও আড়ষ্টের মত চলতে লাগল পেছন পেছন। অনেক লোক, অনেক ভিড়। সবাই যেন পর্মিলির জন্যেই অপেক্ষা করছিল এতক্ষণ।

কিন্তু ভেতরে ঢুকে সেখানে আর এক দৃশ্য!

সুরেন অবাক হয়ে গেল দেখে, সবাই মিলে নাচছে। ছেলে-মেয়ে-বুড়ো। কেউ বাদ নেই। কিছু কিছু লোক এখানে-ওখানে হাতে গেলাস নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, গল্প করছে, আর মাঝে মাঝে গেলাসে চুমুক দিচ্ছে।

একবার ইচ্ছে হলো ডাকে—পর্মিলি—

কিন্তু পর্মিলিকে ঘিরে তখন অনেক লোকের ভিড়। অনেক সমারোহ তার চারদিকে। তার কোনও দিকে ফিরে চাইবার সময় নেই। সুরেন সেই ভিড়ের মধ্যেই অসহায়ের মত খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে সকলের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে দেখতে লাগলো। দেয়ালের গা-বরাবর সার সার চেয়ার পাতা। সেখানেও কেউ কেউ বসে আছে। তাদের হাতেও গেলাস। সুরেন বুঝতে পারলে না সে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকবে, না ওই চেয়ারগুলোর একটাতে গিয়ে বসবে! ওদিকে পর্মিলির তখন নিঃশ্বাস ফেলবার সময় নেই। ভক্তরা তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে ঘিরে আছে অভিমন্যুর মত। তাদের ব্যূহ ভেদ করে বেরিয়ে আসা তার পক্ষে তখন শক্ত। কিন্তু এখন তো তা বলে সুরেনের ফিরে যাওয়াও সম্ভব নয়।

একজন উর্দিপরা বয় তার সামনে এসে ট্রে বাড়িয়ে ধরলে। ট্রের ওপর এক-গাদা গেলাস বসানো।

সুরেন অবাক হয়ে গেল। নেবে কি নেবে না ঠিক করতে পারলে না।

জিজ্ঞেস করলে—এতে কী?

বয়টা বললে—হুইস্কি হুজুর—

সুরেনের তখন জল তেস্টা পেয়েছিল। বললে—জল নেই?

—হ্যাঁ হুজুর, কোকাকোলা আছে।

—কোনটা কোকাকোলা?

চেনাও মুশকিল কোনটা কোকাকোলা আর কোনটা হুইস্কি। সুরেন কোকাকোলার গেলাসটা তুলে নিয়ে তাতে একটা চুমুক দিলে। কিন্তু ভালো করে নজর দিয়ে দেখলে, সবাই হুইস্কির গেলাসগুলোই বেছে বেছে তুলে নিচ্ছে বার বার। এক হাতে সিগারেট আর এক হাতে গেলাস। সকলের চোখের সামনে থেকে পৃথিবী মুছে গেছে, শুধু জেগে আছে হুইস্কি আর সিগারেট। সুরেনের দম আটকে আসছিল। সিগারেটের ধোঁয়ায় আর হুইস্কির গন্ধে মনে হচ্ছিল সে বোধহয় বমি করে ফেলবে। কিন্তু পর্মিলিকে না বলে এখান থেকে চলে যায়ই বা কী করে?

তখন আরো কয়েকজন নাচে যোগ দিয়েছে। সে এক অদ্ভুত নাচ। কারো হাত কেউ ধরছে না। তবু ছন্দ মিলিয়ে জোড়ায়-জোড়ায় নাচছে।

সুরেন এবার উঠলো। এবার পর্মিলিকে গিয়ে বলতেই হবে যে সে চলে যাবে এখান থেকে। পর্মিলি হয়ত রাগ করবে। হয়ত ভাববে অশিক্ষিত। তা ভাবুক। এখানে ভালো না লাগলে সে কী করবে? আগে বললে সে কি আসতো এখানে? আর তাছাড়া সে তো অনিমন্ত্রিত। তার তো এখানে আসার অধিকারও নেই। পর্মিলি সমস্ত জেনেশুনে কেন তাকে এখানে নিয়ে এল? কার সঙ্গে এখানে সে কথা বলবে? কেউ তো তাকে চেনে না। কার বাড়ি, কার বিয়ে কিংবা

জন্মদিন কিংবা হয়ত অন্য কিছু, তাও সে জানে না। এখন হুইস্কি চলছে, এরপরেই হয়ত খাবার ডাক পড়বে। তখন সকলের সংগে তাকে হয়ত খেতেও বসতে হবে। কেউ জিজ্ঞেসও করবে না সে কে, কার সংগে এখানে এসেছে, কেন আর কোন্ অধিকারে এখানে বসে সে নেমন্তন্ন খাচ্ছে! সুরেন অবাক হয়ে ভাবতে লাগলো, এখানে বসে দেবেশের পার্টি-অফিসের কথা যেন ভাবাও অন্যায়। ভাবা অন্যায় টুলুদের কথা। আর আরো ভাবা অন্যায় কালীকান্ত বিশ্বাস আর নরেশ দত্তর কথা। তারাও তো মদ খায়। তবে তাদের মদ খাওয়াকে লোকে নিচু নজরে দেখে কেন?

—পর্মিলি!

যাকে লক্ষ্য করে সুরেন ডাকলো সে পর্মিলি নয়। মহিলাটি পেছন ফিরতেই ভুল ধরা পড়লো।

সুরেন বললে—কিছু মনে করবেন না, আমি ঠিক চিনতে পারিনি—

সত্যিই সাজগোজের দিক দিয়ে কেউই কম যায় না। পর্মিলিদেরই সমাজের মেয়েরা সব। কারো কারো সিঁথিতে সিঁদুর। বিয়ে হয়ে গেছে। তবু নাচতে পারে তারা। পর্মিলির তখন আর পাত্তা নেই। বিরাট হলের ভেতরে কোথায় কোন্ ভিড়ের মধ্যে সে তলিয়ে গেছে তা খুঁজে দেখবার সাধ্য নেই কারো। বিশেষ করে পর্মিলি নিজেও হয়ত হুইস্কি খেয়েছে তখন। অন্য সকলের মতন খেয়ে নেশায় বুঁদ হয়ে আছে।

কিন্তু পর্মিলির আক্কেলটাই বা কী-রকম! তার তো একটা দায়িত্ববোধ থাকা উচিত! সে তাকে এখানে নিয়ে এসেছে। সুরেনের সুবিধে-অসুবিধেটা তো তারই দেখা উচিত! আমি যে এখানে একলা-একলা আড়ষ্ট হয়ে বসে আছি সেটা তো তার দেখা উচিত!

কিন্তু না, হয়ত এইটেই এদের রীতি!

হঠাৎ নজর পড়লো পর্মিলির দিকে। পর্মিলি নাচছে! আশ্চর্য, সুরেন তাকে খুঁজে খুঁজে মরছে, আর পর্মিলি কিনা বেশ হাসি-হাসি মুখে নাচছে! সুরেন সেই দিকেই এগিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ যেন হাসির তোড় উঠলো কোথায়। অনেক-গুলো লোক কী একটা উপলক্ষ্য করে সজোরে হেসে উঠলো। সুরেনের আর যাওয়া হলো না। সে পেছিয়ে এল আবার তার নিজের চেয়ারটার দিকে। সত্যিই তো, কেন সে পর্মিলির কথায় এখানে এল? তার নিজেরই দোষ। পর্মিলির ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে সে নিজের অপরাধটা হাল্কা করবার চেষ্টা করছে মিছিমিছি। আসলে সে নিজেই অপরাধী! এদের এখানে সে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারবে না। সুতরাং এখান থেকে চলে যাওয়াই উচিত।

এবার বাইরে যাবার জন্যে সুরেন দাঁড়িয়ে উঠলো। তারপর আস্তে আস্তে দরজার দিকে এগোতে লাগলো। তখনও নাচ চলছে। কোথা থেকে যেন গানও শুরু হলো একজন মেয়ের।

সুরেন একেবারে সদর গেটের সামনে এসে দাঁড়ালো।

কে একজন এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলে—আপনার গাড়ির নম্বর?

অর্থাৎ হুকুম দিলেই সে গাড়িটা এনে সামনে হাজির করে দেবে।

সুরেন বললে—না, আমার গাড়ি নেই, আমি হেঁটেই যাবো—

তারপর সোজা রাস্তার দিকেই পা বাড়ালো। হঠাৎ সামনেই একটা গাড়ি এসে দাঁড়াতে অবাক হয়ে গেল সুরেন। প্রজেশ সেন!

—আরে সান্ন্যাল, তুমি?

সুরেন বললে—আপনি?

প্রজেশ বললে—আমার একটু আসতে দেরী হয়ে গেল। আমাকে তো আবার চাকরি করতে হয় ভাই—

তারপরে সুরেনকে একটু পাশে নিয়ে গিয়ে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলে—পর্মিলি এসেছে নাকি?

সুরেন বললে—হ্যাঁ, পর্মিলিই তো আমাকে নিয়ে এল এখানে! এখানে কী হচ্ছে?

প্রজেশ সেন বললে—মিসেস সরকারের ম্যারেজ-এ্যানিভার্সারি! তা তুমি ভাই আমার চিঠিটা দিয়েছিলে পর্মিলিকে?

সুরেন বললে—দিয়েছিলুম, কিন্তু পর্মিলি সেটা টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দিলে—

—ছিঁড়ে ফেললে?

সুরেন বললে—হ্যাঁ। আমি আজকেই চিঠিটা দিয়েছিলুম। সেখান থেকেই তো সোজা পর্মিলি আমাকে এখানে নিয়ে এল—

—তা তুমি চলে যাচ্ছ কেন? খেয়েছ?

সুরেন বললে—না।

—আর পর্মিলি? পর্মিলি কী করছে?

সুরেন বললে—দেখলুম নাচছে। আমার খুব খারাপ লাগতে লাগলো, তাই চলে যাচ্ছি—কেউ চেনে না আমাকে এখানে—

প্রজেশ সেন বললে—আমি তো এসে গেছি, এবার ভালো লাগবে, চলো—

সুরেন বললে—না, আপনি যান—

—পর্মিলিকে বলে চলে এসেছ তো?

সুরেন বললে—না, বলে আসবার সুযোগই পাইনি—

—তা বাড়ি যাবে কী করে?

—বাসে করে।

বলে আর দাঁড়ালো না। ফুটপাথ ধরে সোজা হনহন করে চলতে লাগলো। কী হবে এদের সঙ্গে মিশে! এরা কেউ তার আপন নয়। এদের সঙ্গে কোনও দিন তার আত্মীয়তা হবে না। বাইরেই দু'-চারটে ভিখিরি হা-পিত্যেশ করে বসে ছিল। ময়লা জামা-কাপড়। হাতে ভাঙা কলাইকরা থালা—

—একটা পয়সা দিন সাহেব।

দৃশ্যটা চোখে পড়তেই কেমন একটা ধাক্কা লাগলো মনে। এরা আশা করে বসে আছে। ভেতর থেকে সাহেবরা বেরোলেই পেছন নেবে!

সুরেন পকেট থেকে একটা পয়সা বার করে কলাইকরা থালাতে ফেলে দিতেই ঝণাৎ করে একটা শব্দ হলো। সুরেন চমকে উঠলো শব্দটা শুনে। তার মনে হলো কলকাতার সমস্ত মানুষ যেন হঠাৎ একসঙ্গে আর্তনাদ করে উঠলো। সুরেন আর সেখানে দাঁড়ালো না। আলো, জাঁকজমক, বিরাট বিরাট বাড়ি, নাচ, হাসি, গান সমস্ত কিছু তাকে পেছন থেকে তাড়া করেছে। আরো জোরে পা চালিয়ে দিলে সুরেন। আরো আরো জোরে, যেন তীরবেগে তারা তার দিকে ছুটে আসছে। তাকে তারা গ্রাস করবে! তাকে তারা পরাভূত করবে, তাকে তারা আক্রমণ করবে। পালাও, পালাও। এখান থেকে যত শীঘ্র পারো পালাও—

আর প্রজেশ সেন তখন কোরিডোর পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতেই এক সঙ্গে অনেকগুলো গলা চিৎকার করে উঠলো—হ্যাল্লো সেন, হ্যাল্লো—

মাধব কুণ্ডু লেনের বাড়িতে সেদিন সন্ধ্যেবেলাই গণ্ডগোলটা শুরু হয়েছিল। গণ্ডগোলটা কিছুই নয়। ক'দিন থেকেই আবার মা-মণির শরীরটা খারাপ। কেমন যেন মাথটা ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল। মনে হচ্ছিল যেন আর বেশি দিন নয়।

বাদামী পায়ের কাছে বসে ছিল। সেও বুড়ি হয়ে গেছে। মা-মণির যখন বিয়ে হয়েছিল, তখন ওই বাদামীই শ্বশুরবাড়িতে সঙ্গে গিয়েছিল।

সে-ও এক কাণ্ড! এমন কাণ্ড কেউ দেখেনি, কেউ শোনেনি কখনও। শোভাবাজারের দত্ত-বাড়ির আত্মীয়স্বজন যারা এসেছিল তারাও অবাক, যারা পরে শুনেছিল তারাও স্তম্ভিত। কানাঘুষোয় কেলেঙ্কারিটা বেশি দূর গড়াতে পারেনি। কিন্তু মনে আছে বাদামীর। বাদামী অনেক দেখেছে তার জীবনে। কবে ছোটবেলায় একদিন এই মাধব কুণ্ডু লেনের বাড়িতে কাজ করতে এসেছিল, তারপর কোথায় তার দেশ, কোথায় তার বাড়ি, কোথায় তার আত্মীয়-স্বজন, সব ভুলে গেছে। এখন এই বাড়িটাই তার নিজের সংসার হয়ে গেছে।

তরলা একদিন জিজ্ঞেস করেছিল—তোমার কত বয়েস হলো গা দিদি?

—বয়েস?

বয়েসের কথা ভাবতে গিয়েই কেমন মাথাটা ঘুরে যায় বাদামীর। বলে—দূর, আমার আবার বয়েস। আমার বয়েসের কি গাছ-পাথর আছে লা? মরণ হলেই বাঁচি—

তা কথাটা মিথ্যে নয়। বাদামী যেন মরে গেলেই বাঁচে। আর ভালো লাগে না এমন করে বেঁচে থাকতে। মা-মণির অসুখ শোনার পর থেকেই মরতে মরতে পায়ের কাছে এসে শোয়। খাটের ওপর শুয়ে থাকে মা-মণি, আর ঠিক তার পায়ের দিকে মেঝের ওপর বিছানাটা করে নেয়!

হঠাৎ সেদিন মা-মণির গলা শোনা গেল। ডাকলে—বাদামী!

বুড়ো মানুষের ঘুম। ও ঠিক ঘুম নয়। ঝিমুনির মতন। ডাকটা শুনেই উঠে পড়েছে। বললে—কী মা-মণি? তরলাকে ডাকবো?

মা-মণি বললে—হ্যাঁ, ডাকো—

তারপর শুধু তরলা নয়, ধনঞ্জয়ও এল। ধনঞ্জয় ভূপতি ভাদুড়ীকেও ডেকে আনলে। ভূপতি ভাদুড়ী এসেই জিজ্ঞেস করলে—ডাক্তারবাবুকে একবার ডাকবো মা-মণি?

মা-মণি বললে—আমার সেই উইলখানা কী করলে?

—আজ্ঞে মা-মণি, সে তো সব ঠিক করা আছে।

—কই, আমি তো সই করলুম না। আমাকে দিয়ে তো সই করালে না তুমি?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—সে কি! সই তো আপনি করেছেন মা-মণি!

বুড়ো মানুষ, মা-মণিরও সব কথা মনে থাকে না হয়ত। ভূপতি ভাদুড়ী যথারীতি মা-মণির সই নিয়ে আরো পাঁচজন সাক্ষীর সইও নিয়েছিল। তারপর হরনাথ উকিলকে দেখিয়েও ছিল। রেজেস্ট্রি করাটাই তো বাকি ছিল শুধু। উকিলবাবু ব্যস্ত আছেন বলেই সেটা হয়নি। নিজের ক্যাশ-বাক্সের মধ্যেই সেটা ভালো করে রেখে দিয়েছে।

—তা এখন আপনার শরীর খারাপ, এখন ও-সব কথা কেন ভাবছেন? আমি বরং ডাক্তারবাবুকে ডেকে নিয়ে আসি—

মা-মণি বললে—দেরি হয়ে যাচ্ছে যে, আমি কি আর বেশিদিন বাঁচবো?

বাদামী বলে উঠলো—অমন অলক্ষুণে কথা বোল না বাছা! আমাকে রেখে তুমি যাবে? তাহলে আমি থাকবো কার মুখ চেয়ে?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—তোমারই তো দেখা উচিত বাদামী, মা-মণি তো তোমার মেয়ের মতন। তুমি যদি নাক ডাকিয়ে ঘুমোও তো কেমন করে সব চলবে?

মা-মণি বললে—না না, তোমরা ভেবো না কেউ, আমার কিছু হয়নি।

ততক্ষণে তরলাও খবর পেয়ে এসে গিয়েছিল।

বললে—একটু জল খাবে মা-মণি?

মা-মণি বললে—ওরে না, আমার কিছু হয়নি, তোরা সবাই যা—

তরলা বললে—এবার থেকে তোমার ঘরে আমি শোব মা-মণি।

বাদামী বললে—তা আমি কি ঘুমিয়েই ছিলুম! আমার পোড়া চোখে কি ঘুম আছে রে? আমি তো জেগেই ছিলুম বরাবর।

তরলা বললে—তা তুমি জেগে জেগে কী করছিলে? যখনি দেখলে মা-মণি কেমন করছে তখনই তো আমায় ডাকতে হয়! তোমার যে নড়তেই দশ ঘণ্টা!

তারপর মা-মণির সামনে গিয়ে মা-মণির কপালে হাত দিলে। জ্বর আছে কিনা দেখতে লাগলো।

মা-মণি বললে—ওরে, জ্বর-টর কিছু হয়নি আমার, আমার কিছু হয়নি। তোরা সবাই যা আমার ঘর থেকে। এবার থেকে আমি আর কাউকে ডাকবো না—

তরলা গায়ের চাদরটা মা-মণির সারা গায়ে ভালো করে ঢেকে দিলে

বললে—তুমি আজেবাজে কথা ভেবো না মা-মণি, ঘুমোবার চেষ্টা করো। ঘুমিয়ে পড়ো—

ভূপতি ভাদুড়ীও বললে—হ্যাঁ মা-মণি, রাত্তিরে আপনি অকারণ আজেবাজে কথা ভাবেন কেন? উইল নিয়ে আর মাথা-টাথা ঘামাবেন না। আমি তো আছি। আমি সব ঠিক করে দেবো। আর রাত্তিরবেলা ও-সব কথা মাথায় এলোই বা কেন?

মা-মণি বললে—ভাবতে তো আমিও চাই না। কিন্তু ঘুম না এলে কী করবো? ঘুম না এলেই যত রাজ্যির ভাবনা এসে মাথায় ঢোকে। ভাবলাম আমি আর বেশি দিন বাঁচবো না, তাই বাদামীকে ডাকলুম—

—তা সকাল হলেই ডাকতে পারতেন? রাত্তিরে তো আর উকিলবাড়িতে যাওয়া যাবে না? উকিলবাবু তো এখন নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে—

মা-মণি বললে—না না ভূপতি, যত শিগ্‌গির পারো তুমি উইলটা নিজের কাছে এনে রাখো। ওটা রেজিস্ট্রি করে রেখে দাও। মানুষের আয়ুর কথা কি কেউ বলতে পারে?

ভূপতি বললে—উইল তো আমার কাছেই আছে। আমি তো সেটা ক্যাশ-বাক্সের ভেতরে রেখে দিয়েছি। উকিলের বাড়ি থেকে সেটা কবে আনা হয়ে গেছে—

—তোমার কাছেই আছে?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—আমার কাছে নেই তো কি সে উকিলবাবুর বাড়িতে রেখে দিয়ে এসেছি? আমি আমার ক্যাশ-বাক্সে চাবি দিয়ে রেখে দিয়েছি!

মা-মণি যেন শুনে খানিকটা আশ্বস্ত হলো।

বললে—আচ্ছা তোমরা এখন যাও সবাই, আমি এখন ভালো আছি—

বলে পাশ ফিরে শোবার চেষ্টা করলে। ভূপতি ভাদুড়ী বললে—তাহলে আপনি ঘুমোন মা-মণি, আমরা আসি—

তরলা ঘরের বড় আলোটা নিভিয়ে দিলে। শুধু বারান্দার আলোটা জ্বলতে লাগলো। মা-মণি আবার চোখ বোঁজবার চেষ্টা করতে লাগলো। বাদামীও আবার ঘুমিয়ে পড়েছে। জোরে জোরে তার নিঃশ্বাস পড়ছে। কিন্তু ঘুম যেন চোখ থেকে উড়ে গেল মা-মণির। আর ঘুম আসছে না। এই বাড়ি, এই ঘর-দোর ছেড়ে একদিন তাকে চলে যেতে হবে। কেউ তাকে ধরে রাখতে পারবে না। একলা থাকলেই মা-মণির এইসব ভাবনা মাথায় আসে। দূরে কোথায় জাহাজের ভোঁ বেজে উঠলো বুঝি। মনে হলো যেন বড় কাছেই গঙ্গাটা। কতদিন গঙ্গায় নাইতে যাওয়া হয়নি। আর শরীর গেল তো সব গেল। শরীর থাকলে আবার গঙ্গায় নাইতে যেত মা-মণি!

হঠাৎ যেন কাদের গলার আওয়াজ কানে এল। কারা যেন ফিসফিস করে কথা কইছে। এত রাত্তিরে আবার কে কোথায় কথা বলছে? কারোর কি ঘুম নেই নাকি? তারই মত সবাই জেগে আছে? কাছের বড় রাস্তাটায় ট্রাম চলার ঘড়-ঘড় শব্দ শুরু হয়েছে। তবে বুঝি রাত এখনও বেশি হয়নি।

মা-মণি আবার চোখ দুটো বুজে ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগলো।

—মা-মণি!

—কে?

—তোমার চা এনেছি—

মা-মণি বললে—এত রাত্তিরে আবার চা কেন? কাল ভোরবেলায় চা খাবো—

—ভোর তো হয়ে গেছে। বেলা আটটা বেজেছে—

মা-মণি যেন চমকে উঠলো। বেলা আটটা! এর মধ্যে কখন আটটা বাজলো? এই তো এখুনি ভূপতি আলো নিভিয়ে দিয়ে চলে গেল। এই তো তরলা তাকে ঘুমোতে বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। এই তো একটু আগেই বাদামীর নাক ডাকতে লাগলো! রাত আটটা, না সকাল আটটা?

চোখ মেলতেই দেখলে, সুখদা।

—কী রে, তুই? তুই যে চা নিয়ে এলি?

সুখদা বললে—কাল রাত্তিরে শুনলুম তোমার শরীর খারাপ হয়েছিল? আমাকে কেউ খবরই দেয়নি! কেন, আমি কি এ-বাড়ির কেউ নই? আমি কি পর?

মা-মণি উঠে বসলো। বললে—ও-কথা কেন বলিস মা? তোকে কষ্ট দিতে চায়নি তাই তোর ঘুম ভাঙায়নি! আর তাছাড়া আমার তো কিছু হয়নি। শুধু একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম—

সুখদা বললে—তা আমায় ডাকলে কী হতো? তবু তো আমি তোমার কাছে একটু থাকতে পারতুম। আমি তরলাকে কত বকলুম আজ। আজ থেকে আমি তোমার ঘরে শোব। কবে তুমি দেখছি বেঘোরে মারা যাবে, কেউ টেরই পাবে না। কেন, আমি তাহলে এ-বাড়িতে আছি কী করতে?

মা-মণি বললে—তা রাগ করছিস কেন তুই? আমার তো কিছুই হয়নি!

—হয়নি যদি তো রাত্তিরে তুমি কাল ভূপতি ম্যানেজারকে ডেকে পাঠিয়েছিলে কেন?

মা-মণি বললে—ওরে, আমার ঘুম হয়নি তাই বড় ভয় করছিল। মনে হচ্ছিল আমি মরে যাবো, তাই ভাবলাম ভূপতিকে ডেকে উইলের কথাটা জিজ্ঞেস করি। উইল করেছি, মনে হলো সেটাতে তো সই করা হয়নি আমার। আজকাল এমন ভুলো মন হয়েছে আমার, কিছু মনে থাকে না—

সুখদা বললে—মনে থাকে না তো বলছো, তা টাকা-কড়ি সম্পত্তি-টম্পত্তি-গুলো সুরেনকে দিয়ে যাবার সময় তো ঠিক সব মনে থাকে! তার বেলায় তো কিছু ভুল হয় না?

—কী বলছিস রে তুই সুখদা? কে বললে আমি সুরেনকে সব দিয়েছি।

সুখদা বললে—বলবে আবার কে? যে-ই বলুক, আমি কি মিথ্যে কথা বলছি বলতে চাও? সুরেনকে তুমি সব দাওনি?

মা-মণির মুখটা যেন কালো হয়ে গেল কথাটা শুনে। তার মাথাটা আবার ঘুরতে লাগলো।

বললে—ও উইলটা তো পাকা নয়। তুই যখন বাড়ি থেকে চলে গিয়েছিলি তখন ওটা করিয়েছিলুম।

—তা আমি বাড়িতে ছিলুম না বলে কি আমি একেবারে মরে গিয়েছিলুম!

—ছিঃ, বালাই ষাট, ও-কথা বলতে নেই মা। জানিস আমার বয়েস হয়েছে, ও-সব কথা শুনলে আমার কষ্ট হয়।

—কষ্ট না ছাই হয়! তুমি তো কেবল চাও আমি মরে যাই। মরে গেলেই তো তুমি বাঁচো। তাহলে তুমি তোমার সুরেনকে নিয়ে থাকতে পারো!

—ওমা, তুই আমাকে আজ এই কথা বললি?

—তা বলবো না? সত্যি কথা বলবো তাতে আমার ভয় কী?

মা-মণি চিৎকার করবার চেষ্টা করলে—তুই চুপ কর মা, চুপ কর, তোর পায়ে পড়ি মা তুই চুপ কর্—

—কেন চুপ করবো শুনি? আমি কাকে ভয় করি যে আমি চুপ করবো? আমার কে আছে যে তার ভয়ে আমি চুপ করবো? তুমি বুকে হাত দিয়ে বলো যে তুমি সুরেনের নামে সব সম্পত্তি উইল করোনি?

মা-মণি হাঁ করে হতবাক্ হয়ে চেয়ে রইল সুখদার দিকে। মুখ দিয়ে কিছু কথা বেরোল না।

সুখদা বললে—হাঁ করে চেয়ে দেখছো কী, বুকে হাত দিয়ে বলো দিকিনি, আমি সত্যি বলছি না মিথ্যে বলছি?

মা-মণি আবার বললে—ওরে, তোর পায়ে পড়ি তুই অত জোরে চেঁচাসনি, চুপ কর। আমার বুক ধড়ফড় করছে।

সুখদাও গলা চড়িয়ে বললে—আমি কথা বললেই তোমার বুক ধড়ফড় করে, আর সুরেন কথা বললে বুঝি তোমার কানে মধু-বর্ষণ হয়?

—ওরে, থাম থাম তুই—

বলেই আর কিছু করতে না পেরে মা-মণি পাশের দেয়ালে মাথাটা ঠাই-ঠাই করে ঠুকতে লাগলো। আর ঠুকতে ঠুকতে বলতে লাগলো—ওরে, আমার মরণ হয় না কেন রে, আমার মরণ হয় না কেন রে—

শব্দ পেয়ে তরলা ছুটে এল, বাদামী ছুটে এল। মা-মণিকে হাত দিয়ে ধরে বাধা দেবার চেষ্টা করলে তরলা। বললে—মা-মণি, করছো কী, মাথা ফেটে যাবে যে—

কিন্তু তখন কে আর কার কথা শোনে! মা-মণির শরীরে তখন যেন অসুর

ভর করেছে। বললে—তুই ছাড় আমাকে, ছেড়ে দে, আমি মরবো, আমার মরাই ভালো—

সুখদা তখনও দাঁড়িয়ে আছে পাথরের মত।

তরলা বললে—দিদিমণি, দেখছ কী, তুমি একটু বারণ করো—

মা-মণির কিন্তু তখনও কোনও দিকে গ্রাহ্য নেই। কপাল দিয়ে রক্ত গড়িয়ে মুখময় লাল হয়ে গেছে। বিছানাও রক্তে একাকার।

তরলা চিৎকার করে ডাকলে—ধনঞ্জয়, অ ধনঞ্জয়, ম্যানেজারবাবুকে ডেকে নিয়ে আয় দৌড়ে—

ধনঞ্জয় কান্ড দেখতে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। সে তাড়াতাড়ি গিয়ে ভূপতি ভাদুড়ীকে ডেকে নিয়ে এসেছে। ভূপতি ভাদুড়ীর তখনও মুখ-হাত-পা ধোওয়া হয়নি। ঘুম থেকে সবে উঠেছে। খবর শুনেই দৌড়ে লাফাতে লাফাতে সিঁড়ি টপকে তেতলায় উঠে এসেছে। এসে সামনে ওই রক্তারক্তি কান্ড দেখেই চমকে উঠেছে।

তাড়াতাড়ি মা-মণির মাথাটা ধরে ফেলে বিছানায় শুইয়ে দিলে।

বললে—করছেন কী মা-মণি, আপনি কি পাগল হয়ে গেছেন?

মা-মণি তখনও হাঁফাচ্ছে। ভালো করে কথা বলবারও ক্ষমতা নেই। সমস্ত শরীর তখন থর-থর করে কাঁপছে। নিজের মনেই বলতে লাগলো—আমি আর-জন্মে কত যে পাপ করেছিলুম, তাই আমার কপালে এত শাস্তি, আমার মরণ হয় না কেন, আমি যে মলেই বাঁচি—

তরলার দিকে চেয়ে ভূপতি ভাদুড়ী বললে—তুমি একটু মা-মণিকে দেখো, আমি যাই, ডাক্তারবাবুকে গিয়ে ডেকে নিয়ে আসি—

বলেই তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নিচেয় নেমে গেল।

সুখদা এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাথরের মত সব দেখছিল, সব শুনছিল। এবার বোধহয় সেও আর অত রক্ত দেখতে পারলে না। এক নিমেষে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। গিয়ে নিজের ঘরের বিছানার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। আরপর বালিশে মুখ গুঁজে হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগলো।

এরই নাম হয়ত ইতিহাস। এ চোখে দেখা যায় না, কানেও শোনা যায় না। দৈনন্দিন সংসার-যাত্রার আড়ালে অদৃশ্য থেকে আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে যায়। পুণ্যশ্লোকবাবু যখন জীবন আরম্ভ করেছিলেন, ভেবেছিলেন মন্ত্রী হয়ে এক-দিন সমাজের শিখরে গিয়ে উঠবেন, তখন কল্পনাও করতে পারেননি একদিন তাঁরই মেয়ে পুলিশের হাতে অপমানিত হয়ে তাঁর নাম কলঙ্কিত করবে। শম্ভু চৌধুরীও কল্পনা করতে পারেননি যে, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর রেখে যাওয়া বিপুল সম্পত্তি নিয়ে এত বড় রক্তক্ষয় ঘটবে। টুলুরাও যখন পদ্মার ওপারে ছিল তখন ভাবতে পারেনি যে, একদিন ইতিহাস-বিধাতার অমোঘ নির্দেশে তাদের এই কলকাতার সহরতলীর বস্তিতে পশুর মত জীবন কাটাতে হবে। আর দেবেশ? সুরেনদের সহপাঠী সেই দেবেশই কি ভাবতে পেরেছিল যে, ইন্ডিয়া স্বাধীন হবার পরেও তাদের আবার এমন করে জেল খেটে, পুলিশের লাঠি খেয়ে সত্যিকারের স্বাধীনতার জন্যে এত ত্যাগ স্বীকার করতে হবে।

পুণ্যশ্লোকবাবুর লাইব্রেরির মধ্যে বই পড়তে পড়তে সুরেন যেন নতুন এক দিগ্‌দর্শন আবিষ্কার করলে। সকালবেলাই পুণ্যশ্লোকবাবু কয়েকখানা বই নামিয়ে দিয়ে গেছেন। বলে গেছেন—এখন এইগুলো মন দিয়ে পড়ো। মোটা-মুটি একটা আইডিয়া হবে তোমার। দেখে নাও কী-রকমভাবে ইতিহাসের বই লিখতে হয়।

বেশি কথা বলবার লোক নন পুণ্যশ্লোকবাবু। অনেক কাজ তাঁর। প্রথম দিন। তবু যেটুকু বুঝিয়ে দেবার বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন।

বলে গেলেন—যেটা মনে হবে কাজে লাগবে সেটা নোট করবে—

সকাল সকালই খেয়ে নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল। এ-বাড়িতে একদিন সুব্রতর সঙ্গেই প্রথম এসেছিল সে। তখন ভাবেনি যে এই বাড়ির সঙ্গেই আবার এক-দিন জড়িয়ে পড়তে হবে তাকে। পড়তে পড়তে কেবল মনে হচ্ছিল, তার জীবনটাও তো একটা ইতিহাস। ছোটবেলা থেকে গ্রামে জন্মে একদিন ঘটনা-চক্রে কলকাতায় আসা। তারপর এই কলকাতার ইতিহাসের সঙ্গে এই জড়িয়ে পড়া। কত মানুষই তো দেখলে সে! সেই সুব্রতকে দেখেছিল। তারপর একে একে দেখলে সুখদাকে, দেখলে পর্মিলিকে, তারপর দেখলে টুলুকে। টুলুকে দেখতে যেতে হবে হাসপাতালে। সঙ্গে সঙ্গে কালকের কথাটাও মনে পড়লো। সেই কোন্ মিসেস সরকারের বাড়িতে তাদের বিয়ের বার্ষিক উৎসব।

রঘু এসে চা দিয়ে গেল। সঙ্গে জলখাবার।

সুরেন অবাক হয়ে গেল। বললে—এসব কে দিতে বললে আবার?

রঘু বললে—বাবু হুকুম দিয়ে গেছেন—

সুরেন হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে—তোমার দিদিমণি কোথায়?

রঘু বললে—ওপরে, ঘুমোচ্ছে—

—সে কি, এত বেলা পর্যন্ত ঘুমোচ্ছে?

রঘু বললে—হ্যাঁ, কাল অনেক রাতে বাড়ি ফিরেছে যে—

—কত রাত্তিরে?

রঘু বললে—রাত্তির মানে, তখন রাত প্রায় তিনটে হবে—

অত রাত্রে? সুরেন কেমন অবাক হয়ে গেল। অত রাত্রে ওদের পার্টি ভাঙলো?

জিজ্ঞেস করলে—বাবু আবার রাগ করেনি দিদিমণির ওপর?

রঘু বললে—তা জানি না।

রঘু চলে গেল। সুরেন বসে বসে ভাবতে লাগলো। কই, প্রজেশ সেনের কথা তো মিলছে না। সেই তো আগেকার মতই সব আছে। পর্মিলির জীবনের গতিবিধি তো কিছুই বদলায়নি। তবে কেন প্রজেশ সেন অত দুঃখ করতে লাগলো সেদিন। কিন্তু কাল? কাল তো ওখান থেকে বেরিয়ে আসবার সময় প্রজেশ সেনের সঙ্গে সুরেনের দেখা হয়ে গেল। প্রজেশ সেনেরও তো নেমন্তন্ন ছিল ওখানে। নিশ্চয়ই তার দেখা হয়েছে পর্মিলির সঙ্গে। সেখানেও কি কথা বলেনি দু'জনে? দু'জনের ঝগড়া কি তাহলে মিটে গেছে?

সুরেন নিজের মনেই আবার একবার হেসে উঠলো। ওদের আবার ঝগড়া, ওদের আবার ভাব! ওরা কি আর সুরেনদের মত। ওদের সমাজটাই আলাদা। আজ ঝগড়া কাল ভাব। যে-লোক সেদিন মদ খেয়ে পর্মিলির জন্যে কান্নাকাটি করতে পারে, তারই আবার কী-রকম অন্য চেহারা। এর নামও কি প্রেম!

যাক্ গে, মরুক গে! আদার ব্যাপারী হয়ে তার জাহাজের খবরে দরকার

কী! ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলে সুরেন। পড়তে পড়তে যে কোথা দিয়ে সময় কেটে গেল বুঝতে পারেনি। কত বই পুণ্যশ্লোকবাবুর। এই সব বই কি পুণ্যশ্লোকবাবু পড়েছেন? এই বাঙলা দেশে কেমন করে ইংরেজরা এল। কোন্ কূট-কৌশলে তারা রাজ্য-বিস্তার করলে। কেমন করে একে-একে দালালের সৃষ্টি হলো। আর কেমন করে তারা শোষণ করতে শুরু করলে। শোষণ এক-রকমের নয়। নীল-চাষীদের ওপর দাদন দিতে শুরু করলে দালালরা। দীনবন্ধু মিত্র তাই নিয়ে লিখলেন 'নীল-দর্পণ' নাটক। পড়তে পড়তে একেবারে তলিয়ে গেল সুরেন। তারপর ঘড়ির দিকে চেয়ে নিয়ে উঠলো। আজকে আর নয়। বিকেল চারটে বাজে। এখান থেকে হাসপাতালে যেতে হবে। টুলুর অবস্থা কী রকম কে জানে! দু'দিন দেবেশের কাছেও যাওয়া হয়নি। সেই টুলুর বোন ফুলুকে চশমা কিনে দেওয়ার পর আর তাদের খবরও নেওয়া হয়নি কোনো।

লাইব্রেরি ঘরে তালা-চাবি দিয়ে পুণ্যশ্লোকবাবুর দফতরে গিয়ে হরি-লোচন-মুহুরীর কাছে চাবিটা দিলে।

বললে—আপনার কাছেই চাবিটা রাখতে বলে দিয়ে গেছেন পুণ্যশ্লোক-বাবু—

হরিলোচনবাবু চাবিটা নিয়ে বললে—কাজ হলো?

সুরেন বললে—আজকে তো সবে প্রথম দিন, যতটা পারলাম পড়লাম—কাল আবার আসবো—

তারপর আবার বারান্দা পেরিয়ে বাগানের রাস্তা। রাস্তাতে পড়তেই পেছন থেকে ডাক এলো—সুরেনবাবু—

পেছন ফিরেই দেখলে—রঘু—

রঘু বললে—দিদিমণি আপনাকে একবার ডাকছেন।

সুরেন বললে—আমার কথা আবার বলতে গেলে কেন তুমি? আমার যে একটা কাজ আছে, আমাকে এখান থেকে একবার মেডিকেল কলেজের হাস-পাতালে যেতে হবে।

রঘু বললে—তা হোক, একটুখানির জন্যে চলুন—

সুরেন বললে—তুমি বলে দাও না গিয়ে, আমি এখন বেরোচ্ছি, কালও তো আসতে হবে, কালই দেখা করবো।

রঘু বললে—না, কাল না-হয় আবার দেখা করবেন। আজকে একটুখানির জন্যে চলুন—নইলে দিদিমণি আমার ওপর রাগ করবেন—

আর উপায় নেই। আবার ফিরলো সুরেন। সিঁড়ি দিয়ে আবার দোতলার দিকে উঠতে লাগলো।

পার্মিলি যেন তার জন্যেই অপেক্ষা করছিল এতক্ষণ।

সুরেনকে দেখেই জিজ্ঞেস করলে—কাজ করছিলে?

সুরেন বললে—হ্যাঁ, আজ আর অন্য কোথাও যাবো না। আমার একটা কাজ আছে। আমাকে একবার হাসপাতালে যেতে হবে এখন—

—কেন, হাসপাতালে কেন?

—একজন রোগী আছে সেখানে, আমার পরিচিত।

পার্মিলি বললে—কে সে?

সুরেন বললে—সে তুমি চিনবে না। আর তাছাড়া তোমার সঙ্গে আর কোথাও যাবোও না। কালকে তোমার সঙ্গে মিসেস সরকারের বাড়ি গিয়ে অকারণে বড্ড কষ্ট হয়েছে—

—কষ্ট? কীসের কষ্ট? তোমায় কেউ কিছু বলেছে?

—না, তা বলেনি। কিন্তু জেনেশুনে তুমি আমায় ওখানে নিয়ে গেলেই বা কেন? তুমি জানো ওখানে কেউ আমায় চেনে না। অচেনা লোকের মধ্যে কতক্ষণ থাকতে পারা যায়? আর তাছাড়া আসবার সময় তোমায় বলে আসবো তাও সে-সুযোগ পেলাম না। আমি এখন চলি—

পর্মিলি সুরেনের হাতটা ধরে ফেললে।

—না না, বোস বোস। অনেক দিন পরে সকলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, তাই তোমার কথা একেবারে ভুলেই গিয়েছিলুম! যখন মনে পড়লো, তোমায় খুঁজলুম, কিন্তু তখন তুমি নেই। তুমি নিশ্চয়ই খুব রাগ করেছ আমার ওপর—

সুরেন একটু হাসবার চেষ্টা করলে।

পর্মিলি বললে—রাগ যে করেছ তা আমি বুঝতেই পেরেছি। কিন্তু কী করবো বলো! প্রজেশ যখন তোমার কথা বললে তখন আমার খেয়াল হলো। প্রজেশের সঙ্গে তো তোমার কাল দেখা হয়েছিল?

—হ্যাঁ, তা হয়েছিল। একটুখানির জন্যে।

পর্মিলি বললে—অনেক দিন পরে প্রজেশের সঙ্গে দেখা, আমি জানতুম না ও ওখানে যাবে, তাহলে আর আমি ওখানে যেতুম না। আমি মিসেস সরকারকে তাই বললুম। বললুম—আপনি ও স্কাউণ্ড্রেলটাকে কেন ইন্‌ভাইট করেছেন? দেখ, প্রজেশের কিন্তু লজ্জাও নেই...

সুরেন বললে—ও-সব কথা আমাকে কেন বলছো, তোমাদের দু'জনের মধ্যে আমাকে কেন টানছো। হয়ত তোমাদের মধ্যে একদিন মিটমাট হয়ে যাবে। আমাকে আর ও-সব কথা শুনিও না। আমি সেই সকালে এসেছি, এখন যাচ্ছি, খুব ক্লান্ত এখন—আমি যাই—

পর্মিলি বললে—তাহলে চলো কোথাও যাই—

সুরেন বললে—না, তোমাকে আর বিশ্বাস নেই। শেষকালে আবার কোথাও নিয়ে যাবে, তখন মুশকিলে পড়বো। তাছাড়া আমাকে এখন হাসপাতালে যেতে হবে আবার—

—কিন্তু আমি এখন কী করবো?

সুরেন বললে—তা আমি কী জানি!

পর্মিলি বললে—কালকে বাড়ি ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেল। অনেক দিন পরে সকলের সঙ্গে দেখা, তাই তাড়াতাড়ি চলে আসতে পারলাম না—

সুরেন বললে—দেখলাম সবাই ওখানে মদ খাচ্ছিল!

—তা তো খাবেই। ওটা যে কক্‌টেল-পার্টি। ড্রিঙ্ক করবার জন্যেই যে নেমন্তন্ন হয়েছে সকলের।

সুরেন বললে—ও-রকম জায়গায় তুমি আমাকে নিয়ে গেলে কেন? আমি কি ড্রিঙ্ক করি?

—তোমাকে দেখাবার জন্যে নিয়ে গেলুম। দেখলে তো, সবাই কলকাতার বড় বড় ফ্যামিলির লোক।

—কিন্তু কেন খায় ওরা ও-সব? ও-সব খেয়ে কী সুখ পায়?

পর্মিলি বললে—খাওয়াটাই যে স্টাইল। আর না খেয়ে করবে কী? কিছু যে করবার নেই কারো। সকলের অনেক টাকা। সমস্ত দিন টাকা উপায় করতে করতে টাকার পাহাড় জমে গেছে, সন্ধ্যেবেলা তাই ও-সব না করলে যে ঘুম আসবে না। পাগল হয়ে যাবে। এই আমাকেই দেখ না, আমি কী করে সময়

কাটাবো তাই-ই বুঝতে পারি না। দুপুরটা তো ঘুমিয়ে একরকম কেটে গেল। এখন বিকেল-সন্ধ্যেটা কী করে কাটাই?

সুরেন কোনও উত্তর দিতে পারলে না। বললে—অথচ এক-একজন চব্বিশ ঘণ্টা খেটেও পেট ভরে খেতে পাচ্ছে না!

পর্মিলি বললে—ও-সব কথা ছেড়ে দাও। ও-সব আমার বাবা ভাববে।

—কিন্তু তোমারও তো ভাবা উচিত। তোমারও তো একটা দায়িত্ব আছে। তুমিও তো বাঙালী সমাজের লোক।

পর্মিলি বললে—অত কথা ভাবতে গেলে পাগল হয়ে যাবো।

—কিন্তু যারা আমার মতো গরীব তাদের কথা ভাববে না?

পর্মিলি বললে—সে তো আমরা ভাবি। আমরা প্রত্যেক বছরে রেডক্রসের টিকিট কিনি। বাবা কত গরীব লোককে চাকরি করে দেয় তা জানো? ওই যে ব্রজেশ, ও-ও তো গরীব ছিল খুব, ওর চাকরি কে করে দিয়েছিল, জানো? বাবা মাসে মাসে কত টাকা চ্যারিটি করে তার হিসেব কেউ রাখে? আর কংগ্রেস-ফাণ্ডে বাবা কত লাখ টাকা দিয়েছে, তাই বা ক'জনে জানে।

সুরেন চুপ করে রইল। এর কোনও উত্তর তার মুখে যোগালো না।

পর্মিলি বললে—নাঃ, তোমার দেখছি কোনও রস-কষ নেই। তুমি দেখছি কমিউনিস্ট হয়ে গেছ একেবারে! আরে, রাশিয়াতে গিয়ে দেখে এস, কমিউনিস্টরাও ড্রিঙ্ক করছে বোতল বোতল—

সুরেন বললে—তুমি রাগ করছো কেন আমার ওপর? আমি তো রাগের কথা কিছু বলিনি—তোমাদের টাকা আছে, কিন্তু যাদের টাকা নেই, তাদের কথা একটু ভাবতে বলেছি শুধু—

—দূর, তোমার যত সব বাজে কথা—

বলে পর্মিলি উঠে দাঁড়ালো। বললে—তুমি এখন যাও বাপু, যেখানে যাচ্ছ যাও, তুমি রামকৃষ্ণ মিশনে গিয়ে সাধু হও গে যাও—

হঠাৎ নিচেয় গাড়ির আওয়াজ হলো। পর্মিলি বললে—ওই বোধহয় বাবা এসেছে—

সুরেন বললে—তাহলে আমি আসি—

—কাল আসছো তো আবার?

সুরেন বললে—আসতে তো হবেই।

কিন্তু পুণ্যশ্লোকবাবু ততক্ষণে সোজা ওপরে এসে পর্মিলির ঘরে ঢুকলেন। ভারি মানুষ। সিঁড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি উঠতে গিয়ে তখনও হাঁফাচ্ছেন। দম নিয়ে বললেন—এই যে সুরেন, তুমি এখানে?

তারপর পর্মিলির দিকে ফিরে বললেন—সকালবেলা তুমি ঘুমোচ্ছিলে বলে আর ডেকে তুলিনি। কাল কত রাত্তিরে ফিরলে তুমি?

—অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। প্রায় তিনটে—

—অত রাত হলো কেন?

পর্মিলি বললে—অনেক পুরোন ফ্রেন্ডদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, তাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে কারোর আর সময়ের খেয়াল ছিল না—

—মিসেস সরকার কেমন আছেন?

—ভালো, তোমার কথা জিজ্ঞেস করছিল। তুমি যাওনি বলে মিস্টার সরকার খুব দুঃখ করছিল—

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—তুমি বলেছ তো আমার মিটিং ছিল আজকে?

তারপর সুরেনের দিকে চেয়ে যেন নিজের মনের কথাগুলোই বলতে লাগলেন—এ্যাসেম্‌ব্লি খোলার পর থেকে আর কোথাও যেতে পারছি না। সোস্যাল কন্‌ট্যাক্ট্‌ করাও হচ্ছে না। সবাই ভুল বুঝছে আমাকে। কিন্তু কী করে যাই. তুমি বলো? আমি কোন্‌ দিকটা দেখি? সেক্রেটারিরাও কিছু কাজের নয়। সব কাজ আমাকে নিজে দেখতে হয়...

তারপর হঠাৎ যেন সুরেনকে এতক্ষণে এই প্রথম দেখলেন এমনিভাবে বললেন—কী, তোমার খবর কী? তুমি কী পড়লে আজ?

সুরেন বললে—আপনি যে-সব বই পড়তে বলেছিলেন সেইগুলোই শুরু করেছি। যদুনাথ সরকারের 'হিস্ট্রি অব্‌ বেঙ্গল'টা ধরেছি—

--ভেরি গুড্‌ বুক. ভেরি গুড্‌ বুক। দেখ. হিস্ট্রি না পড়লে কিছুই শেখা যায় না। আমি যা কিছু বিদ্যে শিখেছি সব ওই হিস্ট্রি পড়ে! একটু গোড়াকার কথাটা পড়ে নিয়ে মডার্ণ পিরিয়ডে চলে আসবে। মানে যখন থেকে কংগ্রেস সৃষ্টি হলো। অর্থাৎ এইট্টিন্‌ এইট্টি ফাইভে—

সুরেন ঘাড় নেড়ে জানালে—আচ্ছা।

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—যেখানটায় বুঝতে পাববে না, আমাকে জিজ্ঞেস করবে—আমারও অবশ্য সময় কম। সময় যদি থাকতো তো আমি নিজেই তাহলে ..

তারপর বোধহয় হঠাৎ কাজের কথা মনে পড়ে গেল। বললেন—ঠিক আছে, কালকেও ওই রকম সময়ে এসো—হ্যাঁ, ভালো কথা—

বলে একটু থেমে নিয়ে আবার বললেন—তুমি একবার আমার সঙ্গে নিচেয় এসো, একটা কাজ আছে—

বলে ঘরের বাইরে গেলেন। তারপর সিঁড়ি দিয়ে গট্‌-গট্‌ করে নিচেয় নেমে সোজা নিজের ঘরে ঢুকলেন। সুরেনও সঙ্গে সঙ্গে গেল।

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—হরিলোচন, পঞ্চাশটা টাকা বার করো তো, সুরেনকে দিতে হবে—

হরিলোচন মুহুরী আয়রন-সেফ্‌ খুলে পাঁচটা দশ টাকার নোট বার করে সুরেনের দিকে এগিয়ে দিলে।

সুরেন টাকাটা নিয়ে বললে—এ কীসের টাকা?

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—এ্যাড্‌ভান্স। তুমি যে কাজ করবে আমার এখানে, তার এ্যাড্‌ভান্স! নিয়ে নাও। যতই আমরা যা-কিছু বলি, টাকা না হলে কিছুই হয় না হে! ওটা নিতে আপত্তি কোর না—নিয়ে নাও—

সুরেন বললে—কিন্তু এখন তো আমার টাকার অত দরকার ছিল না।

—আরে নাও নাও। এখন তোমার বয়েস কম তাই বুঝতে পারছো না। তুমি তো বিয়ে করোনি?

সুরেন বললে—আজ্ঞে না—

—আগে বিয়ে করো, সংসার হোক. বয়েস হোক, তখন বুঝবে টাকার মূল্য। এখন টাকাব দরকার না থাকে জমিয়ে রাখো। ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্ট খোল। পরে কাজে লাগবে। টাকাটা হলো পাওয়ার। টাকাটা থাকলে পাওয়ার থাকে। এ-যুগে সেইটেই সবচেয়ে বেশি দরকার। পাওয়ার থাকলেই সব থাকলো। যাও, কালকে আবার ঠিক সময়ে এসো। যেটা বুঝতে পারবে না আমাকে জিজ্ঞেস করবে--

সুরেন আর দ্বিধা করলে না। টাকাগুলো পকেটে রেখে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। তারপর ভাবতে ভাবতে রাস্তায় এসে পড়লো। কেমন যেন

অদ্ভুত লাগছিল। এক নতুন অভিজ্ঞতা। এতদিন মা-মণি টাকা দিয়ে গেছে হাত-খরচ হিসেবে। না চাইতেই দিয়ে গেছে। অথচ খরচই বা তার কী? সামান্য বাস-ভাড়া, নয়তো কিছু জামা-কাপড় কেনা। সেটাই মোটা খরচ। কিন্তু এবার যেন আলাদা। প্রথম উপার্জন করা টাকা। এটা ভিক্ষে নয়, দান নয়, দয়া নয়, অনুগ্রহ-করুণা-কৃপা কিছু নয়। নিজের পরিশ্রমের প্রথম ফসল। এর যেন অন্য স্বাদ! রাস্তায় বেরিয়ে চারদিকে চেয়ে সমস্ত কিছু যেন নতুন বলে মনে হতে লাগলো। যেন কলকাতা সহরটাই রাতারাতি বদলে গেছে একেবারে। যেন আরো সুন্দর হয়েছে, আরো পরিষ্কার হয়েছে, আরো পরিচ্ছন্ন হয়েছে—সুরেন নিজের মনের রোমাঞ্চ উপভোগ করতে করতে অন্ধকারের মধ্যেই ফুটপাথ ধরে হাঁটতে লাগলো।

ডাক্তারবাবু এসে দেখে সব ওষুধপত্র লিখে দিয়ে গেছেন। খবরটা জানাজানি হবার পর থেকেই সমস্ত বাড়িটা যেন নিঃঝুম হয়ে গেছে। সারা বাড়িময় একটা চাপা ভয় আবহাওয়াটাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

ভূপতি ভাদুড়ীরই বেশি তাড়া। ধনঞ্জয়কে ডেকে বললে—হ্যাঁরে, ভাগ্নেবাবুকে দেখেছিস?

ধনঞ্জয় বললে—কই, না তো—

সারা বাড়িতে যে এত কান্ড হয়ে গেল, অথচ সে ছোঁড়া কোথায় গেল? তার একেবারে পাত্তাই নেই।

—ঠাকুর, তুমি দেখেছ?

ঠাকুর বললে—হ্যাঁ, ভাগ্নেবাবু তো আজ সকাল সকাল খেয়ে নিয়েই বেরিয়ে গেছে!

—সে কি! সকাল সকাল খেলে কেন? কোনও কাজকর্ম আছে নাকি?

—তা তো আমি জানি না ম্যানেজারবাবু। আমাকে ভাগ্নেবাবু তাড়াতাড়ি ভাত দিতে বললেন, তাই আমিও ভাত বেড়ে দিলাম। কালকেই আমাকে বলে রেখেছিলেন আজ তাড়াতাড়ি ভাত খাবেন—

বুড়োবাবু এতক্ষণ এক কোণে দাঁড়িয়েছিল। ভূপতি ভাদুড়ী চলে যেতেই সামনে এল।

বললে—ঠাকুর, ও ঠাকুর, ম্যানেজারবাবু কী বলছিল গো?

ঠাকুর তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বললে—ও ভাগ্নেবাবুর কথা জিজ্ঞেস করছিল!

—ভাগ্নেবাবুর কথা? তা মা-মণির কথা কিছু বলেনি? শুনলাম ওপরে মা মণির নাকি অসুখ। রক্তারক্তি কান্ড হয়েছে। ম্যানেজারবাবু সে-কথা কিছু বললে না?

ঠাকুরের তখন অনেক কাজ। হাঁড়ি-খুন্তি-বেড়ি নিয়ে ব্যস্ত। বললে—অত আমার শোনবার সময় নেই, শুনলুম কপাল কেটে রক্ত ভেসে গেছে, তাই ডাক্তার এসেছিল—

বুড়োবাবুর মুখটা আরো শুকিয়ে গেল যেন কথাটা শুনে।

বললে—তা কি করে কাটলো বলো তো? কী হয়েছিল? পড়ে গিয়েছিলেন নাকি?

ঠাকুর বিরক্ত হয়ে গেল। কাজের ঝামেলার মধ্যে কেউ বাজে কথা বললে ঠাকুর বড় বিরক্ত হয়। বললে—আমার কাছে আপনি গুজগুজ করছেন কেন? ম্যানেজারবাবুকে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন না—তার কাছে যেতে পারেন না?

বুড়োবাবু বললে—ম্যানেজারবাবু কি সেই রকম লোক গো? নইলে কি আর তোমাকে জিজ্ঞেস করি?

কিন্তু বুড়োবাবুর কথা বোধহয় ঠাকুরের কানে গেল না। তার তখন অনেক কাজ। বুড়োবাবু আব কোথায় যাবে, কাকেই বা জিজ্ঞেস করবে? গামছাটা সামলে নিয়ে চলতে চলতে সামনে যেন কাকে দেখতে পেলে। বললে—কে ওখানে যায় গো? কে?

দুখমোচন নিজের কাজে যাচ্ছিল। বললে—কী?

—দুখমোচন বুঝি? একটা কথা শোন তো বাবা। একটু কাছে এসো না!

দুখমোচন কাছে এল। বুড়োবাবু বললে—তোমার মা মণির কী হয়েছে গো? তুমি কিছু শুনেছ?

দুখমোচন বললে—মা-মণির বেমার হয়েছে—

—শুধু বেমার? তবে যে শুনলুম কপাল কেটে রক্ত-গঙ্গা হয়েছে?

দুখমোচনও কাজের লোক। বললে—তা হবে, আমি কিছু শুনিনি—

—সে কী গো, তোমরা জোয়ান লোক, চোখ-কান ভালো রয়েছে, তোমরা কিছু শুনলে না, আর আমি বুড়োমানুষ হয়ে কী করে শুনলুম? সত্যি বলো না গো, কী হয়েছে? আমি কাউকে বলবো না।

দুখমোচন বিরক্ত হয়ে বললে—এ তো বড় মুশকিল হলো দেখছি, আমি বলছি কিছু জানি না, তবু বুড়ো বলবে কিছু হয়েছে' জ্বালাতন হলো দেখছি—

বুড়োবাবুর কথায় সবাই জ্বালাতন হয়। কেউ বুড়োবাবুর কথা শুনতে চায় না। বুড়োবাবুও যে একটা মানুষ তাও যেন কেউ স্বীকার করে না। যেন বানের জলে ভেসে এসেছে সে। নেহাত খেতে দিতে হয় তাই খেতে দেয়। নেহাত পরতে দিতে হয় তাই একটা গামছা দেয়।

হঠাৎ বুড়োবাবুর কী মনে হলো। খোকাবাবু হয়তো কিছু জানতে পারে! খোকাবাবু তো মা-মণির কাছে যায় মাঝে মাঝে।

খোকাবাবুর ঘরের সামনে গিয়ে বুড়োবাবু ডাকতে লাগলো—অ খোকা-বাবু, খোকাবাবু—

দরজার বাইরে যে তালা ঝুলছে সেটাও তার নজরে পড়ে না। শুধু দরজাটা ঠেলে আর ডাকে—অ খোকাবাবু, খোকাবাবু—

সকাল থেকে বাড়িটা যেন বধির হয়ে রয়েছে বুড়োবাবুর কাছে। কেউ কিছু বলে না, কেউ কিছু উত্তরও দেয় না। তারপর কোথাও কিছু জবাব না পেলে নিজের ঘরের দিকে চলে যায় আস্তে আস্তে। কিন্তু বেশিক্ষণ সেখানেও চুপ করে থাকতে পারে না। আবার খানিকক্ষণ পরে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। তখন বেলা পড়ে এসেছে। কলঘরের কলে তখন জল পড়া বন্ধ হয়েছে। বুড়োবাবুর চোখে তখন সব অন্ধকার ঠেকছে। উঠোনের মধ্যে দিয়ে হাটতে হাটতে আবার এসে দাঁড়ায় সদরে। সদরের গেটের মাথায় তখন আলো জ্বালিয়ে দিয়েছে বাহাদুর সিং।

—অ বাহাদুর সিং, বাহাদুর সিং—

বাহাদুর সিং বললে—কেয়া বুড়াবাবু?

যেন বাহাদুরের গলায় একটু সহানুভূতির ছোঁয়া পেলে বুড়োবাবু।

বুড়োবাবু জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁ বাবা বাহাদুর সিং, তুমি কিছু খবর জানো?

—কেয়া খবর?

—এই মা-মণির নাকি আবার অসুখ করেছে? কপাল কেটে নাকি রক্তগঙ্গা হয়েছে? বুঝলে বাহাদুর, আমি বুড়ো হয়েছি বলে কেউ আমার কথার জবাবও দেয় না। আমি যেন বানের জলে ভেসে এসেছি ভাই, তা আমার কথা তুমি ছেড়ে দাও। আমার রোগ হলে আমি নয় আমার ঘরে মরে পড়ে থাকবো। কিন্তু মা-মণির অসুখ হলে ভাববো না?

বাহাদুর বললে—ঠিক বাত বুড়োবাবু—ঠিক বাত—

—তা ডাক্তারবাবু এসেছিল? তুমি তো গেট্‌মে দাঁড়িয়ে থাকো! তুমি দেখেছ ডাক্তারবাবুকে আসতে?

বাহাদুর বললে—হ্যাঁ হুজুর, দেখেছি—ম্যানেজারবাবু ডাক্তারবাবুকে ডেকে নিয়ে এসেছে। ধনঞ্জয় দাওয়াই নিয়ে এল। সব তো আমি দেখেছি—

—তা ডাক্তার কী বললে তুমি শুনেছ কিছু?

বাহাদুর বললে—না হুজুর, আমি কিছু শুনিনি—

বুড়োবাবু বললে—হ্যাঁ, তা তো বটেই, তুমিই বা শুনবে কী করে? তোমাকেও তো কেউ কিছু বলে না। তুমি কেবল চাকরি করো আর মাইনে পাও, চুকে গেল ল্যাঠা—

হঠাৎ কে যেন একজন ছায়ার মত রাস্তা দিয়ে একেবারে সামনে এল। বললে—কাকাবাবু, আমাকে চিনতে পারেন?

—কে?

বুড়োবাবু অস্পষ্ট দৃষ্টি দিয়ে ভালো করে চেনবার চেষ্টা করতে লাগলো।

লোকটা বললে—আমি সুধন্য! আপনার ভাই-পো—

—সুধন্য, তুই কোত্থেকে? এ্যাদ্দিন পরে? কোথায় ছিলি তুই?

সুধন্য বললে—আমরা আছি কাঁচরাপাড়ায়—

—আয়, আয়, ভেতরে আয়!

বলে সুধন্যকে নিয়ে বুড়োবাবু উঠোন পেরিয়ে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালো।

বললে—এই তক্তপোশটার ওপর বোস। আমার অবস্থা দেখছিস তো?

—তা তুমি গামছা পরে আছ কেন?

বুড়োবাবুর চোখ ভিজে এল। বললে—সেই জন্যেই তো বলছি তোকে, আমার অবস্থাটা দ্যাখ্‌ তুই। এখানে কারো দয়া-মায়া নেই রে। তা তোর বাপ কেমন আছে? দাদা?

—বাবা তো মারা গেছে। মা-ও গেছে গত বছর। আমাদের অবস্থাও খুব খারাপ কাকাবাবু।

—তা তুই কী করছিস?

সুধন্য বললে—আমি আর কী করবো? লেখাপড়া তো কিছু শিখিনি। ভ্যারেন্ডা ভাজি আর উঞ্ছবৃত্তি করি। তা কলকাতায় এসেছিলুম, তাই ভাবলুম কাকার সঙ্গে একবার দেখা করে যাই—

বুড়োবাবু বললে—ভালোই করেছিস, কিন্তু আমার অবস্থা তো নিজের চোখেই দেখছিস, এ্যাদ্দিন পরে এলি, তোকে যে কিছু খেতে দেবো, সে ক্ষমতাও

আমার নেই রে। একটা পয়সাও নেই আমার হাতে।

তারপর একটু থেমে বললে—এই দ্যাখ্ না, আজ শুনছি আবার এ-বাড়ির গিন্নীর মরো-মরো অসুখ...

সুধন্য যেন লাফিয়ে উঠলো। বললে—অসুখ? মরো-মরো অসুখ?

—হ্যাঁ রে সুধন্য, তাই বড় ভাবনায় আছি—

সুধন্য বলে উঠলো—মারা যাবে নাকি? ডাক্তার কী বলছে?

বুড়োবাবু বললে—কে জানে, আমাকে তো কেউ কিছু বলে না—

সুধন্য বললে—তাহলে তো পোয়া বারো কাকা! তাহলে তো কেল্লা মেরে দিয়েছি—

পকেটের মধ্যে টাকাগুলো তখনও সুরেন যেন অনুভব করতে পারছিল। জীবনের প্রথম উপার্জন। পঞ্চাশটা টাকা! পঞ্চাশ টাকা আগেও তার পকেটে এসেছে। মা-মণি বোধহয় বুঝতে পারতো। বলতো—কী রে, তোর টাকার দরকার নেই?

সুরেন বলতো—আমার আর টাকার কীসের দরকার?

—তবু, রাখ তোর কাছে। রাস্তায়-ঘাটে ঘুরিস, কত রকম কাজে লাগতে পারে।

জীবনে বোধহয় ওই একজনই তার দুঃখটা বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু সুরেনের দুঃখের তুলনায় মা-মণি যে কত বড় দুঃখ নিয়ে জীবন কাটিয়েছে তা কি সে তখন জানতো? কে মা-মণিকে দুঃখ দেয়নি? অথচ জিজ্ঞেস করলে বলতো—দূর, আমার আব দুঃখু কীসের? তোরা সবাই সুখে থাক। তোবা সুখে থাকলেই আমার সুখ—

সমস্ত কলকাতায় যখন সবাই নিজের নিজের উন্নতি-অবনতি, সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে পাগল তখন মা-মণি তাদের নিয়েই সুখী। আস্তে আস্তে ক্যাশ-বাক্সটা খুলে কয়েকটা দশ টাকাব নোট বার করে দিত। গুণেও দেখতো না কত দিলে।

বলতো—নে নে, যা পাচ্ছিস নিয়ে নে—কাউকে যেন বলিস নে—

সুরেন বলতো—কিন্তু মা-মণি, তুমি যে এমন করে টাকা ওড়াচ্ছো, শেষে যদি তোমার কম পড়ে?

মা-মণি হাসতো। বলতো—শেষ আর কবে হবে রে, এই-ই তো শেষ। আমি তো শেষ হয়েই গেছি। আমি কি আর আছি? আমি নেই—

সুরেন বলতো—ও-কথা তুমি বোল না, তুমি না-থাকলে আমরাও যে থাকবো না—

মা-মণি বলতো—না রে সুরেন না তোর জন্যে আমি সব ব্যবস্থা করে যাবো। তোর কখনও কোনও কষ্ট হবে না—

সুরেন বলতো—ও-কথা বোল না তুমি মা-মণি! তুমি ভেবেছ আমি বুঝি শুধু টাকার জন্যেই তোমাকে ভালবাসি?

—তুই আমাকে তাহলে ভালোবাসিস?

সুরেন বলতো—বা রে, ভালবাসি না?

মা-মণির মুখটা হঠাৎ কেমন যেন গম্ভীর হয়ে যেত তখনি। বলতো—আমাকে কেউ ভালোবাসে না রে! সবাই আমার টাকাটাই কেবল দেখে। আমাকে কেউ দেখে না!

সুরেন বলতো—কেন, আমি তো দেখি! আমায় তুমি টাকা দিও না মা-মণি! আমার দরকার নেই তোমার টাকায়। টাকা না দিলেও আমি তোমায় দেখবো।

মা-মণি বলতো—আমি তা জানি—সেই জন্যেই তো তোকে এত ভালবাসি, তা জানিস—

কিন্তু আশ্চর্য, মা-মণি সব জেনেও যে কেন অমন অন্ধ হয়ে থাকতো কে জানে! মা-মণি জানতো যে তার অনেক টাকা। অনেক টাকা থাকার জন্যে সবাই তাকে মেনে চলতো। তবু যে কেন সবাইকে অত টাকা দিত কে জানে! টাকা ছাড়া যখন আর কিছু ছিল না মা-মণির তখন টাকাটা আঁকড়ে ধরে রাখলেই পারতো! অন্ততঃ সংসারী লোকরা তো তাই-ই করে। তাহলে?

বাড়ির কাছে আসতেই কেমন অবাক হয়ে গেল সুরেন।

বাহাদুর দাঁড়িয়ে ছিল রোজকার মত। সুরেন জিজ্ঞেস করল—বাহাদুর, বাড়িতে কী হয়েছে? এত আলো জ্বলছে কেন চারদিকে?

বাহাদুর বললে—মা-মণির বেমার হয়েছে—

অসুখ! মা-মণির অসুখ? সুরেনের মাথাটা যেন ঘুরে গেল। বহুদিন আগে একবার অসুখ হয়েছিল মা-মণির! সেদিনও বড় ভয় পেয়েছিল সুরেন। মৃত্যু মানে যে কী তা সুরেন জানে। বাবার মৃত্যু দেখেছে সে। মা-ও তার চোখের সামনে মারা গেছে। সেদিনও যেমন নিঃসঙ্গ মনে হয়েছিল নিজেকে, আজও ঠিক তেমনি মনে হলো। মনে হলো, সে বুঝি আবার মাতৃহারা...

ধনঞ্জয় অন্দর-মহলের সিঁড়ি দিয়ে নিচেয় নামছিল।

সুরেন জিজ্ঞেস করলে—ধনঞ্জয়, কোথায় যাচ্ছ?

ধনঞ্জয় যেন তখন খুব ব্যস্ত। বললে—ওষুধ আনতে যাচ্ছি ডাক্তারখানায়—

—কেমন আছে মা-মণি এখন?

ধনঞ্জয় বললে—সেই একই রকম?

—কখন অসুখটা হলো? কী হয়েছিল?

ধনঞ্জয় বললে—সুখদা দিদিমণির সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল।

—কেন? কী হয়েছিল আবার?

ধনঞ্জয় বললে—তা জানিনে. মা-মণি দিদিমণির ওপর রাগ করে দেয়ালে কপাল ঠুকে একেবারে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়েছে।

আর বেশি কথা বলবার সময় ছিল না। ধনঞ্জয় বাইরে চলে গেল।

—ও খোকাবাবু!

বুড়োবাবুর গলা শুনে সুরেন পেছন ফিরলো।

—মা-মণির কী হয়েছে শুনেছ তো খোকাবাবু?

সুরেন দেখলে বুড়োবাবুর পাশে কে আর একজন দাঁড়িয়ে রয়েছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকে দেখছে।

বুড়োবাবুর চোখ দুটো যেন ছলছল করছিল। বললে—আমাকে তো কেউ ভেতরে যেতে দেয় না খোকাবাবু, কাউকে জিজ্ঞেস করলেও কেউ কিছু বলে না। আমি যেন একটা মানুষই নই, বুঝলে? তা বুড়োমানুষ বলে কি আমার প্রাণ বলে একটা বস্তু নেই? সকাল থেকে আমি ছটফট করছি, কেউ কিছু বলছে না—

সুরেন বললে—আমি তো এখন বাড়িতে এলুম, ধনঞ্জয়ের মুখ থেকে সব শুনলুম। আমিও কিছু জানতুম না—

—কিন্তু কি হয়েছিল বলো তো?

সুরেন বললে—ধনঞ্জয়ের কাছে এখুনি শুনলুম দেয়ালে কপাল ঠুকে রক্ত-গঙ্গা বইয়ে দিয়েছে!

—তা দেয়ালে কপাল ঠুকতে গেলেনই বা কেন?

সুরেন বললে—ওই বলে কে! সুখদার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে তো কী হয়েছে। চুপ করে থাকলেই হয়। সুখদার এখন মাথার ঠিক নেই, তার কথায় কি এখন কান দিতে আছে? আপনিই বলুন?

বুড়োবাবু বললে—ওই তো, বড় রাগী মানুষ যে! মা-মণি বরাবর রাগী মানুষ—

সুরেন বললে—তা আপনি তো জানবেনই, আপনি এ-বাড়িতে আমার চেয়ে কত আগে থেকে আছেন!

বুড়োবাবু বললে—হ্যাঁ, তুমি তো খোকাবাবু সেদিন এলে। রেগে গেলে মা-মণির আর জ্ঞান থাকে না।

সুরেন বললে—কিন্তু আমার সামনে তো কোনও দিন রাগতে দেখিনি মা-মণিকে! মা-মণির মেজাজ তো কখনও চড়তে দেখিনি আমি—

বুড়োবাবু বললে—দোষ তো মা-মণির নয় খোকাবাবু! দোষ তো অন্য লোকের। তারা যে মা-মণির মেজাজ খারাপ করে দেয়। তুমি একটু দেখে এসো খোকাবাবু, আমি এখানে দাঁড়িয়ে রইলুম—

—আপনি দাঁড়িয়ে থাকবেন কেন? আমি আপনার ঘরে গিয়ে বলে আসবো।

অচেনা ভদ্রলোকটি তখনও পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

সুরেন জিজ্ঞেস করলে—ইনি কে? এঁকে তো আগে কখনও দেখিনি—

ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বললে—ইনি আমার কাকা, আমার নাম সুধন্য দত্ত—

কাকা! কাকা শুনে যেন চমকে উঠলো সুরেন। বুড়োবাবুর তাহলে আপন বলতে কেউ আছে সংসারে! অথচ এতদিন জানা ছিল না। ভদ্রলোকের মুখের দিকে ভালো করে চেয়ে দেখলে সুরেন। চেহারার আদলে কোথায় যেন একটা মিল আছে দুজনের মধ্যে।

সুরেন বললে—এতদিন তো আপনাকে কখনও দেখিনি—

সুধন্য দত্ত বললে—দেখবেন কী করে? আমি কি আগে কখনও এসেছি এখানে যে দেখবেন আমাকে!

সুরেন বললে—এখন তো দেখছেন কী অবস্থার মধ্যে কাটাচ্ছেন আপনার কাকা?

—তা তো দেখছি।

সুরেন বললে—একটা গেঞ্জি পর্যন্ত পায় না বুড়োমানুষটা। আমি অনেক-বার ভেবেছি বুড়োবাবুকে একটা গেঞ্জি কিনে দেবো, কিন্তু আবার ভেবেছি তাতে যদি হিতে বিপরীত হয়!

সুধন্য দত্ত বললে—কেন, বুড়োমানুষকে গেঞ্জি কিনে দিলে কে কী বলবে?

সুরেন বললে—এ-বাড়ির মধ্যে অনেক রকম কান্ড চলছে, আপনি ঠিক সব জানেন না তো! তাতে ওর ওপর অত্যাচার আরো বেড়ে যাবে—

সুধন্য দত্ত বললে—কাকার মুখ থেকেও তাই শুনলুম সব—

সুরেন বললে—উনি যে কেন এখানে থাকেন কে জানে! আপনি কাকাকে

নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রাখতে পারেন না? সেখানে থাকলে আর এত হেনস্থা হতো না—। দেখছেন না এই ছেঁড়া গামছা পরে সারা দিন ঘুরে বেড়াচ্ছেন, শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা সব এই রকম করে কাটাচ্ছেন। সবাই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে মানুষটাকে। আপনি ভাইপো থাকতে এটা কি ভাল?

সুধন্য দত্ত বললে—কিন্তু আমার অবস্থাও তো ভাল নয়—

সুরেন বললে—তা এখানে যেমন আছেন তার চেয়ে তো ভাল থাকবেন—

সুধন্য দত্ত বললে—কিন্তু আমার ওখানে মাথা গোঁজবার ঘরই নেই যে। সে একেবারে বলতে গেলে একটা বস্তি-বাড়ি। একখানা মাত্তের ঘর। সেই এক-খানা ঘরে বউ, ছেলেমেয়ে নিয়ে মাথা গুঁজে থাকি, সেখানে কাকাকে শুতে দেবো কোথায়?

তা বটে! সুরেনও ভেবে দেখলে এখানে তবু একটা আলাদা ঘর পেয়েছে বুড়োবাবু। সেখানে তাও যে নেই।

—তারপর আজকাল জিনিসপত্তোরের যে দাম বেড়েছে, এতে তো বেঁচে থাকাই দায় হয়ে উঠেছে, এর পর তো আমাদের মতন সাধারণ লোকদের উপোষ করতে হবে।

সুরেন বললে—এখন আমার বেশি সময় নেই কথা বলবার, তাই, নইলে বুড়োবাবুর সব কথা আপনাকে খুলে বলতাম। পেট ভরে এখন দুমুঠো খেতেও পায় না বুড়োমানুষটা।

সুধন্য দত্ত বললে—আপনি আছেন, আপনি তবু যতটা পারেন দেখুন—

সুরেন বললে—আমার আর এখানে কতটুকু ক্ষমতা আমি কে? আমি তো এ-বাড়ির কেউই না। আমিও তো বাইরের লোক একজন—জিজ্ঞেস করুন না বুড়োবাবুকে! এ বাড়ির যিনি ম্যানেজার, তিনি আমার মামা। আমি সেই সুবাদে এখানে থাকি, আর কিছু নয়—

সুধন্য দত্ত বললে—তাহলে এখন চলি, রাত হয়ে গেল—

সুরেন বললে—আপনি আবার আসবেন, আর যদি পারেন তো কাকার জন্যে একটা গামছা কি একটা গেঞ্জি নিয়ে আসবেন—

সুরেন নমস্কার করে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল। অনেক দেরি হয়ে গেছে। মা-মণির অবস্থাটা দেখবার জন্যে তখন মনটা ছটফট করছে।

সুধন্য দত্ত বললে—ছেলেটা ভালো মনে হচ্ছে কাকা—

বুড়োবাবু বললে—হ্যাঁ রে, ছেলেটা ভালো—

—তা এতই যদি ভালো তো তোমাকে একটা ধুতি কি গেঞ্জি কিনে দিতে পারে না?

বুড়োবাবু বললে—আরে, ও কী করবে? ওর টাকা কোথায়? ও তো চাকরি-বাকরি কিছু করে না এখনও, ও টাকা কোত্থেকে পাবে?

—তুমি থামো, ইচ্ছে থাকলে দেওয়া যায়। ওর মামাই তো ম্যানেজার, ও মামাকে বলে তোমাকে জামা-কাপড়—হাত খরচের টাকা, কিছু দিতে পারে না? আচ্ছা, ঠিক আছে।

যেন সুধন্য কী মতলব ভাঁজলে নিজের মনে। বললে—ঠিক আছে! আর তো বেশি দিন নয়, এবার দেখে নেব। বুঝলে কাকা, তুমি কিছু ভেবো না।

ততক্ষণে সদর গেটের কাছে এসে গিয়েছিল দুজনে।

সুধন্য দত্ত পেছন ফিরে আর একবার বাড়িটা ভালো করে দেখলে। বেশ খুঁটিয়ে-খুঁটিয়েই দেখতে লাগলো। বললে—তা এক বিঘে জমি আছে সবটা

মিলে, কী বলো কাকা? এখানকার জমির দাম এখন কত করে? কাঠা পিছু পনেরো হাজার টাকা হবেই কম করে—

বুড়োবাবু কিছু উত্তর দিলে না।

সুধন্য তখনও দেখছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। তখনও যেন মনে মনে হিসেব করছে। এ তো একটা বাড়ি। শুধু বসত-বাড়ি এটা। এ-ছাড়াও তো আরো বাড়ি আছে। আর ক'খানা বাড়ি আছে শম্ভু চৌধুরীর? আরো সাতখানা? সেগুলোও কি এত বড় বড়?

বুড়োবাবু এ-সব নিয়ে কখনও মাথা ঘামায়নি। অত ভাবতে গেলে বুড়োবাবুর মাথা ঘুরে যায়। কিন্তু সুধন্যর মাথায় তখন অনেক মতলব ঘুরছে। অনেক জটিল হিসেব করছে মনে মনে। অনেক যোগ, অনেক বিয়োগ। অনেক গুণ, অনেক ভাগ। যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগের মধ্যে তলিয়ে গিয়েছে সে। আর সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করে ফেলেছে সব।

তারপর চলে যাবার আগে বললে—তাহলে আমি চলি কাকা। তোমার জন্যে আমি এবার একটা গেঞ্জি নিয়ে আসবো। তুমি আর গামছা পরে থেকো না, আমি তোমার জন্যে ধুতি এনে দেবো—

বলে সুধন্য চলে গেল।

কিন্তু জীবনের বিচিত্র পথ-পরিক্রমার খবর যারা রাখে তারা জানে যে, সুধন্য দত্তরা যখন একবাব এসে হাজির হয়, তখন সহজে তারা যায় না। তারা ঠিক সময়েই আসে আর ঠিক সময়েই তারা বিপর্যয় বাধিয়ে দেয়।

কিন্তু সে সব কথা এখন থাক। বড় উপন্যাসে সে-কথা বলবাব একটা যথা-স্থান আছে। সে-ঘটনা তখনই বলবো। এই যে সুরেন একদিন গ্রাম থেকে এসে সহরে ঢুকেছিল, এর মধ্যে তার সৃষ্টিকর্তার তো একটা গভীব উদ্দেশ্যও ছিল। কিন্তু কী সে উদ্দেশ্য? সে কি জীবনের মহাযাত্রা, না জীবন-পরিক্রমা? এই পরিক্রমা দেখেই বা তার কি লাভ হলো?

লাভের কথা মনে হলেই সুরেনের হাসি পেত। কাকে বলবে সে লাভ, আর কাকে বলবে লোকসান? টুলুর কথাই ধরা যাক। কীসের আশায় টুলু জীবনের পেছনে ছুটেছিল? কেন দেবেশ ঘর-বাড়ি ছেড়ে পার্টি-অফিসে জীবন কাটাতো? পর্মিলির জীবনেরই বা উদ্দেশ্য ছিল কী? পুণ্যশ্লোকবাবু কার জন্যে সংসার থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে মিনিষ্টার হয়েছিলেন? দেশের, না নিজের জন্যে?

মা-মণির ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সুরেন এই কথাগুলোই ভাবছিল। সমস্ত আবহাওয়াটাই নিঝুম, নিস্তব্ধ। মা-মণির মাথাটা ব্যাণ্ডেজ দিয়ে বাঁধা। চোখ দুটো ভাল করে দেখা যায় না। বাকি মুখখানা দেখে বোঝা যায় মা-মণি অঘোরে ঘুমোচ্ছে। কিন্তু ওষুধে সারা শরীর যেন আচ্ছন্ন হয়ে আছে। মাথার কাছে তরলা বসে। পায়ের কাছে বাদামী। সকলেই যেন আতঙ্কে মুহ্যমান। বাইরের দিকে পেছন ফিরে মামা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। সুরেন কাছে যেতেই সবাই তার দিকে ফিরে চেয়ে দেখলে। কিন্তু কারো মুখে কোনও কথা নেই।

সুরেন অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। কী বলবে সে? কার সঙ্গেই বা কথা বলবে? অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আকাশ-পাতাল পরিক্রমা করতে লাগলো। এই তো জীবন। যে-জীবনের একটা আরম্ভ আছে, সে-জীবনের শেষও আছে। সেই শেষ পরিচ্ছেদ এই। এই ভাবেই মানুষকে শেষ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত করতে হয়। এই-ই বোধহয় জীবনের পরিণতি! অথচ এরই জন্যে মানুষ কত

ভালবাসার জয় ঘোষণা করে, কত শত্রুতার আশ্রয় নেয়। মা-মণির মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে মা-মণিরই কত কথা মনে পড়তে লাগলো। এই মাধব কুণ্ডু লেনের বাড়িতে এই যে সে এতদিন রয়েছে, এও তো সম্ভব হয়েছে মা-মণির জন্যেই! মা-মণির আকর্ষণ না থাকলে কবে সে অন্য কোথাও চলে যেত নিরুদ্দেশ হয়ে। তাকে কেউ আর এই বাড়িটার চৌহদ্দির মধ্যে ধরে রাখতে পারতো কি!

সুরেনের চোখ দুটো আস্তে আস্তে ভিজে এল। আর দাঁড়াতে পারলো না সেখানে। তারপর সেখান থেকে সে বেরোল। ঘরের সামনে লম্বা বারান্দা। বারান্দা দিয়ে সোজা দক্ষিণ দিকে চলতে লাগল পায়ে পায়ে। একেবারে শেষ প্রান্তে সুখদার ঘর। এত লোক মা-মণির কাছে রয়েছে, আর সুখদা কেন পড়ে রয়েছে তার নিজের ঘরে। তার কি কোনও মায়া-দয়া নেই। সুখদা কি জানে না যে মা-মণির বয়েস হয়েছে। মা-মণি আশা-আকাঙ্ক্ষার ঊর্ধ্বে উঠে গেছে। কেন সুখদা মা-মণির সঙ্গে ঝগড়া করতে গেল। মা-মণিকে কষ্ট দিয়ে কী আনন্দ সে পেল!

সুখদার ঘরের সামনে এসে দাঁড়াতেই কেমন যেন তার একটু দ্বিধা এল। সুখদা এখন নিশ্চয়ই তার ঘরে আছে! কিন্তু সুখদার সঙ্গে দেখা করে সে কী বলবে! সুখদাকে দুটো কড়া কথা শোনাবে? কিন্তু কড়া কথা শোনাবার সে কে? সুখদাকে কড়া কথা শোনাবার অধিকার কি তার আছে?

দরজাটা ভেজানো ছিল। সুরেন আর দু'পা এগিয়ে জানালার সামনে গেল। কিন্তু ঘরের ভেতরে অন্ধকার। বাইরে থেকে ভেতরের কিছু আভাস পাওয়া গেল না। সুরেন আর দাঁড়ালো না সেখানে। দেখা করে কী-ই বা হতো। কী-কথাই বা শোনাতো! হয়ত রাগের মাথায় একটা কিছু কটুকথা বেরিয়ে আসতো মুখ দিয়ে। তখন হয়ত অনুশোচনা রাখবার আর জায়গা পেত না। তার চেয়ে এই ভালো। দেখা না করাই ভালো। যেমন নিঃশব্দে সে এসেছে, তেমনি নিঃশব্দে চলে যাওয়াই ভালো।

সুরেন আবার বারান্দা পেরিয়ে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো। মা-মণির ঘরে যারা ছিল তারা তখনও তেমনি দাঁড়িয়ে ছিল উদ্‌গ্রীব আগ্রহে। ধনঞ্জয় ওষুধ আনতে গিয়েছে। সেই ওষুধ এলে না-খাওয়ানো পর্যন্ত থাকবে।

সিঁড়ি দিয়ে এক-এক ধাপ করে নামতে নামতে আবার সেই কথাগুলোই ভাবছিল। কী করবে সে! এখন তার কী কর্তব্য! তার নামে মা-মণি সমস্ত সম্পত্তি উইল করে দিয়ে গেছে। এই বাড়ির একদিন সে মালিক হবে। একদিন তাকে আর নিচের একতলার ঘরে শুয়ে রাত কাটাতে হবে না। মা-মণি যেখানে শুয়ে আছে ওইখানেই সে একদিন শোবে। তারই হুকুম মেনে সবাই চলবে। আর শুধু এ-বাড়িই নয়, এই রকম আরো সাতখানা বাড়ি। নিশ্চিন্ত নিরাপদে জীবন কাটাবার মত সম্পত্তির মালিক হবে সে। কেউ কেড়ে নিতে পারবে না তার সেই অধিকার। ভাগ্যের দেওয়া অধিকার পেয়ে সে সম্রাট হয়ে বসবে একদিন, এই-ই তার বিধিলিপি! তাকে অর্জন করতে হলো না, পরিশ্রম করতে হলো না, কোনও রকম অন্যায় দখলদারি হতে হলো না, এক অমোঘ যাদুদণ্ডের ছোঁয়ায় সে জীবনের মসনদে সুলতান হয়ে বসলো। এর চেয়ে আশ্চর্যের আর কী আছে জীবনে! আজ যে পুণ্যশ্লোকবাবুর কাছে গিয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়াতে হয়, তখন আর তাকে তা করতে হবে না। সুব্রত এত টাকা-পয়সা খরচ করে আমেরিকায় গিয়ে লেখাপড়া শিখে এসে যা করবে, এখানে এই কলকাতায় বসে বিনা পয়সায় বিনা পরিশ্রমে সে তাই-ই করবে। কিংবা তার চেয়ে বেশি সম্পত্তির মালিক হয়ে যাবে!

তা হলে?

তা হলে কীসের জন্যে এত লেখাপড়া, এত পরিশ্রম, এত সংগ্রাম? তথাগত বুদ্ধদেব তো রাজার ছেলে, তবে কেন তিনি সব ছেড়ে দিয়ে নিরুদ্দেশ-ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েছিলেন! তাঁরা কি মানুষ নন? মানুষের কামনা-বাসনা যা কিছু থাকে, সবই তো তাঁদের ছিল! তাঁরা কীসের লোভে সংসার-ঐশ্বর্য-স্ত্রী-পুত্র ছাড়লেন? ছাড়তে পারলেন? এই সাংসারিক সুখ-বিলাস-বৈভবের ওপরে আরো বড়, আরো মহৎ কোথাও নিশ্চয় কিছু আছে! সেটা কী?

তবে হয়ত তাঁরা কেউই মানুষ নন, দেবতা!

কিন্তু দেবতা বললেই তো যুক্তি এড়ানো যায় না। দেবতা হলেও মানুষের মায়া-মমতা, নীচতা-হীনতা সবই তো তাঁদের ছিল এককালে! সব কিছুকে তাঁরা জয় করতে পেরেছিলেন বলেই না তাঁরা দেবতার পর্যায়ে উঠেছেন! কই, সারা কলকাতায় তো একটা মূর্তিমান দেবত্বও নজরে পড়লো না তার। দেবত্বের কথা দূরে থাক, একটা মানুষও তো চোখে পড়লো না, যে সম্পূর্ণ মনুষ্যত্বের অধিকারী হয়ে বলতে পারলে—যে নাহং নামৃতা স্যাম কিমহম তেন কুর্যাম্। যা নিয়ে আমি অমৃত হতে পারবো না তা নিয়ে আমি কী করবো?

আস্তে আস্তে নিচের দিকে নেমে আসছিল সুরেন। মনের মধ্যের যে মন, সে বড় বিব্রত হয়ে পড়েছিল এই মা-মণির অসুখের বিপর্যয়ে।

—শোনো!

হঠাৎ ডাকটা শুনেই সমস্ত ভাবনার জাল ছিঁড়ে-খুঁড়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। ডাকটা লক্ষ্য করে তাড়াতাড়ি পেছন ফিরতেই দেখলে সিঁড়ির মুখে তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে সুখদা।

সুরেন ভালো করে তার মুখের দিকে আবার চেয়ে দেখলে। সে মুখের মানে বোঝবার চেষ্টা করলে খানিকক্ষণ। তারপর বললে—কী?

হঠাৎ যেন কোনও উত্তর বেরোল না সুখদার মুখ দিয়ে।

সুরেন সেখানে দাঁড়িয়েই জিজ্ঞেস করলে—কিছু বলবে তুমি?

সুখদা বোধহয় চায়নি যে কেউ তার কথা শুনুক। আস্তে আস্তে সিঁড়ির মাঝামাঝি পর্যন্ত নেমে এল। একেবারে সুরেনের মুখোমুখি।

বললে—ওপরে এসো, কথা আছে তোমার সঙ্গে—

সুরেন অবাক হয়ে গেল সুখদার কথা শুনে। এমন কী কথা আছে যা শোনবার জন্যে সুখদার সঙ্গে তাকে আবার ওপরে যেতে হবে।

সুখদা নিঃশব্দে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে তার নিজের ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকলো। সুরেনও চলছিল তার পেছন-পেছন।

ঘরের ভেতরটা অন্ধকার ছিল। সুখদা আলো জ্বালিয়ে বললে—এসো—বোস—

সুরেন কিন্তু বসলো না। এত যখন ভণিতা তখন কিছু গুরুতর উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আছে সুখদার মনে।

সুখদা বললে—কই, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বোস—

সুরেন বললে—তুমি কী বলবে বলো না, আমি দাঁড়িয়েই শুনতে পারবো—

সুখদা বললে—দাঁড়িয়েই যদি শুনতে পারবে, তাহলে ঢং করে আমার ঘরের কাছে এসেছিলে কেন? কী বলতে এসেছিলে তখন?

সুরেন বুঝতে পারলে সুখদা তার আসার খবরটা টের পেয়ে গেছে।

—আর যদি এলেই তো ডাকলে না কেন?

সুরেন বললে—মা-মণির মাথায় খুব চোট লেগেছে তা জানো তো?

—তা তো জানি। মানুষ যদি ইচ্ছে করে নিজের মাথায় ঘা লাগায় তো কে কী করতে পারে? তা তুমি কি সেই কথা বলবার জন্যেই চুপি চুপি আমার ঘরে এসেছিলে?

সুরেন বললে—মিথ্যে কথা বোল না। আমি তোমার ঘরে আসিনি। ঘরের বাইরে এসে দাঁড়িয়ে ছিলুম।

—ও একই কথা। ইচ্ছে ছিল আমার ঘরে ঢুকবে, কিন্তু সাহসে কুলোয়নি।

সুরেন বললে—না, তাও না। অনুমতি না নিয়ে কারো ঘরে ঢোকা আমি অন্যায় মনে করি। তাই ঢুকিনি। আর তা ছাড়া তুমি কী করে ভাবতে পারলে আমি তোমাকে না জানিয়ে তোমার ঘরে ঢুকবো? আমি কি এতই নীচ?

সুখদা শুধরে দিয়ে বললে—নীচ নয়, বোকা!

সুরেন বললে—আমাকে তুমি যা-ইচ্ছে-তাই গালাগালি দিলেও আমি তোমায় কিছু বলবো না। আমার স্বভাব জানলে তুমি আর আমায় এ-কথা বলতে না।

—কিন্তু বোকাই হও আর যা-ই হও, মা-মণিকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে তার কাছ থেকে টাকা আদায় করবার সময় তো বুদ্ধির অভাব হয় না। তার বেলায় তো বেশ নিজের কোলে ঝোল টানতে পারো।

সুরেন বললে—তোমার এ-কথার জবাব আমি দেবো না।

সুখদা বললে—ঠিকই তো। এ-কথার জবাব তুমি দেবে কেন? তাতে যে হাটে হাঁড়ি ভেঙে যায়।

সুরেন এবার একটু গলাটা চড়ালো।

বললে—তা বলে তুমি এমনি করে মা-মণির জীবন নিয়ে খেলা করবে?

সুখদা বললে—মা-মণির ওপর তোমার অত টান তো ভালো নয়। তুমি কোথাকার কে যে মা-মণির হয়ে এত ভাবছো?

সুরেন বললে—তা তুমি কি এইসব কথা বলবার জন্যেই আমায় ডেকে এনেছিলে?

সুখদা বললে—না, দাঁড়াও, চলে যেও না। তোমার সঙ্গে আমার আরো অনেক বোঝাপড়া আছে।

সুরেন বললে—যা বলবার শিগ্‌গির বলো।

সুখদা বললে—তুমি জানো আমার বিয়ে হয়ে গেছে—

সুরেন বললে—তা তো জানি, কিন্তু তাতে কী?

সুখদা বললে—আমি চাই না যে তুমি আমার সংসার জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে।

—তার মানে!

সুরেন অবাক হয়ে চেয়ে রইল সুখদার দিকে। বললে—বলছো কী তুমি? আমি তোমার সংসার জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দেবো?

সুখদা বললে—হ্যাঁ—ঠিকই বলছি—

সুরেন বললে—কিন্তু আমি তো তোমার কথা কিছু বুঝতে পারছি না। তুমি বিয়ে করেছ কি সংসার করছো, তার সঙ্গে আমার কীসের সম্পর্ক? আমি তো তোমার কিছুর মধ্যেই নেই! আমি তোমার কী করেছি যে আমার সঙ্গে তুমি বরাবর এমন ব্যবহার করো! সেই যেদিন প্রথম এসেছি, সেইদিন থেকেই দেখেছি তুমি আমার ওপর খুশী নও। যেন আমি তোমার কোনও ক্ষতি করেছি! সত্যি করে বলো তো, আমি তোমার কী ক্ষতি করলুম?

সুখদা তার মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ।

তারপর বললে—কেন, তুমি জানো না কিছু? তোমার চোখ নেই?

সুরেন বললে—তুমি কী বলছো সুখদা, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। সত্যি বলছি, কিছুই আমার মাথায় আসছে না।

—মাথায় আসছে না তো কেন আমি নিজের মুখ পোড়ালুম? কেন আমি নিজের হাতে বিষ নিয়ে মুখে পুরে দিলুম? সুখে থাকতে কেন আমার এ দুর্মতি হলো? বলো, কেন আমি এমন করে আত্মঘাতী হলুম? কার জন্যে? কার ওপর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে নিজের ওপর আমি এমন সর্বনাশ করলুম? বলো. বলো তুমি, উত্তর দাও—

বলতে বলতে সুখদা যেন পাগলের মতন সুরেনের সামনে এসে তার গলার কাছে জামাটা চেপে ধরলে।

সুরেন ভয় পেয়ে দু'পা পিছিয়ে আসবার চেষ্টা করলে।

বললে—ছাড়ো ছাড়ো. করছো কী? করছো কী?

সুখদার তখন বোধহয় আর কাণ্ডজ্ঞান নেই। বললে—বলো, উত্তর দাও, আমার কথার জবাব দাও। জবাব না দিলে তোমায় আমি ছাড়বো না—তোমায় জবাব দিতেই হবে।

বলে গলার কাছে জামাটা আরো জোরে চেপে ধরলে!

সুরেন বললে—তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? কী করছো তুমি, ছাড়ো—

—না, ছাড়বো না। তুমি আমার কথার জবাব দাও আগে!

সুরেন বললে—কী মুশকিল! ওদিকে মা-মণির ঘরে যে সবাই রয়েছে। ওরা যে শুনতে পাবে! ছাড়ো।

সুখদা তখনও সেই রকম করে আঁকড়ে ধরে আছে জামাটা।

বললে—শুনুক। শুনুক সবাই। সবাই জানুক—

—জানুক মানে? জানতে পারলে যে সবাই বদনাম দেবে তোমাকে। তোমাকেও বদনাম দেবে. আমিও সে-বদনাম থেকে রেহাই পাবো না—

সুখদা হাসলো।

বললে—বদনামের ভয় দেখাচ্ছ তুমি আমাকে? বদনামের আর বাকিটা কী আছে শুনি যে, আমি ভয় করবো? মাতাল নিয়ে ঘর করলুম এত বছর, কালীঘাটে গিয়ে মাথায় সিঁদুর দিলুম, এর পরেও ভয়?...তুমি ভয় পেয়েছ তাই বলো! তা তোমার বদনাম হওয়াই উচিত।

সুরেন সত্যিই ভয় পেয়ে গেল। এতক্ষণে যেন সন্দেহ হলো সুখদা মদ খেয়েছে। কালীকান্ত বিশ্বাসের সঙ্গে থাকতে থাকতে সুখদাও মদ খেতে শিখেছে।

বললে—একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?

—বলো! কী কথা?

—তুমি কি নেশা করেছ?

—নেশা!

সুখদা সোজা চোখ তুলে চাইল সুরেনের দিকে। তারপর হাসতে হাসতে আবার বললে—নেশা? ঠিক বলেছ! খুব ভালো কথাই বলেছ! নেশা করলে মানুষের যে কী রকম মতি-গতি হয় তা আমার চেয়ে কেউ আর ভালো করে জানে না। হ্যাঁ, আমি নেশাই করেছি—

বলে হাসতে লাগলো সুখদা হা-হা করে।

তারপর একটু হেসে আবার বলতে লাগলো—তোমার মুখে এ-কথা শুনবো এ আমি জানতুম। কিন্তু নেশাই যদি না করবো তাহলে এমন করে তোমার গলা আঁকড়ে ধরতে পারি? এই রকম করে নির্লজ্জের মত তোমায় আমার ঘরে টেনে আনতে পারি?

সুরেন বললে—থামো!

সুখদা বললে—কী বলছো? থামবো?

সুরেন বললে—হ্যাঁ, থামো। একটা কেলেঙ্কারি না করে দেখছি তুমি ছাড়বে না!

সুখদা আবার হাসতে লাগলো।

বললে—কেলেঙ্কারির কি আরো কিছু বাকি আছে? যেটুকু কেলেঙ্কারির বাকি আছে সেটুকুও না হয় আজ সেরে ফেলি!

সুরেন বললে—নাঃ, দেখছি সেই তুমি আমাকে তোমার গায়ে হাত দেওয়াবে!

—কেন, আমার গায়ে হাত দিতে কি তোমার ঘেন্না করে?

সুরেন এক ঝট্‌কা দিয়ে সুখদাকে ঝেড়ে ফেলে দিতে চেষ্টা করলে। কিন্তু সুখদা যেন বাঘের মত তার থাবা দিয়ে তাকে আঁকড়ে ধরে আছে!

—শেষবারের মত বলছি, ছাড়ো!

সুখদা বললে—ছেড়ে দেবার জন্যে তো তোমাকে ডেকে আনিনি। কেন, ছাড়বো কেন? আমাকে কি তোমার ভালো লাগে না? আমি কি এতই খারাপ দেখতে?

—সুখদা!

সুখদাও সোজা হয়ে মুখ তুলে দাঁড়ালো। বললে—আমাকে ভয় দেখাচ্ছ তুমি?

সুরেন বললে—হ্যাঁ, ভয় দেখাচ্ছি। লজ্জা -সরমেরও একটা মাত্রা আছে।

সুখদা বললে—লজ্জা-সরম থাকলে কি আর মেয়েমানুষ হয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে লুকিয়ে একটা পাঁড় মাতালকে বিয়ে করি—

সুরেন বললে—কিন্তু, কেন? সেই কথাই তো জিজ্ঞেস করছি। কেন তুমি অমন করে লজ্জা-সরমের মাথা খেলে? অমন করে মা-মণির মুখ পোড়ালে?

সুখদা বললে—তাহলে তার আগে উত্তর দাও, কেন তুমি এই মাধব কুণ্ডু লেনের বাড়িতে এলে? তুমি এখানে না এলে তো আমার এমন দশা হতো না। আমিও মা-মণির পছন্দ-করা পাত্রকে বিয়ে করে সুখে ঘর-করনা করতে পারতুম কেন তুমি এখানে মরতে এলে? কেন তুমি আমার সর্বনাশ করলে? আমি তোমার কী ক্ষতি করেছিলুম, বলো তো? বলো! চুপ করে থেকো না—

সুরেনের সমস্ত গা দিয়ে তখন দর-দর করে ঘাম ঝরছে।

হঠাৎ মনে হলো সুখদা যেন কাঁদছে। বড় অসহায় মনে হলো সুখদাকে।

সুরেন বললে—এবার আমাকে ছেড়ে দাও—

সুখদা বললে—কিন্তু কই, তুমি তো আমার কথার উত্তর দিলে না?

সুরেন বললে—পাগলের কথার উত্তর আমি দিই না—

সুখদা বললে—আমি যদি পাগল হই তো কে আমায় পাগল করলে তাই তুমি বলো?

সুরেন বললে—দেখ, আমারও একটা সহ্য-ক্ষমতা বলে জিনিস আছে। বাড়িতে এখন সবাই জেগে আছে, তারা যদি কেউ দেখতে পায় তো আমার লজ্জার শেষ থাকবে না—

সুখদা বললে—ভালই তো, সবাই বলবে এ-ছেলেটা সুখদার ঘরে ঢুকেছিল বদ মতলব নিয়ে—

সুরেন বললে—তাতে তোমার লজ্জা না হতে পারে, কিন্তু আমার হয়—তুমি ছেড়ে দাও সুখদা, তোমার দুটি পায়ে পড়ছি সুখদা, আমাকে ছেড়ে দাও—

সুখদা তবু না-ছোড়বান্দা! বললে—না, কিছুতেই আমি ছাড়বো না তোমাকে—

ওদিকে কার যেন পায়ের শব্দ শোনা গেল।

সুখদা বললে—বলো তুমি আমার কথা রাখবে—

সুরেন বললে—তুমি আগে ছাড়ো আমাকে—

—বলো তুমি আগে আমার কথা রাখবে, নইলে কিছুতেই ছাড়বো না তোমাকে।

—শুনতে পাচ্ছো না, ওদিকে কার যেন পায়ের শব্দ আসছে, ছাড়ো।

—না না, কিছুতেই ছাড়বো না। কিছুতেই না—

—কে?

চমকে উঠলো সুরেন। ভূপতি ভাদুড়ীর গলার আওয়াজ মনে হলো।

সুরেন গলার আওয়াজ নামিয়ে বললে—সুখদা, ছাড়ো আমাকে—

ভূপতি ভাদুড়ী তরলাকে বললে—তরলা দেখ্ তো, ওখানে কার গলার আওয়াজ আসছে—

সুরেন প্রাণপণ শক্তিতে সুখদার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলে। কিন্তু তা করতে গিয়ে সুখদার হাতের টানে সুরেনের জামাটা পড়পড় করে ছিঁড়ে গেল।

কিন্তু ততক্ষণে বারান্দার আলো জ্বেলে তরলা ঘরের সামনে এসে পড়েছে। পেছনে ভূপতি ভাদুড়ী। দরজাটা ভেজানো ছিল। তরলা দরজাটা ঠেলতেই সেটা খুলে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেলে সুরেন আর সুখদা ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে জড়োসড়ো হয়ে। সুরেনের জামাটা আধখানা ছিঁড়ে ঝুলে পড়েছে। আর সুখদার শরীর থেকেও কাপড়টা খুলে মাটিতে লুটোচ্ছে—

ঘটনাটা এমন অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটে গেল যে সমস্ত জিনিসটা ভালো করে বুঝতেও পারা গেল না। এক মুহূর্তে যেন সব কিছু গোলমাল হয়ে গেল। মানুষের জীবনে বোধহয় এমনি করেই অসংখ্য দুর্ঘটনা ঘটে, যার জন্যে সে দায়ী নয়, অথচ সারা জীবন তাকে তার দায় বহন করতে হয়। সাদাসিধে সাধারণ মানুষ সুরেন। কলকাতার আর পাঁচজন নিঃসঙ্গ মানুষের মতই অসহায়। ভাগ্যের পাশা-খেলায় একদিন কলকাতার বুকে এসে পড়ে একটা জটিল নাটকের পাত্র হয়ে গিয়েছিল। তখন কি সে জানতো এই নাটকের সে-ই একমাত্র নায়ক। সে-ই একমাত্র অভিনেতা!

হয়ত ভূপতি ভাদুড়ীও কল্পনা করতে পারেনি। এমন করে যে তারই ভাগ্যে এমন ষড়যন্ত্রের জালে জড়িয়ে পড়বে তাও ভাবতে পারেনি সে। নইলে সে কি এমন করে নিজের অজান্তে সুখদার ঘরে সুরেনকে আবিষ্কার করতো।

সুরেন আর সেখানে দাঁড়াল না।

মা-মণি অসুস্থ। তার সেবার জন্যে বাড়ির সবাই সন্ত্রস্ত। কখন যেন ডাক্তারবাবুও এসে গেছে। ঠিক সেই অবস্থাতেই কিনা এই কেলেঙ্কারি। কিন্তু কেলেঙ্কারিরও একটা মাত্রা আছে। সেই মাত্রাটাই বা সুখদা ছাড়িয়ে গেল কেমন করে! কেমন করে অতগুলো লোকের সামনে নিজের চরিত্রহীনতার ঢাক পেটাতে পারলে!

কখন যে সুরেন তেতলার সিঁড়ি দিয়ে নিচেয় বাড়ির উঠোনে নেমে এসেছে তার খেয়াল ছিল না। আলোগুলো সবই জ্বলছিল বটে, কিন্তু সুরেনের মনে হচ্ছিল যেন শুধু অন্ধকারই ঘিরে রয়েছে চারদিকে। একবার মনে হলো রান্না-ঘরের দিকে যায়। সেখানে যা কিছু রাখা হয়েছে তাই দিয়ে সে পেটটা ভরিয়ে নিয়ে কোথাও বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু এখনি চারদিকে তার লজ্জার কথা যেভাবে ছড়িয়ে পড়বে, তারপর আর সে মুখ দেখাবে কেমন করে! তার আগেই তো তার এখান থেকে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া ভালো।

আস্তে আস্তে সুরেন বাইরের রাস্তার দিকে পা বাড়ালো। রাস্তায় তখন লোক চলাচল অনেক কমে গেছে। তবু যেন সকলের চোখের আড়ালে থাকতে ইচ্ছে হলো। মনে হলো তাকে কেউ না-দেখতে পেলেই যেন ভালো। দেখতে পেলেই যেন বলবে—ওই দেখ, ওই সেই ছেলেটা যাচ্ছে—

অথচ সারাদিন কী পরিশ্রমটাই না গেছে। সেই অত সকালে দুটি ভাত মুখে দিয়ে গিয়েছে পুণ্যশ্লোকবাবুর বাড়ি। সেখানে যদুনাথ সরকারের বইটা পড়েছে। তারপর সেই পর্মিলির সঙ্গে কথা কাটাকাটি। আর তারপর সেই পঞ্চাশটা টাকা নেওয়া। পঞ্চাশ টাকা। পঞ্চাশটা টাকার কথা মনে পড়তেই সুরেন বুক-পকেটে হাত দিয়ে দেখে নিলে। টাকাগুলো আছে তো ঠিক!

না, ঠিকই আছে। কেউ পকেটে হাত দেয়নি।

ক্ষিধেটা পেয়েছিল খুব। ফুটপাথের ধারে একটা কাছাকাছি দোকান দেখে তাতেই গিয়ে ঢুকলো সুরেন। থরে থরে সব খাবার সাজানো আছে। সন্দেশ, রসগোল্লা, মিহিদানা, দরবেশ। ভেতরে চেয়ার-টেবিল পাতা।

—কচুরি আছে?

দোকানি বললে—আছে। ক'খানা?

সুরেন বললে—চারটে। গরম আছে তো?

দোকানি বললে—এই রাত দশটার সময় কি গরম-কচুরি থাকে মশাই? এত রাত্তিরে কে আর কচুরি খেতে আসবে? তার চেয়ে রাবড়ি খান না—গরম রাবড়ি আছে, দেবো? এই এক্ষুনি নামলো—

—সের কত করে?

দোকানী বললে—দশ টাকা করে। আসল খাঁটি রাবড়ি, আমাদের রাবড়িতে ব্লটিং-পেপার থাকে না।

রাবড়ি! কিন্তু হঠাৎ রাবড়ি খেতেই বা যাবে কেন সে! রাবড়ি খেয়ে কী এমন লাভ হবে। তার চেয়ে যা খেলে পেট ভরে এমন কিছু খেলেই হয়।

বললে—না, তার চেয়ে আমাকে কচুরিই দিন—

বলে একটা চেয়ারে গিয়ে বসলো সুরেন। একজন কে এসে এক গ্লাস জলও দিয়ে গেল। কোনও খদ্দের নেই আর। রাতও অনেক হবার দিকে। সমস্ত কলকাতা সহরের ভিড়ও পাতলা হয়ে এসেছে। এর পর সহরের সিনেমার শেষ শো ভাঙবে। তখন কিছু খদ্দের আসবে দোকানে। তারপর একে একে খাবারের দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে দেবে।

কচুরি চারখানা একটা শালপাতার ওপর রেখে দিয়ে গেল। ঠাণ্ডা বরফ-হিম কচুরিগুলো। দাঁত দিয়ে কামড়ানো যায় না, এমন শক্ত। সঙ্গে একটা আলুর-ঘ্যাঁট। ক্ষিধেও পেয়েছিল খুব। কখন যে সেগুলো পেটের ভেতর ঢুকে গেল খেয়াল নেই। কিন্তু ক্ষিধের সময় খুব খারাপ লাগলো না।

—আর কিছু নেবেন? অমৃতি জিলিপি ছিল গরম-গরম!

—কত করে দাম?

—এক-একখানা তিন আনা।

সুরেন বললে—দিন একখানা—

—একখানা নয়, দু'খানাই নিন—

বলে দুটো অমৃতি ফেলে দিলে শালপাতার ওপর। বড় আতিথেয়তা দেখাচ্ছে লোকটা। যেন জিনিসের দামই দিতে হবে না। এই-ই বোধহয় ব্যবসা চালাবার কায়দা। অথচ যাবার সময় দাম মিটিয়ে না দিলে গলায় গামছা দিয়ে পয়সা আদায় করে নেবে।

জল খেয়ে মুখ ধুয়ে উঠতে যাচ্ছিল সুরেন। উঠে একখানা দশ টাকার নোট বার করে দিলে। দোকানি ভাঙানি দিলে। ভাঙানিটা নিয়ে পকেটে পুরে রাস্তার দিকে চেয়ে দেখলে। এবার কোথায় যাবে সে! বাড়ি? বাড়িতেই বা যাবে কী করে? সেখানে গিয়ে মামাকে মুখই বা দেখাবে কী করে! হয়ত সারা বাড়ির লোক এখন সমস্ত ব্যাপারটা জেনে গেছে। সবাই আলোচনা করছে তাকে নিয়ে! অথচ সে যদি গিয়ে প্রতিবাদ করে, সে যদি নিজের নির্দোষিতা প্রমাণ করবার চেষ্টা করে তো কেউই হয়ত বিশ্বাস করবে না। মা-মণির কানেও তো কথাটা পৌঁছোবে। মা-মণি শুনে কী বলবে?

না, আর বাড়ি যাওয়া নয়! রাতটা দেবেশদের পার্টি-অফিসে কাটালে হয়। ও-ছাড়া তো তার কোনও যাবার জায়গাও আর নেই। পুণ্যশ্লোকবাবুর বাড়িতে এমন সময়ে যাওয়া যায় না। কোথাওই যাওয়া যায় না এত রাত্রে। আর খানিকক্ষণ পরে কলকাতার বাস-ট্রাম বন্ধ হয়ে যাবে। তখন ইচ্ছে থাকলেও আর কোথাও যাওয়া যাবে না। এদের এই দোকানেও আর তাকে কেউ ঢুকতে দেবে না। তখন আবার তাকে বাধ্য হয়ে মাধব কুণ্ডু লেনের বাড়িতে গিয়েই হয়ত ঢুকতে হবে।

তবু সুরেন পা বাড়ালো। তিনটে ধাপ পেরিয়ে রাস্তা। সেই রাস্তায় এসে দাঁড়াতেই সমস্ত পৃথিবীটা তার চোখের সামনে নিঃসঙ্গ হয়ে দাঁড়ালো। কেউ নেই তার। মনে হলো এই বিপুল পৃথিবীতে তার কেউ নেই। নইলে কেন সে এমন নিঃস্ব হয়ে জন্মালো। কেন জন্মের পর আপন বলতে কেউ তার রইল না। কেন সকলের ভুল ধারণার পাত্র হয়ে সে এই নিষ্ঠুর সহরে বেঁচে আছে।

কিন্তু পায়ে পায়ে চলতে চলতে কখন সে যে আবার মাধব কুণ্ডু লেনের বাড়ীটার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে তা তার খেয়াল ছিল না। হঠাৎ মনে হলো কেন সে এখানে এল! এ-বাড়িতে তার কিসের আকর্ষণ? কীসের মায়া তার এ-বাড়িটার ওপর? আবার মুখ ঘুরিয়ে সে উল্টো দিকে চলতে আরম্ভ করলে। না, যে বাড়ি থেকে একবার সে চলে যাবে বলে ঠিক করেছে, সেখানে আর সে ফিরবে না।

রাস্তাটা এখন বড় নিরিবিলি হয়ে এসেছে। মোড়ের মাথায় তেলেভাজার দোকানটা ঝাঁপ বন্ধ করে দিয়েছে। একটা লাল-পাগড়ি পরা পুলিশ দাঁড়িয়ে ছিল মোড়ের মাথায়। সুরেন গিয়ে তার পাশেই দাঁড়ালো। ঠিক করতে পারলে না কোন্ দিকে সে পা বাড়াবে। কিন্তু পুলিশটা হয়ত কী ভাবছে। তাই আবার

মুখ ঘুরিয়ে উল্টো দিকে চলতে লাগলো। যে-পথ দিয়ে সে এসেছিল, সেই পথ দিয়েই। আবার সেই গেট। বাহাদুর সিং গেট বন্ধ করে দিয়েছিল।

সুরেন ডাকলে—বাহাদুর—

পাশের ছোট ঘর থেকে বেরিয়ে বাহাদুর সিং দরজা খুলে সেলাম করলে।

সুরেন বললে—ডাক্তারবাবু চলে গেছে বাহাদুর?

বাহাদুর বললে—জী হাঁ—

তাহলে বোধহয় আবার সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। উঠোনের একটা বাতি ছাড়া আর সব নিভে গেছে। কেউ কোথাও নেই। সুরেন আস্তে আস্তে তার নিজের ঘরে ঢুকে নিঃশব্দে দরজায় খিল তুলে দিলে।

—কী রে, তুই? এতদিন পরে?

দেবেশও অবাক হয়ে গেছে। বললে—এতদিন ছিলি কোথায়? এ কী চেহারা হয়েছে তোর?

সুরেন মুখ দিয়ে কিছু কথা বার করতে পারলে না হঠাৎ। একটু চুপ করে রইল। তারপর বললে—হ্যাঁ রে, টুলুর কী খবর?

দেবেশ বললে—সেই কথাই তো টুলু জিজ্ঞেস করছিল। বলছিল তোর খবর কী? তুই একদিনও আর দেখতে গেলি না তাকে। তোর হয়েছিল কী? তোর বাড়িতেও খোঁজ নিতে গিয়েছিলুম, তুই বাড়িতেও নেই—

সুরেন বললে—টুলু কোথায়? হাসপাতালে?

দেবেশ বললে—তাকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দিয়েছে, এখন সে বাড়িতে—

—ভালো হয়ে গেছে তো? তাহলেই হলো।

যেন টুলুর ভালো হলেই সুরেনের ভালো।

—তা আমার কথার জবাব দিচ্ছিস না কেন? কী হয়েছিল তোর তা তো বলছিস না। হঠাৎ ডুব দিলি কেন?

সুরেন বললে—খুব বিপদের মধ্যে দিয়ে চলছে ভাই।

—কী বিপদ?

—সব বলতে অনেক সময় লাগবে। একটা চাকরি করছি।

দেবেশ অবাক হয়ে গেছে। বললে—চাকরি? চাকরি করছিস তুই? কোথায়?

সুরেন বললে—ঠিক চাকরি নয়। তবে চাকরিও বলতে পারিস। প্রায় চাকরির মতই। সকালে যেতে হয়, আর সেই সন্ধ্যে পর্যন্ত কাজ। নিজের ওপরেও বিশ্বাস হারিয়ে গেছে। মনে হয় জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল।

দেবেশ বললে—এখন কোথায় যাচ্ছিস?

—বাড়ি। সেই সকালে বেরিয়ে এখন বাড়ি ফিরছি।

—তা এ্যাদ্দিনে একবার হাসপাতালে গিয়ে টুলুর সঙ্গে দেখা করতে পারলি না? এত কী তোর কাজ? একদিন সকাল-সকাল অফিস থেকে বেরিয়ে দেখা করলেই পারতিস!

সুরেন একটু চুপ করে রইল। তারপর বললে—কারোর সঙ্গেই দেখা করতে ভালো লাগছিল না ভাই। আমার জীবনটা নষ্ট হয়ে গেছে রে। আমাকে তুই ভুলে যা—

—কেন? কী হলো তোর? প্রেমে-ফ্রেমে পড়েছিস নাকি?

সুরেন হাসলো। বললে—ও-সব আমার কপালে নেই—

দেবেশ বললে—তার মানে?

সুরেন বললে—ওসব যারা ভাগ্যবান তাদের জন্যে! আমার কী আছে বল্ যে, আমাকে কেউ ভালবাসবে! তোকে তো বলেছিলুম আমাদের বাড়ির কথা। সেই বাড়িতেই কাণ্ডটা ঘটেছে—

—কী ঘটেছে? খুলে বল্ ভালো করে।

সুরেন বললে—সব বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে। বহুদিন থেকেই ভাবছি ওখান থেকে চলে যাবো, কিন্তু পারছিলুম না। তবে এবার বোধহয় আমাকেও ওরা বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবে—

—ওরা মানে? কে?

সুরেন বললে—তুই তাকে চিনিস না। তার নাম সুখদা—

—সুখদা? সে আবার কে?

সুরেন বললে—সে-ই আমার জীবনের ধূমকেতু ভাই। আমি যেদিন থেকে ও-বাড়িতে এসেছি, সেই দিন থেকেই আমার পেছনে লেগেছে। আমাকে অপদস্থ করে একেবারে নাজেহাল করে দিচ্ছে। এতদিন তার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল, আমি বেঁচেছিলুম। এবার আবার ফিরে এসেছে। ফিরে এসেই আমার পেছনে লেগেছে আবার। লজ্জায় আমি আর মুখ দেখাতে পারছি না ভাই। ও-বাড়িতে আমাব থাকাও ভার হয়ে উঠেছে—

দেবেশ বললে—ওই জন্যেই তো তোকে বাড়ি ছেড়ে আমাদের পার্টির অফিসে এসে থাকতে বলেছিলুম—

—কিন্তু মামা তো তাও থাকতে দেবে না। তোদের ওখানেও থাকতে দেবে না, ওদিকে বাড়িতেও আমার আর জায়গা নেই। আমি কী করি বল্ তো!

দেবেশ বললে—এখন তো চাকরি করছিস তুই, এখন একখানা ঘর ভাড়া কর—

সুরেন বললে—কিন্তু একশো টাকা মাইনেতে ঘর ভাড়া করবো কী করে? আর সে-চাকরি তো অফিসের চাকরি নয়, এ যে-কোনও দিন চলে যেতে পারে।

—তার মানে? চাকরিটা কীসের?

সুরেন বললে—ইতিহাস লেখার চাকরি।

—সে আবার কী?

সুরেন বললে—আমাকে কংগ্রেসের হিস্ট্রি লিখতে হবে। পুণ্যশ্লোক-বাবুর অর্ডার। তাই সেখানেই তো যাই আমি রোজ।

দেবেশ চলতে চলতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো। যেন তার মাথায় বাজ পড়েছে। কিংবা মাথায় বাজ পড়লেও বোধহয় সে এত চমকে উঠতো না।

বললে—তুই ও-চাকরি নিলি কেন?

সুরেন বললে—একটা তো কিছু করতে হবে! চুপচাপ আর কতদিন মা-মণির কাছ থেকে টাকা নেব? আমার লজ্জা করতো বড় টাকা নিতে!

দেবেশ বললে—তা বলে আর কোনও চাকরি জোগাড় করতে পারলি না তুই? ওই কংগ্রেসের দালালি করবি তুই? কংগ্রেসের গুণগান করবি তুই? তোর লজ্জা করলো না ওই কাজ করতে?

সুরেন বললে—তুই আমার অবস্থা বুঝতে পারবি না ঠিক। আমার মত অবস্থায় পড়লে তুইও এই করতিস!

দেবেশ বললে—ঠিক আছে! তোর সঙ্গে আমার সব সম্পর্ক শেষ হয়ে গেল—

বলে দেবেশ গম্ভীর হয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলে। বললে—তার চেয়ে উপোষ করে মরলি না কেন তুই? তোর মতন ছেলের মরাই তো ভাল ছিল। আর তাও যদি না পারতিস তো অন্য ছেলেদের মত তাস পিটে আর সিনেমা-থিয়েটার নিয়ে মেতে থাকলেই পারতিস। সেও যে এর চেয়ে ভালো ছিল রে। অন্ততঃ দালাল বলতো না কেউ—

সুরেন বললে—তুই রাগ করবি আমি জানতুম।

দেবেশ বললে—আমি রাগ করলে তোর কী এসে যায়। জানিস, আমিও ইচ্ছে করলে এতদিনে তোর মত কত চাকরি জোগাড় করতে পারতুম। একটু যদি কংগ্রেসের কর্তাদের খোসামোদ করতুম তো আমি অনেক টাকা আয় করতে পারতুম—

সুরেন বললে—কিন্তু আমি পুণ্যশ্লোকবাবুকে খোসামোদ করিনি ভাই, সত্যি বলছি, খোসামোদ করিনি—

—আরে ওরই নাম খোসামোদ! তুই ওদের বাড়িতে যেতিস তো?

সুরেন বললে—তা যেতুম—

—তবে? যেতিস কেন?

সুরেন বললে—যাওয়ার একটা কারণ ছিল। প্রজেশ সেন বলে এক ভদ্রলোক আমাকে পাঠাতো ওদের বাড়িতে—

—কেন পাঠাতো?

সুরেন বললে—ওই পর্মিলিকে ভালবাসতো প্রজেশ সেন, সেই সব ব্যাপার নিয়ে আমাকে যেতে হতো!

দেবেশ ঠিক বুঝতে পারলে না।

বললে—তা তাদের ভালবাসাবাসির মধ্যে তোর নাক গলাবার দরকার কী? তুই কেন ওসব ব্যাপারে থাকিস?

সুরেন বললে—আমাকে যে প্রজেশ সেন যেতে বলে। আমার হাত দিয়ে চিঠি দেয়।

—তা চিঠি দেবার আর লোক নেই তুই ছাড়া? বেছে বেছে তোকে কেন খাটায়? তুই তার কে?

সুরেন বললে—আমার কাছে যে কাঁদে। হাউ-হাউ করে কাঁদে। আমি কী করবো? আমার যে মায়া হয়, দুঃখ হয়!

দেবেশ বললে—মায়া হয় কার জন্যে? প্রজেশ সেনের জন্যে? না পর্মিলির জন্যে? সত্যি করে বল্ তো?

সুরেন বললে—দু'জনের জন্যেই মায়া হয়।

—কার জন্যে বেশি মায়া হয় তোর?

সুরেন বললে—বেশি মায়া অবশ্য পর্মিলির জন্যেই হয়। কারণ মেয়েটার মা নেই, বাপ সমস্ত দিন বাইরে-বাইরে কাটায়, কথা বলবার একটা লোক চাই তো?

—তা তার সময় কাটে না বলে তুই বুঝি তার সঙ্গে কথা বলতে যাস?

সুরেন বললে—না, তা ঠিক নয়। আমি না গেলে যে ডেকেও পাঠায়।

দেবেশ বললে—তা তো ডাকবেই। জানে তো যে, তোর দ্বারা তার কোনও ক্ষতি হবার ভয় নেই।

সুরেন বললে—কেন? ক্ষতি হবার ভয় নেই কেন?

—তা তোর কি ক্ষতি করবার ক্ষমতা আছে মনে করিস? তোর সে সাহস আছে? তোকে তো আমি কতকাল ধরে দেখে আসছি। তোর কারো ভালো করবার ক্ষমতাও নেই, কারো ক্ষতি করবার ক্ষমতাও নেই। তোদের মত লোকরাই হচ্ছে সমাজের পক্ষে ডেঞ্জারাস—

সুরেন এ-কথার কোনও জবাব দিলে না।

বললে—হয়ত তুই ঠিক কথাই বলেছিস ভাই। ঠিকই বলেছিস। যারা আমাকে ভালবেসেছে তাদের ভালোও করতে পারিনি, যারা আমার শত্রুতা করেছে তাদের আঘাতও দিতে পারিনি। কেবল সব দুঃখ সব কষ্ট সব সুখ সব আনন্দ বুকের ভেতরে পুষে রেখেছি কাউকে কিছু মুখ ফুটে বলতেও পারিনি। তা এই স্বভাব নিয়েই আমি জন্মেছি, কী করবো বল্?

দেখে মনে হলো দেবেশ যেন তার ওপর খুবই রাগ করেছে। এতদিনকার বন্ধু দেবেশ। তার ওপর রাগ করার অধিকার তার আছে বৈকি।

সুরেন বললে—ভাই, আমাকে একবার টুলুদের বাড়ি নিয়ে যাবি?

দেবেশ বললে—কেন? হঠাৎ?

সুরেন বললে—ক'দিন থেকে তার কথা খুব মনে পড়ছে। তাকে দেখতে ইচ্ছে করছে। মনে হচ্ছে তাকে হাসপাতালে দেখতে না গিয়ে বড় অন্যায় করেছি—

দেবেশ বললে—তা চল্, এখন যাবি?

ছোট সংসারের সুখ ছোট, কিন্তু বিপর্যয় যখন আসে তখন আর ছোট আকারে আসে না। সে বড় সংসারকে যতখানি বিভ্রান্ত করে, তার চেয়ে বেশি বিভ্রান্ত করে ছোট সংসারকে। কবে একদিন পূর্ব-বাঙলার এক পরিবার আপন অস্তিত্বের চাকাটাকে কোনও রকমে গড়িয়ে-গড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু কখনও স্বপ্নেও ভাবেনি যে, সে-চাকা এমন করে মাঝপথে ভেঙে গিয়ে সমস্ত অস্তিত্বটাকেই অচল করে দেবে! সহদেব সরকার যখন শেষ বয়েসে একটু আরামের আশায় একটু বিশ্রাম নেবার প্রয়োজন অনুভব করলেন, ঠিক সেই সময়েই বিপর্যয়টা ঘাড়ে এসে পড়লো। চোখটা অনেক দিন থেকেই ঝাপসা-ঝাপসা ঠেকছিল। কিন্তু সেটা যে একেবারে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলবে তা তিনি কল্পনা করতেও পারেননি।

আর তারপরই এল দেশ ভাগাভাগির কুরুক্ষেত্র-কাণ্ড।

সে-সব কথা মনে করতেও হৃদ্‌কম্প হয় আজ। কোথা দিয়ে কেমন করে যে কলকাতায় এসে পড়লেন, তাও আজ মনে নেই। শুধু মনে আছে তিনটে মেয়ে তাঁকে আঁকড়ে ধরে ট্রেন করে শেয়ালদা স্টেশনে এসে হাজির হয়েছিল। প্রথম দু'তিন দিন খাওয়াই জোটেনি। তারপর টুলুই মুশকিল আসান করে দিয়েছিল একদিন।

টুলুর তখন বয়েস কত আর! বড় জোর পনেরো কি ষোল।

বলেছিল—বাবা, চলো—

সহদেববাবু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন—আবার কোথায়?

টুলু বলেছিল—কোথায় আবার, যেখানে সবাই যাচ্ছে, সেখানেই যাবো—

সহদেববাবু বলেছিলেন—আর কোথাও যাবো না মা, আমি এখানেই মরবো। আর কোথাও আমি যেতে পারিনে—

সত্যিই তো, নিজের চাষের জমি, লাঙল, ভিটে, দেব-বিগ্রহ সমস্ত কিছু ছেড়ে এই সহর কলকাতায় আসতেই তাঁর অর্ধেক পরমায়ু ফুরিয়ে এসেছিল। এরপর এখান থেকেও যদি নড়তে হয় তাহলে আর তিনি বাঁচবেন না। এই রেলের প্লাটফরমের টিনের ছাদের তলায় শেষ ক'টা দিন কাটিয়ে দিতে পারলেই তিনি নিশ্চিন্ত থাকেন।

কিন্তু টুলুর সত্যিই বাহাদুরি আছে বলতে হবে। সেই বুড়ো বাপকে নিয়ে এসে তুললো এই এখানে। এই যে-বাড়িতে তক্তপোষের ওপর বসে-বসে তিনি হাঁপান আর পুরোন দিনের কথাগুলো দিনরাত ভাবেন।

মাঝে-মাঝে একটু একলা বোধ করলেই ডাকেন—ওরে টুলু, ওরে ফুলু, ওরে বুলু, কোথায় গেলি রে সব তোরা—

কেউ কোনও উত্তর দেয় না। আরো চিৎকার করে ডাকেন তিনি। কোথায় যে তারা থাকে সারাদিন বুঝতে পারেন না। মাঝে-মাঝে ভয় হয়। টুলুটার বয়েস হয়েছে। চোখে দেখতে না পেলেও বয়েস তো আর কারো কমে থাকে না। বয়েস নিশ্চয়ই বেড়েছে টুলুর।

ডাকাডাকি শুনে বুলু কাছে আসে। বলে—আমায় ডাকছো বাবা?

—কোথায় গিছ্‌লি তোরা হারামজাদি? ফুলু কোথায়?

বুলু বলে—মেজদি তো ইস্কুলে গেছে—

—ইস্কুলে?

কথাটা শুনে বুড়ো মানুষটা চমকে ওঠেন।—ইস্কুলে যে গেছে তা মাইনে লাগে না? মাইনে কে দেয়?

—মাইনে দিদি দেয়!

আরো অবাক হয়ে যান সহদেববাবু। বলেন—দিদি কোত্থেকে মাইনে দেয়? টাকা কোত্থেকে পায় তোর দিদি?

ছোট মেয়ে সে-কথার জবাব দিতে পারে না। বলে—তা আমি জানিনে—

তখন থেকেই সন্দেহ শুরু হয় সহদেববাবুর মনে। কোত্থেকে বাড়ির ভাড়া দিচ্ছে টুলু, কোত্থেকে চাল-ডাল, নুন-তেল আসছে তাও জানতে ইচ্ছে করে। কোত্থেকে মেয়েদের জামা-কাপড় আসছে, তাও জানবার কৌতূহল হয় তাঁর। এ তো গাঁ নয়, এ সহর কলকাতা। এখানে পয়সা না ফেললে একটা পা-ও চলা যাবে না। কিন্তু জিজ্ঞেস করতে ভয় করে। টুলু সাত-সকালে রান্নাবান্না সেরেই বেরিয়ে যেত। আসতো অনেক বেলা করে। তারপর আবার টুপ্ করে কখন বেরিয়ে যেত, ফিরতো একেবারে সন্ধ্যে উতরে গেলে।

সহদেববাবু জিজ্ঞেস করতেন—হ্যাঁ রে, আজকাল কোথায় থাকিস তুই?

টুলু বলতো—কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকি খুব বাবা—

সহদেববাবু বলতেন—কী কাজ রে, মাইনে পাস?

টুলু শুধু বলতো—হ্যাঁ—

তারপর অন্য প্রসঙ্গে চলে যেত। বোন দুটোকে খাইয়ে বাবাকেও খেতে দিত। সহদেববাবু আপন মনে নিঃশব্দে খেয়ে যেতেন। জিজ্ঞেস করতে সাহস হতো না কোত্থেকে চাল, ডাল, আটা, তেল, নুন, মাছ আসতো। তিনি নিঃশব্দে সব গিলে যেতেন।

একদিন শুধু জিজ্ঞেস করেছিলেন—ও ছেলেটা কে রে টুলু?

—কোন ছেলেটা বাবা?

—ওই যে তোর কাছে এসেছিল?

টুলু বলেছিল—ও তো দেবেশদা।

—তোদের অফিসে চাকরি করে বুঝি?

টুলু বলেছিল—হ্যাঁ—

সহদেববাবু জিজ্ঞেস করেছিলেন—তোদের কিসের অফিস রে? কী কাজ হয় সেখানে?

টুলু বলেছিল—পার্টির অফিস।

—পার্টির অফিস মানে?

টুলু বলেছিল—দেশের কাজ করে ওরা। যাতে দেশের লোকের ভালো হয়। এই যে আমরা ফরিদপুর থেকে চলে এলাম, দেশ ভাগাভাগি হয়ে গেল, এ-সব যারা করলে তাদের হটানো আমাদের পার্টির কাজ!

সহদেববাবু শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন—ও আবার কী কাজ? কারা দেশ ভাগাভাগি করলে? তারা কারা? তাদের তোরা হটাবি কী করে?

টুলু বলেছিল—সে তুমি বুঝবে না বাবা। তোমরা সেকেলে লোক, আজকাল সব আইন-কানুন বদলে গেছে। ইংরেজরা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের যুগ চলে গেছে—

টুলুর কথাগুলো সহদেববাবুর কাছে কেমন নতুন লাগতো। তা হবে! হয়ত বদলেই গেছে। যুগ বদলে না গেলে কি তাঁকে দেশ-গাঁ ছেড়ে এই কলকাতায় চলে আসতে হয়! যুগ বদলে না গেলে কি তাঁর চোখ অন্ধ হয়ে যায়! চোখ থাকলে যুগ বদলানোর চেহারাটা তিনি হয়ত দেখতে পেতেন। দেশের যুগ কী বদলেছে না বদলেছে তা তিনি দেখতে পান না বটে, কিন্তু জায়গা যে বদলেছে তা তিনি চোখ না-থেকেও বুঝতে পারেন। বুঝতে পারেন শব্দ শুনে। বাইরের রাস্তায় চিৎকার হয়। একসঙ্গে অনেক গলার আওয়াজ আসে—ইনক্লাব জিন্দাবাদ।' কথাগুলো নতুন। ও-সব আগে শোনা ছিল না। টুলুকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিলেন—ওরা সব কী বলে রে টুলু?

টুলু বলেছিল—ওসব বাবা তুমি বুঝবে না, ও-সব নানা রকমের পার্টি হয়েছে তো এখানে...

সহদেববাবু বলেছিলেন—তা কথাটার একটা মানে আছে তো?

টুলু বলেছিল—মানে, বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক—

তবু বুঝতে পারেননি সহদেববাবু। বলেছিলেন—ওটা কি তোদের পার্টি?

—না বাবা, আরো অনেক পার্টি আছে, তারা চেঁচায়।

—তা তোদের পার্টিও ওই রকম চেঁচায়!

—হ্যাঁ।

—তা তুইও ওই রকম রাস্তায়-রাস্তায় চেঁচিয়ে বেড়াস নাকি?

টুলু বলেছিল—হ্যাঁ। ওই-ই তো আমাদের কাজ।

সহদেববাবু ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন—তা হ্যাঁরে, ওতে ভয়-টয় কিছু নেই তো?

—ভয় কীসের?

—যদি পুলিশে ধরে তোকে?

টুলু বলেছিল—তা ধরলে ধরবে!

—তা বলে তুই জেলে যাবি? তোর জেল হবে?

টুলু বলেছিল—তা বললে চলবে কেন বাবা? তোমাদের মহাত্মা গান্ধী জেলে যায়নি? তোমাদের নেতাজীর জেল হয়নি? তাঁদের বেলায় কোনও দোষ হয়নি, আর আমাদের বেলাতেই বুঝি যত দোষ!

সহদেববাবু সত্যিই বড় ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন।

বলেছিলেন—ওরে, তাদের কথা ছেড়ে দে। তারা সব বড় বড় লোকের ঘরের ছেলে। তারা কি আমাদের মত চাষা-ভুষো মানুষ? তাদের সঙ্গে আমাদের তুলনা? তাদের কত টাকা ছিল। তুই যদি জেলে যাস তো আমাদের কী হবে? আমরা কার ভরসায় এখানে থাকবো? কে তোর ছোট ছোট বোনদের দেখবে? আমি অন্ধ মানুষ, কার কাছে গিয়ে হাত পাতবো? আমি এই বিদেশ-বিভুঁয়ে কাকে চিনি?

টুলু বলেছিল—সে তোমাকে ভাবতে হবে না বাবা, আমাদের পার্টি আছে, পার্টির লোকের কাছে গেলেই তারা তোমাদের দেখবে—

সহদেববাবু তবু ভরসা পেতেন না। বলতেন—আর তুই?

টুলু বলতো—আমার কথা আর তুমি ভেবো না বাবা, আমার ভালোটা আমি নিজেই বুঝে নেব—

তা অন্ধ মানুষের পক্ষে তাছাড়া আর গতিই বা কী! মেয়েকে খাওয়ানো-পরানো, বিয়ে দেওয়ার যখন ক্ষমতা নেই, আর যখন উল্টে সেই মেয়েই আবার নিজের বোনদের আর বাবাকে খাওয়াচ্ছে, তখন তার কথায় সায় দেওয়া ছাড়া আর কী-ই বা করতে পারতেন সহদেববাবু। সে মেয়ে কোথায় যায়, কী কাজ করে, কার সঙ্গে মেশে তার জবাবদিহি চাওয়ারও অধিকার তাঁর নেই। তাই সব শুনে সব বুঝেও সহদেববাবু চুপ করে থাকতেন। আর বিছানায় শুয়ে শুয়ে আপন ভাগ্যকে ধিক্কার দিতেন।

কিন্তু এমনি সময়েই একদিন হঠাৎ বিপর্যয়ের সংবাদ এল!

হঠাৎ একদিন কে একজন এসে খবর দিয়ে গেল, টুলু বাসে চাপা পড়েছে।

বাড়িতে কেউ নেই। ফুলু গেছে স্কুলে। বুলুও বুঝি পাড়ায় কোথায় কাদের সঙ্গে খেলা করছে।

—সহদেববাবু, সহদেববাবু আছেন?

বাইরে থেকে অচেনা গলার আওয়াজেই ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন সহদেব-বাবু। তারপর দেয়াল ধরে হাতড়ে হাতড়ে যখন দরজার খিল খুলে দিলেন, তখন যা শুনলেন তাতেই মূর্ছা যাবার যোগাড়। গলা দিয়ে একটা আর্তনাদ বেরিয়ে আসতে চাইল। কিন্তু তখনই মনে পড়লো, সংসারে কাঁদবার অধিকারটাও ভগবান আজ তাঁর কেড়ে নিয়েছে। কেঁদে কী করবেন? কার কাছে প্রতিকার চাইবেন?

সহদেববাবু শুধু জিজ্ঞেস করলেন—টুলু বাঁচবে তো বাবা?

ছেলেটা বললে—হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, এখন ভাগ্য!

ওই পর্যন্ত বলেই ছেলেটা চলে গেল। আর তার ক'দিন পরেই এল সেই ছেলেটা। সেই টুলুর দেবেশদা।

কয়েকটা টাকা দিলে সহদেববাবুর হাতে। বললে—আপনি কিছু ভাববেন না, টুলুর যাতে ভালো হয় তা আমরা করবো। আর আপনার সংসারের যা কিছু দরকার আমাকে বলুন, আমি সব দেখবো।

সহদেববাবুর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো। টুলুর দুর্ঘটনার কথা

শুনে যে-সহদেববাবুর চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জল পড়েনি, দেবেশের কাছ থেকে একটু সহানুভূতির স্পর্শ পেতেই একেবারে হু-হু করে সেই চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো। সে আর বাধা মানলো না।

তিনি বললেন—কিন্তু টুলুকে দেখবার যে কেউ নেই বাবা!

দেবেশ বললে—আমরা তো আছি সহদেববাবু। আপনার চোখ অন্ধ হলোই বা, আমরা আছি, আমাদের পার্টি আছে। আমাদের পার্টি তো গরীবদের জন্যেই কাজ করে।

সহদেববাবু সহানুভূতিতে নুয়ে পড়লেন। বললেন—গরীবদের দুঃখ কেউ বোঝে না বাবা। দেশের লোকও বোঝে না, দেশের কর্তারাও বোঝে না। ভগবানের কাছে তো বলি, এ-সব দেখতে আমাকে কেন বাঁচিয়ে রাখলে তুমি? আমার কেন মরণ হলো না!

দেবেশের অত কথা শোনবার সময় ছিল না। সে খানিক পরেই চলে গেল। কিন্তু তারপর মাঝে মাঝেই এসে কিছু-কিছু টাকা দিয়ে যেত আর টুলুর খবর দিয়ে যেত। টুলু বেঁচে আছে। সে আবার সুস্থ হয়ে উঠবে। সে আবার বাড়ি ফিরে আসবে, এ কথা সহদেববাবুর ভাবতেও ভালো লাগতো।

শেষকালে টুলু একদিন হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে ফিরে এল। সুস্থ হয়ে মানে স্ট্রেচারে শয্যাশায়ী হয়ে। তখন তার হেঁটে উঠে বেড়াবার সামর্থ্য নেই। দেবেশই এসে পৌঁছে দিয়ে গেল। বলে গেল—একটু সাবধানে থাকতে বলবেন, বেশি নড়াচড়া করলে আবার শরীর খারাপ হতে পারে—

সহদেববাবু বললেন—তা সে-কথা আমাকে বলে কী লাভ বাবা, ওই টুলুকেই বলে যাও। ওরও তো ভালো-মন্দ বোঝবার বয়েস হয়েছে—

দেবেশ বললে—ওকে তো আমি বলেইছি, তবু আপনাকেও একবার বলে গেলাম। ও যেন রান্নাবান্না করতে ওঠা-হাঁটা আর না করে।

সত্যিই ছেলেটা ভালো। সহদেববাবুর মনে হলো, এও বোধহয় ভগবানের ইচ্ছে। ইচ্ছে বা আশীর্বাদ। তা না হলে এই অচেনা সহরে এসে কে-ই বা দেখা-শোনা করতো! কে এমন করে তাঁর মেয়ের ভালো-মন্দের কথা ভাবতো।

ছেলেটা চলে গেল। কিন্তু ক'দিন পরে আবার এল। আবার এসে দেখে গেল। কিছু টাকাও দিয়ে গেল। এ কে দেয়?

সেদিন দরজায় কড়া নাড়তেই ফুলু গিয়ে দরজা খুললে। সহদেববাবু বললেন—কে রে? কে দরজা ঠেলছে?

ফুলু ততক্ষণে চিৎকার করে উঠেছে—ও দিদি, দেবেশদার সঙ্গে সুরেনদাও এসেছে—

সুরেনদা! সহদেববাবু তক্তপোষ ছেড়ে উঠলেন। বললেন—সুরেনদা, সে আবার কে?

সেই ঘরেরই মেঝের ওপর শুয়ে ছিল টুলু। তাড়াতাড়ি গায়ের কাপড়টা সে ভালো করে জড়িয়ে নিলে। তারপর যেন উসখুস করতে লাগলো ওঠবার জন্যে।

বললে—বাবা, ওদের জন্যে একটু জলখাবারের ব্যবস্থা করতে পারো তুমি?

—জলখাবার? কী জলখাবার আনাবো?

টুলু বললে—ওই ফুলুকে বলো, রসগোল্লা হোক, পানতুয়া হোক, যা হোক কিছু। সুরেনদা এসেছে—

—তা সুরেনদা'র নাম তো কখনও শুনিনি। সুরেনদা কে রে তোর?

ততক্ষণে দেবেশ অভ্যেস মত ভেতরে ঢুকে পড়েছে।

বললে—এই দেখ টুলু, কাকে ডেকে এনেছি—

সহদেববাবু চোখে দেখতে পান না। তবু চোখ দুটো টান-টান করে সেদিকে দেখবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ঝাপসা দুটো মানুষের ছায়া ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলেন না।

টুলু সেইদিকে চেয়ে বললে—ওঁকে আবার কষ্ট করতে কেন নিয়ে এলে দেবেশদা?

দেবেশ বললে—আরে, আমি কেন নিয়ে আসবো, ও-ই তো তোমার কাছে আসতে চাইল। তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে তো ওরই আগ্রহ বেশি—

তারপর সুরেনের দিকে চেয়ে বললে—আয়, এই মেঝের ওপর আয়েস করে বোস—

সহদেববাবু বললেন—ও কি, ওখানে বসছো কেন? আমার এই তক্তপোষের ওপর বোস তোমরা। এর ওপরে আয়েস করে বোস—

দেবেশ বললে—এই তো এখানে বেশ আরাম। মেঝের ওপর বসতে কি কিছু কম আরাম?

সুরেন ততক্ষণে মেঝের ওপর বসে পড়েছে। বসে পড়ে টুলুর দিকে চেয়ে দেখছে। মনে হলো যেন টুলু বড় শুকিয়ে গিয়েছে। সেই চেহারা তার নেই। কিন্তু চোখের মুখের সেই জৌলুস যেন কমেনি। এখনও যেন একটা দুষ্টু হাসি সেই চেনা ঠোঁট দুটোর ওপর ঝুলছে।

বললে—আমি আসতে পারিনি এ ক'দিন। বড় মুশকিলে পড়ে গিয়েছিলুম।

দেবেশ বললে—আমি আজকে আসতুম না, কিন্তু সুরেন ধরে বসলো আজকেই তোমার কাছে আসবে, তাই বললুম—চল—

টুলু এতক্ষণে একটু কথা বললে। বললে—আমার সৌভাগ্য আপনি এলেন—

সহদেববাবু এতক্ষণ অবাক হয়ে শুনছিলেন সব। জিজ্ঞেস করলেন—উনি কে দেবেশ? ওকে তো কখনও দেখিনি আগে।

দেবেশ বললে—আপনি দেখেননি কিন্তু টুলু দেখেছে। সুরেন আমার বন্ধু, আমরা এককালে দুজনে এক স্কুলে পড়েছি—

—ও—

সহদেববাবু যেন এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হলেন। বললেন—তা তোমরা বোস বাবা একটু, আমি একটু তোমাদের জন্যে জলখাবারের জোগাড় করে...

দেবেশ বললে—না না, ও-সব আপনি কিছু করবেন না। আপনি চুপ করে বসুন তো—

টুলু বললে—না দেবেশদা, সুরেনদা আজকে প্রথম আমাদের বাড়ি এসেছে, এ আমার কত বড় সৌভাগ্য, তুমি বাধা দিতে পারবে না—

দেবেশ বললে—তা ঠিক আছে, তুমি যা বলো—

সুরেন বললে—জলখাবার খাবার জন্যে তো আমি আসিনি, আমি কিন্তু নিজের গরজে এসেছি। নিজের মুখে ক্ষমা চাইতে এসেছি।

ততক্ষণে সহদেববাবু একেবারে বাইরের উঠোনে গিয়ে নেমেছেন। সেখানে গিয়ে ডাকলেন—ও ফুলু, ফুলু কোথায় গেলি রে?

সুরেনের মনে আছে, সেদিনকার সেই টুলুদের একখানা ঘরের সংসার দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। একদিন সুখদার বাড়িতেও গিয়ে দেখেছিল ঠিক এই রকম। কিন্তু সে ঠিক সংসার বলতে যা বোঝায় তা নয়। সে ছিল মাতালের আড্ডা। তাকে সংসার বললে সংসারকে অপমান করা হয়। সংসারেরও একটা পবিত্রতা থাকে যা হাজার দুঃখ-শোকের মধ্যেও মনকে আশা দেয়, সান্ত্বনা দেয়। কিন্তু সে-সব কিছুই ছিল না সুখদার সংসারে।

টুলুর দিকে চেয়ে দেবেশ অনেক গল্প করছিল। কিন্তু সুরেনের মনে পড়ছিল সুখদার কথা। সেও তো এক মেয়ে, আর এ-ও এক মেয়ে। টুলুর সামনে বসে টুলুর কথা শুনতে শুনতে সুখদার কথাগুলো মনে পড়ছিল তার বার বার।

অথচ কি অপরাধ যে সুরেন করেছিল তাও সে জানতে পারলে না আজও।

দেবেশের কথায় হঠাৎ চমক ভাঙলো। দেবেশ জিজ্ঞেস করলে—কী ভাবছিস?

টুলু বললে—আপনার বোধহয় সময় নষ্ট হচ্ছে খুব, না?

সুরেন সামলে নিলে নিজেকে। বললে—না না, আমি বেকার লোক, আমার আবার সময় নষ্ট কী?

দেবেশ বললে—তাহলে কথা বলছিস না যে?

সুরেন বললে—তোদের কথা শুনছি আমি।

টুলু বললে—এইটুকু ছোট ঘর, দেখছেন তো? এর মধ্যে আমরা এতগুলো প্রাণী থাকি। শুধু আমরা নয়, আমাদের দেশ থেকে দলে দলে যত লোক এসেছে, তারা প্রায় সবাই-ই এই রকম করে থাকে। আপনার কাছে এ-সব নতুন লাগছে, না?

সুরেন বললে—নতুন কেন লাগবে! আমি এ-রকম আগেও দেখেছি—

—কোথায় দেখেছেন?

সুরেন বললে—চরম ঐশ্বর্যও দেখেছি, আবার চরম দারিদ্র্যও দেখেছি। আর তা ছাড়া আমার নিজেরই তো কোন আস্তানা নেই। পরের বাড়ীতে অন্নদাস হয়ে আছি—

দেবেশ বললে—অন্নদাস সবাই। কেউ অর্থদাস আবার কেউ বা অন্নদাস। আমাদের সমস্ত জাতটাই ভিখিরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেদিন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলুম, হঠাৎ কতগুলো বাচ্চা-বাচ্চা ছেলে চাঁদার খাতা বাড়িয়ে দিয়ে বললে—আমাদের দুর্গা পুজোর চাঁদা দিন স্যার—

তারপর একটু থেমে নিজের মনেই যেন বললে—এর গোড়াসুদ্ধ না বদলালে, আর চলবে না—

টুলু সে-প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়ে সুরেনকে বললে—এ ক'দিন কাজ নিয়ে খুব ব্যস্ত ছিলেন বুঝি?

দেবেশ বললে—ও এখন পুণ্যশ্লোকবাবুর বাড়িতে বসে বসে বাঙলা দেশের হিস্ট্রি লিখছে—

টুলু অবাক হয়ে বললে—তাই নাকি?

সুরেন বললে—হিস্ট্রি ঠিক লিখছি নয়, হিস্ট্রির খসড়া করছি—

—তার মানেই তাই।

সুরেন বললে—কিন্তু আর বেশি দিন বোধহয় সে-কাজ করতে পারবো না।

—কেন? টুলু জিজ্ঞেস করলে।

সুরেন বললে—হয়ত কলকাতা ছেড়ে আমাকে অন্য কোথাও বাইরে চলে যেতে হবে। এমন এক জায়গায় চলে যেতে ইচ্ছে করছে, যেখানে কেউ আমাকে চিনবে না—

দেবেশ বললে—কেন রে? কী হলো তোর?

এতক্ষণে সহদেববাবু আবার ঘরে ঢুকে পড়েছেন। বললে—ফুলু তোমাদের চা-টা দিয়েছে বাবা?

দেবেশ বললে—হ্যাঁ, চা জলখাবার সব দিয়েছে, আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে বসুন—

সহদেববাবু বললেন—আমি থাকলে কি তোমরা কথা বলতে পারবে? আমি একটু বাইরে দাওয়ায় গিয়ে বসি তার চেয়ে—

—না না, আপনি কেন কষ্ট করতে যাবেন। আপনার সামনেই আমরা কথা বলতে পারবো। আমাদের তো গোপন কথা-টথা কিছু নেই। যা কথা হবে আপনার সামনেই হবে।

সহদেববাবু যেন দেবেশরা আসার পর থেকে ছটফট করছিলেন। তাঁরই যেন যত উদ্বেগ, যত ভয়। আসলে তিনি এটা বুঝতে পেরেছিলেন যে, দেবেশ না থাকলে টুলুকেও দেখবার কেউ থাকে না।

একবার মেয়েকে সহদেববাবু জিজ্ঞেস করেছিলেন—হ্যাঁ রে টুলু, ওই দেবেশ ছেলেটির কে-কে আছে সংসারে—

টুলু বলেছিল—তা কী করে জানবো বাবা?

—তা এতদিন মিশছিস, তাদের বাড়ির খবর নিসনি?

টুলু বলেছিল—মেশামেশি তো পার্টির অফিসে। বাইরে তো আমরা বেশি মিশি না। আর তাছাড়া দেবেশদা তো কখনও নিজের বাড়িও যায় না—

—সে কী? নিজের বাড়িতেই বা যায় না কেন?

টুলু বলেছিল—বা রে, সারাদিন যে পার্টির কাজ করে, বাড়ি যাবে কখন?

—তা পার্টির কাজ করলে কি আর কাউকে বাড়ি যেতে নেই! তুইও তো পার্টির কাজ করিস, তুই কেন বাড়ি আসিস?

টুলু বলেছিল—আমার কথা আলাদা বাবা—আমি বাড়ি ছেড়ে চলে গেলে তোমাদের কে দেখবে বলো তো?

সহদেববাবু বলেছিলেন—তা একদিন তো চলেই যাবি, বিয়ে হলে তখন তো তোকে চলে যেতেই হবে।

টুলু বলেছিলে—তুমি কী যে বলো বাবা, বিয়ে আমি করবোই না—

সহদেববাবু বলেছিলেন—ও-কথা বলিসনে মা। আমাদের জন্যে তুই কেন তোর জীবনটা নষ্ট করবি। আমরা তোর পথে বাধা হবো কেন? তোর সুখ হলে আমাদেরও তো সুখ হবে—

এ-সব অনেকদিন আগেকার কথা। তারপর কতদিন মেয়ে কত সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে। আবার কতদিন কত রাত করে বাড়ি ফিরে এসেছে। যখনি বাড়ি ফিরে এসেছে টুলু, তখনই সহদেববাবুর কেমন সন্দেহ হয়েছে—এত রাত করে কেন বাড়ি এল টুলু! জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয়েছে, এতক্ষণ কার সঙ্গে কোথায় ছিল সে। কিন্তু সহদেববাবুও সে-কথা জিজ্ঞেস করেননি, টুলুও নিজে থেকে কখনও সে-কথা উত্থাপন করেনি।

কিন্তু এই নিম্নবিত্ত সংসারে ওই মেয়েটাই যে ভরসা। যার ছেলে নেই সে যে মেয়ের ওপরে আশ্রয় করেই ভবিষ্যতের নিশ্চিন্ত আশ্রয় রচনা করে। মেয়েই

যে তার কাছে ছেলে। সেই টুলু যদি একদিন হঠাৎ বিয়ে করে তাঁকে ছেড়ে চলে যায়! ওই যে দেবেশ, ও-ও তো বিয়ে করে ফেলতে পারে টুলুকে। তখন টুলু যদি আর বাপকে না দেখে?

বাইরে দাওয়ার ওপর একটা মোড়ায় বসে বসে অনেক কথা ভাবছিলেন। ফুলু আর বুলুকে বাড়ির বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন আগেই। পাড়ার দোকান থেকে জলখাবারের মিষ্টি আনিয়ে দেবার পরই তাদের বাড়ির বাইরে খেলতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

ফুলু বলেছিল—যদি আবার কিছু কেনবার দরকার হয় বাবা?

সহদেববাবু বলেছিলেন—সে তখন আমি তোদের ডাকবো'খন। দেখছিস নে, এখন দিদির অফিসের লোকজন এসেছেন—

—তা এসেছেন তো কী হয়েছে? আমাদের সামনে কি ওরা কথা বলবে না?

সহদেববাবু বলেছিলেন—তা বলবে না কেন? কিন্তু জরুরী কথা তো, তোরা সেখানে না-ই বা থাকলি? দেখছিস নে, আমিও সেইজন্যে বাইরের দাওয়ায় চুপ করে বসে আছি—

তখন বোধহয় ফুলুরা বুঝলো।

সহদেববাবু বললেন—বেশি দূর যাসনে, আমি ডাকলে যেন তোদের সাড়া পাই—

সহদেববাবুর কানে আসছিল ঘরের ভেতরকার কথাবার্তার শব্দ। কিন্তু কিছু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল না। তবে টুলু যে এত কথা বলতে পারে তা আগে জানতেন না সহদেববাবু। হাসির আওয়াজও আসছিল মাঝে মাঝে। বোঝা যাচ্ছিল তিনজনে খুবই কথাবার্তায় মশগুল। হয়ত টুলু নিজের মনের মত লোক পেয়েছে কথা বলবার। হয়ত ওদের সঙ্গে মিশেই টুলু বেশি সুখ পায়। তিনি দুটো ছোট ছোট মেয়ে নিয়ে মিছিমিছি টুলুর ঘাড়ে বোঝা হয়ে আছেন। হয়ত ওই ছেলেটাকে বিয়ে করবে টুলু! আর যদি করেই তো তিনি আর কী করতে পারেন। বিয়ে করলে করবে!

হঠাৎ পেছনে কথাবার্তা স্পষ্ট হয়ে উঠলো। দুটি ছেলেই ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে।

সহদেববাবুও উঠে দাঁড়ালেন।

বললেন -কী হলো? এত সকাল সকাল চলে যাচ্ছ যে? আর একটু বসবে না?

দেবেশ বললে—না, অনেকক্ষণ এসেছি, এবার যাই—

—তাহলে আব্যর কবে আসবে বাবাজীরা?

দেবেশ বললে—আবার একদিন হুট্ করে এসে পড়বো—

সহদেববাবু বললেন—হ্যাঁ, আবার এসো বাবা মনে করে। সারাদিন টুলু মুখ বুঁজে পড়ে থাকে, তোমরা এলে তবু একটু হাসি-গল্প করে আরাম পায়। আমি বুড়ো অন্ধ মানুষ, আমার সঙ্গে আর কতক্ষণ কথা বলতে ভাল লাগে!

দেবেশ বললে—আর টুলু তো এখন ভালো হয়ে উঠেছে, আর বেশিদিন ওকে শুয়ে থাকতে হবে না। এবার ও ওঠা-হাঁটা করতে পারবে।

সহদেববাবু বললেন—সবই তোমাদের জন্যে বাবা, যা বিপদ গেল, তোমরা না থাকলে কে আর আমাদের দেখতো বলো—

তারপর কী মনে হলো ঝাপ্সা দৃষ্টিটা সুরেনের দিকে ফিরিয়ে বললে—তুমিও আবার এসো বাবা, তুমি আজ প্রথম এলে। এ তোমার নিজের ঘর-বাড়ি

মনে করবে—

সুরেন বললে—আমাকে বলতে হবে না, আমি তো বাড়ি চিনে গেলুম, আমি নিজেই আবার একদিন আসবো—

বলে সহদেববাবুকে দু'হাত জোড় করে নমস্কার করলে। তারপর দু'জনেই রাস্তায় পা বাড়ালো।

সহদেববাবু তাড়াতাড়ি ঘরের ভেতরে ঢুকলেন।

বললেন—ও ছেলেটি কে মা টুলু? ওই যে নতুন ছেলেটি? ও-ও কি তোদের পার্টির?

টুলু শুধু বললে—না—

সহদেববাবু বললেন—তা তোদের পার্টির নয় তো তোর সঙ্গে আলাপ হলো কী করে?

টুলু যেন একটু রাগ করলে। বললে—তা পার্টিতে না থাকলে কি কারো সঙ্গে আলাপ থাকতে নেই! ও তো দেবেশদা'র বন্ধু!

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। এতক্ষণে যেন বুঝলেন সহদেববাবু। বললেন—কী বলছিল রে ওরা এতক্ষণ?

টুলু বললে—কী আবার বলবে। ফুলুর চশমা তো ওই সুরেনদাই কিনে দিয়েছিল। আমি দাম দিতে চাইছিলাম, তা নিলে না—

—ও, তাই নাকি? তা ছেলেটি কোথায় থাকে রে?

টুলুর যেন বেশি কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না। শুধু বললে—শ্যামবাজারে—

—শ্যামবাজার? সে বুঝি অনেক দূর?

—না।

সহদেববাবু তবু থামলেন না। বললেন—ওর বাড়ীতে কে-কে আছে মা? বাপ-মা আছে? ভাই-বোন? বিয়ে-টিয়ে হয়েছে নাকি?

টুলু বললে—তুমি চুপ করো তো বাবা, তুমি বুড়ো মানুষ, চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থাকো না! কার বাড়িতে কে-কে আছে, ভাই-বোন ক'টা, বিয়ে হয়েছে কিনা, তা আমি জানবো কী করে?

বলে পাশ ফিরে শুলো। সহদেববাবু আর কোনও কথা বললেন না। গিয়ে গুম্ হয়ে শুয়ে পড়লেন নিজের তক্তপোষের ওপর।

নরেশ দত্তর মনটা বহুদিন থেকেই খারাপ ছিল। নরেশ দত্তর মন এমনি সারাদিন খারাপই থাকে। তারপর আবার একটু তরল পদার্থ পড়লেই চাঙ্গা হয়ে ওঠে। একে বহুদিনের অভ্যেস, তার ওপর মেজাজ খারাপ। খারাপ মেজাজের ওপর তরল পদার্থটির ক্রিয়া ভালো করে খাটে। কিন্তু ক'দিন থেকে তাও খাটছিল না। বোতলগুলোকে জোলো মনে হচ্ছিল। বেটারা সব জিনিসে আজ ভেজাল চালাচ্ছে। তা ভেজাল চালাচ্ছে চালাক, কিন্তু তা বলে আসল জিনিসেই ভেজাল চালাবে? তাহলে মানুষ বাঁচবে কী নিয়ে!

আসলে মেজাজ খারাপ হবার কারণ আছে। মাধব কুণ্ডু লেনের উইলটা নিয়ে গিয়ে একজন উকীলকে দেখিয়েছিল নরেশ দত্ত।

উকীলবাবু ভালো করে উইলটা দেখলেন। নিচেয় নাম লেখা—লাবণ্যময়ী দাসী।

বললেন—কার উইল? কে উইল করছে?

নরেশ দত্ত বললে—লাবণ্যময়ী দাসী—ওই সই রয়েছে—

—তা চারজন সাক্ষীর সই দরকার। তাও নেই। আর এ তো রেজিস্ট্রি করাও হয়নি।

নরেশ দত্ত বললে—তা আজ্ঞে, ভেতরে একটু যদি অদল-বদল করি তো কিছু অন্যায় হবে?

—কী অদল-বদল?

নরেশ দত্ত বললে—ওই সুরেন্দ্রনাথ সান্ন্যালের জায়গায় যদি কালীকান্ত বিশ্বাস নামটা বসিয়ে দেওয়া যায়?

—সে কে?

নরেশ দত্ত বললে—সে হলো গিয়ে ওই সুখদাবালা দাসীর স্বামী! একটু কাটাকাটি হলে কিছু দোষ আছে?

উকীলবাবু বললেন—দোষ আছে বৈকি! উইলে কাটাকুটি, নাম-বদল না-থাকাই ভালো। তাতে আবার সকলের সই-সাবুদ দরকার। আর সাক্ষীরা কোথায়? তাদেরও যে সই দরকার।

নরেশ দত্ত বললে—সব আমি ব্যবস্থা করবো। আপনাকে কত দিতে হবে!

উকীলবাবু বললেন—দু' হাজার টাকা—

—দু'হাজার?

যেন চমকে উঠলো নরেশ দত্ত। বললে—বলছেন কী, আপনি? দু'হাজার টাকা একটা উইল রেজিস্ট্রি খরচা?

উকীলবাবু বললেন—এ তো আমি খুব কম বলেছি, সাত লাখ টাকার সম্পত্তিতে আমরা সাড়ে তিন হাজার নিয়ে থাকি।

নরেশ দত্ত বললে—এক দর? কিছু কম হবে না?

উকীলবাবু মুখ সরিয়ে নিলেন। অন্য কাগজপত্রের দিকে নজর দিতে দিতে বললেন—না—

নরেশ দত্ত খানিকক্ষণ সেখানে বসে রইল। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেছে। তারপর রাস্তার একটা দোকানে চা খেয়ে নিয়েছে। পকেটে রেখে দিয়েছিল গোলা-পাকানো উইলটা। অনেকদিন থেকেই জিনিসটা ছিল কাছে। একবার ভেবেছিল কাউকে পড়িয়ে দেখাবে। কিন্তু বিশ্বাস করবার মত লোক পায়নি একটাও। এমন লোক হওয়া চাই যে কাউকে কথাটা ফাঁস করবে না। কিন্তু তেমন লোক দুনিয়ায় কোথায়? সবাই তো ফেরেব্বাজ। যত লোক দেখেছে নরেশ দত্ত সবাই এক নম্বরের ফেরেব্বাজ। টাকা পেলে সব কিছু করতে পারে কলকাতায়।

তারপর সেদিন হঠাৎ কালীকান্ত বিশ্বাস খবরটা দিলে যে মা-মণির অসুখ। আর বাঁচবে না।

শুনে নরেশ দত্তর মাথায় টনক নড়লো।

বললে—তুই ঠিক জানিস? ঠিক জানিস অসুখ?

কালীকান্ত বললে—হ্যাঁ ছোড়দা, আমি ঠিক জানি!

নরেশ দত্ত বললে—কোথায় খবর পেলি?

কালীকান্ত বললে—বাহাদুর সিং-এর কাছে শুনেছি। একেবারে মরো-মরো অসুখ। ডাক্তার এসে বলে গেছে হার্ট খারাপ, আর বাঁচবে না।

—কেন, কী হয়েছিল হঠাৎ?

কালীকান্ত বললে—শুনলুম সুখদার সঙ্গে ঝগড়ার পর দেয়ালে মাথা ঠুকেছিল মা-মণি, সঙ্গে সঙ্গে মাথা দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরিয়ে একেবারে কুপোকাত। এখন খাবি খাচ্ছে—

কথাটা শুনে পর্যন্ত ছটফট করছিল নরেশ দত্ত। এরই ফাঁকে উইলটার একটা কিছু ফয়সলা করে ফেলা ভালো। নইলে উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ হয়ে যাবে। দু'তিন দিন ধরে নানান মতলব মাথায় ঘুরতে লাগলো। তারপর কাউকে কিছু না বলে উকীলের সন্ধানে এসে পড়েছিল এখানে। কিন্তু এখানে এসেও সুরাহা হচ্ছে না। দু'হাজার টাকা চায় বেটা। আরে, দু'হাজার টাকাই যদি দেবো তো তোর মত বটতলার উকীলের কাছে আসবো কেন? হাইকোর্টের এ্যাটর্নীর কাছে যাবো। তারা যেমন টাকা নেবে, কাজও দেবে তেমনি। একেবারে পাকা কাজ। তারা আইনের দাঁড় দিয়ে এমন কষে বাঁধবে যে তার আর ছাড়ান-ছোড়ন নেই।

অনেকক্ষণ বসে থাকবার পর নরেশ দত্ত বললে—তাহলে কী করবো? চলে যাবো?

উকীলবাবু বললেন—আমার কথা তো আমি বলে দিয়েছি—

নরেশ দত্ত বললে—কিন্তু এ-কাজ কাউকে-না-কাউকে দিয়ে আমাকে হাসিল করতেই হবে। সম্পত্তির মালিক মরো-মরো, এখন আমার সবুর করবার সময় নেই। সই-সাবুদ যা-হোক এখনই কিছু সব করিয়ে নিতে হবে।

উকীলবাবু কিন্তু যেমন-তেমন লোক নন। বললেন—আমি তো বলেই দিয়েছি, এখন আপনার যা অভিরুচি!

—তাহলে এই আপনার শেষ কথা?

উকীলবাবু তখন বিরক্ত হয়ে গেছেন। বললেন—আর কথা বাড়াবেন না আপনি। জাল উইলের ব্যাপারে আমরা ওর কম নিতে পারি না। ওতে আমাদের অনেক রিস্‌ক—

—ঠিক আছে! নরেশ দত্ত তখন এমনিতেই রেগে গিয়েছিল।

উঠে দাঁড়াল সে। বললে—জাল উইল বলছেন কেন?

—জাল উইল না তো কী? উইল জাল করবার জন্যেই তো আমার কাছে এসেছেন, আমরা কিছু ধরতে পারি না মনে করেছেন? আমরা কিছু বুঝি না?

নরেশ দত্ত এ-সব কথায় ঘাবড়াবার মানুষ নয়। একদিন নিজের পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে, এই সব উকীলদের চেনা আছে তখন থেকেই। সম্পত্তির গন্ধ পেলেই এরা কুমীরের মত হাঁ করে। রেগে তখন ফেটে পড়ছে নরেশ দত্ত। একটা নমস্কার পর্যন্ত না করেই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লো। অন্য দিন হলে সোজা ভাঁটিখানায় চলে যেত, কিন্তু লাখ-লাখ টাকার ব্যাপার, অত গাফিলতি করা উচিত নয়।

একেবারে সোজা রিক্‌সা পাকড়ে হাজির হলো গিয়ে কালীকান্তর বাড়িতে।

কালীকান্ত বিশ্বাস তখন আরো মন-মরা হয়ে পড়ে আছে। ক'দিন থেকে তারও দিনকাল খারাপ কাটছে। সুখদা চলে যাবার পর থেকেই যেন তাদের দু'জনের জীবনেই ভাঁটা পড়েছে। টাকাও কম পড়েছে, ফুর্তিতেও টান পড়েছে। ছোড়দার গলা শুনেই কালীকান্ত দরজা খুলে দিলে।

নরেশ দত্ত ভেতরে ঢুকেই বললে—কী রে, দুপুর বেলা ঘরে দম্ মেরে পড়ে আছিস?

কালীকান্ত বললে—দম্ মেরে পড়ে থাকবো না তো কী করবো? মেজাজ বিগড়ে গেছে যে!

নরেশ দত্ত বললে—মেজাজ তো আমারও বিগড়ে আছে, তা বলে আমি হাত-পা গুটিয়ে বসে আছি? এক বেটা উকীলের বাড়ি থেকে আসছি। এ উইল জাল হবে না। দু'হাজার টাকা আগাম চায়। তোর কাছে এলুম এইজন্যেই। মা-মণির এখন মরো-মরো অবস্থা, এমন সুযোগ আর রোজ-রোজ আসবে না—

কালীকান্ত বললে—তা আমি কী করবো?

নরেশ দত্ত বললে—তুই তোর বউ-এর কাছে গিয়ে একটা উইল দিবি, বলবি তাতে মা-মণির নাম সই করতে—

সুরেন সান্ন্যালের নামের জায়গায় কালীকান্ত বিশ্বাসের নাম বসিয়ে নতুন উইল টাইপ করিয়ে নিয়ে যাবি, নিয়ে গিয়ে তোর বৌ এর হাতে দিবি—পারবি না?

মতলবটা কালীকান্তর বেশ মনের মত হলো।

বললে—কিন্তু মা-মণি তাতে সই করবে কেন?

নরেশ দত্ত বললে—তা তোর বউকে মা-মণি এত ভালবাসে বলিস, সই করবে না?

—কিন্তু ওদিকে যে এক কাণ্ড হয়েছে!

নরেশ দত্ত বললে—কী কাণ্ড?

কালীকান্ত বললে—সে এক কেলেঙ্কারী কাণ্ড। শুনলুম সুরেন সান্ন্যাল নাকি রাত্তির বেলা আমার বৌ-এর ঘরে ঢুকে তাকে হঠাৎ জাপটে ধরেছিল—

—সে কী রে? পেটে পেটে ছোঁড়াটার এত বুদ্ধি!

কালীকান্ত বললে—হ্যাঁ, সেই নিয়ে ও-বাড়িতে খুব কানাঘুষো হয়েছে। সবাই জেনে গেছে ব্যাপারটা—

নরেশ দত্ত সব শুনে যেন খুশী হলো। বললে—তাহলে তো কেল্লা ফতে। তোব বউ তাহলে আর গররাজী হবে না! আর মা-মণিও খুশী হয়ে সই দিয়ে দেবে—

তারপর একটু থেমে বললে—তাহলে তুই কবে সই করিয়ে আনবি?

কালীকান্ত বললে—আজই। আজই উইলখানা টাইপ করিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে দিয়ে আসবো—

—যদি ওই শালা ম্যানেজার দেখে ফেলে?

কালীকান্ত বললে—সে ব্যবস্থা আমার করা আছে। টাকার কাছে সব বেটা বশ।

বলে আর দাঁড়ালো না। সে যেন এতদিনে একটা হদিস পেয়েছে। ছোটবেলা থেকে কেবল ফুর্তির সন্ধানে গা এলিয়ে দিয়েছিল সে। এখানে-ওখানে ঘাটে-আঘাটে জীবনের নৌকো বাঁধবার চেষ্টা করেছে সে কতবার। শেষকালে এই ছোড়দার সাহায্যে সেটা মিলেও ছিল। কিন্তু তা-ও হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল নিজের ভুলে। লাখ লাখ টাকার সম্পত্তি তার হাতে এসেও হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল। এবার যেন আবার একটু আশা হলো।

নরেশ দত্ত বললে—আবার যেন মদ-ফদ খেয়ে কেলেঙ্কারি বাধিয়ে বসিসনি, বুঝলি?

কালীকান্ত বললে—এবার নাক-কান মুলছি ছোড়দা, অমন কাজ আর করছিনে—বলে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো।

কিন্তু হয়ত এই-ই হয়। এমনি করেই ভুল বোঝাবুঝির বোঝা মাথায় নিয়ে মানুষকে সংসারের পথে এগিয়ে যেতে হয়। নইলে সেদিন সেই রাত্রে সুখদাকে জড়িয়ে অমন কলঙ্ক রটবে কেন?

কে তার জন্যে দায়ী?

মনে আছে, সেদিন একেবারে ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে গিয়েছিল সুরেন। একবার মনে হয়েছিল চিৎকার করে সে প্রতিবাদ করে। চিৎকার করে সে সকলকে সমস্ত ঘটনাটা প্রকাশ করে দেয়। বলে—সব মিথ্যে, সব মিথ্যে—

কিন্তু না, এতবড় মিথ্যেটার প্রতিবাদ করাও যেন অন্যায়। যেন প্রতিবাদ করলে মিথ্যেটারই মর্যাদা দেওয়া হয়। জীবনে অনেক মিথ্যের মুখোমুখি হয়েও তো সে কখনও প্রতিবাদ করেনি। সুতরাং আজই বা প্রতিবাদ করবে কেন?

ততক্ষণে তেতলাটা মুখর হয়ে উঠেছে কলগুঞ্জনে। ততক্ষণে সবাই ছুটে আসছে সুখদার ঘরের দিকে। আর একটু দেরি হলেই সবাই সশরীরে তাকে দেখে ফেলবে। দেখে ফেলে নানা মুখরোচক চর্চার প্রশ্রয় দেবে। তার চেয়ে মুখের মত জবাব হবে তার এখান থেকে চলে যাওয়া।

কিন্তু নিচেয় চলে গিয়েই কি সুরেন বেঁচেছিল?

অত অসুখের মধ্যেও মা-মণি বাদামীকে জিজ্ঞেস করলে—ওখানে কী হয়েছে রে? ওরা কী বলছে?

বাদামী সত্যিই বুড়ো হয়ে গিয়েছিল। শরীর যেমন তার অচল হয়ে গিয়েছিল তেমনি অচল হয়ে গিয়েছিল শ্রবণশক্তি।

বললে—কোথায়? কারা? কাদের কথা বলছো?

কিন্তু মা-মণি শুনতে পাচ্ছিল তখনও। তেতলায় তার ঘরের বাইরে বারান্দার শেষ প্রান্ত থেকে তখনও যেন সুখদার গলা আসছিল।

মা-মণি গলা চড়িয়ে ডাকলে—তরলা, ও তরলা—

তরলা শুনতে পেয়েই ঘরে এল। মা-মণি জিজ্ঞেস করলে—ওখানে কী করছিলি তোরা? সুখদা কী বলছিল?

তরলা বললে—ভাগ্নেবাবু সুখদা দিদিমণির ঘরে ঢুকেছিল মা-মণি!

—কে? সুরেন?

তরলা বললে—হ্যাঁ—

মা-মণি বললে—কেন? সুখদার ঘরে কেন ঢুকেছিল?

তরলা বললে—তা তো জানিনে মা-মণি! দেখলুম ভাগ্নেবাবু সুখদা দিদিমণির কাপড় ধরে টানাটানি করছে—

—তুই দেখলি? তুই নিজে দেখলি?

তরলা বললে—আমি দেখলুম, আমার সঙ্গে ম্যানেজারবাবু ছিল, ম্যানেজারবাবুও দেখলে—

—তা ম্যানেজারবাবু কোথায়?

—নিচেয় চলে গেছে।

—আর সুরেন? ভাগ্নেবাবু? সে কোথায়?

তরলা বললে—সেও নিচেয় চলে গেছে। আমাদের দেখেই সিঁড়ি দিয়ে

নিচেয় নেমে গেল।

—আর সুখদা? সুখদা কোথায়?

—সুখদা দিদিমণি নিজের বিছানায় শুয়ে কাঁদছে।

—কেন? কাঁদছে কেন?

—তা জানিনে। দিদিমণি বলছে ভাগ্নেবাবু তাকে একলা পেয়ে তার গায়ে হাত দিয়েছিল—

মা-মণি কথাটা শুনে গম্ভীর হয়ে গেল খানিকক্ষণের জন্যে। তুই সুখদাকে ডেকে আন তো, আমার কাছে—যা—

তরলা আর দাঁড়ালো না। সোজা সুখদাকে ডেকে এনে হাজির করলো মা-মণির সামনে। সুখদা শাড়ির আঁচলে মুখ-চোখ ঢেকে তখনও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

মা-মণির সারা মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। মাথার যন্ত্রণায় সমস্ত শরীর তখন দুর্বল। তবু সুখদাকে কাঁদতে দেখে যেন মাথা থেকে পা পর্যন্ত সমস্ত শরীর রি-রি করে উঠলো।

বললে—কী হয়েছিল রে সুখদা?

সুখদা সেইভাবেই মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগলো।

মা-মণি বললে—ঢং রাখ, কী হয়েছিল খুলে বল্?

সুখদার মুখে তখনও কোনও উত্তর নেই।

মা-মণি বললে—কী রে? বোবা হয়ে গেলি নাকি? তোর মুখে কোনও কথা নেই? বল্ কী হয়েছিল?

সুখদা তখনও মুখ ঢেকে রইল।

মা-মণি বললে—মুখের কাপড় নামা—নামা বলছি—

তবু কাপড় নামাচ্ছে না দেখে মা-মণি তরলাকে বললে—তরলা, সুখদার মুখের কাপড় নামিয়ে দে তো—

তরলা কথাটা শুনে যেন একটু দ্বিধা করতে লাগলো।

মা-মণি বললে—কী রে, কানে কথা যাচ্ছে না তোর? কাপড়টা ওর মুখ থেকে টেনে নামিয়ে দে—

তরলা সুখদার কাপড় ধরে টানতে গেল, কিন্তু সুখদা তখন মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে সরে দাঁড়িয়েছে।

মা-মণির তখন বেশ রাগ হয়ে গেছে।

বললে—হ্যাঁ রে, তুই কি আমাকে খুন না করে থামবি না? তুই কি চাস আমি মরে যাই? তোর জ্বালায় আমি কপাল ফাটিয়ে রক্ত বার করে ফেললুম। তবু তোর হুঁশ হলো না? তুই আমাকে সত্যি-সত্যিই মেরে ফেলতে চাস? ...কী হয়েছিল বলবি তো? সুরেন তোর ঘরে গেল কেন? কিছু দরকার ছিল তোর সঙ্গে? বল্, কথার জবাব দে—

সুখদা তবু চুপ।

মা-মণি এবার সুর বদলালো—ওরে, এদিকে আয়, শোন্, আমার কাছে আয়—

তবু সুখদা নড়লো না।

মা-মণি তরলার দিকে চেয়ে বললে—সুখদাকে আমার কাছে ধরে নিয়ে আয় তো—

তরলা সুখদার দিকে এগোচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই সুখদা নিজে এগিয়ে

এল মা-মণির কাছে।

—আয়, আয়, আয় মা আয়—

সুখদা এসে মা-মণির পায়ের কাছে মুখ ঢেকে বসে পড়লো।

—কী রে, মুখ তোল্, আমি দেখি তোর মুখখানা—

বলে সুখদার চিবুকটা ধরে মুখখানা ওপরের দিকে তোলবার চেষ্টা করলে। কিন্তু সুখদা মা-মণির পায়ের ওপর তখন জোরে মুখ চেপে রয়েছে।

মা-মণি বললে—কী হয়েছে আমাকে বল্। তুই আমাকে যত ইচ্ছে গালা-গালি দিস, কিন্তু তবু তো আমি তোর মা-মণি, আমাকে খুলে বল্ সব কথা। মায়ের কাছে বলতে তোর লজ্জা কী মা। বল্ সুরেন কী দোষ করেছে। সুরেন যদি কিছু দোষ করে থাকে আমি তাকে শাস্তি দেবো—বল্ বল্ আমাকে—

সুখদা তখন আরো জোরে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো।

মা-মণি বললে—কই, কিছু বলছিসনে যে—কথা বল্, কাঁদলে আমি কী বুঝবো?

মা-মণি তরলার দিকে চেয়ে বললে—তুই যা তো তরলা এখেন থেকে—

তরলা নিঃশব্দে বাইরে চলে যেতেই মা-মণি সুখদার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললে—কী হয়েছে এবার বল তো মা? সুরেন কী করেছিল?

সুখদা এবার আস্তে আস্তে মুখ তুললে। তার চোখমুখ ভিজে স্যাঁত-স্যাঁতে হয়ে গেছে।

বললে—তুমি তো আমার কথা বিশ্বাস করবে না মা-মণি!

মা-মণি বললে—তুই বলছিস কী মা? আমি তোর কথা বিশ্বাস করবো না?

সুখদা বললে—আমি তোমাকে কত কষ্ট দিই, আমার জন্যেই তোমার এত হেনস্তা মা-মণি, তা কি আমি জানি না? কিন্তু কেন তুমি আমাকে এ-বাড়িতে নিয়ে এলে? আমি তো সেখানে বেশ ছিলুম। সেখানে আমার টাকা-কড়ি ছিল না বটে সেখানে আমার স্বামী মদ খেত, মাতলামি করতো, সব সত্যি, কিন্তু সেখানে আমার মান-সম্ভ্রম তো ছিল। সেখানে কেউ তো অপমান করতে সাহস করেনি!

—কিন্তু কী হয়েছিল তা খুলে বলবি তো? এখেনে কে তোকে কী করেছে? কে অপমান করলো?

সুখদা বললে—সে তুমি আমার কথা বিশ্বাস করবে না—

—কেন বিশ্বাস করবো না! কে অপমান করেছে তার নাম বল্। আমি তাকে আমার কাছে ডাকিয়ে আনাবো। তা সুরেন তোকে কিছু বলেছে?

সুখদা কিছু উত্তর না দিয়ে আবার মা-মণির গায়ের মধ্যে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে লাগলো।

মা মণি বললে—আবার কাঁদে! কাঁদলে আমি বুঝবো কী করে কে অপমান করেছে তোকে? সুরেন যদি তোকে অপমান করে থাকে তো আমি তাকে এখুনি আমার কাছে ডেকে পাঠাচ্ছি। তার এত বড় আস্পর্ধা তোকে অপমান করে সে?

—না মা মণি, তুমি তাকে ভালোবাসো, তার বিরুদ্ধে কোনও কথা আমি বলতে চাই না। তুমি তাকে ডেকো না—

—তা তাকে ভালোবাসি বলে কি তোকে আমি ভালোবাসি না? তুই কি আমার কেউ নোস্? তোর চেয়ে সে-ই বড় হলো?

সুখদা বললে—সে-সব আমি বুঝি না মা-মণি। আমি যদি অতই বুঝবো তো আমার এই দশা হয়! নইলে স্বামী থাকতেও আমি তোমার এখেনে পড়ে

থাকি? আমার কপাল এমন করে পোড়ে? আমি তোমার মত লোককে এত কষ্ট দিই?

মা-মণি সুখদার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললে—তুই চুপ কর মা, চুপ কর।

তারপর একটু থেমে বললে—এবার মাথা ঠাণ্ডা করে বল্ তো কী হয়েছিল?

সুখদা বললে—সে তুমি শুনতে চেও না মা-মণি। শুনলে তোমার রাগ হবে।

মা-মণি বললে—হোক রাগ, তবু শুনবো, তুই বল আমাকে—

সুখদা বললে—তুমি তোমার সুরেনকে ডেকেই জিজ্ঞেস করো না. সে-ই বলবে—

মা-মণি বললে—তাই-ই ডাকছি—

বলে ডাকলে—তরলা—

তরলা বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল। ডাক পেতেই ভেতরে এল।

মা-মণি বললে—তোর ভাগ্নেবাবুকে ডেকে আন তো। বলবি আমি ডাকছি। যেন এখুনি একবার আসে—

তরলা চলে গেল।

সুখদা বললে—তাহলে আমি এখান থেকে চলে যাই মা-মণি—

—কেন, তুই যাবি কেন? তোর সামনেই মোকাবিলা হোক—

সুখদা বললে—না মা-মণি, আমি লজ্জার মাথা খেয়ে এখেনে থাকতে পারবো না—

বলে উঠে দাঁড়ালো। তারপর তাড়াতাড়ি পা ফেলে ঘরের বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সুরেন সেদিন নিজের ঘরের চারটে দেয়ালের মধ্যেই আত্মগোপন করতে চেয়েছিল। তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নিচেয় নেমে তার নিজের ঘরটার মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। সমস্ত দিন পুণ্যশ্লোকবাবুর বাড়িতে কাটিয়েছে। সেই কোন্ সকালে ভাত খেয়ে বেরিয়েছিল। তারপর এখন বাড়িতে ফিরে এসে এ কী দুর্দৈব! এতদিন ধরে সমস্ত জীবনটাকে সে একটা নির্দিষ্ট খাতে বইয়ে দিতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তার সৃষ্টিকর্তার বোধহয় তা ইচ্ছে নয়! নইলে কেন সে এই নিষ্ঠুর সহরে এল। কেন সে এসে এই বাড়িতেই উঠলো। কেন তার সঙ্গে পরিচয় হলো সুখদার, কেন সে পমিলির সঙ্গে অত ঘনিষ্ঠভাবে মিশলো! কেনই বা আবার সে টুলুর সঙ্গে নতুন করে সম্পর্ক পাতাতে চলেছে! কেন সে একলা থাকতে পারে না! আর সকলের মত কেন সে স্বাভাবিক সহজ জীবনের মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দেবার সুযোগ পেলে না! আসলে সে তো এ-সব চায়নি! অথচ সে তো কতবার চেষ্টা করেছে এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে। কতবার চাকরির চেষ্টা করেছে। কতবার দেবেশদের পার্টির অফিসে গিয়ে থাকতে চেয়েছে। কিন্তু তার বেলাতেই বা কেন কিছুই হয়নি। প্রত্যেক জায়গা থেকে তাকে খালি হাতে ফিরতে হয়েছে। ফিরে ফিরে কেবল এই মাধব কুণ্ডু লেনের বাড়িতে এসেই আশ্রয় নিতে হয়েছে। আর আশ্রয়ই যদি নিতে হয়েছে তো বে এখানে সে শান্তি পায়নি!

নিজের সমস্ত জীবনটা পরিক্রমা করতে করতে সুরেনের চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসবার উপক্রম হলো। অদৃশ্য এক দেবতার কাছে বার বার সে প্রার্থনা করতে লাগলো—কবে সে এ থেকে মুক্তি পাবে? কেন তার এই লাঞ্ছনা! সে তো কোনও বিশিষ্ট মানুষ হতে চায়নি। সে তো অর্থে খ্যাতিতে প্রতিষ্ঠায় প্রতিপত্তিতে কাউকে অতিক্রম করতে চায়নি! সে তো শুধু সাধারণ হতে চেয়েছিল। তবে কি সাধারণ হতে চাওয়াও অপরাধ?

হঠাৎ বাইরে থেকে দরজায় ধাক্কা পড়লো—সুরেন, এ্যাই সুরেন—

ভূপতি ভাদুড়ীর গলা। মামা ডাকতে এসেছে। মামা নিজের চোখে যা দেখেছে তাকে সে অস্বীকার কেমন করে করবে? কী বলে মামাকে বোঝাবে?

—দরজা খোল্, এ্যাই সুরেন?

সুরেন উঠে দরজা খুলে দিলে। দিয়ে মামার মুখোমুখি দাঁড়ালো।

—কী রে, দরজা ঠেলছি, খুলছিসনে কেন? এত বড় নচ্ছার হয়েছিস যে তুই মেয়েমানুষের ঘরে ঢুকেছিস? শেষকালে তোর এই প্রবৃত্তি? হাঁ করে শুনছিস কী? কেন গিয়েছিলি ওই ছুঁড়িটার ঘরে বল? ছুঁড়িটার ঘরে তোর যাবার দরকার হলো কেন?

সুরেন স্থাণুর মত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল শুধু।

—উত্তর দিচ্ছিসনে কেন? লুকিয়ে লুকিয়ে মেয়েমানুষের ঘরে ঢোকা? এত লেখাপড়া শিখে তোমার এই প্রবৃত্তি হয়েছে? তুই তোরও সর্বনাশ করলি, আর আমারও সর্বনাশ করলি? আমি এ-বাড়ির মালিকের কাছে মুখ দেখাবো কী করে বল দিকিনি? এতকাল এখেনে আছি, কেউ তো আমাকে এ-বদনাম দিতে পারেনি। শেষকালে তোর জন্যে কি এ-বাড়ি থেকে আমার অন্ন উঠে যাবে? আমি কি এই বুড়ো বয়েসে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াবো? তোর জন্যে কি আমি শেষ পর্যন্ত রাস্তার লোকের কাছে হাত পাতবো? তুই ভেবেছিস কী?

সুরেনের মুখে তখনও কোনও কথা নেই।

সুরেনের অবস্থা দেখে ভূপতি ভাদুড়ীর রক্ত আরো চড়ে গেল।

বললে—কী, কানে আমার কথা ঢুকছে না? যদি ভালো চাস তো কথার উত্তর দে! আমি ব্লাড-প্রেশারের রোগী, রক্ত মাথায় চড়ে গেলে তখন আর কিন্তু আমায় জ্ঞান থাকবে না। ভালোয় ভালোয় বলছি. উত্তর দে কথার। বল্, কেন ওই ছুঁড়িটার ঘরে ঢুকেছিলি?

সুরেন বললে—ওর ঘরে আমি ঢুকিনি—

—ঢুকিনি মানে? আমি নিজের চোখে দেখলুম তুই ওর ঘরে ঢুকেছিস, আর তবু বলছিস কিনা ঢুকিসনি?

—ও মিথ্যে কথা বলেছে। ও আমাকে ওর ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল!

—ও ওর ঘরে ডেকে নিয়ে গেল আর তুইও গেলি? রাত্তির বেলা এ-সময়ে ওর ঘরে তোর কী কাজ থাকতে পারে? ওর বিয়ে হয়ে গেছে, তোর সঙ্গে ওর কীসের সম্পর্ক?

সুরেন বললে—আমার সঙ্গে আবার কীসের সম্পর্ক থাকবে?

ভূপতি ভাদুড়ী চিৎকার করে উঠলো এবার।

বললে—হারামজাদা, সম্পর্ক যদি না থাকবে তো ওর ঘরে ঢুকেছিলি কেন তুই! কেন কাপড় ধরে টানাটানি করছিলি?

—আমি কাপড় টানিনি!

এবার আর থাকতে পারলে না ভূপতি ভাদুড়ী। সুরেনের গালের ওপর এক থাপ্পড় কষিয়ে দিলে জোরে। বললে—আবার মিথ্যে কথা! আমি নিজের চোখে দেখলুম কাপড় টানছিস, তবু বলছিস কাপড় টানিনি—

কিন্তু সুরেনের চোখে তখন সমস্ত কিছু ঝাপসা হয়ে গেছে। তার মনে হলো সে যেন এখনি টলে পড়ে যাবে। চোখ দিয়ে তখন তার টসটস করে জল পড়ছে। ব্লাড-প্রেশারের রোগীর গায়ে যত শক্তি ছিল সব দিয়ে মামা তাকে মেরেছে।

—হারামজাদা, মার খেয়েও জেদ। দাঁড়াও তোমাকে আমি দেখাচ্ছি। ছিলি তো গাঁয়ে পড়ে, সেখানে থাকলে এতদিন না-খেতে পেয়ে মরে যেতিস, আমি ডেকে এনে এখেনে তুলে মানুষ করলুম, তাও সহ্য হলো না। এখন পরের বউয়ের গায়ে হাত? বেরিয়ে যা বাড়ি থেকে, বেরিয়ে যা—

সুরেন তখনও চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল।

ভূপতি ভাদুড়ী আবার বলে উঠলো—বেরো—এখানে থাকতে হবে না তোকে, বেরিয়ে যা—সেবার চলে গিয়েছিলি বলে আদর করে ডেকে এনেছিলুম, এবার আর ডাকতে যাবো না, বেরো—

সুরেনের নির্বিকার মুখের ওপর চেয়ে ভূপতি ভাদুড়ী আরো রেগে গেল। বললে—হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছিস কী? বেরো, তোকে বাড়ি থেকে বার করে দিয়ে তবে আমার শান্তি, বেরো—

সুরেন মাথা নিচু করে উঠোনের দিকেই যাচ্ছিল। হঠাৎ তরলা এসে হাজির হলো। বললে—ম্যানেজারবাবু, মা-মণি ভাগ্নেবাবুকে ডাকছে—

সুরেন মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াল।

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—কেন? ডাকছে কেন রে?

তরলা বললে—তা জানিনে।

—সুখদা দিদিমণি কোথায়?

তরলা বললে—সুখদা দিদিমণিকেও ডেকেছিল মা-মণি, এখন ভাগ্নে-বাবুকে ডাকতে বললে—

—তা সুখদা দিদিমণি কী বললে?

তরলা বললে—তা আমাকে শুনতে দেয়নি মা-মণি। আমাকে ঘরের বাইরে বের করে দিয়েছিল।

সুরেনের দিকে ফিরে ভূপতি ভাদুড়ী বললে—যা, মা-মণি ডাকছে। এবার মজা টের পাইয়ে দেবে, যা,—এতদিন ধরে খাইয়ে-পরিয়ে মানুষ করে এই তো তার পরিণাম! এখন মা-মণির হাতে পায়ে গিয়ে ধরো গে—

সুরেন আবার অন্দর মহলের সিঁড়ির দিকে এগিয়ে চললো। তরলা চলতে লাগলো পেছনে পেছনে।

এমনি করে কতবার সুরেন এই সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠেছে, কিন্তু কখনও এমন করে হৃদ্‌কম্প হয়নি। কখনও মনে হয়নি, সে তার নিজের জবাবদিহি করতে যাচ্ছে। কখনও মনে হয়নি সে অপরাধের সাফাই গাইতে যাচ্ছে—

পেছনে তরলা আসছিল।

অনেক রাত হয়ে গেছে, সমস্ত দিনটা পরিশ্রমের ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়েছিল। সে অবসন্নতা তখন আরো বেড়েছে। হঠাৎ সে তরলাকে জিজ্ঞেস করলে—

মা-মণি আমাকে ডেকেছে কিসের জন্যে, জানো?

তরলা শুধু বললে—না—

সুরেনের মনে হলো তরলাও যেন তাকে সন্দেহ করছে। তরলাও যেন সুরেনকে অপরাধী ভেবে নিয়েছে। তাকে দোষও দেওয়া যায় না সেজন্যে। সে মেয়েমানুষ হলেও কী করে সুখদাকে চিনবে? সুখদাকে ছোটবেলা থেকে দেখে এসেছে সে, কিন্তু ছোটবেলা থেকে দেখলেই কি একজন মানুষের সব কিছু জানা যায়! বিশেষ করে সুখদাদের মতন মেয়েদের!

ওপরে মা-মণির ঘরে আলো জ্বলছিল। সেই আলোতেই দেখা গেল, মা-মণি বিছানার ওপর দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছে। মাথায় কাপড়ের ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। দরজার দিকে চোখ। যেন তার আসার জন্যেই অপেক্ষা করছে মা-মণি।

সুরেনকে দেখেই বললে—কী সব শুনছি রে তোর নামে? তুই সুখদার কী করেছিস?

কথা শুনেই সুরেন ঘরের মধ্যে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

মা-মণি আবার বললে—বল কী করেছিস তুই?

সুরেন বললে—তুমি তো সবই শুনেছ, আবার জিজ্ঞেস করছো কেন?

—তা, আমি যা শুনেছি সব সত্যি বলছিস তুই?

সুরেন বললে—তুমি যদি তাই-ই বিশ্বাস করে থাকো তো সবই সত্যি!

—তাহলে তুই সুখদার ঘরে ঢুকেছিলি? সুখদা তাহলে মিথ্যে কথা বলেনি?

সুরেন বললে—আমি তো বললুম, তুমি যদি তার কথাই বিশ্বাস করে থাকো তো সব সত্যি! সে তোমাকে যা কিছু বলে গেছে তার এক বর্ণও মিথ্যে নয়—

—তবু ঘুরিয়ে কথা বলছিস কেন? বল না সত্যি না মিথ্যে?

সুরেন বললে—তা তুমি কি আমার কথা বিশ্বাস করবে? তোমার কাছে আমার চেয়ে সুখদাই তো বেশি বিশ্বাসী! সুখদা তো তোমার নিজের লোক, আমি কে? আমি তো পর?

মা-মণি খানিকক্ষণ চেয়ে রইল সুরেনের দিকে। তারপর বললে—এতদিন পরে তুই এই কথা বললি আমাকে?

সুরেন বললে—বলবো না? তুমি যদি সুখদাকে বিশ্বাসই না করবে তো আমাকে ডাকলে কেন? তুমি কি সত্যি বিশ্বাস করো আমি সুখদার ঘরে ঢুকেছি?

—তা তুই যদি না ঢুকবি তো তরলা কাকে দেখেছে? তোর মামা কাকে দেখেছে? তারা তোকে নিজে চোখে দেখেনি? না কি তাও মিথ্যে বলতে চাস?

সুরেন বললে—আমিও তো তাই বলছি, যদি ওদের সকলের কথাই তুমি বিশ্বাস করে থাকো তো আমাকে ডেকে কেন জিজ্ঞেস করছো, সত্যি না মিথ্যে! যা বলবার তুমিই বলো না। তোমার যদি ইচ্ছে হয় তো বলো-না আমি তোমার বাড়ি ছেড়ে চলে যাই—

—তুই বলছিস কী? তুই বাড়ি ছেড়ে চলে যাবি?

সুরেন বললে—তা তুমি নিজের মুখে যে-কথাটা বলতে পারছো না, সেই কথাটাই আমি বলে দিলুম। আমি এ-বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেই যদি তুমি খুশী হও তো আমি তাই-ই যাচ্ছি—

বলে সুরেন চলেই আসছিল, কিন্তু মা-মণি পেছন থেকে ডাকলে—যাসনে—শোন্—

সুরেন সামনে মুখ করে দাঁড়ালো।

মা-মণি বললে—কার ওপর রাগ করে চলে যাচ্ছিস তুই? আমি ছাড়া আর কে তোকে এমন করে তোর রাগের দাম দেবে? আমার মত কে তোকে এমন করে সব সময় বুকে আগলে রাখবে শুনি?

সুরেন মা-মণির কথায় যেন গলে গেল। চোখে তার জল আসবার জোগাড় হলো। কিন্তু তবু নরম হলো না। বললে—তুমি কি মনে করেছ আমার কোনও মান-অপমান জ্ঞান নেই

মা-মণি একটা হাত বাড়িয়ে দিলে সুরেনের দিকে। বললে—ওরে, তোর মান-অপমান নিয়ে তুই থাক, আমায় আর কাঁদাসনে। তুই তো জানিস না, ডাক্তার এসে বলে গেছে আমি আর বেশি দিন বাঁচবো না—

সুরেন বললে—তা সেও কি আমার দোষ? সুখদার জন্যে তোমার মাথা ফাটলো আর আমার ওপর তোমার যত রাগ! আমি কী অপরাধ করলুম?

মা-মণি বললে—তাহলে কেন সুখদা আমার কাছে এসে তোর নামে অত কথা বললে?

—তা সে-কথা তুমি সুখদাকে জিজ্ঞেস করলেই পারতে!

মা-মণি বললে—তা তো জিজ্ঞেস করেছিলুম, সে তো তোর নামে দোষ দিলে—

সুরেন বললে—সে আমার নামে দোষ দিলে আর তুমিও তাই বিশ্বাস করলে?

মা-মণির মাথার ভেতর যেন সব গোলমাল হয়ে গেল। বললে—কেন তোরা ঝগড়া করতে যাস বল্ তো! তোরা যদি ঝগড়াই করবি তো তা আমার কানে তুলিস কেন? আমি যে মরো-মরো তা তোরা কি বুঝিস না? আমি যে বেশি দিন বাঁচবো না রে—সংসারে অশান্তি দেখলে যে আমার মনেও অশান্তি হয়--

সুরেন বললে—কিন্তু তুমি বিশ্বাস করো মা-মণি, আমার দিক থেকে আমি কোন অন্যায় করিনি।

মা-মণি যেন অবাক হয়ে গেল সুরেনের কথা শুনে।

সুরেন বললে—এই তোমার পা ছুঁয়ে বলছি, আমি কোনও অন্যায় করিনি মা-মণি, আমি জ্ঞানতঃ কোনও অন্যায় করিনি—

বলে সে মা-মণির পায়ে হাত দিয়ে মাথায় ঠেকালে।

মা-মণি সুরেনের হাত দুটো ধরতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ কোথা থেকে সুখদা ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়লো। বললে—মা-মণি...

দু'জনেই চেয়ে দেখলে সুখদার চোখ দুটো যেন জ্বলছে। সুখদা ঘরে ঢুকেই বলে উঠলো—তোমার পায়ে হাত দিয়ে যে ডাহা মিথ্যে কথা বলতে পাবে তার কথাই তুমি বিশ্বাস করলে, আর আমার কথাটা কিছু না?

মা-মণি যেন বিরক্ত হলো। বললে—তুই আবার কেন এলি মা এ-ঘরে? তোকে কি আমি ডেকেছি?

সুখদা বললে—কিন্তু আমি যে আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনেছি! এমন জল-জ্যান্ত মিছে কথাটা শোনবার পরও চুপ করে থাকবো বলতে চাও? আমারও কি মান-অপমান জ্ঞান থাকতে নেই? আমার ওপর যে-সে অত্যাচার করে যাবে আর আমি মুখ বুঁজে মাথা পেতে সব সহ্য করবো মনে করো? আমি কি এ-বাড়ির

ঝি না চাকর!

—আঃ।

মা-মণির যেন আর সহ্য হচ্ছিল না! বললে—তুই কী বলছিস মা, তোর কি মাথা খারাপ হলো নাকি? কাকে কখন কী বলতে হয় তাও এখনও শিখলি না?

সুখদা যেন ঝগড়া করবে বলে তৈরি হয়েই ছিল!

বললে—তোমার নিজের শুনতে ভালো লাগছে না তাই বলো। তোমার আদরের সুরেনের নিন্দে শুনতে তো ভালো লাগবেই না। কই, আমার নিন্দে শুনতে তো খুব ভালো লাগছিল। তখন তো খুব মিষ্টি-মিষ্টি করে আদর-মাখানো কথা বলছিলে!

মা-মণি আর পারলে না। বললে—হ্যাঁ লা, তোর হলোটা কী? তোর কি যখন-তখন ঝগড়া না করলে পেটের ভাত হজম হয় না?

—থামো তুমি! ঝগড়া আমি করি না তুমি করো? তুমিই তো সোহাগ দেখিয়ে আমাকে এখানে ঝগড়া করতে নিয়ে এলে! আমি কি তোমাকে পায়ে ধরে সেধেছি আমাকে এখেনে নিয়ে আসবার জন্যে? তুমি তো জানতে আমি ঝগড়া করি, তাহলে আমাকে নিয়ে এসে এত আদিখ্যেতা করতে গেলে কেন? আমাকে না নিয়ে এলেই হতো, তাতে তুমিও বাঁচতে, আর তোমার আদরের সুরেনও বাঁচতো!

মা-মণি সুরেনের দিকে অসহায়ভাবে চেয়ে বললে—দেখছিস তো কেমন গায়ে পড়ে ঝগড়া করছে? তুই তো দেখছিস, আমি কিছু বলেছি ওকে?

সুরেন কোনও উত্তর দিলে না সে-কথার। মা-মণি সুরেনের কাছে কোনও সমর্থন না পেয়ে বললে—ও লো আমার ঘাট হয়েছে। আমি ঘাট মানছি তোর কাছে। তোর ক্ষুরে ক্ষুরে পেন্নাম করি আমি, এমন মেয়েও তোর মা পেটে ধরেছিল? তুই তো এমন ছিলি না বাছা আগে! তোর হলোটা কী বল্ তো!

সুখদা বললে—হবে আবার কী! ন্যায্য কথা বললে তোমার গায়ে তো লাগবেই। ন্যায্য কথা বলি বলেই আমি তোমার চক্ষুশূল তা কি আমি জানি না ভেবেছ? আমার নিজের মা নেই বলেই তোমার কাছে দরবার করি। নইলে তোমার কাছে কি বলতুম? তা আমার যেমন কপাল, পর কি আর নিজের মত হয়! আমারই ভুল হয়েছিল, আমি তোমাকে ভুল করে নিজের বলে মনে করে-ছিলুম। হ্যাঁ, আমারই ভুল হয়েছিল। এবার বলে রাখছি, যদি আমার ঘরে ঢুকে কেউ আমাকে খুন করেও যায় তো তবু একবারের জন্যেও তোমার কাছে নালিশ করতে আসবো না, এই প্রতিজ্ঞা করলুম—

বলে হনহন করে ঘরের বাইরে চলে গেল।

মা-মণি হতবাক্ হয়ে সেই দিকে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর বললে—দেখলি তো বাবা, দেখলি তো? কী বলতে কী হয়ে গেল! আমারও কপাল রে! নইলে সব থাকতে আমার কিছু নেই কেন? আমার এত টাকা এত সম্পত্তি তবু সে-সব কোনও কাজে লাগলো না—

সুরেন চুপ করে দাঁড়িয়ে সব শুনতে লাগলো।

মা-মণি আঁচল দিয়ে চোখ দুটো মুছে নিতে নিতে বললে—যখন আমার কেউই ছিল না, তখন ভাবতুম কেউ নাই বা রইল, সুখদাকেই আমি আমার পেটের মেয়ের মত মানুষ করবো, সুখদাকেই বিয়ে দিয়ে আমি ঘরে জামাই আনবো। জামাই-ই আমার বাড়িতে ছেলের মত থাকবে। কিন্তু সব উল্টে গেল, কোনও সাধই মিটলো না আমার।

সুরেন বললে—আমি তাহলে আসি মা-মণি—

মা-মণি বললে—তা যা, তোরা সবাই যা, তোদের কাউকেই তো আমি আটকে রাখতে পারবো না। আমি এখন বুড়ো হয়েছি, আমার কথা তোরা শুনবিই বা কেন? যা তোরা, সবাই চলে যা আমার সামনে থেকে—

বলে মা-মণি আরো জোরে কাঁদতে লাগলো।

সুরেন বললে—তোমার শরীর খারাপ, এখন এ-সব কথা ভাবছো কেন মা-মণি?

মা-মণি বলে উঠলো—ভাববো না? এখন ভাববো না তো কখন ভাববো? তোদের যখন আমার মতন বয়েস হবে, তখন তোরাও দেখবি আমার মতন ভাববি। ভাববি এতদিন বেঁচে থেকে কী লাভটা হলো? কার জন্যে এত কিছু করলুম? কাদের জন্যে এতদিন প্রাণ দিয়ে এই সংসার আঁকড়ে থেকেছি। কার মুখের দিকে চেয়ে শান্তিতে মরবো! এ-সব ভাবনা কি ছাড়তে পারি রে?

সুরেন বললে—এখন একটু ঘুমোতে চেষ্টা করো তুমি, অনেক রাত হয়েছে, আমি চলি—

—যা—

বলে মা-মণি মাথা নিচু করলে। সুরেন খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। তারপর আস্তে আস্তে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল। বারান্দাটা অন্ধকার। সুখদা তার নিজের ঘরে চলে গেছে এতক্ষণে। এতবড় কলঙ্কের বোঝা সুরেনের মাথার ওপর চাপিয়ে দিয়ে সে হয়ত নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে।

সিঁড়িটা আরো অন্ধকার। ধাপ দেখে দেখে নামতে হয়। সেই অন্ধকারের মধ্যেই যেন খসখস একটা শব্দ হলো।

সুরেনের মনে হলো কে যেন সরে গেল পাশ থেকে।

—কে?

কেউ উত্তর দিলে না। হয়ত কিছু নয়। কেউই কোথাও নেই হয়ত। শুধু সুরেনের মনের ভুল। আর কোনও দিকে না চেয়ে সুরেন আস্তে আস্তে দোতলায় নেমে এল। দোতলার সিঁড়িও অন্ধকার। রাত অনেক হয়েছে। ধনঞ্জয় হয়ত আলো নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়েছে। তার আর অপরাধ কী? সেও তো সারাদিন খাটে।

কিন্তু একতলার সিঁড়ির মাঝখানে এসে থামতে হলো। কে যেন নিচে থেকে ওপরের সিঁড়ির দিকে উঠছে।

—কে?

—আমি, ভাগ্নেবাবু!

ধনঞ্জয়ের গলা। সুরেন বললে—আলো নিভিয়ে দিয়েছ কেন ধনঞ্জয় তুমি?

—আজ্ঞে, আলোর লাইনটা খারাপ হয়ে গেছে।

কথাটা বলে ধনঞ্জয় ওপরে উঠে যাচ্ছিল। কিন্তু তার পেছনেই আর একটা লোক। লোকটাকে চেনা গেল না।

—তুমি কে?

লোকটা যেন একটু থমকে দাঁড়ালো।

কিছু উত্তর নেই। তবু ভালো করে ঠাহর করে দেখতে চেষ্টা করলে সুরেন। মেয়েমানুষ নয়, পুরুষ। সুরেনকে পাশ ছেড়ে দেবার জন্যে একেবারে দেয়াল ঘেঁষে সরে দাঁড়ালো।

সুরেন আবার জিজ্ঞেস করলে—এ কে ধনঞ্জয়?

ধনঞ্জয় তখন ওপরে উঠে গেছে। সেখান থেকে পেছনের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে—আজ্ঞে ও আমার ভাই—

—ভাই? তোমার ভাই আবার কবে এল?

—এই কাল এসেছে দেশ থেকে।

সুরেন আর দাঁড়ালো না। বললে—ও—

বলে নিচেয় নেমে এল।

লোকটা ততক্ষণে ওপরে উঠে গেছে। ধনঞ্জয় ওপরের সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে ছিল। লোকটা উঠে কাছে যেতেই আবার ওপরের সিঁড়ি দিয়ে তেতলায় উঠে বারান্দায় পোঁছে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো ধনঞ্জয়।

বললে—চলে আসুন জামাইবাবু, এদিক পানে কেউ নেই, আর কেউ দেখতে পাবে না—

বলে আবার সোজা চলতে লাগলো। একেবারে বারান্দার শেষ প্রান্তে গিয়ে সুখদার ঘরের দরজায় গিয়ে ঠুক-ঠুক শব্দ করলে।

ভেতর থেকে খিল খুলে সুখদা বললে—এসো—

লোকটা ভেতরে ঢুকলো। ততক্ষণে দরজায় আবার খিল লাগিয়ে দিয়েছে সুখদা।

কালীকান্ত তখন বিছানার ওপরে গিয়ে বসে নিশ্চিন্ত হয়েছে। উঃ, কী বিপদেই পড়েছিলুম রে বাবা—

সুখদা জিজ্ঞেস করলে—কেন, কী হলো?

কালীকান্ত বললে—আর বলো কেন? সিঁড়ি দিয়ে উঠছি, হঠাৎ সেই ভাগ্নেবাবুর সঙ্গে দেখা। ও ছোঁড়াটার কি কাজ-কম্ম কিছু নেই? এই মাঝ-রাত্তিরে মা-মণির ঘরে এসেছিল কেন?

সুখদা বললে—আবার তুমি ওই ছাইপাঁশ খেয়েছ?

কালীকান্ত বললে—কই, না তো—

—নিশ্চয়ই খেয়েছ! আমি গন্ধ পাচ্ছি যে। আমি তোমাকে বার বার বলেছি না ওইসব খেয়ে আমার কাছে এসো না—

কালীকান্ত বললে—তুমি রাগ করো না, রাগ করো না, আমি বেশি খাইনি, মাত্তোর এক পাঁট চুমুক দিয়ে এসেছি—

সুখদা সে-কথায় কান না দিয়ে বললে—কই, কাগজপত্তর কী এনেছো?

কালীকান্ত পকেট থেকে কাগপত্তর বার করলে। বললে—এনেছি এনেছি, কাগজ-পত্তর না এনে কি পারি? এই নাও—

সুখদা কাগজের বাণ্ডিলটা হাতে নিয়ে খুললে।

কালীকান্ত বললে—ও আর তুমি কী বুঝবে? ছোড়দা সব উকীলকে দিয়ে ঠিক করে লিখে দিয়েছে। তুমি কোনও রকমে সইটা বসিয়ে নাও মা-মণির, তারপরে যা করবার সব ছোড়দা করে দেবে—দেখি শালা সাত লাখ টাকা ওই ভাগ্নে-ছোঁড়াটা কী করে পায়!

সুখদা বললে—ঠিক আছে—

—তাহলে কখন হবে?

সুখদা বললে—তার জন্যে তোমায় ভাবতে হবে না। সে আমি তোমাকে ঠিক সময়ে পাঠিয়ে দেবো—

কালীকান্ত বললে—কিন্তু জিনিসটা তাড়াতাড়ি দবকার আমার। কবে বুড়ি টেঁসে যায় বুঝতে পারছো তো? টেঁসে গেলে কিন্তু সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে।

তার আগে সব ফয়সালা করতে হবে—। আর সাক্ষী-টাক্ষী সব জোগাড় করে দেবে ছোড়দা, তার জন্যে কোনও ভাবনা নেই—

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠতে সেদিন দেরি হয়ে গেল। শেষ রাত্রের দিকে একটা স্বপ্ন দেখে একবার সুরেনের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, চারদিকে চেয়ে কেমন অবাক হয়ে গিয়েছিল সে। বড় বিশ্রী স্বপ্নটা। এমন স্বপ্ন যে সে কেন দেখতে গেল কে জানে। অথচ রাত্তিরে অতক্ষণ সে মা-মণির সঙ্গে কথা বলে এসেছে। তখনও সে কিছু বুঝতে পারেনি।

হঠাৎ ধনঞ্জয় তাকে ডাকতে এসেছিল।

—ভাগ্নেবাবু, ভাগ্নেবাবু, দরজা খুলুন, উঠুন।

ধড়মড় করে উঠে খিল খুলে দিয়ে সুরেন বললে—কী খবর ধনঞ্জয়? কী হয়েছে?

ধনঞ্জয় বললে—আজ্ঞে আমি ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছি, মা-মণি কেমন করছে—

বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো সুরেনের। একটুখানি সময় লাগলো সামলে নিতে। তারপর জিজ্ঞেস করলে—মা-মণির কাছে কে-কে আছে?

—সবাই, সবাই আছে—

—ম্যানেজারবাবু আছেন?

—হ্যাঁ, ম্যানেজারবাবু আছেন, সুখদা দিদিমণি আছেন, জামাইবাবু আছেন!

জামাইবাবু! কথাটা খটাস্ করে সুরেনের কানে গিয়ে বিঁধলো। জামাই-বাবু মানে কালীকান্ত বিশ্বাস! সে কী করে এই অসময়ে এ-খবর পেলে!

কথাটা বলে ততক্ষণে ধনঞ্জয় উঠোন পেরিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে গেছে। সুরেন তাড়াতাড়ি গায়ে জামাটা চড়িয়ে অন্দর-মহলের সিঁড়ি দিয়ে উঠলো। তেতলায় উঠে দেখলে, সত্যিই সবাই এসে পৌঁছে গেছে। পায়ের কাছে বসে বাদামী খাটে মাথা রেখে কাঁদছে। তার পাশে তরলা চোখে আঁচল দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আর সামনে দাঁড়িয়ে আছে ভূপতি ভাদুড়ী। আর সবচেয়ে বিছানার কাছে মুখ গুঁজে হাউ-হাউ করে কাঁদছে সুখদা। আর কাঁদছে কালী-কান্ত। কালীকান্ত বিশ্বাস।

মা-মণির মুখখানার দিকে খানিকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে রইল সুরেন। মনে হলো যেন ঘুমিয়ে পড়েছে মা-মণি! মুখখানার দিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে হঠাৎ একবার পায়ের দিকে নজর পড়লো। দেখলে, টুলু। দাঁড়িয়ে আছে পাশেই।

সুরেন অবাক হয়ে গেল টুলুকে দেখে।

জিজ্ঞেস করলে—একি, তুমি? তুমি কী করে খবর পেলে? তোমাকে কে ডাকলে?

টুলু কিছু উত্তর দিলে না। শুধু চেয়ে রইল তার দিকে, আর মিটিমিটি হাসতে লাগলো। কিন্তু সেও বেশিক্ষণ নয়, হঠাৎ মনে হলো যেন সমস্ত বাড়িটা কাঁপছে। সবাই ভয় পেয়ে গেছে। ভূমিকম্প নাকি! বাড়িটা আরো কাঁপছে। নিশ্চয়ই কাঁপছে। এখনি সমস্ত বাড়িটা ভেঙে পড়ে যাবে। সবাই চেঁচিয়ে উঠলো। আতঙ্কের চিৎকার। তারপরে আর কেউ দেরি করলে না। সবাই সিঁড়ির

দিকে দৌড়লো। হুড়োহুড়ি করে সকলের আগে নিচেয় নেমে যাবে। ভূপতি ভাদুড়ী দৌড়লো। বাদামী, তরলা তারাও দৌড়লো। নিচে থেকে চিৎকার উঠলো, পালাও পালাও—ভূমিকম্প—পালাও—

হঠাৎ সুরেন দেখলে বুড়োবাবু ঠিক সেই সময়ে হাঁফাতে হাঁফাতে ওপরে উঠে এসেছে। বুড়োবাবু মা-মণির দিকে তখন একদৃষ্টে চেয়ে আছে—যেন মা-মণিকে গিলছে বুড়োবাবু। একটু ভয়-ডর নেই। সবাই যখন যে-যেখানে পারে পালাচ্ছে, তখন বুড়োবাবু কোনও দিকে না পালিয়ে সোজা ওপরে উঠে এসেছে।

সুরেন বলে উঠলো—পালান বুড়োবাবু, পালান, ভূমিকম্প হচ্ছে—

বুড়োবাবু সুরেনের দিকে চেয়ে যেন শুধু একটু হাসলো। তারপর আবার চোখ ফিরিয়ে দেখতে লাগলো মা-মণির দিকে।

সুরেন টুলুর দিকে চাইলে। সেও আর দাঁড়ালো না। সুরেন বললে—পালাও টুলু, পালাও—

টুলু সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ির দিকে দৌড়চ্ছে। সমস্ত বাড়িটাও তখন থরথর করে কাঁপছে। চারদিক থেকে গুম-গুম করে আওয়াজ হতে শুরু করেছে। ভূপতি ভাদুড়ী নামছে, তরলা নামছে, ধনঞ্জয় নামছে। টুলুও নামছে। হঠাৎ মনে হলো একটা বিকট শব্দ করে তেতলা বাড়িটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়লো। আর সবাই যেন সেই ভাঙা ইঁট-কাঠ-পাথরের মধ্যে চাপা পড়ে গেল। সুরেন হাত বাড়িয়ে দেয়াল ধরতে গেল—কিন্তু হাতটা একটা মানুষের গায়ে গিয়ে ঠেকলো। মানুষটার মুখের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেছে সুরেন। টুলু তার ঠিক ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে। সুরেন টুলুকে বাঁচাবার জন্যে আকুল হয়ে উঠলো।

বললে—টুলু!...

নিজের চিৎকারে নিজেরই ঘুম ভেঙে গেছে সুরেনের। চারদিকে চেয়ে দেখলে কেউ কোথাও নেই। অন্ধকার ঘরের মধ্যে বিছানার ওপর শুয়ে আছে। কেন যে এমন অদ্ভুত স্বপ্নটা দেখলে সে কে জানে! তাড়াতাড়ি উঠে মুখে-হাতে-পায়ে একটু জল দিয়ে আবার ঘুমোবার চেষ্টা করলে। সমস্ত নিস্তব্ধ চারদিকে। মাধব কুণ্ডু লেনের কয়েকটা কুকুর দূর থেকে চেঁচাচ্ছে। তারপর চোখ-কান বন্ধ করে প্রাণপণে ঘুমোবার জন্যে মাথা কুটতে লাগলো। কাল আবার যথাসময়ে পুণ্যশ্লোকবাবুর বাড়িতে যেতে হবে। পুণ্যশ্লোকবাবু যদি তখন বাড়িতে থাকেন তো দু'একটা কথাও জিজ্ঞেস করেন।

বলেন—কতদূর পড়া হলো তোমার?

সুরেন বলে—অনেকটা এগিয়েছি। উনিশশো একুশ সাল পর্যন্ত এসেছি, গান্ধীজী কলকাতায় কংগ্রেসের ডেলিগেট হয়ে এসেছেন—

পুণ্যশ্লোকবাবু খুশী হন। বলেন—খুব ভালো। খুব ভালো। খুব ইমপর্টান্ট চ্যাপ্টার ওটা। দেখবে কত লোক আমাদের মত দেশের জন্যে সর্বস্ব ত্যাগ করেছে। এই আমার কথাই দেখ না, কোর্টে গিয়ে হাজার-হাজার টাকা উপায় করতুম, দেশের কাজের জন্য সব ছেড়ে দিলুম। মহাত্মাজীও দেশের জন্যে

প্র্যাক্‌টিস্ ছেড়েছেন। আর শুধু কি একলা আমরা হে! নাইনটিন-ফাইভের ব্যাপারটা মনে আছে তো? সি-আর-দাশের ব্যাপারটা নোট্ করে রেখে দিতে বলেছিলাম, তা রেখেছ তো?

সুরেন বলে—আজ্ঞে হ্যাঁ—

—হ্যাঁ, সব নোটস্ নেবে। তাতে পরে তোমারই সুবিধে হবে। এ-সব পড়লে কমিউনিস্ট পার্টির প্রোপাগান্ডায় তখন মন গলবে না। আজকালকার ছেলে-দের কী ডিফেক্ট জানো? তোমরা কেউ কিছু পড়ো না। আমরা তোমাদের মত বয়েসে কত লেখাপড়া করেছি তা জানো? এই যে পণ্ডিত নেহরু, আমাদের প্রাইম মিনিষ্টার, উনি কত লেখাপড়া করেছেন, জানো? দিন-রাত কেবল বই মুখে নিয়ে থাকতেন আগে। আমরা নৈনী জেলে একই সঙ্গে একমাস কাটিয়েছি। লোকটা খেয়ালী হোক, কিন্তু অগাধ পণ্ডিত। ও নামেও পণ্ডিত, কাজেও পণ্ডিত।

বলতে আরম্ভ করলে পুণ্যশ্লোকবাবুর আর মাত্রা থাকতো না। নিজের জীবনের সব কাহিনী বার বার করে বলে যেতেন। সে-সব আলোচনার মধ্যে পণ্ডিত নেহরু, বিধান রায়, সি আর দাশ, গান্ধী, সকলেরই প্রসঙ্গ উঠতো।

বলতেন—জানো জানো, এইসব জানো। আজকালকার ইয়াং-ম্যান্ তোমরা, এ-সব তোমাদের জানা দরকার। না-জানলে অন্য ছেলেদের জানাবে কী করে? আমাদের পরে তোমরাই তো আসবে। আমরা তো আর চিরকাল গদি আঁকড়ে বসে থাকতে আসিনি হে। তখন আবার তোমরাই মিনিষ্টার হবে, মিনিষ্টার হয়ে স্টেট্ কন্‌ট্রোল করবে—

তারপর একটু থেমে বলতেন—না, হাসি নয়, আমি যা বলছি সব সত্যি! আমাকে দেখেও তো তোমার সব শিক্ষা হওয়া উচিত। আমি প্রজেশকেও এই রকম শিখিয়েছি। কিন্তু প্রজেশ তো এ লাইনে থাকলো না। তার টাকার দরকার, টাকার জন্যে চাকরি করতে গেল। তা তোমার তো আর সে রকম মতলব নেই?

সুরেন সে-কথার উত্তর না দিয়ে চুপ করে থাকতো। কী বলবে সে? তার জীবনে তো টাকারও দরকার। সে তো এখনও পরের দানের উপরে নির্ভর করে জীবন কাটাচ্ছে। যেদিন সে মাধব কুণ্ডু লেনের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসবে সে-দিন কোথায় আশ্রয় পাবে সে? কার গলগ্রহ হয়ে থাকবে? কাকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকবে?

—তোমাকে যে আমি দেড়শো টাকা করে দিচ্ছি, তাতে তোমার অসুবিধে হচ্ছে না তো?

সুরেন বলতো—না—

—খুলে বলো, ভাল করে। পলিটিক্‌সের কাজ হোল-টাইমের কাজ। আমিও অনেকদিন ধরে একটা এ্যাসিস্‌টেণ্ট খুঁজছি। আর টাকার কথাই যদি বলো তো এই পলিটিকস্ করতে এসে কখনও কারো টাকার অভাব হয়নি। প্রজেশ ছেলেটা ভুল করলো। চাকরি করে আর কত টাকা আয় করবে ও। মাসে হাজার টাকা, দু'হাজার টাকা? না হয় তিন হাজার টাকাই ধরলুম! কিন্তু তেমন করে যদি ট্যাক্টফুলি থাকা যায় তো লাখ-লাখ টাকা তোমার হাতে এসে যাবে। তখন তুমি ইচ্ছে হলে চ্যারিটি করে দাও, তাতে তোমার আরো নাম হবে। লোকে তোমাকে আরো রেস্‌পেক্ট্ দেবে। তখন যদি সে-টাকা তুমি নিজের আরামের জন্যেও খরচ করো তবু তোমাকে লোকে বলবে—সাধু! এরই নাম হলো পলিটিক্‌স্, বুঝলে?

এত কথা বলবার সময় হতো না রোজ, প্রায়ই ব্যস্ত থাকতেন তিনি। নানা রকম লোক নানা কাজে আসতো তাঁর কাছে। নানা রকম ভাবে লোকে বিরক্ত করতো, সমস্ত দিন-রাত টেলিফোন আসতো। সেই সব ঝঞ্ঝাটের মধ্যে ভালো করে সুরেনের সঙ্গে কথাও বলতে পারতেন না তিনি। কিন্তু তবু তারই ফাঁকে ফাঁকে যখনই দেখা হতো তখনই খুব মিষ্টি করে কথা বলতেন।

সেদিন হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসলেন—তুমি এ-মাসের টাকা নিয়েছ তো?

সুরেন বললে—না—

হঠাৎ যেন রেগে গেলেন পুণ্যশ্লোকবাবু। বললেন—কেন? নাওনি কেন?

তারপর হরিলোচনবাবুর দিকে চেয়ে বললেন—হরিলোচন, তুমি সুরেনকে টাকা দাওনি? আমি যে তোমাকে মাসে-মাসে ওর হাতে দেড়শো করে টাকা দিতে বলেছিলুম—

সুরেন বললে—তাতে কী হয়েছে, আমার তো টাকার অত দরকার নেই—

—দরকার নেই মানে? টাকার দরকার কার না থাকে? তুমি সকাল থেকে এসে এখানে কাজ করো তার জন্যে টাকা না পেলে কাজ করবে কেন? তোমার টাকার দরকার থাক বা না থাক, মাসে-মাসে তোমার টাকা নিয়ে যাবে—

হরিলোচন মুহুরী তাড়াতাড়ি ক্যাশ থেকে টাকাটা বার করে এনে তার কাছ থেকে একটা ভাউচার লিখিয়ে নিয়েছিল। টাকা নিচ্ছিল বলেই সুরেনের মনে কেমন একটা দায়িত্ববোধ এসে গিয়েছিল। টাকাটা পকেটে করে নিয়ে এসে সোজা মা-মণির কাছে চলে যেত সে। বলতো—এই টাকাগুলো তোমার কাছে রেখে দিও—

মা-মণি প্রথমবার বলেছিল—তোর টাকা? কোত্থেকে পেলি?

সুরেন বলেছিল—চাকরি করে—

—চাকরি? তুই চাকরি করিস? কই, আমাকে তো বলিসনি?

সুরেন বলেছিল—এ ঠিক চাকরি নয়, একজন ভদ্রলোকের বাড়িতে কিছু কিছু কাজ করে দিই, তার বদলে তিনি মাসে মাসে টাকা দেন—

—ওই ওর নামই তো চাকরি। তা আমার কাছে রাখছিস কেন? তোর কাছেই রাখ না। আমি কবে আছি কবে নেই, শেষকালে একদিন সব খোয়া যায় যদি—

সুরেন বলেছিল—তুমি কি আমাকে কম টাকা দিয়েছ। তোমার কাছে যে আমার অনেক দেনা—

—ও, বুঝেছি, তুই ধার শোধ করতে চাস?

—তোমার ধার কি শোধ করা যায় মা-মণি? তোমার ধার জীবনে কখনও শোধ করতে পারবো না—

শুনে মা-মণির মুখখানা যেন কেমন ছলছল করে উঠেছিল।

এ-সব কথা অনেক আগেকার। তখন সবে পুণ্যশ্লোকবাবুর কাছে কাজ করতে শুরু করেছে সে। সবে সে একটা জায়গায় আশ্রয় পেয়েছে। সবে তার মনে হতে শুরু হয়েছে যে, সংসারে শুধু পরের বাড়ি অন্নদাস হবার জন্যেই সে জন্মায়নি। এ-পৃথিবীতে তারও একটা কিছু দায়িত্ব আছে। তার সৃষ্টিকর্তা তাকেও এখানে পাঠিয়েছে একটা কাজ করতে।

ঠিক তারপরেই এই ঘটনাটা ঘটলো। এই সুখদার ঘটনাটা। যেদিন প্রথম সুখদা তার বিরুদ্ধে মিথ্যের বোঝাটা চাপিয়ে দিলে, সেদিন মনটায় খুব কষ্ট

হয়েছিল। কিন্তু মা-মণির কাছে যখন নিজের বক্তব্যটা বলবার সুযোগ পেলে, তখন যেন মনটা খানিকটা হালকা হয়ে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল সংসারে আর কেউ না-বুঝুক, মা-মণি হয়ত তাকে ভুল বুঝবে না।

স্বপ্নটা ভাঙার পর থেকেই নানা আজেবাজে ভাবনায় মনটা ভারী ছিল। তারপর কখন যে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল, তার খেয়াল ছিল না। হঠাৎ ধনঞ্জয়ের ডাকে ঘুম ভাঙতেই দেখলে, বড় বেলা হয়ে গেছে চারদিকে।

কথাটা বলে ধনঞ্জয় চলে গিয়েছিল। সুরেন তাড়াতাড়ি মুখ-হাত-পা ধুয়ে নিয়ে বাইরে বেরোল। ততক্ষণে উঠোন ধুয়ে পরিষ্কার করে ফেলেছে অর্জুন। কলের জলে চৌবাচ্চা ভর্তি হয়ে গেছে। কিন্তু সবাই যেন গম্ভীর-গম্ভীর। একটা ভয়ের ছায়া যেন সব জায়গায় ছড়িয়ে আছে।

হঠাৎ সামনেই দেখলে কালীকান্ত বিশ্বাসকে।

কালীকান্তর হাসিমুখ। সুরেনের দিকে এগিয়ে এল। বললে—কী ব্রাদার, কী খবর?"

সুরেন বললে—আপনি? আপনি কখন এলেন?

—এই তো এখনই এলুম। শুনলাম মা-মণির খুব অসুখ। অসুখের খবর শুনে কি আর দূরে থাকতে পারি হে?

সুরেন কিছু বললে না। পাশ কাটিয়ে ভেতরের দিকে যাচ্ছিল, হঠাৎ কালীকান্ত সামনে এসে পথ আটকে দাঁড়ালো। বললে—এত সকালে কোথায় যাচ্ছ?

সুরেন বললে—মা-মণিকে দেখতে। আমি মা-মণির অসুখের কথা এখন শুনলুম, ধনঞ্জয় বলে গেল—

—তা তুমি তো কাল রাত্তিরে মা-মণির কাছে ছিলে অনেক রাত্তির পর্যন্ত—

—আপনি কী করে জানলেন? আপনাকে কে বললে?

কালীকান্ত হেঁ-হেঁ করে হাসতে লাগলো। বললে—এ শর্মা সব জানে হে, সব জানে!

—তাহলে সুখদা আপনাকে বলেছে নিশ্চয়ই!

কালীকান্ত বললে—আরে ভাই, বউই বলুক আর যে-ই বলুক, এ-সব কথা কি আর চাপা থাকে? মড়া দেখলেই শকুনি এসে জুটবে, এ আর নতুন কথা কী!

সুরেন কালীকান্তর কথা শুনে অবাক হয়ে গেল। এমন কথা কেউ এমন সময়ে মুখেও যে উচ্চারণ করতে পারে তা সে কল্পনাও করতে পারেনি।

কালীকান্ত বললে—কিন্তু সে-গুড়ে বালি ভাই, সে-গুড়ে বালি—

—তার মানে?

কালীকান্ত বললে—তুমি যা মতলব করেছ তা হবে না হে, হবে না—এই আমি তোমায় বলে রেখে দিলুম!

বলে জামার পকেট থেকে সিগারেট বার করে ধরালে। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললে—তোমার মামাও ভেবেছে কেল্লা মেরে দিয়েছে—

সুরেন তবু বুঝতে পারলে না। বললে—আপনি কী বলছেন বুঝতে পারছি না—

কালীকান্ত বললে—তা বুঝতে পারবে কেন হে? যখন বুড়ি মারা যাবে তখন বুঝবে। এখন তো বেশ পায়ের ওপর পা দিয়ে আরাম করে খাচ্ছো, ভেবেছ চিরটা কাল এমনি যাবে! তা কখনও যায় হে? এই দুনিয়ার নিয়ম তা নয়, এইটি জেনে রাখো—

সুরেন বুঝতে পারলে কালীকান্ত বিশ্বাসের জ্বালাটা কোথায়। কিন্তু সে-কথার কোনও উত্তর না দিয়ে সোজা অন্দর-মহলের ভেতরে গিয়ে ঢুকলো—

কিন্তু সুরেনের ঘুম ভাঙবার আরো অনেক আগে সুখদা উঠেছে। অনেক আগেই শুরু হয়ে গেছে নরেশ দত্তের ষড়যন্ত্র!

অনেক রাত্রেই কালীকান্ত সব ভালো করে বুঝিয়ে দিয়েছিল সুখদাকে। কোথায়-কোথায় সই করতে হবে, সব পাখীপড়া করিয়ে দিয়েছিল।

কালীকান্ত বলেছিল—তোমার ভালোর জন্যেই তো আমি এ-সব করছি, নইলে আমার আর কী! টাকা তো সবই তোমার নামে থাকবে। তুমি দিলে তবে আমি পাবো—

সুখদা বোধহয় তবু একটু দ্বিধা করেছিল।

বলেছিল—টাকা পেলেই তো সেই তুমি আবার তোমার ছোড়দার খপ্পরে পড়বে—

কালীকান্ত দাঁত দিয়ে জিভ কেটে বলেছিল—আরে রাম রাম, আমাকে কি তুমি সেই রকম ভাবো? এত দিনেও তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারলে না?

—তাহলে তোমার বাবার অত টাকা তুমি নষ্ট করলে কেন? সব তো মদ খেয়ে উড়িয়ে দিলে!

কালীকান্ত বলেছিল—কী যে বলো তুমি! শালার আত্মীয়রা সব মামলা-মকর্দমা করে নষ্ট করে ফেললে, আর তুমি আমাকে দোষ দিচ্ছ? কে ও-সব বাজে কথা তোমাকে বললে?

সমস্ত রাত ধরে একটা ফয়সালা করলে দুজনে। ঠিক হলো সুখদা ভোর-বেলাই মা-মণির কাছ থেকে উইলে সই নিয়ে আসবে আর কালীকান্ত অপেক্ষা করবে সুখদার ঘরে। তারপর সইটা কোনও রকমে একবার হয়ে গেলেই তখন আর কে কার ধার ধারে!

কিন্তু সেদিন তখনও ভোর হয়নি, কালীকান্ত উঠিয়ে দিলে সুখদাকে। বললে—কই, ওঠো, ওঠো—ভোর হয়ে গেল যে—

সুখদা বললে—এত ভোরেই যাবো?

কালীকান্ত বললে—হ্যাঁ, এত ভোরে না গেলে তখন আবার কেউ এসে পড়বে, তখন সব ভন্ডুল হয়ে যাবে—

সুখদা উঠলো। কাগজগুলো নিলে। তারপর আস্তে আস্তে বারান্দা পেরিয়ে মা-মণির ঘরের দিকে গেল। অন্ধকার তখনও ভালো করে পরিষ্কার হয়নি। মা-মণির ঘরের দরজা ভেজানো ছিল। একটু ঠেলতেই খুলে গেল।

মা-মণির বোধহয় সারা রাত ঘুমই হয়নি! দরজায় শব্দটা হতেই বললে—কে রে? তরলা?

সুখদা ঘরের ভেতর ঢুকলো। বললে—না মা-মণি, আমি—

—সুখদা? কী হয়েছে রে? এত ভোরে কী চাই রে?

টিমটিম করে একটা বাতি জ্বলছিল ঘরে। সুখদা মা-মণির পাশে গিয়ে বসলো।

বললে—কেমন আছ তুমি মা-মণি?

মা-মণি সে-কথার উত্তর না দিয়ে বললে—কাল রাত্তিরে সুরেন এসেছিল জানিস? তাকে খুব বকে দিয়েছি। সে আমার কাছে ক্ষমা চেয়ে গেছে রে। তুই আর কিছু বলিসনি ওকে। যে ক'টা দিন আমি বেঁচে আছি, তোরা আর ঝগড়াঝাঁটি করিসনি মা।

সুখদা কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে চুপ করে রইল।

মা-মণি সুখদার পিঠে হাত বোলাতে লাগলো আস্তে আস্তে। বললে—ভালোই করেছিস মা তুই এসেছিস। আমি জানতুম তুই আসবি—

হঠাৎ সুখদা বললে—আমাকে তুমি ক্ষমা করো মা-মণি।

মা-মণি আর থাকতে পারলে না। বললে—ওরে সুখদা, তুই এ সব কী বলছিস মা? তুই মুখ ফুটে বলবি তবে আমি ক্ষমা করবো? তোকে আমি সেই ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি আর তুই আজ আমাকে ক্ষমার কথা বলছিস? তোকে আমি চিনি না?

সুখদা বললে—কাল সারারাত আমি ঘুমোতে পারিনি মা-মণি। ভাবলুম আমার জন্যেই তো তোমার এত কষ্ট আজ—

—ওরে থাক্ থাক্। আর বলতে হবে না তোকে!

সুখদা বললে—না মা-মণি, তোমাকে আমি অনেক কষ্ট দিয়েছি, আমি অনেক অন্যায় করেছি তোমার ওপর। আমাকে তুমি ক্ষমা করো—

—আবার ওই কথা মুখে আনছিস? ছেলেমেয়ে মাকে অমন কড়া কথা বলেই থাকে, তাতে কি মা কখনও কষ্ট পায় রে? যদি কষ্টই পেতাম তো তোকে কি এমন করে এখেনে তুলে নিয়ে আসতুম? তুই আমাকে পর মনে করতে পারিস, কিন্তু আমি তো তোকে পর মনে করিনে মা—

সুখদা আস্তে আস্তে পেট-কাপড় থেকে কাগজটা বার করলে।

—ওটা কী রে?

সুখদা বললে—এই কাগজটা তোমার কাছে এনেছি মা-মণি, এর ওপরে তোমাকে একটা সই দিতে হবে—

—সই? কীসের সই?

সুখদা বললে—হ্যাঁ মা-মণি, আমি কলম সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি, এই নাও, এখানে একটা সই দিয়ে দাও—

মা-মণি তবু বুঝতে পারলে না। বললে—কিন্তু জিনিসটা কী? সই করবো কেন? কীসে সই করবো? ওতে কী লেখা আছে?

সুখদা বললে—ওটা তোমার উইল—

মা-মণি চমকে উঠলো। অসুখের মধ্যেই সুখদার দিকে চেয়ে রইল এক-দৃষ্টে।

বললে—তুই কোথায় পেলি এটা? কে দিলে তোকে?

সুখদা বললে—অত কথা তোমার কাছে শুনতে চাইনে। তুমি সই দেবে কি না বলো।

মা-মণি বললে—কিন্তু না-বুঝে সই দেবো কী করে, তুই বল্? আমি তো ইংরিজী পড়তে পারিনে, তুইও পড়তে পারিসনে। এখানে কী লেখা আছে তুই বুঝিয়ে বল্, তবে তো সই দেবো। আমি তো যা-তা কাগজে সই করতে পারিনে?

সুখদা রেগে গেল। বললে—তুমি তাহলে আমাকে বিশ্বাস করো না বলো?

মা-মণি বললে—তুই রাগ করিসনে মা। দেখছিস তো আমার এখন শরীরটা খারাপ, একটু সেরে উঠি, তখন তুই যাতে বলবি সই করবো—

সুখদা রাগ করে চলে যাচ্ছিল কাগজটা নিয়ে।

মা-মণি ডাকলে—রাগ করিসনে, শোন, ওরে—

সুখদা দাঁড়ালো! তারপর আস্তে আস্তে কাছে ফিরে এল। বললে—কী?

মা-মণি বললে—এটা কে তোকে দিয়েছে? কে লিখে দিয়েছে?

সুখদা বললে—যে-ই লিখুক, তুমি যখন সই দেবে না তখন তোমার তা জেনে কী লাভ?

মা-মণি বললে—কালীকান্ত দিয়েছে বুঝি তোকে?

সুখদা বললে—সেই দিক আর অন্য কেউই দিক, তোমার তো সই দেওয়া নিয়ে কথা—

মা-মণি বললে—তবু যাতে-তাতে তো সই করতে পারিনে মা। উকীল-মোক্তারকে না দেখিয়ে কি সই করা উচিত? তুই-ই বল্ না। তুই নিজে হলে কি তাই করতে পারতিস?

সুখদা সে-কথার উত্তর না দিয়ে বললে—তুমি তো মরতে বসেছ মা-মণি, এখনও তোমার সম্পত্তির ওপর এত লোভ? সম্পত্তি নিয়ে কি তুমি স্বর্গে যাবে?

মা-মণি বোধহয় কিছু উত্তর দিতে যাচ্ছিল, তার আগেই সুরেন ঢুকলো। কিন্তু সুখদাকে দেখেই বাইরে চলে যাচ্ছিল।

মা-মণি ডাকলে—কে রে?

সুরেন ফিরে দাঁড়ালো।

মা-মণি বললে—সুরেন বুঝি? আয়—আয়—

সুরেন বললে—আমি না-হয় পরে আসবো মা-মণি, তুমি এখন কথা বলছো, বলো! আমাকে ধনঞ্জয় গিয়ে খবর দিলে—

সুখদা এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল। উইলখানা তাড়াতাড়ি আঁচলের আড়ালে লুকিয়ে ফেললে। বললে—আমি আসি তাহলে—

মা-মণি বললে—যাসনি, দাঁড়া—

সুখদা বললে—তুমি যে সুরেনকে এখানে ডেকে পাঠিয়েছ তা তো বলোনি আমাকে? জানলে আমি এখন তোমার কাছে আসতুম না—

মা মণি বললে—আমি ওকে ডাকিনি রে, ধনঞ্জয় ডেকে নিয়ে এসেছে—তুই বিশ্বাস কর মা, আমি ওকে ডাকিনি—

তারপর একটু থেমে বললে—আর ডাকলেই বা! তুই বা ওকে দেখতে পারিস না কেন? কী করছে ও? ও তো তোর কোনও ক্ষতি করেনি। ও তো এ-বাড়ির কোনও ব্যাপারেই থাকে না। দুটো খায়, আর বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ায়—

সুরেন বললে—তোমরা কেন ঝগড়া করছো মা-মণি, আমি এ-বাড়ি থেকে চলে গেলেই যদি শান্তি হয় তো আমিই না হয় চলে যাচ্ছি—

বলে সুরেন আর সেখানে দাঁড়ালো না। যেমন ওপরে এসেছিল, তেমনি আবার নিঃশব্দে নিচেয় নামতে লাগল। সিঁড়িতে মুখোমুখি দেখা ধনঞ্জয়ের সঙ্গে। সে উঠছিল ওপরের দিকে। পেছনে পেছনে ডাক্তার। ডাক্তারবাবুকে দেখে সুরেন একটু একপাশে সরে দাঁড়ালো। তারপর দু'জনে ওপরে চলে যাবার পর সুরেন আবার নিচেয় নামতে লাগলো। ঠিক সিঁড়ির মুখেই ভূপতি ভাদুড়ীর সঙ্গে দেখা। সুরেনকে দেখেই অবাক।

বললে—কী রে, তুই? এত সকালে তুই?

সুরেন বললে—মা-মণিকে দেখতে গিয়েছিলুম—

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—তোকে কে খবর দিলে?

সুরেন বললে—ধনঞ্জয়—

—তা চলে এলি যে! মা-মণি কী বললে?

সুরেন বললে—মা-মণি কিছু বলেনি, আমিই চলে এলুম—

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—তুই তো আচ্ছা গর্দভ! এই এখন মা-মণির অসুখ, এখন চলে এলি? এই সময়েই তো কাছে থাকতে হয় রে! তোর বুদ্ধি বলে একটা জিনিস নেই? চল্, আমার সঙ্গে ওপরে চল্! চল্—

সুরেন বললে—না—

ভূপতি ভাদুড়ী যেন অবাক হয়ে গেল সুরেনের কথায়।

বললে—যাবিনে?

সুরেন বললে—না।

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—তোর জ্ঞানগম্যি বলে কোনও জিনিস হবে না কোনওদিন? দেখছিস না ওদিকে কালীকান্ত এসে হাজির হয়েছে? তুই ঠিক এই সময়ে চলে যাচ্ছিস? ওপরে ছুঁড়িটা রয়েছে, সে যদি এখন জোর-জুলুম করে কিছু করে?

সুরেন বললে—তা করুক!

ভূপতি ভাদুড়ী এক কাজ করে বসলো। জামার পকেট থেকে একটা পাকানো কাগজ বের করলো।

বললে—এই দ্যাখ, এইটে হচ্ছে মা-মণির উইল। সেই আসলটা খুঁজে পাচ্ছিনে বলে আবার এইটে কাল তৈরী করিয়ে এনেছি। এটাতে আজকে সই করিয়ে নেব। চল্, ভালো কথা বলছি, আমার সঙ্গে চল্—

সুরেন বললে—না, আমি এখন যাবো না—

ভূপতি ভাদুড়ী রেগে গেল। বললে—তবু বলছিস যাবিনে?

—না, আমি কিছুতেই যাবো না—

বলে সুরেন জোর করে বাইরের উঠোনে বেরিয়ে এল। তখন চারদিকে বেশ সকাল হয়েছে। উঠোনে ঝাঁট দিচ্ছে দুখমোচন। কোনওদিকে না চেয়ে সুরেন নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

হঠাৎ পেছন থেকে ডাক এল—ও ব্রাদার, ব্রাদার—

সুরেন পেছন ফিরে দেখলে কালীকান্ত বিশ্বাস। এতক্ষণে স্পষ্ট দেখা গেল কালীকান্তকে। বোধহয় সুখদার একটা শাড়ি পরেছে। বেশ খুশী-খুশী ভাব।

সামনে এগিয়ে এল কালীকান্ত। বললে—কী ব্রাদার, আমাদের যে একেবারে দেখতেই পাও না—

সুরেন বললে—কী বলবেন, বলুন—

কালীকান্ত বললে—ওরে বাব্বা, তুমি যে একেবারে ফায়ার হয়ে আছ হে। ব্যাপার কী? আমি তোমার কোন্ পাকা ধানে মই দিয়েছি?

সুরেন বললে—না না, আপনাকে আমি কিছু বলিনি, আপনি কিছু মনে করবেন না, কী বলছেন বলুন—

কালীকান্ত এবার হাসলো। বললে—তোমার মেজাজ গরম দেখে খুব ভয় পেয়ে গিছলুম ভাই। সকাল থেকে চা পেটে পড়েনি, আমারও মেজাজটা তাই বিগড়ে আছে, কিছুছু ভাল্লাগছে না—

তারপর ঘনিষ্ঠ হয়ে বললে—মা-মণি এখন কেমন আছে দেখলে?

সুরেন বললে—ভালো না—

—ভালো নয় মানে?

সুরেন বললে—ভালো নয় মানে শরীরটা খুবই খারাপ—

—তাহলে আজকালের মধ্যেই মরে যাবে মনে করো?

সুরেনের মনে হলো কালীকান্তর মুখে এক চড় কষিয়ে দেয়। কিন্তু অনেক

কষ্টে নিজেকে সামলে নিলে।

তারপর বললে—আর কিছু বলবার আছে আপনার?

—চটো কেন ব্রাদার, চটো কেন? চা না খেয়ে দেখছো আমার মেজাজটা এমনিতেই বিগড়ে আছে, তার ওপর তুমি আবার বেশি বিগড়ে দিচ্ছ। বলি আমি কিছু অন্যায় বলেছি? শরীর খারাপ থাকলে লোকে মরে যাবে না? কে না মরবে শুনি? তুমি মরবে, আমি মরবো, সবাই একদিন মরে যাবো। মরতেই তো আমরা এসেছি হে পৃথিবীতে! মা-মণি মরে যাবে বলাটা কি এতই অন্যায় হলো? ওই তো দুখমোচন উঠোন ঝাঁট দিচ্ছে, ওকেই জিজ্ঞেস করো আমি কী অন্যায়টা বলছি—

বলেই হাঁক দিলে—এ্যাই দুখমোচন, এদিকে আয়, শোন—

হঠাৎ ডাক পেয়ে দুখমোচন ঝাঁট থামিয়ে কাছে এল। বললে—কী বলছেন?

কিন্তু ততক্ষণে সুরেন তার নিজের ঘরে ঢুকে পড়েছে। তার মনে হলো যেন মাধব কুণ্ডু লেনের এই চৌধুরীবাড়িটা একটা আগ্নেয়গিরি হয়ে উঠেছে। সামান্য টাকার জন্যে যেন এ-বাড়ির সবাই উন্মাদ হয়ে উঠেছে। অথচ মুশকিল এই যে, সবাই ভাবছে সুরেনও বুঝি টাকার লোভে এ-বাড়ির মাটি কামড়ে পড়ে আছে। উইলের টাকার কিনারা না হলে সে এ-বাড়ি ছেড়ে যাবে না!

তারপর ঘর থেকে আবার বেরোল। কলতলায় গিয়ে চান করে নিলে। যেন এ-বাড়ি ছেড়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়তে পারলে সে বাঁচে। কিন্তু বেরিয়ে কোথায়ই বা সে যাবে। সেই তো সেই পুণ্যশ্লোকবাবুর বাড়ি। সেখানে গিয়ে তো সেই রোজকার মত ইতিহাস পড়া। আর পুণ্যশ্লোকবাবু বাড়ি থাকলে তাঁর উপদেশ শোনা।

—ঠাকুর!

রান্নাঘরের সামনে গিয়ে ঠাকুরকে ডাকতেই ঠাকুর বেরিয়ে এল।

সুরেন বললে—আমি একটু সকাল-সকাল বেরোচ্ছি ঠাকুর, আজকে আর আমি বাড়িতে খাবো না—আমার ভাত যেন ঢেকে রেখো না আবার—

ঠাকুর বললে—কিন্তু আপনার চাল তো নিয়েছি, আপনি তো আগে বলেননি তা—

—তা এত সকালে ভাত চড়িয়েছ কেন আজ?

ঠাকুর বললে—আজ্ঞে, জামাইবাবুর হুকুম যে। জামাইবাবুর চা হয়নি, রেগেমেগে একাকার। তাই দুটো উনুনে আগুন দিয়েছি। একটাতে চা চড়িয়েছি, আর একটাতে ভাত—

সুরেন যেন কী ভাবতে লাগলো।

ঠাকুর বললে—আপনি যদি বলেন তো একটু দেরী করলে ভাত বেড়ে দিতে পারি—

সুরেন বললে—না, তার দরকার নেই—

বলে নিজের ঘরে এসে জামা-কাপড় বদলে চটি পায়ে দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো।

এ-সব ক'দিন আগের ঘটনা। সেদিন রাস্তায় বেরিয়েও ঠিক ছিল না তাকে

ঢাকুরিয়া যেতে হবে। রোজকার নিয়মমত সুকীয়া স্ট্রীটে পুণ্যশ্লোকবাবুর বাড়িতেই তার যাবার কথা। ট্রাম থেকে নেমে সুকীয়া স্ট্রীটের মোড়েই যথারীতি ঢুকেছিল। তারপর সেই চেনা পথ। বাড়িতে ঢুকে সেই বাগান পেরিয়ে তার নির্দিষ্ট ঘরখানার ভেতরে ঢোকবার কথা।

কিন্তু বাড়ির সামনে গিয়ে কী যেন মনে হলো, আর ভেতরে ঢুকলো না। কী হবে ওখানে গিয়ে, কী হবে কংগ্রেসের ইতিহাস লিখে। কী হবে পুণ্যশ্লোকবাবুর বাঁধা উপদেশ শুনে।

মুখটা ঘুরিয়ে আবার উল্টোদিকে চলতে লাগলো। চলতে চলতে একসময় শেয়ালদা স্টেশনের সামনে এসে দাঁড়ালো। নানা ধবনের লোক স্টেশন থেকে আসছে, আবার কেউ বা স্টেশনের দিকে যাচ্ছে। সেখানে গিয়ে একবার ভাবলে টিকিট কেটে কোথাও যায়। ট্রেনে উঠে বসে। তারপর আবার না-হয় সন্ধ্যের ট্রেনে কলকাতায় ফিরে আসবে। কিন্তু কোথায়ই বা যাবে!

এমনি করে ঘুরতে ঘুরতে কত রাস্তা পেরিয়ে কত দূর চলতে লাগলো তার নিজেরও খেয়াল ছিল না।

আর ঠিক তারপরেই বিকেলবেলার দিকে দেবেশের সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল। আর দেবেশের সঙ্গে দেখা না হলে কি টুলুদের বাড়ি যেত সে!

টুলুদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে সুরেন বললে—তোর অনেকটা সময় নষ্ট করে দিলুম ভাই—

দেবেশ বললে—না, এটাও তো একটা কাজ রে। আমিও তো অনেকদিন টুলুর কাছে আসিনি—

সুরেন বললে—এখন কোন্ দিকে যাবি তুই?

দেবেশ বললে—এখন আর কোথাও যাবো না, পার্টি অফিসে যাবো—তুই কোথায় যাবি? বাড়ি?

সুরেন বললে—না—

—না মানে? বাড়ি যাবি না তো কোথায় যাবি এখন? কখন বেরিয়েছিস?

সুরেন বললে—সেই ভোরবেলা?

—খাওয়া? খেলি কোথায়?

সুরেন বললে—আজ খাইনি কিছু। এই টুলুদের বাড়ি যা খেলুম—

—খাসনি কেন? কাজ ছিল?

সুরেন বললে—না রে, কোনও কাজই ছিল না আমার। আজকে পর্মিলিদের বাড়িতেই যাইনি। এমনি সারাদিন রাস্তায় টো-টো করে ঘুরে বেড়িয়েছি।

—কেন? কী হয়েছে তোর? কেউ কিছু বলেছে বাড়িতে?

সুরেন বললে—বাড়িতে ভীষণ অশান্তি চলেছে ভাই। ভীষণ অশান্তি। আগে একবার তোর কাছে চলে এসেছিলুম, আবার তেমনি হচ্ছে। কিচ্ছু ভালো লাগছে না। কেবল মনে হচ্ছে, ও-বাড়িতে আর ঢুকবো না—

দেবেশ বললে—তোর মাথাটা নিশ্চয়ই খারাপ হয়ে গেছে। এখন বাড়িতে যাবি তো? আজ রাত্তিরে?

সুরেন বললে—এখনও কিছু ভাবিনি—

—ভাবিসনি তো ভাব! জামা-কাপড় সব সেখানে পড়ে রইল আর তুই এই রকম পাগলামি করছিস? বাড়ী যাবি না তো খাবি কোথায়? ঘুমোবি কোথায়?

সুরেন বললে—তাও জানি না। আমাদের বাড়ির সকলের ধারণা আমি

টাকার জন্যে ও-বাড়ির মাটি কামড়ে পড়ে আছি। আমি বাড়ির বাইরে থেকে প্রমাণ করে দিতে চাই যে, আমার ও-টাকার ওপর কোনও লোভ নেই—

দেবেশ এবারে হেসে উঠলো।

বললে—তাহলে তুই এক কাজ কর—

সুরেন আগ্রহী হয়ে উঠলো। বললে—কী?

দেবেশ বললে—তুই টুলুকে বিয়ে করবি? তাহলে বউও পাবি বাড়িও পাবি। অন্ততঃ থাকার একটা আস্তানা হবে—

—কী যে বলিস!

দেবেশ বললে—আমি তোর রোগটা ঠিক ধরেছি।

সুরেন বললে—তুই ঠাট্টা করছিস! আমার মনের মধ্যে কী হচ্ছে তোকে ঠিক বোঝাতে পারবো না। তোরা সবাই কিছু-না-কিছু নিয়ে মেতে আছিস। সুব্রত, সে তো আমেরিকায় গিয়ে নিজের লেখাপড়ায় মেতে রইল, তুই দেশের কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছিস। এই রকম সবাই। কিন্তু আমি কী নিয়ে থাকি বল্ তো? আমার যে কিছুতেই কিছু ভালো লাগে না—

দেবেশ বললে—তাহলে চল্, তোকে একটা জায়গায় নিয়ে যাই—

—কোথায়?

দেবেশ বললে—চল্ না, সেখানে কেউ তোর পাত্তা পাবে না—

সুরেন বললে—চল্ তাহলে—

সেদিন মাধব কুন্ডু লেনের বাড়ির সামনে একজন বুড়ো লোক এসে হাজির হলো।

কালীকান্ত বিশ্বাস উঠোনেই পায়চারি করছিল।

বললে—কে? কী চান আপনি?

বুড়ো লোকটা বললে—এখানে সুরেন্দ্রনাথ সান্ন্যাল বলে কেউ থাকে মশাই?

কালীকান্ত বললে—হ্যাঁ, কেন? আপনি কে?

—আমার নাম হরিলোচন। আমি মিনিষ্টার পুণ্যশ্লোক রায়ের কাছ থেকে আসছি। সুরেনবাবু ক'দিন তাঁর কাছে যাননি, তাই আমাকে পাঠালেন খবর নিতে। কেমন আছেন তিনি?

কালীকান্ত খানিকক্ষণ অবাক হয়ে রইল মিনিষ্টারের নাম শুনে।

বললে—মিনিষ্টার?

হরিলোচন বললে—হ্যাঁ, মিনিষ্টার পুণ্যশ্লোক রায়, তাঁরই মুহুরী আমি—

কালীকান্ত বললে—তা আমাদের সুরেন ভায়ার সঙ্গে তাঁর আলাপ হলো কী করে?

হরিলোচন মুহুরী বললে—তা কী করে জানবো মশাই। তাঁর কাছে কত লোক আসছে দিনরাত তার কি হিসেব আছে? তা আপনি কে?

কালীকান্ত বললে—আমিই তো আসল লোক এ-বাড়ির, আমি এ-বাড়ির জামাই, আর সুরেন ভায়া তো ফাল্তু লোক।

হরিলোচন কালীকান্তর কথা শুনে কেমন যেন হতবাক্ হয়ে গেল। এ-বাড়ির জামাই-এর কথার হাবভাবও তেমন ভালো লাগলো না তার। জামাই-ই যদি হবে

তো বৌ-এর চওড়া-পাড় শাড়িটা ধুতির মতন করে পরে আছে কেন? পরবার একটা ধুতি পেলে না?

তারপর একটু ভেবে বললে—দেখুন, সুরেনবাবু যদি আজ বাড়ি আসেন তো বলবেন আমি ডাকতে এসেছিলুম, কর্তা ডেকে পাঠিয়েছেন—

কালীকান্ত হঠাৎ বললে—মিনিষ্টার মশাই এত লোক থাকতে আমাদের সুরেন ভায়ার মত বেকার লোককে ডেকে পাঠালেন কেন বলুন তো? মতলবটা কী? চাকরি-বাকরি কিছু দেবেন বুঝি?

হরিলোচন বললে—না, চাকরি তো সুরেনবাবু করেনই—

—চাকরি করেন? কত টাকা মাইনের চাকরি?

—দেড়শো।

বলেই বললে—আমি এখন যাই তাহলে মশাই, আমার আবার হাজরে দেবার টাইম হয়ে গেছে।

বলে হরিলোচন চলেই যাচ্ছিল, কিন্তু কালীকান্ত এগিয়ে গিয়ে ধরে ফেললে। বললে—শুনুন না মশাই, চলে যাচ্ছেন কেন? আপনার নামটা কী, ভুলে গেলাম—

হরিলোচন বললে—শ্রীহরিলোচন সরকার—

কালীকান্ত নাম শুনে যেন বিগলিত হয়ে গেল। বললে—তা হরিলোচন-বাবু, সুরেন ভায়ার যখন একটা চাকরি হলো তো আমার একটা হয় না?

হরিলোচনের তখন হাতে অনেক কাজ। তাকেও খাওয়া-দাওয়া সেরে কাজে বেরোতে হবে। বললে—আমি তো চাকরি দেবার মালিক নই, আমি সামান্য মানুষ। কর্তা নিজেই সুরেনবাবুকে ডেকে চাকরি দিয়েছেন। আমার আর কতটুকু হাত?

কালীকান্ত বললে—তাহলে এক কাজ করুন, আমাকে একবার মিনিষ্টার মশাইয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিন—

হরিলোচন বললে—সেও আমি পারবো না মশাই, আমি কর্তার সঙ্গে কথা বলতেই ভয় পাই। বড় রাশভারী মানুষ যে!

হরিলোচন যত চলে যেতে চায়, কালীকান্ত তত আটকে রাখতে চায় তাকে। কথা বলতে বলতে উঠোন পেরিয়ে একেবারে মাধব কুণ্ডু লেনের ওপরে এসে পড়েছে। তবু ছাড়ে না কালীকান্ত।

কালীকান্ত বললে—কিন্তু আপনার বাড়িটা কোথায় বলুন, আপনার বাড়িতে গিয়েই না-হয় আমি দেখা করবো—

হরিলোচন তখন বিরক্ত হয়ে উঠেছে। বললে—আমার বাড়িতে গিয়ে কী লাভ মশাই, আমি কিছু সাহায্য করতে পারবো না আপনাকে—

কালীকান্ত বললে—না না, তবু আপনাকে মনে করিয়ে দিতে যাবো। বড় অভাবে পড়ে আছি মশাই। বড় দুরবস্থা চলছে আমার। একটা কিছু করতেই হবে আপনাকে, সুরেন ভায়ার চেয়ে আমারই বেশি দুরবস্থা—

হরিলোচন বললে—আপনার দুরবস্থা কীসের? আপনিই তো বললেন আপনি চৌধুরীবাড়ির জামাই। আপনি তো শ্বশুরবাড়ির সম্পত্তিও পাবেন—

কালীকান্ত বললে—সে-গুড়ে বালি, বুঝলেন, সে-গুড়ে একেবারে বালি! আমার বৌকে এ-বাড়ির মালিক কিস্যু দেবে না মশাই, সেই জন্যেই তো এখানে মুখ গুঁজে পড়ে আছি—

হরিলোচন ভালো করে আবার চেয়ে দেখলে কালীকান্তর দিকে। লোকটা

যেন কেমন-কেমন।

কালীকান্ত তখন এক কাণ্ড করে বসলো।

বললে—আসুন হরিলোচনবাবু, আসুন—

হরিলোচনও অবাক হয়ে গেছে। বললে—কোথায় যাবো?

কালীকান্ত হরিলোচনের একটা হাত ধরে ফুটপাথের দিকে টেনে নিয়ে গেল। বললে—আসুন না, আপনাকে খুন করবো না, ভয় নেই—

বলে টানতে টানতে একেবারে একটা চায়ের দোকানের ভেতরে ঢুকিয়ে নিয়ে গেল।

বললে—বসুন এখানে আয়েস করে—

তারপর দোকানদারকে বললে—এ্যাই, দু'কাপ চা দাও তো ভাই, বেশ গরম জলে কাপ দুটো ধুয়ে দেবে। বেশ কড়া লিকার, চিনি কম।

তারপর হরিলোচনের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে—আপনি চিনি কম খান, না বেশি?

হরিলোচনের তখন পালাই-পালাই অবস্থা। বললে—চা খাইনে মশাই, আমি এখন চা খাবো না—

—আরে চা তো আর বিষ নয়। না হয় খেলেনই-বা। বিষ তো নয় মশাই।

দোকানদার তখন নতুন ঝাঁপ খুলেছে। ভোরবেলার দিকে খদ্দেরের একটু ভিড় হয়ই। কিন্তু অত সকালে তখন কেউই আসেনি।

হরিলোচন তখনও অস্থির হয়ে আছে। কিন্তু কালীকান্ত যেমন করে হোক হরিলোচনকে খাতির করবেই। পাশের সিগারেটের দোকান থেকে দৌড়ে এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে এসেছে। প্যাকেটটা খুলে হরিলোচনের সামনে ধরে বললে—নিন, একটা তুলে নিন—

হরিলোচন জোড় হাত করে বললে—সিগারেট খাইনে আমি—

কালীকান্ত অবাক হয়ে গেল। বললে—সে কী, আপনি সিগারেটও খান না? তাহলে আপনাকে খাতির করবো কী করে? তাহলে জিলিপি? জিলিপি খাবেন? গরম-গরম জিলিপি ভাজছে পাশের দোকানে। গরম জিলিপি দিয়ে চা খেতে খুব ভালো লাগবে মশাই—যাই, নিয়ে আসি—

হরিলোচন আর থাকতে পারলে না। উঠে দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি কালীকান্তর হাতটা জড়িয়ে ধরলে। বললে—আমাকে মাফ করবেন, আমি কিছুই খাবো না। আমাকে এখুনি বাড়িতে গিয়ে নাকে-মুখে ভাত গুঁজে কাজে বেরোতে হবে--

দোকানদার চা দিয়ে গেল দু'ভাঁড়।

কালীকান্ত বললে—খান মশাই, খান—

হরিলোচন বললে—কিন্তু কেন আপনি এত খাতির করছেন আমাকে? আমি চাকরি করে দিতে পারবো না আপনার। আমার কোনও হাত নেই, আমি তো বলেইছি--

—তা হোক, চাকরি আপনি না-ই বা করে দিলেন, আপনি মিনিষ্টারের মুহুরী, আপনার মত লোকের সঙ্গে পরিচয় থাকলে ভবিষ্যতে আমাদের কত লাভ তা জানেন?

কিন্তু ওদিকে রাস্তায় হঠাৎ ভূপতি ভাদুড়ীকে দেখে কালীকান্ত যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। শুধু ভূপতি ভাদুড়ী নয়, সঙ্গে রিক্‌শায় করে ডাক্তারবাবু—

কালীকান্ত আর দাঁড়ালো না। দোকান থেকে এক লাফে রাস্তায় নেমে পড়েছে। তারপর সোজা গিয়ে একেবারে ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলে—ডাক্তারবাবু,

মা-মণিকে কেমন দেখলেন?

হঠাৎ অচেনা লোকটার প্রশ্ন শুনে ডাক্তারবাবুও অবাক।

ভূপতি ভাদুড়ী পরিচয় করিয়ে দিলে। বললে—আমাদের বাড়ির জামাই ইনি—

ডাক্তারবাবু বার দুয়েক লোকটার দিকে আপাদমস্তক চেয়ে দেখলে। তারপর সংক্ষেপে বললেন—ভালো—

—ভালো মানে?

ডাক্তারবাবু আরো একটু বুঝিয়ে বললেন—মানে, তত ভয়ের কিছু নেই।

কালীকান্ত বলে উঠলো—কী বলছেন আপনি? ভয়ের কিছু নেই? কিন্তু মাথা ফেটে গিয়ে অত রক্তপাত হলো তবু বলছেন ভয়ের কিছু নেই?

ভদ্রতার খাতিরে ডাক্তার বেশি বলতে পারলেন না। শুধু বললেন—রক্তপাত হয়েছিল বটে, তবে এখন একটু সামলে নিয়েছেন। স্ট্রং ওষুধ দিয়েছিলুম, তাতেই কাজ হয়েছে—

কালীকান্ত এবার রেগে গেল খুব।

কিন্তু রাগটা চেপে বললে—আপনি স্ট্রং ওষুধ দিয়েছেন? কিন্তু স্ট্রং ওষুধ দিলেন কেন? আপনি জানেন বুড়ো-মানুষ, হার্টটা উইক। এই দুর্বল হার্টের ওপর স্ট্রং ওষুধ কি দিতে হয়?

ডাক্তারবাবুর কথাটা শুনতে ভালো লাগলো না। কিন্তু তবু কিছু বললেন না। রিক্‌শায় চড়ে যেমন বসে ছিলেন, তেমনি বসে রইলেন। ভূপতি ভাদুড়ী পাশাপাশি হে'টে চলছিল। তারও কালীকান্তর মাতব্বরিটা ভাল লাগেনি।

বললে—তুমি চুপ করো না বাবাজি! ডাক্তারবাবু যা ভালো বুঝেছেন তাই করেছেন। ওষুধের ব্যাপারে তুমিই বা কী জানো, আর আমিই বা কী জানি—

কালীকান্ত বললে—আমি জানি না মানে? আমি ডাক্তার নই বলে কি ওষুধ আমি খাই না? না, কখনও খাইনি? হার্ট যখন দুর্বল তখন কি কোনও ডাক্তার স্ট্রং ওষুধ দেয়?

ডাক্তারবাবু রিক্‌শাওয়ালাকে হঠাৎ থামতে বললেন।

রিক্‌শাটা থামতেই ডাক্তারবাবু বললেন—আপনি নিজেই যদি অত বোঝেন, তাহলে নিজেই চিকিৎসা করুন না আপনার শাশুড়ির, আমাকে আর মিছিমিছি ডাকা কেন?

ভূপতি ভাদুড়ীও বললে—তা তো বটেই। ডাক্তারবাবুর কথার ওপরে তুমি কথা বলতে যাও কেন? উনি যেটা ভালো বুঝেছেন সেটাই করেছেন—

কালীকান্ত বলে উঠলো—তা বললে শুনবো কেন? ভাবছেন আমি জানি না আপনার কী মতলব? দেবো সব ফাঁস করে?

ভূপতি ভাদুড়ী একটু লজ্জায় পড়লো।

বললে—কেন, আমার কী মতলব?

—আপনার মতলব মা-মণি তাড়াতাড়ি মারা যাক।

—সে কী?

ভূপতি ভাদুড়ী যেন লজ্জায় আধমরা হয়ে গেল। ডাক্তারবাবুর সামনে কালীকান্ত এ-সব কী বলছে?

জানেন? এরা চায় আমার শাশুড়ি তাড়াতাড়ি মরে যাক—

কালীকান্ত তখন ডাক্তারবাবুকে সাক্ষী মেনে ফেললে।

বললে—ডাক্তারবাবু আপনি শুনুন, মন দিয়ে শুনুন—এদের মতলব কী

ডাক্তারবাবু বললেন—দেখুন, রাস্তার মধ্যে এ-সব আলোচনা করবেন না। আপনাদের ঝগড়া করবার দরকার হয়, বাড়ির ভেতরে গিয়ে করুন। লোকে শুনলে আপনাদেরই দোষ দেবে সবাই—

কালীকান্তর কিন্তু লোকলজ্জা বলে কোনও বস্তু নেই।

বললে—আমার মশাই অত লজ্জা-ফজ্জা নেই। লোকে কী বলবে তার জন্যে আমি থোড়াই কেয়ার করি। সত্যি কথা বলতে আবার লজ্জা কী মশাই—

ডাক্তারবাবু বললেন—তাহলে আপনারা ঝগড়া করুন, আমি চলি, আমার কাজ আছে—

কালীকান্ত তাড়াতাড়ি রিকশার হাতলটা ধরে ফেললে।

বললে—না ডাক্তারবাবু, আপনার পায়ে পড়ি, আপনি এর একটা বিহিত করে দিয়ে যান—

ডাক্তারবাবু বড় মুশকিলে পড়লেন। বললেন, আমি কী বিহিত করবো?

কালীকান্ত বললে—আপনি বিহিত না করলে কে বিহিত করবে? আমার কে আছে? জানেন ডাক্তারবাবু, আমার শাশুড়ির সম্পত্তিটা গ্রাস করবার জন্যে এই ম্যানেজার বহুদিন থেকে প্ল্যান করছে। এখন পাছে আমার হাতে পড়ে তাই মা-মণিকে তাড়াতাড়ি মেরে ফেলবার মতলব—

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—এর কথা কিছু বিশ্বাস করবেন না ডাক্তারবাবু, এর কথার এক বর্ণও বিশ্বাস করবেন না। আমি চৌধুরী মশাই-এর আমলের লোক। আমার নামে এই বদনাম!

ডাক্তারবাবু এতক্ষণে রিকশা থেকে নেমে এলেন।

বললেন—দেখুন, আপনারা রাস্তার মধ্যে দাঁড়িয়ে কেলেঙ্কারি করবেন না। চেয়ে দেখুন, কত লোক জড়ো হয়ে গেছে। আপনাদের নিজেদের মধ্যেকার ঝগড়া, নিজেরা মিটিয়ে ফেলুন গে যান—

ভূপতি ভাদুড়ীর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো। বললে—দেখছেন তো ডাক্তারবাবু, আপনি নিজের চোখ দিয়েই তো সব দেখছেন। বাবাজী বলে কিনা আমি সম্পত্তির লোভে আমার মা-মণিকে মেরে ফেলছি—

ডাক্তারবাবু কালীকান্তর দিকে চেয়ে বললেন—বুড়োমানুষকে কেন কষ্ট দিচ্ছেন মিছিমিছি। আমি তো এঁকে অনেকদিন থেকে জানি। ইনি নতুন নন। যদি কিছু বলবার থাকে তো আপনি মা-মণিকে গিয়ে বলুন। তাঁর কাছে গিয়ে আপনি কমপ্লেন করুন। আমি রোগীর চিকিৎসা করতে এসেছি, আমাকে কেন জড়াচ্ছেন এর মধ্যে—

ইতিমধ্যে রাস্তায় আরো কিছু লোক জড়ো হয়ে গিয়েছে। তাদের কৌতূহল, এখানে কী হচ্ছে তা জানবে।

কালীকান্তর কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই। সে তখন লম্বা-চাওড়া কথা আরম্ভ করে দিয়েছে। বলছে—এ্যাদ্দিন আমি কিছু বলিনি—আমি ভদ্দরলোকের ছেলে, কারো ব্যাপারে আমি থাকতে চাইনি, কিন্তু বলবো কী, এবার আমার অসহ্য হয়ে উঠেছে—

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—তুমি অসহ্য হয়েছ, না তোমার ব্যাপারে আমরা অসহ্য হয়ে উঠেছি!

—খবরদার বলছি ম্যানেজার। মুখ সামলে কথা বলবে!

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—মুখ সামলে কথা বলবো কেন শুনি? আমি কী করেছি তোমার যে মুখ সামলে কথা বলবো? আমি কি তোমার খাই, না পরি...

কথা শেষ না হতেই কালীকান্ত এক ঘুঁষি মেরেছে ভূপতি ভাদুড়ীর মুখের ওপর! বুড়োমানুষ। ঘুঁষি খেয়ে পড়ে যাবারই কথা। কিন্তু ভূপতি ভাদুড়ী কালীকান্তকে দু'-হাতে জাপটে পেড়ে ফেলবার চেষ্টা করতে গিয়ে দু'জনেই এক সঙ্গে রাস্তার ওপর টলে পড়লো।

আর যারা এতক্ষণ দেখছিল তারা সবাই 'গেল' 'গেল' করে উঠলো। ডাক্তারবাবু আর দাঁড়ালেন না। তাড়াতাড়ি রিকশায় উঠে বললেন—চল্‌ চল্‌ জোরে চালা বাবা—

চায়ের দোকানের ভেতর থেকে হরিলোচন এতক্ষণ কাণ্ডটা দেখছিল। দু'ভাঁড় চা তখন ঠাণ্ডা জল হয়ে গেছে।

দোকানদারের কথায় যেন চমক ভাঙলো।

দোকানদার বললে—কী বাবু, চা যে জল হয়ে গেল, খাবেন না?

হরিলোচন দেখলে এই-ই ফাঁক, এমন লোকের পাল্লায় পড়বে সে কল্পনাই করতে পারেনি।

পকেট থেকে পয়সা বার করে বললে—না বাবা, চা আমি খাবো না, তা কত হয়েছে বলো দিকি?

—চার আনা।

পকেট থেকে চার আনা দোকানদারের হাতে গুণোগার দিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লো। এমন বিপাকেও মানুষ পড়ে! তারপরে একেবারে এক দৌড়ে ট্রাম-রাস্তায় পড়ে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো।

ওদিকে সুরেন একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। বরানগরের একটা বাড়িতে দেবেশ তাকে রেখে দিয়েছিল। সে-বাড়িতে না আছে কোনও সঙ্গী, না-আছে কোনও কাজ। দিনগুলো বড় অস্বস্তিতে কাটছিল। দেবেশদেরই একটা ব্রাঞ্চ অফিস খোলবার কথা আছে ওখানে। বাড়িটা ভাড়া নেওয়া হয়েছে অনেকদিন, কিন্তু তখনও অফিস শুরু হয়নি। হোটেলে গিয়ে সুরেন ভাত খেয়ে আসতো দু'বেলা আর বাড়ির ভেতরে চুপচাপ শুয়ে-বসে থাকতো।

দেবেশ আসতো মাঝে মাঝে।

জিজ্ঞেস করতো—কী রে, কেমন লাগছে?

সুরেন প্রথম দিকে বলতো—ভালো—

কিন্তু কাজ কিছু নেই, সারাদিন চুপচাপ বসে থাকা, এই জিনিসটাই একদিন চেয়েছিল সুরেন। কিন্তু এত খারাপ লাগবে তা প্রথমদিকে সেটা বুঝতে পারেনি। শুয়ে শুয়ে মা-মণির কথা মনে পড়তো, সুখদার কথাও মনে পড়তো। মনে পড়তো পর্মিলির কথা, টুলুর কথা, সকলেই যেন তার মনের সামনে এসে ভিড় করে দাঁড়াতো। তারপর ভাবতে ভাবতে যখন ঘুম আসতো না, তখন মাঝরাত্তিরে গিয়ে ছাদে উঠে পায়চারি করতো।

সেদিন দেবেশ আসতেই সুরেন বললে—আমি আর পারছিনে ভাই, আমাকে একটা কিছু কাজ দে, যে-কোনও একটা কাজ—

—কী কাজ চাস তুই?

সুরেন বললে—যে-কোনও কাজ—

দেবেশ বললে—কাল আমাদের একটা প্রোসেশান বেরোবে. তুই জয়েন করবি?

সুরেন বললে—কীসের প্রোসেশান?

—আমরা হান্‌ড্রেড্‌ ফর্টিফোর ভাঙবো—

—কী করে ভাঙবি?

দেবেশ বললে—আমরা ফ্ল্যাগ্‌ নিয়ে শ্লোগান দিতে দিতে রাজ-ভবনের সামনে পুলিশ-কর্ডন ভাঙবো।

সুরেন বললে—তাই যাবো—

দেবেশ বললে—কিন্তু মাথায় তোর লাঠি পড়তে পারে। পুলিশ ধরে নিয়ে জেলে পুরতে পারে—

সুরেন বললে—তা পুরুক। না হয় কয়েক মাস জেলই খাটবো, আমি রাজী—

দেবেশ বললে—তবে তাতে তোর হেলথ্‌ ভালো হয়ে যাবে, তা বলে রাখছি, তোকে ফার্স্ট ক্লাস প্রিজনার করে দেবার ব্যবস্থা করে দেবো।

সুরেন বললে—সে যা-হয় হবে, আমি জেলে গিয়েই ভালো থাকবো। এখনও তো এক রকম জেলখানাতেই আছি ভাই—

সুরেন বললে—তাই ভালো, এর চেয়ে তাই ভালো—

দেবেশ জিজ্ঞেস করলে—কেন, এখানে তোর অসুবিধেটা কী হচ্ছে?

অসুবিধেটা যে কী হচ্ছে তা কী করে সে বোঝাবে? আসলে কোনও অসুবিধে তো হবার কথা নয় তার। কোথাও কোনও কাজ তাকে করতে হয় না। এ-বাড়িটা পার্টির তরফ থেকে ভাড়া নিয়েছে সন্দীপদা। আসলে সন্দীপদাই সব কিছুর ব্যবস্থা করে দেবেশদের অফিসে। একজন অদ্ভুত চরিত্রের লোক। নিজে চাকরি করে মোটা মাইনে পায়। সব টাকাটা পার্টির জন্যে খরচ করে। অথচ কখনও সামনে আসে না। বাইরের লোকের চোখের আড়ালে বসে নিঃশব্দে কাজ করে যায়। যে-কথা পূর্ণবাবুরও মন থাকে না সে-কথা সন্দীপদার মনে থাকে। কোথায় কার টাকা দরকার, কার কাছ থেকে কত টাকা পাওয়া যাবে, কখন কত টাকা খরচ করতে হবে, কে খাচ্ছে কে খাচ্ছে না, সব হিসেব সন্দীপদার। এই বরানগরে যে বাড়ি ভাড়া এও সন্দীপদার প্ল্যান। যখন মেম্বর বাড়বে তখন এখানে একটা কমিউন-অফিস হবে। এখন খালি রেখেছে বটে, কিন্তু আর কিছুদিন পরেই দেবেশদের অফিসেব কিছু মেম্বার এখানে থাকবে। এই অঞ্চলের কাজ-কারবারে কাছাকাছি থাকলে কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হয়।

কিন্তু সেজন্যে নয়। আসলে একলা থাকলেই যেন সমস্ত জীবনটা বার বার ঘুরে ফিরে তার কেবল মনে আসে। সেই ছোটবেলা থেকে কলকাতায় এসে এই বর্তমান কালটা পর্যন্ত যেন সমস্ত কিছু তাকে আক্রমণ করতে আসে। কেবল বলে—এ নয়, এ নয়, এখান থেকে পালাও, এই কাজের জন্যে তোমার জন্ম হয়নি—

সেই টুলুদের বাড়ি যেদিন গিয়েছিল সেদিন থেকেই মনে হয়েছিল এ-পৃথিবীর সবটাই বেনিয়মী! যার সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকার কথা সে সুখে নেই। যার শাস্তি পাবার কথা সে পায়ের ওপর পা তুলে আরাম করে কাটাচ্ছে। টুলু-দের অবস্থা দেখে সে অবাক হয়ে গিয়েছিল। এক ঘড়া জল আনতে গেলে আধ মাইল দূরের টিউব-ওয়েল থেকে বয়ে আনতে হয়। চোখের চশমার দরকার হলে টাকা ধার করতে হয়, কিংবা ভিক্ষে চাইতে হয়। অথচ পুণ্যশ্লোকবাবুর বাড়িতে

টাকার পাহাড় জমা আছে। যেমন মাধব কুণ্ডু লেনের মা-মণির অগাধ ঐশ্বর্য! ঐশ্বর্যের ভাগ পাবার জন্যে কালীকান্ত বিশ্বাস আর নরেশ দত্তর ষড়যন্ত্র।

—কবে মিছিল বেরোবে?

দেবেশ বললে—কাল।

বলে একটু থেমে আবার বললে—আমাদের দাবীর কথা জানানোর জন্যে আমরা পদ্মজা নাইডুর সঙ্গে দেখা করতে যাবো। কিন্তু পুলিশ যেতে দেবে না। ওরা রাস্তা কর্ডন করে রাখবে। কিন্তু আমরা কর্ডন ভেঙে এগোবার জন্যে জিদ করবো। তখন পুলিশ আমাদের লাঠি মারবে--

—লাঠি মারবে কেন? লাঠি না মেরে জেলে পুরলেই তো পারে।

দেবেশ বললে—লাঠি মারলেই তো আমাদের লাভ রে—

সুরেন অবাক হয়ে গেল। বললে—কেন, তোদের লাভ কিসের?

দেবেশ বললে—লোকে দেখুক বিধান রায় কি-রকম দেশের লোকের শত্রু। আমরা তো বিধান রায়ের মিনিষ্ট্রিকেই হঠাতে চাই রে। লোকে বিধান রায়ের ওপর যত ক্ষেপে উঠবে ততই আমাদের পার্টির লাভ। এখানে বিধান রায় আর দিল্লীতে নেহরু এরাই হচ্ছে দেশের শত্রু—

—কিন্তু এই রকম পুলিশের মার খেলেই কি ওরা সরবে?

দেবেশ বললে—কিন্তু সামনে তো ইলেকশান আসছে, তখন তোর বিধান রায়ই হোক আর ওই নেহরুই হোক, সকলকেই ভোটারদের দরজায় আসতে হবে। এখন যদি আমাদের মিছিলের ওপর পুলিশ লাঠি মারে তাহলে তখন সেই ভোটের সময় ওরা ওদের মুখ দেখাবে কী করে?

সুরেন কী যেন ভাবতে লাগলো চুপ করে।

দেবেশ বললে—কী ভাবছিস, শিগগির শিগগির বল্! তোর সঙ্গে কথা বললে আমার চলবে না। আমার অনেক কাজ—

—তোর কী কাজ?

দেবেশ বললে—বলছিস কী, কাজ নয়? কাল ভোরবেলা বাইরে থেকে লোক আসতে শুরু করবে। একটা দুটো লোক নয় তো, লক্ষ-লক্ষ লোক। তাদের খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা করতে হবে—তোর এ-বাড়িতেও পাঁচশো লোক থাকবে কাল—

—পাঁচশো লোক এখানে ধরবে?

—গাদাগাদি করে থাকবে কোনও রকমে। থাকতে হবে। এই রকম ছড়িয়ে ছড়িয়ে থাকবে সব জায়গায়।

—খাওয়া?

দেবেশ বললে—খাওয়ার ব্যবস্থার জন্যেই তো এখন আমাকে বেরোতে হবে। পাড়ার লোকদের বাড়ি-বাড়ি গিয়ে বলতে হবে। বাড়ি পিছু একশো-দুশো করে রুটি তৈরী করতে বলবো। টুলুরা তিনশো রুটি তৈরী করবে।

—তিনশো রুটি? অত আটা কোথায় পাবে?

দেবেশ বললে—যেখান থেকে হোক জোগাড় করবে। পিপল্ তো আমাদের দলে। সবাই-ই তো কংগ্রেসের জ্বালায় জ্বলছে। লুকিয়ে লুকিয়ে সবাই যে আমাদের সাহায্য করছে—

তারপর যেন মনে পড়ে গেল এমনিভাবে বললে—আমি যাই, তুই ঠিক যাস কিন্তু—

—আমি কার সঙ্গে যাবো? কোথায় যাবো?

দেবেশ বললে—সে তোকে ভাবতে হবে না। দেখবি কাল ভোর থেকেই এখানে লোক এসে জুটতে আরম্ভ করেছে। তারা এখেনে এসে উঠবে, খাবে। তারপর বিকেল চারটের সময় সবাই সার বেঁধে মিছিল করে বেরোবে—তুইও তাদের সঙ্গে যাস্—

—তুই আসবি না?

দেবেশ বললে—আমার কিছু ঠিক নেই। আমি কাল কোথায় থাকি এখন বলতে পারছি না। সে আমি আসি আর না-আসি, তোর কিছু ভাবনা নেই—

—তোর সঙ্গে তাহলে রাজভবনের সামনে দেখা হবে তো?

দেবেশ বললে—দূর, সেখানে কে কার খবর রাখে তখন? মারামারি কাটাকাটির মধ্যে আমিই বা কোথায় থাকবো আর তুই-ই বা কোথায় থাকবি তার কি ঠিক আছে?

—আর টুলু? টুলু যাবে?

দেবেশ বললে—টুলু কাল থেকেই আমাকে বলছে যাবে। আমি বারণ করলাম, সহদেববাবুও বারণ করছিলেন, নতুন অসুখ থেকে উঠেছে, এখন না-যাওয়াই ভালো। কিন্তু কিছুতেই ছাড়বে না। সে যাবেই—

সুরেন বললে—ওকে তুই আসতে দিসনি ভাই, এ-সব গণ্ডগোলের মধ্যে মেয়েদের কি যাওয়া ভালো?

দেবেশ বললে—সে কারো কথা শুনবে না—বড় একগুঁয়ে মেয়ে—

—কিন্তু যদি তার মাথায় লাঠি-টাটি পড়ে? আবার যদি মাথায় লাগে তখন কে দেখবে?

দেবেশ বললে—সে তা শুনবে না। সে বলে কংগ্রেস যদি গদি আঁকড়ে থাকে তাহলে তার বেঁচে থাকাই মিথ্যে।

সুরেন কী যেন ভাবলে। তারপর বললে—আমি না থাকলে বরং কারো কোনও লোকসান নেই। কেউ আমার জন্যে কাঁদবে না। কিন্তু ওর যে মাথার ওপর বুড়ো বাপ রয়েছে, ওর ভরসায় দুটো ছোট ছোট বোন, তাদের কে দেখবে?

দেবেশ বললে—ওসব ভাবলে পার্টির কাজ চলে না। দেশের কাজ করতে গেলে লাইফ দিতেই হবে, লাইফ দেবার জন্যে তৈরি থাকতে হবে। বিধান রায় কি সহজে গদি ছাড়বে ভেবেছিস? আমি চলি—

সুরেন দেবেশের সঙ্গে বাইরে রাস্তায় বেরিয়ে এল। অন্ধকার আর ধোঁয়া ঘন হয়ে এসেছে রাস্তায়। পার্টিশানের পর থেকে বরানগরে উদ্বাস্তুদের ভিড় বেড়েছে। যত দিন যাচ্ছে ততই ভিড় আরো বাড়ছে। কাল এতক্ষণে রাস্তাঘাটে অন্য রকম চেহারা। এ-বাড়িতে চার-পাঁচশো লোক এসে উঠেছে। মেয়েরাও থাকবে, পুরুষরাও থাকবে। হৈ-হৈ পড়ে যাবে পাড়ায়। সবাই মিলে আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার করবে—আমাদের দাবী মানতে হবে, নইলে গদি ছাড়তে হবে, ছাড়তে হবে—

—তুই আর কেন আসছিস, এবার যা—

সুরেন বললে—হ্যাঁরে, তোদের অফিসে আমার মামা একদিন আমার খোঁজ-টোজ করতে গিয়েছিল?

দেবেশ বললে—কই, কিছু তো শুনিনি—

সুরেন বললে—নিশ্চয়ই গিয়েছিল। তুই হয়ত তখন ছিলি না।

—তা হবে!

সুরেন বললে—পুণ্যশ্লোকবাবুও হয়ত খুব ভাবছেন। হয়ত মাধব কুণ্ডু

লেনের বাড়িতে খুঁজতে লোকও পাঠিয়েছিলেন—! হঠাৎ যাওয়া বন্ধ করেছি তো!

কথাটা বলেই মা-মণির কথা মনে পড়লো। মা-মণির অসুখ দেখে এসেছে। ধনঞ্জয় ডাক্তার ডাকতে গিয়েছিল মা-মণির জন্যে! তারপর কী হলো কে জানে!

—আর আসছিস কেন তুই?

সুরেন বললে—না, এবার ফিরি।

—হ্যাঁ, কাল ভোরবেলা উঠে তৈরি হয়ে নিবি। সকাল থেকেই আস্তে আস্তে লোক আসতে আরম্ভ করবে। দুপুরবেলা আমিই আসি কিংবা আর কেউ আসুক, তোদের সবাইকে নিয়ে প্রোসেশান করে কলকাতার দিকে নিয়ে যাবে—

দেবেশ চলে গেল হন্ হন্ করে। সুরেন সেদিকে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ; তারপর আবার ফিরলো। রাস্তা দিয়ে দলে দলে অফিস-ফেরত লোক চলেছে। ওদের কোনও ভাবনা নেই। দেশের সিংহাসনে কে বসে আছে তা নিয়ে কারো মাথাব্যথা নেই। বিধান রায়ই থাকুক, কি নেহরুই থাকুক কিংবা পূর্ণবাবুই থাকুক তাতে কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই। পাঁচ বছরে একবার ভোট দিতে হয় তাই দেওয়া। কাকে ভোট দিতে হবে তাও তারা ভাবে না। যে-ই আসুক তাতে তাদের কোনও লাভ-লোকসান নেই। তাদের খেটে খেতে হবেই। কেউ তাদের বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াতে আসবে না। জিনিসপত্রের দাম যেমন বাড়ছে তা বেড়েই চলবে, এর আর কোনও প্রতিকার নেই যেন। সেই একবার ১৯৫২ সালে ভোট হয়েছিল, এতদিন পরে আবার ভোট আসছে—এবার কারা জিতবে? বিধান রায়ের দল না পূর্ণবাবুর দল? তারই লড়াই চলবে কাল রাজভবনের সামনে!

সুরেন আবার সদর দরজাটা খুলে বাড়ির ভেতরে ঢুকলো।

সুকীয়া স্ট্রীটের বাড়ির ফটকের সামনে আসতেই পর্মিলির গাড়িটা একটু থামলো। গেটটা বন্ধ ছিল। দরোয়ান তাড়াতাড়ি দৌড়ে এসে গেট খুলে দিয়ে সেলাম করে সরে দাঁড়ালো।

গাড়িটা পোর্টিকোর নিচে গিয়ে দাঁড়াতেই পর্মিলি নামলো। নেমে সোজা ওপরের দিকেই চলে যাচ্ছিল। কিন্তু থমকে দাঁড়াতে হলো।

প্রজেশ দাঁড়িয়ে ছিল একাই। তার মুখে-চোখে লজ্জা মাখানো। পর্মিলিকে দেখেই পাশে সরে যাচ্ছিল।

পর্মিলি কিন্তু তাকে সরে যেতে দিলে না।

বললে—কী হলো, তুমি আবার এসেছ যে?

প্রজেশ যেন একটু থতোমতো খেয়ে গেল। বললে—তুমি কোথায় গিয়েছিলে?

পর্মিলি বললে—আমি যেখানে খুশী যাবো, কিন্তু তুমি এসেছ কেন আবার?

প্রজেশ বললে—মিস্টার রায় ডেকেছেন।

—তোমাকে ডেকেছে?

যেন বিশ্বাস করতে পারলে না কথাটা। বললে—ঠিক বলছো বাবা তোমাকে ডেকেছে?

প্রজেশ বললে—বিশ্বাস না করো মিস্টার রায় বাড়িতে এলে তাঁকেই জিজ্ঞেস কোর।

পর্মিলি বললে—কিন্তু আমি তো বাবাকে বারণ করে দিয়েছি তোমার মত স্কাউনড্রেলকে বাড়িতে ডাকতে—

প্রজেশ বললে—দেখছি আমার ওপর তোমার রাগ এখনও যায়নি পর্মিলি। অথচ আমি তোমার কী যে করেছি তা আজ পর্যন্ত জানতে পারলুম না। বলতে পারো আমার দোষটা কী?

পর্মিলি সে-কথার উত্তর না দিয়ে সোজা ওপরের দিকে উঠে যাচ্ছিল। প্রজেশ কিছুটা এগিয়ে এল। বললে—পর্মিলি, একটা কথা শোন—

মুখ ফিরিয়ে পর্মিলি বললে—কী?

প্রজেশ সেন বললে—তুমি যেমন আমার সর্বনাশ করেছ, তেমনি নিজেরও একদিন সর্বনাশ করবে তুমি।

—তার মানে?

প্রজেশ বললে—হ্যাঁ, একটা কথা মনে কবে রেখো, চিরকাল কারো সমান যায় না।

পর্মিলি বললে—তুমিই তো তার প্রমাণ; একদিন রাস্তার কুকুর ছিলে, এখন পোষা কুকুর হয়েছে।

প্রজেশ বললে—আমাকে তুমি যত গালাগালিই দাও আমি কিছু মনে করতে যাবো না। তোমার বাবার কাছে আমি গ্রেটফুল। আজ আমি যা হয়েছি তা তোমার বাবার জন্যেই হয়েছি। ছিলুম একজন কংগ্রেসের ভলান্টিয়ার, আজ হয়েছি এক-জন গেজেটেড্ অফিসার। কিংবা হয়ত তার চেয়েও বড়। কিন্তু সেই ইঁদুর আর সিংহের গল্পটা জানো তো? ইঁদুরটা সিংহের উপকার করে ধন্য হয়েছিল।

পর্মিলি বললে—তুমিই সেই ইঁদুর বুঝি? তুমিই আজ সিংহের উপকার করতে চাও—

প্রজেশ বললে—আমি কিছুই করতে চাই না—আমি শুধু তোমাকে কথা-মালার সেই গল্পটা মনে করিয়ে দিলুম।

পর্মিলি বললে—তার মানে তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ? না কি তুমি কমিউনিস্টদের দলে গিয়ে ভিড়ছো—

প্রজেশ বললে—তার আর উপায় নেই। আর তাছাড়া তারা আমাকে তাদের দলে নেবেও না। আমি ব্র্যান্ডেড কংগ্রেসাইট্। কলকাতার সবাই জানে আমি পুণ্যশ্লোকবাবুর স্টুজ্—

পর্মিলি বললে—তাই যদি জানো তো তাহলে এত ভণিতা করছো কেন? যা বলতে চাও খুলেই বলো না।

প্রজেশ বললে—খুলেই তো বলছি—পুণ্যশ্লোকবাবু আবার আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন -

—কেন ডেকে পাঠিয়েছেন?

প্রজেশ বললে—কেন আবার? কমিউনিস্টরা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে যে—

পর্মিলি বললে—তাতে কি বাবা ভয় পেয়ে গেছে বলতে চাও?

প্রজেশ বললে—না তা বলছি না। কিন্তু এবারে বাহান্ন সালের ইলেকশান তো আর নয়। এবার চাকা ঘুরে গেছে। এটা ছাপ্পান্ন সাল, কংগ্রেসের মধ্যেও ভাঙন ধরেছে সেটা তো সবাই জানে!

পর্মিলি বললে—তা সেই কথা বলতেই কি তুমি এখানে এসেছ?

প্রজেশ বললে—না, তোমার সঙ্গে দেখা করতেও এসেছি—

—আমার সঙ্গে কী দরকার?

প্রজেশ বললে—মিষ্টার সান্ন্যাল সম্বন্ধে একটা খবর পেলাম। এখানে শুনলাম রোজ আসে, না কি হিস্টি লিখছে কংগ্রেসের—

—হ্যাঁ

—কিন্তু শুনলাম নাকি সে আবার কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে ঘোরাঘুরি করছে। কিন্তু এখান থেকে যদি মাইনে নেয় তাহলে ওদের ওখানে আবার যাচ্ছে কেন?

পর্মিলি বললে—ওসব নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। ওসব বাবার কাছে গিয়ে বোল তুমি—

প্রজেশ বললে—কিন্তু তাহলে আমি কী দোষ করলাম! আমাকে সরিয়ে দিয়ে মিষ্টার সান্ন্যালের এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট হলো, অথচ যত দোষ হলো আমার .....

হঠাৎ গেটের সামনেই গাড়ির শব্দ হলো। প্রজেশ দেখলে পুণ্যশ্লোকবাবুর গাড়ি ঢুকছে ভেতরে। গাড়িটা পোর্টিকোর সামনে আসতেই প্রজেশ এগিয়ে গেল। পুণ্যশ্লোকবাবু গাড়ি থেকে নামলেন। নেমে প্রজেশকে দেখেই বললেন—কী হলো, কতক্ষণ এসেছ? বলে নিজের ঘরের দিকে চলতে লাগলেন।

প্রজেশ সেনও পেছনে পেছনে চলতে লাগলো, তারপর ঘরের ভেতরে গিয়ে ঢুকলো। হরিলোচন মুহুরী আপন মনেই কাজ করছিল। পুণ্যশ্লোকবাবু চেয়ারে গিয়ে বসতেই হরিলোচন কয়েকখানা চিঠি সামনে এনে রেখে দিলে।

পুণ্যশ্লোকবাবু প্রজেশের দিকে চেয়ে বললেন—বোস—

পুণ্যশ্লোকবাবুকে দেখে প্রজেশের মনে হলো যেন খুব বিব্রত তিনি। সাধারণতঃ এত বিব্রত তাঁকে দেখা যায় না। প্রজেশ বুঝতে পারলে পার্টির ব্যাপারে তিনি খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। আগেও এমন অনেকবার হয়েছে তাঁর। যেদিন থেকে পুণ্যশ্লোকবাবু কংগ্রেসে ঢুকেছেন, সেইদিন থেকেই একটা-না-একটা ব্যাপার নিয়ে তাঁর সমস্যা থাকে। আগে যখন প্রজেশ এ-বাড়িতে আসতো তখন পুণ্যশ্লোকবাবু তাকে সব কথা বলতেন। পরামর্শ চাইতেন। কিন্তু আজকাল অন্যরকম। সেই যেদিন পর্মিলি পুলিশের হাতে ধরা পড়লো, তারপর থেকেই তাঁদের দুজনের সম্পর্কের মধ্যে যেন একটা ছেদ পড়েছে।

পুণ্যশ্লোকবাবু প্রজেশকে বসতে বলে টেবিলের ওপরকার চিঠিগুলো দেখতে লাগলেন এক-এক করে। অনেক চিঠি। হরিলোচন সব চিঠিগুলোই এক-এক করে সাজিয়ে রেখেছিল পর পর।

হঠাৎ যেন কী মনে পড়লো পুণ্যশ্লোকবাবুর। হরিলোচনের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন—হরিলোচন--

হরিলোচন কাজ করতে করতে কাজ থামিয়ে মুখ ফেরালে—আজ্ঞে।

—আজ সেই সুরেন আসেনি?

হরিলোচন বললে—আজ্ঞে, কই, আসেনি তো!

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—তা তোমাকে যে বলেছিলুম একবার তার ঠিকানা জোগাড় করে তার সঙ্গে দেখা করতে? ঠিকানা পেয়েছিলে? অসুখ-বিসুখ হয়েছে হয়ত...

হরিলোচন বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিকানা জোগাড় করে আমি সেখানে গিয়েছিলাম। অসুখ হয়নি—

—অসুখ হয়নি তাহলে? ভালো আছে?

হরিলোচন বললে—আজ্ঞে তা বলতে পারছি না। দেখা হয়নি সুরেনবাবুর সঙ্গে—

—দেখা হয়নি তো আর একবার দেখা করলে না কেন?

হরিলোচন বললে—আজ্ঞে, সুরেনবাবু সে বাড়িতেই আর থাকেন না। বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন।

পুণ্যশ্লোকবাবু অবাক হয়ে গেলেন। বললেন—বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে মানে! ঝগড়া হয়েছে? না কি অন্য কোথাও চাকরি পেয়েছে? কার সঙ্গে তোমার কথা হলো? কে বললে বাড়ি ছাড়ার কথা?

হরিলোচন একটুখানি দ্বিধা করতে লাগলো। তারপর বললে—সে-এক বিদ্‌ঘুটে লোক—

—বিদ্‌ঘুটে লোক? বিদ্‌ঘুটে লোক মানে? যা বলবে ভালো করে বুঝিয়ে বলো। লোকটা কে?

হরিলোচন বললে—আজ্ঞে লোকটা ওই বাড়ীর জামাই। আমাকে নাস্তানাবুদ করে দিয়েছিল একেবারে। ছাড়তে চায় না। কেবল বলে একটা চাকরি জোগাড় করে দিতে—

—কেন? কী করে সে? বেকার? ঘর-জামাই?

হরিলোচন বললে—আমার তো তাই মনে হলো। বেকার জামাই বোধ হয় ঘর-জামাই হয়ে থাকে ও-বাড়িতে—

এতক্ষণ প্রজেশ সামনে বসে সমস্ত কথা শুনছিল। এবার বললে—আমি একটা কথা বলবো পুণ্যদা?

—হ্যাঁ, বলো।

প্রজেশ বললে—আমিও সুরেনবাবুর কথা বলতে এসেছিলাম। আপনিও তো আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন—

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—আমি তো এই খবর জানবার জন্যেই ডেকে পাঠিয়েছিলাম, সামনে ইলেকশান আসছে, ভাবলাম তার আগে যদি একটা বই বেরিয়ে যায়। কংগ্রেসের আসল ইতিহাস তো কেউ লিখলো না। তোমাকেও কতবার বলেছি, তা তোমার তো সেদিকে মন নেই। অথচ কংগ্রেস সম্বন্ধে একটা সঠিক ইতিহাস থাকা দরকার। কেমন করে ছোট্ট একটা অরগ্যানিজেশান থেকে আস্তে আস্তে কংগ্রেস ব্রিটিশ-গভর্ণমেণ্টকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিলে, কেমন করে দেশকে স্বাধীন করলে, তার তো একটা রেকর্ড থাকা দরকার—

প্রজেশ একমনে পুণ্যশ্লোকবাবুর কথাগুলো শুনছিল। বললে—তা তো বটেই—

—তা তোমাকে এতবার বলেছিলুম, তুমি কিছু করলে? জীবনে তোমার দ্বারা কিছুই হবে না। সেই সব ভেবেই তো সুরেনকে দিয়ে আমি কাজ আরম্ভ করে দিয়েছিলুম, কিন্তু সে-ও দেখছি তোমার মতন—

প্রজেশ বললে—আমার মত বলছেন কেন? আমি তো কংগ্রেস ছেড়ে দিয়ে চলে যাইনি। কিন্তু সুরেনবাবু তো দল ছেড়ে দিয়েছে।

—দল ছেড়ে দিয়েছে মানে?

প্রজেশ বললে—শুনলুম পূর্ণবাবুদের পার্টিতে রয়েছে।

—সে কী?

যেন আকাশ থেকে পড়লেন পুণ্যশ্লোকবাবু। বললেন—পূর্ণবাবুর ওখানে

গিয়ে জুটেছে? কে বললে তোমাকে?

প্রজেশ বললে—অনেকেই বললে। আমাদের কংগ্রেস থেকে আগেই কিছু কিছু ছেলে পূর্ণবাবুদের পার্টিতে চলে গিয়েছিল, তারাই বললে। ওদের বৌবাজারের বাড়িতে জায়গা কুলোচ্ছিল না বলে ওরা আবার বরানগরে একটা বড় বাড়ি ভাড়া নিয়েছে—

পুণ্যশ্লোকবাবু শুনলেন কথাগুলো। শুনে খানিকক্ষণ গুম্ হয়ে রইলেন। তারপর বললেন—আশ্চর্য! অথচ দেখ ওই পূর্ণবাবু তখন খেতে পেতো না. রাস্তায় রাস্তায় ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়িয়েছে, তখন আমিই বলে ওরিয়েণ্টাল ইন্স্টিটিউশনে বাংলার মাষ্টারের চাকরিতে ঢুকিয়ে দিয়েছিলুম। মানুষ এত নেমক-হারামও হয়!

হরিলোচন তখন আবার নিজের টাইপ-রাইটার নিয়ে কাজ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—তোমাকে কী জন্যে ডেকেছিলুম শোন! তোমাকে আমার ইলেকশানে এবার মেজর পার্ট নিতে হবে। পারবে?

প্রজেশ বললে—কেন পারবো না পুণ্যদা। আপনি যা বলবেন তাই করবো—কিন্তু আপনার বইটা কে লিখবে তাহলে! ইলেকশানের আগে বেরোলে ভালো হতো না?

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—তা তো ভালো হতো। কিন্তু তা যখন হলো না তখন আর কী করা যাবে!

প্রজেশ বললে—আপনি তার জন্যে কিছু ভাববেন না পুণ্যদা। কংগ্রেসকে হারানোর সাধ্যি কারো নেই, এই আপনাকে বলে রাখলুম—

—কী করে জানলে তুমি?

প্রজেশ বললে—এ আর জানাজানির কী আছে! সবাই বলছে একই কথা।

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—তবু বলা যায় না, বুঝলে. আমি এবার সব ভোটারদের বাড়ি-বাড়ি যাবো। এবার আর রিস্ক নেবো না। কারণ পূর্ণবাবুরা এখন থেকেই প্রোসেশান করতে আরম্ভ করেছে। ওদের স্লোগান শুনেছ তো? 'গরীব মেরে মন্ত্রী পোষা চলবে না'। যেন আমরা বসে বসে শুধু মাইনে নিচ্ছি। আমরা যেন কোনও কাজ করিনি কখনও।

প্রজেশ বললে—হ্যাঁ পুণ্যদা. আমিও শুনেছি ওরা এবার নাকি বিরাট প্রোসেশান বার করবে। আমাদের সুরেন সান্ন্যালবাবু নাকি ওদের দলে ভিড়েছে—

—কে বললে তোমাকে?

পুণ্যশ্লোকবাবু উদ্‌গ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

প্রজেশ বললে—একজন দেখেছে ওদের আড্ডায় যাওয়া-আসা করতে—

পুণ্যশ্লোকবাবুর যেন বিশ্বাস হলো না। জিজ্ঞেস করলেন—তুমি ঠিক জানো?

প্রজেশ বললে—যে বলেছে আমাকে, তার কথা অবিশ্বাস করতে পারি না।

—কিন্তু কেন গেল বল তো? আমার দিক থেকে তো কোনও ত্রুটি হয়নি। আমি তো ঠিক মাসে মাসে তাকে দেড়-শো টাকা এ্যালাউন্স দিতুম।...কী হে হরিলোচন, টাকা দাওনি তুমি? টাকা তো মাসে-মাসেই নিয়ম করে দিতে?

হরিলোচন বললে—হ্যাঁ স্যার, আমি তো ঠিক মাসের পয়লা তারিখেই টাকা দিয়ে গিয়েছি, যেমন আপনি দিতে বলেছিলেন—

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—তাহলে কি পর্মিলি কিছু বলেছিল ওকে?

পমিলির তো আবার যাকে-তাকে যা-তা বলা অভ্যেস!

প্রজেশ বললে—পমিলি যদি কিছু বলেই থাকে তো আপনাকে তো বলবে সে! তার তো আপনাকে বলা উচিত—

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—তা বলা যায় না, তুমি একবার গিয়ে পমিলিকে জিজ্ঞেস করে এসো তো, যাও, জিজ্ঞেস করো ও কিছু বলেছে কিনা তাকে—

প্রজেশ আর দেরি করলে না। ঘর থেকে বেরিয়ে একেবারে সোজা ওপরে উঠে গেল। বারান্দা পেরিয়ে পমিলির ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ডাকলে—পমিলি—

পমিলির গলার শব্দ এল ভেতর থেকে। বললে—কে? প্রজেশ?

প্রজেশ ঘরের ভেতরে ঢুকলো। বললে—আমার ওপর রেগে যেও না যেন। মিস্টার রায়ই তোমার কাছে আসতে বললেন আমাকে—

পমিলি বললে—আমাকে তোমার খুব ভয় করে বুঝি?

প্রজেশ যেন এবার সাহস পেল একটু।

বললে—ভয় করবে না? তোমাকে কে ভয় পায় না তাই বলো? তোমার ভয়ে মিস্টার সান্ন্যাল পর্যন্ত ভয় পেয়ে এ-বাড়ি থেকে পালিয়ে গেল।

পমিলি বললে—কে? সুরেন? সুরেন আমার ভয়ে পালিয়ে গেছে? কে বললে এ কথা?

প্রজেশ বললে—মিস্টার রায় তো তাই-ই সন্দেহ করেন। নইলে মাসে দেড়-শো টাকা করে মাইনে পাচ্ছিল, হঠাৎ আসছে না-ই বা কেন? তোমার সঙ্গে নিশ্চয় কিছু হয়েছে!

পমিলি বললে—সে কী! তার সঙ্গে আমার কীসের রিলেশান? সে আমার কে যে আমাকে ভয় করতে যাবে?

—কিন্তু তুমি জানো না যে সে এখানে আর আসছে না? জানো না যে সে পূর্ণবাবুর পার্টিতে গিয়ে জয়েন করেছে?

পমিলি জিজ্ঞেস করলে—কে বললে তোমাকে?

প্রজেশ বললে—আমি ভাল বিশ্বাসী লোকের কাছ থেকেই শুনেছি—

পমিলি বললে—যার যে-পার্টিতে খুশী জয়েন করবে, তাতে কারো হাত নেই। তার জন্যে আমি কী করতে পারি? তাছাড়া আমাদের হাল-চাল হয়ত তার ভালো লাগে না।

—আমাদের হাল-চাল কী রকম?

পমিলি বললে—এই আমাদের ড্রিঙ্ক করা, সিগ্রেট খাওয়া, এ-সব হয়ত তার পছন্দ নয়। সে গ্রামের ছেলে, অন্যভাবে মানুষ হয়েছে। তার টাকার অভাব, চাকরি নেই। হয়ত এও হতে পারে যে সে অন্য কোথাও চাকরি পেয়েছে। চাকরি পাওয়াটাই তার কাছে বড় কথা। যেমন তুমি। বাবা তোমাকে চাকরি করে দিয়েছিল বলেই তো এখনও কংগ্রেসে রয়েছ! চাকরি না পেলে তোমার লয়্যালটি থাকতো?

প্রজেশ এবার চেয়ারের ওপর বসে পড়লো। বললে—পুণ্যদা চাকরি করে দিয়েছেন বলেই কি আমার এই লয়্যাল্‌টি?

পমিলি বললে—তাছাড়া আর কী? তুমি যা চেয়েছিলে তা তো পেয়েছ!

—আমি কী চেয়েছিলুম?

—তুমি চাকরি চেয়েছিলে, বাড়ি চেয়েছিলে, গাড়ি চেয়েছিলে, সেই জন্যেই বাবার কাছে ছিলে। সে সবই তুমি পেয়েছ!

প্রজেশ বললে—আমি কি শুধু তাই-ই চেয়েছিলুম? আর কিছু চাইনি?

—আর কী চেয়েছিলে শুনি?

প্রজেশ বললে—কিন্তু আমি তো তোমাকেও চেয়েছিলুম পর্মিলি! তোমাকে কি আমি পেয়েছি?

পর্মিলি সোজাসুজি চাইল প্রজেশের দিকে। বললে—আমাকে একলা পেয়ে তোমার তো বড় সাহস বেড়ে গেছে প্রজেশ! তোমার কি আবার আমার হাতে চড় খেতে সাধ হয়েছে?

প্রজেশ নিজের মুখটা পর্মিলির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললে—তুমি আমার গালে চড় মারবে এ তো আমার সৌভাগ্য পর্মিলি। মারো, চড়ই মারো আমাকে—যত ইচ্ছে চড় মারো—

বলে পর্মিলির হাতটা ধরে টান দিলে।

বললে—তুমি আমার গালটা নিয়ে যা ইচ্ছে করো পর্মিলি, আমি তোমায় কিচ্ছু বলবো না।

পর্মিলি বললে—আবার সেই রকম করছো? আজকেও কি তুমি ড্রিংক করে এসেছো নাকি?

প্রজেশ বললে—ড্রিংক তো আমি রোজই করি পর্মিলি। তুমি হঠাৎ নতুন কথা বলছো কেন? তুমিই তো আমায় ড্রিংক করতে শিখিয়েছ! তোমার মনে নেই?

পর্মিলি বললে—ড্রিংক করতে তো শিখিয়েছি, কিন্তু এমন মাতাল হতেও কি শিখিয়েছি? আর ড্রিংক করতে আমি তোমাকে শিখিয়েছি না তুমি আমাকে শিখিয়েছ, তা কে বলবে?

প্রজেশ বললে—আজকে আর তা নিয়ে ঝগড়া করতে চাই না পর্মিলি। ধরে নাও আমিই তোমায় শিখিয়েছি। কিন্তু তুমি আমি কি আলাদা?

পর্মিলি বললে—তোমার মনে দেখছি আজ খুব রং ধরেছে। ব্যাপার কী?

প্রজেশ বললে—তোমার কাছে এলেই আমার মনের পাখা ওড়ে পর্মিলি। মনে হয় আমি স্বর্গ পেলাম। চলো, কোথাও যাই দুজনে। যেখানে হোক—

পর্মিলি বললে—আমি এখুনি সিনেমা দেখে এলাম, এখন আর আমার কোথাও যেতে ভালো লাগছে না—

প্রজেশ বললে—দেখবে বাইরে বেরোলেই ভালো লাগবে। আজ সন্ধ্যেটা আর ঘরে বসে নষ্ট করতে ইচ্ছে করছে না—

পর্মিলি বললে—কিন্তু সেদিনের মত যদি আবার হয়? তোমাকে বিশ্বাস নেই আর—

প্রজেশ বললে—সেদিন তো ড্রাই-ডে ছিল, আজ তো তা নয়। আজ আর ড্রিংক করবো না। শুধু তোমার সঙ্গে কথা বলবো। আর তুমি কথা বলবে আমার সঙ্গে—

পর্মিলি বললে—কিন্তু কলকাতায় তেমন নির্জন জায়গা কোথায় পাবে?

প্রজেশ বললে—আমরা গাড়িতেই বসে থাকবো। কিংবা গাড়ি নিয়ে চলে যাবো কলকাতার বাইরে যশোর রোড ধরে। সেখানে মাঠের ওপর গাড়ি পার্ক করে গল্প করবো—

হঠাৎ নিচেয় গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ হলো। এখন আবার কে এল?

পর্মিলি বললে—কেউ এল বোধহয় নিচেয় বাবার কাছে!

প্রজেশও শুনেছিল শব্দটা। হঠাৎ রঘু দৌড়তে দৌড়তে এল। বললে—দিদিমণি, বাবু একবার ডাকছেন আপনাকে—

নিচে থেকে পুণ্যশ্লোকবাবুর গলা শোনা গেল। ডাকছেন—পমিলি—

পমিলি বাইরে বেরিয়ে আসতেই দেখলে বাবা সিঁড়ির নিচে দাঁড়িয়ে আছে। সেখান থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই জিজ্ঞেস করলেন—প্রজেশ কোথায়?

প্রজেশও বেরিয়ে এসেছিল। বললে—আমাকে ডাকছেন?

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—হ্যাঁ তুমি এসো, আমার সঙ্গে তোমাকে একবার যেতে হবে। এখনি ফোন এসেছিল।

প্রজেশ বললে—কোথায় পুণ্যদা?

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—শুনলুম কালকে কমিউনিস্টরা এ্যাসেমব্লি-হাউসের দিকে প্রোসেশান করে যাবে। এক লাখ লোক কলকাতায় আসছে—আমাদের পার্টি অফিসে স্ট্র্যাটেজি ঠিক হবে—তুমিও চলো আমার সঙ্গে। ওদের প্রোসেশান ভাঙতে হবে—

ততক্ষণে প্রজেশ নিচেয় নেমে এসেছে। পুণ্যশ্লোকবাবুর সঙ্গে সঙ্গে সেও গাড়িতে উঠে বসলো। বসে জিজ্ঞেস করলে—কিন্তু পুণ্যদা, আমাদের পুলিশ-কমিশনার তো রয়েছে—

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—তা থাক, কিন্তু ডাক্তার রায় বলছেন গভর্ণমেণ্ট যা করে তা করবে, কিন্তু পার্টি লেভেলে কিছু করা দরকার। আমাদের ভলাণ্টিয়ারদেরও কিছু করতে হবে। ওদের সব চেষ্টা বানচাল করতে হবে।

—কী করে বানচাল করবেন?

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—তার অনেক উপায় আছে। আমাদের কিছু ভলাণ্টিয়ার ওদের প্রোসেশানের মধ্যে ঢুকে পড়তে পারে। এতদিন এত টাকা খরচ করে যাদের পোষা হচ্ছে তারা আছে কী করতে?

পুণ্যশ্লোকবাবুর গাড়ি হু-হু করে সামনে এগিয়ে চলতে লাগলো।

অনেক ভোর থেকেই দেবেশদের বরানগরের বাড়িতে লোক এসে জুটতে আরম্ভ করেছিল। সুরেনের তখনও ভালো করে ঘুম ভাঙেনি। সদর দরজার কড়া নাড়ার শব্দ শুনেই দরজা খুলে দিয়েছিল চাকরটা।

সুরেন দেখলে একদল লোক ময়লা জামা-কাপড় পরে এসে ঢুকলো বাড়ির ভেতর। সঙ্গে মেয়েমানুষও আছে। মনে হলো সবাই কুলী-মজুর বা চাষী শ্রেণীর লোক। ট্রেণে চড়ে ভোরবেলা এসে পৌঁছেছে। এসেই সবাই কলতলায় গিয়ে ভিড় করেছে। হাত-পা ধুয়ে এসে বারান্দায় জড়ো হলো। তাদের খাওয়ার বন্দোবস্ত করেছে পার্টির লোক। বালতি ভর্তি চা এসে গেছে। সঙ্গে কোয়ার্টার-পাউণ্ড পাঁউরুটি একটা-একটা। হাম-হাম করে সবাই তাই খাচ্ছে। যেন অনেক দিন তারা কেউ খেতে পায়নি।

একদল লোকের পর আর একদল লোক এল। তারপর আর একদল।

একজনকে কাছে পেয়ে সুরেন জিজ্ঞেস করলে—তোমরা কোথা থেকে আসছো গো?

তারা বললে—ইটিণ্ডাঘাট—

—আর তোমরা?

—আমরা আসছি উলুবেড়িয়া থেকে।

—তোমরা কী কাজ করো?

তাদের মধ্যে একজন বললে—আমরা জুট-মিলে কাজ করি—

দুপুর দুটো পর্যন্ত সমস্ত দিন ধরে তাদের স্নান খাওয়া চললো। এ যেন একটা উৎসব। সবাই এসেছে অনেক রাস্তা অতিক্রম করে। বিকেলবেলাই তারা যুদ্ধ করতে বেরোবে। আর কাছাকাছি থেকে যারা আসছে, তারা দুপুর একটা-দুটোর সময়েই ট্রেণে উঠবে। কেউ টিকিট কাটবে, আবার কেউ বা টিকিট কাটবে না। আজকের দিনে কোনও নিয়ম নেই, কানুন নেই। আজকের দিনে শুধু অভিযান। লক্ষ্যে পৌঁছোবার অভিযান। যেমন করে হোক লক্ষ্যে পৌঁছতে হবেই। আজ দশ বছর ধরে কংগ্রেস-রাজত্বের অত্যাচারে সাধারণ মানুষের প্রাণ কণ্ঠাগত হয়ে উঠেছে। তারা মুক্তি চায়। তারা শোষণ শেষ করতে চায়। তারা চায় মানুষের সংসারে আবার মানুষ হয়ে বাঁচতে। তোমরা যে-যেখানে আছ, এসো। এসে আমাদের সঙ্গে হাত মেলাও। আমাদের সঙ্গী হও। আমরা কলকাতার চারদিক থেকে গিয়ে রাজভবনের রাজদ্বারে মিশবো। মিলিত কণ্ঠে আমাদের দাবী জানাবো। আমরা বলবো—আমাদের দাবী না মানলে তোমাদের গদি ছাড়তে হবে। চলো চলো কলকাতা চলো—

দেবেশ এক ফাঁকে এসে গেল। সে তদারক করতে এসেছে সকলের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সম্বন্ধে। সবাই তৈরি তো? সবাই ভালো আছ তো? কারো কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো?

সুরেনকে দেখে বললে—কী রে, তুই যাচ্ছিস তো আমাদের সঙ্গে?

সুরেন বললে—হ্যাঁ, যাচ্ছি—

—ভয় করছে নাকি তোর?

সুরেন কিছু বললে না। ভয় করলে যেন দেবেশ তার ভয় দূর করবে! তার ভয় হলেই বা সে করছে কী?

দেবেশ বললে—কিছু ভয় নেই তোর। যদি কংগ্রেস সরকার গুলি চালায় তো কী আর হবে, বড় জোর দু'চারজনের প্রাণ যাবে।

দেবেশের কাছে দু'চারজনের প্রাণ যাওয়া যেন কিছুই না। সেই দু'চারজন যেন মানুষ নয়। মানুষ যেন দেবেশদের কাছে একেবারে খেলনা হয়ে গেছে। খেলনা যেমন খেলতে গিয়ে ভেঙে যায়, মানুষও বুঝি তেমনি।

দেবেশ আবার বললে—আরে, দেশের মানুষের জন্যে না হয় প্রাণই দিলি। প্রাণ তো এমনিতেও যাচ্ছে, এবার না হয় গভর্ণমেণ্টের গুলিতেই গেল—

বেশি কথা বলবার সময় নেই দেবেশের। আরো অনেকগুলো ঘাঁটিতে যেতে হবে তাকে। শুধু কি বরানগর নিয়ে মাথা ঘামালে তার কাজ হবে? আরো অনেক লোক আসছে বাইরে থেকে। তারা হাওড়া আর শেয়ালদা ষ্টেশন থেকে আসতে শুরু করেছে। এসে পৌঁছুলো বলে।

সুরেন বললে—কিন্তু পুলিশ যদি প্রোসেশান ভেঙে দেয়?

দেবেশ বললে—তোকে ও-সব কিছু ভাবতে হবে না। পূর্ণদা, সন্দীপদা ও-সব ভাবছে। পুলিশ ভেঙে দেয় দেবে। তা বলে তো আমরা চুপ করে বসে থাকতে পারি না—

বলে আর দাঁড়ালো না। দৌড়ে বেরিয়ে গেল।

খানিক পরেই তিনটে বাজলো। তখন যাত্রা। যাত্রা শুরু হলো মিছিলের।

মাঝখানের একটা জায়গায় গিয়ে লাইনে দাঁড়ালো সুরেন। তারপর শুরু হলো শ্লোগান। কলকাতা সহর কাঁপিয়ে পাঁচশো লোক শ্লোগান দিতে দিতে

চললো।

আমাদের দাবী মানতে হবে।
নইলে গদি ছাড়তে হবে,
ছাড়তে হবে॥

সুরেন প্রথমে চেঁচায়নি। গলায় গলা মেলায়নি। কিন্তু যখন দেখলে রাস্তার দু'পাশের বাড়িতে বাড়িতে মানুষের সপ্রশংস দৃষ্টি তাদের ওপর রয়েছে, তখন মনে হলো সেও বুঝি ওই প্রশংসার একজন হক্‌দার। সে যেন একটা সত্যিকার ভালো কাজ করতে চলেছে। সেও যেন মানুষের চোখে একটু বৃদ্ধ হয়েছে। সে সাধারণ মানুষের মত ঘরের কোণে নিরাপদে আশ্রয় নিতে জন্ম নেয়নি। সে-ও বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, সেও জীবন তুচ্ছ করে মৃত্যুর সামনে এগিয়ে যেতে পারে। সে ভীতু নয়, ভীরু নয়, সে মানুষ। বীরের মত সে পুলিশের গুলির সামনে বুক পেতে দেবে।

সঙ্গে সঙ্গে সেও ঘুঁষি উঁচিয়ে চিৎকার করে উঠলো ঃ

আমাদের দাবী মানতে হবে।
নইলে গদি ছাড়তে হবে,
ছাড়তে হবে॥

তারপর মানুষের স্রোত রাস্তা বেয়ে আরো এগিয়ে চলতে লাগলো। ভিড় আরো ঘন হলো। আশপাশ থেকে আরো মিছিল এসে বড় মিছিলে মিশতে লাগলো। তখন লম্বা হয়ে গেছে গোটা মিছিলটা। আরো, আরো লম্বা। শুরু থেকে চেয়ে দেখলে শেষ খুঁজে পাওয়া যাবে না—

মাধব কুণ্ডু লেনের মোড়ের কাছে আসতেই সুরেন দেখলে, সেখানেও অনেক ভিড় জমে আছে। ওরা কেউ জানে না যে সুরেনও আছে এদের মধ্যে! হঠাৎ নজরে পড়লো অর্জুন দাঁড়িয়ে আছে। সেই দুখমোচনের ছেলে অর্জুন।

সেই অর্জুন হঠাৎ সুরেনকে দেখতে পেয়েছে। দেখতে পেয়েই দৌড়ে এসেছে।

ডাকলে—ভাগ্নেবাবু, আপনি?

সুরেন বললে—কী রে, কী দেখছিস?

অর্জুন বললে—ভিড় দেখছি—

—মা-মণি কেমন আছে?

অর্জুন বললে—ভালো। ম্যানেজারবাবু আপনাকে খুঁজছে। পুলিশে খবর দিয়েছিল—

সুরেন বললে—তুই যেন আমার কথা বলিসনি কাউকে, জানিস?

—কিন্তু আপনি থাকেন কোথায়?

সুরেন কী বলবে বুঝতে পারলে না। মিছিল তখনও পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছে। চলতে চলতেই কথা হচ্ছিল।

—বলুন না আপনি কোথায় থাকেন?

সুরেন বললে—তা জেনে তোর লাভ কী? আমি আর তোদের ওখানে ফিরে যাবো না—

অর্জুন বললে—কিন্তু সবাই যে আপনার কথা বলছে?

—আমার কথা বলছে? কী বলছে?

—বলছে, ভাগ্নেবাবু কেন বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। কেউ কিছু বুঝতে পারছে না. আপনি কেন চলে গেলেন? সত্যি আপনি চলে গেলেন কেন?

সুরেন বললে—তুই বাড়ি যা—

অর্জুন বললে—সত্যি, বলুন না আপনি চলে গেলেন কেন?

সুরেন বললে—বুড়োবাবু কেমন আছে?

—তেমনিই আছে। আর বেশি দিন বাঁচবে না বুড়োবাবু!

বুড়োবাবুর কথা উঠতেই সুরেন যেন কেমন নরম হয়ে এল।

বললে—বাঁচবে না মানে? অসুখ হয়েছে নাকি?

অর্জুন বললে—অসুখ হয়নি, কিন্তু আর তেমন খেতে পারে না। শুধু চুপচাপ শুয়ে পড়ে থাকে নিজের ঘরে, আর বিড়বিড় করে বকে—

কেমন যেন ভিজে এল মনটা। বললে—কেউ বুঝি আর দেখে না তাকে?

—কে আর দেখবে বলুন? কার অত দেখবার সময় আছে? সবাই তো নিজের-নিজের ধান্দা নিয়েই ব্যস্ত!

সুরেন বললে—তা বটে! আর জামাইবাবু?

—জামাইবাবুও আছে। দিব্যি আছে। খাচ্ছে-দাচ্ছে ঘুমোচ্ছে আর সবাইকে বকাবকি করছে। মাঝে মাঝে ম্যানেজারবাবুর সঙ্গেও খুব ঝগড়া হয়!

—কী নিয়ে ঝগড়া হয়?

—কী নিয়ে আর, টাকা-কড়ি নিয়ে। ম্যানেজারবাবু মোটে টাকা দেয় না হাতে। বিড়ি-সিগারেটের টাকা চাই তো!

—কিন্তু টাকা দেয় না কেন?

অর্জুন বললে—টাকা দেবে কেন? আর কত টাকা দেবে? জামাইবাবুর নেশার টাকা জোগানো কি সোজা? মা-মণির সঙ্গে তাই নিয়ে ঝগড়া হয় খুব।

—কার সঙ্গে মা-মণির ঝগড়া হয়?

—জামাইবাবুর সঙ্গে! কেবল ভয় দেখায় চলে যাবে বলে। রোজই বলে, দিদিমণিকে নিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে; কিন্তু যায় না। যাবে কোথায় বলুন? খাবে কী? ট্যাঁকে তো টাকাকড়ি কিছু নেই।

সুরেন চলতে চলতে শুনছিল অর্জুনের কথা।

বললে—আমি আর তোমাদের ওখানে যাবো না অর্জুন। আমার ও-সব ভালো লাগে না, সবাই ভাবে আমিও বুঝি সকলের মত টাকা লুটবার জন্যে পড়ে থাকি। ওখানে থাকলে আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে। ওখানে থাকতে আমার ভালো লাগে না মোটে—তুমি যাও কাউকে কিছু বোল না—

অর্জুন চলে গেল। সুরেন আবার দলের সঙ্গে চলতে লাগলো আপন মনে। বাস-ট্রাম-গাড়ি সব আটকে গেছে রাস্তায়। একটু পরেই অফিস থেকে ফিরবে সবাই। তখন কেউ আর বাড়ি ফিরতে পারবে না। তখন সবাই রাস্তায় দল বেঁধে ঘোরাঘুরি করবে, ছট্‌ফট্‌ করবে। সমস্ত সহরের কাজকর্ম অচল হয়ে যাবে। বিপর্যস্ত হয়ে যাবে জীবনযাত্রা, তবেই তো মিছিলের সার্থকতা। লাইন ঠিক রেখে চলতে চলতে অনেক কথা মনে পড়তে লাগলো সুরেনের। এতদিন দূর থেকে বাইরে দাঁড়িয়ে কত মিছিল দেখেছে সে। এবার লাইনে ঢুকে বাইরের দিকে চেয়ে দেখতে লাগলো বার বার। ওরা তাদের সম্বন্ধে কী ভাবছে তাও যেন তাঁর মুখস্থ। কেউ মজা দেখছে, কেউ বা উৎসাহ পাচ্ছে। আবার কেউ বা বিরক্ত হচ্ছে। এ সব আবার কেন? বেশ তো নিশ্চিন্তে নির্বিবাদে ছিলাম, সকালবেলার অফিস যাওয়া আর সন্ধ্যেবেলার অফিস থেকে ফেরার ব্যস্ততা নিয়ে জীবনটা একরকম কেটে যাচ্ছিল, তার মধ্যে আবার ঝঞ্ঝাট কেন ডেকে আনছে এরা? এরা কি আর মানুষকে শান্তিতে থাকতে দেবে না?

দেবেশ কোত্থেকে হঠাৎ এসে জুটলো। বড় উদ্বিগ্ন সে। বড় বিব্রত। চিৎকার করে বলে উঠলো—লাইন ঠিক রাখো, লাইন ঠিক রাখো—

যেন তারই যত মাথাব্যথা। যেন দেশ-উদ্ধার করার ব্রত একলা তারই।

হঠাৎ নজর পড়ে গেল সুরেনের দিকে। বললে—এসেছিস তুই?

সুরেন বললে—এতক্ষণ কোথায় ছিলি তুই?

দেবেশ বললে—আমাকে সবদিক সামলাতে হচ্ছে, ওদিকে কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট আর্মড্-পুলিশ বসিয়েছে চৌরঙ্গীতে—

—গুলি চালাবে নাকি দেবেশদা?

একজন ও-পাশ থেকে জিজ্ঞেস করলে।

দেবেশ বললে—চালাক না, গুলি চালিয়ে একবার দেখুক। গুলি চালিয়ে যদি গদি আঁকড়ে থাকতে পারতো, তাহলে আর ব্রিটিশ-সরকার ইণ্ডিয়া ছেড়ে পালিয়ে যেত না—

ততক্ষণে মিছিল ধর্মতলার মোড়ে এসে পেঁাছে গেছে। দূর থেকে দেখা যায় ওপাশে লাঠি নিয়ে আর বন্দুক উঁচিয়ে এক পাল পুলিশ রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে আছে। তারা যেন এই মিছিলটার জন্যেই অপেক্ষা করে আছে এতক্ষণ ধরে। কিন্তু কোনদিক তারা সামলাবে? ও-পাশে সেণ্ট্রাল এ্যাভিনিউ-এর দিক থেকে আর একটা বিরাট মিছিল শ্লোগান দিতে দিতে আসছে। আর তারই ঠিক উল্টোদিকে চৌরঙ্গী দিয়ে আর একটা মিছিল। মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত জায়গাটা যেন জটিল-কুটিল হয়ে উঠলো। আশপাশের অফিসের জানালা-বারান্দা-ছাদ সব ভরে গেল মানুষের মাথায়। চারতলা বাড়ির ছাদ থেকে কে যেন একটা মস্ত চেয়ার রাস্তার পুলিশকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারলে।

আবার চিৎকার উঠলো—

আমাদের দাবী মানতে হবে—
নইলে গদি ছাড়তে হবে—
ছাড়তে হবে—

চৌরঙ্গীর দিক থেকে যারা আসছিল তাদের সামনের সারিতে কয়েকটা মেয়ে। হঠাৎ সুরেনের নজরে পড়লো টুলুকে। টুলু একেবারে সামনের সারির প্রথমে রয়েছে। লাল শালুর ফেস্টুনটা হাত দিয়ে ধরে রয়েছে। আর ঘন-ঘন শ্লোগান দিচ্ছে—

আমাদের দাবী মানতে হবে—
নইলে গদি ছাড়তে হবে
ছাড়তে হবে—

সঙ্গে সঙ্গে যেন একটা ঢেউ উঠলো সমস্ত চৌরঙ্গীপাড়ার কেন্দ্রস্থলে। চিৎকার-শ্লোগান ছুটোছুটিতে সোরগোল পড়ে গেল চারদিকে। কারা যেন চিৎকার করে উঠলো—মারো শালাদের—মারো—.

বিছানার ওপর গা এলিয়ে দিয়ে বেড্ ল্যাম্পের তলায় একটা ইংরিজি থ্রিলার পড়ছিল পমিলি। সন্ধ্যেবেলা সিনেমা দেখে এসে বড় ক্লান্ত লাগছিল তার।

হঠাৎ রঘু এসে বললে—দিদিমণি, একজন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা

করতে এসেছে—

—আমার সঙ্গে? আমার সঙ্গে কেন? বলে দে, বাবু বাড়ি নেই—

রঘু বললে—আপনার সঙ্গেই দেখা করতে চান তিনি—

—কী দরকার আমার সঙ্গে?

—তা বলেননি। বলছেন এ-বাড়ির দিদিমণির সঙ্গে একবার দেখা করতে চান—

রঘু চলে গেল জিজ্ঞেস করতে। ফিরে এসে বললে—সুরেনবাবুর খোঁজ নিতে এসেছেন। বলছেন, সুরেনবাবু তার ভাগ্নে—

পর্মিলির কী যেন মনে হলো। এ সময়ে আবার সুরেনের খোঁজ নিতে এল কেন লোকটা। বললে—নিচের ঘরে বসা, আমি যাচ্ছি—

ভূপতি ভাদুড়ী বসবার ঘরের ভেতরে গিয়ে বসলো। আর খানিক পরেই পর্মিলি এসে ঢুকলো ঘরে।

ভূপতি ভাদুড়ী দাঁড়িয়ে উঠে নমস্কার করলে পর্মিলিকে।

বললে—আজ্ঞে, অসময়ে এসে বিরক্ত করলাম মা আপনাকে। কিন্তু বড় নাচারে পড়েই এসেছিলাম। আমার মা-মরা ভাগ্নে সুরেনকে আপনি নিশ্চয়ই চেনেন, তার খোঁজেই আমি আপনার কাছে এসেছি—

পর্মিলি বললে—কিন্তু আমাদের কথা আপনাকে কে বললে?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—আমার ভাগ্নের মুখেই আপনার কথা খুব শুনেছি। আপনার কথা দিন-রাতই কেবল বলতো। তাই ভাবলাম আপনার কাছে একটু তার সন্ধান পাবো হয়ত—

পর্মিলি বললে—তার কী হয়েছে?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—হয়নি কিছুই। আমি মামা হলেও তার বাপের মতন। তাই মাঝে মাঝে রাগ করে তাকে দু চার কথা বলে থাকি। বড় একগুঁয়ে ছেলে, কারো কথা-টথা শুনবে না। একদিন হয়ত কী-না-কী বলেছিলাম, সেই থেকে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছে, আর তার কোনও খোঁজ-খবর নেই তারপর থেকে—

পর্মিলি বললে—তা আমি এ-ব্যাপারে কী করতে পারি?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—মা, আপনি ইচ্ছে করলে সবই করতে পারেন। আপনার বাবাকে বলে যদি একটু সন্ধান নেন তো আমি এই বুড়ো বয়েসে একটু শান্তি পাই মনে।

পর্মিলি বললে—এর আগে কখনও কি এই রকম করে চলে গিয়েছিল?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—হ্যাঁ, একবার গিয়েছিল। তা সেবার আমি রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে এসেছিলাম। দেখি কী, একটা মেয়ের সঙ্গে রাস্তায় ঘোরাঘুরি করছে—

—মেয়ে?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—হ্যাঁ মা, একটা উদ্বাস্তু শ্রেণীর মেয়ে—

—উদ্বাস্তু মেয়ে? তার সঙ্গে ওর কী সম্পর্ক?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—তা জানিনে মা। আমি বলি, তোর কীসের এত ভাবনা? তোকে চাকরিও করতে হবে না, কিছুই না। আমাদের বাড়ির মা-মণি ওকে খুব ভালোবাসে কিনা, তাঁর অনেক টাকা-কড়ি ওকে দিয়ে যাবে। আর বিয়ে? আমি বলেছি, তোর জন্যে আমি সুন্দরী পাত্রী দেখে একটা বিয়ে দেবো! তা সেদিকে কান নেই, ও যে কী ভাবে, কী করে কিছুই বলে না—

হঠাৎ বাইরে গাড়ির শব্দ হলো। পর্মিলি জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে দেখলে বাবা এল। আর তার পেছনে প্রজেশ। বাবা গাড়ি থেকে নেমে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে চলে গেল। আর প্রজেশ পোর্টিকোর তলায় দাঁড়িয়ে রইল।

ভূপতি ভাদুড়ী হঠাৎ বললে—কেউ এল বুঝি? তাহলে আমি আজ উঠি মা—

—আচ্ছা, আপনি আসুন—

হঠাং বাইরে থেকে প্রজেশের গলা শোনা গেল—পর্মিলি—

ততক্ষণে ভূপতি ভাদুড়ী ঘর থেকে বেরিয়ে বাগান পেরিয়ে সদর-গেট দিয়ে একেবারে রাস্তায় গিয়ে পড়েছে। বাইরে গিয়ে একবার দাঁড়ালো ভূপতি ভাদুড়ী। তারপর পেছন ফিরে বাড়িটা ভালো করে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো। এত বিরাট বাড়ি। শুধু বিরাট নয়, সৌখীনও বটে। এইখানেই তার ভাগ্নে সুরেন আসতো। এইখানেই সুরেন এসে প্রত্যেক দিন এই মেয়েটার সঙ্গে মিশেছে। যদি মিশেইছে তবে এখন আর মেশে না কেন? আসে না কেন?

আবার ভালো করে সমস্ত বাড়িটার দিকে হাঁ করে চেয়ে দেখতে লাগলো কলকাতার মন্ত্রী একজন। সামান্য মানুষ নয়। তার কাছে ক'জনই বা আসতে পারে। ক'জনই বা তার সঙ্গে মিশতে পারে। এখানে আসতে পারলে তো মানুষ ধন্য হয়ে যায়। আর সে কিনা এখানেও আসা বন্ধ করে দিলে। একটা গাড়ি আসছিল পশ্চিমদিক থেকে। সেটাকে দেখে ভূপতি ভাদুড়ী সরে দাঁড়ালো। তারপর গাড়িটা চলে যেতেই আবার চলতে লাগলো পশ্চিমের ট্রাম-রাস্তার দিকে।

হঠাৎ একটা লোককে দেখে খানিকটা থমকে দাঁড়ালো ভূপতি ভাদুড়ী। যেন চেনা-চেনা ঠেকলো মুখটা। সে-লোকটাও বার বার ভূপতি ভাদুড়ীর দিকে চেয়ে দেখছিল।

ভূপতি ভাদুড়ী এগিয়ে গেল। কাছে গিয়ে বললে—তোমাকে ভাই বড় চেনা-চেনা ঠেকছে যেন? কোথায় দেখেছি বল তো?

ছেলেটা বললে—আমাকে সুরেনের সঙ্গে দেখেছেন। সুরেনের সঙ্গে আমি এক ইস্কুলে এক ক্লাশে পড়েছি।

—তোমার নামটা কী বল তো?

—দেবেশ।

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—তোমার নাম দেবেশ? তোমার নাম তো আমি আমার ভাগ্নের মুখে শুনেছি। তোমার নাম শুনেছি, ওই যে মন্ত্রী পুণ্যশ্লোক রায়, ওঁর ছেলে সুব্রত রায়-এর নাম শুনেছি, ওর মেয়ে পর্মিলির নাম শুনেছি। আমিই সুরেনের মামা।

দেবেশের তখন অনেক কাজ। পরের দিন সারা কলকাতা থেকে মিছিল বেরোবে। বরানগর থেকে শুরু করে হাওড়া, শেয়ালদা, যাদবপুর, বেহালা সব জায়গা থেকে মিছিল এসে কলকাতার জীবনযাত্রা অচল করে দেবে, তারই কাজ রয়েছে, এ-সময় দাঁড়িয়ে কথা বলবার অবসর নেই তার।

বললে—একটা খুব জরুরী কাজ আছে, এখন আমি আসি—

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—একটা কথা আছে বাবা তোমার সঙ্গে। আমার ভাগ্নে ক'দিন থেকে বাড়িতে আসছে না। কোথায় আছে বলতে পারো? তুমি কিছু খবর জানো তার? আমি খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হয়ে যাচ্ছি বাবা—

দেবেশ বললে—তা বাড়ি থেকে চলে গেল কেন সে? কী হয়েছিল?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—কিছুই হয়নি বাবা। আর হবেই বা কী? তার তো

বাপ-মা কেউ নেই। আমিই তার বাপ, আমিই তার মা। এই এতটুকু বেলা থেকে তাকে ছেলের মত মানুষ করেছি। আর আজ আমিই পর হয়ে গেলাম তার? তুমিই বলো বাবা, আমি কিছু অন্যায় বলেছি?

দেবেশ বললে—আগেও তো একবার বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল সে?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—সেবারে আমি তো ওকে রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে এসেছিলাম। একদিন হঠাৎ দেখলাম, একটা উদ্বাস্তু মেয়ের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারপর থেকেই ওকে আমি চোখে চোখে রাখতুম। কিন্তু এদানি এখানে চাকরি করতে আসতো, এই পুণ্যশ্লোকবাবুর বাড়িতে। কিন্তু চাকরি করার দরকারটা কী তোর? তোর কি টাকার অভাব যে, অভাবে পড়ে তোকে টাকার জন্যে দাসত্ব করতে হবে? আমি যদ্দিন আছি তদ্দিন তো তোর ভাবনা নেই—

দেবেশ বললে—কিন্তু আপনি তো চিরকাল থাকবেন না, তখন? তখন ও কী করবে?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—তা আমি না-থাকলামই বা, আমাদের বাড়ির যিনি মা-মণি, তিনি তো ওকে অনেক টাকা দিয়ে যাবেন। দু'খানা বাড়িই তো পেয়ে যাবে ও। সে বাড়িগুলোর মালিকানা তো ও একলাই পেয়ে যাবে সব। তখন? তখন চাকরি করবার সময় পাবে ও?

দেবেশ ভূপতি ভাদুড়ীর আপাদমস্তক ভালো করে দেখতে লাগলো।

বললে—সুরেন বোধহয় বোকা!

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—ঠিক বলেছ বাবা। তোমাদের সঙ্গে তো দেখা-টেখা হতো অনেক, তোমাদের কিছু বলেনি ও?

দেবেশ বললে—না—

ভূপতি ভাদুড়ী আবার বললে—দেখা হলে তোমরা একটু বুঝিয়ে বোল না বাবা! আমার কথা তো কখনও শোনেওনি, কখনও শুনবে না। তোমরা তার ইয়ার-বন্ধু, তোমাদের কথা হয়ত শুনতে পারে। এই তো এই পুণ্যশ্লোকবাবুর মেয়ের সঙ্গে এখুনি দেখা করে এলুম। ও'র মেয়ে পর্মিলিকেও সেই কথা বলে এলাম। বললাম—আমার ভালোর কথা তাকে ভাবতে হবে না। কিন্তু নিজের ভালোটাও তো লোকে বোঝে? এই কথাটাই তোমরা তাকে বুঝিয়ে বোল বাবা—

কথা বলতে বলতে হঠাৎ বাধা পড়লো। কতকগুলো ছেলে দেয়ালে কী যেন একটা লেখা কাগজ লটকে দিলে। কাগজের ওপর বড় বড় করে লেখা রয়েছে কী সব। ভূপতি ভাদুড়ী ভালো করে নাকের ওপর চশমাটা লাগিয়ে পড়তে লাগলো—

আগামীকাল অপরাহ্ণে
জনতার দাবী আদায় করতে
দলে দলে মিছিলে যোগদান করুন॥

ভূপতি ভাদুড়ী অনেকক্ষণ ধরে সমস্ত লেখাগুলো মন দিয়ে পড়তে লাগলো। বললে—এ-সব কী লিখেছে বাবা? কীসের দাবী? এরা কারা?

দেবেশ তখন ছেলেগুলোর সঙ্গে কথা বলছিল। ফিরে এসে বললে—কাল মিছিল আছে কিনা, সেই ব্যাপার।

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—কীসের মিছিল?

দেবেশ বললে—এসব রাজনৈতিক মিছিল। পলিটিক্যাল!

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—তাহলে হরতাল নাকি? আমি তো বাড়ির বাজার-টাজার কিছু করে রাখিনি। যাই, কাল হরতাল হবে আগে জানলে সব কাজ সেরে

রাখতুম। যাই, বাড়ি যাই—

দেবেশ বললে—না আপনি মিছিমিছি ভাবছেন, হরতাল নয়।

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—ওই একই কথা। হরতাল আর মিছিল তো লেগেই আছে কলকাতায়। বেটাদের তো কোনও কাজ নেই, কেবল মিছিল আর হরতাল। কেন বাপু, তোদের খেয়ে-দেয়ে আর কোন কাজ নেই, কেবল হরতাল আর হরতাল! অসুখ-বিসুখ ডাক্তার হাসপাতাল কত লোকের কত কাজের ক্ষতি হয় বল তো? এই সোজা কথাটা কেউ বুঝবে না?

বলতে বলতে ভূপতি ভাদুড়ী ট্রাম-রাস্তার দিকে এগিয়ে গেল।

দেবেশ খানিকক্ষণ সেইদিকে চেয়ে দেখলে। কত রকম লোকই আছে সহরে! তা হোক, এদের কথায় রাগ করলে পার্টির কাজ চলে না।

দলের একটা বাচ্চা ছেলে বললে—ও লোকটা কে দেবেশদা? লোকটাকে তুমি চেন নাকি?

দেবেশ বললে—ওদের কথা ছেড়ে দে। চোরবাগানের রাস্তায় পোস্টার লাগিয়েছিস?

ছেলেটা বললে—সেখানে লাগিয়েই তো আসছি এখানে—

দেবেশ বললে—তাহলে দ্যাখ্, এক কাজ কর্, ওই পুণ্যশ্লোকবাবুর দেয়ালে দু'চারখানা লাগিয়ে দিবি—ওই যে ওই বাড়িটার দেয়ালে!

ছেলেটা বললে—কিন্তু ওখানে যে পুলিশ ঘুরছে—

দেবেশ বললে—দূর পুলিশকে তোরা ভয় করিস? পুলিশকে ভয় করলে পার্টি চলে কখনও? ও পুলিশ তো কংগ্রেসের পুলিশ।

ছেলেরা যেন দেবেশের কথায় ভারি উৎসাহ পেলে। আঠার বালতি আর পোস্টার নিয়ে পুণ্যশ্লোকবাবুর দেয়ালের দিকে এগিয়ে গেল।

দেবেশ আর দাঁড়ালো না। তাকে আরো অনেক জায়গায় যেতে হবে। আজ রাত্তিরে আর তার ঘুম আসবে না। অফিস থেকে জিপ্ নিয়ে তাকে সারা কলকাতা চষে বেড়াতে হবে। তারপর কাল ভোর থেকেই শুরু হবে বাইরের চাষী-মজুরদের আসা। তাদের থাকা খাওয়ার তদারক আছে। তারপর আছে কালকের মিছিল। বরানগরের দিকটা দেখা হয়ে গেছে। শ্যামবাজারের চারদিকেও পোস্টার পড়ে গেছে। এবার হাতীবাগান হয়ে চোরাবাগান। তারপর ভবানীপুর। ভবানীপুরের পরে কালীঘাট। কালীঘাটের পর ঢাকুরিয়া। ঢাকুরিয়ার দিকে আছে টুলু। টুলু ওদিকটা দেখবে।

দেবেশ হাঁটতে হাঁটতে চোরবাগানের দিকে চলতে লাগলো।

ভূপতি ভাদুড়ী চলে যেতেই পার্মিলি বাইরে এল। দেখলে প্রজেশ দাঁড়িয়ে আছে।

বললে—একি, তুমি তো এখুনি বাবার সঙ্গে কোথায় গেলে, আবার ফিরে এলে যে?

প্রজেশ বললে—ও ভদ্রলোক কে?

পার্মিলি বললে—ও সুরেনের মামা। ভাগ্নেকে খুঁজতে এসেছিল ভদ্রলোক। কদিন ধরে নাকি তাকে পাওয়া যাচ্ছে না, বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছে—

প্রজেশ বললে—তুমি বললে না কেন, সে কমিউনিস্টদের দলে জয়েন করেছে—

পমিলি বললে—আমি কিছুই বলিনি—

প্রজেশ বললে—কেন, বললে না কেন? বললে কী ক্ষতিটা হতো?

পমিলি বললে—বললে কি সুরেনের ইজ্জৎ বাড়তো?

প্রজেশ বললে—সুরেনের ইজ্জৎ কমুক এটা বুঝি তুমি চাও না?

পমিলি রেগে গেল। বললে—দেখ প্রজেশ, তোমার কথার মানে আমি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু তোমার ইচ্ছেমত কাজ তো আমি করবো না। আমার নিজেরও একটা ইচ্ছে-অনিচ্ছে বলে জিনিস আছে, সেটা ভুলে যেও না।

প্রজেশ বললে—কিন্তু পুণ্যদা'র ইচ্ছে বলেও তো একটা জিনিস আছে, সেটা ভুলে যাচ্ছ কেন?

পমিলি বললে—বাবার দোহাই দিয়ে নিজের মনের মীন্‌নেস্‌ ঢাকতে যেও না প্রজেশ, ওটা কাওয়ার্ড লোকদের লক্ষণ।

প্রজেশ বললে—এই কাওয়ার্ড, এই ভীরু লোকটাই কালকে কী করবে দেখে নিও। তখন বুঝবে আমি কাওয়ার্ড, না সুরেন কাওয়ার্ড!

পমিলি জিজ্ঞেস করলে—তার মানে?

প্রজেশ বললে—তার মানে আজ বলবো না, কালই বুঝতে পারবে। আর পরশুদিন খবরের কাগজে দেখতে পাবে। যারা প্রোসেশান করে লাটসাহেবদের বাড়ির দিকে গিয়ে বুক ফুলিয়ে শ্লোগান দেয়, তাদের শায়েস্তা করার অস্ত্র কংগ্রেসেরও আছে—

পমিলি বললে—তা যা ইচ্ছে করো না তোমরা। কিন্তু তার সঙ্গে ও-বেচারির কী সম্পর্ক?

প্রজেশ বললে—সম্পর্ক নেই বলছো কেন! এতদিন পুণ্যদা তো দেড়শো টাকা করে মাইনে দিয়ে এসেছেন—কৃতজ্ঞতা বলেও তো একটা জিনিস আছে পৃথিবীতে!

পমিলি বললে—দেড়শো টাকা বাবার কাছে কতটুকু! আমি তো কতদিন বারে গিয়েই দেড়শো টাকা উড়িয়ে দিয়ে এসেছি। দাঁড়াও আমি বাবাকে গিয়ে বলছি—

কিন্তু পমিলি যাবার আগেই ওপর থেকে রঘু এসে প্রজেশকে বললে—বাবু আপনাকে একবার ডাকছেন—

প্রজেশ আর দাঁড়ালো না। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল। একেবারে পুণ্যশ্লোকবাবুর প্রাইভেট-চেম্বারে গিয়ে হাজির। পুণ্যশ্লোকবাবু প্রজেশের জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন। প্রজেশ আসতেই একটা কাগজের বাণ্ডিল তার হাতে দিয়ে বললেন—এটা নাও—সাবধানে রেখে দিও—

প্রজেশ প্যাণ্টের পকেটে বাণ্ডিলটা পুরে ফেলে জিজ্ঞেস করলে—কত আছে এতে?

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—গোয়েঙ্কাজী ইলেকশানের খরচ হিসেবে অনেক টাকা দিয়ে গিয়েছিল। তার থেকেই দিলাম টাকাটা। এতে এক টাকা, পাঁচ টাকার নোট মিলিয়ে মোট পাঁচ হাজার টাকা আছে—

—ঠিক আছে—বলে প্রজেশ চলে আসছিল।

কিন্তু পমিলি ঠিক সেই সময়েই এসে ঘরে ঢুকেছে।

পুণ্যশ্লোকবাবু মেয়েকে ঢুকতে দেখে অবাক হয়ে গেলেন। বললেন—কী

হলো পর্মিলি? তোমার ডিনার খাওয়া হয়েছে?

পর্মিলি সে-কথার উত্তর না দিয়ে বললে—বাবা, আজকে সেই সুরেনের মামা এসেছিল তার খোঁজ করতে। সুরেনের কথা মনে আছে তো?

পুণ্যশ্লোকবাবুর তখন বাজে কথা শোনবার সময় ছিল না।

বললেন—ও-সব কথা আমি পরে শুনবো। তুমি আজকে ক্লাবে যাওনি!

পর্মিলি বললে—না, আমি সিনেমায় গিয়েছিলুম।

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—তা সিনেমায় যাও ক্ষতি নেই, দ্যাটস্ গুড্, কিন্তু তুমি ক্লাবে যাও না কেন? আমি তোমাকে বার বার বলেছি সন্ধেবেলা ক্লাবে গিয়ে সময় কাটাবে। আমি আমার নিজের কাজ নিয়ে বিজি থাকি, সব সময় তোমার মুভ্‌মেন্টের খবর রাখতে পারি না, একলা-একলা বাড়িতে বসে কী করবে? ক্লাবই তো ভালো।

পর্মিলি বললে—বারে, আমার কথা তোমায় ভাবতে কে বলেছে?

পুণ্যশ্লোকবাবু প্রজেশের দিকে চেয়ে বললেন—তুমি আর দাঁড়িয়ে আছ কেন? তোমার অনেক কাজ, তুমি বেরিয়ে পড়ো—

প্রজেশ বেরিয়ে পড়লো। সত্যিই তার অনেক কাজ। আজ রাত্রের মধ্যেই সব কলকাতাটা ঘুরতে হবে। বস্তিতে বস্তিতে যেতে হবে। শুধু বৌবাজারটা ঘুরলেই অর্ধেক কাজ হয়ে যাবে। তারপর রাজাবাজার রাজাবাজারেও ওদের ঘাঁটি আছে। ব্রিটিশ আমলেও ওদের ওখানে ঘাঁটি ছিল। আগে ওরা গাঁট কেটে, পকেট কেটে বেড়াতো। ধরা পড়লে জেল খাটতো। খুন-খারাবির অপরাধে ওদের অনেকে ধরাও পড়েছে। ধরা পড়ে ফাঁসিও হয়েছে অনেকের। কিন্তু তার জন্যে ভয় পেয়ে জাত-ব্যবসা কেউ ছাড়েনি। তারপর যখন স্বাধীনতা এল তখন ওরাও স্বাধীন হলো। তখন কংগ্রেস সরকারের কল্যাণে কেউ পেলে মদের দোকানের লাইসেন্স, কেউ পেলে মাংসের দোকানের লাইসেন্স। সবাই নানান রকমের সুবিধে পেয়ে কলকাতা সহরে জাঁকিয়ে বসলো। তখন আর অন্ধকারে মুখ ঢেকে বেড়াতে হয় না কাউকে। প্রকাশ্য দিবালোকে বুক ফুলিয়ে বেড়াতে শুরু করে দিলে।

বাইরে এসেই নজরে পড়লো কাণ্ডটা।

প্রজেশ গাড়িটার ব্রেক কষে থেমে গেল। দেখলে, পুণ্যশ্লোকবাবুর বাড়ির দেয়াল ভর্তি পোস্টার লাগানো। লাল-নীল অক্ষরে বড় বড় করে লেখা রয়েছেঃ

> আগামীকাল অপরাহ্নে
> মেহনতী জনতার দাবী আদায় কবতে
> দলে দলে মিছিলে যোগদান করুন॥

জিনিসটা দেখতে প্রজেশ গাড়ি থেকে নামলো। সমস্ত দেয়াল ভর্তি করে দিয়েছে। দরোয়ানকে ডাকলে। দরোয়ান কাছে আসতেই জিজ্ঞেস করলে—এ-সব কারা লাগালে দরোয়ান? কখন লাগালে?

দরোয়ানও দেখলে। দেখে সেও অবাক হয়ে গেল। হিন্দীভাষী দরোয়ান ভাষাটাই বুঝতে পারলে না। শুধু বুঝলে কোনও একটা অন্যায় কথা লিখে দিয়েছে কারা।

বললে—হুজুর, আমি তো কিছু জানি না।

প্রজেশ আবার বাড়ির ভেতরে ঢুকলো। তারপর সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে পুণ্যশ্লোকবাবুর ঘরের সামনে যেতেই শুনতে পেলে, পর্মিলি যেন বাবাকে কী বলছে।

পুণ্যশ্লোকবাবু বলছেন—কিন্তু তুমি ও-সব ব্যাপারে থাকো কেন পর্মিলি। সমস্ত কান্ট্রির ভালো-মন্দর কথা নিয়ে আমায় মাথা ঘামাতে হয়, তাতে কে একজন ইন্‌ডিভিজুয়াল মরলো কি বাঁচলো তা নিয়ে ভাববার সময় কোথায় আমার? আর তা ছাড়া আমি তো তোমার কথায় সব রকম স্কোপ্‌ তাকে দিয়েছিলুম! তাকে আমি দেড়শো টাকা করে মাইনে দিয়েছিলুম ফর নাথিং। শুধু তুমি রিকোয়েস্ট করেছিলে বলে। কিন্তু দেখ, পলিটিক্সের মত ব্যাপারে দয়া-মায়ার কোনও স্থান নেই। পার্টি আমাকে যা ডাইরেক্টিভ দেবে তা আমি শুনতে বাধ্য! শুধু আমি নয়, আমাদের চিফ্‌-মিনিষ্টার পর্যন্ত তা' শুনতে বাধ্য।

প্রজেশ আর দেরি করলে না। ঘরে ঢুকে পড়লো।

পুণ্যশ্লোকবাবু প্রজেশকে আবার ফিরতে দেখে অবাক হয়ে গেলেন। বললেন—কী হলো আবার? ফিরলে যে?

প্রজেশ বললে—পুণ্যদা, কাণ্ড দেখেছেন, ওরা আপনার বাড়ির দেয়ালে পোষ্টার লাগিয়ে গেছে।

—কীসের পোষ্টার?

—কালকের মিছিলের পোষ্টার। লিখেছে, জনতার দাবী আদায় করতে দলে দলে মিছিলে যোগদান করুন!

পুণ্যশ্লোকবাবু রেগে গেলেন। বললেন—আমার দেয়ালে? পুলিশ কেউ নেই ডিউটিতে?

প্রজেশ বললে—কাউকে তো দেখতে পেলাম না বাড়ির সামনে—

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—দেখেছ কাণ্ড! পুলিশ ডিপার্টমেণ্ট পর্যন্ত কমিউনিষ্ট হয়ে গেছে। কেউ কাজ করছে না মন দিয়ে। আমি এখনি পুলিশ-কমিশনারকে টেলিফোন করছি। তুমি আমার চাকরদের দিয়ে সব ছিঁড়ে ফেলে দাও তো! কী আশ্চর্য এরা আমার বাড়িতে পোষ্টার লাগিয়েছে। এত বড় সাহস!

বলে তিনি টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিলেন।

প্রজেশ তাড়াতাড়ি আবার যেমন এসেছিল, তেমনি সিঁড়ি দিয়ে নিচেয় নেমে গেল।

ভূপতি ভাদুড়ী মাধব কুণ্ডু লেনের বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে হঠাৎ একটা অচেনা লোকের সংগে একেবারে মুখোমুখি হয়ে গেল।

বললে—কে? কাকে চাই? কোত্থেকে আসছ?

লোকটা থতমত খেয়ে গেছে। উত্তর দিতে একটু দেরি হলো তার।

বাহাদুর সিং দরজা খুলে দাঁড়িয়ে ছিল। বললে—বাহাদুর, ইনি কে?

ছোকরা মানুষ, তবে মালকোঁচা মারা ধুতি পরনে, গায়ে ছিটের সার্ট। লোকটা যেন ভূপতি ভাদুড়ীকে দেখে একটু সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল।

ভূপতি ভাদুড়ী আবার জিজ্ঞেস করলে—কী দরকার এ বাড়িতে?

ছোকরাটি বললে—আমি বুড়োবাবুর সংগে দেখা করতে এসেছি—

—বুড়োবাবুর সংগে? এত রাত্তিরে? বুড়োবাবু তোমার কে?

ছোকরাটি বললে—আমার কাকা। শুনলুম তার খুব অসুখ—

ভূপতি ভাদুড়ী ছোকরাটির আপাদমস্তক আর একবার ভালো করে দেখে নিলে। বললে—তুমি থাকো কোথায়?

ছোকরাটি বললে—কাঁচরাপাড়ায়—

ভূপতি ভাদুড়ী আবার জিজ্ঞেস করলে—তোমার নাম?

ছোকরাটি বললে—সুধন্য—সুধন্য দত্ত।

ভূপতি ভাদুড়ীর তবু কেমন যেন সন্দেহ হলো। এত রাত্রে কেন দেখা করতে এসেছে ছেলেটা।

বললে—কিন্তু এত রাত্তিরে যে তুমি দেখা করবে, এখন তো মানুষটা ঘুমিয়ে পড়েছে। এখন কি আর দেখা হবে?

সুধন্য বললে—আমি হঠাৎ খবর পেলাম কিনা, তাই আসতে দেরি হলো—সকালে খবর পেলে আরো আগে আসতে পারতুম—

আসলে সত্যিই তখন বুড়োবাবু ঘুমিয়েই পড়েছিল। তবে ঘুম ঠিক নয়। কোনও কাজ-কর্ম না থাকলে মানুষ কী আর করবে, শুয়ে পড়বে। শুয়ে শুয়ে আকাশপাতাল ভাবাই ভাল। বুড়োবাবু ক'দিন ধরেই সকাল-সকাল ঘরে গিয়ে ঢুকতো। ঘর মানে একটা যা-হোক আস্তানা। মাথার ওপর একটা ছাদ আর চারপাশে চারটে দেয়াল থাকলে যদি তাকে ঘর বলা যায় তো সেটাও একটা ঘর। না আছে একটা বিছানা, না আছে একটা মশারি। আর না আছে একটা হারিকেন-বাতি। সারা কলকাতায় যখন চারদিকে নানা আন্দোলন, নানা কাণ্ড চলছে, তখন বুড়োবাবু সমস্ত পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চুপচাপ পরলোকের দিকে চেয়ে সময় কাটিয়ে দিত।

ঠাকুর একদিন এসে ডেকেছিল। বলেছিল—কই, বুড়োবাবু আপনি খাবেন না?

যে-বুড়োবাবুর অত খাবার লোভ ছিল, খাবার জন্যে দিনরাত অত ছটফট করতো, একটু ভাত কিংবা ডাল কম হলে রান্নাবাড়ি ফাটিয়ে ফেলতো, একটা গামছার জন্যে বার বার ম্যানেজারবাবুর কাছে-দরবার করতো, মা-মণির কাছে গিয়ে পর্যন্ত কাঁদুনি গেয়েছে ভাগ্নেবাবুর কাছে পর্যন্ত গিয়ে আর্জি জানিয়েছে, সেই বুড়োবাবুরই আজকাল যেন আর কোনও কিছুতেই গা নেই। খেতে দিচ্ছ দাও, খেতে না দিলেও কিছুই বলবো না। আমি আর এ-বাড়ির কে বলো না, আমি তো কেউ নই তেমন যে, আমাকে নিয়ে তোমরা মাথা ঘামাবে। যতদিন বেঁচে আছি ততদিন থাকবো এখানে, তারপর আর আমি দেখতে আসছি না মরে গেলে তোমরা আমাকে শ্মশানে নিয়ে পোড়ালে না ভাগাড়ে ফেলে দিলে।

শুধু ঠাকুর নয় দুখমোচনও উঠোন ঝাঁট দিতে দিতে একবার ঘরের মধ্যে উঁকি মেরে দেখে যেত বুড়োবাবু বেঁচে আছে না মারা গেছে।

বুড়োবাবু জেগে থাকলে জিজ্ঞেস করতো—কে?

চিঁ-চিঁ গলার আওয়াজ শুনে দুখমোচন বুঝতো বুড়োবাবু বেঁচে আছে। বলতো— আমি বুড়োবাবু, আমি—

বুড়োবাবু বলতো—ও, দুখমোচন বুঝি? একটু জল দিবি বাবা, বড় জল তেষ্টা পেয়েছে—

দুখমোচন বলতো—আমার হাতের ছোঁয়া জল কি খাবেন বুড়োবাবু? আমি তো জমাদার—

বুড়োবাবু একটু হাসবার চেষ্টা করতো। সে-হাসিও ঠিক কান্নার মতন শোনাতো। বলতো—দূর, তুইও যেমন, জল তেষ্টার কাছে কি জাত-অজাত আছে

রে বাবা? আমি বলে জল তেষ্টার জ্বালায় মরে যাচ্ছি আর তুই বলছিস কিনা তুই জমাদার। দে বাবা, এক গেলাস জল এনে দে! আগে বাঁচি তারপর তোর জাত বিচার করবো—

তা এমনি করেই চলছিল বহুদিন। কেউ একবার দেখতেও আসতো না। কেউ খোঁজও নিতো না বুড়োবাবুর। মাঝে মাঝে বুড়োবাবুর পুরোন কথা-গুলো মনে পড়তো। মনে পড়লেই বুকটা ভয়ে কেঁপে কেঁপে উঠতো। তারপর আর ভাবতো না কথাগুলো। কান পেতে থাকতো সমস্ত দিন, সমস্ত রাত।

সেদিন হঠাৎ যেন কে ডাকলে। যেন চেনাচেনা গলা।

বুড়োবাবু অত রাত্রেও ঘুমোয়নি।

—আমি সুধন্য কাকাবাবু!

দরজা কখনও বন্ধ থাকে না বুড়োবাবুর। অন্ধকার ঘর। কিন্তু সুধন্য আগেও এসেছে অনেকবার। চেনা রাস্তা, চেনা ঘর।

বুড়োবাবু বললে—আয়, বোস্—

সুধন্য তক্তপোষের ধারে গিয়ে বসলো। বললে—কেমন আছ?

বুড়োবাবু বললে—আমার আর থাকা, আমার এবার গেলেই ভালো। তোরা কেমন আছিস? বৌমা কেমন আছে?

সুধন্য বললে—সবাই ভালো আছে। আমাদের জন্যে তোমায় ভাবতে হবে না। আমার ওষুধগুলো খেয়েছ তুমি?

বুড়োবাবু বললে—কে আর খাওয়ায় বল না! যখন মনে পড়েছে, খেয়েছি—

সুধন্য বললে—বারে বা, তোমার জন্যে আমি ডাক্তার আনলুম, ওষুধ আনলুম, কত টাকা খরচ করলুম, আর তুমি ওষুধ খেলে না?

বুড়োবাবু বললে—আমার জন্যে তুই আর ভাবিসনি রে। আমার জন্যে মিছিমিছি আর টাকাও খরচ করিসনি। আমি আর ক'দিন—

সুধন্য বললে—ওই তো তোমার দোষ কাকাবাবু, তুমি অত ভয় পাচ্ছ কেন? তোমাকে বাঁচতেই হবে! তাহলে আমি আছি কী করতে?

বুড়োবাবু বললে—মানুষ কী আর চিরকাল বাঁচে রে সুধন্য? যখন তার মরবার সময় হয় তখন কেউ আর তাকে বাঁচাতে পারে না।

সুধন্য বললে—কী যে বলো তুমি কাকাবাবু, তোমাকে আমি বাঁচাবো তবে ছাড়বো। তুমি ভেবো না কিছু।

বুড়োবাবু অন্ধকারের মধ্যেই হাসলো। বললে—এ-রকম করে বেঁচে থাকাও পাপ রে—

—তুমি থামো তো! ও সব কথা আমার সামনে বোল না। তোমাকে যে গেঞ্জি কিনে দিয়েছিলুম তা গায়ে দাও তো!

বুড়োবাবু বললে—দিই—

—তাহলে এখন খালি গায়ে শুয়ে আছ কেন?

বুড়োবাবু বললে—বড় ময়লা হয়ে গেছে সেটা। কাচা হয়নি।

—কাচা হয়নি কেন? আমি যে টাকা দিয়ে গেলুম তোমাদের দুখমোচনকে। সে তোমার কাজ-টাজ করে দেয় না?

বুড়োবাবু বললে—তুই আর তা নিয়ে কিছু বলিসনি ওকে। শেষকালে তুই চলে যাবার পর তখন আমার ওপর হেনস্থা করবে—

সুধন্য বললে—ওই তো তোমার দোষ! তুমি সারা জীবন কেবল ভয় করে-করেই গেলে। ওই জন্যেই তোমায় কেউ মানে না—

বুড়োবাবু বললে—তুই আর বুড়ো বয়েসে আমায় শেখাতে আসিসনি সুধন্য। এ-জীবনটা এই রকম করেই কেটে গেল আমার, আসছে জন্মে যদি ভগবানের দয়া হয়, তখন আবার দেখা যাবে—

রাত তখন অনেক হয়েছে। বুড়োবাবু বললে—এত রাত করে কেন এলি তুই বাবা? এখন কাঁচরাপাড়ায় ফিরবি কী করে?

সুধন্য বললে—বাড়ি গিয়েই যে খবরটা পেলাম তোমার অসুখ বেড়েছে—তাই আর থাকতে পারলুম না। সঙ্গে সঙ্গে চলে এলুম—

—এখন ফিরবি কী করে?

—হেঁটে।

—হেঁটে মানে? তুই সেই কাঁচরাপাড়ায় হেঁটে যাবি?

সুধন্য বললে—বাস না পাই, ট্রেণে যাবো।

তারপর একটু থেমে বললে—আজ তোমাদের ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে দেখা হলো, জানো?

—কোথায়?

সুধন্য বললে—বেটা একেবারে চিনতে পারলে না আমাকে। এ্যাদ্দিন ধরে আসছি, তবু চিনতে পারে না। একেবারে ন্যাকা সাজলে, বুঝেছ?

বুড়োবাবু বললে—ওকে কিছু বলিসনি তুই যেন আবার। তখন আমার ওপর তম্বি করবে কেবল। আমি যে ম্যানেজারের চক্ষুশূল।

সুধন্য বললে—আমি চক্ষুশূল করা ওর বের করছি. দাঁড়াও না, আমি ওর কী করি তাই শুধু তুমি দেখ। ভেবেছে আমি কিছু জানি না।

বুড়োবাবু বললে—ম্যানেজারবাবুর ভাগ্নেটাও বাড়ি থেকে চলে গেছে, তা জানিস?

সুধন্য যেন আনন্দে লাফিয়ে উঠলো। বললে—চলে গেছে? সত্যি বলছ?

বুড়োবাবু বললে—হ্যাঁ—

—আর সেই মাগীটা? সেই সুখদা না কী তার নাম?

বুড়োবাবু বললে—তা জানি না—

—তাহলে সেই জামাইটা? সেই কালীকান্ত বিশ্বাস হারামজাদাটা?

বুড়োবাবু বললে—আমাকে তুই ও-সব কথা জিজ্ঞেস করিসনি বাবা, আমি ও-সব খবর রাখিনে! আমার অত খবর রাখবার ক্ষমতা নেই রে—

সুধন্য বললে—থাক, তোমায় আর ও-সব খবর রাখতে হবে না। আমি নিজেই সব খবর রাখবো। আমি ওদের উদ্বাস্তু করে তবে ছাড়বো, এই তোমাকে বলে রাখলুম—

বুড়োবাবু বললে—আমি মারা যাবার পর তুই যা খুশী করিস, তার আগে কিছু করতে হবে না তোকে—

সুধন্য বললে—তোমাকে বাঁচতেই হবে কাকাবাবু! তুমি না বাঁচলে সব ভেস্তে যাবে আমার। তোমাকে আমি বাঁচিয়ে তুলবোই। নইলে আমি যে মারা যাবো—

হঠাৎ যেন বাইরে কীসের একটা শব্দ হলো। যেন একটা গাড়ি ঢুকলো উঠোনের মধ্যে।

সুধন্য বললে—একটা গাড়ির শব্দ শুনতে পাচ্ছ কাকাবাবু? কে যেন গাড়ি করে বাড়ির মধ্যে এল মনে হচ্ছে? এত রাত্তিরে কে এল, বলো তো?

বুড়োবাবু সে-কথায় উত্তর দিলে না। গাড়ি করেই আসুক এ বাড়িতে আর

হে'টেই আসুক, বুড়োবাবুর তা নিয়ে মাথা ঘামানোর মত শরীরের অবস্থা নয়। কিন্তু সুধন্যর তা নয়। সে ছোকরা মানুষ। তার মাথায় অনেক মতলব ঘুরছে। অনেক সুখের দিন এককালে দেখেছে সে। এখন আবার চরম দুঃখের দিনও চোখের সামনে দেখছে। এখন যেন দুঃখের সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে খেতে একটা কুটো আশ্রয় করে বে'চে উঠতে চাইছে।

বাইরের উঠোনের দিকে কান পেতে কী যেন সন্দেহ হলো তার।

বললে—ডাক্তার নাকি?

বুড়োবাবু সে-কথার উত্তরও দিলে না।

তারপর সুধন্য নিজেই বললে—যাই, একবার দূর থেকে দেখে আসি—

বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তারপর খানিক পরে ফিরে এসে বললে—হ্যাঁ, যা বলেছি ঠিক তাই। ডাক্তার এসেছে মা-মণিকে দেখতে—

বুড়োবাবু বললে—অসুখ? আবার অসুখ হয়েছে?

সুধন্য বললে—তা হবে না? আমি তো রোজ ঠনঠনের কালীবাড়িতে পুজো চড়াচ্ছি কাকাবাবু! জয় মা কালী—

বলে সুধন্য দুই হাত জোড় করে অনেকক্ষণ ধরে কপালে হাত ঠেকিয়ে রাখলে।

বললে—অনেক টাকা মা-কালীর পেছনে খরচা করেছি কাকাবাবু, জানো? তুমি কি মনে করো সব জলে যাবে? ঠাকুর-দেবতা কি মিথ্যে বলতে চাও? মা-মণি মরবেই এটা তুমি দেখে নিও। অত পাপ কি সয়? পাপ সয় না কাকা-বাবু, পাপ সয় না। পাপ আর পারা একদিন ফুটে বেরোবেই বেরোবে, নইলে ঠাকুর-দেবতা যে মিথ্যে হয়ে যাবে—

বুড়োবাবুর যেন কথাগুলো ভালো লাগছিল না।

বললে—ও-কথা তুই বলিসনি সুধন্য। আমার শুনলে বড় কষ্ট হয়—

সুধন্য বললে—হোক কষ্ট। এমন কষ্ট হওয়া ভালো। জানো, আমি সেদিন আমার কুষ্ঠি দেখিয়েছি; গণৎকার বলেছে, এবার আমার ভালো টাইম আসছে—

তবু বুড়োবাবু কোনও উত্তর দিলে না।

সুধন্য বললে—তাহলে এখন উঠি কাকাবাবু! কাল আবার কলকাতায় গণ্ডগোল হবে—

—কীসের গণ্ডগোল হবে!

সুধন্য বললে—রাস্তায় আসতে আসতে দেখছিলুম দেয়ালে দেয়ালে সব পোষ্টার পড়েছে, মিছিল বেরোবে।

—কীসের মিছিল রে?

সুধন্য বললে—আর কীসের? ওই যত পার্টির মিছিল। তার মানে বাস-ট্রামের অক্কা। আসবার সময় আপিস থেকে হে'টে হে'টে ফিরতে হবে। এদের জ্বালায় এবার কাজ-কর্ম সব বন্ধ হয়ে যাবার জোগাড়—যদি পারি তো পরশু আবার আসবো।

বলে সুধন্য সত্যি সত্যিই উঠলো এবার।

বললে—তাহলে ওষুধগুলো ঠিক খেও মনে করে বুঝলে কাকাবাবু? অনেক টাকা লেগেছে ওগুলো কিনতে ডাক্তারকেও অনেকগুলো টাকা দিয়েছি। মা-কালীর মন্দিরেও অনেক টাকার পুজো চড়িয়েছি। জয় মা কালী

ঘরের বাইরে এসে সুধন্য দেখলে, তখনও উঠোনের সব আলোগুলো জ্বলছে। আর গাড়িটাও তখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে সেখানে। একবার মনে হলো জেনে যায়

মা-মণির অবস্থাটা কেমন! কিন্তু অত দেরি করলে ওদিকে আবার ফেরবার ট্রেণ পাওয়া যাবে না।

—কে? কে আপনি?

সুধন্য চেয়ে দেখলে সেই বখাটে জামাইটা। জামাইটা তার দিকেই এগিয়ে আসছে। লুঙিগ করে কাপড়টা পরা। গায়ে হাতা-কাটা গেঞ্জি। জামাইটা যেন দিন দিন ভালো-মন্দ খেয়ে এরই মধ্যে খোদার খাসি হয়ে গেছে। একটু নেয়া-পাতি ভুঁড়িও হয়েছে।

সুধন্য বললে—আমি বুড়োবাবুর ভাইপো—

—বুড়োবাবু? বুড়োবাবুর ভাইপো তো এত রাত্তিরে এখেনে কেন? মতলবটা কী?

সুধন্য বললে—কাকাবাবুর অসুখ শুনে দেখতে এসেছিলুম!

—অসুখ হয়েছে তো কী হয়েছে? অত ভাত খেলে অসুখ হবে না? পরের বাড়ির খাওয়া পেয়ে কেবল দিন-রাত গিলবে, অসুখ তো হবেই। তোমার কাকাবাবুকে এখান থেকে নিয়ে যাও না তোমাদের কাছে। এখেনে রেখেছ কেন?

সুধন্য বললে—শরীরের এই অবস্থায় কী করে নিয়ে যাবো? এখন তো নাড়ানাড়ি করলেই রোগী মারা যাবে।

কালীকান্ত বললে—তা বুড়ো হলে তো সবাই মরে যাবে। বুড়োমানুষকে বাঁচিয়ে রেখে লাভ কী? শুধু গেরস্থর ভাত নষ্ট—ওকে তোমরা নিয়ে যাও এখান থেকে—

সুধন্যর বড় রাগ হলো। মনে হলো এক থাপ্পড় মেরে লোকটার মুখটা বেঁকিয়ে দেয়। কিন্তু কিছু না বলে চুপ করে রইল।

কালীকান্ত বললে—ফের যদি কোনও দিন এ-বাড়িতে আসতে দেখি তো তোমাকে আমি দেখে নেব, এখন যাও—

সুধন্য বললে—আমার নিজের কাকাকে আমি দেখতে আসবো না?

কালীকান্ত তেড়ে-ফুঁড়ে সামনে এল। বললে—না, আর কখ্খনো আসবে না—

হঠাৎ ভেতর দিক থেকে ডাক্তারবাবু বেরিয়ে এল। সঙ্গে ভূপতি ভাদুড়ী। দুজনেই নিজেদের মধ্যে কথা বলতে ব্যস্ত। তাদের কথা শুনে সুধন্যর মনে হলো যেন তারা খুবই উদ্বিগ্ন। কালীকান্তও এগিয়ে গেল সেদিকে। গিয়ে জিজ্ঞেস করলে—কী রকম দেখলেন ডাক্তারবাবু?

সুধন্য আর দাঁড়ালো না সেখানে। দাঁড়াতে ইচ্ছে হচ্ছিল, কিন্তু এদিকে বাড়ি যেতেও দেরি হয়ে যাচ্ছিল। তাছাড়া বুড়ি তো মরেও মরে না। এ তো রোজই অসুখ লেগে আছে, আর রোজই বেঁচে উঠছে। কী যে হবে কে জানে! এত কালীবাড়িতে পুজো দিয়েও যে কিছু ফয়দা হচ্ছে না।

সুধন্য পায়ে পায়ে ট্রাম রাস্তায় গিয়ে পড়লো।

পুণ্যশ্লোকবাবুর বাড়ির দেয়ালের পোষ্টারগুলো উপড়ে ফেলে দিয়ে প্রজেশ গাড়িটা নিয়ে রাস্তায় বেরিয়েছিল। পকেটের ভেতরে টাকাটা সাবধানে নিয়েছে সে। অনেক দিন পরে আবার এ-লাইনে নামতে হয়েছে।

প্রজেশ গাড়িটা নিয়ে বৌবাজারের একটা রাস্তার সামনে এসে থামলো। তারপর গাড়িটা লক্ করে রেখে একটা সরু রাস্তার ভেতরে ঢুকলো।

তারপর একটা বাড়ির সামনে গিয়ে ডাকলো—বাদল, ও বাদল—

কোনও উত্তর নেই।

প্রজেশ আবার ডাকলে—বাদল, এই বাদল—

আজকাল এরা রাত্রে বাড়িতে ফিরে ঘুমোতে শিখেছে। নইলে আগে এরা ছিল নিশাচর। এই বাদলরা। দিনের বেলায় এদের পাত্তা পাওয়া যেত। কিন্তু রাত্রে কখনও নয়। রাত্রের দিকেই ছিল ওদের সব কারবার।

প্রজেশ সেন অনেক দিনকার লোক। এদের সঙ্গে অনেক কালের জানাশোনা তার। কাজে অকাজে এদের হাতে রাখবার জন্যে পুণ্যশ্লোকবাবুর হয়ে এককালে অনেক টাকা এদের দিয়ে গেছে। তখন ব্রিটিশদের রাজত্ব। পার্টির পেছনে এরাই ছিল ভরসা। দরকার হলে এরা পার্টির লীডারদের পুলিশের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। আবার দরকার হলে গভর্ণমেন্টের মাল লুঠপাটও করেছে। তখন এরাই ছিল জনসাধারণ। জনসাধারণ চায় না ব্রিটিশ শক্তিকে, এটা প্রমাণ করা হতো এদের দিয়ে লুঠপাট করিয়ে। সাধারণ মানুষ যদি বা বন্দুকের ভয়ে পালিয়ে আসতো, এরা নির্ভীক। দুটো টাকার লোভে এরা পুলিশকে খুন করতেও পেছ-পা হতো না।

তারপর যখন ব্রিটিশরা চলে গেল তখন এরা হলো বেকার।

তখন এরা এল প্রজেশ সেনের কাছে।

বললে—এবার আমরা কী করবো হুজুর? আমাদের কাজ দিন কিছু—

কাজ না দিলে তখন এরা আবার সিঁদ কাটবে, পকেট কাটবে, ছিনতাই করবে। কিন্তু বাড়াবাড়ি করলে তখন গভর্ণমেন্টেরই বদনাম। বদনাম পুলিশেরও। ভাবনায় পড়লো পার্টি। এদের এখন কাজ না দিলে যে এরা লঙ্কাকান্ড বাধাবে। যে দৈত্যকে নিজেরাই সৃষ্টি করেছিল, সেই দৈত্য এখন এদেরই ঘাড়ে বসে এদেরই রক্ত চুষবে।

তখন পরামর্শ করে ঠিক হলো এদের কাজ দিতে হবে। কী কাজ? না লাইসেন্স দিয়ে দাও সকলকে এক-একটা করে। কেউ পেলে ট্যাক্সির পারমিট, কেউ মদের দোকান, কেউ বা মাংস। পাঁঠার মাংস বিক্রি করার লাইসেন্স। তাতেই আপাততঃ মান রক্ষা হলো পার্টির।

বেশ চলছিল এমনি করে। বেশ কায়েম করে বসেছিল তখন পুণ্যশ্লোকবাবুরা অনেক বছর ধরে। প্রায় জমিদারি মৌরসী-পাট্টা। পার্টির খোদ-কর্তাকে খোশ-মেজাজে রাখো, একটা হিল্লে হয়ে যাবেই। হয় মন্ত্রিত্ব, নয়তো চাকরি, নয়তো এক্সপোর্ট-ইম্পোর্টের লাইসেন্স! পার্টির নিজের দায়ে দানছত্র খুলতে হলো। কিন্তু দেশে মানুষ যখন অসংখ্য তখন দানছত্র খুলে ক'জনকে তুষ্ট করবে? দানছত্রের ভাঁড়ারেরও তো একটা সীমা আছে! পারমিট-লাইসেন্সেরও তো একটা সীমা-সংখ্যা আছে!

তখন যারা এতদিন কিছুই পায়নি তাদের নিয়েই সন্দীপবাবু আর পূর্ণবাবুরা একটা পার্টি খুললো। তাদের দেখাদেখি আরো নানা পার্টি ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠলো। তারাও ঠিক পুণ্যশ্লোকবাবুদের পার্টির মত মিছিল করতে লাগলো।

তখন আবার ডাক পড়লো বাদলদের।

প্রজেশ আবার ডাকলো। দরজার কড়া জোরে জোরে নাড়তে লাগলো।

বললে—কই রে, বাদল আছিস বাড়িতে?

হঠাৎ পেছন থেকে একজন এসে হাজির হলো।

—কে? প্রজেশবাবু?

প্রজেশ অন্ধকারের মধ্যেই চিনতে পারলে। বাদল অনেক মোটা হয়ে গেছে। বেশ খোলতাই হয়েছে চেহারা। বাদল হাত তুলে নমস্কার করে বললে—রাস্তার মোড়ে আপনার গাড়ি দেখেই বুঝতে পেরেছি—

—তা কেমন আছিস বল্? বাড়িটার ভোল তো ফিরিয়ে ফেলেছিস দেখছি—

বাদল হাসলো। বললে—সবাই বাড়ি করে ফেললে, আর আমরা করলেই দোষ? আপনিও তো বাড়ি করেছেন!

প্রজেশ ও-প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেল। বললে—ও-সব কথা থাক্, কাজের কথা বলতে এসেছি। পুণ্যশ্লোকবাবু পাঠিয়েছে।

—বাবু কেমন আছেন? মন্ত্রী হয়ে আমাদের কথা একেবারে ভুলে গেলেন।

—বলছিস কী তুই! তোদের কথা কেউ ভুলতে পারে কখনো? তোদের জন্যেই তো বাবু এখন মিনিস্টার হয়েছে। আর তার জন্যে তোরা কত টাকা খেয়েছিস বল দিকিনি? আবার এই সামনে ইলেকশান আসছে, তখন আবার কত খাবি বল তো?

বাদল ঘুঘু লোক। এককালে বাদল-গুণ্ডা বলতে বৌবাজার পাড়ার লোকেরা কাঁপতো। এখনও কাঁপে। এখন কাঁপে অন্য কারণে। তখন কাঁপতো বাটপাড়ির ভয়ে, খুন-জখমের ভয়ে। এখন কাঁপে পেছনে মন্ত্রীরা আছে বলে।

বাদলের মনে পড়ে গেল। বললে—হ্যাঁ সামনে তো ভোট আসছে—কিন্তু এবার রেট বেড়ে গেছে প্রজেশবাবু। হাত খরচের রেট এবার বাড়াতে হবে কিন্তু, পুণ্যশ্লোকবাবুকে আগে থেকে বলে রাখবেন—

প্রজেশ বললে—তুই যে নতুন লোক হয়ে গেলি দেখছি, এখন থেকেই একেবারে বায়না ধরেছিস!

বাদল বললে—বায়না নয়, জিনিসপত্তোরের দাম বেড়ে গেছে—

প্রজেশ বললে—তা দাম বেড়ে গেছে তো তোদের কী? তোদের তো ফোকোটের পয়সা। তোদের তো আর খেটে খেতে হয় না। লোকের পকেট কাটবি আর মজাসে খরচ করবি—

—কী যে বলেন প্রজেশবাবু—বাদল মুখ বেঁকিয়ে তাচ্ছিল্যের সুরে বলে উঠলো—সে জমানা আর নেই। এখন বাবুদের পকেটের পেছনে আর একটা পকেট থাকে—

—সে থাক, কিন্তু এখন তো মাংস বেচেও কিছু হচ্ছে!

বাদল বললে—সে তো হচ্ছেই, নইলে চালাচ্ছি আর কী করে?

প্রজেশ বললে—তাই তো তোদের কাছে এখন এসেছি। মুফোৎ কিছু রোজগার করবি তো বল্, সঙ্গে এনেছি—

—কাজটা কী?

প্রজেশ বললে—কাল বিকেলে পূর্ণবাবুদের পার্টির মিছিল আছে, তোদের ভাঙতে হবে—

—বেশ! তারপর?

প্রজেশ বললে—পুলিশ-পাহারা থাকবে, বন্দুক-রাইফেলও থাকবে। লালবাজারের দিকটা আমরা সামলাবো, কিন্তু তোরা মিছিলের সঙ্গে মিশে গিয়ে

ইঁট ছুঁড়বি পুলিশের দিকে, সোডার বোতল ছুঁড়বি, তাহলে ওদের ওপর পুলিশের মোকাবিলা করতে সুবিধে হবে—

—কত দেবেন?

—মাথা-পিছু তোদের কত চাই বল?

—তা আপনি কি নতুন দিচ্ছেন যে জিজ্ঞেস করছেন?

—ঠিক আছে!

বলে নিজের পকেটে হাত পুরে দিলে প্রজেশ। তারপর একতাড়া নোট বার করে অন্ধকারের মধ্যেই মনে মনে গুণতে লাগলো। এক-দুই-তিন-চার-পাঁচ...

তারপর সেগুলো একটা নির্দিষ্ট সংখ্যায় আসতেই গোণা থামিয়ে দিলে। বললে—নে—

বাদলও নিলে. তারপর সেও গুণতে লাগলো।

প্রজেশ বললে—কম দিইনি রে, কম দিইনি!

তারপর একটু থেমে বললে—মঙ্গল পাঁড়ে কোথায়?

বাদল ততক্ষণে টাকা গোণা শেষ করেছে। করে নোটের বাণ্ডিলটা মাথায় ছোঁয়ালে। তারপর বললে—চলুন, মঙ্গল বোধহয় এখন বাড়ি ফিরেছে—

এমনি করে বাদলের কাছ থেকে মঙ্গল। মঙ্গলের কাছ থেকে আরো অনেক জায়গায় যেতো হলো প্রজেশকে। কলকাতা সহরে এর আগেও মিছিল হয়েছে। আগেও প্রজেশকে এমনি করে টাকা ছড়াতে হয়েছে। এ নতুন কিছু নয়। সবাই একজোট হয়ে শলা-পরামর্শ করেছে। বাদলদেরও আবার সাকরেদ আছে। তাদেব কাছেও যেতে হয়। তারা আবার ভাগ পায় তার। প্রজেশ টাকাগুলো দিয়ে অর্ধেক নিজের কাছে রাখে। কাজ তো হওয়া চাই। কাজ হাসিল হবার পর তখন বাকি পাওনা মিটিয়ে দিতে হবে।

যখন প্রজেশ নিজের বাড়িতে ফিরলো তখন ভোর-রাত। আর একটু পরেই ফরসা হবে আকাশ। নিজের গলির মধ্যে হঠাৎ একটা দেয়ালে গিয়ে চোখ দুটো আটকে গেল। এখানেও ওদের পোষ্টাব। এখানেও বেটারা সব কাগজ লেপটে দিয়ে গেছে। এখানেও লাল-কালো কালিতে লেখা লিখে দিয়ে গেছে ঃ

আগামীকাল অপরাহ্নে
মেহনতী জনতাব দাবী আদায় করতে
দলে দলে মিছিলে যোগদান করুন।

প্রজেশ খানিকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে পোষ্টারটা দেখলে। তারপর গাড়িটা গ্যারাজে পুরে নিজের ফাঁকা বাড়িটার মধ্যে ঢুকলো।

শেষ রাত্রের দিকেই হঠাৎ আবার মা-মণি চোখ তুলে চাইলে। ডাকলে—তরলা, তরলা কই রে—

সারা রাত জেগে জেগে তরলারও একটু ঝিমুনি এসেছিল। মা-মণির ডাক শুনেই ধড়মড় করে জেগে উঠেছে। মা-মণিব কাছে গিয়ে বললে—কী মা-মণি? কিছু বললে?

মা-মণি বললে—হ্যাঁ রে। ওরা সব কোথায় গেল?

তরলা বললে—কারা?

—ওই যারা এসেছিল?

—কারা এসেছিল!

কী জানি, সব যেন কেমন গুলিয়ে গেল। রাত্রেও ডাক্তারবাবু এসে দেখে গিয়েছিল। তখন সবাই ছিল সামনে। যত দূর মনে পড়ে ভূপতি ভাদুড়ী ঠিক পায়ের কাছে দাঁড়িয়েছিল। আর মুখের সামনেই ডাক্তারবাবু। ডাক্তারবাবুকে দেখে একবার মাথায় ঘোমটা টানবার চেষ্টা করেছিল।

—সুখদা কোথায়? সে খেয়েছে?

তরলা বললে—হ্যাঁ—

—তাকে একবার ডেকে নিয়ে আয় না মা!

সুখদাও তখন সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল। সে এগিয়ে এসে মুখ নিচু করে বললে—কী বলছো?

আর কিছু বলেনি মা-মণি। আর তারপর সবাই চলে গিয়েছিল। মা-মণিও আবার ঘুমিয়ে পড়েছিল। বড় অঘোর সে ঘুম। তারপর আস্তে আস্তে বারান্দা, সিঁড়ি আর উঠোনের সব আলো নিভে গিয়েছিল। কালীকান্ত ভেতরের দিকে অন্দরমহলে চলে যাচ্ছিল। বড় উদ্বেগে দিনগুলো কাটছিল তার ক'দিন।

হঠাৎ যেন পেছনে কে এল। বললে—কে? ছোড়দা?

নরেশ দত্ত বললে—কী রে, কী ব্যাপার? কোনও খবর নেই তোর, শেষ-কালে আমিই এসে গেলুম। তুই যে বলেছিলি টাকা দিবি?

কালীকান্ত বললে—মাইরি বলছি ছোড়দা, এখনও কোনও কিনারা হয়নি বুড়ির—

—তা ডাক্তার কী বলছে?

কালীকান্ত বললে—ডাক্তারে আর কী বলবে? কেবল টাকা লুটে নিয়ে যাচ্ছে ধাপ্পা দিয়ে।

—তা বুড়িকে ডাক্তার না দেখালেই হয়। বুড়ি তো মরবেই শুধু মাঝখান থেকে টাকাগুলো নষ্ট!

কালীকান্ত বললে—আমিও তাই শালাকে বলি—

—কোন্ শালা?

—ওই ম্যানেজার শালা! বাড়ি ভাড়ার টাকাগুলো আদায় করছে আর ডাক্তার-ওষুধের পেছনে ঢালছে।

—এবার এক কাজ কর।

কালীকান্ত সমস্যার একটা সমাধান খুঁজে পাবার আশায় বললে—কী?

—বুড়ির টাকা কোথায় থাকে? টাকা, গয়নাগাটি সব কিছু?

কালীকান্ত বললে—কোথায় আবার থাকবে, সিন্দুকে।

—সিন্দুকের চাবি?

—বুড়ির কাছেই থাকে।

—বুড়ির কাছেই থাকে? তা বুড়ি তো এখন মরো-মরো। আজকালের মধ্যেই পটল তুলবে। যখন অঘোরে পড়ে থাকে, তখন তোর বউ চাবি খুলে গয়না-গাটি হাতাতে পারে না? তোর বউটা তো কোনও কাজের নয় দেখছি। একেবারে অকম্মা। অকম্মার ধাড়ি।

—কথাটা মন্দ বলনি ছোড়দা!

কালীকান্ত মতলবটা ভেবে দেখতে লাগলো। আবার বললে—কিন্তু যদি ধরা পড়ে যায়!

নরেশ দত্ত বললে—ধরা পড়বে কী করে? ধরাই যদি পড়বে তো বউ-এর কীসের বুদ্ধি? এই সহজ কাজটা পারবে না! হাতে একটা পয়সা নেই আমার, আমার কী করে চলে বল্ দিকিনি? শুঁড়িখানায় বাকি পড়ে গেছে কতগুলো টাকা। আর কদ্দিন ধার দেবে?

কালীকান্ত বললে—আমারও তো তাই ছোড়দা।

—তা মাল খাচ্ছিস কী করে? না কি উপোস?

কালীকান্ত বললে—তাছাড়া আর কী? যেদিন থেকে বুড়ির অসুখ বেড়েছে সেদিন থেকেই হরিমটর—

—তা বউ কী বলে?

—বউ বলে, ভালোই হয়েছে। আমার মদ খাওয়াটা দু'চক্ষে দেখতে পারে না যে!

নরেশ দত্ত বললে—দূর, তোর বউটা একেবারেই অকম্মা।

কালীকান্ত বললে—তা তুমিই তো ওর সঙ্গে আমার বিয়ে দিলে। আর আমিও টাকার লোভে তোমার কথায় ভুললুম, এখন পস্তাচ্ছি।

নরেশ দত্ত বললে—তুই কি একলা পস্তাচ্ছিস? সঙ্গে সঙ্গে আমিও তো পস্তাচ্ছি। সব প্ল্যানটা ভেস্তে গেল। আমি এত আটঘাট বেঁধে মতলব বাব করলুম আর সব কিনা কেঁচে গেল? উইলখানাতেও তো সই করাতে পারলি না বউকে দিয়ে—

তারপর একটু থেমে বললে—যাক্ গে, এখন আর সে নিয়ে ভেবে কী হবে। এখনও উপায় আছে—তুই চাবিটা হাত কর—

—তারপর?

—তারপর গয়নাগুলো বার করে নে!

কালীকান্ত বললে—সে আর কত টাকা! তুমি যে বলেছিলে বুড়ির কেউ নেই, বাড়িগুলোও সব আমি পাবো?

নরেশ দত্ত বললে—বুড়ি মরলে তো তুই-ই পাবি!

—ম্যানেজার? ম্যানেজারের ভাইপো?

নরেশ দত্ত বললে—তারা তো পর রে! একেবারে আন্‌কোরা পর। তাদের বাড়ি পাবার কি হক্ আছে? একবার বুড়িকে মরে যেতে দে না—

কালীকান্ত বললে—যদি তার মধ্যে ম্যানেজারের ভাইপোটাকে সব উইল করে দিয়ে যায়?

—এখনও তো দেয়নি! আর যেটায় সই করেছিল সেটা তো আমি লোপাট করে দিয়েছি।

কালীকান্ত বললে—নতুন করেও তো উইল করে নিতে পারে।

—করুক! তা করুক।

কালীকান্ত বললে—তার মানে?

নরেশ দত্ত বললে—আমিও একটা জাল উইল তৈরি করবো! উইল জাল হয় তা জানিস তো? পয়সা দিলে উইল জাল করে দেবার লোক আছে কলকাতায়, তা জানিস? ম্যানেজার বেটা যদি তেমন কিছু করে তো আমি আছি কী করতে? আমিও লড়ে যাবো—আমিও লড়তে জানি! তুই ভেতরে যা—আজ রাত্তিরেই কাজ হাসিল করতে বলবি তোর বউকে—

—কিন্তু আমার বড় ভয় করছে ছোড়দা!

—কাকে ভয়?

কালীকান্ত বললে—যদি আমার হাতে হাত-কড়া পড়ে।

নরেশ দত্ত বললে—কিছুছু ভয় নেই। তুই দুগ্গা বলে ঝুলে পড়, আমি তো আছি। আমি তোকে আপীলে খালাস করে নিয়ে আসবো। আর শেষকালে একটা পথ তো খোলা আছেই—

—কী পথ?

নরেশ দত্ত বললে—এক ফোঁটা বিষের তো তোয়াক্কা শুধু। শেষে বুড়ির ওষুধের সঙ্গে তোর বউকে বিষ মিশিয়ে দিতে বলবি। চুকে যাবে ল্যাঠা। তারপর মামলা চলুক। দেখি কার কত উকিল-মোক্তার আছে, আমি ছেড়ে কথা বলবো না—

কালীকান্ত বললে—কিন্তু অতটা বোধহয় করতে হবে না ছোড়দা—

—কেন? কীসে বুঝলি?

—ম্যানেজারের সেই ভাগ্নেটা ভেগেছে।

—ভেগেছে মানে?

কালীকান্ত বললে—ভেগেছে মানে আমি ভাগিয়ে দিয়েছি। সে আর এ-বাড়িতে আসে না।

—কী করে ভাগালি তাকে?

কালীকান্ত বললে—গাঁট্টা মেরে। বড় শয়তান ছিল বেটা। একদিন মাথায় গাঁট্টা মারলুম খুব কষে। বললুম, ফের যদি এ-বাড়িতে ঢুকবি তোর ঠ্যাং খোঁড়া করে দেবো। এখন ম্যানেজার তাকে চারদিকে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে—

—ঠিক আছে!

নরেশ দত্ত পকেট থেকে একটা সিগারেট বার করে ধরালে। যেন একটু নিশ্চিন্ত হলো।

বললে—তাহলে একটা রাস্তা ক্লিয়ার। ঠিক আছে। এইবার ম্যানেজারকে কুপোকাৎ করতে পারলেই কম্ম ফতে। তুই আর দেরী করিসনি, অনেক রাত হয়েছে। কালকে আমি আবার আসবো। আমার বড় টাকার টানাটানি রে। খুব হাওলাতে হয়ে গেছে—

নরেশ চলে গেল।

সারা বাড়িটা তখন প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে। কালীকান্ত বাহাদুর সিং-এর কাছে গিয়ে বললে—বাহাদুর, গেট বন্ধ করে দাও—

বাহাদুর বললে—জী হুজুর—

—কেউ যেন না ঢোকে ভেতরে। বুঝলে! আজেবাজে লোক কাউকে ঢুকতে দেবে না।

—নেহি হুজুর।

তারপর অন্দর-মহলের দিকে ঢুকে পড়লো।

ভোরবেলাই ঘুম থেকে উঠেছেন পুণ্যশ্লোকবাবু। বরাবর ভোরবেলাই ওঠা অভ্যেস। ভোরবেলা উঠেই মুখ হাত পা ধুয়ে কাজে লেগে যান। তখন একটার পর একটা টেলিফোন আসে। সেই সকালবেলাই সারা দিনের প্রোগ্রাম তাঁর ঠিক হয়ে যায়।

সেদিন কিন্তু নিজে থেকেই টেলিফোন রিসিভারের ডায়াল ঘোরালেন।

—কে? প্রজেশ?

আগের দিন অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল তাই তখনও ঘুম ভাঙেনি প্রজেশের। কিন্তু পাতলা ঘুম টেলিফোনের বাজনার শব্দে আরো পাতলা হয়ে উঠলো। বিছানা থেকে হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা কানে দিয়ে বললে—হ্যালো?

কিন্তু পুণ্যশ্লোকবাবুর গলা শুনেই উঠে বসেছে।

—আমি প্রজেশ!

ওপাশ থেকে পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—কাল কী হলো? বাদলদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

প্রজেশ বললে—হ্যাঁ স্যার, দেখা করেছি।

—টাকা? টাকা দিলে?

—হ্যাঁ স্যার। অনেকদিন পরে দেখা, সবাই খুব খুশী হলো। টাকা পেয়ে আরো খুশী হলো।

—সব টাকা ওদের দাওনি তো?

প্রজেশ বললে—না, তাই কখনও আমি দিই? ওয়ান-থার্ড ওদের দিলুম, বললুম কাজ হয়ে গেলে তখন বাকিটা পাবি—

পুণ্যশ্লোকবাবু নিশ্চিন্ত হলেন। এ-লাইনে সব দিকে নজর না দিলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। এ ওকালতি নয়, এমনকি স্কুল-মাস্টারিও নয়। অন্য সব প্রফেশানের চেয়ে এ এক জটিল প্রফেশান। যেদিন প্রথম পলিটিক্স্‌-এ এসেছিলেন, সেদিন জানতেন না যে এ-লাইনে এত ঝামেলা। তখনকার দিন-কাল ভাল ছিল। বড়কে বড় বলে সবাই মানতো, যে-কোনও রকমে একবার যদি সকলের মাথায় ওঠা যেত তো সবাই মাথায় তুলে রাখতো। তখন কংগ্রেসের নাম করলেই লোকে ভক্তিতে গদ্‌গদ হয়ে উঠতো। একটা মিটিং ডাকলে লোকে চুপ করে কান পেতে শুনতো। সে-সব দিন আর নেই। এখন যেন আবার সব উল্টে-পাল্টে গেল।

পুণ্যশ্লোকবাবু নিচেয় নেমে এলেন। নামবার পথে চেয়ে দেখলেন পর্মিলির ঘরটার দিকে। এখনও ঘুমোচ্ছে বুঝি। বরাবর সে দেরি করে ওঠে ঘুম থেকে।

রঘু আসছিল ওপরে। মনিবকে দেখেই একপাশে সরে দাঁড়ালো।

পুণ্যশ্লোকবাবু জিজ্ঞেস করলেন—দিদিমণিকে চা দিয়েছিস?

রঘু বললে—দিদিমণি তো বাড়িতে নেই—

—বাড়িতে নেই? কোথায় গেল?

রঘু বললে—ভোরবেলাই জগন্নাথকে ডেকে নিয়ে বাইরে চলে গেছেন—

—ভোরবেলা? কত ভোরে?

—সে অনেক ভোরে। আমি ওঠবার আগে—

পুণ্যশ্লোকবাবু একটু অবাক হলেন। যে-মেয়ে অন্যদিন দেরি করে ওঠে, সেই মেয়ে হঠাৎ এত ভোরে উঠলোই বা কেন? আর উঠলোই যদি তো গেল কোথায়?

কিন্তু রাজনীতিতে ঢোকার পর থেকে এ-সব ব্যাপারে দেখাশোনা করবার, এ নিয়ে আর ভাববার বেশি সময় পান না পুণ্যশ্লোকবাবু। কিন্তু ভাবতে ইচ্ছে করে মাঝে মাঝে। মাঝে মাঝে মনে হয় পর্মিলিকে নিয়ে কোথাও বেড়াতে যান। দুজনে মিলে কিছুদিন কোথাও নিরিবিলিতে কাটান। সুব্রত কলকাতায় থাকলে হয়ত এটা দরকার হতো না। সে এলে দু'জনে মিলেমিশে ঝগড়া করেও সময়

কাটিয়ে দিত। পমিলি বোধহয় বড় একলা হয়ে গেছে। তার বিয়ে হওয়া একান্ত দরকার। কিন্তু সেদিকে ভাববার সময় কোথায় তাঁর! যখন দিল্লীতে যান তিনি তখন এখানে পমিলি একলা পড়ে থাকে। যাবার সময় পমিলিকে বলে যান—খুব সাবধানে থাকবি রে, আমি তিন দিনের জন্যে দিল্লী যাচ্ছি—

বাবা দিল্লী যাবার পর বাড়িতে একলা থাকার যে ভয়, তা কোনও কালে ছিল না পমিলির। বাড়ির গেটের সামনে দিন-রাত পুলিশ পাহারা থাকতো, তবু থানার ও-সিকে একবার টেলিফোন করে বলে দিয়ে যেতেন। থানা থেকেও খুব কড়া নজর রাখতে বলা হতো পুলিশদের।

কিন্তু তাতে পমিলির কোনও অসুবিধেও হতো না, সুবিধেও হতো না।

থানার ও-সি টেলিফোন করতো প্রত্যেক দিন।

জিজ্ঞেস করতো—কেমন আছেন মিস সেন? আমি থানার ও-সি বলছি।

পমিলি বলতো—ভাল আছি, থ্যাঙ্কস্—

বলে টেলিফোন রেখে দিত।

এক-একদিন ও-সি বলতো—কিছু অসুবিধে হলে আমাদের বলবেন আপনি—

কোনও দিন কোনও অসুবিধে হয়নি পমিলির। বরং আরামেই কেটেছে তার। আরাম করে বাইরে বেরিয়েছে, আরাম করে ক্লাবে গিয়েছে, কখনও বা আরাম করে 'বারে' গিয়েছে। আর যখন খুশী যত রাত্রে খুশী বাড়ি ফিরেছে, কেউ বলবারও নেই, দেখবারও নেই। কোনদিন তার কোনও ব্যাপারের জন্যে কৈফিয়ত দিতে হয়নি কাউকে। এই-ই পমিলি। বরাবর পমিলির এই-ই স্বভাব। তা নিয়ে পুণ্যশ্লোকবাবুর খেদ থাকলেও, পমিলির মনে কোনও খেদ নেই।

—আইয়ে রায়-সাহেব!

গোয়েঙ্কা সাহেব ভোরবেলাই এসে বসেছিলেন। পুণ্যশ্লোকবাবুকে ঘরে ঢুকতে দেখেই উঠে দাঁড়ালো।

—কতক্ষণ এসেছেন গোয়েঙ্কা সাহেব?

যে-কাজে গোয়েঙ্কা সাহেব এসেছেন তা পুণ্যশ্লোকবাবুর জানা। সেই চিনিব কল। সুগার ফ্যাক্টরি।

গোয়েঙ্কা সাহেব বললে—দেয়ালে-দেয়ালে আজ পোস্টার দেখলুম রায়-সাহেব। ওরা খুব পোস্টার লাগিয়েছে। আপনার বাড়ির দেয়ালেও তো দেখলাম লাগিয়েছে।

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—ওই সব গুণ্ডাদের যত কাণ্ড! কালকে রাত্তিরে সব ধুয়ে-মুছে সাফ করে দিয়েছি, আবার লাগিয়ে গেছে—

—পুলিশ কোনও কাজ করে না রায়-সাহেব। পুলিশ পাহারা দিচ্ছে তবু কখন লাগালে ও-সব?

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—সামনে ইলেকশান আসছে তো, তাই এখন কিছু বলছি না। ইলেকশানেব পর দেখে নেব একবার সবাইকে—

গোয়েঙ্কা সাহেব বললে—আজ তো একশো চুয়াল্লিশ ধারা ঝুলিয়ে দিয়েছেন ওখানে?

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন, তা তো দিয়েছি, কিন্তু তাতে কি আর কমিউনিস্টরা শায়েস্তা হবে? ওদের আমি চিনে নিয়েছি—

গোয়েঙ্কাও খুব একমত।

বললে—ওদের খুব শায়েস্তা করে দিন রায় সাহেব। এমন শায়েস্তা

করবেন যাতে চিরকাল মনে থাকবে। আমাদের লেবারদের খুব খেপাচ্ছে ওরা। ওদের জন্যে আর কারবার করা যাচ্ছে না বাঙলা-মুলুকে—গোলি চালিয়ে দিন আজকে, পুলিশ কমিশনারকে গোলি চালাবার হুকুম করে দিন রায়-সাহেব, আমরা কারবারীরা একটু বাঁচি—

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—সে তো করবো, সে আপনাদের আর বলতে হবে না। আপনারা যদি একটু ভরসা দেন তো আমরা কমিউনিষ্টদের ভয় করি না—আপনারা কংগ্রেসকে একটু মদৎ দিন—

—মদৎ তো নিজেদের গরজেই দিচ্ছি রায়-সাহেব।

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—শুকনো মদৎ দিলে কী হবে গোয়েঙ্কা সাহেব, টাকা দিন। কংগ্রেস ফাণ্ডে টাকা বড় শর্ট পড়েছে।

—কেন, রুপিয়া তো আমরা দিচ্ছি রায়-সাহেব—

—আপনি একলা রুপিয়া দিলে কী হবে গোয়েঙ্কা সাহেব। আপনাদের কমিউনিটি, যাদের হাতে টাকা, তারা যে কিছু দিচ্ছে না। আপনাদের চেম্বার অব্ কমার্স থেকে কিছু কিছু পাইয়ে দিন। নইলে ইলেকশানে আমরা লড়বো কী করে? এক একটা ইলেকশানে আমাদের কত টাকা খরচ হয় জানেন?

—কত টাকা? পঁচাশ লাখ?

—কী বলছেন শেঠজী, আগেকার ইলেকশানে আমাদের আড়াই কোটি টাকা খরচ হয়েছে, তা জানেন?

—এত টাকা কীসে লাগে রায়-সাহেব?

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—লাগে। খরচ যে অনেক। ঘুষ দিতে হয় যে! এই ভোটের সময় কত লোক বাড়ি করে ফেলে তা জানেন? আমার একটি লোক আছে, তার নাম প্রজেশ। তাকে দেখেছেন তো? খুব খাটতে পারে, তিনটে ভোটে সে কাজ করেছে। এই কলকাতা সহরে সে বাড়ি করে ফেলেছে তা জানেন?

—প্রজেশবাবুকে তো চিনি। সে তো চাকরি করে!

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—চাকরিটা তো লোক-দেখানো গোয়েঙ্কা সাহেব। ওটা কিছু না, আমার কাছে যা পায় তা চাকরির ডবল। এক-এক সময় ভাবি লোকটাকে তাড়িয়ে দিই। দু'একবার তাড়িয়েও দিয়েছি। কিন্তু ভোটের আগেই আবার খোসামোদ করে ডেকে আনতে হয়—ও সব কলা-কৌশল জানে—

তারপর হঠাৎ যেন মনে পড়লো। বললেন কই, টাকা এনেছেন আপনি?

গোয়েঙ্কা সাহেব হাতের ব্যাগ খুললে। বললে—আমি যখন কথা দিয়েছি, তখন টাকা আনবো না, আপনি কী বলছেন?

বলে টাকাটা পুণ্যশ্লোকবাবুর দিকে এগিয়ে দিলে। তিনি সেটা নিয়ে নিজের পকেটে পুরে রাখলেন। রাখতে রাখতে বললেন—এই সব টাকা যাচ্ছে পার্টির ফাণ্ডে, জানেন গোয়েঙ্কা সাহেব। আমার নিজের টাকাও এর সঙ্গে কত চলে যাচ্ছে তার কি ঠিক আছে?

—আমার সুগার মিলের প্ল্যানটা তাহলে কবে স্যাংশান করছেন রায়-সাহেব?

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—হবে হবে—

তারপর আবার বললেন—দেখুন আজ ওদের পার্টির প্রোসেশান হচ্ছে, তারপর সামনে আসছে ইলেকশান, এ-সময়ে ক্যাবিনেট মেম্বারদের মাথা খারাপ হয়ে আছে। এ-সময়ে কোনও কাজ হবে না। ইলেকশানটা চুকে যাক, তখন

আপনার কাজটা করে দেবো, আমি কথা দিচ্ছি—

হঠাৎ পাশের টেলিফোনটা বেজে উঠলো।

—স্যার!

প্রজেশের গলা। গলাটা যেন বড় উদ্বিগ্ন।

—আবার কী বলছো?

—পর্মিলি কি বাড়িতে আছে এখন?

—কেন, হঠাৎ তার কথা জিজ্ঞেস করছো কেন তুমি? কী হয়েছে তার?

প্রজেশ বললে—না, আমি জিজ্ঞেস করছি পর্মিলি এখন বাড়ি আছে কি না। আমি এখুনি টেলিফোন পেলুম কিনা, তাই আপনাকে জিজ্ঞেস না করে থাকতে পারছি না।

পুণ্যশ্লোকবাবু আগেই উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন। এবারে কৌতূহলী হয়ে উঠলেন।

বললেন—না, সে ভোরবেলা সবার ওঠার আগেই কোথায় বেরিয়ে গেছে। এখন কোথায় সে?

প্রজেশ বললে—সেই কথা বলবার জন্যেই আমি আপনাকে এখন টেলিফোন করলুম। শুনলুম এখন সে ওদের পার্টি-অফিসে রয়েছে—

—ওদের পার্টি অফিসে মানে? কাদের পার্টি অফিসে?

—পূর্ণবাবুদের পার্টি অফিসে!

—সে কী?

যেন খবরটা শুনে হতচকিত হয়ে গেলেন। যেন বিশ্বাস করতে চাইলেন না। পর্মিলি গেছে পূর্ণবাবুদেব পার্টি অফিসে? এও কি বিশ্বাস করতে হবে?

বললেন—তুমি ঠিক বলছো?

প্রজেশ বললে—আমিও তো বিশ্বাস করতে চাইনি প্রথমে। এমন লোকের মুখে শুনলুম, যার কথা অবিশ্বাস করতে পারি না। সেই জন্যেই তো আপনাকে টেলিফোন করে সঠিক খবর নিচ্ছি। সে নিজের চোখে দেখেছে, পর্মিলি বৌবাজারে ওদের পার্টি অফিসের সামনে গাড়ি থেকে নেমে ভেতরে ঢুকলো—

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—কিন্তু এত জায়গা থাকতে অত ভোরবেলা ওখানে যাবেই বা কেন সে? তুমি নিশ্চয়ই ভুল শুনেছ—

প্রজেশ বললে—না, ভুল শুনিনি স্যার, আমার মনে হচ্ছে বাড়িতে যখন নেই তখন সে নিশ্চয়ই সেখানে গেছে—

পুণ্যশ্লোকবাবু তবু যেন বিশ্বাস করতে চাইলেন না।

বললেন—তোমরা সবাই পাগল হযে গেছ প্রজেশ তোমাদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে নিশ্চয়ই, নইলে আমার মেয়ে কখনও ওদের পার্টি অফিসে যেতে পারে? সে হাইলি এডুকেটেড্ মেয়ে, সে জানে ভালো করে তার বাবা কোন্ পার্টির লোক, তবু সে ওখানে যাবে? আজ যে ওদের মিছিল বেরোবে—

প্রজেশ বললে—আচ্ছা, আমি নিজে গিযে দেখে আসছি, আমি এখুনি যাচ্ছি—আমি যদি পর্মিলিকে ওখানে পাই তো আপনার কাছে নিয়ে যাবো—

—হ্যাঁ, এখন যাও, আমি তোমাদের জন্যে বাড়িতেই ওয়েট করছি—

ওদিক থেকে প্রজেশও তখন রিসিভার রেখে দিলে।

মাধব কুণ্ডু লেনের বাড়িতে তখন মাঝ-রাত। গেটের ওপর আলোটা তখনও জ্বলছে। ওটা সারা রাত অমনি করে জ্বলবে। কিন্তু গেটে তালা-চাবি বন্ধ করে দিয়েছে বাহাদুর সিং। নরেশ দত্ত চলে যাবার পরই কালীকান্ত বিশ্বাস গেট বন্ধ করতে বলে দিয়েছে। তারপরেই উঠোন। উঠোনের সব আলোগুলো নেভানো। বার-বাড়ি, রান্নাবাড়ি, খিড়কী, বুড়োবাবুর ঘরও তখন অন্ধকার। দুখমোচন, অর্জুনের ঘর থেকেও কোনও সাড়া-শব্দ নেই!

সুরেনের ঘরখানা ছিল উঠোনের একধারে। ক'দিন থেকে সে-ও নেই। ভূপতি ভাদুড়ী সেই দিন থেকেই ঘরের দরজায় তালা বন্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু অন্দর-বাড়ির ভেতরে মা-মণির মাথার কাছে একটা আলো শুধু টিম্-টিম্ করে জ্বলছে তখনও।

বাদামী মা-মণির পায়ের কাছেই শোয়। সেদিনও সে সেখানে শুয়েছিল। বুড়ো মানুষ, কবে একদিন এই মা-মণির বিয়ের সময় নতুন বউ-এর সঙ্গে হাটখোলার দত্ত-বাড়িতে গিয়েছিল। আর তারপর......

সে-সব কতদিনের কথা। চোখ দুটো বুজলেই বাদামীর সব মনে পড়ে যায়। যেন সেই নহবতের সুরটাও কানে ভেসে আসে। বাদামী ঘুমের ঘোরেই বিড়বিড় করে কী যেন বকে। তারপর আবার সব ঝাপসা হয়ে যায়। নহবত থেমে যায়। গান, হৈ-চৈ, আনন্দ সব কিছু থেমে আসে। সমস্ত হাটখোলাটায় যেন ঘুরঘুট্টি অন্ধকার নামে।

—বাদামী, বাদামী!

বাদামী সেই ফুলশয্যার রাতের উৎসবের হৈ-চৈ-এর মধ্যেও বারান্দার একটা কোণ বেছে নিয়ে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছিল। তা হাটখোলার দত্তবাড়ির ছেলের বিয়ের ফুলশয্যে, যে-সে ব্যাপার নয়। কলকাতা ঝেঁটিয়ে নেমন্তন্ন হয়েছিল। যে এসেছে নেমন্তন্ন খেতে তারই হাতে একটা করে বেলফুলের গোড়ে মালা দেওয়া হয়েছে, গায়ে গোলাপ-জল স্প্রে করা হয়েছে। এলাহি-কান্ড হয়েছে চারদিকে। এমন বাজি ছোঁড়া হয়েছিল সেদিন যে বাগবাজার থেকে পর্যন্ত লোক এসে হাঁ করে দেখেছিল আর অবাক হয়ে গিয়েছিল।

মা-মণিকে সেদিন এমন সাজিয়েছিল, দেখে মনে হচ্ছিল যেন জগদ্ধাত্রী।

লোকে বলেছিল—হ্যাঁ, দেখবার মত বৌ হয়েছে বটে ভাই—

তা টানা-টানা চোখ, ছোট কপাল, সেই কপালের ওপর হীরের টায়রা ঝুলছে, বেনারসীর একটু ঘোমটার নিচে জ্বলজ্বলে সিঁদুর।

কনের বাড়ির ঝি, তারই কি কম খাতির করেছিল দত্তবাড়ির মাসিপিসীরা। এক-একজন আসে আর জিজ্ঞেস করে যায়—কী গো, কনের বাড়ির ঝি, তুমি খেয়েছ তো?

—হ্যাঁ মা, খেয়েছি—

তবু ছাড়ে না তারা। বলে—পেট ভরে খেয়েছ তো মেয়ে, শেষকালে যেন বেয়াই মশাইকে গিয়ে আবার নিন্দে কোর না—

খেতে বসার পর সবাই বার বার জিজ্ঞেস করেছিল—হ্যাঁ গো মেয়ে, আব একটা পানতুয়া দিই?

একটা নিলে তো আর একটা জোর করে পাতে দিয়ে দেয়। দিদিমণির শ্বশুর-বাড়িতে এসে যেন অভুক্ত না থাকে কনের বাড়ির ঝি। তারপরে শাঁখ বেজে উঠলো। অনেক অনেক বার। লোকজন খেয়ে যেতে যেতে রাত গভীর হয়ে এল। তখন ফুলশয্যার আরম্ভ। জামাইবাবু সেজেগুজে শোবার ঘরে ঢুকলো। তার আগেই দিদিমণিকে সাজিয়ে-গুজিয়ে রেখে দিয়ে এসেছে ননদরা।

—ওগো, কনের বাড়ির ঝি, তুমি বিধবা মানুষ, তুমি কেন বাছা এখেনে?

বাদামী তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে এল। তখন ফুলশয্যার ঘরের মধ্যেই সবাই হুড়োহুড়ি করছে। বাদামী বারান্দার এককোণে একটা জায়গা বেছে নিয়ে সেখানেই দেহটা কুঁকড়ে শুয়ে পড়লো। আর তারপর কখন অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে তার খেয়াল ছিল না।......

হঠাৎ কে যেন ডাকলে—বাদামী, বাদামী—

তখন কত রাত কে জানে। সারা বাড়ির গোলমাল সমস্ত থেমে গেছে। বারান্দার বাইরে শুধু একটা জোরালো আলো তখনও জ্বলছে।

—বাদামী, ও বাদামী, ওঠ্ ওঠ্—

হঠাৎ ভালো করে দেখতেই নজরে পড়লো—দিদিমণি—

—দিদিমণি, কী হলো? তুমি?

কার যেন পায়ের শব্দে বাদামীর পাতলা ঘুমটা আবার ভেঙে গেল।

বললে—কে?

চমকে উঠেছে সুখদা। সুখদা তাড়াতাড়ি আবার ঘর থেকে বেরিয়ে অন্ধকার বারান্দায় এসে পড়লো। সুখদার ঘরের সামনে কালীকান্ত চুপ করে দাঁড়িয়েছিল।

সুখদাকে দেখেই বললে—কী হলো, ফিরে এলে যে? চাবি পেলে?

সুখদা বললে—না, ফিরে এলুম—

—কেন, ফিরে এলে কেন?

সুখদা বললে—ভয় করতে লাগলো—

—কেন, ভয় করলো কেন?

সুখদা বললে—বাদামী জেগে আছে মনে হলো—

কালীকান্ত বললে—দূর, ও একটা আশি বছরের বুড়ী, চোখে দেখতে পায় না, ওকে কীসের ভয়? তুমি যাও, আর একবার যাও, ছোড়দা আমাকে অনেক করে বলে গেছে, যাও, যাও, ভয় পেও না, যাও, ভয় কী, আমি তো আছি—

সুখদা আবার মা-মণির ঘরের দিকে এগোতে লাগলো—

প্রথমদিকে সুখদা একটু ভয় পেয়েছিল। ঘরে ঢুকেও যেন সাহস পাচ্ছিল না। একে অন্ধকার মাঝ-রাত, তার ওপরে উদ্বেগ, সব মিলিয়ে আবার তাকে আরো আড়ষ্ট করে তুললো। আবার ফিরে এল সে।

নিজের ঘরের সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল কালীকান্ত। সুখদাকে আবার ফিরতে দেখে রেগে গেল।

বললে—এ কি, আবার ফিরে এলে তুমি?

সুখদা বললে—আমি পারবো না—

—পারবে না মানে?

—আমার ভয় করছে!

—আবার ওই এক কথা বলে! টাকা কি আমি আমার জন্যে নিচ্ছি। টাকা তো তোমার জন্যেই দরকার। এই যে তোমার মা-মণি, এই মা-মণি যদি আজ

মারা যায় তখন টাকাগুলো তো সব ওই শালা সুরেনই নেবে। কোথাকার কে ঠিক নেই, উড়ে এসে এখানে জুড়ে বসেছে! লাখ লাখ টাকা তার কপালেই নাচছে! অথচ ন্যায্যতঃ তো সব তোমারই পাওনা। তুমিই তো মা-মণির সব সম্পত্তির হকদার।

সুখদা বাধা দিয়ে বললে—কিন্তু সুরেন কি করে সব সম্পত্তি পাবে?

কালীকান্ত বললে—তবে আর বলছি কী তোমাকে! তোমার মন সরল তাই সবাইকে সরল ভাবো। ভেতরে ভেতরে যে ওই ম্যানেজার বেটা সব পাকা বন্দোবস্ত করে ফেলেছে?

—কী বন্দোবস্ত করেছে?

কালীকান্ত বললে—তোমাকে তো কতবার বলেছি সে সব কথা! সমস্ত সম্পত্তি উইল করে ম্যানেজার নিজের ভাগ্নের নামে লিখিয়ে নিয়েছে।

—কিন্তু সে-উইল তো তোমার ছোড়দা চুরি করে এনেছিল!

কালীকান্ত সুখদার বোকামি দেখে আরো বিরক্ত হয়ে গেল। বললে—আরে দূর, ম্যানেজার কি অত কাঁচা ছেলে? সে আবার ডুপ্লিকেট করিয়ে নিয়েছে। মা-মণি যখন টেঁসে যাবে, তখন সেই উইলখানাই ম্যানেজার বার করবে!

—তা তোমার ছোড়দা আছে কী করতে? ঘাস খেতে?

কালীকান্ত বললে—এই জন্যেই তো বলে মেয়েমানুষের বুদ্ধি। তোমার বুদ্ধিতে চললেই কাজ হাসিল হয়েছে আর কি! তখন ছোড়দাও আবার একটা ডুপ্লিকেট উইল বার করবে। ছোড়দা যা করবে তা করবেই। তা নিয়ে তোমায় মাথা ঘামাতে হবে না। এখন কাঁচা টাকা আর গয়নাগুলোর জন্যেই তো যত ভাবনা। সেইগুলো এই অবস্থায় হাতিয়ে ফেলতে পারলে অর্ধেক কাজ ফতে! এইটুকুন সামান্য কাজ তোমার দ্বারা হবে না? পট্ করে যদি আজ তোমার মা-মণি মারা যায় তো তখন কী সর্বনাশ হবে বল তো? তখন আমরা কোথায় দাঁড়াবো তা ভেবেছ?

—তা মা-মণি মারা গেলে কি ওরা আমাদের তাড়িয়ে দেবে?

—তা দেবে না তো কি তোমাকে জামাই-আদরে এখানে বসিয়ে বসিয়ে মাছের মুড়ো খাওয়াবে?

—আমি তাহলে কী করবো?

কালীকান্ত বললে—কী আর করবে। আমি যা বলছি তাই-ই করবে! আমি যা বলছি তোমার ভালোর জন্যেই বলছি। আমি পুরুষ মানুষ, আমি যেমন করে হোক নিজের একলার পেটের ব্যবস্থা করে ফেলতে পারি। কিন্তু তোমার কথা আলাদা। তুমি হলে গিয়ে যাকে বলে মেয়েমানুষ। ধরো আমি যদি কাল মরেই যাই, তখন তুমি তো বিধবা হবে? হবে কিনা বলো?

সুখদা বললে—তা তো হবোই!

—তোমার সঙ্গে তো আমার বিয়ে হয়েছে। মন্ত্র পড়ে আগুন সাক্ষী রেখেই তো বিয়ে হয়েছে।

—তা তো হয়েছে! আমি কি বলছি হয়নি?

কালীকান্ত বললে—তবে? তবে কেন নিজের ভালোটা নিজে বুঝছো না? আমি যখন থাকবো না, তখন কে তোমাকে দেখবে?

—কেন, তুমি দেখবে না?

—আরে, আবার যত বাজে কথা বলে! যদ্দিন আমি আছি তদ্দিন তো

দেখবোই। আমি তোমাকে বিয়ে করেছি আর তোমায় দেখবো না? কথাটা হচ্ছে, আমি যখন থাকবো না, তখন তোমাকে কে দেখবে! সেই কথাটা একবার ভেবে দেখেছ কখনও? আমি তো কেবল তোমার জন্যে ভেবেই এত কথা বলছি। নইলে আমি বেটা ছেলে, আমার আর কী রে বাবা! আমি একলার জন্যে কি কখনও কারো পরোয়া করি? তুমি মা-মণির সিন্দুক থেকে গয়না-টয়না যা কিছু আনবে সব তোমারই থাকবে, আমি তাতে হাতও দিতে যাবো না। আমি এতদিন আছি কিন্তু তোমাকে কি কিছু দিতে পেরেছি! একটা শাড়ি কি গয়না কিছুই তো তোমাকে হাতে তুলে দিতে পারিনি! আমার কি দুঃখ হয় না ভাবো? আমার কি তোমাকে কিছু দিতে ইচ্ছে করে না?

সুখদা যেন তবু দ্বিধা করতে লাগলো।

বললে—শেষকালে কিছু হবে না তো?

কালীকান্ত বললে—কী আবার হবে? হবেটা আবার কী? আর হলে তো আমি আছি। আমি থাকতে তোমার ভয় কী?

সুখদা এবার যেন একটু সাহস পেলে। আস্তে আস্তে আবার বারান্দা দিয়ে মা-মণির ঘরের দিকে এগোতে লাগলো। সমস্ত শরীরটা কাঁপছে তার তখন। সমস্ত দিনটায় বিশ্রাম নেই। এত রাত হয়ে গেল, তবু চোখে ঘুম নেই এতটুকু। একবার পেছনে চেয়ে দেখলে সে। পেছন থেকে কালীকান্ত সামনে এগিয়ে যাবার জন্যে হাত তুলে ইঙ্গিত করছে। সুখদা আস্তে আস্তে গিয়ে ঢুকলো মা-মণির ঘরের ভেতরে।

আর তারপর সেই মা-মণির মাথার কাছে দেয়ালের সঙ্গে গাঁথা সেই সিন্দুকটা। সেই দিকে একবার চেয়ে দেখলে সুখদা। বাদামী তখনও ঘুমের ঘোরে যেন বিড়বিড় করে কী বকছে। মা-মণির চোখ দুটোও বোঁজা। মা-মণির কাপড়ের আঁচলটার খানিকটা বালিশের তলায় চাপা পড়েছে। তার শেষ প্রান্তেই চাবির গোছাটা বাঁধা আছে।

সুখদা পায়ে পায়ে সেই মাথার বালিশের দিকেই এগিয়ে গেল।

কালীকান্তর বুকের ভেতরটা তখন উত্তেজনায় ঢিপ্ ঢিপ্ করছে। মেয়েমানুষের বুদ্ধির ওপরে কোনও দিনই আস্থা নেই কালীকান্তর। তবু মেয়েমানুষ না হলে এ-কাজ সম্ভবও নয়। ছটফট করতে লাগলো কালীকান্ত। কাজ তাড়াতাড়ি হাসিল হয়ে গেলেই যেন সে বাঁচে। তারপর ঠন্‌ঠনের কালীবাড়িতে গিয়ে পাঁচ সিকের পুজো দিয়ে আসতে হবে। মা-কালীর দয়া না হলে কোনও কিছুই হবার উপায় নেই। মা, তুমিই আমার ভরসা মা! তুমি ছাড়া জগতে আমার কেউই নেই। আমি বড় গরীব মা। তোমাকে খুশী করবার মত টাকাকড়ি আমার নেই। আমি বড় দুঃখী। অনেক প্ল্যান করে আমি সুখদাকে বিয়ে করেছি মা! এ প্ল্যান যদি ভেস্তে যায় মা তো আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে। আমি বেঘোরে মারা পড়বো মা! তুমিই আমার একমাত্র ভরসা মা। লোকে তোমাকে পতিতপাবনী বলে। আমার মত পতিতকে পাবন না করলে আর কাকে করবে মা, আমার যে আর কেউ নেই—

এক হাতে একটা জ্বলন্ত সিগারেট্ আর একটা হাত যতক্ষণ পারে একমনে মা'কে ডাকতে ডাকতে কপালে ঠেকাতে লাগল কালীকান্ত।

কিন্তু হঠাৎ একটা শব্দে কালীকান্ত চমকে উঠলো।

—চোর, চোর—

মেয়েলি গলার আওয়াজ! চিৎকারটার সঙ্গে সঙ্গে যেন সারা বাড়িতে

একটা প্রতিধ্বনি উঠলো—চোর, চোর, চোর—

আর তার পরেই একটা পুরুষালি গলা।

—কই, কোথায় গেল চোর—কোথায়? কোনদিকে?

যেন মনে হলো ম্যানেজার ভূপতি ভাদুড়ীর গলার আওয়াজ। ম্যানেজার যেন জানতো সব। যেন তাই ওত পেতে ছিল কাছাকাছি কোথাও। সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামার পায়ের দুপ্-দাপ্ শব্দ। ফটাফট কয়েকটা আলো জ্বলে উঠলো। সুখদা কি তাহলে ধরা পড়ে গেল?

কালীকান্তর গা ছমছম করতে লাগলো ভয়ে। যদি সুখদা ধরা পড়ে থাকে তাহলে তো কালীকান্তকেও সবাই দায়ী করবে! এর পর হয়ত পুলিশ আসবে, দারোগা আসবে। সুখদার সঙ্গে কালীকান্তকেও দায়ী করবে তারা।

হাতের জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরোটা পা দিয়ে মাড়িয়ে দিয়ে সে নিজের কর্তব্য ঠিক করে নিলে। তাড়াতাড়ি সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গিয়ে দুড়-দুড় করে নিচে নামতে লাগলো আর সকলের সঙ্গে গলা মিলিয়ে চেঁচাতে লাগলো—চোর—চোর—

নিচের দিক থেকে ওপরে উঠছিল ধনঞ্জয়। কালীকান্তকে নামতে দেখে জিজ্ঞেস করলে—কী হয়েছে জামাইবাবু, কী হয়েছে?

কালীকান্তর তখন মাথার ঠিক নেই। নামতে নামতেই বললে—আরে ভাই, সর্বনাশ হয়ে গেছে, সব চুরি হয়ে গেছে—

—আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

—যাচ্ছি থানায়। পুলিশ ডাকতে--

বলে আরো তাড়াতাড়ি নিচেয় নেমে গেল। তারপর উঠোন পেরিয়ে সদর গেট। সদর গেট খোলা। খোলা কেন? —এই বাহাদুর সিং, বাহাদুর সিং! কাঁহা গিয়া? সদর-গেট খুলে রেখে ঘুমোন হচ্ছে! এই জন্যেই তো বাড়ির মধ্যে চোর-ডাকাত ঢোকে।

কোথা থেকে বাহাদুর সিং বেরিয়ে এসেই সেলাম করলে।

তাকে দেখেই কালীকান্তর তম্বি! --গেট চাবি-বন্ধ নেই কেন? আমি রাত্তিরে অত করে চাবি-বন্ধ করে রাখতে বললুম, আর তবু খুলকে রাখা?

বাহাদুর সিং বললে হুজুর চাবি বন্ধই ছিল, ম্যানেজারবাবু যে আভি বেরিয়ে গেলেন।

—ম্যানেজারবাবু? বেরিয়ে গেলেন? কোথায়?

—থানায়!

বুকটা হিম হয়ে গেল বাহাদুর সিং-এর কথায়। আর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে সাহস হলো না। এখনই হয়তো এ-পাড়ার ও-সি এসে হাজির হবে। এসে কালীকান্তকেও অ্যারেণ্ট করবে। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিয়ে কালীকান্ত একেবারে ট্রাম-রাস্তার ওপরে পড়লো। তারপর কলকাতার সেই জনহীন মাঝ-রাত। ট্রাম-রাস্তাও ফাঁকা। খানিকটা যেতেই মনে হলো, কয়েকটা ছেলে-ছোকরা যেন কী করছে। তাদের হাতে কাগজ। এত রাত্তিরে এরা কী করছে এখানে!

ছেলেরা দেয়ালের গায়ে একটা বড় সাইজের কাগজ এঁটে দিলে আঠা দিয়ে। কালীকান্ত পড়তে লাগলো লেখাগুলোঃ

'আগামীকাল অপরাহ্নে
মেহনতী জনতার দাবী আদায় করতে
দলে দলে মিছিলে যোগদান করুন।

কালীকান্ত কিছু বুঝতে পারলে না। একজন ছেলের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে—এ কীসের ভাই? কীসের মিছিল?

পাণ্ডা গোছের একজন ছেলে অত নির্জন রাত্রে কালীকান্তকে দেখে অবাক হয়ে গেছে।

—আমাদের পার্টির পোষ্টার।

—তোমাদের কী পার্টি ভাই?

ছেলেটা রেগে গেল। বললে—আপনি কোন্ দেশের লোক? থাকেন কোথায়?

কালীকান্ত বললে—কেন, কলকাতায়। জন্ম এস্তোক কলকাতায় থাকি—

ছেলেদের তখন অনেক কাজ। তাদের তখনও অনেক পোষ্টার মারতে হবে! বললে—কলকাতায় থেকেও যদি না বুঝতে পারেন তবে আর আপনার বুঝে দরকার নেই মশাই।

বলে ছোকরার দল চলে যাচ্ছিল।

কালীকান্ত এগিয়ে গেল। বললে—ও ভাই, শোন শোন—কী বললে; আর একবার বলো?

পাণ্ডা ছেলেটা বললে—বললুম, আপনাদের মত লোকরা আছে বলেই এতদিন কংগ্রেস চুটিয়ে রাজত্ব করে চলেছে। নইলে কবে টেঁসে যেত। কাল দেখবেন বিকেলবেলা কী হবে?

—কী হবে?

ছেলেটা বললে—দেখবেন কী হবে! রক্তগঙ্গা ব'য়ে যাবে—

বলে ছেলেটা আর দাঁড়ালো না। দৌড়তে দৌড়তে দল-বল নিয়ে আরো দূরে চলে গেল। কালীকান্তও বাঁ দিকে গ্রে-স্ট্রীটের মধ্যে ঢুকে পড়লো। দেখলে, সে-রাস্তার দেয়ালেও সব পোষ্টার মারা রয়েছে। সেই একই পোষ্টার—

'আগামীকাল অপরাহ্ণে
মেহনতী জনতার দাবী আদায় করতে
দলে দলে মিছিলে যোগদান করুন।'

কালীকান্ত বুঝে নিলে যে, ছোকরাগুলোর কোনও কাজ নেই। আরে, কাজ না থাকে তো রাত্তিরে বাড়িতে গিয়ে ঘুমো। আর ঘুম যদি না আসে মাল খা। মাল খেয়ে অসাড় হয়ে পড়ে থাক। এ শালার ছোকরাদের দিয়ে কোনও কাজ হবে না। এ-যুগের ছোকরারা সব ষাঁড়ের গোবর হয়েছে। রাত জেগে জেগে পোষ্টার মারছে। তোরা কংগ্রেসের সঙ্গে পারবি?

তারপর ডানদিকের গলিটার মধ্যে ঢুকে পড়লো। ঢুকে একটা বাড়ির সামনে এসে দরজায় ধাক্কা দিতে লাগল—ছোড়দা, ছোড়দা—

অনেক ডাকাডাকির পর ভেতর থেকে দরজা খুলে বেরিয়ে এল নরেশ দত্ত।

বললে—কী রে, এত রাত্তিরে? কম্ম হাসিল?

কালীকান্ত বললে—না ছোড়দা, সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে—

—সে কী রে? কী সর্বনাশ হলো?

কালীকান্ত বললে—একেবারে কেলেঙ্কারি কাণ্ড!

নরেশ দত্ত বললে—আয় ভেতরে আয়, দরজা বন্ধ করে দে, ভেতরে এসে বল—

কালীকান্ত ঘরের ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলে!

দেবেশদের পার্টি-অফিসে সকাল থেকেই সেদিন সাজ-সাজ রব। হাজার হাজার লোক এসে জড়ো হবে, তার তোড়জোড় চলছে। প্রত্যেককে রুটি আর আলুর দম দিতে হবে। যারা রুটি-আলুর দম পাবে না, তারা পাবে একটা করে কোয়ার্টার পাউন্ড পাঁউরুটি। পরিবেশন ছাড়া টাকারও দরকার। খাবারটা জোগাড় হবে বাড়ি-বাড়ি। বাকিটা চাঁদা।

তা চাঁদাই কি সহজে ওঠে? কংগ্রেসকে চাঁদা দেয় কলকাতার বড় বড় ফার্ম। এ-পার্টিকে কে দেবে? এ-পার্টির বোনাফাইডি কী? এ-পার্টির কর্তারা ক'বছর জেল খেটেছে?

কিন্তু সন্দীপবাবু এ-সব না ভেবেই একদিন পার্টির পত্তন করেছিল। হুগলীর একটা কলেজে চাকরি করতে করতেই মাথায় আইডিয়াটা এসেছিল তার। তারপর এখানে-ওখানে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ানো। সন্দীপবাবুর বক্তৃতা হলেই সভা ভিড়ে ভর্তি হয়ে যেত। সে বক্তৃতায় লোকে বুঝতে পারতো, কংগ্রেস কেবল তাদের ভাঁওতা দিয়ে চলেছে বরাবর। কবে একদিন কংগ্রেস ঘি খেয়েছিল, এখনও হাতের গন্ধে তার প্রমাণ রেখে দিয়েছে। মহাত্মা গান্ধী আর সি. আর. দাশের নাম ভাঙিয়েই এতদিন তারা চালাচ্ছে। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে, তত মতলববাজ মানুষের ভিড় বেড়েছে সেখানে। এ সব কথাই মীটিং-এ প্রথম প্রথম বলতে আরম্ভ করেন সন্দীপবাবু। বেশির ভাগ লোকই তখন কথাগুলো মন দিয়ে শুনতো। কিন্তু লোকে ঠাট্টা-তামাশা করতো। বলতো—শুধু কি কথায় চিঁড়ে ভেজে হে? কাজ করা চাই। কংগ্রেসকে হঠানো অত সোজা নয় বাছাধন। পুলিশ-টুলিশ সব তো ওদের হাতে।

কিন্তু ওরিয়েণ্ট সেমিনারির পূর্ণবাবু দলে আসার পর থেকেই দলটা আসলে জমে উঠলো। দুজনেই ব্যাচিলর। ক্যারেকটারও ভালো। দেশে তো অনেকগুলো দল! দল থাকুক, তারই মধ্যে নিজেদের জায়গা করে নিতে হবে। আজ না হোক. কাল হবে। এবারকার ভোটে যদি জিততে না পারা যায় তো পরের বারে হবে। পাঁচ বছর পর পর তো ইলেকশান হবেই। এখন থেকে সেই চেষ্টা করে যাওয়াই ভালো।

ভোর থেকেই সবাই যে-যার কাজে বেরিয়ে গেছে। ক'দিন ধরেই খাটছে সবাই। ভলাণ্টিয়াররা তো কাল সারা রাত ধরে কলকাতার দেয়ালে-দেয়ালে পোস্টার মেরেছে। গভর্ণমেণ্ট, পুলিশ, ক্যাবিনেট সবাই উৎকর্ণ হয়ে অপেক্ষা করছে, দেখবে কী হয় আজ—

হঠাৎ আশুতোষ এসে বললে—সন্দীপদা, একটি মেয়ে এসে দেবেশদাকে খুঁজছে—

—কে মেয়েটি? কোত্থেকে আসছে?

আশুতোষ বললে—তা জানি না। গাড়ি করে এসেছে, গাড়ির ভেতরে বসে আছে—

সন্দীপদা বললে—বল্ গে, দেবেশ নেই এখন—

ছেলেটা চলে গেল। সন্দীপদা আবার হাতের কাজগুলো করতে লাগলো। কিন্তু হঠাৎ আশুতোষ আবার ফিরে এসেছে। সঙ্গে একজন মহিলা।

আশুতোষ বললে—সন্দীপদা, ইনি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।

সন্দীপবাবু ভালো করে চেয়ে দেখলে মেয়েটির দিকে। বেশ বড়লোকের মেয়ে বলে মনে হলো। দামী শাড়ি-ব্লাউজ-জুতো পরে এসেছে।

সন্দীপবাবু জিজ্ঞেস করলে—কী চান আপনি?

পমিলি একটা চেয়ারে বসলো। বললে—আমি আপনাদের পার্টির দেবেশ-বাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলুম। শুনলুম তিনি এখন নেই। তাই আপনার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি। আপনি আমায় একটা সাহায্য করতে পারেন?

—কী সাহায্য, বলুন!

—আমি সুরেন্দ্রনাথ সান্যাল নামে একজন ছেলের খোঁজ নিতে এসেছি। সে দেবেশবাবুর বন্ধু। ক'দিন থেকে তাকে বাড়িতে পাওয়া যাচ্ছে না। বাড়ির লোকেরা চারদিকে খুব খোঁজাখুঁজি করছে। থানায় খবর দিয়েছে। তার মামা কাল আমার কাছে এসে অনেক কান্নাকাটি করে গেছে। তিনি খুব ভাবছেন। আপনি কি বলতে পারেন তিনি আপনাদের পার্টি-অফিসে আছেন কিনা?

সন্দীপ সিংহ বহুদিন ধরে পলিটিক্স করছেন। পার্টির কাজ করতে গিয়ে এ-রকম ধরনের ব্যাপারে অনেকবার মাথা ঘামাতে হয়েছে তাকে। মেয়েটি ভোর বেলাই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে। তবু সেজেছে খুব। গা থেকে মিষ্টি সেন্টের গন্ধ বেরোচ্ছে একটা।

বললে—আজকে আমাদের পার্টির লোকরা অনেকেই নেই এখানে। যারা রয়েছে তারা প্রায় সবাই কলকাতার বাইরে থেকে এসেছে।

পমিলি বললে—আমি তা জানি। সেই জন্যেই তো আমি এত ভোরে উঠে এসেছি। ভেবেছিলাম ঘুম থেকে ওঠবার আগেই আমি সুরেনকে ধরবো।

সন্দীপবাবু জিজ্ঞেস করলে—কিন্তু সে ছেলেটি কি আমাদের পার্টির মেম্বার?

পমিলি বললে—তা বলতে পারি না। হতেও পারে মেম্বার। তার বাবা-মা কেউ নেই, এখানে পরের বাড়িতে তার মামা তাকে ছোটবেলা থেকে মানুষ করেছে। সে যদি পার্টিতে ঢোকে তো কী-রকম সর্বনাশ হবে বলুন তো?

সন্দীপবাবু হাসলো। বললে—কেন, আমাদের পার্টিতে ঢুকলে কী সকলের সর্বনাশ হয়?

—সর্বনাশ হয় না? আপনি কী বলছেন?

সন্দীপবাবু বললে—আর বাপ-মা-ভাইয়ের আওতায় থাকলেই বুঝি সবাই মানুষ হয়?

পমিলি বললে—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তাই হয়।

সন্দীপবাবু আবার হাসলো। বললে—আপনি তাহলে ঠিক জানেন না হয়ত। আমি কিন্তু বাপ-মা-ভাইয়ের আওতায় থেকেও অনেককে চোর-ডাকাত মাতাল-ব্ল্যাক্‌মার্কেটিয়ার হতে দেখেছি। আর তা ছাড়া আজকাল সব বাপ-মা'রাই কি আর আদর্শ বাপ-মা আছে? তাদের মধ্যেও তো আজকাল ইভিল্ ঢুকেছে। সেরকম ক্ষেত্রে সেই বাপ-মা'র সংস্রব ছেড়ে আসাই তো মঙ্গল—

পমিলি বললে—আপনার সঙ্গে আমি তর্ক করতে আসিনি। এর মামা সে-রকম মানুষ নয়, চোর-ডাকাত-মাতাল-ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার কিছু নয়।

সন্দীপবাবু বললে—তা নয় সেটা তো খুব ভালো কথা। কিন্তু চোর-ডাকাত-মাতালের সমাজে যারা ভালো-মানুষ সেজে তা সহ্য করে তাও তো

খারাপ। চুরি-ডাকাতি-মাতলামির প্রশ্রয় দেওয়াও তো চোর-ডাকাত-মাতালের সামিল—

পমিলি উঠলো এবার।

বললে—অত কথা শুনতে আপনার কাছে আমি আসিনি। সুরেন এখানে নেই, চুকে গেল কথা—

কথাগুলো বলেই পমিলি বাইরের দিকে চলে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ ঘরের মধ্যে প্রজেশকে ঢুকতে দেখে অবাক হয়ে থমকে দাঁড়ালো। খানিকক্ষণ দুজনের মুখেই কোনও কথা নেই।

কিন্তু নিস্তব্ধতা ভাঙলো সন্দীপবাবু।

বললে—এ কি প্রজেশ, তুমি?

প্রজেশ বললে—সন্দীপদা, আমাকে দেখে আপনি খুব অবাক হয়ে গেছেন নিশ্চয়ই—

সন্দীপবাবু বললে—সে তো হয়েইছি, কিন্তু ব্যাপারটা কী বল তো? পুণ্যশ্লোকবাবুর কোনও সংবাদ আছে নাকি?

প্রজেশ বললে—না সন্দীপদা, সে-রকম কোনও মতলব নেই। তাছাড়া, আপনাদেব আজকে যে প্রোগ্রাম, তা বদলে দেবার কোনও ইচ্ছে নেই পুণ্যশ্লোকবাবুর। আমি এখানে বাধ্য হয়ে এসেছি। এসেছি এই পমিলির জন্যে—

—এ'র নাম পমিলি বুঝি?

—আপনি চেনেন না একে? এখনও পরিচয় হয়নি আপনার সঙ্গে?

সন্দীপবাবু বললে—ইনি কে?

প্রজেশ সেন অবাক হয়ে গেল। পমিলির দিকে চেয়ে বললে—সে কী, এখনও তুমি তোমার পরিচয়টাই দাওনি?

পমিলি এতক্ষণ পরে কথা বললে—তুমি কী করতে এখানে এসেছ?

প্রজেশ বললে—তোমার জন্যে!

পমিলি বললে—আমাব জন্যে তোমাকে কে আসতে বলেছে এখানে?

প্রজেশ বললে—কেউ আসতে বলবে কেন? আমার নিজের দায়িত্বেই আমি এখানে এসেছি। ভোরবেলা তুমি বাড়ি থেকে চলে এসেছ, অথচ কেউ তোমার মুভমেণ্ট্ জানে না। চলো—

—তা আমার মুভমেণ্ট কেউ যদি না-ই জানে তো তুমিই বা জানলে কী করে?

প্রজেশ বললে—তুমি যে এখানে আসবে তা আমি ভাবতেই পারিনি।

পমিলি বললে—তুমি কি ভেবেছ নিজের ইচ্ছে মত কোথাও যাওয়ার স্বাধীনতা আমার নেই? আমি এসেছিলুম সুরেনের খোঁজ করতে—জানো সে বাড়ি ছেড়ে আজ ক'দিন কোথায় চলে গেছে!

প্রজেশ বললে—কিন্তু তাকে খোঁজবার তো অনেক লোক আছে। যাবা তার নিজের লোক তারা সে-খোঁজ করবে। তুমি কেন? তুমি কি তার আপনার কেউ?

সন্দীপবাবু এতক্ষণ এই নাটকীয় ব্যাপারটার কিছু বুঝতে পারছিল না। এবাব সে তার চেয়ার ছেড়ে উঠে এল।

বললে—কী ব্যাপার বল তো প্রজেশ?

প্রজেশ বললে—পরে বলবো, এখন আমি চলি। আজকে তো আপনাদের বিরাট ব্যাপার, অনেক কাজ আপনার।

আশুতোষ এতক্ষণ দেখছিল সব, শুনছিল সব। প্রজেশ আর পমিলি চলে

যাবার পর সন্দীপদার দিকে চেয়ে বললে—এরা কারা সন্দীপদা?

সন্দীপদা সেদিকে কান না দিয়ে বললে—কে জানে কোন্ পার্টির! ওই প্রজেশ তো ছিল এককালে কংগ্রেসে—

আশুতোষ বললে—কংগ্রেসের লোক, এখানে এসেছিল কেন?

সন্দীপদা বললে—আসুক না, তাতে আমাদের ক্ষতিটা কী?

তারপর একটু থেমে বললে—আমাদের এখানে সুরেন সান্যাল বলে কেউ আছে? তুই চিনিস তাকে?

আশুতোষ বললে—আছে। আছে নয়, ছিল—

—কে সে? কোথায়?

আশুতোষ বললে—সে দেবেশদার বন্ধু, ক্লাশফ্রেন্ড, এককালে এককাশে দুজনে পড়েছে—

– তা তাকে খুঁজতে মেয়েটা এখানে এল কেন? মেয়েটার সঙ্গে তার কীসের সম্পর্ক? ও কী করে জানলে যে সে এখানে আসে?

তারপর হঠাৎ টেলিফোনের রিং শুরু হলো। সন্দীপদা সোজা নিজের টেবিলে গিয়ে রিসিভারটা তুলে নিলে।

১৯৪৭ সাল থেকেই জোরদার আন্দোলন শুরু হয়েছিল। তখন সন্দীপ সিংহ লেখাপড়া করছে কলেজে। রাশিয়ার খবরগুলো ছেলেদের মহলে এসে পৌঁছোবার সঙ্গে সঙ্গে সবাই মিলে সেগুলো গিলতো। তখন থেকেই দল গড়ে উঠেছিল ছেলে-মহলে। তখন থেকেই শুরু হয়েছিল লেনিন-ট্রট্স্কি-স্টালিনের লেখাগুলো পড়া। ব্রিটিশরা থাকার সময় ও-সব খুব লুকিয়ে লুকিয়ে চলতো। সকলের চোখের আড়ালে। কিন্তু যেদিন থেকে ব্রিটিশরা চলে গেল সেইদিন থেকেই নতুন করে সব পার্টির পত্তন হলো। ফরওয়ার্ড ব্লক আগেই ছিল। কমিউনিষ্ট পার্টিও ছিল। কিন্তু তেমন জোরদার ছিল না তাদের ক্রিয়াকলাপ।

কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা কংগ্রেস। আর কংগ্রেস মানেই ছিল গান্ধী। মহাত্মা গান্ধী। মহাত্মা গান্ধীর নামটাই ছিল যথেষ্ট। শুধু মহাত্মা গান্ধীর নামটা করলেই লক্ষ লক্ষ মানুষের মাথা শ্রদ্ধায় ভক্তিতে বেদনায় নত হয়ে আসতো।

সবই ঠিক ছিল। কিন্তু গোলমাল বাধালো টুলুরা। টুলুরা এসেছিল পাকিস্থান থেকে। দলে তারা ছিল লক্ষ লক্ষ লোক। একদিকে বাঙলাদেশ, আর একদিকে পাঞ্জাব। তারা আস্তে আস্তে মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো কংগ্রেসের বিরুদ্ধে।

টুলুর বাবা সহদেব সরকার বড় রেগে গেল গান্ধীর ওপর।

বললে—ওই গান্ধী বেটাই যত নষ্টের গোড়া—

পাড়ার পাঁচজন বৃদ্ধ মানুষেরও ওই এক কথা। বললে—ওই বুড়োটাই তো দেশটাকে দুভাগ করলে—

কিন্তু যাকে নিয়ে এত কথা, সে কবে মরে ভূত হয়ে গেছে। একজন হিন্দুই তাকে খুন করেছে গুলি করে। কেউ বলতে লাগলো গান্ধী দেবতা। কিংবা মহাপুরুষ, অবতার। আবার কেউ বলতে লাগলো লোকটা বেনে। হিন্দু-

দের সর্বনাশ করে পাকিস্থান করে দিলে।

পুণ্যশ্লোকবাবু পার্কের মীটিং-এ মীটিং-এ লেকচার দিয়ে বেড়াতে লাগলেন। বলতে লাগলেন—মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ কংগ্রেসেরই আদর্শ। মহাত্মা গান্ধীর স্বপ্নকে আমরা বাস্তব রূপ দিয়েছি। আমরা দামোদর ভ্যালি করপোরেশন করেছি, ভাখ্‌রা নাঙ্গাল বাঁধ করেছি। আমরা ভারতবর্ষের কোটি কোটি ক্ষুধাতুর মানুষের মুখে অন্ন দেবার চেষ্টা করছি, আপনারা কংগ্রেসের পতাকার তলায় এসে অহিংসার শপথ নিন। বন্দে মাতরম্—

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেক পার্টি পার্কে পার্কে মীটিং করতে লাগলো। সব নামে আলাদা। কিন্তু আসলে সবাই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। কারো নাম বলশেভিক পার্টি। কারো নাম সোস্যালিষ্ট পার্টি। আরো কত সব নাম, কত সব দল।

সন্দীপবাবুদের দলটাও ছিল ঠিক এমনি একটা পার্টি।

পূর্ণবাবু সেই মিটিং-এ দাঁড়িয়ে বলতো—আমরা অনেকদিন কংগ্রেসের ভাঁওতায় ভুলেছি। আর ভুলতে চাই না। কংগ্রেস আর সেই মহাত্মা গান্ধী, সি. আর. দাশ, গোখেল-তিলকের কংগ্রেস নেই। এ জওহরলাল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, প্রফুল্ল সেন-এর কংগ্রেস। এ কংগ্রেস বিড়লা-গোয়েঙ্কার দালাল। মেহনতী মানুষ আর ক্ষেত-খামারের চাষী-মজুরের শত্রু। এর নিপাত চাই আমরা।

এমনি করেই আস্তে আস্তে দল ভারি হয়েছে। দলে এসেছে কারখানার মজুর, পাকিস্থানের উদ্বাস্তু, আর স্কুল-কলেজের ছেলেরা। এসেছে দেবেশ, টুলুরা, আর এসেছে উলুবেড়িয়া, ধানবাদ, বারাসত, বীরভূমের লোকজন। তাদের একমাত্র লক্ষ্য কংগ্রেসের শেকড় পর্যন্ত দেশের মাটি থেকে উপড়ে ফেলতে হবে। তবে শান্তি আসবে দেশে। কংগ্রেস যতদিন থাকবে ততদিন বাঙলাদেশের গরীব মানুষদের কোনও ভরসা নেই।

এ হলো ইতিহাস।

কিন্তু ইতিহাস তো কোনও সজীব পদার্থ নয়। এর পেছনে থাকে অনেক যুগের অনেক মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা-ইচ্ছে-অনিচ্ছে-ত্যাগ-তিতিক্ষা। সেই সব মানুষদের কামনা-বাসনাই একদিন পার্টি হয়ে, প্রতিষ্ঠান হয়ে বিপ্লবের রূপ নিয়ে হাজির হয়।

এই উনিশ শো ছাপ্পান্ন সালেই বুঝি সেই বিপ্লব এসে হাজির হলো।

পুণ্যশ্লোকবাবু বড় উত্তেজিত হয়ে কথা বলছিলেন।

বললেন—আজকে লোকে কংগ্রেসকে আর মানতে চায় না, কিন্তু গোয়েঙ্কাজী, আপনিই বলুন, কংগ্রেস কি বাঙালীর কোনও উন্নতি করেনি?

গোয়েঙ্কাজী বললে—উ-সব কমিউনিষ্টদের বাত্ ছেড়ে দিন মিষ্টার রায়। ওরা সব রাশিয়ার দালাল। রাশিয়া থেকে ওদের কাছে টাকা আসে, তা জানেন?

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—ওদের গুণ্ডামী ভাঙতে গভর্ণমেণ্টের এক মিনিটও লাগে না গোয়েঙ্কাজী। এক মিনিটে ওদের আমরা শায়েস্তা করতে পারি—। কিন্তু জওহরলাল নেহরু যে বারণ করেন, সেই হয়েছে মুশকিল—

—কেন? বারণ করেন কেন?

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—ওই তো! ওই জন্যেই তো বলি অত নরম মন নিয়ে প্রাইম-মিনিষ্টারি চলে না। কেবল বলেন—পিপল্‌কে ঘাঁটাবেন না। পিপল্‌ই আমাদের গদীতে বসিয়েছেন, পিপল্‌ই আমাদেব প্রভু। পিপল্‌কে আমাদের হাতে রাখতে হবে। কারণ তারা হলো ভোটার।

—কিন্তু হুজুর, তাহলে পুলিশ-মিলিটারি তুলে দিলেই হয়।

হঠাৎ কানে এল গাড়ির আওয়াজ। পুণ্যশ্লোকবাবু জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে দেখলেন।

পর্মিলি আসছে প্রথম গাড়িতে। আর পেছনে প্রজেশের গাড়ি।

পর্মিলি গাড়ি থেকে নেমেই সোজা সিঁড়ি দিয়ে ওপরের দিকে উঠতে লাগলো।

পুণ্যশ্লোকবাবু ঘর থেকে বেরোলেন। প্রজেশ গাড়ি থেকে নেমে সোজা পুণ্যশ্লোকবাবুর দিকে এগিয়ে এল।

পুণ্যশ্লোকবাবু আগেই বললেন—কোথায় পেলে পর্মিলিকে?

প্রজেশ বললে—আমি যা বলেছিলুম, ঠিক তাই। পূর্ণবাবুদের পার্টি অফিসে গিয়েছিল পর্মিলি!

পুণ্যশ্লোকবাবু চমকে উঠলেন। বললেন—সে কি! ওখানে ও কী করতে গিয়েছিল?

প্রজেশ বললে—তা ঠিক জানি না।

—তা ওখানে গিয়ে তুমি কী দেখলে? কী করছিল ও সেখানে? অফিসে আর কারা ছিল?

—আর বিশেষ কেউই ছিল না। সেই সন্দীপ সিংহের সঙ্গে বসে বসে কথা বলছিল দেখলুম।

—কী কথা বলছিল?

প্রজেশ বললে—তা আমি শুনতে পাইনি। আমি যাবার সঙ্গে সঙ্গে ওদের কথা বন্ধ হয়ে গেল। সন্দীপ সিংহ জিজ্ঞেস করলে, পর্মিলি কে?

—ওকে তাহলে চিনতো না সন্দীপ?

—তাই-ই তো মনে হলো।

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—যদি চেনাশোনা না-ই থাকবে তবে পর্মিলি ওখানে গিয়েছে কী করতে?

প্রজেশ বললে—আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে সেই আমাদের সুরেনের খোঁজে। সে তো ক'দিন ধরে বাড়ি থেকে মিসিং—

—তা তার জন্যে ওর অত ভাবনা কেন? সে ওর কে?

প্রজেশ প্রথমে চুপ করে রইল। তারপর বললে—তা আমি জানি না।

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—তুমি একটু দাঁড়াও।

বলে আবার নিজের অফিস-ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। গোয়েঙ্কাজী তখনও বসেছিল সেই একই চেয়ারে।

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—গোয়েঙ্কাজী, আজকে আপনি আসুন, আজকে আমার খুব কাজ। আমি এখুনি আবার রাইটার্স বিল্ডিং-এ যাবো। আজকে ইমপরট্যাণ্ট ক্যাবিনেট মিটিং আছে—

গোয়েঙ্কাজী উঠলো। বললে—ঠিক আছে, আমি তাহলে পরে আসবো—

গোয়েঙ্কাজী চলে যেতেই পুণ্যশ্লোকবাবু আবার বাইরে এলেন। তারপর প্রজেশকে আবার দাঁড়াতে বলে ওপরে গিয়ে উঠলেন। উঠে একেবারে সোজা গিয়ে ঢুকলেন পর্মিলির ঘরে।

পর্মিলি তখন ঘরে গিয়ে সবে পৌঁচেছে। পেছন থেকে পুণ্যশ্লোকবাবু গম্ভীর গলায় ডাকলেন—পর্মিলি—

পর্মিলি বোধ হয় এর জন্যে তৈরিই ছিল। পেছন ফিরে পুণ্যশ্লোকবাবুর

মুখোমুখি দাঁড়ালো।

পুণ্যশ্লোকবাবু জিজ্ঞেস করলেন—এত ভোরে তুমি কোথায় গিয়েছিলে?

পর্মিলি বললে—প্রজেশের কাছে তুমি তো সব শুনেছ?

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—আমি যা বলছি তার উত্তর দাও—

পর্মিলি বললে—কেন, প্রজেশের কথায় কি তোমার বিশ্বাস হয়নি?

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—প্রজেশের কথাই যদি সত্যি হয়, তাহলে আমারও জিজ্ঞেস করবার আছে, তোমার কী মতলব!

পর্মিলি বললে—তোমার যেমন অধিকার আছে, তেমনি আমারও অধিকার আছে যেখানে খুশী যাবার।

—এই কি আমার কথার জবাব হলো?

পর্মিলি যেন ঝগড়া করবার জন্যে তৈরিই ছিল। বললে—জবাব না দেবার অধিকারও তো আমার আছে। না, সে অধিকারও আমার নেই?

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—সোজা ভাষায় সহজ করে কথা বলো।

পর্মিলি বললে—তা তুমিই কি সহজ করে কথা বলছো?

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—এবার সহজ করেই কথা বলছি। তুমি সন্দীপের অফিসে গিয়েছিলে কেন? জানো না, তুমি জানো না তারা কংগ্রেসের এগেন্‌স্টে?

পর্মিলি বললে—কে কার এগেন্‌স্টে তা আমার জেনে দরকার নেই। কিন্তু মানুষ মানুষের কাছেও যেতে পারবে না, এই-ই কি তুমি বলতে চাও?

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—কিন্তু তুমি জানো ওরা সামনের ইলেকশানে আমার বিরুদ্ধে পূর্ণবাবুকে দাঁড় করিয়েছে? সেই পূর্ণ বিশ্বাস, যে আমার স্কুলে দেড়শো টাকা মাইনের মাস্টারি করেছে।

পর্মিলি বললে—সে সবাই জানে, সবাই জানে আমরা বড়লোক। সবাই জানে তোমার অনেক টাকা!

—দেখ!

পুণ্যশ্লোকবাবু একটা চেয়ারে বসে পড়লেন। বললেন—তুমি খুব এক্‌সাইটেড্ হয়ে গেছ পর্মিলি, তুমি চেয়ারে বোস। তোমার সঙ্গে দুটো কথা বলতে চাই আমি। বোস, ওই চেয়ারটায় বোস তুমি -

পর্মিলি সামনের সোফাটার ওপর বসতেই পুণ্যশ্লোকবাবু জিজ্ঞেস করলেন—কেন তুমি ওদের পার্টির অফিসে গিয়েছিলে বলো? কী হয়েছে তোমার? তুমি জানো আমার নিজের একটা পোজিশান আছে। সমাজের কাছে, দেশের কাছে আমার একটা দায়িত্বও আছে—

পর্মিলি কিছু বললে না আর। তেমনি চুপ করে রইল।

পুণ্যশ্লোকবাবু বলে যেতে লাগলেন—তোমার জন্যে কি আমার বদনাম হবে বলতে চাও?

পর্মিলি বললে—তা তোমার বদনাম হলে আমি কি করবো, আমারও তো বদনামের ভয় থাকতে পারে!

—তোমার বদনাম! তোমার কীসের বদনামের ভয়?

পর্মিলি বললে—তুমি কিছু অন্যায় করলে আমি কি বদনাম এড়াতে পারবো? তোমার জন্যে আমারও তো বদনাম হচ্ছে—

—আমার জন্যে তোমার বদনাম হচ্ছে!

পর্মিলি বললে—হ্যাঁ। সারা কলকাতাতে দেখনি কী পোস্টার পড়েছে?

—সে তো দেখেছি। সে তো ওদের প্রোসেশনের পোস্টার!

—কিন্তু রাস্তার ছেলে-ছোকরারা তোমাদের পার্টির নামে কী ভাষায় স্লোগান দিচ্ছে, তা জানো?

—তা তো জানি! পলিটিক্‌স করতে গেলে ও-সব শুনতেই হয়। গান্ধীর নামে লোকে কত কী বলে, জওহরলাল নেহরুর নামেও কত কী বলে। ও-সব কানে তুললে কি কাজ চলে?

পর্মিলি বললে—নিজের নামের সঙ্গে গান্ধী-নেহরুর নাম কোর না তুমি!

পুণ্যশ্লোকবাবু যেন চমকে উঠলেন। নিজের মেয়ের মুখ থেকে একদিন এমন কথা শুনতে হবে ভাবতেও পারেননি।

রেগে গিয়ে বললেন—তোমার কি মাথাটা খারাপ হয়ে গিয়েছে পর্মিলি? তুমি বলছো কী? তুমি জানো না বাবার সঙ্গে কী করে কথা বলতে হয়? তোমার এত লেখাপড়ার শেষকালে এই ফল?

পর্মিলি বললে—লেখাপড়া আমাকে তুমি শেখালে কোথায়?

—তার মানে?

পর্মিলি বললে—যা বলছি তা ঠিকই বলছি—আমাকে শুধু তুমি মদ খেতে শিখিয়েছ!

পুণ্যশ্লোকবাবুর মাথায় বাজ পড়লেও বোধহয় তিনি এত চমকে উঠতেন না। তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। মাথাটা গরম হয়ে উঠলো। আজ ওদিকে বিকেলবেলা প্রোসেশন শুরু হবে, সমস্ত কলকাতাময় মানুষ আজকে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে—কী হবে, কী হবে। এতদিনকার কেরিয়ার তাঁর শেষ হবার দিকে। অনেক বছরের চেষ্টায় তিনি নিজে আজ মর্যাদার শিখরে উঠে বিরাজ করছেন। এই মর্যাদার মাথাতেই আজ আঘাত হানবার চেষ্টায় সবাই উন্মুখ। ক'দিন থেকে তিনি এই মর্যাদার কথা ভেবেই ছট্‌ফট্‌ করে বেড়াচ্ছেন। বাড়ির দিকে তিনি এতকাল নজরই দিতে পারেননি। হঠাৎ পর্মিলির কথায় যেন সেই বাড়ির দিকেই এই প্রথম তাঁর নজর পড়লো। তিনি পর্মিলির দিকে অনেকক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখতে লাগলেন। পর্মিলি বলছে কী?

পর্মিলি কথাগুলো আবার বললে।

বললে—হ্যাঁ, তুমি আমাকে কেবল মদ খেতেই শিখিয়েছ!

পুণ্যশ্লোকবাবুর সমস্ত শরীর তখন থরথর করে কাঁপছে। বললেন—এতদিন পরে তোমার মুখ দিয়ে আমাকে এই কথা শুনতে হলো? আমি তোমাকে মদ খেতে শিখিয়েছি?

—হ্যাঁ, তুমি ছাড়া আর কে শেখাবে?

—আমি? আবার বলছো আমি? আমি তোমাকে মদ খেতে শিখিয়েছি?

পর্মিলি বললে- হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। আবার কতবার বলবো? বাড়িতে তুমি আমেরিকানদের ককটেল-পার্টি দাওনি? সেই পার্টিতে তুমি আমাকে সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দাওনি? তারা যখন আমার সঙ্গে মদ খেয়ে নেচেছে তখন তুমি মনে মনে খুশী হওনি? বলো, সত্যি কথা বলছি কিনা বলো? যাতে আমি তাদের সঙ্গে ভালো করে নাচতে পারি, মিশতে পারি, কথা বলতে পারি, তার জন্যে তুমি আমাকে কনভেণ্টে পড়াওনি? নাচের স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিয়ে তুমি আমাকে নাচ শেখাওনি?

—হ্যাঁ, শিখিয়েছি। কিন্তু সে কীসের জন্যে? তোমারই ভালোর জন্যে।

পর্মিলিও তখন দাঁড়িয়ে উঠেছে। বললে—না, আমার ভালোর জন্যে নয়, তোমার নিজের ভালোর জন্যে। তোমার নিজের যাতে উন্নতি হয় তার জন্যে।

তুমি স্বার্থপর, তাই কেবল তোমার নিজের কথা ভেবেই আমাকে তুমি নিজের ব্যবহারে লাগিয়েছ! সেই জন্যেই মেমসাহেব রেখে আমাকে পিআনো শিখিয়েছ—

পুণ্যশ্লোকবাবু কী করবেন বুঝে উঠতে পারলেন না।

বললেন—এতদিন পরে তুমি এই কথা বলছো পর্মিলি?

পর্মিলি বললে—এতদিন পরে যে বলতে পেরেছি এর জন্যেই আমি আজ খুশী! এতদিন পরে যে অত্যাচারের চরম সীমায় এসে পৌঁছিয়েছ তুমি। এতদিন আমাকে তুমি কত ভাবেই না ব্যবহার করেছ? তোমার যাতে সম্মান বাড়ে, প্রতিষ্ঠা বাড়ে, তার জন্যে আমাকে সাজতে হয়েছে, তাদের সঙ্গে মিশে তাদের খুশী করতে হয়েছে। পার্টিতে যাতে তোমার নাম হয়, পজিশান হয়, তুমি যাতে মিনিস্টার হও তার জন্যেও তুমি আমাকে খাঁটিয়ে নিয়েছ! আর কতদিন আমি এ-সব সহ্য করবো বলো তো, আর কতদিন মানুষ সহ্য করতে পারে?

বলতে বলতে পর্মিলি কেঁদে ফেললে। মাথা নিচু করে দু'হাত দিয়ে মুখ ঢাকলে।

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—সব ভুল পর্মিলি, সব ভুল তোমার। জানি না এসব তোমার মাথায় কে ঢুকিয়েছে। কিন্তু বিশ্বাস করো, এ সব তোমার ভুল ধারণা—

পর্মিলি বললে—ভুল ধারণা? তাহলে আমি যখন ড্রিঙ্ক করে বাড়ি ফিরেছি দিনের পর দিন, তখন তুমি কিছু বলোনি কেন? আমি যখন প্রজেশের সঙ্গে বাইরে রাত কাটিয়েছি, তখন তুমি আমাকে বকোনি কেন? আমাকে বারণ করোনি কেন? কই, তারপরেও তো তুমি আমাকে ক্লাবে যেতে বলেছ। তারপরেও তো তুমি প্রজেশকে আমাদের বাড়িতে আসতে দিয়েছ?

পুণ্যশ্লোকবাবুর মনে হলো পর্মিলি যেন তাঁর মুখের সামনে একটা আয়না ধরে আছে, আর সেই আয়নাতে যেন তাঁর নিজের মুখের ছবিটা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ ধরা পড়ছে। পর্মিলির কথাগুলো যেন তাঁরই বিশ্লেষণ! সত্যিই তো, পর্মিলি যা বলছে তার এক বর্ণও তো মিথ্যে নয়! নিজের মূল্যায়ন যেন পর্মিলিই স্পষ্টভাবে করে দিচ্ছে একে একে। এই তো সেদিন পর্মিলির জন্ম হলো। এই তো এতটুকু এক চিলতে একটা মেয়ে! এরই মধ্যে এত বুঝতে শিখলে সে কী করে?

পুণ্যশ্লোকবাবু ভালো করে চেয়ে দেখতে লাগলেন পর্মিলিকে।

সত্যিই তো, পর্মিলি তো এখন আর ছোট নেই। এতদিন তিনি নিজের সম্মান, প্রতিষ্ঠা, মর্যাদার কথাই তো কেবল ভেবে এসেছেন, পর্মিলির কথা তো কই কখনও ভাবেননি? ভেবেছিলেন, পর্মিলিকে গাড়ি দিয়েছেন, পর্মিলির হাত-খরচের মোটা টাকা দিয়েছেন, এরপর সে আর কিছু চাইবে না। পুণ্যশ্লোকবাবুকে পরিপূর্ণ দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে সে নিজের খেয়াল-খুশীমত ঘুরে বেড়াতেই ব্যস্ত থাকবে।

পর্মিলি আবার মাথা তুলে বলতে লাগলো—আর আমার মা! তাকেও বোধহয় এমনি ভাবেই ব্যবহার করেছ, আর তা করেছ বলেই মা তোমাকে ছেড়ে গিয়ে মুক্তি পেয়েছে—

পুণ্যশ্লোকবাবু গলাটা করুণ করে নিয়ে বললেন—তুমি চুপ করো পর্মিলি, তুমি খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছ, যা-নয়-তাই বলতে আরম্ভ করেছ—

—না না, আমি মোটেই উত্তেজিত হইনি। আমি যা বলছি, সব ভেবে-চিন্তেই বলছি। তুমি বুকে হাত দিয়ে বলো তো মা মারা যাবার পর তুমি হাঁফ ছেড়ে

বেঁচেছিলে কি না?

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—সে কী, তুমি দেখনি, তোমার মা'র কত বড় ছবি আমার ঘরে টাঙানো রয়েছে?

পর্মিলি বললে—থামো! ও-সব বলে তুমি আমাকে ভোলাতে পারবে না। পার্ক স্ট্রীটের মোড়েও তো গান্ধীর মূর্তি গড়ে রেখেছ তোমরা, কিন্তু কোনও-দিন গান্ধীর কথা এক মিনিটের জন্যেও স্মরণ করেছ? ছবি টাঙালেই বুঝি শোক জানানোর দায় চুকে যায়?

পুণ্যশ্লোকবাবু চুপ করে রইলেন। কোনও উত্তর দিতে পারলেন না।

তারপর একটু পরে বললেন—তাহলে কি বলতে চাও, আমি তোমাদের সকলকে ঠকিয়েছিই কেবল?

—নিশ্চয়ই ঠকিয়েছ। নইলে কেন তুমি সুব্রতকে আমেরিকায় পাঠিয়ে দিলে?

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—কেন, তাকে আমেরিকা পাঠানোর মধ্যেও আমার দোষ হয়ে গেল?

পর্মিলি বললে—তুমি নিজের মনের কাছে প্রশ্ন করো, কেন তুমি সুব্রতকে আমেরিকায় পাঠিয়েছিলে!

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—সুব্রত আমার ছেলে, তার ভালোর জন্যেই তাকে বিদেশে পাঠিয়েছি এ কথা তো আগেই বলেছি!

পর্মিলি বললে—সেটা তো বাইরের উত্তর। বাইরের লোককে তুমি ওই কথা বলে বোঝাও। কিন্তু আসলে তুমি ছেলে-মেয়ের দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেতে চাও। আমরা তোমার কাছে বোঝা, বোঝা ছাড়া আর কিছুই নই আমরা—

—কিন্তু জানো, বছরে তার জন্যে আমার ক'হাজার টাকা করে খরচ হয়?

পর্মিলি বললে—কিন্তু তার বদলে যে তোমার কতখানি বোঝা কমে গেছে। কতখানি নিশ্চিন্ত হয়ে তুমি স্বার্থসিদ্ধি করতে পারছো তার বদলে! ঠিক এই জন্যেই তুমি আমাকেও হাত উপুড় করে টাকা দাও। যাতে আমি তোমার ঘাড় থেকে নেমে যাই—

পুণ্যশ্লোকবাবু কাছে এলেন। পর্মিলির মাথায় হাত দিয়ে সান্ত্বনার সুরে বলতে লাগলেন—তোমার মনের ভুল পর্মিলি! শুধু মনের ভুল! এ-সব ধারণা তোমার মাথায় ঢুকলো কেমন করে তাই ভাবছি—

মাথায় হাত পড়তেই পর্মিলি সেটা সরিয়ে দিয়ে নিজে বিছানার ওপর গিয়ে শুয়ে পড়লো। তারপর বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে রইল।

পুণ্যশ্লোকবাবু আস্তে আস্তে পর্মিলির বিছানার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর আজ অনেক কাজ। হাতে এতটুকু সময় নেই। নানান চিন্তা ক'দিন থেকে মাথার মধ্যে ঘুরছে। সকলের মাথায় ওঠা সোজা, কিন্তু সেই অবস্থানটা বজায় রাখার যে দুর্ভাবনা তার যন্ত্রণা কে বুঝবে! সমস্ত সমাজের মানুষ আজ তাঁকে সরিয়ে দেবার যে ষড়যন্ত্র করছে তা ঠেকাবার ভাবনাতেই তিনি আজ বিব্রত। কাল থেকেই তো দেয়ালে-দেয়ালে পোস্টার পড়ে গেছে। তাঁর নিজের দেওয়ালেও পোস্টার পড়েছে। আজ সেই মিছিল। আর তারপরেই আসছে ইলেকশান। এ-সব ভাবনাই এতদিন দুর্বহ হয়ে তাঁকে কেবল পীড়া দিয়েছে। আজ এখন পর্মিলির কথায় আবার এক নতুন সমস্যার কথা ভেবে তিনি বড় মুষড়ে পড়লেন। এর থেকে মুক্তির উপায় কী? পর্মিলি যে তার দুর্ভাবনার বোঝা এমন করে বাড়িয়ে দেবে তা তো তিনি

বুঝতে পারেননি! অথচ পর্মিলি আর সুব্রতর জন্যে তিনি কি কিছুই করেননি? তাদের জন্যে এত টাকা খরচ করাটাও কি তুচ্ছ? ছেলে-মেয়ের কাছে তার কোনও দাম নেই? ওরা সব কিছুর মধ্যে তাঁর স্বার্থসিদ্ধিই শুধু দেখলে? ভালোবাসার ছিটেফোঁটাও দেখতে পেলে না এতটুকু? সত্যিই কি তিনি স্বার্থপর? সত্যিই কি তিনি নিজের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তির কথাই সারাদিন ভাবেন? ছেলে-মেয়ের ভবিষ্যতের ভাবনা কি তাঁর মাথায় ঢোকে না একবারও?

পুণ্যশ্লোকবাবু আদর করে ডাকলেন—পর্মিলি—

ভাবলেন, হয়ত আদর করলে পর্মিলি একটু শান্ত হবে। মুখটা নিচু করে পর্মিলির মুখের কাছে এনে আবার ডাকলেন—পর্মিলি মা—

পর্মিলি হঠাৎ রেগে উঠলো। মুখটা তুলে রাগের ঝোঁকে বলে উঠলো—তুমি যাও তো, তুমি বেরিয়ে যাও আমার ঘর থেকে, বেরিয়ে যাও—

পুণ্যশ্লোকবাবু এক পা পেছিয়ে এলেন। এমন কথা রাইটার্স-বিল্ডিং-এ কেউ তাকে বললে তার চাকরিই চলে যেত তখনই। কিন্তু মেয়ের কাছ থেকে এই উত্তব পেয়ে শুধু দুঃখ পেলেন। চরম মর্মান্তিক দুঃখ পেলেন। খানিকক্ষণ চুপ করে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পর্মিলিব দিকেই দেখতে লাগলেন। কিংবা হয়ত পর্মিলির দিকে মুখ রেখে নিজের দিকেই চেয়ে রইলেন। নিজেকেই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে চাইলেন। কিন্তু নিজের নিঃস্ব মূর্তিটা দেখে যেন নিজেই চমকে উঠলেন। হঠাৎ নিজের কাছে নিজেকে বড় কদর্য মনে হলো। তিনি চমকে উঠলেন।

কিন্তু সেই মুহূর্তে রঘুর গলাব আওয়াজে যেন মুক্তি পেলেন—বাবু, আপনার টেলিফোন—

প্রজেশ তখনও একতলার করিডোবে অপেক্ষা কবছিল।

ওপর থেকে পুণ্যশ্লোকবাবুকে সিঁড়ি দিযে নামতে দেখে তাঁর দিকে চেয়ে দেখলে। এতক্ষণ ধরে পর্মিলির সঙ্গে তার কী কথা হচ্ছিল কে জানে! তাকে দাঁড়াতে বলে গিয়েছিলেন পুণ্যশ্লোকবাবু। পুণ্যশ্লোকবাবুর মুখের দিকে চেয়ে দেখলে প্রজেশ। প্রজেশের মনে হলো যেন পুণ্যশ্লোকবাবুর মুখের চেহারাটা আমূল বদলে গিয়েছে। যেন এইটুকু সময়েব মধ্যেই পুণ্যশ্লোকবাবুর বয়েস বেড়ে গেছে। নিজের দিকে চোখ রেখেই নামছেন, কিন্তু যেন কোনো দিকেই তাঁর দৃষ্টি নেই।

প্রজেশকে যাতে দেখতে পান সেই জন্যে পুণ্যশ্লোকবাবুর দৃষ্টির সীমানার মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালো সে।

পুণ্যশ্লোকবাবু এতক্ষণে তাকে দেখলেন।

বললেন—তুমি একটু দাঁড়াও প্রজেশ, আমি টেলিফোনে কথা বলে আসছি—

বলে চলে যাচ্ছিলেন। কিন্তু আবার থামলেন। ফিবে দাঁড়িয়ে বললেন—তোমার সঙ্গে আসবার সময় পর্মিলি তোমায় কিছু বলেছিল প্রজেশ?

প্রজেশ বললে—একসঙ্গে তো আমরা আসিনি। পর্মিলি তার নিজের গাড়িতে এসেছিল। কেন, কিছু বলছিল আপনাকে?

—না, কিছু বলেনি। কিন্তু মনে হলো পর্মিলি যেন হঠাৎ বড় আপসেট হয়েছে। একী হলো বুঝতে পারছি না। অথচ আজকে আমাব এত কাজ, এসব ভাববারই সময় নেই একেবারে। ক্যাবিনেট মীটিং আছে। তারপর এস্‌প্ল্যানেডে ওদের আজ প্রোসেশান—

প্রজেশ বললে—তার জন্যে আপনি অত ভাবছেন কেন? পুলিশ কমিশনার তো সব জানেনই।

—তাহলেও, বুঝছো না, একবার যদি ফায়ারিং হয়, তাহলে তার কত ল্যাঠা! সমস্ত ল্যাঠা তো মিনিস্ট্রিকেই সহ্য করতে হবে! তখন হয়ত এন্‌কোয়ারি কমিশন বসাবার জন্যে অপোজিশান পার্টি জেদ ধরবে। কী ঝামেলায় যে ফেললে সবাই মিলে--

বলে আবার টেলিফোনের কথাটা মনে পড়তেই সেই দিকে চলে গেলেন। যাবার সময় বলে গেলেন—তুমি যেন চলে যেও না প্রজেশ, তোমার সঙ্গে আমার সিরিয়াস কথা আছে, আমি টেলিফোনটা শেষ করেই আসছি—

প্রজেশ সেই অবস্থাতেই সেখানে পায়চারি করে অপেক্ষা করতে লাগলো।

সারা কলকাতার জীবনে যে কী দুর্যোগ ঘনিয়ে আসছিল, তা কিন্তু তখনও কেউই বুঝতে পারেনি। সেই কবে একদিন কংগ্রেসের সৃষ্টি হয়েছিল এই কলকাতা সহরকেই কেন্দ্র করে। তারপর সেই কবে একদিন সেই কংগ্রেসই আবার সমস্ত ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষের মনে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করেছিল। সে সমস্ত কথা আজকের এই পুণ্যশ্লোকবাবুর যুগের সবাই ভুলে গেছে। কবে 'বন্দে মাতরম' উচ্চারণ করবার অপরাধেই কত লোক হাসতে হাসতে ফাঁসিকাঠে প্রাণ দিয়েছে, কবে আবার একদিন 'জয় হিন্দে'র আবির্ভাবে সেই 'বন্দে মাতরম'কেই সবাই ভুলে গেল, তাও আবার আজ কারো মনে নেই। তারপর আবার কবে যে সব কিছু ভুলিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে 'ইন্‌ক্লাব জিন্দাবাদ' এসে হাজির হলো তাও কেউ টের পায়নি কখনও।

হয়ত এমনিই হয়। হয়ত এইটেই নিয়ম। এরই নাম হয়ত ইতিহাস! এই ইতিহাসই কেবল বলতে পারে এর কোথায় পরিণতি। নইলে পুণ্যশ্লোকবাবুর পূর্বপুরুষ যেদিন এই সহরে বসতি পত্তন করেছিলেন, সেদিন কি তিনি কল্পনা করেছিলেন তাঁরই বংশের একটা সন্তান একদিন অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদবে! অগাধ ঐশ্বর্য আর অসীম ক্ষমতা পেয়েও প্রতি মুহূর্তের আশঙ্কায় সাধারণ মানুষের কাছে দয়ার হাত পেতে ভোট ভিক্ষের ওপর নিজের মান-সম্মান বাঁচাবে!

আর শিবশম্ভু চৌধুরী?

কোথায় লাখ-লাখ টাকার কলকাতার স্থাবর সম্পত্তি রেখে দিয়ে গিয়ে একমাত্র সন্তানের ভবিষ্যৎ নিশ্চিন্ত করতে চেয়েছিলেন। ভেবেছিলেন, মেয়ের বিয়ে দিয়ে গেলাম আর রেখে গেলাম এত টাকার সম্পত্তি। এর ভবিষ্যৎ কে টলিয়ে দেবে?

হায় রে মানুষ, আর হায় রে মানুষের সাধ-আহ্লাদ-বাসনা-কামনা!

সুধন্যেরও সেই কথাই মনে হচ্ছিল। মাধব কুণ্ডু লেনের গলির মধ্যে ঢুকতে ঢুকতে বার বার ইষ্ট দেবতাকে স্মরণ করছিল—হে ভগবান, যেন বাড়িতে ঢুকে দেখি মা-মণি পটল তুলেছে। হে মা-কালী, আমার মনোবাঞ্ছা যেন পূর্ণ হয় মা।

কিন্তু বাড়ির গেটের কাছে আসতেই চমকে উঠলো। একবার ভাবলে পালিয়ে

যাবে। তারপর ভাবলে, এতদূর এসেছে যখন তখন দেখাই যাক্ ব্যাপারটা কি!

ভেতরে তখন গোটা তিনেক লাল পাগড়ি পুলিশ লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ পুলিশই বা এল কেন? কী হয়েছে এ-বাড়িতে?

রাস্তার একজন লোক কাছেই দাঁড়িয়েছিল। সুধন্য তাকেই গিয়ে জিজ্ঞেস করলে—কী হয়েছে মশাই এ-বাড়িতে?

ভদ্রলোক বললে—কী জানি! শুনছি নাকি বাড়ির ভেতরে চুরি হয়েছে—

চুরি! সুধন্য অবাক হয়ে গেল! এ-বাড়িতে এত বড় গেট, দরোয়ান বসে থাকে দিনরাত। তবু চুরি! চোরের তো সাহস কম নয়। সুধন্য বুঝতে পারলে না ভেতরে ঢুকবে কি না। উঠোনের ওপর পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে বটে, কিন্তু আসল ব্যাপারটা ঘটেছে বাড়ির ভেতরে।

বাহাদুর সিং নিয়ম মত গেটে পাহারা দিচ্ছিল।

সুধন্যকে বাহাদুর সিং চিনে গেছে।

—কেমন আছ বাহাদুর সিং?

বাহাদুর সিং এই বাবুকে দেখেছে বুড়োবাবুর সঙ্গে। এটা অন্ততঃ বুঝতে পেরেছে যে লোকটার ভেতরে ঢোকবার অধিকার আছে। বাহাদুর সিং সুধন্যর কথার কোনও উত্তর দিলে না। উঠোনের ভেতরে তখন বাড়ির ঝি-চাকর-ঠাকুর দূর থেকে উদ্‌গ্রীব হয়ে সব দেখছে। কিন্তু সেই ম্যানেজারটা কোথায় গেল? সে-ই তো এ-বাড়ির কর্তা!

আরো ভেতরে রান্নাবাড়ির আড়াল থেকে চাকর-বাকররা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল। সুধন্য কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে—কী চুরি হয়েছে গো? কে চুরি করেছে?

কেউ কিছু উত্তর দিলে না। সবাই যেন ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে আছে। এদের মধ্যে বুড়োবাবুকে কোথাও দেখা গেল না। তারপর আস্তে আস্তে একেবারে পেছনের দিকে বুড়োবাবুর ঘরে গিয়ে ডাকলে—কাকা—

বুড়োবাবু নিজের ঘরের তক্তপোষটার ওপর ধুঁকছিল।

বললে—কে? সুধন্য?

সুধন্য ভেতরে ঢুকে বললে—তুমি এখানে শুয়ে আছ কাকা, আর ওদিকে যে বাড়িময় হৈ-চৈ হচ্ছে খুব—

—কীসের হৈ-চৈ? আমাকে তো কেউ কিছু বলেনি!

—চুরি হয়েছে। চোরে সব চুরি করে নিয়ে গেছে!

বুড়োবাবু যেন চিন্তিত হয়ে উঠলো। বললে—কী চুরি করেছে রে? কে? কে চুরি করলে?

সুধন্য বললে—তা ঠিক বুঝতে পারলুম না। শুধু দেখলুম পুলিশ-টুলিশ সব এসেছে, সবাই ভিড় করেছে বাড়ির ভেতরে—

যেটুকু সুধন্য বাইরে থেকে দেখেছে সেইটুকুই সে বললে। কিন্তু তার চোখের আড়ালে অন্দর মহলে তখন আরো অনেক কাণ্ড হচ্ছে। একেবারে তেতলার বারান্দার ওপরেই ম্যানেজার ভূপতি ভাদুড়ী পুলিশের ইন্সপেক্টারেব সামনে হাত নেড়ে নেড়ে সব বুঝিয়ে দিচ্ছে।

ইন্সপেক্টার জিজ্ঞেস করলে—আসলে ও মেয়েটি এ-বাড়ির কে? আপনাদের আত্মীয়?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—আরে রাম রাম, আত্মীয় হতে যাবে কোন্ দুঃখে? আমাদের মা-মণির সাত কুলের কেউ নয়—বিশ্বাস না-হয় তো ওকেই জিজ্ঞেস

করুন!

সুখদা তখন সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুখে-চোখে আঁচল চাপা দিয়ে কাঁদছিল। আর ওদের কথাগুলোও তার কানে যাচ্ছিল।

ইন্সপেক্টার ভদ্রলোক সুখদাকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করলে—আপনি এ-বাড়ির মা-মণির কে হন?

সুখদা কাঁদতে কাঁদতে জবাব দিলে—মা-মণি আমার দিদি—

—দিদি মানে? আপনার নিজের বোন?

সুখদা বললে—না, মা-মণি আমার মা'র বোন-ঝি।

—কী রকম বোন-ঝি? আপন বোন-ঝি?

—আমি ঠিক জানি না। কিন্তু আপনের চেয়েও বেশি। আমি আমার মাকেও দেখিনি কখনও। আমি ছোটবেলা থেকেই মা-মণির কাছেই মানুষ।

ইন্সপেক্টার ভূপতি ভাদুড়ীর দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে—আপনাদের এই বাড়িতেই ইনি মানুষ হয়েছেন নাকি?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—সে-সব অনেক কেলেঙ্কারি ব্যাপার। আপনি থানায় নিয়ে গিয়ে জেরা করুন, সব বেরিয়ে পড়বে—

দারোগার তখন অত সময় নেই হাতে। প্রথমতঃ থানা থেকে কেউ আসতেই চাইছিল না এখানে। ভূপতি ভাদুড়ী অনেক খোসামোদ করে তবে পুলিশকে বাড়িতে ডেকে এনেছে। বলেছিল—চোর ধরা পড়েছে, আপনি এখ্খুনি একবার চলুন দারোগাবাবু—

কিন্তু সত্যিই সেদিন পুলিশের হাতে অনেক কাজ। বিকেলবেলা কমিউনিস্টদের বিরাট একটা মিছিল বেরোবে। সেখানে রাজভবনের সামনে সবাইকে ডিউটি দিতে হবে।

ইন্সপেক্টার বলেছিল—আমাদের এখন অনেক কাজ ও-সব পেটি কেস ধরতে আমি যেতে পারবো না, আমি শুধু কন্‌স্টেবল্ পাঠিয়ে দিচ্ছি—

কিন্তু ভূপতি ভাদুড়ী সহজে ছাড়বার পাত্র নয়। দরকার হলে সে হয়ত দারোগার পা দুটো জড়িয়ে ধরতে পারতো।

বললে—আপনি না গেলে চলবে না স্যার, আপনার পায়ে পড়ি, আপনি একবারটি চলুন—

বলতে বলতে সত্যিই একেবারে পা জড়িয়ে ধরতে যাচ্ছিল। তারপর যখন আভাস পাওয়া গেল যে পার্টি শাঁসালো, তখন উঠলো। বললে—চলুন—

ভূপতি ভাদুড়ী ব্যবস্থা করে রেখে দিয়েছিল আগে থেকেই। শ'তিনেক কাঁচা টাকা ফতুয়ার পকেটেই গুঁজে নিয়েছিল। একটা খামের মধ্যে পুরে সেটা এগিয়ে দিলে সামনের দিকে। দারোগা সাহেবের মুখে আর কথা নেই।

বললে—চলুন—

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—এখন তিনশো টাকা দিলুম স্যার, এখন ওইটে নিন্, পরে আরো দেবো স্যার, কথা দিচ্ছি—

তারপর একটু থেমে বললে—একেবারে হাতে হাত-কড়া দিয়ে বেঁধে ধরে আনতে হবে স্যার, আমার বড় ইচ্ছে—

তা তা-ই সই। মামুলি যখন পাওয়া গেছে তখন আর বলতে হবে না, সব বুঝে নিয়েছে। বললে—চলুন।

সেই ভোর থেকেই এই কাণ্ড চলেছে। এ-সব ব্যাপারে ভূপতি ভাদুড়ীর বুদ্ধি খোলে ভালো। ভূপতি ভাদুড়ী অনেক দিন থেকেই ওত পেতে ছিল। সেই

যেদিন কালীকান্ত বিশ্বাস এল এ-বাড়িতে সেই দিন থেকেই। কেমন যেন সন্দেহ হতো তার। কেবল মনে হতো, কিছু মতলব আছে জামাইটার। মুখে কিছু বলতো না ভূপতি ভাদুড়ী। কিন্তু তলে তলে সমস্ত লক্ষ্য করতো। মা-মণি যখন অসুখে শুয়ে পড়ে থাকতো, তখন তাকে দেখবার নাম করে ভূপতি ভাদুড়ী সেখানে গিয়ে দাঁড়াতো। দুটো কথা বলতো। তারপর সুখদার চোখ-মুখ ভালো করে লক্ষ্য করতো। সে চোখ দুটো যেন সব সময়ে কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছে মনে হতো। তখন থেকেই সন্দেহ হয়েছিল ভূপতি ভাদুড়ীর। তখন থেকেই কারণে-অকারণে ঘনঘন মা-মণির ঘরে আসতো।

কিন্তু যেদিন দেখলে নরেশ দত্ত এসে চুপিচুপি ফিসফিস করে কথা বলছে কালীকান্তর সঙ্গে, সেই দিনই সন্দেহটা দৃঢ় হলো। তাহলে তো যা ভেবেছে সে তা ঠিক। তারপরে নানা কথার পর নরেশ দত্ত চলে গেল। ভূপতি ভাদুড়ীও তারপর থেকে তক্কে-তক্কে রইল। কালীকান্ত যখনই ওপরে যায়, তখনই একটা-না-একটা ছল করে ভূপতি ভাদুড়ী ওপরে যায়। ওপরে গিয়ে মা-মণির ঘরে যায়। যেখানে নানা ছুতোয় বসে থাকে মা-মণির পায়ের কাছে।

ভূপতি ভাদুড়ী জানতো রাত্তিরটাতেই বেশি বিপদ! রাত্রেই ওরা মতলব হাসিল করবে।

সেদিন ঘরের জানালা দিয়ে ভূপতি ভাদুড়ী দেখলে কালীকান্ত জ্বলন্ত সিগারেটের শেষ টুকরোটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ভেতরে চলে গেল। ঠিক তারপর ভূপতি ভাদুড়ীও পেছন-পেছন ওপরে গিয়ে উঠলো। অন্ধকারে পা টিপে টিপে একেবারে তেতলায় গিয়ে উঠে দরজার আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে রইল। সুখদা আর কালীকান্তর কথাগুলো কানে আসছিল ভূপতি ভাদুড়ীর। থমথম করছিল সমস্ত আবহাওয়াটা। মা-মণির ঘরের ভেতরে কোণের দিকে টিম্-টিম্ করে একটা বাতি শুধু জ্বলছিল, আর সব কিছু অন্ধকার।

হঠাৎ নজরে পড়লো সুখদা আস্তে আস্তে মা-মণির ঘরের ভেতরে গিয়ে ঢুকলো। কিন্তু অত তাড়াতাড়ি তখনই ধরে ফেললে সব মাটি হয়ে যাবে! আর একটু অপেক্ষা করতে লাগলো ভূপতি ভাদুড়ী।

কিন্তু সুখদা তখনই বেরিয়ে এল ঘর থেকে। বোধহয় ভয় পেয়ে গিয়েছিল। বাইরে এসে নিজের ঘরের কাছে আসতেই কালীকান্ত সুখদাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আবার ভেতরে পাঠিয়ে দিলে।

ভূপতি ভাদুড়ী আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল।

তারপর চোখ-কান খাড়া করে রইল। অন্ধকারে কানে এল সুখদার টিপি-টিপি পায়ের শব্দ! মেয়েটা বোধহয় খুবই ভয় পেয়ে গেছে। ভূপতি ভাদুড়ীর বুকটাও তখন আশায়-আশঙ্কায় ঢিপ্-ঢিপ্ করতে শুরু করেছিল নতুন করে। বহুদিন ধরে বহু আশা বুকের মধ্যে লালন করে এসেছে ভূপতি ভাদুড়ী। যে-দিন থেকে শিবশম্ভু চৌধুরী মারা গেছেন, সেইদিন থেকেই সমস্ত প্ল্যান করে রেখেছে। এই যা-কিছু স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি সমস্তই একদিন তার হবে, শুধু উইল করাটা নিয়ে যা কিছু কাজ বাকি!

আর উইলের কথাই যদি বলো তো তাও তো সবই ঠিক হয়ে আছে। শুধু মা-মণির অসুখের জন্যে সই করিয়ে নেওয়াটাই যা হয়নি! একবার চুরিও হয়ে গিয়েছিল উইলটা। তারপর তার কপি থেকে আরো কয়েকটা কপি করিয়ে নেওয়া হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু এদিকে যে সুখদা আবার এ-বাড়িতে উঠে আসবে সে-কথাটা কল্পনাও

করতে পারেনি ভূপতি ভাদুড়ী। আজ এতদিন পরে যখন সেই সুখদাকে তাড়াবার ব্যবস্থা হয়েছে, তখন যেন এ সুযোগ হাতছাড়া করা আর কিছুতেই উচিত নয়। তাই দারোগার পায়ে ধরে বাড়িতে নিয়ে এসেছে।

—তাহলে এসব কেন চুরি করতে গেলেন আপনি?

সুখদা কোনও উত্তর দিলে না। তেমনি আগেকার মত মুখে আঁচল চাপা দিয়ে কাঁদতে লাগলো।

—কাঁদলে তো কোনও ফল হবে না। যা করেছেন সত্যি কথা বলুন।

সুখদা কাঁদতে কাঁদতে বললে—আপনার দুটি পায়ে পড়ি, আমাকে ছেড়ে দিন, আমি আর চুরি করবো না। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি আমি চুরি করবো না আর—

—কিন্তু তা তো হয় না, আপনাকে থানায় যেতে হবে।

সুখদা আর্তনাদ করে উঠলো—আপনার দু'টি পায়ে পড়ি দারোগাবাবু, দু'টি পায়ে পড়ি—

দূরে তরলা, বাদামী সবাই আড়াল থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিল। সে-দিকে চেয়ে নিয়ে দারোগাবাবু বললে—নিচেয় আমার কনস্টেবলদের একজনকে ডেকে আনুন তো—

ভূপতি ভাদুড়ীর যেন আর তর সইল না। তাড়াতাড়ি এক লাফে নিচে নেমে গিয়ে পুলিশকে ডেকে আনলে। হ্যান্ড্-কাফ্ তৈরি ছিল তার কাছে। সুখদার দুটো হাত নিয়ে হাত-কড়া পরিয়ে দিতেই হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলো সুখদা।

ইন্সপেক্টার বললে—চলো, বাইরে নিয়ে চলো—

সুখদার একবার মনে হলো সে বুঝি এবারে অজ্ঞান হয়ে যাবে। কবে একদিন এ-বাড়িতে সে হঠাৎ এসেছিল। কিন্তু কোথা দিয়ে কী হয়ে গেল! জীবনটারই যেন কোনও মানে রইল না। সব যেন গোলমাল হয়ে গেছে সুখদার চোখের সামনে।

বাইরে পুলিশের একটা গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। সকলের চোখের সামনে দিয়ে হাত-কড়া বাঁধা অবস্থায় সুখদা মুখ-চোখ ঢেকে গিয়ে উঠলো গাড়ির ভেতর। আর সঙ্গে সঙ্গে সুধন্য আবার গিয়ে ঢুকলো বুড়োবাবুর ঘরে।

বললে—কাকা, খুব ভালো খবর আছে—

—কী রে?

সুধন্য বললে—এখ্খুনি দেখে এলুম, এ-বাড়ির সেই মেয়েটাই চোর। মা-মণির গয়না চুরি করেছিল। পুলিশ তাকে হাতে হাত-কড়া বেঁধে থানায় ধরে নিয়ে গেল।

বুড়োবাবু মুখ দিয়ে কিছু বললে না। সুধন্যর দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল।

সুধন্য বললে—জয় মা কালী, জয় মা জগদম্বা, তুমি শুয়ে থাকো কাকা, আমি দেখে আসি কী হচ্ছে ওখানে, আমি দেখে এসে সব তোমাকে বলবো—

বলে আবার দৌড়ে উঠোনের দিকে চলে গেল।

ওদিকে ধর্মতলার মোড় দিয়ে মিছিলের শেষ প্রান্তটা তখনও হেঁটে চলেছে। এমনি করেই বুঝি ইতিহাস যুগে যুগে এগিয়ে চলে। এমনি করে এই রাস্তা

দিয়েই ইংরেজের আর্মি একদিন নবাব সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে লড়াই করতে এগিয়ে গেছে। সে ১৭৫৭ সালের কথা। আবার এমনি করে এই রাস্তা দিয়েই একদিন কংগ্রেসের ভলান্টিয়াররা 'বন্দে মাতরম' বলতে বলতে কলকাতার লাট-সাহেবের বাড়ির দিকে এগিয়ে গিয়েছে। আবার আজ এই একই রাস্তা দিয়েই সেই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে পূর্ণবাবুর পার্টির ছেলেমেয়েরা 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ' বলতে বলতে রাজভবনের দিকে এগিয়ে চলেছে।

অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সব যেন একাকার হয়ে গেছে এই রাজভবনের কাছে এসে। সেই অতীত থেকে শুরু করে আগামী ভবিষ্যতের দিন পর্যন্ত এর যেন আর বিরাম নেই। আগেও যেমন চলেছিল, আগামীকালও তেমনি চলবে।

দূর থেকে টুলুকে দেখে হঠাৎ যেন কথা বলতে ইচ্ছে হলো সুরেনের। সে ভালো করে চেয়ে দেখলে টুলুর দিকে। লাল রংএর শালুর ফেস্টুনটা হাতে নিয়ে মাঝে মাঝে টুলু চিৎকার করে উঠছে—ইনক্লাব জিন্দাবাদ—

চিৎকার করবার সঙ্গে সঙ্গে তার মাথাটা উঁচু হয়ে উঠছে, এক হাতের মুঠোটা সে উঁচু করে আকাশের দিকে তুলছে। যেন আকাশকেই সে ঘুঁষি দেখাচ্ছে, কিংবা আকাশের মত উঁচুতে যারা বসে আছে তাদের শাসাচ্ছে। শরীরটা যেন এ ক'দিনেই তার ভালো হয়ে গেছে। বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে টুলুকে এখন।

—কী হলো, আপনি?

টুলু হঠাৎ দেখতে পেয়েছে সুরেনকে।

—আপনাকে মিছিলে দেখবো ভাবতে পারিনি—

সুরেন বললে—তোমাকে একেবারে চেনাই যাচ্ছে না।

—কেন?

—আমি ভাবতে পারিনি অত বড় এ্যাক্‌সিডেণ্টের পর তুমি এত শিগ্‌গির উঠে দাঁড়াতে পারবে!

টুলু ভিড়ের ভেতরেই রঙিন হয়ে উঠলো যেন। নিজের লজ্জাটা ভাঙবার জন্যেই যেন তাড়াতাড়ি উত্তর দিলে—বাবা আসতে বারণ করছিল আমাকে—

—তাহলে এলে কেন?

—এলুম। না এসে থাকতে পারলুম না—

হঠাৎ সুরেনের পাশের লোকটা পকেট থেকে একটা সোডার বোতল বার করে দূরের পুলিশদের ওপর ছুঁড়ে ফেলতেই খুব জোরে একটা শব্দ হলো। সঙ্গে সঙ্গে পেছন থেকে আর একটা।

সুরেন আশ্চর্য হয়ে গেছে।

সুরেন লোকটাকে জিজ্ঞেস করলে—এ কী করছেন? সোডার বোতল ছুঁড়ছেন কেন?

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা কাণ্ড হলো। সার-সার পুলিশ দাঁড়িয়ে ছিল পাশে। তারা এতক্ষণ কিছু বলেনি। কিন্তু এবার তারা ছুটোছুটি আরম্ভ করেছে। কোথাও পাশেই যেন দুম্ করে বিকট একটা শব্দ হলো। সঙ্গে সঙ্গে ধোঁয়ায় ধোঁয়া হয়ে গেছে চারিদিক। আবার শব্দ, আবার স্লোগান। ইন্‌ক্লাব জিন্দাবাদ। ততক্ষণে ক্ষেপে উঠেছে মিছিলের লোক। কোথা থেকে যেন ইঁটের টুকরো এসে পড়তে লাগলো পুলিশদের ওপর। মারো শালাদের, মারো। সুরেন

হতবাক্ হয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো চারদিকে। সবাই পালাচ্ছে কেন? পালাচ্ছে কেন সবাই? কিন্তু টুলু যে ফেস্টুন উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে তখনও। টুলু, সরে যাও। ধোঁয়ায় ধোঁয়া হয়ে গেছে জায়গাটা। চোখ জ্বলছে। কেউ কেউ আবার টিয়ার-গ্যাসের জ্বলন্ত টুকরোগুলো নিয়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে পুলিশের দিকে। একটা সোডার বোতল গিয়ে পড়লো একটা দোকানের শো-কেসের ওপর। চুরমার হয়ে গেল কাঁচ। টুলু, পালিয়ে যাও, পালিয়ে যাও টুলু। তোমার শরীর খারাপ। তুমি সবে অসুখ থেকে উঠেছ। এখনি গুলী ছুঁড়বে ওরা। ওদিক থেকে আরো এক ঝাঁক পুলিশ এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো মিছিলের ওপর। ততক্ষণে মিছিলের লোকরাও বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। একটা বিকট শব্দ হলো আবার। আরো জোর শব্দ! এবার টিয়ার-গ্যাস নয়, ফায়ারিং। সমস্ত কলকাতা সহরটা যেন থর থর করে কেঁপে উঠলো। টুলু, পালাও, পালিয়ে যাও, পালিয়ে যাও তুমি—

হঠাৎ সুরেনের মনে হলো তার মাথায় এসে কী যেন লাগলো। আর তাব সঙ্গে সঙ্গে একটা বিকট শব্দ হলো। একটি মাত্র মুহূর্ত। সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণা, কিন্তু তাও এক মুহূর্তের জন্য। তারপরে আর কিছু মনে নেই সুরেনের—

দূরে দাঁড়িয়েছিল টুলু। তারও নজরে পড়তেই মুখ দিয়ে একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এল—উঃ—

ক্যাবিনেটের সভা থেকে তখন পুণ্যশ্লোকবাবু বেরিয়েছেন। সন্ধ্যে উতরে গেছে। সমস্ত ডালহৌসি স্কোয়ারটা পুলিশে ভর্তি। বাইরে থেকেও পুলিশ আনা হয়েছিল। আজকের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছিল আগে থেকেই। আগে থেকেই জানা গিয়েছিল এমন একটা কিছু হবেই। পুণ্যশ্লোকবাবুর কানে আসছিল ফায়ারিং-এর শব্দ। সমস্ত রাইটার্স বিল্ডিংটা যেন মাতাল হয়ে উঠেছিল সেই শব্দে। ঘরে ঘরে ক্লার্করা কেউই কাজ করেনি। সেক্রেটারিরা শুধু নিয়ম-মাফিক হুকুম তামিল করে গেছে। রাজনৈতিক জীবনে এ-রকম ঘটনা নতুন নয়। অনেক মিটিং দেখেছেন পুণ্যশ্লোকবাবু। অনেক গোলমাল গন্ডগোলের মুখোমুখি হয়েছেন তিনি জীবনে। জীবনে উন্নতি করা কি সোজা? বিশেষ করে রাজনীতিক জীবনে! যেখানে রাজনীতিটা প্রায় পেশার পর্যায়ে এসে পেঁাচেছে সেখানে এ-সংগ্রাম অনিবার্য। এককালে হয়ত সোজাই ছিল! কিন্তু সোজা ছিলই বা বলি কী করে! সেই সেকালেই কি কম ঝঞ্ঝাট গেছে তাঁর। সেকালেও ছিল পুলিশের বন্দুক, সেকালেও ছিল জেল। জেলখানার মধ্যে কতবার অনশন করতে হয়েছে তাঁকে, তা আজকালকার বিশেষ কেউ জানে না। আজকালকার ছেলে-ছোকরাদের কাছে তিনি মৃত! কিন্তু তখন যেখানে যেখানে তিনি গেছেন, গিয়ে দাঁড়িয়েছেন, সেখানেই সমস্ত জনতা উদ্বেল হয়ে উঠেছে তাঁকে দেখে। তিনি কিছু বলবার আগেই তারা হাততালি দিয়েছে। তাঁর বক্তৃতা শোনবার আগেই তাঁকে তারা মাথায় তুলে নিয়েছে। কলকাতা থেকে গোহাটি, গোহাটি থেকে ফরিদপুর, ফরিদপুর থেকে নারায়ণগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ থেকে ঢাকা, বরিশাল, সমস্ত বাংলা দেশময় তাঁকে একটার পর একটা বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে হয়েছে। ফুলের মালায় গলা ভর্তি হয়ে গেছে। সে-সব ইতিহাস যদি কেউ এখন লিখতো তাহলে আজ-

কালকার ছেলেরা তা পড়ে বুঝতে পারতো পুণ্যশ্লোকবাবুও দেশের জন্যে কিছু কম করেননি। আজকের ঐ পূর্ণবাবুর তুলনায় তিনিও কিছু কম নন।

ক্যাবিনেটের মিটিং হবার সময় তিনি চুপ করে সেইসব কথাই ভাবছিলেন। সকলের মুখই খুব গম্ভীর। বোধহয় ভেতরে ভেতরে সবাই-ই সেই কথাই ভাবছিল। অনেক দিন আগে থেকেই ভাবনা চলছিল, প্ল্যান্ চলছিল। চিফ-মিনিষ্টার এ-ব্যাপারে বরাবরই কড়া। বড় কড়া ষ্টেপ্ নিয়েছিলেন শুরু থেকেই।

ডক্টর রায় শুরু থেকেই কড়া মানুষ। চারদিকে যখন অরাজক অবস্থা তখন তাঁর মেজাজ টলে না। অবশ্য যতক্ষণ পুলিশ-মিলিটারি হাতে রয়েছে ততক্ষণ ভয় কীসের? কিন্তু আসলে ভয় সকলেরই জনতাকে। জনতাকে আজ না-হয় বন্দুক উঁচিয়ে শায়েস্তা করা গেল, কিন্তু ভোটের সময়?

সেই ভোট আসছে বলেই তো এত ভাবনা। নইলে আর কী! অন্য সময় হলে তো কাউকে পরোয়া করবার দরকারই ছিল না। ঘরের মধ্যে সকলেই তুমুল আলোচনা করছিল। ক্লোজ্‌ড-ডোর মিটিং। প্রেসের লোকজনদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি। তাই যার যা বলবার অধিকার ছিল সবই অবাধ। সামনের ইলেকশানের কথা ভেবেই সবাই বিব্রত।

হঠাৎ পর্মিলির কথা মনে পড়লো।

মনে পড়তেই যেন চোখের সামনে থেকে সব কিছু মুছে গেল। মুছে গেল ইলেকশান, মুছে গেল ক্যাবিনেট। মুছে গেল সমস্ত বন্দুক আর টিয়ার-গ্যাস ছোঁড়ার আওয়াজ।

মনটা সেইজন্যে সকাল থেকেই খারাপ ছিল। কেন পর্মিলি গিয়েছিল ওদের ক্যাম্পে? পর্মিলি কি জানতো না যে ওদের পার্টির অফিসে যাওয়া মানে আমাকে অপমান করা? হয়ত পর্মিলি জানতো। হয়ত জেনেশুনেই কাজটা করেছিল। হয়ত সত্যিই মেয়ের চোখে তিনি আর শ্রদ্ধার পাত্র নন! আর নন বলেই তো অমন করে বলতে পারলো ওই কথাগুলো।

নিজের কাছেই নিজেকে যেন অপরাধী মনে হলো তাঁর। পর্মিলি যা বলেছে তা কি সত্যি? সত্যিই কি তিনি নিজের স্বার্থে নিজেকে ব্যবহার করেছেন? নিজের মেয়েকে মেমসাহেব রেখে পিয়ানো বাজনা শিখিয়েছেন শুধু কি নিজে পাবলিক লাইফে উন্নতি করবার জন্যে? ক্লাবে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলেন পর্মিলিকে, তাও কি সেই কারণেই?

পর্মিলির মুখ থেকে কথাগুলো শোনবার পর থেকেই মনটা কেমন অপরাধী হয়ে গিয়েছিল।

পুণ্যশ্লোকবাবুর কাছে তখন সমস্ত জীবনটাই যেন নিরর্থক হয়ে উঠেছিল। সেই ছোটবেলা থেকে এই আজ পর্যন্ত যেন সবটুকুই ছলনা। তিনি যেন নিজের অজ্ঞাতেই সকলকে কেবল ছলনা করে এসেছেন। সকলকে ছলনা করেছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও ছলনা করেছেন। পর্মিলি যেন ঠিকই ধরেছে, তাঁর নিজের মেয়ে হলেও সে তো আর ছোট নেই এখন। তারও একটা নিজস্ব সত্তা বলে বস্তু সৃষ্টি হয়েছে। ঠিকই বলেছে সে—পুণ্যশ্লোকবাবু তাঁর নিজের মেয়েকে ভাড়া খাটিয়ে নিজের বড় হওয়ার পথ সুগম করেছেন।

সকালবেলার ঘটনাটা আবার তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠলো।

টেলিফোনটা সেরে আবার তিনি বাইরে এলেন। দেখলেন প্রজেশ তখনও

করিডোরে পায়চারি করছে।

প্রজেশ পুণ্যশ্লোকবাবুর প্রসাদপুষ্ট জীব। পুণ্যশ্লোকবাবুকে ত্যাগ করার অর্থ সে বোঝে। বোঝে যে পুণ্যশ্লোকবাবুকে আঁকড়ে ধরে থাকার সার্থকতার মধ্যেই তার সিদ্ধি।

পুণ্যশ্লোকবাবুকে দেখেই সে এগিয়ে এল আশান্বিত দৃষ্টি নিয়ে।

বললে—পুণ্যদা, আপনি আমাকে দাঁড়াতে বলেছিলেন...

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—হ্যাঁ. তোমার সঙ্গে আমার কথা ছিল, এসো, লাইব্রেরি ঘরে এসো, একটু নিরিবিলিতে বলতে হবে—

বলে লাইব্রেরি-ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকলেন। প্রজেশও পেছন পেছন গেল।

এই লাইব্রেরি-ঘরের মধ্যেই একদিন পুণ্যশ্লোকবাবু সুরেনকে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। সেদিন ভেবেছিলেন প্রজেশের পর এই সুরেনকে দিয়েই একদিন তিনি আবার আরো উঁচু শিখরে উঠবেন। সুরেনই লিখবে কংগ্রেসের ইতিহাস। আর সেই ইতিহাসের ফাঁকে পুণ্যশ্লোকবাবুর কীর্তি-গাথা উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা থাকবে। আসলে এই-ই ছিল উদ্দেশ্য। কিন্তু তা হলো না।

প্রজেশের দিকে চেয়ে পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—তুমি তো সবই জানো প্রজেশ। তোমাকে আর নতুন করে কী বলবো! আজ পর্মিলি আমাকে যা বললে তা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে—

প্রজেশ বিনীত সুরে বললে—কী বলেছে পর্মিলি?

পুণ্যশ্লোকবাবু গম্ভীর হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ নীরবতা ভাঙলেন।

বললেন—আচ্ছা প্রজেশ, তুমি কি মনে করো আমি পর্মিলিকে মদ খেতে শিখিয়েছি? আমি নিজের উন্নতির জন্যে তাকে ভাড়া খাটিয়েছি!

প্রজেশ অবাক হয়ে গেল।

বললে—এই কথা পর্মিলি আপনাকে বলেছে নাকি?

পুণ্যশ্লোকবাবু সে-কথার উত্তর না দিয়ে বললেন—আমার নিজেরই কী-রকম খারাপ লাগছে প্রজেশ। আজকে এমনিতেই আমরা সবাই বিব্রত। সামনে ইলেকশান আসছে। তুমি জানো ইলেকশানের সময় আমার ব্লাড-প্রেশার কী-রকম বাড়ে! তার ওপর হঠাৎ পর্মিলির এই ব্যাপার—

প্রজেশ বললে—সত্যি, আপনার ব্লাড-প্রেশারটা নেগলেক্ট করা উচিত নয়, একবার ডাক্তারকে খবর দেবো আমি?

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—না না, তোমার কিছু ভাবতে হবে না। যা হবার তা হবে—

প্রজেশ বললে—ও-কথা বলবেন না স্যার। আচ্ছা আমিই না-হয় ডাক্তারকে একবার আসতে বলবো। আমাকে একটু এদিকটা দেখতে হবে—

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—না, তা আর দেখতে হবে না তোমাকে। তোমাকে শুধু একটা অনুরোধ করবো, তোমাকে রাখতে হবে—

—বলুন, বলুন কী অনুরোধ. আর অনুরোধ বলছেন কেন? আমাকে আপনি ও-ভাবে কথা বলবেন না পুণ্যদা!

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—আচ্ছা, একটা কথা, পর্মিলির বিয়ে দিলে কেমন হয়?

—বিয়ে!

—হ্যাঁ, বিয়ে। বিয়েই দিতে হবে মনে হচ্ছে পর্মিলির! মনে হচ্ছে বিয়ে

দিইনি বলেই বোধহয় এই রকম হয়েছে। বয়েসের ধর্ম বলে তো একটা কথা আছে! আমি সারাজীবন দেশের কাজ নিয়ে মেতে ছিলাম, ছেলেমেয়ের কথা ভাববার সময়ই পাইনি। এখন দেখছি সমস্তই আমার অপরাধ!

প্রজেশ বললে—অপরাধ বলছেন কেন? আপনি তো পর্মিলি-সুব্রতর জন্যে যথেষ্ট করেছেন। আর কেউ না-জানুক, আমি তো জানি। আপনি কেন ও-সব ভেবে মিছিমিছি কষ্ট পাচ্ছেন?

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—কিন্তু পর্মিলি তো আজ আমাকে সেই কথাই বললে এতক্ষণ! আর সেইজন্যেই তো আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। তাই ভাবলাম তোমার সঙ্গে পরামর্শ করবো। তা বিয়ে তো দেবো, কিন্তু কাব সঙ্গে দিই বলতে পারো?

প্রজেশ কোনও উত্তর দিলে না। চুপ করে রইল।

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—তুমি কি জানো পর্মিলির সঙ্গে কারো ভাব-ভালবাসা আছে? মানে কার সঙ্গে বেশি মেলামেশা করে ও?

প্রজেশ হঠাৎ এ-কথার উত্তর দিতে পারলে না। বললে—আমি বরং খোঁজ নেবার চেষ্টা করবো—

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—সে কী? এতদিন ধরে এখানে আসছ-যাচ্ছ এ-খবরটাও তুমি রাখো না? তোমাকে দিয়ে কি একটা কোনও কাজও আমাব হবে না? তাহলে তুমি আমার সঙ্গে আছ কী করতে?

প্রজেশ যেন কেমন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো।

বললে—পর্মিলিকেই আপনি জিজ্ঞেস কবলেন না কেন?

পুণ্যশ্লোকবাবু আর ধৈর্য ধরতে পারলেন না।

বললেন—তুমি যে কী বলো তার ঠিক নেই। এ-সব কথা কি আমি ওকে জিজ্ঞেস করতে পারি? না পর্মিলিই আমাকে এর উত্তর দিতে পারে। তোমার দ্বারা কি একটা কাজও হবার নয়! আমার মনে হচ্ছে এতদিন পর্মিলির বিয়ে না দিয়ে আমি ভুল করেছি। তোমার কী মনে হয়?

প্রজেশ বললে—আমি আর এ-ব্যাপারে কী বলবো, বলুন?

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—বা রে. প্রায় সেই ছোটবেলা থেকে তুমি পর্মিলিকে দেখে আসছো, তুমি বলবে না তো কি আমি বলবো? আর ধরো যদি সে-রকম কিছু না থাকে তো আমাকে ওর জন্যে একটা পাত্র দেখতে হবে—! কী বলো?

প্রজেশ বললে—হ্যাঁ, তা তো দেখাই উচিত—

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—তুমি তো উচিত বলেই খালাস, কিন্তু ওর মতন মেয়ের পাত্র খোঁজাই কি সোজা? কোথায় পাই তেমন পাত্র?

তারপর হঠাৎ মাথায় কী যেন একটা ভাবনা এল।

একটু থেমে বললেন—আচ্ছা, একটা কথা, সংসারে তোমার কে-কে আছে?

—আমার? প্রজেশ আকাশ থেকে পড়লো।

—হ্যাঁ, মানে তোমার বাবা-মা, কাকা-কাকীমা, ভাই-বোন কেউ নেই?

প্রজেশ বললে—না—

—না মানে? কোনও কালে তারা ছিল তো?

প্রজেশ বললে—বাবা-মা ছিল, আত্মীয়-স্বজনও কিছু কিছু ছিলই, কিন্তু আমি তাদের সঠিক মনে করতে পারি না। ছোটবেলা থেকেই আমি পরের বাড়ি মানুষ হয়েছি। তারপর বড় হয়ে যেদিন থেকে কংগ্রেসে ঢুকেছি, জেল খেটেছি, পিকেটিং করেছি তখন থেকেই তারা আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে—।

তখন থেকেই আমি আপনার কাছে আছি—

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—সে তো জানি। কিন্তু তুমি তো তা সত্ত্বেও টাকা-কড়ি জমিয়েছ; বাড়িও করেছ একটা—

প্রজেশ বললে—হ্যাঁ—তেমন বড় বাড়ি নয়—

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—তা হোক, বড় হোক আর ছোটই হোক, কলকাতা সহরের মধ্যে জমি কিনে বাড়ি করা কি সোজা কথা নাকি? তা বাড়ি থেকেও তো তোমার কিছু ইনকাম হয়?

প্রজেশ বললে—হ্যাঁ, খানিকটা পোরশান ভাড়া দিয়ে মাসে আড়াইশো টাকা পাই—

—আর মাইনে? মাইনে তুমি কত পাও, ভুলে গেছি—

প্রজেশ বললে—বারো শো—

—এ ছাড়া আর কিছু ইনকাম আছে তোমার?

প্রজেশ বললে—আছে, এদিক-ওদিক থেকে প্রেসের মালিকরা কিছু কমিশন দেয় কাজের জন্যে। তাও মাসে তিন চারশো টাকার মতন হয়—

পুণ্যশ্লোকবাবু কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর বললেন—আচ্ছা, আর একটা কথা, তোমার সঙ্গে পর্মিলির রিলেশন কেমন? পর্মিলি কি তোমার কোম্পানি পছন্দ করে?

প্রজেশ বললে—তা মনে হয়, করে!

—পছন্দ করে?

প্রজেশ বললে—মুখ ফুটে কখনও কিছু বলেনি পর্মিলি, কিন্তু মনে হয় অপছন্দ করে না।

পুণ্যশ্লোকবাবু যেন খানিকটা নিশ্চিন্ত হলেন।

বললেন—তাহলে প্রজেশ তুমি একটা কাজ করো না! তুমি নিজেই বরং একদিন পর্মিলির কাছে প্রপোজ করো, দেখ না পর্মিলি কী বলে! পর্মিলি যদি রাজী থাকে তো আমার কোন আপত্তি নেই! বুঝলে আমি ভেবে দেখলুম, আমারই অন্যায় হয়েছে। নানান ঝঞ্ঝাটের মধ্যে থেকে আমি বলতে গেলে পর্মিলির কথাটা ভুলেই গিয়েছিলুম—। আর তা ছাড়া সত্যিই তো একটা বয়েস আছে যে-বয়েসে বিয়ে করা দরকার হয়। তোমরাও তো সে বয়েস হয়েছে প্রজেশ, তোমারও তো একটা বিয়ে করা উচিত—

প্রজেশ কিছু উত্তর দিলে না! চুপ করে রইল।

পুণ্যশ্লোকবাবু এ-কথার পর আর দাঁড়াননি! উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন—ঠিক আছে, তাহলে ওই কথাই রইল। যদি পর্মিলি তোমার প্রোপোজালে রাজী হয় তো ওয়েল-এ্যান্ড-গুড্। আর যদি তা না হয় তো আমাকে আবার নতুন করে ভেবে দেখতে হবে—

পরদিন পুণ্যশ্লোকবাবু যখন গাড়িতে করে সেক্রেটারিয়েটে যাচ্ছিলেন, তখনই দেখেছিলেন কড়া পাহারার বন্দোবস্ত রয়েছে চারদিকে। কলকাতা সহরটাই যেন থমথম করছে।

আর তারপরেই সেই ক্লোজ্ড্-ডোর মিটিং—

গাড়িটা ক্যানিং স্ট্রীট দিয়ে ঘুরে আসছিল। ওই একটা দিকে পুলিশ পাহারা দিয়ে রেখে দিয়েছে।

মিনিষ্টার আর অফিসারদের যাতায়াতের জন্যে এই রাস্তাটা খালি করে

রেখেছে পুলিশ।

পুণ্যশ্লোকবাবুর গাড়ি আস্তে আস্তে সেই রাস্তা দিয়ে একেবারে মহাত্মা গান্ধী রোডে গিয়ে পড়লো। তিনি বুঝতে পারলেন কলকাতা সহরের অবস্থা অস্বাভাবিক। রাস্তায় লোক-চলাচল কমে গেছে। সবাই খবর পেয়ে গেছে সহরে গুলি চলেছে, গুলিতে লোক মরেছে। বাস-ট্রাম কিছু কিছু বন্ধ হয়ে গেছে। হাওড়া ষ্টেশনে যারা ট্রেণে এসে পৌঁছিয়েছে, তারা কুলির মাথায় মোটঘাট চাপিয়ে দিয়ে ফুটপাথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে যে-যার গন্তব্য স্থানে চলেছে। লোকের কষ্টের শেষ নেই। এটাই ওরা বোঝে না। এতগুলো লোকের অসুবিধে ঘটিয়ে ওরা কংগ্রেসকে হটাবে! এমনি করেই ওরা ভোটে জিতবে! ফুলস্! প্যাক্ অব্ ফুলস্—দোজ কমিউনিষ্টস্!

হঠাৎ যেন দক্ষিণ দিক থেকে আবার গুলি ছোঁড়ার শব্দ হলো।

তখনও চলছে ওদের ফায়ারিং। চলুক। একটু জব্দ হোক। জব্দ না হলে ওদের শিক্ষা হবে না। আমরা যেন দেশের কিছু ভালো করিনি। আমরা যেন কিছু ত্যাগ করিনি। আমরা যেন একদিন জেল খাটিনি। ওরা একলাই শুধু জেল খেটেছে, গুলি খেয়েছে, পুলিশের লাঠি খেয়েছে।

অনেক রাস্তা ঘুরে ঘুরে পুণ্যশ্লোকবাবুর গাড়ি আবার সুকীয়া স্ট্রীটের গলির মধ্যেই ঢুকলো।

বাড়ির গেটের মধ্যে গাড়ি ঢুকতেই দরোয়ান সেলাম ঠুকলে।

গাড়িটা করিডোরের সামনের পোর্টিকোতে আসতেই দেখলেন, প্রজেশ দাঁড়িয়ে আছে। তার চোখ-মুখ শুকনো।

পুণ্যশ্লোকবাবু গাড়ি থেকে নেমেই জিজ্ঞেস করলেন—কী খবর প্রজেশ? কখন এলে?

—এই এক ঘণ্টা হলো এসেছি।

—ওদিককার কিছু খবর পেয়েছ?

প্রজেশ বললে—পেয়েছি, কিন্তু পুণ্যদা, পর্মিলি বাড়িতে নেই—

—সে কি? বাড়িতে নেই পর্মিলি?

প্রজেশ বললে—না—

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—কী আশ্চর্য, এই দুর্যোগের মধ্যে কোথায় বেরোল সে?

প্রজেশ বললে—আমি তো ছিলুম না, একটা কাজে গিয়েছিলুম, এসে দেখি পর্মিলি নেই—

তিনি অবাক হয়ে গেলেন আরো। প্রজেশ তখনও দাঁড়িয়ে সামনে।

বললেন—তা তুমি থাকলে না কেন এখানে! তোমাকে এ-বাড়ি থেকে চলে যেতে কে বললে? জানো তুমি যে, একটা ঝঞ্ঝাটের মধ্যে দিয়ে দিন কাটছে। এই ক'টা দিন একটু তুমি পর্মিলিকে সামলে চলতে পারলে না?

প্রজেশ বললে—সেই জন্যেই তো আমি আজকে অফিসেই যাইনি—

—অফিস যাওনি তো কোথায় গিয়েছিলে?

প্রজেশ বললে—একবার শুধু বাড়িতে গিয়েছিলাম খেতে। বাড়ি থেকেই অফিসে টেলিফোন করে দিয়েছিলাম যে আমি যাবো না—

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—হ্যাঁ, ভালোই করেছ অফিসে যাওনি—

প্রজেশ বললে—তারপর সেখান থেকে এসেই শুনি পর্মিলি নেই—

—কিন্তু কোথায়ই বা গেল! আজকের মতন দিনে কোথায়ই বা সে যাবে?

জানো, ডাক্তার রায় ভয়ানক রেগে গেছেন্। পুলিশ কমিশনারকে অর্ডার দেওয়া হয়ে গেছে ফায়ার করবার জন্যে! আইন ভাঙলেই অ্যারেস্ট্ করা হবে। সমস্ত ট্রাম রাস্তা থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে—বাসও চলছে না সব রাস্তায়—

প্রজেশ বললে—সে তো আমি রেডিওতেই শুনলুম—

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—ক্যাবিনেট মিটিং-এ সবাই খুব গরম হয়ে গিয়েছিল। দিল্লীতেও ট্রাঙ্ক-কল করা হয়েছিল। হোম-মিনিস্টারের কাছ থেকেও কন্সেণ্ট্ পাওয়া গেছে—। কিন্তু সে-সব কথা থাক, আমার মনটা আজ সারাদিন খুবই এজিটেটেড্ রয়েছে। আমি চুপ করে ছিলুম সব সময়। ডাক্তার রায় আমাকে অনেকবার জিজ্ঞেস করেছিলেন—তুমি চুপ করে আছ কেন পুণ্য-শ্লোক?...আমি কিছু বলতে পারলুম না। কী-ই বা বলবো? আমার কী-ই বা বলবার ছিল? কার কাছে সব বলবো? কেবল মনে হচ্ছে এতদিন ধরে যা-কিছু করেছি, সব ভুল করেছি।

প্রজেশ সান্ত্বনা দিয়ে বললে—ভুল করেছেন বলছেন কেন পুণ্যদা! আপনি যা ভালো বুঝছেন, যা ন্যায় বলে মনে করেছেন তাই-ই করেছেন! আপনি ভালো মনে করেছেন বলেই তো সুব্রতকে হায়ার এডুকেশনের জন্যে আমেরিকায় পাঠিয়েছেন। আর পর্মিলি? পর্মিলি কি বলতে পারবে যে তাকে আপনি নেগলেক্ট করেছেন? আপনি মেমসাহেব রেখে ওকে পিয়ানো বাজনা শিখিয়েছেন, সিনিয়র কেম্‌ব্রিজ পাশ করিয়েছেন। ওর জন্যে আলাদা গাড়ি, আলাদা ড্রাইভার রেখে দিয়েছেন। মানুষ ছেলে-মেয়েদের জন্যে আর কী-ই বা করতে পারে?

পুণ্যশ্লোকবাবু মাথার চুলের মধ্যে হাত চালিয়ে দিলেন। বললেন—তুমি তো তাই বলছ। আর এতদিন আমিও তাই ভেবে এসেছি। কিন্তু ওরা তো তা ভাবে না। ওরা তো ভাবে আমি নিজের ইজ্জৎ বাড়াবার জন্যে সব কিছু করেছি—

হঠাৎ থেমে গিয়ে আবার বললেন—তোমাকে আমি যে-কথা বলেছি এখনও তাই বলছি প্রজেশ। পর্মিলির যদি আপত্তি না থাকে তো তুমি ওকে বিয়ে কর প্রজেশ। আমি অন্ততঃ বাঁচি—

প্রজেশ বললে—আপনি কী বলছেন পুণ্যদা, আমি তো স্বপ্নেও ভাবতে পারছি না—

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—না, স্বপ্ন নয়! দেখ, আমি অনেক ভেবে দেখেছি। চেষ্টা করলে আমি হয়ত পর্মিলির একটা ভালো পাত্র পেতে পারি। কলকাতা সহরে বনেদী বড়লোকের অভাব নেই। আমি প্রস্তাব করলেই তারা সেটা লুফে নেবে। তারা আমার পোজিশানের কথা জানে, আমার যে টাকা আছে, তাও তারা জানে! কিন্তু আমি তা চাই না—

—কেন, ক্ষতিটা কী?

—না, প্রজেশ, এই ক'বছরে আমি অনেক দেখেছি। আর তুমিও অনেক দেখেছ! আজকালকার বনেদী বংশের বড়লোকদের ছেলেদের সম্বন্ধে আমার ভালো ধারণা নেই। আমি পুলিশ রিপোর্ট পড়ে দেখেছি, আজকাল সহরে ডাকাতি-রাহাজানির পেছনে তারাই আছে! এই যে গাড়ি চুরি যাওয়া। এর পেছনেও তারা। বড়-বড় ফ্যামিলির ছেলেরাই আজকাল গাড়ি চুরি করে নিয়ে পালাচ্ছে, তারপর তিন-চার দিন পরে সেই গাড়ি ভাঙাচোরা অবস্থায় পাওয়া যাচ্ছে কোনও রাস্তার ধারে। তুমি শুনলে অবাক হয়ে যাবে প্রজেশ, যদি তোমাকে সেই সব বংশের নাম বলি।

প্রজেশ চুপ করে রইল। কোনও উত্তর দিলে না।

পুণ্যশ্লোকবাবু আবার বলতে লাগলেন—তুমি শুধু রাজী কিনা সেইটে আমাকে বলো?

প্রজেশ একবার মাথা নিচু করলো। একবার ভেবে নিলে। পর্মিলিকে যদি বিয়ে করতে পারে প্রজেশ তো-জীবনে আর কী চায় সে! এই পুণ্যশ্লোকবাবু তাকে ভলান্টিয়ার করে নিয়েছিলেন কংগ্রেসের। তারপর চাকরি পাইয়ে দিয়েছেন। আর তারপর আজ...

—বলো ভাবছো কী? উত্তর দাও—আমি ইলেকশানের আগেই ঝঞ্ঝাটটা চুকিয়ে ফেলতে চাই। তুমি তো জানো, আমি যা ভাবি তা করি। যত তাড়াতাড়ি পারি তা করি। পর্মিলির বিয়েটাও তাড়াতাড়ি চুকিয়ে দিতে না পারলে আমি ইলেকশানের দিকে পুরোপুরি মন দিতে পারবো না—এবারের ইলেকশান অন্যবারের মত তো নয়। সেবার কংগ্রেসের নামেই লোকে গদ্‌গদ হয়ে ভোট দিত—এবার তো আর তা নয়। এবার নিজে প্রত্যেক বাড়িতে গিয়ে গিয়ে আমাকে হাতজোড় করে দাঁড়াতে হবে—

প্রজেশ চুপ করে পুণ্যশ্লোকবাবুর কথাগুলো শুনছিল।

পুণ্যশ্লোকবাবু আবার বললেন—কী হলো, তুমি কিছু জবাব দিচ্ছ না যে?

প্রজেশ বললে—আমি কী জবাব দেবো বলুন—

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—তুমি রাজী কিনা সেটা আমাকে বলবে তো?

প্রজেশ বললে—আমি রাজী হলে কী হবে, পর্মিলির মতও তো নিতে হবে। সে যদি রাজী না হয়?

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—কিন্তু এতদিন ধরে তো পর্মিলির সঙ্গে মিশছো, এক ক্লাবের মেম্বার ছিলে তোমরা। দু'জনে এক সঙ্গে কত মেলামেশা করেছ, তাকে তুমি রাজী করতে পারবে না? তাহলে তুমি এতদিন আমার সঙ্গে মিশে কী শিখলে?

প্রজেশ খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বললে—আমি চেষ্টা করবো পুণ্যদা, আমি আপ্রাণ চেষ্টা করবো—

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—হ্যাঁ, চেষ্টা করো। তাছাড়া, যে-যাই বলুক, পর্মিলি আসলে মেয়ে ভালো। আমার নিজের মেয়ে বলে বলছি না। তুমি নিজেই তো দেখেছ! একটু হট-হেডেড। একটুতেই রেগে ওঠে। কিন্তু তখনি আবার জল হয়ে যায়। রাগ মনে পুষে রাখে না—

প্রজেশ বললে—সে আমি জানি—

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—কিন্তু সন্ধ্যে হয়ে গেল, এখনও তো এল না সে—

প্রজেশ বললে—কোথায়ই বা যেতে পারে সে? থানাগুলোতে টেলিফোন করবো?

—থানাতে টেলিফোন করে কী হবে! হয়ত ক্লাবে গেছে। বরং তার ক্লাবে টেলিফোন করতে পারো—

—কিন্তু এই হ্যাঙ্গামে কি ক্লাব খোলা থাকবে?

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—আরে, ক্লাবের কথা আর বোল না। তাদের কাছে হ্যাঙ্গাম-ট্যাঙ্গাম নেই। সেখানে ঠিক তাদের সব কাজ নিয়ম করে চলছে, দেখো গে যাও—

প্রজেশ ঘরে ঢুকে টেলিফোন রিসিভারটা তুলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই সেটা বেজে উঠলো।

প্রজেশ সেটা তুলে বললে—হ্যালো—

পুণ্যশ্লোকবাবু পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন।

প্রজেশ রিসিভারটা মুখ থেকে সরিয়ে বললে—আপনাকে চাইছে—

—কে?

—কংগ্রেস অফিস থেকে বলছে—

পুণ্যশ্লোকবাবু রিসিভারটা কানে নিয়ে বললেন—কে?

তারপর একটু চুপ। কিন্তু তারপরেই যেন চমকে উঠলেন।

বললেন—পর্মিলি? পর্মিলি ওখানে রয়েছে? পর্মিলি ওখানে এল কী করে?

ও-পাশ থেকে কংগ্রেসের সেক্রেটারি বললে—রাস্তায় প্রোসেশানের ভিড়ের মধ্যে ওর গাড়ি ঘেরাও করেছিল ওরা। পুলিশ তাকে ছাড়িয়ে এখানে নিয়ে এসে তুলেছে।

—ওর গায়ে হাত দেয়নি তো কেউ?

—না, তা দেয়নি। কিন্তু আপনার গাড়িটা পুড়িয়ে দিয়েছে ক্রাউড্। গাড়িটা সেখানে ফেলে রেখে পুলিশ-ভ্যানে করে আপনার মেয়েকে এখানে এনে তুলেছে।

—কিন্তু তাকে আমার বাড়িতে নিয়ে আসেনি কেন?

—আপনার বাড়ি যাবার সমস্ত রাস্তা ব্লক্‌ড্‌ হয়ে আছে। ওখানে দু'খানা ডবল্-ডেকার পুড়ছে!

—তা সেণ্ট্রাল এ্যাভিনিউ-এর রাস্তা দিয়ে তো আসতে পারতো?

—সেখানে ফায়ারিং চলছে এখনও। সাউথ থেকে নর্থে যাবার সমস্ত রাস্তা এখন বন্ধ!

—এখনও কি ওদের প্রোসেশ্যন চলছে নাকি?

সেক্রেটারি বললে—যা রিপোর্ট পাচ্ছি তাতে মনে হচ্ছে ওরা রাস্তায় বসে পড়েছে। আর ধর্মতলার চারদিকে রাস্তার আলো নিভে অন্ধকার হয়ে গেছে। চারদিকে ধোঁয়ায় ধোঁয়া।

—মরেছে ক'জন? কিছু ফিগার পেয়েছ?

—না, এখনও পাইনি তবে চল্লিশ-পঞ্চাশজনের কম নয়। আর আহত হয়েছে অন্ততঃ শ'চারেক লোক।

—সে কী!

সেক্রেটারি ওপাশ থেকে বললেন—আপনি কিছু ভাববেন না, আপনার মেয়েকে আমরা এখানে নিরাপদে রেখে দিয়েছি। তার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না। রাস্তাটা একটু সেফ্ হলেই আপনার বাড়িতে পৌঁছে দেবো।

—কিন্তু পর্মিলি ওদিকে গিয়েছিল কেন, কিছু বলছে না?

—না সে-কথা আমরা জিজ্ঞেস করতে পারি না।

—ঠিক আছে, একটু সুবিধে পেলেই আমি ওকে নিয়ে আসবার চেষ্টা করছি—

বলে রিসিভারটি রেখে দিলেন পুণ্যশ্লোকবাবু। তারপর প্রজেশের দিকে চাইলেন। কিন্তু মুখে কিছু না বলে চেয়ারটায় হেলান দিলেন।

সমস্ত দিনটাই ঝড়ের মত গেল। এ-ঝড় এখনও থামেনি। আর এ-ঝড় সেই ইলেকশানের আগে থামবে না বলেই তাঁর মনে হলো।

প্রজেশ অনেকক্ষণ পরে জিজ্ঞেস করলে—আমি যাবো পুণ্যদা?

—কোথায়?

—পর্মিলিকে আনতে।

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—যাবে কী করে শুনি? রাস্তা যে বন্ধ! দু'খানা স্টেট্ বাস পুড়ছে ধর্মতলায়। প্রাইভেট্ কারও পুড়িয়েছে। এদিকে সেন্ট্রাল এ্যাভিনিউও অন্ধকার। ওখান দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যেতে পারবে? তোমার গাড়িও যদি পুড়িয়ে দেয়? দেশটাকে একেবারে ছারখার না করে দেখছি ওরা ছাড়বে না।

বলে আবার খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন।

প্রজেশ কী করবে বুঝতে পারলে না। তারপর বললে—আপনি যদি বলেন তো চলে যেতে পারি এখনই—

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—তুমি থামো। তুমি দেখছি কোনও কাজের নও। তোমার সে-লোকগুলো কোথায় গেল? যাদের তুমি হাজার-হাজার টাকা দিয়ে এলে? শেষকালে পমিলির গাড়িটা পুড়িয়ে দিলে আর তারা কিছু করতে পারলে না?

প্রজেশ কী উত্তর দেবে এ-কথার? কী উত্তর দেবারই বা ছিল তার? সে অপরাধীর মত চুপ করে মাথা নিচু করে রইল।

ভূপতি ভাদুড়ীর সারাদিন বড় ধকল গেছে। সেই সমস্ত রাত জেগে চোর ধরা। তারপর থানায় গিয়ে দারোগার খোসামোদ করা। আর শুধু মুখের খোসা-মোদে তো কাজও হয় না। নগদ টাকাও গুঁজে দিতে হয়েছিল সকলকে। আর টাকা না দিলে কোন্ কাজটাই বা হয় কলকাতা সহরে! তারপর সুখদাকে পুলিশ থানায় নিয়ে গিয়ে হাজতে পুরলো।

এ-সব কাজে পুলিশের পেছনে লেগে পড়ে থাকতে হয়। লেগে পড়ে না থাকলে আবার অন্য পক্ষ টাকা দিয়ে কেস খারাপ করে দিতে পারে। তাই সুখদা চলে যাবার পর ভূপতি ভাদুড়ীও পেছন-পেছন থানায় গিয়ে হাজির হয়েছিল।

অনেকক্ষণ সেখানে কাটাবার পর দারোগাবাবুর যেন একটু দয়া হলো।

বললে—আপনি আর এখানে কেন? যা করবার তা আমরাই করবো—

ভূপতি ভাদুড়ী হাত জোড় করলে—দয়া করে যেন আসামীকে জামিনে খালাস করবেন না আপনারা—

দারোগাবাবু বললে—তা জামিন দেবার মালিক কি আমরা হে?

ভূপতি ভাদুড়ী সব জানে। বললে—আপনারাই তো আসল মালিক বড়-বাবু। কলকাতা সহরেরই তো মালিক আপনারা—

বড়বাবু বললে—ও-সব কথা থাক, আইন ছাড়া আমরা কিছু করতে পারি না—

ভূপতি ভাদুড়ী ততক্ষণে ফতুয়ার পকেট থেকে এক তাড়া নোট বার করতে শুরু করে দিয়েছে। সেগুলো পাকিয়ে মুঠোর মধ্যে পুরে সামনে বাড়িয়ে ধরেছে।

বললে—কী যে বলেন বড়বাবু, আপনারাই তো আইন। আপনারা যা করবেন সেইটেই আইন হবে।

বোধহয় দয়া হলো বড়বাবুর।

বললে—এখন যান। খেয়ে-দেয়ে বরং বিকেলবেলা আসবেন।—

তা তাই-ই সই। খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম করেই আবার থানায় গিয়ে হাজির। আবার বড়বাবুর সামনে গিয়ে প্রণাম করা।

তখন বড়বাবু এজাহার লেখা নিয়ে ব্যস্ত। সুখদার জবানবন্দী লিখছে খাতায়।

ঘোমটাটা দিয়ে চোখ দুটো ঢেকে সুখদা একটার পর একটা জবাব দিয়ে যাচ্ছে। তার গলার শব্দে মনে হচ্ছে সে অঝোর ধারায় কাঁদছে।

—আপনার বিয়ে কবে হয়েছে?

সুখদা তারিখটা বললে।

বড়বাবু জিজ্ঞেস করলে—আপনি কি বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে অভিভাবকদের বিনা অনুমতিতে বিয়ে করেছিলেন?

—হ্যাঁ।

—আপনার স্বামীর নাম কী?

সুখদা দ্বিধা করতে লাগলো। ভূপতি ভাদুড়ী বললে—কালীকান্ত বিশ্বাস—

—আপনার স্বামীর নাম কালীকান্ত বিশ্বাস?

সুখদা ঘাড় নেড়ে বললে—হ্যাঁ—

বড়বাবু জিজ্ঞেস করলে—আপনার স্বামী কী করেন?

অনেকক্ষণ পরে সুখদা উত্তর দিলে—কিছু না—

—তা আপনার স্বামীই কি আপনাকে গয়না চুরি করতে প্ররোচনা দিয়েছিল?

সুখদা চুপ করে রইল।

বড়বাবু ধমক দিলে একটা।

—বলুন, বলুন—চুপ করে থাকলে কিন্তু চালান দিয়ে দেবো—

সুখদা বললে—হ্যাঁ—

—আপনার স্বামী থাকেন কোথায়? ঠিকানা কী? বলুন, বলুন, চুপ করে থাকলে আপনারই বিপদ হবে—

শেষ পর্যন্ত পুরো জবানবন্দী নেওয়া হয়ে গেল। তারপর কনষ্টেবল সুখদাকে নিয়ে গারদের মধ্যে পুরে দরজায় তালা লাগিয়ে দিলে।

বড়বাবু ভূপতি ভাদুড়ীর দিকে চেয়ে বললে—এখন খুশী তো? যা চেয়েছিলেন তা হয়েছে তো?

ভূপতি ভাদুড়ী সত্যিই খুব খুশী। আবার হাতজোড় করে প্রণাম করলে। বললে—তাহলে আমি আবার আসবো।

রাস্তায় বেরিয়ে ভূপতি ভাদুড়ী একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লে। কিন্তু রাস্তার আলোগুলো তখন সব নিভে গেছে। বাস একটা দুটো চলছে মাঝে মাঝে। কিন্তু ট্রাম বন্ধ। লোকের কথায় বোঝা গেল ধর্মতলার দিকে গুলী চলেছে। বহু লোক মারা গেছে। আরো অনেক খবর এল কানে। মনটা কেমন প্রসন্ন হয়ে উঠলো ভূপতি ভাদুড়ীর। যাক, সব জ্বলে পুড়ে যাক। তার নিজের কার্যসিদ্ধি হয়ে গেছে। এখন কলকাতা পুড়ে ছারখার হয়ে গেলেও আর কোনও দুঃখ নেই তার। বহুকালের পাপ বিদেয় হলো এবার। এবার জেলে গিয়ে পচুক সুখদা। সুখদা পচুক, কালীকান্ত বিশ্বাস পচুক, আর সেই হারামজাদা নরেশ দত্তটাও পচুক। ভূতের কাছে মামদোবাজি! এবার বুঝুক বাছাধন, কত ধানে কত চাল!

মাধব কুণ্ডু লেন দিয়ে বাড়িতে ঢোকবার মুখেই একজন হন হন করে

এগিয়ে এল।

বললে—হ্যাঁ মশাই, সুরেন সান্ন্যাল বলে কেউ এ-বাড়িতে থাকে?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—হ্যাঁ, কেন? আমি তার মামা। কী হয়েছে?

—আপনি তার মামা? তাহলে এখ্‌খুনি একবার মেডিকেল কলেজে যান, এমার্জেন্সী ওয়ার্ডে—

—কেন? বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো ভূপতি ভাদুড়ীর।

ছেলেটা বললে—আপনার ভাগ্নের গায়ে বন্দুকের গুলী লেগেছে, তাকে পুলিশ মেডিকেল কলেজের হাসপাতালে এনেছে, এমার্জেন্সী ওয়ার্ডে।

বলে আর দাঁড়ালো না ছেলেটা। যেমন এসেছিল, তেমনি হন হন করে আবার চলে গেল।

যখন সংবিং ফিরে এলো তখন ছেলেটা অনেক দূর চলে গেছে। ভূপতি ভাদুড়ী তাড়াতাড়ি চিৎকার করে ডাকলে—ও ভাই শোন, ও ভাই—

ভূপতি ভাদুড়ী সেইখানেই খানিকক্ষণ চুপ করে হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইল। যে-ছেলেটা খবর দিয়ে গেল, সে ততক্ষণে হন হন করে গলি পেরিয়ে সদর রাস্তায় পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে। ভূপতি ভাদুড়ীর চোখে সমস্ত আব-হাওয়াটা যেন ঝাপসা হয়ে এল। একটু আগেই সুখদাকে হাজতে পাঠাতে পেরে যে আনন্দটা মনে উদয় হয়েছিল সব যেন উবে গেল। কী করবে সে বুঝতে পারলে না। এতদিন ধরে ভাগ্নেটাকে সামলে চলে চলে শেষকালে তার এই পরিণতি হলো! তীরে এসে তরী ডুবলো। পাকা ঘুঁটি শেষকালে কিনা কেঁচে গেল!

হাঁ করে তখনও ভূপতি ভাদুড়ী সেখানে দাঁড়িয়ে।

ভূপতি ভাদুড়ীর মনে হলো তার সমস্ত মতলব যেন ভেস্তে গেল। এখন কী হবে তার এই এত টাকার সম্পত্তির মালিক হয়ে! আর কতদিন সে বাঁচবে? বহুদিনের বড় সাধ তার, এই বাড়ির তিনতলার ঘরে বসে সে পায়ের ওপর পা তুলে আরাম করবে। শেষ জীবনে ভাগ্নের একটা বিয়ে দেবে। নিজে সে বিয়ে করেনি। বিয়ে কেউ দেয়নি বলেই তার বিয়ে করা হয়নি। বিয়ে করে ছেলে-মেয়ে হলেই যে শান্তি হতো তারই বা কী নিশ্চয়তা ছিল।

বাড়ির সামনে আসতেই বাহাদুর সিং সেলাম করলে। কিন্তু ভূপতি ভাদুড়ী সেদিকে গ্রাহ্যই করলে না। দূর, দূর! সারা জীবন এই চাকরি করেই কাটিয়ে দিলে বেটা। কেবল পাহারা দিয়েই গেল। জানতেই পারলে না কত কী সম্পত্তি চুরি হয়ে যাচ্ছে।

—নমস্কার!

চমকে উঠেছে ভূপতি ভাদুড়ী। বলল—কে? কে তুমি?

লোকটা বললে—আমি সুধন্য।

—সুধন্য? সুধন্য কে?

—আজ্ঞে, আমি বুড়োবাবুর ভাইপো। বুড়োবাবু আমার কাকা।

ভূপতি ভাদুড়ী লোকটার আপাদমস্তক দেখে নিলে একবার। তারপর বললে—তা, কী চাই?

সুধন্য বললে—না, চাই না কিছু। বুড়োবাবুর শরীরটা তো তেমন ভালো যাচ্ছে না। তাই মাঝে মাঝে দেখতে আসি আর কী!

ভূপতি ভাদুড়ী রেগে গেল। বললে—শুধু শুধু দেখতে এসে কী লাভ? কাকাকে যদি এতই দেখবার ইচ্ছে তো তোমাদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তুললেই তো

পারো। সেখানে প্রাণ ভরে চোখের আশ মেটাতে পারবে—

সুধন্য বললে—আজ্ঞে, এই অবস্থায় কি নড়াচড়া করানো ভালো—

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—খুব ভালো, খুব ভালো। বুড়োবাবুর এমন কী হয়েছে যে নড়াচড়া করানো ভালো নয়? বেশ তো খাচ্ছে-দাচ্ছে ঘুমোচ্ছে! খুব কষেই তো ভাত গিলছে শুনতে পাই, কোনও কষ্ট তো নেই বুড়োবাবুর এখানে—

সুধন্য বললে—কী বলছেন আপনি ম্যানেজারবাবু! কাকার ক্ষিধে কমে গেছে। কাকা আর কতদিন বাঁচবে তারও ঠিক নেই—ভালো করে কথাও বলতে পারছে না, ওঠা-হাঁটাও করতে পারছে না—

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—কথা বলতে পারছে না তো আমি কী করবো? আমি কি ডাক্তার? কাকার ওপর যদি তোমার অত দরদ, তাহলে ডাক্তার দেখাও। কলকাতায় তো ডাক্তারের অভাব নেই। টাকা দিলেই তারা এসে দেখে যাবে—

সুধন্য বললে—টাকাই যদি থাকবে ম্যানেজারবাবু তো আপনাকে এসব কথা বলবো কেন? আমার কাকাও গরীব লোক, আমিও গরীব লোক। যদি বড়লোকই হবো তো কাঁচরাপাড়ার বস্তিতে গিয়ে বউ-ছেলেমেয়ে নিয়ে আমাকে বাস করতে হয়?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—আমার এখন অত কথার জবাব দেবার সময় নেই হে—তুমি এসো—

সুধন্য বললে—আপনি কাজের লোক, আপনার তো কথার জবাব দেবার সময় থাকবেই না। কিন্তু বুড়োমানুষের দিকেও তো আপনাদের একবার দেখা দরকার—

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—আরে দরকার তো অনেক কিছুই, কিন্তু আমি তো একলা মানুষ, আমি কত দিক দেখবো? এদিকে বাড়িতে গয়না-গাঁটি চুরি গেছে, তার ওপর ভাগ্নেটা হাসপাতালে। তার গায়ে গুলী লেগেছে। আমি কোন্ দিক সামলাই বলো তো? তাই তো বলছি তুমি এখন এসো ভাই, আমার এখন বাজে কথা বলবার সময় নেই—

সুধন্য অবাক হয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলে—আপনার ভাগ্নে? সেই সুরেন-বাবু? তার গায়ে গুলী লেগেছে? বন্দুকের গুলী?

—হ্যাঁ হে, হ্যাঁ। ঝামেলা কি আমার একটা? তাই জন্যেই তো বলছি তুমি এখন এসো। আমার অনেক কাজ এখন। মাথার ঘায়ে কুকুর-পাগল হচ্ছি আমি, আর তুমি তখন থেকে কেবল ফ্যাচ্-ফ্যাচ্ করছো—

বলে আর দাঁড়ালো না ভূপতি ভাদুড়ী। কাল রাত থেকে ঝঞ্ঝাট চলেছে। তারপর আবার এখন এক নতুন ঝঞ্ঝাট। এখন কি আর হাসপাতালে দেখতে পাওয়া যাবে সুরেনকে? ছ'টার পরে তো বন্ধ হয়ে যায়। এখন গেলে কি আর ঢুকতে দেবে তাকে? কিন্তু না গিয়েই বা কী করবে? অন্ততঃ খবরটা পাওয়া যেত কেমন আছে! বাইরের নার্স কি ডাক্তারদের জিজ্ঞেস করলেও তারা বলতে পারে খবরটা।

মা-মণির ঘরের সামনেই ধনঞ্জয়ের সঙ্গে দেখা।

—কী রে? মা-মণি কেমন আছে এখন?

—সেই রকমই।

—জ্ঞান হয়েছে?

ধনঞ্জয় বললে—একটু কথা বলছিল। তরলা জল খাইয়ে দিয়েছে—

ভূপতি ভাদুড়ী ঘরের ভেতরে ঢুকলো। বাদামী একপাশে বসে বসে ঝিমোচ্ছে। তরলা মাথার কাছে বসে আছে। আর মা-মণি চোখ বুজিয়ে চিত হয়ে শুয়ে আছে। ভূপতি ভাদুড়ী ঢুকতেই তরলা একবার চেয়ে দেখলে ম্যানেজারবাবুর দিকে।

ভূপতি ভাদুড়ী ইঙ্গিত করতেই তরলা কাছে উঠে এল।

বললে—সকাল থেকে কিছু মুখে দেয়নি। এখন একটু জল দিলাম খেতে—

—কিছু জিজ্ঞেস করছিল মা-মণি?

তরলা বললে—সকলের দিকে চেয়ে দেখলে। তারপর জিজ্ঞেস করলে—সুখদা কোথায়?

—কী বললি তুই? পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে বলিসনি তো?

তরলা বললে—না। বললাম, দিদিমণি নিজের ঘরে আছে—

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—বাঃ, তোর তো বুদ্ধি আছে খুব দেখছি—খুব ভালো জবাব দিয়েছিস।

তরলা বললে—পুলিশের কথা শুনে যদি আবার অজ্ঞান হয়ে যায়, সেই জন্যেই তো ওই জবাব দিলাম।

—বেশ করেছিস মা, তুই বেশ করেছিস। তোর বুদ্ধিকে বলিহারি। দুর্বল শরীর, পুলিশের নাম শুনলেই তো হার্ট ফেল করবে। এখন কাউকে বলতে হবে না। বাদামীকেও বলে দিস, ধনঞ্জয়কেও বলে দিস, যেন পুলিশের কথাটা মা-মণিকে না বলে! সে দরকার হলে ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করে আমি নিজেই বলবো। তোদের এ-ব্যাপারে কিছু বলতে হবে না—বুঝলি?

তারপর একটু থেমে বললে—ওদিকে আবার এক ঝঞ্ঝাট হয়েছে রে—

—কী ঝঞ্ঝাট?

—আরে, শুনলুম আমার ভাগ্নেটাকে নাকি আবার পুলিশ গুলী করেছে!

—ওমা, সে কী? কেন গুলী করলে?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—আরে, কলকাতার রাস্তায় কখন যে কী হয়, কেউ বলতে পারে? রোজই তো হ্যাঙ্গামা লেগে আছে। কখন ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়েছে আর গুলী এসে গায়ে লেগেছে—যতসব বদমাইস্ লোক, কাজকর্ম নেই, কেবল হুজুক।

ভূপতি ভাদুড়ী আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। আজকে এতদিন পরে যেমন একটা স্বস্তি পেয়েছে, তেমনি আবার একটা নতুন ঝঞ্ঝাট এসে জুটলো। তা হোক, আসলে তো মা-কালীই সব কিছুর মালিক। মালিকের যদি ইচ্ছে হয় তো সব সাধই মিটবে ভূপতি ভাদুড়ীর। তোমায় আমি জোড়া পাঁঠা বলি দেবো মা, আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কোর মা। তোমার সোনার শাঁখা গড়িয়ে দেবো। মুক্তো-বসানো সোনার নথ দেবো!

—সেলাম হুজুর।

বাহাদুর সিং নিজের ডিউটি করছিল। ভূপতি ভাদুড়ী সেদিকে গ্রাহ্যও করলে না। ছেলেটা কোথায় বেঘোরে পড়ে রইল। বাপ নেই, মা নেই, সমস্ত ঝক্কিটা মামার। ভাগ্নে হয়ে জন্মে যেন মাথা কিনে নিয়েছে মামার। ট্রাম নেই, বাস নেই, শুধু হেঁটেই যেতে হবে অতখানি পথ! রাস্তার আলোগুলো পর্যন্ত নিভিয়ে দিয়েছে বেটারা। দলে দলে লোক আসছে হেঁটে হেঁটে। দোকানপাট সব বন্ধ।

ভূপতি ভাদুড়ী একজন অচেনা ভদ্রলোককে ডেকে জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁ

মশাই, সামনে কোন গণ্ডগোল আছে?

ভদ্রলোক বললেন—কদ্দুর যাবেন?

—এই মেডিকেল কলেজ পর্যন্ত!

ভদ্রলোক বললে—না, ওখান পর্যন্ত কোনও গোলমাল নেই। ওয়েলিংটন স্কোয়ারে বিধান রায়ের বাড়ির সামনে থেকেই গোলমালটা বেধেছে। ওদিকে না গেলেই হলো—

বলে ভদ্রলোক চলে যাচ্ছিল। ভূপতি ভাদুড়ী তবু ছাড়লে না। আবার জিজ্ঞেস করলে—গণ্ডগোলটা কীসের মশাই? গুলী চল্লো কেন? কিছু জানেন?

—আরে, যত সব গুণ্ডাদের কাণ্ড! একদিকে কংগ্রেস আর একদিকে কমিউনিস্ট। দু'দলই মিনিষ্ট্রি পেতে চায়। মাঝখান থেকে শুধু কতকগুলো নিরীহ লোক গুলী খেয়ে মরলো। আর আমাদের দুর্ভোগ, আপিস থেকে হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফিরতে হচ্ছে—

ভূপতি ভাদুড়ী জিজ্ঞেস করলে—অনেক লোক মরেছে নাকি?

ভদ্রলোক বললে—কালকে খবরের কাগজেই দেখবেন—

পাশ দিয়ে এক ভদ্রলোক হেঁটে যাচ্ছিল, সে ফোড়ন কাটলে—রাজায়-রাজায় যুদ্ধ হয় উলুখাগড়ার প্রাণ যায়—

দু'জনেই চেয়ে দেখলে লোকটার দিকে। কিন্তু লোকটা কথাগুলো বলেই যেদিকে যাচ্ছিল সেইদিকেই চলতে লাগলো। ভূপতি ভাদুড়ী আর দাঁড়ালো না। গুলী লেগে ভাগ্নেটা হাসপাতালে পড়ে আছে, দেরী হয়ে গেলে হয়ত আর দেখাই হবে না শেষ পর্যন্ত। ট্রাম-বাস চলছে না বটে, কিন্তু রিক্‌শা চলছে, ট্যাক্সি চলছে। কিন্তু সবই ভর্তি। গাদাগাদি করে লোক চলেছে। যে যেমন করে পারে বাড়ি ফিরতে চাইছে। একবার কোনও রকমে বাড়ি গিয়ে পৌঁছতে পারলেই নিশ্চিন্ত। তখন আর কোনও ভাবনা নেই। ভূপতি ভাদুড়ীও বাড়ির গেট বন্ধ করে নিশ্চিন্তে কাটাতে পারতো। কিন্তু তার জো নেই। ভাগ্নেটা বেয়াড়া হয়ে গেছে। বদ বন্ধুদের সঙ্গে মিশে বখাটে হয়ে গিয়েই যত জ্বালা বাড়িয়েছে।

মেডিকেল কলেজের গেটের সামনে ভীষণ ভিড়। কোথায় এমার্জেন্সী-ওয়ার্ড তাও জানা নেই ভূপতি ভাদুড়ীর। সবাই ছুটোছুটি করছে।

সামনে উঠোনের ভেতরে একজনকে পেয়ে জিজ্ঞেস করলে—মশাই, এমার্জেন্সী-ওয়ার্ডটা কোথায় বলতে পারেন?

ভদ্রলোকটি বললে—ওই তো সামনে। লেখা রয়েছে বড় বড় অক্ষরে।

তারপর একটু থেমে জিজ্ঞেস করলে—আপনার কে আছে এমার্জেন্সী-ওয়ার্ডে?

মিষ্টি কথায় ভূপতি ভাদুড়ী গলে গেল। বললে—আমার নিজের ভাগ্নে মশাই, শুনলাম নাকি পুলিশের গুলী লেগে এখেনে এসেছে—

—পুলিশের গুলী? গুলী কোথায় লেগেছে?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—তা তো জানিনে। আমাকে একজন এসে খবর দিয়ে গেল। আমি মশাই বাপের জন্মে কখনও এখানে আসিনি। প্রাণের দায়ে আজ আসতে হয়েছে—

ভদ্রলোকটি বললে—শুধু আপনি একলা তো নয়. আমাকেও তো তাই আসতে হয়েছে—

—আপনার কে?

—আমার নিজের ছোট ভাই মশাই। আজকালকার ছেলে, কথা তো শোনে না মোটে। কিন্তু আমি তো তা বলে রাগ করে চুপ করে বসে থাকতে পারি না। আমাকেও তাই আপনার মত প্রাণের দায়ে ছুটে আসতে হয়েছে—

ভূপতি ভাদুড়ী যেন একটা অবলম্বন পেলে। বললে—ভাইকে আপনি দেখেছেন? কেমন আছে এখন?

ভদ্রলোক বললে—কী করে দেখবো? টাকা চাইছে যে! বলছে টাকা দিতে হবে—

—কেন? টাকা কীসের?

—বলছে অনেক রক্ত বেরিয়ে গেছে, তাই এখন ব্লাড্-ব্যাঙ্কের রক্ত দিতে হবে। তার দাম তিরিশ টাকা—। রক্ত দেবার পর দেখা করতে দেবে—

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—তাহলে তো আমার ভাগ্নের জন্যেও রক্ত লাগবে—

—তা তো লাগবেই!

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—তাহলে একটু খবর নিন না, আমার ভাগ্নের কী অবস্থা। আমার ভাগ্নেরও তো গুলী লেগেছে—

ভদ্রলোক বললে—কী নাম আপনার ভাগ্নের?

—সুরেন্দ্রনাথ সান্ন্যাল!

—কী রকম চেহারা বলুন তো? নাম তো সকলের জানা নেই এদের।

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—কালো মতন রোগা, দোহারা চেহারা। বাইশ বছর বয়েস, মাথার চুল পেছন দিকে উল্টোনো—

—ঠিক আছে—

বলে ভদ্রলোক ভেতর দিকে চলে গেল। যাবার সময় বলে গেল—আপনি এখেনে দাঁড়িয়ে থাকুন, আমি এখ্খুনি খবর নিয়ে আসছি—অন্য দিকে কোথাও চলে যাবেন না—

ভূপতি ভাদুড়ী চুপ করে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল। ভাগ্যিস আসবার সময় টাকা সঙ্গে করে এনেছিল। নইলে এখন কোথায় কার কাছে হাত পাততো? আশেপাশে কত লোক উৎসুক দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করছে। ভূপতি ভাদুড়ী চুপ করে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল।

খানিক পরেই দৌড়তে দৌড়তে এল ভদ্রলোক।

এসেই বললে—সর্বনাশ হয়েছে মশাই, আমার ভাই-এরও যা আপনার ভাগ্নেরও তাই, সেম কেস। ব্লাড দিতে হবে—

—কী রকম দেখলেন আমার ভাগ্নেকে? কেমন আছে? কথা বলতে পারছে?

ভদ্রলোক বললে—আরে না, দেখা হয়নি। দেখা হবে কী করে।

—ডাক্তার কী বললে?

—ওই বললে ব্লাড দিতে হবে।

—আমার কত টাকা লাগবে?

—বললে তিরিশ টাকার মতন—আপনার কাছে টাকা আছে? টাকা সঙ্গে করে এনেছেন?

ভূপতি ভাদুড়ী বুক পকেটের মানি-ব্যাগ থেকে টাকা বার করতে করতে বললে—হ্যাঁ, এনেছি। আসবার সময় কী ভেবে টাকা নিয়ে এলাম।

তারপর তিনটে দশ টাকার নোট ভদ্রলোকের হাতে এগিয়ে দিয়ে বললে—ডাক্তারকে কিছু জিজ্ঞেস করলেন? ডাক্তার কী বললে? বাঁচবে তো?

ভদ্রলোক বললে—নিশ্চয়ই বাঁচবে। আমি ডাক্তারকে তো সেই কথাই জিজ্ঞেস

করলাম। জিজ্ঞেস না করে কি আর টাকা দিচ্ছি ভাবছেন?

টাকাটা হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে ভদ্রলোক বললে—হ্যাঁ, একটা কথা, আপনার কাছে আর তিরিশটা টাকা হবে?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—হ্যাঁ—

—যদি বিশ্বাস করে দেন তো বড় ভালো হয়। আমি টাকা আনতে ভুলে গেছি। টাকাটা আমি আজ রাত্তিরেই আপনার বাড়িতে গিয়ে নিজে দিয়ে আসবো—আমার নাম ঠিকানাটা আপনি রাখুন, আমার নাম নিরাপদ সেন-গুপ্ত...

ভূপতি ভাদুড়ী বাধা দিয়ে বললে—সে আপনাকে এখন ভাবতে হবে না।

তারপর আরো তিনটে দশ টাকার নোট বার করে ভদ্রলোকের হাতে দিলে। বললে—আপনি তো এখুনি আসছেন?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, টাকাটা দিলে তবে রক্ত দেবে।

—রসিদ দেবে তো?

—নিশ্চয়ই? রসিদ না নিয়ে ছাড়বো কেন? আমি এখ্খুনি আসছি, আপনি এইখেনেই দাঁড়িয়ে থাকুন—

বলে ভদ্রলোক হন হন করে চলে গেল।

সমস্ত মধ্য কলকাতাটা তখন জ্বলছে। মানুষের জীবন-ধারা বিপর্যস্ত হয়ে গেছে ঘণ্টা কয়েক ধরে। এও বুঝি ইতিহাসের এক অমোঘ লিপি। একদিন ব্রিটিশ-রাজ দু'শো বছরের মৌরুসী পাট্টা ছেড়ে চলে গিয়েছিল। তারপর অনেক বাত কেটে গেছে। মানুষের জীবনে আর এক নতুন বিপ্লবের সূচনা হয়েছে। এ ঊনবিংশ শতাব্দীর শিল্প-বিপ্লব নয়, এ তার চেয়েও আর এক নতুন ধরনের বিপ্লব। এ কারো বশ্যতা স্বীকার না করার বিপ্লব। পিতা এখানে পিতা নয়, কন্যাও এখানে কন্যা নয়। এ হয়ত প্রাচুর্যের অপচয়ের অবধারিত বিপ্লব, কিংবা আবার হয়ত দারিদ্র্যের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ঘটিত বিপ্লব। অবসর এ যুগে পাপ, আবার হয়ত জীবিকার্জনের কারণে উদয়াস্ত পরিশ্রমও এখানে অসহ্য। জন্মের ওপরেই এ-যুগের মানুষের রাগ কোপানল হয়ে সমস্ত মানুষ-সমাজকে ধ্বংস করে তবে শান্ত হবে। তাই যা-কিছু প্রতিষ্ঠিত, যা-কিছু মূল্যবান, যা-কিছু সুন্দর তার ওপরই মানুষের যত কোপ।

প্রজেশ অনেক রাস্তা ঘুরে ঘুরে সারকুলার রোড, পার্ক স্ট্রীট ঘুরে কংগ্রেস-ভবনে এসে হাজির হলো। দূরের টিয়ার গ্যাস ফাটানোর আওয়াজ সেখানেও কানে আসছে। গাড়িটা নিচেয় রেখে প্রজেশ তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল। সাজানো ফিটফাট আসবাব। অনেক টাকা খরচ করে চাঁদার টাকায় এ-বাড়ি তৈরি হয়েছে কর্তাদের আরামে থাকবার জন্যে। যাতে দেশ-সেবার জন্যে শান্তিতে পুণ্যশ্লোকবাবুরা মাথা ঘামাতে পারে তারই চূড়ান্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে। তা'ছাড়া সামনেই ইলেকশান। তারও তোড়জোড় শুরু হয়ে গেছে।

—কোথায়? পর্মিলি কোথায়? কোন্ ঘরে?

কোথায় যেন একটা মস্ত ভাঙন ধরার চিহ্ন সকলের মুখে। তবু সেটা প্রকট নয়। বেশ প্রসন্ন আবহাওয়া অফিসে। কেউ কেউ সিগারেট খাচ্ছে। প্রজেশ সেনের

পুরোন বন্ধুবান্ধব সব। আজ কলকাতার বহুৎসবের দিনে সবাই মাথা ঠাণ্ডা করবার জন্যে এখানে এসে জুটেছে। কিন্তু তখন আর আড্ডা দেবার মেজাজ নেই প্রজেশ সেনের। যেদিকে পর্মিলি ছিল, সেইদিকেই সে গিয়ে পোঁছলো। পর্মিলির ঘরের ভেতরে তখন দু'তিনজন মহিলার ভিড়।

—এই যে প্রজেশদা, এতক্ষণ পর্মিলিদির সঙ্গে আমরা গল্প করছিলাম—

তাদের সঙ্গেও গল্প করবার প্রবৃত্তি ছিল না তখন প্রজেশের। তারা চলে যেতেই প্রজেশ বললে—কী হলো পর্মিলি, আজকে তুমি কী বলে রাস্তায় বেরোলে! তুমি জানতে আজকে একটা গোলমাল হবে! তুমি শুনেছ নিশ্চয়ই, আজকে পুলিশ ফায়ার করেছে—

পর্মিলির মুখ-চোখ-চেহারা যেন অন্যরকম হয়ে গেছে। এ-পর্মিলি যেন সে-পর্মিলি নয়। যেন অনেক দিন পরে প্রজেশ ভালো করে চোখ তুলে পর্মিলিকে দেখছে। ছোটবেলা থেকে সে দেখে আসছে পর্মিলিকে। ছোটবেলা থেকে মিশে আসছে পর্মিলির সঙ্গে। তখন কন্‌ভেণ্টে পড়তো পর্মিলি। তারপর মেমসাহেব রেখে পিয়ানো শিখতো। সে-সব দিনও দেখেছে। তখন ভাই-বোনে ঝগড়া করতো। সে-ঝগড়া মেটাতে হতো প্রজেশকেই। পুণ্যশ্লোকবাবুর যাবতীয় কাজ তখন প্রজেশকেই দেখতে হতো। হরিলোচন মুহুরী ছিল বটে। কিন্তু তার থাকা না-থাকা ছিল সবই সমান।

তারপর প্রজেশ চাকরি পেলে। সাহেব কোম্পানীর পাবলিক রিলেশনস অফিসারের চাকরি। সে চাকরিতে মাইনে যেমন ভালো, তেমনি উপরি পাওনা আছে প্রচুর। তাছাড়াও আছে নানারকম পার্টি, কনফারেন্স আর বাইরে ঘোরার সুবিধে। সেই উপরি-টাকার সুবিধে দিয়ে সে আজ কলকাতা সহরের ওপর বাড়ির মালিক হয়েছে। বাকি ছিল বিয়েটা। তারও ব্যবস্থা করে দিলেন পুণ্য-শ্লোকবাবু।

এ যেন সবটাই সাজানো ঘটনা। নভেলের মত সাজানো!

রাস্তায় আসতে আসতে প্রজেশ সেই কথাই ভাবছিল। কলকাতা আজ অশান্ত! যখন এতদিন পরে তার জীবনে একটু শান্তির প্রত্যাশা দেখা গেছে, ঠিক তখনই কি সহরে আগুন লাগতে হয়! এখন আগুন লাগার কী দরকার ছিল!

প্রজেশ বললে—চলো, বাড়ি চলো। পুণ্যদা আমাকে আসতে দিচ্ছিলেন না। কিন্তু আমি জোর করে চলে এলুম।

পর্মিলি তবু কিছু উত্তর দিলে না।

প্রজেশ আবার বললে—রাস্তায় খুব টিয়ার-গ্যাস ছোঁড়া চলছে।

পর্মিলি বললে—এই বিপদের মধ্যে তোমাকে কে আসতে বলেছিল?

প্রজেশ বললে—বা রে, তোমার বিপদের কথা শুনে আমি কী করে চুপ করে থাকি? খবরটা শোনার পর থেকে তো আমি তোমার কাছে আসবার জন্যে ছট-ফট করছি। তোমার গাড়িটা পুড়িয়ে দেবার কথা শোনবার পর থেকে আমি যে কী-রকম ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম তা তুমি ভাবতে পারবে না—

পর্মিলি বললে—দোহাই তোমার, তুমি চুপ করো প্রজেশ—

প্রজেশ বললে—কেন? তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না? তুমি জানো না আমি কী বিপদের মধ্যে দিয়ে গাড়ি চালিয়ে এসেছি। কিন্তু আমি নিজের কথা এক-বারও ভাবিনি। আমাকে তো পুণ্যদা আসতে বারণই করেছিলেন। বলছিলেন, কংগ্রেস অফিসে আছে পর্মিলি, বেশ নিরাপদেই আছে—

একটু থেমে প্রজেশ বললে- চলো, আর দেরি কোর না রাত বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে গোলমাল আরো বাড়তে পারে। আজকের ফায়ারিং-এ অনেক লোক ওদের মারা গেছে—

হঠাৎ পর্মিলি বললে—চলো—

প্রজেশ যেন হাতে স্বর্গ পেলে। বললে—এসো, আর দেরি করা ভাল নয়—

পর্মিলি সত্যিই উঠলো। তারপর আস্তে আস্তে প্রজেশের সঙ্গে নিচেয় নামতে লাগলো। প্রজেশ একবার ভেতরে গিয়ে ধন্যবাদ দিয়ে এল সেক্রেটারিকে। তখন সেখানে তাসের আড্ডা চলেছে। সেখান থেকে তাড়াতাড়ি একেবারে গাড়ি-বারান্দায় নেমে দেখলে পর্মিলি গাড়িতে উঠে বসে আছে। গম্ভীর মুখ চোখ। কোনদিকে দৃষ্টি নেই।

গাড়ি চালাতে চালাতে প্রজেশ বললে—তোমার গায়ে যে হাত দেয়নি বেটারা, তাই-ই যথেষ্ট। ওরা সব পারে—

পর্মিলি চুপ করে রাস্তার দিকে চেয়ে ছিল। বাইরে অন্ধকার রাস্তা। এ দিকটা অনেক ঘুর-পথ। এদিকে গোলমাল নেই। কিন্তু রাস্তার আলোগুলো নেভানো। এ-পাড়ার লোকেরাও খবর পেয়ে গেছে যে, ধর্মতলায় খুনোখুনি কাণ্ড হয়েছে। বাস পুড়ছে। সবাই নিশ্চিন্তে বাড়ির মধ্যে ঢুকে নিরাপত্তা খুঁজছে। কিন্তু তারা জানে না যে নিরাপত্তা দেবার মালিকরা নিজেদের নিরাপত্তা নিয়েই বিব্রত। তারাও অক্ষত থাকতে পারেনি। তাদের সিংহাসন যেন তখন টলমল করছে। তাদের মেয়েরাও কংগ্রেস ভবনের চার দেয়ালের মধ্যে তখন নিরাপত্তা খুঁজছে!

—তোমাকে কোনও অপমান করেনি তো ওরা পর্মিলি?

পর্মিলি বললে—না—

প্রজেশ বললে—হ্যাঁ, অত সাহস ওদের নেই। সাহস থাকলে কাওয়ার্ডের মতন এইসব বাস পোড়ায়? এটা জানে না যে এ-সব পাবলিক প্রপার্টি—

বলে স্টিয়ারিংটা আরো জোরে চেপে ধরলে। তারপর বললে—অথচ দেখ পর্মিলি, আমরাও পার্টির কাজ করেছি। পিকেটিং করেছি, জেল খেটেছি, পুলিশকে মেরেছি, আইন ভেঙেছি, কিন্তু সোডার বোতলও কখন ছুঁড়িনি, বাস-ট্রামও পোড়াইনি, কারণ আমরা জানতুম যে ওগুলো দেশের মানুষের সম্পত্তি—

গাড়িটা শেয়ালদার মোড়ের দিকে না গিয়ে আমহার্স্ট স্ট্রীটে ঢুকলো।

হঠাৎ প্রজেশ বললে—আচ্ছা পর্মিলি, একটা কথা তোমায় জিজ্ঞেস করবো?

পর্মিলি বললে—কী?

—তোমার বাবাকে গিয়ে একটা অনুরোধ করবো?

—কী অনুরোধ?

—তুমি আন্দাজ করো না, অনুরোধটা কী হতে পারে?

পর্মিলি কিছু উত্তর দিলে না। যেন বাজে কথার উত্তর দেবার সময় নেই তার।

প্রজেশ বললে—কই, আমার কথার উত্তর দিচ্ছ না যে?

পর্মিলি বললে—আমার এখন কিছু ভাল লাগছে না, তুমি চুপ করো—

প্রজেশ বললে—ঠিক, ঠিক, আমারই ভুল হয়েছিল। এতবড় একটা এ্যাক্সিডেণ্ট হয়ে গেল, এখন তো কথা বলতে ভাল লাগবেই না—

তারপর একটু থেমে বললে—দেখ পর্মিলি, তুমি তো জানো আমি কত

মাইনে পাই—লাস্ট স্যালারি ড্র করেছি পনেরো শো টাকা, তারপর আছে একস্ট্রা অনেক ইনকাম, যে-গুলোর কোনও হিসেব নেই, যেমন...

কথা বলতে বলতে প্রজেশ পমিলির মুখের দিকে চেয়ে দেখলে। পমিলি কথাগুলো শুনছে কি শুনছে না তা বোঝা গেল না।

—তাছাড়া তুমি জানো আমি বাড়িও করেছি একটা...

হঠাৎ পমিলি বলে উঠলো—স্টপ্ প্রজেশ, প্লিজ্ স্টপ্—

প্রজেশ ভয় পেয়ে গেল। পমিলির মুখের দিকে চেয়ে বললে—কেন পমিলি, তোমার কি আমার কথাগুলো শুনতে ভাল লাগছে না? আমার সম্বন্ধে কি তুমি কিছুই জানতে চাও না? আমি কি তোমার চোখে একটা মানুষও নই?

পমিলি অধৈর্য হয়ে বলে উঠলো—প্রজেশ, থামো এখন! ওসব কথা এখন আমার ভাবতে ভালো লাগছে না—

প্রজেশ বললে—তাহলে তোমার কী ভাবতে ভালো লাগছে?

পমিলি বললে—আমার কিছুই ভাবতে ভালো লাগছে না। আমি ভাবতে ভাবতে এখন বোবা হয়ে গিয়েছি—

—বোবা হয়ে গিয়েছ মানে?

পমিলি বললে—তোমাদের কাণ্ড দেখে আমার সব ভাবনা থেমে গেছে।

প্রজেশ অবাক হয়ে গিয়েছে। বললে—আমাদের কাণ্ড দেখে! আমাদের কী কাণ্ড তুমি দেখলে? কাণ্ডটা তো করলে ওরা। ওই ওদের পার্টি—

—ওদের পার্টি মানে?

—ওই পূর্ণবাবুরা। কালকে সারাদিন দেয়ালে পোস্টার দিয়ে দিয়ে লোক ক্ষেপিয়ে রেখেছিল, মানুষকে ক্ষেপিয়ে দিলে তারা বাস-ট্রাম-গাড়ি পোড়াবে না? অথচ এটা জানে না যে এটা তাদেরই প্রপার্টি! পুণ্যদার প্রপার্টিও নয়, তোমার-আমার প্রপার্টিও নয়—সকলের প্রপার্টি—

তারপর একটু থেমে বললে—এই দেখ না, তুমি ওদের সঙ্গে কী শত্রুতা করেছ যে তোমার গাড়িটা পোড়াতে গেল? তুমি তো ওদের সঙ্গে কোনও খারাপ ব্যবহারও করোনি—

পমিলি বললে—হ্যাঁ, আমরা ওদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছি—

প্রজেশ আরো অবাক হয়ে গেল। বললে—সে কী? তুমি খারাপ ব্যবহার করেছিলে নাকি ওদের সঙ্গে?

পমিলি বললে—না, আমি করিনি, কিন্তু আমার বাবা ওদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে। ওরা জানে যে আমি মন্ত্রীর মেয়ে।

—তা মন্ত্রীর মেয়ে হওয়া কি অপরাধ? তুমি আমাকে হাসালে দেখছি? আর তাছাড়া পুণ্যদাই বা ওদের সঙ্গে কী খারাপ ব্যবহার করেছে?

পমিলি ধমকে উঠলো যেন। বললে—সব জেনেও তুমি মিথ্যে কথা বোল না প্রজেশ—

প্রজেশ আরো অবাক হয়ে গেল। বললে—তার মানে?

পমিলি বললে—তার মানে তুমি ভালো করেই জানো। আমার কাছে ন্যাকামি কোর না। আমার বাবা ওদের ওপর যে অত্যাচার করেছে তা তুমি জানো না?

প্রজেশ আরো উত্তেজিত হয়ে উঠলো—পুণ্যদা ওদের ওপর অত্যাচার করেছে?

—শুধু অত্যাচার করেনি, এক্সপ্লয়েটও করেছে। আর শুধু ওদেরই এক্সপ্লয়েট করেনি, আমাকেও এক্সপ্লয়েট করেছে—

প্রজেশ বুঝতে পারলে সমস্ত ব্যাপারটা। এতদিন পর্মিলির সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছে, ফূর্তি করেছে, মদ খেয়েছে, মাতলামি করে এসেছে। কিন্তু সেই মেয়েই যে হঠাৎ এতদিনে এত আত্মসচেতন হয়ে উঠবে, তা কখনও কল্পনা করেনি প্রজেশ! প্রজেশের কাছে এও যেন এক আবিষ্কার। পর্মিলির কথায় প্রজেশ যেন হঠাৎ মহাদেশ আবিষ্কার করার বিস্ময় অনুভব করলে।

পর্মিলি চুপ করেই ছিল। হঠাৎ সে আবার বলতে লাগলো—আমি এতদিন কিছু বুঝতে পারিনি, তাই কিছু বলিনি। কিন্তু এখন আমার চোখ খুলে গেছে—

প্রজেশ বললে—আশ্চর্য তো, হঠাৎ কীসে তোমার চোখ খুলে গেল? কী ঘটনা ঘটলো হঠাৎ যে তুমি এত বদলে গেলে? আজকের কান্ড দেখে?

পর্মিলি বললে—না—

—তাহলে?

কিন্তু পর্মিলির উত্তর দেওয়া আর হলো না। সামনেই দেখা গেল অনেক লোকের ভিড়। সেই অন্ধকার সুকীয়া স্ট্রীটের মধ্যেই যেন বহু লোক পুণ্য-শ্লোকবাবুর বাড়ির সামনে জমায়েত হয়ে শ্লোগান দিচ্ছে। কম করেও অন্ততঃ দু'শো লোক জড়ো হয়েছে। সবাই একসঙ্গে চিৎকার করছে—

খুনের বদ্‌লা খুন চাই
হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার—

একটা পুলিশের নাম-গন্ধ নেই কোথাও। প্রজেশ যেন কেমন ভয় পেয়ে গেল।

গাড়িটা থামিয়ে দিলে সে হঠাৎ। বললে—চলো, গাড়িটা ঘুরিয়ে নিয়ে যাই পর্মিলি—

পর্মিলি বললে—কেন?

প্রজেশ বললে—ওখানে গেলে এ-গাড়িটাও জ্বালিয়ে দেবে—

—ওরা কারা?

—আবার কারা। ওই পূর্ণবাবুদের গুন্ডার দল—

—তা ওরা আমাদের বাড়ির সামনে কী করছে?

প্রজেশ বললে—কী আর করছে, শ্লোগান দিচ্ছে—

পর্মিলি বললে—শ্লোগান দিলে তোমার ভয় কী?

প্রজেশ বললে—আবার যদি রেগে গিয়ে আমার গাড়িটাও পুড়িয়ে দেয়?

—কেন, তুমি ওদের কী করেছ?

প্রজেশ বললে—না না, সময় নষ্ট করে লাভ নেই। চলো, গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে থানায় খবর দিয়ে আসি। পুণ্যদা হয়ত এতক্ষণ ভাবছেন খুব—

—পুলিশে তো বাবাই খবর দিতে পারে। টেলিফোনে কি আর খবর দেওয়া যায় না? তুমি চলো, আমি বলছি তুমি চলো—

প্রজেশ বললে—না না, তোমার গায়েও ওরা হাত দিতে পারে, তুমি ওদের চেনো না—

—কেন, আমার গায়ে হাত দেবে কেন? আমি ওদের কী করেছি?

প্রজেশ বললে—কিন্তু ওরা তো চেনে তোমাকে যে তুমি পুণ্যদার মেয়ে?

—তা বাবা ওদের এমন কী করেছে যে, তাঁর মেয়েকেও তারা রেহাই দেবে না?

প্রজেশ বললে—এখন তর্ক করবার সময় নয় পর্মিলি। ওরা যুক্তিতর্ক বোঝে না। দেখছো না বলছে, খুনের বদলা খুন চাই, হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার—

—তার মানে?

—তার মানে ওই যে এস্‌প্ল্যানেডে কয়েকটা লোক পুলিশের গুলীতে মারা গেছে, তার বদলে ওরাও খুন করবে—

বলে প্রজেশ গাড়িটা ঘুরিয়ে নিচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই পর্মিলি বললে—দাঁড়াও, আগে আমি নেমে যাই, তারপরে তুমি থানায় যেও—

—সে কী?

কিন্তু ততক্ষণে দরজাটা খুলে পর্মিলি সেই অন্ধকার রাস্তায় নেমে পড়েছে। নেমে সোজা বাড়ির দিকে হন্ হন্ করে হাঁটতে শুরু করেছে।

—পর্মিলি, পর্মিলি, শোন—

প্রজেশ গাড়িটা পাশে দাঁড় করিয়ে নিজেও নামলো। তাবপর তাডাতাড়ি পর্মিলির পেছনে গিয়ে ডাকতে লাগলো—পর্মিলি, শোন পর্মিলি—

পর্মিলি তখন আরো এগিয়ে গেছে। সামনের ভিড় থেকে তখন সমবেত গলার চিৎকার আসছে—

কংগ্রেস সরকার খুনী সরকার
ভুলো মাৎ ভুলো মাৎ—

প্রজেশের আরো ভয় হতে লাগলো। তাড়াতাড়ি দৌড়ে গিয়ে পর্মিলিকে এক হাতে চেপে ধরলে। বললে—যেও না, যেও না পর্মিলি, ফিরে এসো—

পর্মিলি এক ঝটকায় প্রজেশের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে এগিয়ে গেল। বললে—তুমি ছাড়ো—

তারপর একেবারে মানুষের ভিড়ের মধ্যে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

সেখানে গিয়েই বললে—আপনারা চেঁচাচ্ছেন কেন? কী চাই আপনাদের?

প্রথমটায় যেন সবাই থতমত খেয়ে গিয়েছিল। এমন যেন তারা আশা করেনি।

পর্মিলি বললে—আপনারা কি আমার বাবার সঙ্গে দেখা করতে চান? যদি দেখা করতে চান তো আসুন আমার সঙ্গে—

সকলে এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেছে। এমন ঘটনা আগে কোনও মন্ত্রীর বাড়িতে ঘটেনি।

পর্মিলি বললে—যদি আপনাদের কিছু বলবার থাকে তো বাবাকে বলুন মুখোমুখি—

কাছ থেকে কে যেন চিৎকার করে উঠলো—খুনের বদলে খুন চাই—

কিন্তু 'হুঁশিয়ার' বলবার কোনও মানুষ নেই।

ততক্ষণে প্রজেশ এসে গেছে। এসেই পর্মিলির চারদিকে দুটো হাত দিয়ে বেষ্টনী করে দিলে। যেন তা না করলে তারা তার গায়ে হাত দেবে—

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা সোরগোল উঠলো। দূর থেকে পুলিশের ভ্যান আসার শব্দ পাওয়া গেল। ভিড়ের মানুষের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হলো। পুলিশ এসেই হয়ত ফায়ারিং শুরু করবে!

তবু কয়েকজনের তখনও বুঝি সাহস ছিল। তারা একসুরে চিৎকার করে উঠলো—

কংগ্রেস সরকার খুনী সরকার
ভুলো মাৎ ভুলো মাৎ—

কিন্তু ততক্ষণে ভ্যানটা সামনে এসে পড়েছে। ভিড়ের মানুষরা সঙ্গে সঙ্গে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে। পুলিশকে লক্ষ্য করে চারদিক থেকে ঢিল পড়তে লাগলো পুলিশও তৈরি ছিল। তারাও সঙ্গে সঙ্গে টিয়ারগ্যাস ছুঁড়েছে। মুহূর্তের মধ্যে

শব্দে-গন্ধে জায়গাটা একটা যুদ্ধক্ষেত্র হয়ে গেছে একেবারে—

পুণ্যশ্লোকবাবুর দরোয়ান ভেতর থেকে লোহার গেট বন্ধ করে দিয়েছিল।

প্রজেশ সেখানে সেই গেটের সামনে দাঁড়িয়েই চিৎকার করতে লাগলো—দারোয়ান গেট খোল, গেট খোল, দিদিমণি এসেছে—

হাসপাতালের উঠোনে তখন ভিড় আরো বেড়েছে। আরো কয়েকটা এ্যাম্-বুলেন্স এসে হাজির হলো পর পর। আরো কয়েকজনকে স্ট্রেচারে করে ধরে ধরে নামানো হলো। সকলের আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব হাঁ করে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ছিল কোথাও। স্ট্রেচার নামাতেই তারা এগিয়ে গেল সামনে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মুখের চেহারাগুলো দেখতে লাগলো। চেনা যদি কেউ হয়।

ভূপতি ভাদুড়ীও সামনে এগিয়ে গেল তাড়াতাড়ি। সুরেন যদি থাকে ওদের মধ্যে।

কিন্তু না। অচেনা সব অল্পবয়েসী ছেলে। বড় জোর কুড়ি-বাইশ বছর বয়েস হবে। কী বদ্খেয়াল সব হয়েছে আজকালকার ছেলেদের। বাপ-মা, জ্যাঠা-খুড়োর কথা শোনে না কেউ। কেবল ডানপিটেগিরি, কেবল বোমাবাজি!

—ও মশাই, শুনুন—

ভদ্রলোক আচম্কা ডাক পেয়ে থমকে দাঁড়ালো।

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—কী হলো, আমার টাকাটা জমা দিলেন?

ভদ্রলোক তো আকাশ থেকে পড়লো। বললে—কীসেব টাকা? কীসের টাকা জমা করে দেবো?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—সে কী, আপনি যে আমার কাছ থেকে তিরিশ টাকা নিলেন, আপনার নিজের জন্যেও তিরিশ টাকা ধার নিলেন?

—কী জন্যে টাকা নেব আপনার কাছ থেকে? আমার কাছে কি টাকা নেই? আপনি কে?

মহা মুশকিলে পড়লো ভূপতি ভাদুড়ী। সারাদিন গাধার খাটুনি গেছে থানা আর বাড়ি করতে, তারপর কাল রাত্রেও সমস্তক্ষণ জেগে কেটেছে। আর এখন এই বিপদ।

—আপনি কাকে দেখতে কাকে দেখেছেন, আর আমার নামে দোষ দিচ্ছেন। জানেন আমি এই মেডিক্যাল কলেজের স্টুডেন্ট!

আরো দু'চারজন কথা কাটাকাটি শুনে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। বললে—কোন ঠগ্-জোচ্চোরের পাল্লায় পড়েছেন, ও-টাকা আর পাচ্ছেন না, গচ্চা গেল—

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—তাহলে আমি থানায় খবর দেবো—

—দিন গে! পুলিশের আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই, আপনার তিরিশটা টাকা নিয়ে তাদের মাথা ঘামাতে বয়ে গেছে—

বলে দল বেঁধে তারা হাসতে হাসতে যে-যার দিকে চলে গেল।

ভূপতি ভাদুড়ী খানিকক্ষণ বোকার মত থ হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। কী করবে কিছুই ভেবে পেলে না। তিরিশ তিরিশ ষাটটা টাকাই চলে গেল শুধু শুধু! রাগে দুঃখে ক্ষোভে সেখানে দাঁড়িয়ে তার আঙুল কামড়াতে ইচ্ছে হলো। তার মতন লোককে এমন করে বোকা বানিয়ে ঠকিয়ে দিলে। চোখ দিয়ে জল

পড়তে লাগলো ভূপতি ভাদুড়ীর। চোখের জলে সমস্ত হাসপাতালটা, সমস্ত পৃথিবীটা যেন ঝাপসা ঠেকতে লাগলো। ছি ছি, ষাটটা টাকা! ষাট দুকুনে একশো কুড়িটা আধুলি, দু'শো চল্লিশটা সিকি ..আর হিসেব করতে পারলে না সে।

ভূপতি ভাদুড়ী ঘেন্নায় ধিক্কারে হাসপাতালের গেট পেরিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালো। যাকগে, মরুকগে। হারামজাদা যা ইচ্ছে করুকগে! যে জাহান্নামে যাবে বলে পণ করেছে, কার বাপের সাধ্যি তাকে ঠেকায়। আমার কী! আমার তো তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে! কোথাকার কে বাপ-মা মরা ভাগ্নে, তার জন্যে আমার কীসের মাথাব্যথা! আমি বিয়ে-থা করিনি, ঝাড়া-হাত-পা মানুষ. আমি কার পরোয়া করি। দরকার নেই পরের জন্যে ভেবে। তার চেয়ে পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে আরাম করে খাবো-দাবো-ঘুমোব, সেই ভালো। সেই যে কথায় আছে—যম-জামাই-ভাগ্না কেউ নয় আপনা। এও হলো তাই।

আবার সেই অন্ধকার রাস্তা। সেই দলে দলে ফুটপাথ দিয়ে লোকজন বাড়ি-মুখো চলেছে। প্রতিবাদ করবার ভাষাও যেন সবাই হারিয়ে ফেলেছে। সমস্ত কলকাতা সহরটা যেন অসাড় হয়ে পড়েছে অস্বস্তিতে।

হঠাৎ একটা খালি রিকশা নজরে পড়লো।

ভূপতি ভাদুড়ী রিকশাওয়ালাটাকে ডাকলে। রিকশাওয়ালা দাঁড়িয়ে পড়লো।

—শ্যামবাজারের মোড়ে যাবি বাবা? মাধব কুণ্ডু লেন? কত নিবি?

—তিন টাকা।

যেন কেয়ারই নেই। অন্য দিন হলে ওরাই খোসামোদ করতো। আর আজ খদ্দেরকেই খোসামোদ করে মরতে হচ্ছে।

যে লোক তিন টাকা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে পারে তার সংগে কথা বলা মানে মুখ নষ্ট করা। একে ষাটটা টাকা জলে গেছে, তার ওপর আবার তিনটে টাকা গচ্চা দেওয়ার কোনও মানে হয় না। যতক্ষণ পা দুটো আছে ততক্ষণ কার পরোয়া করবো আমি! এখন থেকে আর কারো পরোয়া করছে না ভূপতি ভাদুড়ী। আর কারো পরোয়া করবেও না সে কখনও। সমস্ত মানুষ জাঁহাবাজ হয়ে গেছে। সমস্ত মানুষ ফেরেব্বাজ হয়ে গেছে। কারো ভালোর কথা সে আর ভাববে না। চলো ভূপতি ভাদুড়ী, পা চালিয়ে হেঁটেই চলো তুমি। হেঁটেই চলো .

বাহাদুর সিং রোজকার মত মাধব কুণ্ডু লেনের চৌধুরী বাড়ির গেট পাহারা দিচ্ছিল। হঠাৎ একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়ালো।

—কোন্ হ্যায়?

ট্যাক্সিটা একেবারে গেট পেরিয়ে উঠোনে ঢুকতে চাইছিল। কিন্তু বাহাদুর সিং কিছুতেই গেট খুলবে না। ট্যাক্সির ভেতরে চার-পাঁচজন ছোকরা বসে ছিল। তাদেরই মধ্যে একজন লাফিয়ে রাস্তায় নামলো। নেমে গেটের সামনে এসে দাঁড়ালো।

বললে—ভূপতি ভাদুড়ীবাবু বলে এ-বাড়িতে কেউ আছে? তাকে একবার ডেকে দাও—

—ম্যানেজারবাবু? কোঠিমে নেহি হ্যায় আভি!

—আর কে আছে তাহলে?

—আউর কোই নেহি হ্যায়!

বলে বাহাদুর সিং চুপচাপ বন্ধ গেটের সামনে দাঁড়িয়ে রইল।

ছেলেটা বললে—আর কেউ নেই তো কার সঙ্গে কথা বলবো?

উঠোনের মধ্যে সুধন্য দাঁড়িয়ে ছিল। সে দেখেছিল একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়ালো। তারপর একজন এসে দারোয়ানের সঙ্গে কী সব কথা বললে। ক'দিন থেকে সে ঘন ঘন আসা-যাওয়া করছে। কখন কী হয় এ-বাড়িতে, কিছুই বলা যায় না। তারপর আজ ধর্মতলায় গুলী চলেছে। ট্রাম বন্ধ। হাঁটতে হাঁটতে তাকে বেলগাছিয়ার মোড় পর্যন্ত যেতে হবে। সেখান থেকে বাসে উঠে বাড়ি। আবার বাস পাওয়াও যেতে পারে, না-ও পাওয়া যেতে পারে।

কথা কাটাকাটি হচ্ছে শুনে সে গেটের কাছে এগিয়ে এল।

—কী হয়েছে মশাই? কাকে চাই?

ছেলেটা বললে—সুরেন সান্ন্যাল এ-বাড়ির লোক তো?

সুধন্য বললে—হ্যাঁ এ-বাড়ির লোক। কিন্তু তিনি তো নেই এখন বাড়িতে। ক'দিন হলো তিনি বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছেন—

– তার মামা ভূপতি ভাদুড়ী? তিনিও নেই?

সুধন্য বললে—না।

ছেলেটা বললে—সেই সুরেন সান্ন্যালকে আমরা ট্যাক্সি করে নিয়ে এসেছি। তার হাতে গুলী লেগেছে।

—গুলী? বন্দুকের গুলী?

—হ্যাঁ। ধর্মতলায় পুলিশ ফায়ারিং হয়েছিল, সেখানেই গুলী লেগেছিল। তারপর সেখান থেকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল এ্যাম্বুলেন্স। এখন ব্যান্ডেজ বেঁধে রিলিজ করে দিয়েছে।

সুধন্য বুঝতে পারলে এরা সব পার্টির লোক। কিন্তু কী করবে বুঝতে পারলে না। সে নিজেই তো বাইরের লোক।

বললে—বেঁচে আছে তো?

ছেলেটা বললে—হ্যাঁ হ্যাঁ, বেঁচে আছে। বেশি লাগেনি। বেশি সিরিয়াস হলে কি আর হাসপাতাল ছেড়ে দিত!

সুধন্য বললে—দেখুন, আমি ঠিক এ-বাড়ির লোক নই, আমি এ-বাড়ির চাকরকে ডাকছি—

ইতিমধ্যে হঠাৎ ভূপতি ভাদুড়ী এসে সব দেখে অবাক।

বললে—কী হয়েছে? এখানে কীসের ভিড়? কীসের ভিড় এখানে?

একে কাল থেকেই মেজাজ খারাপ ছিল। তার ওপর হাসপাতালের ষাটটা টাকা গচ্চা গেছে। মেজাজের আর দোষটা কী?

সুধন্য এগিয়ে এল। বললে—ম্যানেজারবাবু, এরা হাসপাতাল থেকে সুরেনবাবুকে নিয়ে এসেছেন—

—য়্যাঁ!

ভূপতি ভাদুড়ীর মাথাটার ঠিক ব্রহ্মতালুর ওপর যেন বাজ পড়লো। —কোথায়? কই? কই সে?

ট্যাক্সির ভেতর তখন সুরেন অচৈতন্য অজ্ঞান হয়ে শুয়ে আছে। একটা হাতে শক্ত করে ব্যান্ডেজ বাঁধা। দেখলে মনে হয় যেন মারা গেছে। কিংবা আর কিছুক্ষণের মধ্যেই মারা যাবে।

—অজ্ঞান হয়ে গেছে নাকি সুরেন?

ছেলেরা তখন বললে—না, মরফিয়া দিয়ে ডাক্তাররা এখন অজ্ঞান করে

রেখেছে। বলেছে ভয়ের কিছু নেই। হাসপাতালের ডাক্তাররা রিলিজ করে দিয়েছে, বলেছে বাড়ি নিয়ে যেতে—

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—তোমরা কারা?

ছেলেরা বললে—আমরাও সুরেনদার পার্টির লোক।

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—আমিও তো এখন হাসপাতাল থেকে আসছি। তোমরা যদি আগে নিয়ে আসতে, তাহলে আর আমার এত হয়রানি হতো না আমার টাকাও গচ্চা যেত না—

বলে ট্যাক্সির ভেতরে মাথাটা গলিয়ে দিলে। সবাই মিলে ধরাধরি করে সুরেনকে কোলে করে বাড়ির উঠোনে নিয়ে গেল। তারপর সুরেনের ঘরের ভেতরে নিয়ে গিয়ে তার বিছানার ওপর শুইয়ে দিলে।

ছেলেরা বললে—এবার তাহলে যাই আমরা—

ভূপতি ভাদুড়ী রেগে গেল। বললে—তোমরা তো আমাদের ঘাড়ে ফেলে রেখে চলে গেলে, কিন্তু তারপর?

ছেলেরা বললে—তারপব আপনি পাড়ার ডাক্তারকে দেখান—

—বা রে মজা! গুলী খাওয়াবার বেলায় তোমরা আব ডাক্তার দেখাবার বেলায় আমি? কেন? কেন তোমরা ওকে তোমাদের দলে ঢুকিয়েছিলে শুনি? ট্রাম-বাস পুড়িয়ে কী লাভটা হয় তোমাদের বাপু? গভর্ণমেণ্টের ক্ষতি করে তোমরা কী মজাটা পাও? তোমাদের বাপ-খুড়ো-মামা-জ্যাঠা কেউ নেই? তারা তোমা-দের কিছু বলে না? তারা তোমাদেব বাড়ি ঢুকতে দেয়? যত সব হাবাতের দল জুটেছে কলকাতাটাকে একেবারে ছারখার করে ছাড়লে গো!

ছেলেরা তখন আর কেউ দাঁড়ালো না। গুটি-গুটি পায়ে পেছোতে লাগলো। আর তারপর অন্ধকারের মধ্যে গেটের বাইরে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বাইরে দরজার কড়া নাড়তেই নরেশ দত্ত খিলটা খুলে দিলে। যা ভেবেছে তাই। কালীকান্ত এসে ভেতরে ঢুকলো।

নরেশ দত্ত জিজ্ঞেস কবলে—কী খবর? কিছু সুরাহা হলো?

কালীকান্তর তখন এক হাত জিভ বেরিয়ে গিয়েছে। তক্তপোষটার ওপর বসে পড়লো মাথায় হাত দিয়ে। বললে—কেলেঙ্কাবি কান্ড হয়ে গিয়েছে—

—কী রকম?

কালীকান্ত বললে—বউটাকে ম্যানেজাব বেটা হাজতে পুরে রেখে দিযেছে—

—কেন?

কালীকান্ত বললে—ওই যে, তোমাকে বলেছিলুম চুরির কেস। মা-মণির সিন্দুক থেকে গয়না চুরি করেছিল বউ—

—তা জামিন দিলে না কেন পুলিশ?

কালীকান্ত বললে—জামিন কী করে দেবে পুলিশ? ম্যানেজার বেটা যে পুলিশকে টাকা খাইয়েছে। তা আজ তো শনিবার! আজ সারা রাত হাজতে পচবে, কাল রবিবার, কালকের দিনটাও পচবে, রাতটাও পচবে, তারপর পরশু সোমবাব। সোমবার দিন যদি কোর্টে নিয়ে যায় বউকে, তখন জামিন চাইলে জামিন দেবে—

—কে তোকে বললে এ-সব কথা?

কালীকান্ত বললে—কে আর বলবে, বললে পুলিশ!

--পুলিশ স্বীকার করলে যে তারা ম্যানেজারের টাকা খেয়েছে?

কালীকান্ত বললে—তা কি আর কেউ মুখে বলে? আমি তো হাবভাবে সব বুঝতেই পারলুম। আমাব টাকা থাকলে আমিও ঘুষ দিতুম—

নরেশ দত্ত খানিকক্ষণ গম্ভীর হয়ে মতলব ভাঁজতে লাগলো। যখনই কোনও বিপদে পড়ে নরেশ দত্ত তখনই গম্ভীর হয়ে যায়। বহুদিন থেকে নরেশ দত্ত এই কারবার করে আসছে। আর বহু মতলবও ভেঁজে ভেঁজে বার করেছে। এবার কিন্তু মতলব ভেঁজে বার করতে গিয়ে বড় মুশকিলে পড়লো। শেষকালে কি ভূপতি ভাদুড়ীর বুদ্ধির কাছে হেরে যাবে সে! ভাবতেও যেন বড় কষ্ট হলো। তাছাড়া এত দিনকার এত আয়োজনের সব ফল এমন করে নষ্ট হয়ে যাবে! বুড়ীটা মারা যাচ্ছে, ঠিক এই সময়েই কিনা এই আপদ!

ক'দিন থেকেই নানা ঝঞ্ঝাট চলছিল নরেশ দত্তর। আগে ম্যানেজারের কাছ থেকে যখনই দরকার হয়েছে টাকা নিয়ে এসেছে। একটু চাপ দিলেই বাপ্-বাপ্ বলে ক্যাশবাক্স খুলে টাকা বার করে দিয়েছে। এখন কী হবে? এখন কোন ছুতোয় আবার টাকা চাইতে যাবে!

—কিন্তু ছোড়দা, তোমার কথাতে আর ভিজছি না।

—কেন?

কালীকান্ত বললে—গয়না চুরির মতলব তো তুমিই দিলে—

—মতলবটা তো আমি দিয়েছিলুম, কিন্তু মতলব হাসিল করতে যে গোঁজা-মিল দিলে সেটাও আমার দোষ? তোর বউটা কি কোনও কাজের নয়? একেবারে অকম্মার ধাড়ি? এই সোজা কাজটা পারলে না?

তারপর বেগে গিয়ে বললে—দূর, ও শালার বউকে আর তুই ঘরে নিসনি—

কালীকান্ত কথাটার মানে বুঝতে না পেরে ছোড়দা'র মুখের দিকে চেয়ে রইল।

নবেশ দত্ত বললে—হ্যাঁ, যা বলছি ঠিক বলছি। ও বউকে নিয়ে তোর কোনও কাজে লাগবে না। একেবারে ষাঁড়ের গোবর। একটা সামান্য কাজ দিলুম তাও পারলে না! ছি ছি--

তারপর একটু থেমে বললে—ঠিক আছে। যা হবার তা হয়ে গেছে। ওই ম্যানেজার বেটাকে আমি দেখে নেব। বেটা আমাকে জক্ দেবে!

বলে উঠলো। তারপর দেয়ালের পেরেকে টাঙানো পাঞ্জাবিটা নিয়ে গায়ে চড়ালে। জুতো জোড়াও পায়ে গলালো। আর তারপর দরজায় বাইতে বেরোতে গিয়ে একবার পেছন ফিরে দাঁড়ালো। বললে—তোর কাছে কিছু রেস্তো হবে?

কালীকান্ত কিছু বুঝতে পারছিল না ছোড়দা'র হাব-ভাব। বললে—কোথায় বেরোচ্ছ তুমি?

নরেশ দত্ত বললে—দেখি শালার ম্যানেজারের একটা কিছু হেস্তনেস্ত করে আসি--

—কী হেস্তনেস্ত করবে?

—সে তুই নিজের চোখেই দেখতে পাবি। এখন তোর কাছে কিছু রেস্তো আছে কিনা তাই বল—

কালীকান্ত বললে—কিন্তু তুমি যাবে কী করে? রাস্তায় যে গুলী চলছে—

নরেশ দত্ত বললে--দূর, তোর ছোড়দা অত গুলীর পরোয়া করে না কখনও।

কত বন্দুক, কত গুলী দেখলুম। আমি ম্যানেজারের হেস্তনেস্ত না করে আর ফিরছি না।

—কী হেস্তনেস্ত করবে?

—দরকার হলে মাথা নেব। ও ভেবেছে কী? আমি ওর মাথা নিতে পারি না?

বলে আর সেখানে দাঁড়ালো না। একেবারে অন্ধকার রাস্তায় পা বাড়িয়ে দিলে। তারপর বাইরের বড় রাস্তায় এসে একটা রিক্‌শায় চেপে বসলো।

চেনা রিক্‌শাওয়ালা। বাবুকে অনেক দিন অনেক জায়গা থেকে অনেক বেঁহুশ অবস্থায় বাড়ি নিয়ে এসেছে।

—কোথায় যাবো বাবু?

—কোথায় আবার যাবো? রামবাগান! তুই কি আবার নতুন লোক হয়ে গেলি নাকি রে?

বলে নরেশ দত্ত আয়েশ করে রিকশায় হেলান দিলে। আর রিকশাওয়ালাটা ঠুন্ ঠুন্ শব্দ করতে করতে অন্ধকার ভেদ করে দৌড়তে লাগলো।

নরেশ দত্ত জীবনে অনেক দেখেছে। এককালে হাটখোলা দত্তবাড়ির ঐশ্বর্যও দেখেছে, আবার পকেটে একটা পয়সা-না-থাকার লাঞ্ছনাও সহ্য করেছে। মামলা যেমন জিতেছে, মামলায় হেরেছেও তেমনি। হার-জিতের টানা-হ্যাঁচড়াতে লাভ কিছুই হয়নি, যে দুর্দশা ছিল সেই দুর্দশাই তার রয়ে গেছে। পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রি-বন্ধক থেকে যা-কিছু টাকা পেয়েছিল সবই গেছে উকিল-ব্যারিস্টার-এ্যাটর্নির পেটে।

শেষকালে অনেক মতলব বার করে পাকড়েছিল ভূপতি ভাদুড়ীকে। ভূপতি ভাদুড়ীর তখন খুব বিপদের সময় চলছে। সুখদা তখন মা-মণির ন্যাওটা। ভূপতি ভাদুড়ীর তখন ভয় হয়েছিল যদি সব সম্পত্তি মা-মণি সুখদার নামে লিখে দেয় তো সব রসাতলে যাবে।

ঠিক সেই সুযোগে নরেশ দত্তর খপ্পরে পড়েছিল ভূপতি ভাদুড়ী!

হাটখোলার দত্তবাড়ির ছেলে, সে যে এমন ফেরেব্বাজি করবে তা তখন বুঝতে পারেনি সে।

রিক্‌শার ওপর চড়ে বসে চলতে চলতে নরেশ দত্ত সেই কথাই ভাবছিল। ফেরেব্বাজির সার কতটুকু দেখেছে ম্যানেজার। আমাকে দিয়ে কাজ হাসিল করে এখন আমাকেই ল্যাং মারা। দাঁড়াও তুমি। আমি তোমায় নতুন ফেরেব্বাজি দেখাচ্ছি।

এমনিতে রাত হয়েছে। তবু আজ যেন আরো রাত হয়েছে মনে হচ্ছে। সেই দুপুর থেকে শুরু হয়েছে হল্লা। তারপর বিকেলবেলা গুলী চলেছে ধর্মতলায়। বাস চললেও, ট্রাম পুরো বন্ধ হয়ে গেছে। লোকজন যারা অন্যদিন কাজে-অকাজে রাস্তায় বেরোত তারা আজ বাড়ির ভেতরে বসে বসে রেডিও শুনছে, নয়তো তাস খেলছে।

এবার রিক্‌শাটা গিয়ে ঢুকলো রামবাগানের গলির ভেতর। ওখানে তখন দিন। ওখানে ঢুকে বোঝাই যায় না এই দু'ঘণ্টা আগে কলকাতা সহরে পুলিশের গুলীতে মানুষের রক্ত পিচের রাস্তায় গড়াচ্ছিল।

এ যেন দিন এখানে।

দূর থেকে দেখা গেল ভুলোকে।

—এই ভুলো, ভুলো—

ভুলো পুরোনো পাপী এ-পাড়ার। হঠাৎ বড়বাবুকে দেখে কিল-বিল করে উঠলো। পানটা মুখে পুরে দিয়েই দৌড়ে এসে মাথা নুইয়ে প্রণাম করলে নরেশ দত্তকে।

নরেশ দত্ত ততক্ষণে রিকশা ছেড়ে দিয়েছে। বললে—কী রে এত কাহিল হয়ে গিছিস কেন? মাল-টাল পেটে পড়ছে না বুঝি? কী হলো? এ-পাড়ায় কাপ্তান-টাপ্তান আসা ছেড়ে দিলে নাকি?

ভুলো বললে—বড়বাবু না এলে কাহিল হবো না? কী বলছেন আপনি?

নরেশ দত্ত পাঞ্জাবির পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট ঝপাৎ করে বার করে দিলে।

বললে—নিয়ে আয় দিকিনি, ভালো দেখে খাঁটি দু'নম্বর নিয়ে আসবি। তোর সঙ্গে কথা আছে। তোর দলবল, সাগরেদরা কোথায় গেল রে? আছে তো সব ঠিক?

ভুলো বললে—সব আইডিল বসে আছে বড়বাবু, একটা কাজকর্ম দিন না, খেতে পাচ্ছি না—

নরেশ দত্ত বললে—হবে হবে, সেই জন্যেই তো এসেছি রে—

মহা খুশী ভুলো। সঙ্গে সঙ্গে ভুলোর আরো সাগরেদের সঙ্গেও দেখা হয়ে গেল। সবাই খুশী। বড়বাবু এসেছে, বড়বাবু এসেছে!

বড়বাবু বললে—ওরে না না, আমি আর এখন বড়বাবু নই রে, এখন বাবুই নই। এখন আমার হাঁড়ি ফেঁসে গেছে। আমি কারে পড়ে এসেছি—একবার যদি আমাকে উদ্ধার করে দিতে পারিস তো আবার আমি বড়বাবু হবো, তখন রোজ রোজ আসবো এখানে—

চলতে চলতে একটা আড্ডার মধ্যে ঢুকলো নরেশ দত্ত। বেশ নিরিবিলি জায়গা। আসলে এটাই হচ্ছে ভুলোদের আড্ডাখানা। যখন মদের টানাটানি পড়ে রামবাগানে তখন এখান থেকেই রাত-বিরেতে সাপ্লাই হয় পাড়ার ঘরে ঘরে।

নরেশ দত্ত বললে—এবার গেলাসে ঢাল সবাই, চুমুক দে—

সবাই চুমুক দিলে।

নরেশ দত্ত বললে—এবার কাজের কথা বলি। মাধব কুণ্ডু লেন চিনিস—

—চিনি হুজুর, শ্যামবাজারে।

—বহুত আচ্ছা, চৌধুরীদের বাড়ি চিনিস? শিবশম্ভু চৌধুরী?

চিনতে পারলে সবাই।

—সেইখানকার কথা বলছি। সে-বাড়ির ম্যানেজার আছে একটা। কালো মতন বেঁটে। বয়েস সত্তরের কাছাকাছি, কিন্তু এখনও খুব ডাঁটো। বেটা আমার লাখখানেক টাকা হাওলাত নিয়েছে, দিচ্ছে না। আসলও দিচ্ছে না, সুদও দিচ্ছে না। তাকে খতম করে দিতে হবে—পারবি?

ভুলো আবার গেলাসে চুমুক দিতে গিয়ে থমকে গেল।

—পারবিনে তাহলে?

—কিন্তু বড়বাবু, খতম করে দিলে টাকা উসুল হবে কী করে?

—দূর, তুইও যেমন! অমন কত লাখ টাকা আমার গেছে। উসুল হওয়ার কথা কে ভাবছে? টাকা উসুল না-ই বা হলো। কিন্তু বদলা তো নিতে পারবো। আমাকে জক্ দিয়ে বেটা পায়ের ওপর পা তুলে আয়েশ করবে, আমার টাকা শোধ করবার নাম করবে না, এটা তো ভাল কথা নয়—

—মামলা-কাছারি হয়েছে নাকি?

—আরে মামলা-কাছারি হয়নি ভেবেছিস? মামলা-কাছারিতেই তো আমার গাঁটের পঞ্চাশ হাজার টাকা উকিলে-ব্যারিস্টারে খেয়ে ফেললে। তোরা কাজ হাসিল করতে পারবি কিনা তাই বল।

—কেন পারবো না বড়বাবু! হুকুম দিলেই সেবা করবো।

—তাহলে আমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারি তো?

ভুলো বললে—আপনি মোচে তা দিয়ে ঘুমোন গে যান—

—ঠিক আছে। বলে নরেশ দত্ত গেলাসে শেষ চুমুক দিয়ে উঠে পড়লো। তারপর ঠোঁট মুছতে মুছতে বাইরে এসে দাঁড়ালো। পাড়া তখনও সরগরম।

নরেশ দত্ত পকেটে হাত দিয়ে জিজ্ঞেস করলে—টাকা তোরা আগাম নিবি, না পরে হলে চলবে?

তারপরে নিজেই একটা দশ টাকার নোট বার করে এগিয়ে দিয়ে বললে—নে, আগাম বায়না নিয়ে নে—যা—কাজ হাসিল হলে বাকি-বকেয়া শোধ হয়ে যাবে—

বলে পকেট থেকে এক প্যাকেট সিগারেট বার করে সবাইকে একটা একটা করে দিলে। বললে—নে, ধর আমার দায় উদ্ধার হয়ে যাক, তখন যা চাইবি তোরা পাবি—

তারপর সামনেই একটা রিকশা দাঁড়িয়েছিল, তাতেই উঠে বসলো নরেশ দত্ত।

বললে—চলো ভাই, চলো—

কিন্তু চলতে গিয়েও থেমে গেল রিকশাটা। সামনেই পুলিশের দারোগা দু'জন কনেষ্টবল নিয়ে পথ আটকে দাঁড়ালো।

দারোগা এগিয়ে এসে বললে—আপনার নামই নরেশ দত্ত?

নরেশ দত্ত তো অবাক। বললে—হ্যাঁ, কেন স্যার?

—আপনাকে আমি এ্যারেস্ট করছি। আপনি আমার সঙ্গে থানায় চলুন—

নরেশ দত্ত তখনও রিকশা থেকে নামেনি। সেখানে বসে বসেই বললে—কী বলছেন স্যার আমি বুঝতে পারছি না। আমি তো স্যার কিছু অন্যায় করিনি—

—আপনি অন্যায় করেছেন কি করেননি তা কোর্ট বুঝবে। এখন চলুন, রিকশা থেকে নামুন।

নরেশ দত্ত অগত্যা নেমে পড়লো। চারদিকে একবার চেয়ে দেখলে। রাস্তা ফাঁকা। পুলিশ দেখবার সঙ্গে সঙ্গে ভুলোরা সবাই দৌড় দিয়েছে। দু'চারজন মানুষ যারাও বা রাস্তায় পায়চারি করছিল তারাও কে কোথায় উধাও হয়ে গেছে।

নরেশ দত্ত রিকশা থেকে নেমে বললে- আমি কী অপরাধ করলুম তা আমায় বলবেন তো স্যার—

—এখন থানায় চলুন, কোর্টে গিয়ে সব শুনতে পাবেন—

কনেষ্টবল দুটো ঠেলতে ঠেলতে নরেশ দত্তকে থানার দিকে নিয়ে গেল।

ধর্মতলা তখন শান্ত। ক'ঘণ্টা আগেই যে সেখানে খুন-খারাবি হয়ে গেছে তার কোনও চিহ্ন আর তখন সেখানে নেই। কিন্তু জায়গাটা তখনও থমথম করছে। খানকয়েক পুলিশের গাড়ি আর জনকয়েক কনষ্টেবল তখনও পাহারা

দিচ্ছে এখানে-ওখানে। খুব সাবধান! কড়া পাহারা রাখো। আমাদের গদি কেড়ে নেবার জন্যে সমাজ-বিরোধীরা ষড়যন্ত্র করছে। তারা সারা সহরে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে আমাদের ভয় পাওয়াতে চাইছে। অহিংসার রাজত্বে হিংসার প্রশ্রয় দিচ্ছে। যেমন করে হোক ওদের শায়েস্তা করতে হবে। গান্ধীজীর মহান আদর্শ বজায় রাখতে হবে—

তখন ক্যাবিনেটের মীটিং শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু টেলিফোনে এখান থেকে ওখানে কথা চলছে। ওদের অবস্থা কী? ওদের পার্টিকে বে-আইনী করলে চলে না? নাকি তার জন্যে আবার কংগ্রেস হাই-কম্যাণ্ডের পারমিশান চাই? বে-আইনী করে দিলে ক্ষতিটা কী? ওরা তো রাশিয়ার দালাল! রাশিয়া যদি টাকা না দেবে তো এত বড় বড় মিছিলের খরচ আসে কোত্থেকে? কে যোগায় ওদের এত টাকা?

ওদিক থেকে পুলিশ-কমিশনার আর এদিক থেকে হোম-মিনিস্টার টেলিফোন করলেন—ওদের সবাইকে জেলে পুরে দিন—

—কিন্তু জেলখানার সব ঘর ভর্তি হয়ে গেছে।

—সে কী! আর একটুও জায়গা নেই?

—না। আরো একশো মত লোক রাখবার জায়গা চাই।

—জেলখানার উঠোন? উঠোনে তো টেম্পোরারি শেড্ করে দিতে পারেন!

—তা তো করবার ব্যবস্থা করেছি। তাতেও কুলোচ্ছে না।

—তাহলে এক কাজ করুন! সকলকে নিয়ে বাইরে পাঠিয়ে দিন—

—বাইরে কোথায়?

—যেখানে হোক। ধরুন বারাসতের ইনটিরিয়ারে, কিংবা গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের ওপর, কিংবা ডায়মণ্ডহারবারের রাস্তায়। সেখানে নিয়ে গিয়ে তাদের ছেড়ে দিন—যতগুলো ভ্যান আছে সবগুলো ভর্তি করে চারদিকে পাঠিয়ে দিন—

—ঠিক আছে স্যার—

তা সেই রকম ব্যবস্থাই হলো। লালবাজারের লাল বাড়িটা থেকে দলে দলে ছাড়লো ভ্যানগুলো। এক-একটা ভ্যান ছাড়ে আর হুইশল বাজে পুলিশের। রাত তখন অনেক। মাঝরাত্রের মধ্যেই সব কাজ সেরে ফেলতে হবে। আর মাঝ রাত্রের মধ্যেই সব প্রিজনারদের নিঃশব্দে ভাসিয়ে দিয়ে আসতে হবে অকূল পাথারে।

আর মেয়েরা?

পুলিশ কর্তার হুকুম হলো—মেয়েদেরও একটা ভ্যানে পুরে দিন। পুরে দিয়ে পাঠিয়ে দিন বসিরহাট ছাড়িয়ে কোনও মাঠের ওপর—

তা সেই ব্যবস্থা পাকা করে দিয়ে পুলিশ কমিশনারের কাজের বিরাম হলো। সারাদিন বড় পরিশ্রম গেছে। একদিকে হোম-মিনিস্টারের তলব আর অন্যদিকে এদের গণ্ডগোল। কলকাতার শান্তি নষ্ট করতে দিলে চলবে না। কলকাতার লোক যেন শান্তিতে ঘুমোতে পারে। তারা যেন কাল সকালে আবার ঠিক সময়ে বাস-ট্রাম খালি পায়। কাল সকাল সাড়ে দশটার মধ্যে যেন সবাই অফিস-কাছারি-ব্যাঙ্ক করতে পারে।

রাত্রে বাড়িতে গিয়েও শান্তি নেই। টেলিফোন তখনও বাজে। তখনও মিনিস্টারের কাছে জবাবদিহি করতে হয়। তখনও বলতে হয়—এভ্‌রিথিং ও-কে—

—সকলকে এ্যারেস্ট করেছেন তো?

—হ্যাঁ!

—আমি এখুনি দিল্লীতে টেলিফোন করছি। বলছি সব ও-কে!

—হ্যাঁ, বলে দিন!

আর তারপর পুলিশ কমিশনার কিছুক্ষণের জন্যে বিছানায় গা এলিয়ে দিলে।

তখন আকাশের অনেকগুলো তারা জায়গা বদল করে নিয়েছে। অন্ধকাব রাস্তার মাঝখানে ভ্যানটা গিয়ে দাঁড়ালো। পেছন দিকের দরজাটার চাবি খুলে গেল হঠাৎ।

পাহারাদার বললে—এখানে নামুন সবাই, নেমে যান—

টুলু উঁকি দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে দেখলে।

বললে—এ কোথায় এলাম?

কে বলে দেবে কোথায় এল তারা। প্রশ্ন করবার মানুষ ভ্যানের ভেতরে গাদাগাদি করে এত দূর এসেছে। কিন্তু উত্তর দেবার মানুষের মুখ বন্ধ। তারা হুকুম তামিল করবার চাকর, উত্তর দেওয়ার ডিউটি তাদের নয়। তোমাদের যা বলছি তাই করো। এখানে নেমে যার যা খুশী তাই করো। আমাদের ভ্যান খালি করে দাও, আমরা বাড়ি যাই। বাড়ি গেলে আমাদের ছুটি।

টুলু নামলো। পেছনে পেছনে আরো সবাই নামলো।

—এ কোথায় এলুম ভাই?

কে জানে তারা কোথায় এল। চারদিকে শুধু গাছপালা। দূরে কয়েকটা চালাবাড়ি। বাগান, মাঠ, ক্ষেত। কোথাও এতটুকু আলোর চিহ্ন নেই। সবাই অন্ধকারে অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

সন্ধ্যা বললে—এখন কোথায় যাবো?

টুলু বললে—কাউকে জিজ্ঞেস করে দেখি, আয় না—

শুধু সন্ধ্যা নয়। মেয়েদের সবাইকে গাড়িতে পুরে একসঙ্গে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে।

একটা দোকান-ঘরের ঝাঁপ বন্ধ।

টুলু বাইরে থেকে ডাকতে লাগলো—ভেতরে কে আছেন, একবার উঠুন—

অনেকক্ষণ ডাকতে হলো। সহজে কি কারোর ঘুম ভাঙে? একজনের কী যেন দয়া হলো। ঝাঁপ খুলে চোখ রগড়াতে রগড়াতে এসে এতগুলো মেয়েকে একসঙ্গে দেখে হতবাক্।

—আমাদের পুলিশে ধরে নিয়ে এসে ছেড়ে দিয়ে গেছে। আমাদের দেখে ভয় পাবেন না। এ-জায়গার নামটা কী বলতে পারেন?

লোকটা বললে—নবাবপুর!

সন্ধ্যা হেসে উঠলো। আর নাম পেলে না! নাম রেখেছে নবাবপুর। সব নবাবরা থাকে বুঝি এখানে!

—এটা কোন্ জেলা?

—চব্বিশ পরগণা!

চব্বিশ পরগণা। তাহলে তো বেশি দূর নিয়ে আসেনি।

—এখানে রেলের ষ্টেশন আছে?

—না, সে তো অনেক দূর। এখন অন্ধকারে সেখানে যেতে পারবেন না।

—যাবো না তো থাকবো কোথায়?

কোথায় থাকবে তার হদিস দিতে পারলে না লোকটা। দোকানের ভেতরে অত জায়গা নেই যে তাদের সবাইকে জায়গা দিতে পাবে।

—এখানে আমাদেব জমিদারবাবুদের একটা চণ্ডীমণ্ডপ আছে, সেখানে থাকতে পারেন।

—জায়গা খালি আছে?

—আছে। চলুন -

লোকটার দয়া-মায়া আছে বলতে হবে। সেই অত রাত্রে একটা হারিকেন জ্বালিয়ে সকলকে নিয়ে চললো।

পুরোন বাড়ি। তা হোক। লোকজন জমিদারের কেউ থাকে না। জমিদাররা কলকাতায় থাকে। কিন্তু বিরাট বাড়িটা খালি পড়ে আছে। গভর্ণমেণ্টের ইচ্ছে আছে উদ্বাস্তুদের ওখানে নিয়ে এসে কিছু একটা কাজকর্ম করে। কিন্তু সে ইচ্ছে এখনও কার্যকরী হয়নি।

—এখানে টেলিফোন আছে?

সে তো পোস্টাফিসে। কাল সকাল ছাড়া পাওয়া যাবে না। রাত্তিরে পোস্টাফিস বন্ধ।

—আর খববের কাগজ?

—খবরের কাগজ আসবে সে তাও সকালে!

তা সেই ভালো। লোকটা দু'একজনকে ডেকে ঘব পরিষ্কার করিয়ে দিলে। হারিকেনটাও বেখে গেল।

টুলু বললে—আর ক'ঘণ্টাই বা। এটুকু জেগেই কেটে যাবে—

সকাল বেলা পোস্টাফিস খুলতেই টুলু এগিয়ে গেল পোস্ট-মাস্টারের কাছে। টোল-কল্ করবার জন্যে ধরলে। পোস্টমাস্টার এতগুলো মেয়েকে এক-সঙ্গে দেখে অবাক হয়ে গেছে। জিজ্ঞেস কবলে—আপনারা কারা?

—আমরা পলিটিক্যাল পার্টির লোক।

পোস্টমাস্টার বুঝতে পারলে। বললে—কাল কলকাতায় নাকি দু'শো লোক মারা গেছে—

—আপনি কী করে জানলেন?

—আমাদের হেড-অফিস থেকে খবর এসেছে।

—তা এই অজ গাঁয়ের পোস্টাফিসে টেলিফোন এল কোত্থেকে?

পোস্টমাস্টার মশাই বললে—সেই যুদ্ধের সময় এখানে মিলিটারিরা ছিল, তাদের কল্যাণে তখন থেকে টেলিফোন রয়ে গেছে—

অনেক কষ্টে লাইন পাওয়া গেল।

—কে? সন্দীপদা? আমি টুলু!

—কোত্থেকে!

—আমাদের নবাবপুরে নামিয়ে দিয়ে চলে গেছে পুলিশ। আমরা এখানকাব পোস্টাফিস থেকে টেলিফোন করছি। ওখানকাব খবর কী? পূর্ণদা কোথায়?

—তিনি এ্যারেস্টেড্!

—আর দেবেশদা?

—দেবেশও এ্যারেস্টেড!

—আচ্ছা বলতে পারেন সেই সুরেনদা কোথায়?

—কে? সুরেন সান্ন্যাল বলে সেই ভদ্রলোক? তার গায়ে তো গুলী লেগেছিল।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, তারপর কী হলো? কিছু খবর পেয়েছেন?

সন্দীপদা বললে—সে ছেলেটিকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছিল, শুনছি সেখানে সে মারা গেছে—

টুলুর মাথাটা যেন খানিকক্ষণের জন্যে ঘুরতে লাগলো। এর আগে অনেকবার এমন মিছিলে যোগ দিয়েছে টুলু। এ তাদের কাছে গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে। এই গুলী, বন্দুক, পুলিশ. টিয়ার-গ্যাস, এসব পার্টির কাজ করতে গেলে এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। তারপরে এই ভ্যানে করে তুলে এনে অজ পাড়াগাঁয়ে ছেড়ে দেওয়া, এও নতুন নয়। কিন্তু এবারে বোধহয় তাদের হিসেবে একটু ভুল হয়ে গিয়েছিল। হ্যাঁ, ভুলই হয়েছিল নিশ্চয়। নইলে এমন গাঁয়ে ছেড়ে দিলে কেন, যেখানে পোস্টাফিস আছে, টেলিফোন আছে।

—কী হলো টুলুদি?

পার্টির মেয়েরাও হঠাৎ টুলুদির চেহারা দেখে অবাক হয়ে গেছে।

—খবর কী কলকাতার?

টুলু বললে—মাথাটা খুব ঘুরে উঠলো। চল্, কোথাও গিয়ে একটু বসা যাক—

তা গ্রামেও রাজনীতি জানা লোক কিছু কিছু আছে। নবাবপুর পাড়াগাঁ হলেও এখানকার লোকও কিছু কিছু খবর রাখে সহরের।

অনেক বুড়ো বুড়ো বয়েসের লোক দেখা করতে এল। দেখতে দেখতে ভিড় হয়ে গেল বাড়ির সামনে।

—তা হ্যাঁ গা, পুলিশে তোমাদের গায়ে হাত দিলে?

সন্ধ্যা বললে—কেন. পুলিশ গায়ে হাত দিলে শুনে অবাক হচ্ছেন আপনারা? ইংরেজদের বদলে কংগ্রেস এসেছে, কিন্তু পুলিশ যে-কে-সেই আছে, পুলিশের হালচাল কিছুই বদলায়নি।

একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক বললে—তাই তো দেখছি—

এক-একজনের বাড়িতে দলের এক-একজন লোকের খাওয়ার বন্দোবস্ত হলো। সবাই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ভাগাভাগি করে সকলকে আপ্যায়ন করলে। সবাই-ই বলতে গেলে চাষী শ্রেণীর লোক। কেউ তেমন কলকাতা সহর দেখেনি। বিশেষ করে বুড়োরা। কেউ কাশী বা শ্রীক্ষেত্র দেখতে যাবার পথে শেয়ালদ' ষ্টেশনে নেমে হাওড়া ষ্টেশনে গিয়ে আবার ট্রেণ ধরেছে। সেইটুকুই যা কলকাতা দেখা।

বেলা হয়ে গিয়েছিল। এবপর আর দেরী করলে কলকাতায় যেতে রাত হয়ে যাবে। খানকয়েক গরুর গাড়ির ব্যবস্থা হলো। একেবারে ষ্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে দেবে তারা। বিকেল দুটো নাগাদ গাড়িগুলো গ্রাম ছাড়লো। ছ'ক্রোশ রাস্তা।

বিকেল ছটা নাগাদ ষ্টেশনে এসে পৌঁছলো সবাই। হাতে আব টাকা-পযসা নেই কারো। পার্টিব মেয়েরাই ষ্টেশনের সামনে দাঁড়িয়ে পার্টির নাম করে চাঁদা তুলতে লাগলো। আধ ঘণ্টার মধ্যেই টাকা উঠলো অনেক। কুড়িজনের টিকিট কাটতে হবে।

ট্রেণ যখন এল সবাই হুড়হুড় করে উঠলো।

একজনের যেন খেয়াল হয়েছে। বললে—টুলুদি? টুলুদি কোথায় গেল?

আর একজন বললে—ওই তো টুলুদি—

টুলু এককোণে তখন চুপ করে বসে আছে নির্জীবের মত।

সন্ধ্যা জিজ্ঞেস করলে—তোমার মাথা ধরাটা সেরেছে টুলুদি?

টুলু বাইরের দিকে তেমনি একদৃষ্টে চেয়ে রইল। কোনও কথার উত্তর দিলে না। তার যেন কথা বলবার ক্ষমতাটুকুও লোপ পেয়ে গেছে।

রাতটা কোনও রকমে কাটলো। কলকাতার রাত সাধারণতঃ কাটতে চায় না। ওই রাতগুলোতেই দেয়ালে-দেয়ালে পোস্টার আঁটা হয়। ওই রাতগুলোতেই পার্টির ষড়যন্ত্র মুখর হয়ে ওঠে। কাল সকালে আবার কোন্ প্রোগ্রাম নেওয়া হবে তা ক্যাবিনেটে ওঠবার আগে টেলিফোনেই ঠিক হয়ে যায়। এ-পাড়া থেকে ও পাড়ায় খবর চালাচালি হয়। রাত্রে মানুষগুলো অনেক আশা নিয়ে ঘুমোতে যায়, যেন কাল সকালে ট্রাম-বাস ঠিক চলে। ঠিক সময়ে যেন বাজার বসে। ঠিক সময়ে যেন ছেলে-মেয়েরা স্কুল-কলেজে যেতে পারে, স্কুল-কলেজ থেকে ফিরতে পারে—

পর্মিলির সঙ্গে আর সেদিন বেশি কথা বলেননি পুণ্যশ্লোকবাবু।

পর্মিলিকে বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছিল।

পুণ্যশ্লোকবাবু পর্মিলির মুখের দিকে চেয়ে শুধু বললেন—খুব টায়ার্ড দেখাচ্ছে তোমাকে পর্মিলি—

পর্মিলি কিছু বললে না।

পুণ্যশ্লোকবাবু আবার বললেন—গুণ্ডাদের কাণ্ড এসব। তুমি কিছু ভেবো না। আমি কালই ওদের ঠাণ্ডা করে দেবো—তুমি যাও, ওপরে যাও তুমি, টেক্ রেস্ট্—

পর্মিলি আস্তে আস্তে ওপরে উঠে তার নিজের ঘরে চলে গেল।

তারপর প্রজেশের দিকে ফিরে বললেন—দিস ইজ্ ভেরি ব্যাড্! আমি বলছি—দিস্ ইজ ভেরি ব্যাড্। আমি ডক্টর রায়কে এখুনি রিং করেছিলুম—

প্রজেশ উৎসাহিত হলো। বললে—কী বললেন ডক্টর রায়?

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—কী আর বলবেন, তাঁর বাড়ির সামনেও ওই হামলা, দুটো বোমা ফেটেছে।

প্রজেশ বললে—আমি বুঝতে পারি না এত বোমা পায় কোথা থেকে ওরা—

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—বোমার চেয়ে বড় কথা ওরা টাকা পায় কোথা থেকে। এতবড় প্রোসেশানের ব্যবস্থা করতে কম করে অন্তত এক লাখ টাকা খরচ হয়েছে। এ টাকা দেয় কে?

প্রজেশ বললে—ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চ কী বলে?

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—তারা তো বলে ব্যাঙ্ক অব্ চায়না টাকা সাপ্লাই করছে—

—কিন্তু এটা আপনারা বন্ধ করতে পারেন না?

পুণ্যশ্লোকবাবুর এ-সব কথা ভাবতে আর ভালো লাগছিল না। প্রসঙ্গটা এড়াতে চাইছিলেন।

বললেন—এসব কথা থাক, আমি পমিলির ফিউচার নিয়ে খুব ওরিড্ হয়ে পড়েছি। গাড়িতে আসতে আসতে কী বললে তোমাকে পমিলি? তুমি প্রোপাজ করেছ?

প্রজেশ এ-কথার কী উত্তর দেবে বুঝতে পারলে না। তারপর একটু থেমে বললে—পমিলির টেম্পার তত ভালো ছিল না, তাই ..

—হোয়াট ডু ইউ মীন্ বাই টেম্পার? ওর রি-এ্যাকশন কী? ও কি খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছে? ওর গায়ে কেউ হাত দিয়েছে?

প্রজেশ বললে—না, তা দেয়নি—

—তাহলে? তুমি জিজ্ঞেস করলে না, কেন ও আজকে গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছিল? এই রকম দিনে কেউ গাড়ি নিয়ে বেরোয়?

প্রজেশ বললে—আমি জিজ্ঞেস করেছিলুম, কিন্তু কোনো উত্তর দেয়নি সে-কথার—

—ওর গাড়িটার কী অবস্থা?

—সেখানেই পড়ে আছে—

—আর ওর ড্রাইভার জগন্নাথ?

—সে কোথায় পালিয়েছে, তার কোনও ট্রেস নেই।

—তুমি তাহলে কালকেই ইন্সিরেন্স অফিসকে একটা খবর দিয়ে দিও। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়, পমিলিকে নিয়ে আমি কী করবো বুঝতে পারছি না। আগে ক্লাব, পিয়ানো, ড্রিংকস্ নিয়ে মেতে ছিল, তাব একটা মানে ছিল তবু। কিন্তু এটা কী? হঠাৎ এই আন্ডারডগ্‌দের দিকে ওর অত সিম্প্যাথি গেল কেন? এ যদি একবার প্রশ্রয় পেয়ে যায় তো এ তো আরো বেড়ে যাবে। তখন তো আমাদের ক্যাবিনেটে কথা উঠবে—

প্রজেশ বললে—তা তো বটেই—

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—এই আমাদের ছেলে-মেয়েদের কাজকর্ম নিয়ে আমাদের এ্যাসেম্ব্লিতে কথা উঠতে পারে, তখন মুশকিল হয়, তা পমিলি বোঝে না—! এই একটু আগেই ডক্টর রায়ের সঙ্গে কথা হচ্ছিল—হয়ত ওরা এন্কোয়ারি কমিশন বসাবার জন্যে বায়না ধরবে—

প্রজেশ চুপ করে রইল।

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—যদি এন্কোয়ারি কমিশন সত্যিই বসে তো তখন তোমার অনেক কাজ পড়বে। তখন তোমাকে অফিস থেকে ছুটি নিতে হবে—

—এন্কোয়ারি কমিশন কি সত্যিই বসবে?

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—বসতে তো পারে। নইলে হয়ত আবার হরতালের ডাক দেবে ওরা। আমরা তো পূর্ণবাবুকে এ্যারেস্ট করেছি, তা জানো তো? ওদের পার্টির সব পান্ডাদেরও এ্যারেস্ট করেছি।

প্রজেশ বললে—ঠিক করেছেন বড্ড বাড় বেড়েছিল—

—কিন্তু একটা কথা, এখন তুমি বাড়ি চলে যাও। কাল ভোরবেলা আবার একবার আসবে। আমার অনেক প্ল্যান ঘুরছে মাথায়। সামনের ইলেকশানের কথা ভেবেই বলছি—

প্রজেশ বললে—হ্যাঁ, তারও তো সময় ঘনিয়ে আসছে—

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—রাত হলো, তুমি এখন যাও, আমারও একটু বিশ্রাম করে নিয়েই আবার কাল থেকে লাগতে হবে! দেখ, এবার ইলেকশানের আগেই পমিলির বিয়েটা দিতে চাই। নইলে ইলেকশানের সময় আবার পমিলিকে

সামলাতে হলে কাজকর্ম আর কিছুছু করতে পারবো না—

বলে আর দাঁড়ালেন না। সামনে দিয়ে রঘু যাচ্ছিল, তাকে ডাকলেন—এই, দিদিমণি কী করছে রে?

রঘু সসম্ভ্রমে কাছে এল। বললে—দিদিমণির ঘরের দরজা বন্ধ দেখে এলুম—

—দিদিমণির তো খাওয়া হয়নি। খাবে না?

রঘু এর উত্তর কী দেবে বুঝতে পারলে না।

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—আচ্ছা তুই যা—

রঘু চলে যেতে পেরে বেঁচে গেল। তারপর প্রজেশও চলে গেল। তার গাড়িটা ভেতরে এনে রেখেছিল সে। নইলে হয়ত ওরা পর্মিলির গাড়ির মত আগুন জ্বালিয়ে দিত! রাস্তায় তখন আরো অন্ধকার। আগেই কয়েকটা বাতি নিভে গিয়েছিল। এবার সব ক'টা বাতি ঢিল মেরে ভেঙে দিয়েছে। দু'জন কনস্টেবল তখনও পাহারা দিচ্ছে গেটে।

প্রজেশ গেট পার হয়ে থার্ড গীয়ারে সোজা অনেকটা এগিয়ে গেল। তাড়াতাড়ি যাওয়াই ভালো। রাস্তার মধ্যে তাকে দেখতে পেলে ছেলেরা ক্ষেপে যেতে পারে। সত্যিই, আশ্চর্য হয়ে গেল প্রজেশ! অথচ এই ক'বছর আগেও তারা 'পুণ্যশ্লোক রায় জিন্দাবাদ' বলতে অজ্ঞান ছিল। কলকাতার যেখানে যত অনুষ্ঠান হয়েছে সব জায়গা থেকে ডাকতে এসেছে পুণ্যশ্লোকবাবুকে। পুণ্যশ্লোকবাবুর সব জায়গায় যাওয়া চাই-ই। তিনি গেলেই যেন তারা কৃতার্থ। আর পুণ্যশ্লোকবাবু যখন লেকচার দিতে দাঁড়াবেন, তখন চারদিক থেকে হাততালি। সেসব কোথায় গেল! সে যুগ কোথায় তলিয়ে গেল। এখন সেই পুণ্যশ্লোকবাবুকে কেউ ডাকলে প্রজেশেরই ভয় হয়—ঢিল পড়বে না তো? চেয়ার ভাঙবে না তো?

এ কেন হলো?

বাড়ির সামনে আসতেই হঠাৎ মনে হলো, কে যেন দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে।

—কে?

এত রাত্রে লোকটা একলা দাঁড়িয়ে কী চায়!

প্রজেশ গাড়ি থামিয়ে জিজ্ঞেস করলে—কাকে চাই?

আরো তীক্ষ্ম নজর দিয়ে দেখলে। ছিঃ ছিঃ, একটা গরু। একটা গরু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জাবর কাটছে। প্রজেশের কি চোখও খারাপ হয়ে গেল নাকি? একটা জলজ্যান্ত গরুকে কী করে সে মানুষ বলে ভুল করলে।

গরুটাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে গ্যারাজের দরজার চাবি খুলে গাড়িটা ঢুকিয়ে দিলে। তারপর আবার চাবি বন্ধ করে দরজার কলিং-বেলটা টিপলে।

কিন্তু কলকাতার রাতকে সত্যিই বিশ্বাস নেই। বিশ্বাস ছিল, আগে যখন রাতগুলো কলকাতায় নামতো ঘুমোবার জন্যে। তখন দিনের ক্লান্তির শেষে ঘুম নামতো নতুন উদ্যোগে ভোরবেলা নতুন করে কাজ করবার জন্যে। এখন রাত নামে নতুন ষড়যন্ত্রের জন্ম দেবে বলে। এই সব গলির ভেতরে তারা হয়ত নানান ছদ্মবেশে নিরীহ চেহারায় দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু আসলে তারা মানুষ। তারা সমস্ত রাত ধরে দেয়ালে দেয়ালে হাতে-লেখা পোস্টার এঁটে দেয়। বিপ্লবের আহ্বান জানায়। আর ভোর হলেই তারা বাসে-ট্রামে ঝুলতে ঝুলতে অফিসে-কারখানায়-কাছারিতে যায়।.

পুণ্যশ্লোকবাবুরও অনেকক্ষণ ঘুম আসেনি! অনেক চিঠিপত্র অনেক কাজ-কর্ম ক'দিন ধরে বাকি পড়েছিল। কিন্তু মন পড়েছিল গেটের দিকে। আজকে তাঁরই বাড়ির সামনে ওরা 'মুর্দাবাদ' বলে চেঁচিয়েছে। এতদিনের এত জেল-খাটা, এতদিনেব এত লেকচারের পর আজ এই পরিণতি? এও তাঁকে দেখে যেতে হলো! কিন্তু হয়ত এই-ই শেষ নয়। এরপরে এন্‌কোয়ারি কমিশনের দাবী জানাবে ওরা। তদন্ত-কমিটি! তদন্ত-কমিটির সামনে ওরা দলে দলে সাক্ষ্য দিতে যাবে। বলবে, কংগ্রেস নিরীহ মানুষের ওপর গুলী চালিয়েছে। বলবে, পুলিশকে উস্‌কিয়ে দেবার জন্যে গুন্ডাদের লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে! হয়ত সমস্তই ফাঁস হয়ে যাবে। তাঁর নামও উঠবে, প্রজেশের নামও উঠবে!

আস্তে আস্তে নিজের ঘর ছেড়ে সিঁড়ির দিকে যেতে লাগলেন।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতলায় করিডোর। হঠাৎ নজরে পড়লো পাশের পর্মিলির ঘরে আলো জ্বলছে। এত রাত্রেও জেগে আছে পর্মিলি! ফ্যান-লাইট থেকে আলোর জেল্লা বাইরের সিলিং-এ এসে পড়েছে।

—পর্মিলি!

পর্মিলিকে না ডেকে থাকতে পারলেন না পুণ্যশ্লোকবাবু।

—পর্মিলি, এখনও জেগে আছ?

দরজার পাল্লা দুটো খুট করে খুলে গেল। তারপর ভেতর থেকে পর্মিলি মুখটা বাড়িয়ে বললে—কী?

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—না না, তোমায় আর বিরক্ত করবো না আমি। কিন্তু এত রাত পর্যন্ত জেগে আছ কেন? ঘুমিয়ে পড়ো—

পর্মিলি বললে—একটা কাজ করছিলুম—

—কাজ? কী কাজ? তোমার আবার কী কাজ?

পর্মিলি বললে—সুব্রতকে চিঠি লিখছিলুম—

—সুব্রত? সুব্রতকে চিঠি লিখছিলে? সুব্রত কেমন আছে? আমায় তো কই চিঠি দেয়নি সে অনেকদিন! কী লিখেছে? কেমন আছে?

পর্মিলি বললে—ভালো আছে—

—পাশ করেছে?

—হ্যাঁ। আরো কিছুদিন থাকতে চাইছে।

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—তা থাক না আর কিছুদিন তাড়াহুড়ো করবার কী আছে। ভালো থাকলেই হলো। তাকে তো আর টাকা উপায় করতে হবে না এখানে এসে—

পর্মিলি বললে—না, কিন্তু আমি তাকে তাড়াতাড়ি ইন্ডিয়ায় চলে আসতে লিখলুম—

—কেন? পুণ্যশ্লোকবাবু অবাক হয়ে গেলেন।

আবার বললেন—তাড়াতাড়ি চলে আসতে বললে কেন? সে তো সেখানে বেশ আছে! দেখছো না কলকাতায় এখন কী রকম কান্ড চলেছে! এখন কি আসা তার ভালো হবে? একেবারে ইলেকশানের পরে এলেই তো বেটার হতো!

পর্মিলি বললে—না, এখনই আসা তার ভালো!

পুণ্যশ্লোকবাবু যেন নিজের বাড়িতেও ইলেকশানে হেরে যেতে বসেছেন। বললেন—না না তুমি তার চেয়ে বরং লিখে দাও আমাদের ইলেকশানের পরে যেন আসে!

পর্মিলি বললে—না বাবা. আমি যে অল্-রেডি তাকে ফিরে আসতে লিখে দিয়েছি –

পুণ্যশ্লোকবাবু থমকে দাঁড়ালেন মেয়ের কথায়। তারপর সামলে নিয়ে বললেন—লিখেছ বেশ করেছ. কিন্তু ও লেখাটা ছিঁড়ে ফেলতে কতক্ষণ? আর একটা নতুন চিঠি লিখে দাও! তুমি বুঝতে পারছো না কেন, ইলেকশানের পরে আমি একটু ফ্রি হবো। আমরা তখন আমাদের পোজিশান কন্সোলিডেট্ করতে পারবো—

পর্মিলি বললে—তোমার ব্যাপার তুমি বুঝবে, তার সঙ্গে আমাদের কী সম্পর্ক?

পুণ্যশ্লোকবাবু অবাক হয়ে গেলেন। বললেন—সে কী! বলছো কী তুমি? আমার সঙ্গে তোমাদের সম্পর্ক নেই? এরপরও তুমি ওই সব পাগলামি করছো? আমি তোমাদের গার্জিয়ান নই? তোমাদের ভালো-মন্দ আমার ভালো-মন্দ নয়? সুব্রত ফিরে এলে আমাকেই তাকে চাকরি খুঁজে দিতে হবে না? আমি না করলে কে করবে?

পর্মিলি বললে—রাত হয়ে যাচ্ছে, তুমি এবার ঘুমোতে যাও বাবা।

—আমি ঘুমোতে যাবো কিনা সে আমি বুঝবো। আমার কথাগুলোর তুমি আগে জবাব দাও—

—আমি কোনো জবাব দেবো না।

পুণ্যশ্লোকবাবু কড়া হলেন এবার। বললেন—জবাব দেবে না মানে? আমি এতদিন অনেক সহ্য করেছি। তোমার অনেক ব্যাপারে আমি চোখ বুঁজে থেকেছি। কিন্তু আর আমি চুপ করে থাকবো না ঠিক করেছি। আজকে কেন তুমি গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছিলে বলো তো? কোথায় গিয়েছিলে? তুমি জানতে না যে, আজকে ওদের এ্যান্টি-কংগ্রেস ডিমন্স্ট্রেশন আছে? তুমি জানতে না যে, আজকে পুলিশের গুলী চলবে ওদের ওপর? তবু কেন তুমি ইচ্ছে করে রাস্তায় বেরিয়েছিলে?

পর্মিলি বললে—সে জবাবও আমি তোমাকে দিতে বাধ্য নই—

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—কিন্তু তুমি কিছু জবাব না দিলেও আমি বেশ বুঝতে পারি তোমার জবাবটা কী? তুমি নিজের চোখে আমার বে-ইজ্জতিটা দেখতে চেয়েছিলে!

পর্মিলি এরপরে আর দাঁড়ালো না। পুণ্যশ্লোকবাবুর মুখের ওপর দরজাটা ঝপাৎ করে বন্ধ করে দিয়ে ভেতর থেকে খিল লাগিয়ে দিলে। পুণ্যশ্লোকবাবুর মনে হলো যেন পর্মিলি তাঁর মুখে সজোরে একটা চড় কষিয়ে দিলে।

তারপরে ভোরবেলা যখন ঘুম ভাঙলো তখন খবরের কাগজটা খুলতেই আর একটা চড় এসে পড়লো মুখের ওপর। বড় বড় হেড্-লাইন দিয়ে কালকের খবরটা ছাপা হয়েছে কাগজের মাথার ওপর। তার পাশেই ওদের পার্টির স্টেট-মেণ্ট। ওরা চেয়েছে এনকোয়ারি কমিশন বসুক। এই অমানুষিক অত্যাচারের বিচার চাই। তদন্ত কমিটি বসানো হোক!

সুরেন চোখ দুটো খুলে চারদিকে চেয়ে দেখলে একবার। অন্ধকার চারদিকে। শুধু টিমটিম করে একটা আলো জ্বলছে বাইরে। তারই আলোয় ভেতরটা খানিকটা আলো হয়ে গেছে।

হঠাৎ সামনে একটা মুখ নজরে পড়লো। বড় চেনামুখ যেন।

কে? কে?

চিনতে পেরেও যেন চিনতে পারলে না। আবার চিনতে চেষ্টা করলে। কিন্তু মাথাটা ঘুরে উঠলো বোঁ বোঁ করে। তারপর আর জ্ঞান নেই। আবার অজ্ঞান হয়ে গেল সুরেন।

ভূপতি ভাদুড়ী পাশেই দাঁড়িয়েছিল। ডাক্তার এসে দেখে গিয়েছে। বন্দুকের গুলীটা হাতে লেগেছিল বটে, কিন্তু হাতের ভেতরে গিঁথে যায়নি। পাশ দিয়ে লেগে খানিকটা মাংস খুবলে নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে। ভালো করে ব্যাণ্ডেজ খুলে আবার ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়ে গেছে। সুরেন যখন আবার চোখ বুঁজলো, তখন ভূপতি ধনঞ্জয়কে বললে—তুই এখানে একটু বোস ধনঞ্জয়, আমি আসছি—

ক'দিন থেকে ভূপতি ভাদুড়ীর কাজ খুব বেড়ে গিয়েছিল। এই বুড়ো বয়েসে একলা এত কাজ কি সামলানো যায়। মেডিকেল কলেজে সেই ষাটটা টাকার লোকসান যেন গায়ে তখনও বিঁধছিল। কী দুনিয়া হলো রে বাবা! কাউকে আর বিশ্বাস করতে পারা যায় না।

তাড়াতাড়ি মুখ হাত-পা ধুয়ে নিয়ে একবার বেরোতে হবে।

দুখমোচন উঠোন ঝাঁট দিচ্ছিল। ভূপতি ভাদুড়ী তাকে পাশ কাটিয়ে সোজা কলতলার দিকে চলে গেল। তারপর এক বালতি জল নিয়ে হুড়হুড় করে মাথায় ঢেলে দিলে।

সারা জীবন ভূপতি ভাদুড়ী এই চৌধুরী-বাড়িতে কাজ করে আসছে। শিবশম্ভু চৌধুরীর আমলে এই ভূপতি ভাদুড়ী না থাকলে এ-বাড়ির এক দণ্ড চলতো না! এখন কর্তা চলে গেছেন, কিন্তু ভূপতি ভাদুড়ী আছে, ভূপতি ভাদুড়ীই তখন থেকে এ-বাড়ির প্রত্যেকটি কাজের পেছনে হাল ধরে আছে। ভূপতি ভাদুড়ী না হলে এ বাড়ির কোনও কাজ যেমন চলে না, এ বাড়ির কাজ না থাকলে ভূপতি ভাদুড়ীরও তেমনি চলে না।

আর তো বেশি দিন নয়!

ভূপতি ভাদুড়ী মাথায় জল দিতে দিতেই ভাবলে—আর তো বেশি দিন নয়। অনেক দিন অপেক্ষা করেছি মা, এবার আমার দিকে একবার মুখ তুলে চাও মা। অধীনে দয়া করো।

আজকে আর তেমন আয়েশ করে চান করা হলো না। চান করে বেরিয়ে আসার মুখেই হঠাৎ মুখোমুখি সুধন্যর সঙ্গে দেখা।

—তুমি?

সুধন্য বললে—নমস্কার ম্যানেজারবাবু—

—তুমি এত সকালে কোত্থেকে?

সুধন্য বললে—আমি কাল হাঙ্গামার মধ্যে বাড়ি যেতে পারিনি, তাই এখেনেই রাত কাটিয়েছি—

ভূপতি ভাদুড়ীর মুখটা কী রকম ত্যারছা হয়ে গেল! বললে—বলা নেই কওয়া নেই, তুমি এখানে রাত কাটালে?

সুধন্য বললে—আজ্ঞে কী করবো বলুন, বাস-ট্রাম কাল সব বন্ধ হয়ে গেল। শ্যামবাজারের মোড় পর্যন্ত হেঁটে গেলুম, সব খাঁ-খাঁ করছে। রাস্তায় একটা আলো নেই। আমার বড় ভয় করতে লাগলো ম্যানেজারবাবু, তাই আবার ফিরে এলুম—

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—তা আমি এ বাড়ির ম্যানেজার, আমাকে একবার জিজ্ঞেস করতে হয় তো!

সুধন্য বললে—আজ্ঞে, জিজ্ঞেস করবো কী করে বলুন, আপনার তো পাত্তা পেলুম না, আপনি তখন পুলিশ, হাসপাতাল আর সুরেনবাবুকে নিয়ে ব্যস্ত—

ভূপতি ভাদুড়ী রেগে গেল।

বললে—আমি ব্যস্ত বলে কি আমার কথা বলবারও ফুরসত ছিল না? তুমি কী এমন তালেবর যে আমাকে একবার জিজ্ঞেস করাও দরকার মনে করলে না!

সুধন্য বললে—অত ঝামেলার মধ্যে আমি আর আপনাকে বিরক্ত করতে চাইনি আর কি!

—থামো তুমি, বেয়াদব কোথাকার! যা পছন্দ করিনে তাই-ই হয়েছে! তুমি তোমার কাকাকে নিয়ে যেতে পারো না? এতই যদি তোমার কাকাকে ভালোবাসো তো কষ্ট করতে এখানে রাখা কেন? নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেই তো পারো!

সুধন্য বললে—এবার তাই নিয়ে যাবো ম্যানেজারবাবু! শরীরটা একটু ভালো হলেই বাড়িতে নিয়ে যাবো—

—হ্যাঁ, তাই নিয়ে যেও। আমার বলে মাথার ঘায়ে কুকুর পাগলের অবস্থা। বাড়ির মধ্যে দশটা রুগীকে নিয়ে আমি কোন্‌দিক সামলাই। এটা বাড়ি, না হাসপাতাল!

বলে আর দাঁড়ালো না। একেবারে সোজা নিজের ঘরে চলে গেল। জামা-কাপড় বার করে পরলে। শুধু একটা দিক দেখলে তো চলবে না তার। হাজার দিক দেখতে হবে। হাজারটা ঝামেলা মাথার ওপর। ক'দিন থেকে মা-মণিকে দেখাই হচ্ছে না। তার ওপর ভাগ্নেটা গুলী লাগিয়ে এসে শুয়ে রইল।

মাথাটা চিরুণী দিয়ে আঁচড়ে আয়নাতে একবার নিজের মুখটা দেখলে ভালো করে। তারপর ঘরের কোণ থেকে ছাতাটা নিয়ে বেরোল।

গেটের কাছে আসতেই বাহাদুর সিং যথারীতি সেলাম করলে।

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—বাহাদুর, রাত্তিরে আর কেউ বাড়িতে ঢোকেনি তো?

বাহাদুর সসম্ভ্রমে বললে—না হুজুর!

—হ্যাঁ, কাউকে আর ভেতরে ঢুকতে দেবে না। দিনকাল বড় খারাপ পড়েছে। কলকাতা সহরমে বহুত গোলমাল হোতা হ্যায়! খুব হুঁশিয়ার রহনা—

বাহাদুর সিং আবার সসম্ভ্রমে বললে—জী হুজুর—

তারপর ছাতাসুদ্ধ দু'হাত জোড় করে মাথায় ঠেকিয়ে সূর্যের দিকে তার অলক্ষ্য দেবতাকে লক্ষ্য করে কী যেন প্রার্থনা করলে এক মুহূর্ত। হে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের দেবতা আমার উদ্দেশ্য যেন সিদ্ধ হয়, আমি যেন সব বাধা-

বিপত্তি অতিক্রম করে, সব বিপদ অগ্রাহ্য করে সব মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে পারি।

এরপর আর দেরি নয়। একেবারে হনহন করে সোজা হাতীবাগানের থানায়। প্রথম থেকেই শুকনো সেলামী চড়াতে হয় থানাতে। প্রথমে কনস্টেবল-পুলিশ। তারপর চুনোপুঁটি কেরাণী কর্মচারী। তারপরে একবারে খোদ দারোগা-সাহেব।

কিন্তু দারোগা-সাহেবদের খুশী করা অত সোজা নয়। সংসারে যাদের সর্বস্ব দিয়েও খুশী করা যায় না তারা হলো কোর্টের পেশকার। কিন্তু যারা খুশী হয়েও চিরকাল অখুশী থাকে তারা হলো দারোগা।

থানার বড়বাবু জিজ্ঞেস করলে—কী খবর ম্যানেজারবাবু?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—খবর নিতেই তো আসা বড়বাবু, আপনার কাছে! আমি আর কী খবর দেবো?

—আপনার কাজ হাসিল হয়ে গেছে। সেই নরেশ দত্তকে হাজতে পুরেছি।

—খুব ভালো করেছেন বড়বাবু! সমাজের একটা পাপ বিদেয় হলো। মানুষের একটা মহা উপকার করলেন আপনি বড়বাবু। কী বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ দেবো!

বড়বাবু হাসলেন। বললেন—কিন্তু সেই বেটাকে পাওয়া গেল না। সে বেপাত্তা—

—কে? কালীকান্ত? কালীকান্ত বিশ্বাস? সে বেপাত্তা?

—হ্যাঁ।

ভূপতি ভাদুড়ীর মুখটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলো। বললে—কী সব্বোনাশ! ওই বেটাই তো আসল পাজী বড়বাবু!

—দেখা যাক, কী করা যায়।

বলে বড়বাবু টেলিফোনে যেন কার সঙ্গে কথা বলতে লাগলো! কথা এক মিনিটে শেষ হয় না। লোকের আর সময় হলো না, ঠিক এই সময়টিতে কথা না বললে চলতো না!

—স্যার?

টেলিফোনটা রাখতে রাখতেই বড়বাবু বললে—কী?

—আমাদের সেই চোরের খবরটা কী? কিছু স্টেট্‌মেণ্ট দিয়েছে?

বড়বাবু বললে—না—কিছুতেই কিছু খবর দিচ্ছে না—

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—দিচ্ছে না তো আদায় করে নিন। কোঁতকা দিয়ে আদায় করে নিন। সে কী, পুলিশের কথা শুনবে না, এ তো ভালো কথা নয়। এত বেয়াদপি!

তারপর বললে—কী বলছে ছুঁড়িটা?

বড়বাবু বললে—কিছুই বলছে না। কাল থেকে কিছুই খায়নি। খাচ্ছে না দাচ্ছে না, কেবল মুখ গোঁজ করে বসে আছে!

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—তা একবার আমার সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবেন? আমি একবার চেষ্টা করে দেখবো?

—তা দেখুন!

বলে বড়বাবু 'ডিউটি'কে ডাকলে। সে ম্যানেজারকে নিয়ে ভেতরে ঢুকলো। শক্ত লোহার গারদওয়ালা দরজা। ভেতরটা কেমন অন্ধকার। অন্ধকারের মধ্যে ম্যানেজারের চোখ দুটো খানিকক্ষণের জন্যে যেন নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। সকাল-বেলা। বাইরে সূর্যের আলোয় সহর ফটফট করছে। আর এখানে এর ভেতরে

যেন নরক। নরকেও বোধহয় এর চেয়ে বেশি আলো।

সুখদা মুখ ঢেকে এক কোণে বসে ছিল। হঠাৎ দরজার আওয়াজ পেতেই চোখ তুলে দেখলে। চিনতে পারলে ম্যানেজারকে।

ভূপতি ভাদুড়ী সুখদাকে দেখেই হাউ-হাউ করে কেঁদে ফেললে।

সুখদা চমকে গেল ভূপতি ভাদুড়ীর কান্না শুনে। হঠাৎ কান্নার কোনও মানে খুঁজে পেলে না।

ভূপতি ভাদুড়ী কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলো—হ্যাঁ মা, শেষকালে তোর এই দশা আমাকে দেখতে হলো? তোকে এই হাজত-বাস করতে হলো এমন করে? এর চেয়ে আমার মরণ হলো না কেন মা? তুই কী এমন অপরাধ করেছিস্ যার জন্যে তোর এই হেনস্থা?

সুখদা কোনও কথা বললে না। শুধু চুপ করে শুনতে লাগলো।

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—কী মা, কথা বলছিস না কেন রে?

সুখদা বললে—মা-মণি জানে আমি এখানে?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—আমি তো সেই কথা বলতেই এখানে এসেছি রে। তুই যখন ছোট্ট এতটুকু, তখন থেকে আমি তোকে দেখে আসছি! শেষকালে তোর কপালে এই ছিল মা? তুই কী করেছিলিস বল্ দিকিনি? তোর এমন দুর্মতি হলো কেন?

সুখদা আর থাকতে পারলে না। বললে—আপনি থামুন, আপনার কান্না আমার ভালো লাগছে না—

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—ওরে, তা তো তুই বলবিই। আমার যে কত জ্বালা তা তো তুই জানিসনে! আমার ভাগ্নেটার গায়ে বন্দুকের গুলী লেগে মরো-মরো, আমি তাকে দেখবো না মা-মণিকে দেখবো! মা-মণির সেইদিন থেকে আর জ্ঞান নেই। অজ্ঞান-অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে। আর তারপর তুই! তুই রইলি পুলিশের হাজতে! আমি কাকে ফেলে কাকে দেখি, তাই বল্?

—সুরেনের কী হয়েছে?

—কী আবার হবে, অজ্ঞান-অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে! ঈশ্বরের খুব দয়া যে গুলীটা বুকের মধ্যে লাগেনি। আমি কত করে বলেছি যে ও-সব নচ্ছারদের সঙ্গে মিশিসনি! তা চোরা কি ধর্মের কাহিনী শোনে! যাকগে, যার যা কপালে আছে তাই হবে! আমার কী! এখন তোর কথা বল! সুরেনকে ধনঞ্জয়ের হেফাজতে রেখে তোর কাছে এসেছি, তোর কথা ভেবে আমি তো আর কান্না চেপে রাখতে পারছিনে! তোর এ-দশা কে করলে তাই বল? বল, কে করলে? তুই কেন চুরি করতে গেলি?

এবার সুখদার পালা বোধহয়। সুখদা নিজের শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ দুটো মুছে নিলে।

—কাঁদিসনি মা, কাঁদিসনি, বড় দারোগাবাবুও তাই দুঃখ করছিল। বল-ছিল—মেয়েটা সারা রাত খেলে না, জল পর্যন্ত স্পর্শ করলে না! বড় দয়ার শরীর দারোগাবাবুর। তা আমি শুনে বললুম, আমাকে একবার দেখা করতে দিন, দারোগাবাবু, আমি যদি বুঝিয়ে-সুঝিয়ে কিছু করতে পারি—

সুখদা তবু কাঁদতে লাগলো।

ভূপতি ভাদুড়ী আর একবার বললে—কাঁদিসনি মা, কাঁদিসনি, তুই বল আমাকে তুই কী করতে চাস? কী করলে তোর ভালো হয়? কী করলে তোর সুখ হয়?

সুখদা সেই রকম ভাবেই বলে উঠলো—মরলেই আমার সুখ, আমি আর বেঁচে থাকতে চাই না ম্যানেজারবাবু, আর আমার বাঁচতে সাধ নেই—

—বালাই ষাট, ও-কথা কি বলতে আছে? খবরদার মা, ও-সব কথা মনেও এনো না। আমি যদ্দিন বেঁচে আছি, তদ্দিন তোমার কীসের ভয়? ভুল কি মানুষে করে না? মানুষমাত্রেই ভুল করে। তা একবার ভুল করলে কি মানুষ রসাতলে যাবে? একজন লম্পটকে বিয়ে করে তুমি ভুল করেছ। এই যেমন এবার মা-মণির গয়না চুরি করেও ভুল করেছ। তাতে কী হয়েছে? অমন যে রাম, তিনি সীতাকে বনবাসে পাঠিয়ে ভুল করেননি? তা বলে কি আমরা রামায়ণ পড়ি না? কত ভক্তিভবে পড়ি। ও-সব কথা ভেবে ভেবে মনে কষ্ট পেও না। এখন আমি তোমার জন্যে কী করতে পারি তাই বলো?

সুখদা বললে—আমার জীবন নষ্ট হয়ে গেছে, আমার জন্যে আপনি আর কষ্ট করতে যাবেন না। আমার যা-হয় হোক। আমার কপাল তো আপনি খণ্ডাতে পারবেন না। আর আমার কপাল যদি ভালোই হবে তো আমার মা-মাসী-দিদিমা-ঠাকুমা সবাই মারাই বা যাবে কেন? আমিই বা কেন ওই মাতাল-লম্পট লোকের কথায় ভুলে তাকে বিয়ে করে ফেলবো!

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—সে যা হয়ে গেছে তা নিয়ে ভেবে আর কী করবে? এখন কী করবে তাই বলো?

সুখদা বললে—তা আমি কী বলবো, ভগবান বলে যদি কেউ থাকেন তিনিই তা জানেন।

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—তাহলে মা আমি বলি কি, পুলিশ যা বলে তাই করো, উপোষ করে থেকো না, দু'টি খেয়ে নাও। জানি খেতে তোমার রুচি হবে না। কিন্তু বাঁচতে তো হবে!

—বাঁচার কথা আপনি আর বার বার বলবেন না।

—কেন বলবো না মা, আলবৎ বলবো!

—কিন্তু চোর বদনাম নিয়ে বেঁচে কী লাভ? কার জন্যে আমি বাঁচবো? এর-পরে কে আমায় আশ্রয় দেবে? কীসের ভরসায় আমি বাঁচাবো?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—কেন আমি আছি কী করতে? ভাগ্যের ফেরে তুমি চুরি করে ফেলেছ, তাই বলে তুমি চোর হয়ে গেলে? তাই যদি হতো, আমি এমন করে ভাগ্নেকে মরো-মরো অবস্থায় ফেলে এখানে তোমাকে দেখতে আসতুম না।

সুখদা অধৈর্য হয়ে বললে—তা আমি কী করবো বলুন?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—তুমি আগে দু'টি মুখে দাও মা, তারপরে আমি বলবো তোমাকে কী করতে হবে।

—দু'টি ভাত মুখে দিলেই আমি সতী-সাধ্বী সীতা-সাবিত্রী হয়ে যাবো?

—হ্যাঁ মা, আমার আবদার, দু'টি মুখে দাও আগে। আমি তোমার ছেলে, এই বুড়ো ছেলের আবদার রাখো—

তা কথাগুলো শুনে সুখদার কী হলো কে জানে! রাজী হলো ভূপতি ভাদুড়ীর কথায়। তাড়াতাড়ি বড়বাবুর কাছে গিয়ে ভূপতি ভাদুড়ী বললে—বড়বাবু, রাজী করিয়েছি—

বড়বাবু অবাক। বললে—তাই নাকি? তাহলে তো কাজের লোক আপনি! আপনি পুলিশের চাকরি নিলেন না কেন?

ও-সব রসিকতার উত্তর দেবার সময় নেই তখন। ভূপতি ভাদুড়ী বললে—তাহলে এক কাজ করি বড়বাবু, আপনি তৎক্ষণ একটা স্টেটমেণ্ট তৈরি করিয়ে

রাখুন। দোষ স্বীকার করে যেন সব চার্জে 'হ্যাঁ' বলে। আমি ততক্ষণে রাস্তার দোকান থেকে চার টাকার খাবার কিনে আনি—

বলে আর দাঁড়ালো না। একেবারে সোজা মোড়ের দোকানে গিয়ে বললে—দু' টাকার রাজভোগ, দু' টাকার সন্দেশ, আর দু' টাকার রাবড়ি দেখি—

ছ' টাকা দিয়ে খাবারের ঠোঙাটা নিয়ে তাড়াতাড়ি আবার থানায় ফিরে এল সে।

বললে—ওটা তৈরি হয়েছে বড়বাবু ?

—আরে, অত শিগ্‌গিব তৈরি হয় ? একটু ভাবতে হবে না ?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—একটু শিগ্‌গিব-শিগ্‌গির করুন বড়বাবু, মনে হচ্ছে যেন একটু মনটা ভিজে এসেছে ছুঁড়িটার—

বড়বাবু খাতা বার করে সাজিয়ে-গুছিয়ে লিখতে লাগলো। —আমি আমার স্বামী কালীকান্ত বিশ্বাসের প্ররোচনায় আর নরেশ দত্ত নামে একজন লম্পটের সুবিধার জন্য আমার আত্মীয়া শ্রীমতী লাবণ্যময়ী দাসীর গহনার বাক্সের চাবি খুলিয়া পঞ্চাশ হাজার টাকা মূল্যের সোনা এবং জড়োয়া অলঙ্কার চুরি করিতেছিলাম। এমন সময় আমি হাতেনাতে ধরা পড়িয়া যাই। আমি সুস্থচিত্তে এবং বহাল তবিয়তে স্বীকার করিতেছি যে

বড়বাবু বললে—মেয়েটা লেখাপড়া জানে নাকি ?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—না বড়বাবু, একেবারে 'ক' অক্ষর গোমাংস ওর কাছে—

—তাহলে ঠিক আছে—বলে পুরো বয়ানটা লিখে শেষ করে দিলে বড়বাবু।

তারপর বললে—এইবার এই এর নিচেয়, এই জায়গাটায় একটা টিপসই দিয়ে দিতে বলবেন, এই নিন কালির প্যাড—

ভূপতি ভাদুড়ীর তখন আর দেরি সইছে না। একহাতে খাবারের ঠোঙা, আর একহাতে খাতা-প্যাড নিয়ে হাজতের ভেতরে গিয়ে ঢুকলো।

সেদিন হঠাৎ সকালবেলা খবরের কাগজ খুলে দেখা গেল, ডাক্তার বিধান রায় একটা প্রস্তাব দিয়েছেন। বাঙলাদেশের ভৌগোলিক আর অর্থনৈতিক উন্নতি-বিধানের জন্যে বাঙলা আর বিহার প্রদেশের একীকরণ দরকার। দু'টি রাজ্য এক হলে আবার বাঙলাদেশ দেশ-বিভাগের আগের মত সবল হয়ে উঠবে। বাঙালীরা বিহারীরা দুই রাজ্যের অধিবাসীরাই আবার খাদ্যে স্বয়ংভর হয়ে পরস্পরের সহযোগিতায় নিজেদের জীবিকা এবং উপার্জনের পথ সুগম করবে।

সন্দীপবাবু খবরের কাগজটা খুলে পড়তে পড়তে চমকে উঠলেন। আবার এক চাল চেলেছে কংগ্রেস।

পার্টি অফিসের ভেতরে ফাঁকা। প্রায় সবাই ধরা পড়েছে পুলিশের হাতে। পূর্ণবাবুকে জেলে ধরে নিয়ে গেছে ওরা।

হঠাৎ টেলিফোন এল।

বললেন—কে ?

—আমি অমর। আজকের কাগজ দেখেছেন সন্দীপদা ? এ কংগ্রেসের আর একটা প্যাঁচ। ইলেকশানের আগে আমাদের পার্টিকে উইক্ করে দিতে চায়।

বেঙ্গল-বিহার মার্জার কখনও ভালো হতে পারে? আপনিই বলুন?

সন্দীপদা বললেন—দেখি, ভেবে দেখি—

অমর বললে—না, ভেবে দেখাদেখা নেই। আমি এখুনি যাচ্ছি। একটা স্টেট-মেণ্ট দিতে হবে প্রেসের জন্যে। আগে কালকের ব্যাপারটাব একটা ফয়সালা হোক, তারপর মার্জারেব প্রশ্ন। আমি বলছি এর এনকোয়্যারি কমিশন বসাতে হবে—

হঠাৎ দরজায় কাদের যেন মুখ দেখা গেল। পার্টির কয়েকজন মেয়ে এসে হাজির হয়েছে—যাদের পুলিশ নবাবপুর পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিয়ে এসেছিল।

টুলুই ছিল সকলের সামনে। মুখটা তার ছলছল করছে।

টেলিফোনটা রেখে দিয়ে সন্দীপদা বললে—এসো, এসো—

টুলুদের জীবনে এসব গা-সওয়া ঘটনা। যখন থেকে তারা জন্মেছে, তখন থেকেই ধরে নিয়েছে সংগ্রাম করে, লড়াই করে তাদের দাবী আদায় করে নিতে হবে। নিজে থেকে কেউ তোমার মুখে সন্দেশ পুরে দেবে না। সহদেববাবুর সব মেয়েরাই তাই জানতো।

যেদিন মিছিল হবে, তার আগের দিনই সহদেববাবু জিজ্ঞেস করেছিলেন—হ্যাঁ রে, মিছিলে গুলী-টুলি চলবে না তো?

টুলু বলেছিল—গুলী চালালে আর কী করবো, চলবে!

সহদেববাবু হাজার হলেও বাপ। বলেছিল—এই সেদিন তুই অসুখ থেকে উঠলি, এর মধ্যেই এত হেনস্থা সইতে পারবি?

টুলু বলেছিল—সে তবু এর চেয়ে ভালো বাবা, এমন করে বাঁচাকে কি বাঁচা বলে?

এরপরে সহদেববাবুর আব কোনও কথা বলবার মত ভাষা যোগায়নি মুখে। যে-বাপ ছেলেমেয়েদের খাওয়াতে পরাতে পারে না, সে বাপের বেঁচে থাকার অধিকার নেই। কিন্তু অন্ধ মানুষ হয়ে নিজেই বা কী করবে? এ তো আর সেই নিজের দেশ নয়, নিজের গ্রামও নয়। এ সহর। খাস কলকাতা সহর। এ-সহরে কে কার কথা ভাববে? কে কাকে নিয়ে মাথা ঘামাবে!

দুপুর হবার আগেই টুলু চলে গেল।

যাবার আগে বলে গেল- আমি যদি না ফিরি তো কেউ-না-কেউ এসে তোমায় খবর দিয়ে যাবে!

ফুলু চুপ করে পাশে দাঁড়িয়েছিল। টুলু বললে—আমি যদি না আসি তো তুই বাবাকে ভাত বেড়ে দিতে পারবি না?

ফুলু পারবে। সে না পেরে আর কীই বা করবে। এমন সংসারে জন্মালে পারতেই হয়। ছোটবেলা থেকে এ-কাজ পেরেই এসেছে। জীবনে কাকে বলে অসাধ্য-সাধন তা সে জেনেই এসেছে। জেনে এসেছে তার দিদিও ছোটবেলা এমনি অসাধ্য-সাধন করেছে। এসব সংসারে সবাই সব পারে। সব কাজ পারাটাই নিয়ম এখানে। যাদেব বাড়িতে ফুলু কাজ করে, তাদেব কর্তা-গিন্নি তো ছোট মেয়েটাকে তার হেফাজতে রেখে অফিসে চলে যায়। তখন কে করে সংসারের কাজ!

টুলু চলে গেল।

সহদেববাবু চুপ করে বসে রইল খানিকক্ষণ! তারপর উঠে দাঁড়ালো। তার-

পর আবার বসলো। আবার উঠলো খানিক পরে। তারপর ডাকলে—ফুলু, ও ফুলু—

কোথায় ফুলু! সেও দিদির সঙ্গে বাস-রাস্তা পর্যন্ত গেছে। হয়ত দিদিকে তুলে দিতে। এখুনি আবার আসবে। কিন্তু কোথাও কারো সাড়া-শব্দ নেই। সহদেববাবু আবার এসে বসলো নিজের তক্তপোষটার ওপর। বুক থেকে যেন একটা বেদনা ওপর দিকে ঠেলে উঠতে লাগলো। এসব যে কী ধরনের কাজ তা বুঝতে পারলো না সহদেববাবু। এসব মারামারি কাটাকাটির মধ্যে কেন গেল টুলু! কেন, আর কোনও কাজ ছিল না সংসারে! চাকরিই যদি করতে হয় তো কোনও অফিসে চাকরি নিলে হতো না! কত মেয়ে তো অফিসে চাকরি করে। তারপর অফিসেরই কোনও ছেলেকে বিয়ে করে সংসারধর্ম করে।

হঠাৎ সহদেববাবু গলা ফাটিয়ে ডাকলে—ফুলু, ফুলু রে—

শব্দ পেয়ে কে যেন উত্তর দিলে বাইরে থেকে। বললে—সহদেববাবু, সহদেববাবু আছেন?

সহদেববাবুর বুকের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস যেন হঠাৎ থেমে গেল। বললে—কে?

লোকটা দরজা ঠেলে ভেতরে এল। বললে—আমি টুলুদি'র পার্টির অফিস থেকে আসছি। আপনার নামই তো সহদেববাবু? টুলুদির বাবা?

সহদেববাবু বললে—হ্যাঁ, টুলু কেমন আছে বাবা?

ছেলেটা বললে—ভালো আছে। সেই কথাটা বলতেই আমি এসেছি। টুলুদি আপনাকে খবর দিতে বলেছে। টুলুদিদের পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে।

—জেল হয়েছে?

ছেলেটা বললে—হ্যাঁ, আপনি কিছু ভাববেন না, দিন-কতক পরেই আবার ফিরে আসবে। আপনাকে ভাবতে বারণ করেছে টুলুদি!

—তা, কী করেছিল টুলু?

ছেলেটা বললে—করবে আবার কী! শুধু ফেস্টুন নিয়ে শ্লোগান দিয়েছিল, হানড্রেড-ফরটি-ফোর ব্রেক করেছিল।

সহদেববাবু কিছু বুঝলে না। শুধু বললে—ওসব করে কী হয় বাবা তোমাদের? তোমরা ওসব কেন করতে যাও মিছিমিছি? গুলী-বোমা খেয়ে পুলিশের সঙ্গে ঝগড়া করে কী লাভটা হয়? তার চেয়ে কোনও অফিস-কাছারিতে চাকরি-বাকরি করতে পারো না? তাতে বুড়ো বাপ-মায়ের তবু কিছু সাশ্রয় হয়।

ছেলেটা বললে—ওসব আপনি বুঝবেন না সহদেববাবু। এসব না করলে কংগ্রেস শায়েস্তা হবে না! ওই কংগ্রেসের জন্যেই তো আপনাদের দেশ পাকিস্তান হয়ে গেছে। ওই কংগ্রেসের জন্যেই তো আজ আপনাকে এত কষ্ট করে এখানে এই বস্তির মধ্যে গরু-ছাগলের মত বাস করতে হচ্ছে—

তা ঠিক। সহদেববাবুর মনে হলো তা কথাটা ঠিক।

বললে—বাবা, কিন্তু আমার যে ওই টুলুই ভরসা। আর যে কেউ নেই আমার। টুলুর যদি কিছু হয় তো আমি কী নিয়ে বাঁচবো? আমার কি একটা উপযুক্ত ছেলে আছে? যে ছেলে ছিল সেও যে মারা গেল শেয়ালদা ইষ্টিশানে! আমার মেয়েকে তোমরা পার্টি থেকে ছাড়িয়ে দাও না—

ছেলেটার অত কথায় কান দেবার সময় নেই।

বললে—আমার আরো অনেক জায়গায় যেতে হবে, আমি এখন যাই—

বলে আর দাঁড়ালো না, চলে গেল। সহদেববাবু যেন হতভম্ব হয়ে কিছুক্ষণ সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। তারপর কিছু করতে না পেরে অসহায়ের মত আবার এসে তক্তপোষটার ওপর বসলো। কিন্তু বসে থাকতেই কি পারে মানুষ চুপ-চাপ। একটা না আছে মানুষ, না আছে জন যার সঙ্গে কথা বলে। হঠাৎ কার পায়ের শব্দে যেন চমকে উঠলো সহদেববাবু। চেঁচিয়ে উঠলো—কে? আবার কে?

ফুলুর গলা শোনা গেল—তোমায় খেতে দেবো বাবা?

আর থাকতে পারলে না সহদেববাবু। একেবারে যেন ফেটে পড়লো। বললে—কোথায় থাকিস তুই হারামজাদী?

ফুলু এসব গালাগালিতে কখনও কান পাতে না। বললে—খাবে তো খেয়ে নাও, নইলে আমি খাচ্ছি, আমার খিদে পেয়েছে—

সহদেববাবু বললে—তোর কেবল গেলা আর গেলা। গিলতে পারলেই চুকে গেল। ওদিকে তোর দিদিকে পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়ে জেলে পুরেছে, তা জানিস?

ফুলু বললে—জানি।

মুখ ভেঙচে উঠলো সহদেববাবু—জানি! জেনেও তোর ক্ষিধে আসে? বলিহারি তোর ক্ষিধে বাপু! আক্কেল বলে তোর একটা কিছুছু থাকতে নেই! তুইও মরবি, আমাকেও মারবি। তোকেও পুলিশে ধরে নিয়ে গেল না কেন, আমি তাহলে বাঁচতুম!

ফুলু থালায় নিজের ভাত বার করে খেতে লাগলো আর খিলখিল করে হাসতে লাগলো।

—আবার হাসছে, লজ্জাও করে না মেয়ের! দিদি জেলখানায়, বোন হি-হি করে হাসছে!

ফুলু আবো হাসতে লাগলো। হাসতে হাসতেই বললে—আমার যে কান্না পাচ্ছে না তা আমি কী করবো? তুমিও হাসো-না, তোমায় কে কাঁদতে বলেছে?

সন্দীপদা তখন সকাল হবার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। পূর্ণবাবু নেই। পার্টির পলিসি সন্দীপদাকে একলাই ঘোষণা করতে হবে। পার্টির এ-রকম ব্যাপার আগে কখনও হয়নি। আগে যা হয়েছে তা পরামর্শ করে করা হয়েছে। কংগ্রেসের চক্রান্তকে ভাঙতে গেলে আগে দেশের মানুষকে সচেতন করতে হবে। দেশের মানুষ যদি একবার জানতে পারে যে, যাদের তারা সেবারে ভোট দিয়েছে তারা সুবিধেবাদী, তারা স্বার্থপর, তারা নিজের দলের সুবিধের কথা আগে ভাবে, তাহলে সব উদ্দেশ্য সফল। এইটেই চেয়েছিল পূর্ণবাবুরা।

দেবেশও তাই চেয়েছিল। দেবেশও সুরেনকে বলেছিল—তোকে আমাকে যদি পুলিশে গুলী মেরে খুন করে ফেলে তবেই আমাদের মিশন সাক-সেস্‌ফুল।

সুরেন বলেছিল—কিন্তু আমরা মরে গেলে তাহলে স্বাধীনতা ভোগ করবে কে?

দেবেশ বলেছিল—আমরা না-ই বা থাকলুম, আমাদের পার্টি তো থাকবে! আমাদের পার্টি তো বড় হবে, পার্টি তো ফেমাস হবে, আমাদের পার্টির লোকই একদিন ইন্ডিয়ার প্রাইম-মিনিস্টার হবে, তার চেয়ে আর বড় কাজ কী আছে?

এসব কথা আগে থেকেই হয়েছিল। আগে থেকেই সব প্ল্যান ঠিক হয়ে গিয়েছিল। সন্দীপদা শুধু সকালবেলা পার্টির অফিসে সেই প্ল্যানই নতুন করে রূপ দিচ্ছিল। প্রেসের কাছে পার্টির তরফ থেকে স্টেটমেন্ট দেওয়া হয়ে গিয়েছিল। সকালবেলা 'স্বাধীনতা', 'আনন্দবাজার', 'স্টেটস্‌ম্যান', 'যুগান্তরে' সেই স্টেটমেন্ট ছাপা হয়ে বেরিয়েও ছিল। সন্দীপদা সেগুলো পড়ছিল নিজের মনে। খবরটা সব জায়গায় বেরিয়ে ছিল ছোট করে। শুধু 'স্বাধীনতা' কাগজে ছাপা হয়েছিল বড় বড় টাইপে। লেখা হয়েছিল ঃ আমরা সরকারের কাছে একটা জিনিসের জবাবদিহি চাই। আমরা জানতে চাই, ডাক্তার রায়ের সরকার কোন্ সাহসে নিরীহ নিরস্ত্র মিছিলের ওপর নির্মম গুলী চালালেন। যে ডাক্তার রায় বাঙলা-বিহার একীকরণ করবার জন্যে উদ্‌গ্রীব, যে ডাক্তার রায় নতুন করে বাঙালীর ঐতিহ্যকে ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর তাঁর কাছে জবাব চাই এই রক্ত-পাতের ফলে তিনি কার কোন্ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করলেন? আমরা চাই ডাক্তার রায়ের সরকার এই দুর্ঘটনার তদন্ত কমিশন বসান। তদন্ত কমিশন বসিয়ে প্রকৃত দোষীর শাস্তি বিধান করুন। তদন্ত কমিশন গঠন না করলে আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাবো। এবং যতদিন না তা হচ্ছে ততদিন ডাক্তার রায়ের সরকারের পুলিশের বন্দুকের সামনে হাজার হাজার শান্তিপ্রিয় মানুষ তাদের বুক পেতে দেবে! ততদিন এই বিপ্লবের আগুন উজ্জ্বল হয়ে জ্বলবে।

সকাল থেকে এই সব কাজই করেছে সন্দীপদা। এমন সময় টুলুদের দল এসে গেল।

সন্দীপদা বললে—আজকের সকালের কাগজ দেখেছ তো?

টুলু বললে—দেখেছি—

সন্দীপদা বললে—এন্‌কোয়ারি কমিশন যদি হয় তো তোমাদের সকলকে সাক্ষ্য দিতে হবে।

টুলু জিজ্ঞেস করলে—কিন্তু তা কি হবে?

সন্দীপদা বললে—করতেই হবে। নইলে আবার হরতাল ডাকবো। হরতাল ডেকে কলকাতার কাজকর্ম সব অচল করে দেবো। কংগ্রেস যদি ভেবে থাকে যে পাবলিকের ওপর তাদের হোলড্ আছে তাহলে এবার তাদের দেখিয়ে দেবো।

হঠাৎ টুলু বললে—হাসপাতাল থেকে কোনও লিস্ট পেয়েছেন?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেল সন্দীপদার। সামনেই একটা কাগজ পড়েছিল। সেখানা নিয়ে বললে—এই দেখ, তোমাকে কালকে ভুল খবর দিয়ে-ছিলুম। দেবেশ হস্‌পিট্যালে রয়েছে এখন। তার কনডিশন বেশি সিরিয়াস নয়।

—আর সুরেনদা?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, সুরেন সান্ন্যাল। সেই দেবেশ যাকে নিয়ে এসেছিল। তাকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দিয়েছে।

—ছেড়ে দিয়েছে?

টুলু চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে। তবু যেন একবার সন্দেহ হলো। জিজ্ঞেস করলে—ছেড়ে দিয়েছে? তবে যে আপনি কালকে টেলিফোনে আমাকে বললেন মারা গেছে?

সন্দীপদা বললে—আমি ভুল রিপোর্ট পেয়েছিলুম তখন।

—হাসপাতাল থেকে কোথায় নিয়ে গেছে তাকে? পুলিশ হাজতে?

—না, পুলিশ হাজতে নিয়ে গেলে তো খবর পেতুম। বোধহয় তার বাড়িতেই নিয়ে গেছে।

—বাড়িতেই?

টুলু যেন উত্তেজনায় কাঁপছে। বললে—আপনি ঠিক জানেন সন্দীপদা, তাকে তার বাড়িতে নিয়ে গেছে? সেই মাধব কুণ্ডু লেনের বাড়িতে?

সন্দীপদা বললে—তা জানি না।

টুলু বললে—আমি আজ তাহলে উঠি সন্দীপদা।

সন্দীপদা বললে—হ্যাঁ হ্যাঁ, বাড়ি যাও, তোমার বুড়ো বাবা হয়ত খুব ভাবছেন। কিন্তু কালকেই একবার এসো, আসা চাই। আমি আবার বিকেলবেলা দেবেশকে হাসপাতালে দেখতে যাবো। আজকে বাড়ি গিয়ে রেস্ট নাও বরং—

ততক্ষণে আরো কয়েকজন পার্টির লোক আসতে আরম্ভ করলো। পার্টির অফিসে সারাদিনই এমনি চলবে। টুলু ততক্ষণে বেরিয়ে এসেছে রাস্তায়। আগে বাড়ি যাবে, না মাধব কুণ্ডু লেনে! কিন্তু অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই একটা গাড়ি এসে দাঁড়ালো টুলুর সামনে।

ড্রাইভার যেন পেছনে কার দিকে চাইলে।

—আচ্ছা, আপনি এই অফিস থেকেই কি বেরোচ্ছেন? গাড়ি থেকে একজন মহিলা নেমেই একেবারে টুলুকে প্রশ্ন করলে।

টুলু বললে—হ্যাঁ—

মহিলাটি বললে—কালকের খবর কিছু জানেন আপনি?

টুলু জিজ্ঞেস করলে—কী খবর চান? আজকের খবরের কাগজেই তো সব বেরিয়েছে।

মহিলাটি বললে—না, তা নয়। কে-কে মারা গেছে আর কে-কে ইনজিওরড্, তাই জানতে চাই—

টুলু মহিলাটির সর্বাঙ্গে দৃষ্টি বুলিয়ে দেখলে। ঝলমল করছে সাজ-পোশাক। দামী সিল্কের শাড়ি, দামী গাড়ি, গা থেকে তখনও যেন সেন্টের গন্ধ বেরোচ্ছে। কিন্তু যেন বড় আলুথালু।

টুলু বললে—আপনি কার খবর চান বলুন?

মহিলাটি বললে—সুরেন সান্ন্যাল তার নাম। সে কালকের প্রোসেশানে জয়েন করেছিল শুনলুম—

টুলুর শরীরের সমস্ত রক্ত এখন যেন এক নিমেষে মাথায় গিয়ে উঠলো।

—সুরেন সান্ন্যাল?

মহিলাটি বললে—হ্যাঁ, আপনি চেনেন তাকে?

টুলু কোনও রকমে বললে—হ্যাঁ—

মহিলাটি অধৈর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলে—বলতে পারেন সে কেমন আছে?

টুলু তখন যেন টলছে। বললে—আপনি কে?

মহিলাটি যেন রেগে গেল। বললে—ডাজ্ দ্যাট্ রিয়্যালি ম্যাটার?

ইংরিজি বুঝতে পারলে না টুলু।

মহিলাটি বললে—আমি যে কোশ্চেন করছি, আপনি তার উত্তর দিন—সে কেমন আছে আমি তাই জানতে চাই—

ড্রাইভারটা তখন টুলুর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে দেখছিল।

টুলুর যেন কেমন অকারণে রাগ হয়ে গেল। রাস্তার দিকে মুখ করে বললে—আপনি পার্টি অফিসের ভেতরে গিয়ে খবর নিন—

বলে আর দাঁড়াল না সে। বাস-রাস্তার দিকে এগিয়ে চলতে লাগলো। তারপর একবার কী খেয়াল হলো পেছন ফিরে দেখলে। দেখলে তখনও গাড়িটা সেখানে

তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। আর সেই মেয়েটা? মেয়েটা বোধহয় সিঁড়ি দিয়ে অফিসের দোতলায় উঠে গেছে।

বাসের জন্যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে অনেকগুলো ট্রাম-বাস চলে গেল, তবু যেন একটাতেও তার উঠতে ইচ্ছে করলো না। কে মেয়েটা? সুরেনের সঙ্গে মেয়েটার কীসের সম্পর্ক? এত আগ্রহ তার কীসের? সুরেনের সঙ্গে কি বিশেষ জানাশোনা আছে নাকি?

আর ভালো লাগলো না দাঁড়িয়ে থাকতে। একেবারে রাস্তা পেরিয়ে ওদিকের ফুটপাথে গিয়ে দাঁড়ালো। যাবে না সে মাধব কুণ্ডু লেনে। কী হবে সেখানে গিয়ে! তাকে দেখবার অনেক লোক আছে। তার জন্যে তো অনেক লোক ভাববার আছে! টুলু কে তার কাছে? টুলুর কে আছে? টুলুর যারা আছে তারা তো তার ওপর নির্ভর করে থাকে। বুড়ো অন্ধ বাবা, ছোট নাবালক বোন!

না আর সে কারোর কথা ভাববে না। তার কথা ভাববার যখন কেউ নেই, সেও তখন কারো কথা ভাববে না।

একটা বাস সামনে এসে থামতেই টুলু তাতে উঠে বসলো। তারপর বাসটা ছেড়ে দিলে। হঠাৎ চমক ভাঙলো কণ্ডাক্টারের কথায়।

—টিকিট!

টুলু ব্যাগ থেকে পয়সা বার করে দিলে।

বললে—ঢাকুরিয়া একখানা—

সকালবেলাও পুণ্যশ্লোকবাবু কিছু টের পাননি। সকালবেলা উঠে খবরের কাগজগুলো পড়তেই দেরি হয়ে গেল অনেক। ওদের পার্টি স্টেটমেণ্ট দিয়েছে। 'স্বাধীনতা'টাই আগে পড়েন রোজ পুণ্যশ্লোকবাবু।

লিখেছে : আমরা ডাক্তার রায়ের সরকারের কাছ থেকে একটা জিনিসের জবাবদিহি চাই। আমরা জানতে চাই ডাক্তার রায়ের সরকার কোন্ সাহসে কী অপরাধে নিরস্ত্র মিছিলের ওপর নির্মম গুলী চালালেন! যে ডাক্তার রায় বাঙলা-বিহার একীকরণ করবার জন্যে উদ্‌গ্রীব, যে ডাক্তার রায় নতুন করে বাঙালীর ঐতিহ্যকে ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর, তাঁর কাছে জবাব চাই—এই রক্তপাতের ফলে তিনি কার কোন্ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করলেন! আমরা চাই, ডাক্তার রায়ের সরকার এই দুর্ঘটনার তদন্ত কমিশন বসান। তদন্ত কমিশন বসিয়ে প্রকৃত দোষীর শাস্তি বিধান করুন।

পড়তে পড়তে পুণ্যশ্লোকবাবুর মাথার রক্ত গরম হয়ে উঠলো।

ডাকলেন—রঘু—

রঘু এল।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন—হরিলোচনবাবু এসেছে?

রঘু বললে, না, এখনও আসেনি।

ঘড়ির দিকে চাইলেন পুণ্যশ্লোকবাবু। এখনও সাতটা বাজেনি। হরি-লোচনের আসতে আরো এক ঘণ্টা বাকি।

বললেন—মুহুরীবাবু এলে বলবি আমি বেরিয়ে গেছি। বলবি ডাক্তার রায়ের বাড়িতে গেছি—

—বলবো হুজুর।

—আর শোন্‌। গাড়ি বার করতে বল তো আমার।

রঘু বললে—গাড়ি তো দিদিমণি নিয়ে বেরিয়ে গেছে—

—সে কী? আমার গাড়ি নিয়ে বেরোল? দিদিমণি?

রঘু বললে—হ্যাঁ—

—কোথায় বেরোল?

রঘু বললে—তা জানি না—

—কখন বেরিয়েছে?

রঘু বললে—এই আধ ঘণ্টা আগে। দিদিমণির নিজের গাড়ি তো নেই, তাই জগন্নাথকে আপনার গাড়ি বার করতে বললেন—

কথাটা শুনে পুণ্যশ্লোকবাবু খানিকক্ষণ হতবাক্‌ হয়ে রইলেন। ঘরে বাইরে যদি এমন করে অশান্তি হয় তাহলে মানুষ পাবলিক-ওয়ার্ক করে কী করে? অবশ্য গাড়িটা যদি কাল না পুড়তো তাহলে আর এমন হতো না। পমিলিরও তো একটা গাড়ি চাই। ছোটবেলা থেকে তার ছেলে আর মেয়ে বরাবর গাড়ি চড়ে এসেছে; স্কুলে-কলেজে যাওয়া-আসার কাজে কখনও তিনি তাদের ট্রামে-বাসে চড়তে দেননি। এখন কি আর তারা গাড়ি ছাড়া ট্যাক্সিতে যাতায়াত করতে পারবে?

রাজনীতি! রাজনীতিই তিনি করে এসেছেন বরাবর। রাজনীতিতে সত্যি কথা সহজ করে বলার নিয়ম নেই। অথচ এমনভাবে কথা বলতে হবে যেন লোকে মনে করে, সত্যি কথা সহজ করে বলছি। পাবলিক-লাইফেই হোক, আর সাংসারিক জীবনেই হোক, এটা পুণ্যশ্লোকবাবুদের দলের সকলের স্বভাব হয়ে গেছে। আর শুধু পুণ্যশ্লোকবাবুর দলের লোকেদেরই নয়, সমস্ত রাজনীতিক দলের জীবনের গোড়ার কথা হলো এই! সত্যি কথা সহজ করে বলো, তুমি তোমার দল হারাবে। তুমি নিঃসঙ্গ হয়ে পড়বে।

এই সব কারণেই তো প্রজেশদের মত লোকদের রাখতে হয়। অন্ততঃ তাদের কাছে মন খুলে কিছু বলা যায়। ছেলেমেয়েদের কাছেও যা বলা যায় না তা নিঃসঙ্কোচে বলা যায় প্রজেশদের কাছে।

প্রজেশের বাড়িতে একবার টেলিফোন করলেন।

—প্রজেশ, তুমি একবার আসতে পারো?

প্রজেশ বললে—কী ব্যাপার পুণ্যশ্লোকদা, কী হলো হঠাৎ?

—তুমি একবার এখ্খুনি এসো। আমি বড় মুশকিলে পড়েছি—

প্রজেশ বেশি দেরি করলে না। মাত্র কিছু আগে সে ঘুম থেকে উঠেছে। এ-রকম ডাক সে বরাবর পেয়ে এসেছে। সেই যখন থেকে সে ভলাণ্টিয়ারি শুরু করেছিল তখন থেকেই। এই রকম হুকুম পালন করেই সে আজ এতবড় হয়েছে। কলকাতা সহরে বাড়ি করেছে, আজ মোটা মাইনের চাকরী করছে, নিজে গাড়ি চালাচ্ছে।

পুণ্যশ্লোকবাবুর বাড়িতে এসেই সোজা তাঁর চেম্বারে চলে গেল।

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—শোন প্রজেশ, আমার খুব তাড়াতাড়ি রয়েছে। দিল্লী থেকে নেহরু টেলিফোন করেছিল ডাক্তার রায়কে কলকাতার ঘটনার জন্যে।

প্রজেশ বললে—আমিও তাই ভাবছিলুম—

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—কাগজগুলো দেখেছ তো? অপোজিশান পার্টি কী স্টেটমেন্ট দিয়েছে? নিজেরাই কাণ্ডটা বাধালো, আবার বলে কিনা এন্-

কোয়ারি কমিশন বসাতে হবে। আজকের মীটিং-এ এর একটা ডিসিশন নিতে হবে। আমি তো সেই সকাল থেকেই আজ খবরের কাগজ নিয়ে বসেছি—

প্রজেশ বললে—আমিও তো তাই—তা এন্‌কোয়ারি কমিশন বসবে নাকি?

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—তা বসলেই বা আমাদের ভয় কী?

প্রজেশ বললে—না, আমি সে জন্যে বলছি না।'এ রকম কথায় কথায় যদি কেবল এন্‌কোয়ারি কমিশন বসে তো কাজ চলবে কী করে? পুলিশেরও তো মন ভেঙে যাবে। পুলিশের যদি মন ভেঙে যায়, তাহলে এ্যাডমিনিস্ট্রেশান চলবে কী করে বলুন?

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—সেই জন্যেই তো আমরা ডাক্তার রায়ের বাড়িতে যাচ্ছি, কিন্তু এদিকে কী হয়েছে জানো? পর্মিলি ভোরবেলাই কোথায় বেরিয়ে গেছে।

—পর্মিলি! কোথায় গেল সে?

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—কী জানি। আমাব গাড়ি নিয়ে কোথায় গেছে বুঝতে পারছি না। ওকে নিয়ে তো বড় মুশকিলে পড়লুম দেখছি। আগে ক্লাবে যেত, বার-এ যেত, সে এর চেয়ে ভালো ছিল। এমন করে সকালবেলা তো কোথাও যেত না—

প্রজেশ চুপ করে রইল কিছুক্ষণ!

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—তুমি গাড়ি এনেছ?

প্রজেশ বললে—হ্যাঁ—

—তাহলে তোমার গাড়িতেই আমি একবার বেরোই। পর্মিলি কখন ফিরবে তার তো কোনও ঠিক নেই। আব যদি গেল তো আমার গাড়িটা নিয়ে গেল কেন? আমাকে বলে গেলেও তো পারতো!

প্রজেশ বললে—চলুন, আপনাকে আমি নিয়ে যাচ্ছি—

—তোমার অফিস নেই?

প্রজেশ বললে—আমি তাদের টেলিফোন করে দেবো।

প্রজেশের অফিসের কর্তারা জানে, প্রজেশকে সন্তুষ্ট রাখা মানে বাঙলা দেশের গভর্ণমেণ্টকে হাতে রাখা। প্রজেশ হাতে থাকলে কোম্পানীর কাজে গভর্ণমেণ্ট কোনও বাধা দেবে না। বরং দরকাব হলে অনেক সুবিধে পাবে পেছনেব দরজা দিয়ে।

পুণ্যশ্লোকবাবু তৈরি হয়ে নিলেন। ততক্ষণে হরিলোচন এসে গিয়েছিল। তিনি হরিলোচনকে বললেন—আমি না আসা পর্যন্ত তুমি কোথাও যেও না হরি-লোচন। গোয়েঙ্কা সাহেব যদি আসে তো বসিয়ে রেখো। তার সঙ্গে আমার অনেক কাজ আছে—বলবে, আমি তার কাজেই ডাক্তার রায়ের কাছে গেছি—

প্রজেশ গাড়ি স্টার্ট দিলে।

মানুষের একটা বড় অভিযোগ এই যে, তার ইচ্ছেমত সব কাজ হয় না। এক-দিন কি দেশবন্ধু সি. আর দাশই ভাবতে পেরেছিলেন, যে-বাঙলাদেশের জন্যে তিনি সর্বস্ব ত্যাগ কবে গেলেন, সেই বাঙলাদেশের কপালে এত দুর্ভোগ আছে! সেদিন সর্বস্ব ত্যাগ করে তিনি ভেবেছিলেন, ভবিষ্যৎ বংশধরেরা অন্ততঃ তাঁর

মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে। অন্ততঃ তাঁর দল থেকে আরো দু'চারজন দেশবন্ধু জন্ম নেবে!

কিন্তু তিনি বোধহয় ইতিহাসের অলক্ষ্য নির্দেশের আভাস অনুমান করতে পারেননি। অনাগত কালকে তিনি দিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর কাজ, তাঁর জীবন। তিনি চেয়েছিলেন, তাঁর পরে যারা আসবে তারা যেন তাঁর দেখানো পথ দিয়ে চলে। কিন্তু পুণ্যশ্লোকবাবুর মত লোকরা যে আবার বাঙলাদেশে জন্মগ্রহণ করবে একথা দেশবন্ধু কেন, কেউই কল্পনা করতে পারেনি।

সুখদা হাজতের ভেতর থেকে বেরোল।

পুলিশ অফিসার বললে—চলুন—

—কোথায়?

পুলিশ অফিসার বললে—কোর্টে—

—কেন? কোর্টে কেন?

পুলিশ অফিসার বললে—আপনার কেসের শুনানী হবে।

সুখদা বললে—কিন্তু যা বলবার আমি তো তা লিখে দিয়েছি। আমি স্বীকার করেছি আমি চোর, আমি চুরি করেছি। আমার চুরির জন্যে আমার স্বামী কালীকান্ত বিশ্বাস, আমার স্বামীর বন্ধু নরেশ দত্তও দায়ী। তাদেরও আপনারা ধরুন, আমার মত তাদেরও হাজতে পুরুন—

পুলিশ অফিসার বললে—তাদেরও আমরা ধরেছি—

সুখদা অবাক হয়ে গেল। বললে—আমার স্বামীকে ধরেছেন?

—না, তিনি পালিয়ে গেছেন!

—পালিয়ে গেছেন?

—হ্যাঁ। তাঁকে ধরবার চেষ্টাও আমরা করছি। কিন্তু এখনও তাঁকে ধরতে পারিনি—

সুখদা বললে—কিন্তু তাকে আপনারা ধরতে পারছেন না কেন? তার ঠিকানা আমি বলে দিতে পারি, তাকে আপনাবা যত শিগগির পারেন ধরুন—

—সে তো আমরা ধরবার চেষ্টা করছিই। আপনি বলতে পারেন কোথায় গেলে তাকে পাওয়া যায়?

—কেন, তার বাড়িতে? গ্রে স্ট্রীট থেকে একটা কানা গলির ভেতরে!

—সেখানে কেউ নেই। সেখানেও আমরা গিয়েছিলুম।

এক রাত্রের মধ্যেই সুখদার যেন অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। সুখদা চারদিকে চেয়ে দেখলে।

বললে—আমাদের বাড়ির ম্যানেজার কোথায় গেল? সে আসেনি?

পুলিশ অফিসার বললে—কাল এসেছিল।

সুখদা জিজ্ঞেস করলে—আর কেউ আসেনি? আমাকে দেখবার জন্যে সেখান থেকে মা-মণি কাউকে পাঠায়নি? আমার জন্যে শাড়ি-ব্লাউজ পাঠিয়েও দেয়নি?

সুখদা যেন কী ভেবে হঠাৎ কেঁদে ফেললে।

বললে—আমাকে আপনারা ছেড়ে দিন-না, আমি আর কখনও কারো কথা শুনবো না, আমি আর কখনও চুরি করবো না—

এমন সময় দেখা গেল, দূর থেকে ছাতি হাতে ভূপতি ভাদুড়ী আসছে।

—ওই যে, আপনাদের ম্যানেজারবাবু আসছে!

ভূপতি ভাদুড়ীকে দেখেই সুখদা আর থাকতে পারলে না। একেবারে হাউহাউ করে কান্না জুড়ে দিলে।

দারোগাবাবুর দিকে চেয়ে ম্যানেজারবাবু বললে—কী হলো, কাঁদছে কেন আসামী?

এতক্ষণ একজন পুলিশ কনস্টেবল আসামীর পাশে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিল। সুখদা তাকে পাশ কাটিয়ে ভূপতি ভাদুড়ীর দিকে ঝাঁপিয়ে পড়লো—ম্যানেজারবাবু, এরা আমাকে কোর্টে নিয়ে যাচ্ছে. আমাকে বাঁচান আপনি। আমি কোর্টে যাবো না. কোর্টে গেলে আমাকে জেলখানার কয়েদ করে দেবে—

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—না মা, তোমার কিচ্ছু ভয় নেই, আমি তো আছি। তোমার কথা ভেবে ভেবে সারা রাত আমার ঘুম হয়নি, তা জানো? তোমাকে দেখবার জন্যে আমি আমার সব কাজকর্ম ফেলে চলে এলুম। ভাবলুম মা'র আমার খুব কষ্ট হচ্ছে, যাই একবার দেখে আসি গিয়ে—তা রাত্তিরে তোমার ঘুম হয়েছিল তো?

সুখদা বললে—না ম্যানেজারবাবু, আমার একেবারে ঘুম হয়নি। সারারাত আমি কেবল কেঁদেছি, কেবল ভেবেছি, কেন আমি এমন করলুম! আমার এ দুর্মতি কেন হলো।

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—তা এখন তো আমি এসেছি, এখন আর তোমার কোনও ভয় নেই মা—

—কিন্তু ম্যানেজারবাবু, আমার যে জেল হবে। জেল হয়ে গেলে আমি লোকের কাছে মুখ দেখাবো কেমন করে? আমি কার কাছে গিয়ে দাঁড়াবো আমাকে কে আশ্রয় দেবে? আমি যে আত্মঘাতী হবো ম্যানেজারবাবু?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—কেন মা, আমি রয়েছি কী করতে? ছেলে থাকতে মা আবার কোথায় যাবে? ছেলের কাছেই মা থাকবে! আমার কাছে থাকতে তোমার আপত্তি আছে নাকি মা?

সুখদা আরো ভেঙে পড়লো।

বললে—আপনি আমাকে বাঁচান ম্যানেজারবাবু, আমি জেলে যেতে পারবো না—আমি কিছুতেই জেলে যেতে পারবো না—

ভূপতি ভাদুড়ী পুলিশটার দিকে চেয়ে বললে—আরে, এ মেয়েটাকে নিয়ে তো মহা মুশকিলে পড়া গেল। জেলে কে না গেছে? কত বড় বড় লোক জেল খেটে এল, তুমি তো জানো। মহাত্মা গান্ধী জেল খাটেনি? নেতাজী জেল খাটেনি? আর এই যে আমাদের প্রাইম মিনিস্টার জওহরলাল নেহরু, ইনি কত বছর জেল খেটে মরেছেন, বলো তো তাই তুমি? এ মেয়েকে বুঝিয়ে বলো তো সেই কথাটা?

তারপর সুখদার দিকে চেয়ে বললে—তুমি তো কিছু খবর-টবর রাখো না, এই সেপাইজীকে জিজ্ঞেস করো, বড় বড় লীডারকে এই সেপাইসাহেব নিজের হাতে জেলখানায় পুরে দিয়েছে। আবার এখন এই সেপাইজীই আবার তাদের দেখে সেলাম করে! সব দিন কি মানুষের সমান যায় কারো মা? কিছুদিন জেল খেটে এসো না, তারপরে আবার সংসারধর্ম করবে, ছেলেপুলে হবে, তখন আজকের কথা আর কে মনে রাখবে বলো? কেউ মনে রাখবে না। তখন তোমার যদি টাকা হয়, তখন তোমাকেই আবার সবাই খাতির করবে!

সুখদা কাঁদতে কাঁদতে বললে—আমি আর টাকা চাই না ম্যানেজারবাবু, আমার টাকার ওপরে ঘেন্না ধরে গেছে। সবাই মিলে আমাকে টাকার লোভ দেখিয়েছিল! আমি টাকা চাইনি—ওরাই আমাকে চুরি করতে বলেছিল, আমি ওদের কথা আর শুনছিনে ম্যানেজারবাবু—

—কিন্তু কেন তুমি ওদের কথা শুনেছিলে মা? ওরা কি সৎ পরামর্শ দিয়েছিল?

সুখদা বললে—ওরাই যে বলেছিল মা-মণির সম্পত্তি আমি পাবো—

—ওরা বলেছিল আর তুমিও তাই বিশ্বাস করেছিলে?

—তাহলে মা-মণির টাকা কে পাবে?

—মা-মণি যাকে উইল করে দিয়ে যাবে সেই-ই পাবে। ও আমিও পাবো না, তুমিও পাবে না।

সুখদা এতক্ষণে সহজভাবে কথা বলতে পারছিল। বললে—তবে যে ওরা বলেছিল, মা-মণির সব সম্পত্তি আপনি মা-মণিকে দিয়ে আপনার ভাগ্নেকে উইল করিয়ে দিয়েছে?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—ওরা বললে বলেই তুমি বিশ্বাস করলে মা! আচ্ছা বলো তো, আমার ভাগ্নেকে সম্পত্তি পাইয়ে দিয়ে আমার কী লাভ? আমার ভাগ্নে কি আমার বশে? সে সম্পত্তি নেবে, এই তোমাকে ওরা বুঝিয়েছে? জানো, আমার ভাগ্নে আমার কাছেই থাকে না আজকাল?

—আপনার কাছে থাকে না?

ভূপতি ভাদুড়ী ম্লান হাসি হাসলো। বললে—তবে আর দুঃখের কথা বলছি কী মা, বাপ-মা মরা আপন ভাগ্নে, যাকে আমি কলকাতায় এনে টাকা-কড়ি খরচা করে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করলুম, ভাবলুম আমার বুড়ো বয়েসে সে আমাকে দেখবে, সে কিনা এখন লায়েক হয়ে উঠে আমাকেই মানতে চায় না? এ কি আমার কম দুঃখু মা?

—কিন্তু তাহলে সুরেন কোথায় থাকে?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—তুমি নিজের দুঃখে কাতর মা, সেইজন্যেই এসব কথা তোমায় বলতে চাইনি। ভেবেছি সুখদা-মা'কে আর আমার দুঃখ-কষ্ট জানিয়ে কষ্ট দেবো না! আমি যে কী জ্বালায় জ্বলছি তা ভগবানই জানেন! আর তার ওপর মা-মণির অসুখ! সে অসুখ তো আর সারছে না। তার জন্যে ওষুধ, ডাক্তার, সেবা সব তো একলা আমাকেই করতে হচ্ছে—

সুখদা হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে—মা-মণি জানে আমি এখানে?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—পাগল হয়েছ মা, একথা আমি কাউকে বলতে পারি? এ তো কাউকে বলবার মত কথা নয় মা। মা-মণি যে সেই অজ্ঞান হয়ে আছে সে তো আর জ্ঞান না ফেরারই মত। তরলা দিনরাত তার পাশে থেকে দেখাশোনা করছে। আর বাদামীর কথা ছেড়েই দাও, বাদামীরও আর বেশিদিন নয়, সেও এবার যাবে!

বলে একটু দম নিয়ে আবার বলতে লাগলো—আমি যে কী করে দিন কাটাচ্ছি তা আর তোমাকে কী করে বোঝাবো মা, বাড়ি যেন শ্মশান হয়ে আছে! চৌধুরীবাড়ির একদিন কত জাঁকজমক দেখেছি, আবার সেই চৌধুরীবাড়ির এই দশাও আমাকে দেখতে হলো—

সুখদা সকলের দুঃখের কথা শুনে যেন নিজের দুঃখের কথাটা কিছু ভুলতে পারলে।

বললে—কিন্তু আপনার ভাগ্নে? সে কোথায় আছে আপনি কোনও খোঁজ-খবর পাননি?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—খোঁজ যখন পেলাম মা, তখন সব শেষ হয়ে গেছে—

—শেষ হয়ে গেছে মানে?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—কোথায় কোন্ বখাটেদের দলে পড়ে পার্টি করে বেড়াতো, কালকে গায়ে বন্দুকের গুলী খেয়ে আবার আমার কাছে এসেছে—

—সে কী? বন্দুকের গুলী খেলে কেন?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—সেই তো কথা। আমিও তো তাই বলি। লেখা-পড়া শিখে সবাই যা করে তাই করলেই তো হয়। চাকরী কর একটা, তারপর একটা বিয়ে করে ঘর-সংসার কর! তা নয়, আজকালকার ছেলেদের যে কী মতি-গতি হয়েছে! মীটিং করতে গিয়েছিল—সেখানে গিয়ে পুলিশের গুলী খেয়েছে।

—এখন কেমন আছে?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—তোমার জন্যে তাকেও তো ঠিক মত দেখতে পারছি না। ওদিকে মা-মণি, আর একতলায় সুরেন। দুটো রুগী নিয়ে আমি একলা মানুষ হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি। তার ওপর আবার তুমি! আমি কার দিকে দেখি? কাকে সামলাই?

পুলিশের বড়বাবু দপ্তরের কাজে ওদিকে চলে গিয়েছিল। এবার আবার এল।

বললে—চলুন, ভ্যান এসে গেছে'

বাইরে রাস্তায় জাল-ঘেরা মটরভ্যানটা দাঁড়িয়েছিল।

সুখদা ডুকরে কেঁদে উঠলো আবার। বললে—আমার কী হবে ম্যানেজার-বাবু?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—কিচ্ছু ভয় নেই মা. আমি আছি, ভয় কী? আমিও কোর্টে যাচ্ছি. আমি তোমার জন্যে গাঁটের পয়সা খরচ করে উকিল দেবো। তোমায় কিচ্ছু ভাবতে হবে না—তুমি গাড়িতে গিয়ে ওঠো—

সুখদা কাঁদতে কাঁদতে গাড়িতে গিয়ে উঠলো। দুজন কনস্টেবল-পুলিশ সঙ্গে রইল। বড়বাবু এক ছোটবাবুকে পাঠিয়ে দিলে সঙ্গে। ছোটবাবু ড্রাইভারের পাশে গিয়ে বসতেই গাড়ি স্টার্ট দিলে।

পেছনে ভূপতি ভাদুড়ী সুখদাকে শুনিয়ে শুনিয়ে অন্তর্যামীর উদ্দেশে হাতজোড় করে বলে উঠলো—দুগ্যা—দুগ্যা—

হঠাৎ একটা শব্দে সুরেন চোখ খুললো। দেখলে, ধনঞ্জয়।

ধনঞ্জয় বললে—একজন মেয়েমানুষ আপনাকে দেখতে এসেছে ভাগ্নেবাবু—

—কে রে? কে মেয়েমানুষ?

ধনঞ্জয় বললে—তা জানিনে, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে। এখানে ডেকে আনবো?

সুরেন ঠিক বুঝতে পারলে না। এখানে কে তার খবর নিতে আসবে? পমিলি নাকি? কিন্তু পমিলি কী করতে আসবে তার কাছে? পমিলির সঙ্গে তার কীসের সম্পর্ক? তবে কি টুলু? কিন্তু তাকে তো পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে! সে তো এখন জেলে।

বললে—ঠিক আছে, তুমি ডেকে নিয়ে এসো—

এমন করে টুলু যে হঠাৎ এসে হাজির হবে তা সুরেন কল্পনা করতে পারেনি।

—কেমন আছ তুমি সুরেনদা ?

সুরেন উঠে বসবার চেষ্টা করতে লাগলো। যে মানুষটা এসেছে সে যেমন-তেমন মানুষ নয় যেন। তাকে যেন শুয়ে থেকে অভ্যর্থনা করা অন্যায়।

টুলু বললে—উঠছো কেন তুমি ? শুয়ে থাকো না!

সুরেন বললে—কিন্তু তুমি আমাদের বাড়িতে এলে, আর আমি এমনি করে শুয়ে থাকবো ?

টুলু বললে—তাতে কী হয়েছে ? তুমি অসুস্থ, শোবে না তো কি উঠে বেড়াবে। তোমার যে বেশি লাগেনি, এইটেই তো যথেষ্ট! ওরা চেয়েছিল আমা-দের দলের কিছু লোককে খুন করতে।

সুরেন বললে—কেউ মারা গেছে আমাদের দলের ?

টুলু বললে—এখনও তো কিছু খবর পাওয়া যায়নি। আমাকেও তো ওরা এ্যারেস্ট করেছিল। কিন্তু কোথায় নবাবপুর বলে এক অজ পাড়াগাঁ, সেখানে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিয়েছিল। আজ একটু আগেই সেখান থেকে আসছি।

—সে কী ? তুমি এখনও বাড়ি যাওনি ?

টুলু বললে—বাড়ি গিয়েছিলুম। কিন্তু বাড়িতে গিয়ে কেবল এখানে আসবার জন্যে ছটফট করতে লাগলাম। তারপর সেই অবস্থাতেই আবার সোজা চলে এলুম, তোমার কাছে না এসে থাকতে পারলুম না—

সুরেনের মুখটা কেমন হঠাৎ লাল হয়ে উঠলো।

তারপর বললে—আমার দ্বারা রাজনীতি করা হবে না টুলু—

টুলু বললে—কেন ? ওকথা বলছো কেন ?

সুরেন বললে—তোমার কথাগুলো শুনতে তাহলে এত ভালো লাগছে কেন ? তুমি এসেছ দেখে আমার এত আনন্দ হচ্ছে কেন ? এত সেণ্টিমেণ্টাল হলে কি পলিটিকস্ করা চলে ?

টুলু হাসতে লাগলো। বললে—বারে, যারা পলিটিকস্ করে তাদের বুঝি মন থাকতে নেই ? তাহলে আমি পলিটিকস্ করছি কী করে ? আমি যখন বাড়িতে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলুম, তখন তুমি আমাকে দেখতে যাওনি ? তখন তবে আমার কেন ভালো লেগেছিল ?

সুরেন টুলুর চোখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে দেখলে। কথাগুলো সত্যি বলছে কিনা তা টুলুর চোখ দেখে হয়ত যাচাই করবার চেষ্টা করলে।

বললে—সত্যি ? সত্যিই তোমার ভালো লেগেছিল টুলু ?

টুলু বললে—কেন, তুমি জানো না সে কথা ?

সুরেন বললে—জানি, কিন্তু বিশ্বাস করতে যে ভয় করে!

টুলু বললে—ওসব কথা এখন ভাববার দরকার নেই। তুমি শিগ্‌গির শিগ্‌গির ভালো হয়ে ওঠো—

সুরেন আর থাকতে পারলে না। উঠে বসলো।

টুলু বললে—ও কি, উঠলে কেন ? উঠলে কেন ?

সুরেন সে কথার উত্তর দিলে না। জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে যেন কাকে খুঁজতে লাগলো।

—কাকে খুঁজছো ?

সে কথার উত্তর না দিয়ে সুরেন বাইরের উঠোনে অর্জুনকে দেখতে পেয়ে কাছে ডাকলে। বললে—অর্জুন, ধনঞ্জয়কে একবার ডেকে দে তো—

—কেন, ডাকছো কেন ?

কিন্তু সে কথার উত্তর দিতে হলো না সুরেনকে। ধনঞ্জয় কাছাকাছি কোথাও ছিল। ডাক পেয়েই সে এল। সুরেন তাকে কাছে এনে চুপিচুপি কী যেন বললে। আর ধনঞ্জয় তা শুনেই আবার তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

টুলু বললে—কী ব্যাপার বলো তো?

সুরেন বললে—ও কিছু না—

—কিছু না মানে?

সুরেন বললে—তুমি এতদিন পরে এলে, তোমাকে একটু আপ্যায়ন না করলে কি ভালো দেখায়?

টুলু বললে—সে কী, না না, তোমার সঙ্গে কি আমার সেই সম্পর্ক?

কিন্তু ততক্ষণে ধনঞ্জয় দৌড়তে দৌড়তে এসে হাজির হয়েছে। হাতে খাবারের ডিশ।

টুলু বললে—এ কী করেছ, আমি কি হাতী না ঘোড়া? এত আমি খেতে পারি? তুমি কি ভেবেছ আমাকে?

সুরেন বললে—না, খাও, খেয়ে নিতে হবে—না খেলে আমি রাগ করবো—

টুলু হাসলো। বললে—তুমি দেখছি আমাকে খাতির না করে ছাড়বে না!

বলে খাবারের ডিশটা টেনে নিলে। আস্তে আস্তে একটা একটা করে মিষ্টি মুখে পুরে দিতে লাগলো।

সুরেন বললে—আমার শরীর খারাপ, ঠিক মনের মত করে তোমার খাতির করতে পারলুম না। তুমি আজ আমার বাড়িতে এলে টুলু, এতে যে কী খুশী হলাম তা তোমাকে বোঝাতে পারবো না।

টুলু বললে—আর আসতে পেরে আমিও যে কত খুশী হয়েছি তা তো তুমি জানতে পারলে না সুরেনদা! আমি কাল সারারাত নবাবপুরে ঘুমোতে পারিনি, তা জানো?

—নবাবপুরে তোমাদের খুবই কষ্ট হয়েছে তাহলে?

টুলু বললে—কষ্টের চেয়ে ভাবনাটাই হয়েছিল বেশি—

—কেন, ভাবনা কীসের?

টুলু বললে—তোমার জন্যেই ভাবনা হয়েছিল। তোমার তো এসব মিছিল-টিছিলে যাওয়ার অভ্যেস নেই কখনও, আর তোমার দিকে যখন বন্দুক তুললে পুলিশটা, তখনই আমি আঁতকে উঠেছিলুম। তারপরে যখন তুমি পড়ে গেলে, তোমার গা দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে, আমি আর থাকতে পারলুম না, আমার মাথা ঘুরে গেল। কিন্তু সেই সময় আমাকেও ওরা ধরে নিয়ে গিয়ে ভ্যানে পুরে দিলে, তোমাকে আর দেখতে পেলুম না—

সুরেন চুপ করে কথাগুলো শুনছিল। বললে—তারপর?

টুলু বললে—তারপর তো একেবারে সেই নবাবপুর—সেখানে গিয়েও শুধু তোমার কথাই ভাবছিলাম—সেখানকার পোস্টাফিস থেকে টেলিফোন করে জানলাম যে, তুমি নাকি মারা গেছ—

সুরেন হেসে উঠলো।

বললে—সে কী, আমি মারা গেছি? কে বললে?

—সন্দীপদা। সন্দীপদা প্রথমে ভুল খবর পেয়েছিল! শুনে যে মনটা কী খারাপ হয়ে গেল, কী বলবো। সমস্তক্ষণ যে কী কষ্ট হয়েছে, আমি বুঝিয়ে বলতে পারবো না। তারপর ভোরের ট্রেণে উঠে কলকাতায় চলে এলুম সবাই মিলে। কলকাতায় পৌঁছেই প্রথমে অফিসে এসেছি। সেখানেই সন্দীপদা প্রথম

জানালে যে, তোমাকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দিয়েছে—

সুরেন বললে—আমি মারা গেলেই ভালো হতো টুলু!

—সে কী? কেন?

সুরেন বললে—আমাদের এ-পৃথিবীটা বড় জঘন্য জায়গা টুলু, এর চেয়ে জঘন্য জায়গা আর নেই। মারা গেলে এইসব জঘন্য জিনিস দেখতেও হতো না, শুনতেও হতো না।

টুলু বললে—কেন, এসব কথা হঠাৎ তোমার মনে এল কেন?

সুরেন বলতে লাগলো—তুমি সব জানো না টুলু, আমি এ-বাড়িতে অনেক দিন ছিলুম না, এর মধ্যে এখানে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। মানুষ টাকার জন্যে যে কত নীচ হতে পারে তার পরিচয়ও পেয়ে গেলাম।

বলে সুখদার ঘটনাটা বললে। তারপর বললে—এরকম ঘটনার কথা কখনও শুনেছ তুমি? অথচ এরাও তো মানুষ? দুটো হাত, দুটো পা, সবই মানুষের মত—আমি এই জন্যেই তো এ-বাড়ি থেকে চলে গিয়েছিলুম। কিন্তু পালিয়ে যাবোটা কোথায়? যেখানে যাই সেখানেই এই রকম। বলতে পারো টুলু, পৃথিবীর মানুষ এত খারাপ হয়ে গেল কী করে? বইতে তো অনেক ইতিহাস পড়েছি, কিন্তু তখন তো এত খারাপ ছিল না মানুষ?

—তোমাদের সুখদা এখন কোথায়?

সুরেন বললে—শুনলুম, এখন জেলখানায়। মামলা হবে তার বিরুদ্ধে—

—কেন সে চুরি করতে গিয়েছিল?

সুরেন বললে—যে জন্যে লোকে চুরি করে সেই জন্যেই করেছিল। সে ভেবেছিল মা-মণি মারা যাবার পর সে হয়ত সম্পত্তির কিছুই পাবে না, তাই আগেভাগেই নিতে গিয়েছিল। তার ধারণা, মা-মণির যখন নিজের কেউ নেই তখন এ-সম্পত্তি সব আমিই পাবো—

—তুমি পাবে কেন? তুমি মা-মণির কে?

—আমি কেউ না, কিন্তু সবাই সন্দেহ করে মা-মণি নাকি সব সম্পত্তি উইল করে আমায় দিয়ে গেছে। এই সাত লাখ টাকার সম্পত্তি! আসলে এই বিরাট সম্পত্তিই যত নষ্টের গোড়া—

টুলু জিজ্ঞেস করলে—তাহলে তুমি কী করবে ঠিক করেছ? সম্পত্তি পেলেও নেবে না?

সুরেন বললে—তুমিই বলো না, আমার কি নেওয়া উচিত?

টুলু বললে—আমি ওসব জানি না। আমি জীবনে অত টাকা দেখিওনি, কখনও দেখবোও না, আমার মতের কোনও দাম নেই—

সুরেন বললে—আমি ঠিক করে ফেলেছি। আমি জানি, যে টাকা আমি উপার্জন করে পাইনি, সে টাকা আমার নয়!

টুলু বললে—তাহলে এক কাজ করতে পারো তো, টাকাটা যদি পাও তো পার্টির কাজে দিয়ে দিও—

সুরেন বললে—টাকা আমি নিলে তবে তো পার্টিকে দেবো—

টুলুর খাওয়া তখনও চলছে।

খেতে খেতে টুলু বললে—জানো সুরেনদা, সন্দীপদা বলেছে সেদিনকার ঘটনার জন্যে এন্‌কোয়ারি কমিটি বসাবার ব্যাপারে আমরা চাপ দেবো—

সুরেন বললে—বারে, সুব্রত আমার ক্লাশফ্রেন্ড, তার বাবাই তো পুণ্যশ্লোক-বাবুকে তো আমি চিনি, তিনি ডাক্তার রায়ের ডান হাত!

টুলু বললে—তুমি চেনো? তুমি পুণ্যশ্লোকবাবুকে চিনলে কী করে?

সুরেন বললে—বারে, সুব্রত—আমার ক্লাশফ্রেন্ড, তার বাবাই তো পুণ্যশ্লোক রায়। ওই পুণ্যশ্লোকবাবু আমাকে কংগ্রেসের ইতিহাস লেখবার জন্যে বলেছিলেন। আমার লিখতে ভালো লাগেনি—তাই সে কাজ ছেড়ে দিয়েছিলাম—

টুলু বললে—একথা তো আমি জানতুম না—

সুরেন বললে—তোমার সঙ্গে আর ক'দিনের পরিচয় যে তুমি জানবে? আমার সব কথা কি তুমি জানো? দেবেশ জানে! দেবেশ আর আমি একসঙ্গে পড়েছি যে।

টুলু বললে—জানো, দেবেশদাকেও এ্যারেস্ট করে রেখেছে পুলিশ?

সুরেন হঠাৎ দেখতে পেয়েছে। বললে—ও কি, সন্দেশটা খেলে না তুমি? ওগুলো খেয়ে নাও, পয়সা দিয়ে কেনা জিনিস, ফেলো না—সব তোমায় খেতেই হবে, খাও—

টুলু বললে—রক্ষে করো সুরেনদা, আমার পেট ভরে গেছে, আমি আর খেতে পারছি না—

সুরেন টুলুর হাতটা ধরে ফেললে। বললে—না, তোমায় খেতেই হবে। তোমাদের বাড়িতে তুমি যা দিয়েছিলে আমি চেটেপুটে খেয়ে এসেছি, আমাদের বাড়িতে তুমি ফেলতে পারবে না—

টুলুও খাবে না, সুরেনও ছাড়বে না। হাত নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া চলতে লাগলো। সুরেন টুলুর হাতটা ধরে বললে—আমি তোমার হাত কিছুতেই ছাড়বো না—

সেই অবস্থাতেই হঠাৎ সুরেনের আর টুলুর সামনে যেন বজ্রাঘাত হলো। হঠাৎ ঘরের মধ্যে এসে হাজির পর্মিলি। পর্মিলিও ভেতরে ঢুকে ঠিক এ-দৃশ্য দেখবে আশা করেনি। গেটের সামনে আসতেই দরোয়ানটা তার গাড়ি দেখে একটু বেশি সমীহ করে সেলাম করেছিল। তারপর ভাগ্নেবাবুর নাম শুনেই একেবারে সুরেনের ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে।

পর্মিলি ভেবেছিল, এসে দেখবে সুরেন অসুস্থ অবস্থায় শয্যাশায়ী হয়ে আছে। কিন্তু এমনভাবে যে একজন মেয়ের সঙ্গে বসে বসে গল্প করবে আর হাত ধরে টানাটানি করবে তা তার কল্পনায়ও ছিল না।

ঘরে ঢুকেই এই দৃশ্য দেখে কেমন একটা অস্বস্তিবোধ করছিল পর্মিলি। কী কথা বলে আরম্ভ করবে বুঝতে পারছিল না। একবার ভাবলে সে চলে যায়, কিন্তু সে এক মুহূর্তের জন্যে—

—এ কী পর্মিলি, তুমি? তুমি যে?

ততক্ষণে টুলুও মুখ ফিরিয়ে দেখে অবাক হয়ে গেল। এই-ই সেই মেয়েটা না? সেই তাদের পার্টি অফিসের সামনে গাড়ি থেকে নেমে তাকে সুরেনের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেছিল? সে শেষ পর্যন্ত এখানে এল? এত পরে এল কেন? এতক্ষণ কোথায় ছিল?

পর্মিলিও টুলুকে দেখে চিনতে পেরেছিল। এ মেয়েটা এখানে কী করে এল?

সুরেন ততক্ষণে সোজা হয়ে বসেছে। বললে—তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন পর্মিলি, বোস—

পর্মিলি কী বলবে বুঝতে পারলে না। সে গম্ভীর হয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপরে বললে—আমি ভেবেছিলাম তুমি শুয়ে থাকবে। খবর পেয়েছিলুম

তোমার গায়ে পুলিশের গুলী লেগেছে—

সুরেন বললে—হ্যাঁ, গুলীই তো লেগেছিল, কিন্তু বুকে না লেগে হাতে লেগেছিল বলে অল্পের জন্যে বেঁচে গেছি—

পর্মিলি বললে—যাক্, দেখে গেলাম, তুমি তাহলে ভালোই আছ—

সুরেন বললে—না, ভালো নেই পর্মিলি, সত্যিই ভালো নেই, তুমি বোস—

পর্মিলি বললে—মিথ্যে কথা বোল না, নিজের চোখে দেখছি তুমি ভালো আছ, ভালো না থাকলে হাসি-ঠাট্টাই বা করছো কী করে?

সুরেন বললে—হাসি-ঠাট্টা? হাসি-ঠাট্টা করতে কখন দেখলে তুমি আমাকে?

পর্মিলি বললে—নিজের চোখকে তো আর তা বলে অবিশ্বাস করতে পারি না। এখনও আমার চোখ খারাপ হয়নি যে আমি ভুল দেখবো।

সুরেন বললে—কী বলছো তুমি পর্মিলি? আমি টুলুর সঙ্গে গল্প করছি বলে তুমি ওই কথা বললে? এও তো তোমারই মতন আমাকে দেখতে এসেছে আমার গুলী লাগার খবর শুনে—

পর্মিলি বললে—তা হয়ত হবে—

সুরেন বললে—তুমি বুঝি বিশ্বাস করলে না? বিশ্বাস না হয় তো তুমি একে জিজ্ঞেস করো—

পর্মিলি হেসে উঠলো। বললে—ওঁকে জিজ্ঞেস করতে হবে না, আমি ওঁকে চিনি। শুঁড়ীর সাক্ষী মাতাল—

—কী বললেন?

টুলু এতক্ষণ চুপ করেছিল। একটা কথাও বলেনি। কিন্তু এবার ফোঁস করে উঠলো। বললে—কী বললেন?

পর্মিলি বললে—যা বলছি ঠিকই বলছি। আমাকে আপনি চেনেন না?

টুলু বললে—সঠিক চিনি না, কিন্তু আপনাকে আমি দেখেছি—

পর্মিলি বললে—আপনি যদি সবই জানতেন, তাহলে সুরেনের খবর আমাকে দিলেন না কেন?

টুলু বললে—আপনাকে আমি জানি না চিনি না, কেন আপনাকে আমি সুরেনদা'র খবর দেবো?

সুরেন অবাক। বললে—তোমরা কি দুজনে দুজনকে চেনো নাকি? কী কাণ্ড!

পর্মিলি বললে—না, ওকে আমি চিনি না। আমি ওকে তোমার ঠিকানা জিজ্ঞেস করেছিলুম, তা উনি পার্টি অফিস দেখিয়ে দিলেন।

সুরেন পর্মিলিকে বললে—তা আমার ঠিকানা তো তুমি জানতে পর্মিলি! তুমি তো আগে আমাদের বাড়িতে এসেছ—

পর্মিলি বললে—তা তো জানি, কিন্তু আমি কী করে জানবো যে, তুমি হসপিটালে আছ না বাড়িতে আছ! তোমার সঠিক খবরটা জানতেই তো আমি তোমাদের অফিসে গিয়েছিলাম—

টুলুর চোখ দুটো ছলছল করে উঠলো। বললে—আমি তাহলে এখন যাই সুরেনদা, তোমরা দুজনে গল্প করো—

বলে উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল।

কিন্তু পর্মিলি বললে—না, আপনি কেন যাবেন? যেতে হলে আমিই চলে যাবো। আমি আপনাদের দুজনের প্রেমালাপে বাধা দিতে চাই না—

বলে আর সেখানে দাঁড়ালো না। একেবারে ঘর থেকে বেরিয়ে উঠোন

পেরিয়ে সোজা নিজের গাড়িতে গিয়ে উঠলো।

সুরেন সেই তক্তপোষের ওপরে বসে বসেই ডাকতে লাগলো—পর্মিলি শোনো, পর্মিলি—

কিন্তু পর্মিলির ড্রাইভার জগন্নাথ তখন গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে দিয়েছে। সেই আওয়াজে পর্মিলি আর কিছুই শুনতে পেলে না।

ঘরের মধ্যে টুলু তখন আঁচলে চোখ ঢেকে কাঁদছে। বললে—এ কী হলো? এ তুমি কী করলে সুরেনদা? তোমার সামনে তোমার বন্ধু এসে আমাকে অপমান করে গেল আর তুমি কিছুই বললে না?

তারপর মুখ থেকে আঁচল নামিয়ে হঠাৎ টুলু বললে—আমি এখন উঠি সুরেনদা, আমি দেখছি ভুল করেছি তোমার কাছে এসে। আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল—

বলে উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে গেল। তারপর দরজা পেরিয়ে উঠোনের দিকে পা বাড়ালো।

সুরেন বললে—তুমি যাচ্ছ কোথায় টুলু, বোস—

টুলু বললে—আমি যাই, আমি আর কখনও আসবো না এখানে—সত্যিই ভুল হয়েছিল আমার—

সুরেন বললে—আরে, তুমিও রাগ করলে টুলু? তুমিও আমাকে ভুল বুঝলে? বোস, বোস, চলে যেও না—

কিন্তু টুলু তখন তরতর করে সোজা উঠোন পেরিয়ে মাধব কুণ্ডু লেনে পা দিয়েছে—

ব্যাংকশাল কোর্টে মুন্সিফের ঘরে তখন আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছে সুখদা। মাথায় ঘোমটা টানা। আর দাঁড়িয়ে আছে নরেশ দত্ত।

উকিল জেরা করলে—আসামী সুখদাবালা, আপনি থানার পুলিশের কাছে যে এজাহার দিয়েছেন, সেটা কি সত্যি?

সুখদা চুপ করে রইল। কোনও উত্তর দিলে না।

পুলিশের উকিল আবার জিজ্ঞেস করলে—এই দেখুন, এই আপনার এজাহার। এই এজাহার আপনিই দিয়েছেন তো? এতে আপনার টিপ্‌সই রয়েছে। এতে আপনি জানিয়েছেন যে আপনি আসামী নরেশ দত্ত আর আপনার স্বামী পলাতক আসামী কালীকান্ত বিশ্বাসের প্ররোচনায় যাট হাজার টাকার গয়না চুরি করেছেন। সেই সমস্ত গয়না আপনার স্বামী পলাতক আসামী কালীকান্ত বিশ্বাসকে দিয়েছেন। এসব তো সত্যি? হুজুর আপনার মুখ থেকে শুনতে চান, এজাহারে যা লিখেছেন তা সত্যি কিনা। বলুন, সব সত্যি তো?

আরো যে কত প্রশ্ন করতে লাগলো ওরা তার কি ঠিক আছে? প্রশ্নের যেন ঢেউ। এক-একটা ঢেউ আসে আর যেন সুখদাকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যায়। কবে একদিন প্রথম মানুষ তার আদিম পাপ করেছিল নিজেরই বোকামিতে, আজ এত যুগ পরে যেন সুখদাকে ধর্মাধিকরণের সামনে তার জবাবদিহি করতে হচ্ছে। তার খেসারত দিতে হচ্ছে।

ওগো মানুষের সৃষ্টিকর্তা, তোমার কোন্ অহেতুক খেয়াল চরিতার্থ করতে

আমাদের এই পৃথিবীতে জন্ম নিতে হয়েছে কে জানে! যদি আমাদের সৃষ্টিই করলে তবে তোমার মনের মত করে কেন সৃষ্টি করলে না? কেন অন্তরে দিলে ক্ষুধা, আর বাইরে দিলে অনুশাসন? হাত বাড়ালেই যা পাওয়া যায়, তাকে কেন নাগালের বাইরে ঠেলে দেবার এ পরিহাস! জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এত অসাধ্য-সাধনের লড়াই করবার ক্ষমতা কেন দিলে না, যদি এত বাসনা-কামনাই দিলে? তুমি যদি অন্তর্যামী তো আমাদের কান্না কেন তোমার বন্ধ সিং-দরজায় ধাক্কা খেয়ে আমাদের বুকে ফিরে আসে? আমি কোথায় জন্মেছি, আমি কার যত্নে কার অবহেলায় এতখানি বড় হয়েছি, জানি না। শুধু এই জানি যে, যে-পৃথিবীতে আমি রয়েছি এখানে কেউ কারোর নয়। প্রয়োজনের মাপকাঠি দিয়ে মেপে মেপে ওজন করে এখানে আমাদের দাম যাচাই হয়। ওগো, তাই তো আমি তোমাকে অস্বীকার করেছি। তোমাকে অস্বীকার করে আমি তোমাকে যেমন অপমান করেছি, নিজেও তেমনি অপমানিত হয়েছি। আমাকে যেন তুমি কখনও ক্ষমা কোর না প্রভু। আমাকে তুমি তোমার চরম দণ্ড দাও, আমি তোমার সামনে তাই আজ আমার সব অপরাধ স্বীকার করে মাথা পেতে দাঁড়িয়ে আছি। আমাকে দাও দণ্ড, দাও শাস্তি। ক্ষমা কোর না আমাকে, ক্ষমা করে আমার আত্মার পরিত্রাণ থেকে রেহাই দিও না।

চোখের সামনে কী যে ঘটছে, কেন ঘটছে, কে কী বলছে, কারা ওরা, কিছুই তখন আর সুখদার মাথায় ঢুকছে না। কত লোক, কত শব্দ, কত তর্ক, কত কৌতূহল, কিছুই যেন আর সুখদাকে স্পর্শ করতে পারছে না।

হঠাৎ কী যে হলো, মনে হলো সব ফাঁকা হয়ে গেছে। কেউ নেই আর। অখণ্ড এক শূন্যতার মধ্যে কেউ যেন তাকে ছুঁড়ে দিয়েছে।

—চলো মা, চলো।

সুখদার আজও মনে আছে, সেই মাত্র যেন তার জ্ঞান ফিরলো। সামনেই ভূপতি ভাদুড়ী দাঁড়িয়ে আছে—তার দিকে চেয়ে। যেন কী বললে সুখদাকে।

—চলো মা, এবার চলো!

সুখদাও কাঠের পুতুলের মত চলতে লাগলো। ভাবলে, আবার সেই জাল-ঘেরা গাড়ি, আবার সেই পুলিশ কনস্টেবলদের পাহারা!

সুখদা জিজ্ঞেস করলে—সেই পুলিশগুলো কোথায় গেল? সেই জাল-ঘেরা গাড়িটা?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—পুলিশরা সব চলে গেছে মা, আমি তোমায় ট্যাক্সি করে নিয়ে যাবো।

সুখদা অবাক হয়ে গেল—কেন? ট্যাক্সি কেন? সেই জাল-ঘেরা গাড়িটা কোথায় গেল?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—তুমি যে জামিনে খালাস পেয়েছ মা। এখন তো তুমি স্বাধীন।

—তাহলে আমার জেল হয়নি? আমাকে আর হাজতে ফিরে যেতে হবে না?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—না, এখন আমি তোমাকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাবো।

সুখদা বললে—কোথায়? আমার সেই বাসা-বাড়িতে?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—না মা, সে-বাড়ি আর তোমার নেই, সে-বাড়ি ছেড়ে দিয়ে জামাই-বাবাজী পালিয়ে গিয়েছিল, বাড়িওয়ালাও এখন সে-বাড়ি দখল করে নিয়েছে। ভাড়া বাকি পড়েছিল অত দিনের, বাড়িওয়ালার দোষ কী? তা

তার জন্যে ভাবনা নেই—

সুখদা বললে—আমি কিন্তু মা-মণিকে আমার মুখ দেখাতে পারবো না।

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—আমি তা জানি মা, আমি তাই তোমার জন্যে আগাম বাড়ি ভাড়া করে রেখেছি, সেখানে গিয়েই তুমি উঠবে, চলো—

ট্যাক্সিতে সুখদাকে তুলে দিয়ে ভূপতি ভাদুড়ীও পরে উঠলো। ট্যাক্সিওয়ালাকে বোধহয় আগে থেকেই সব বলা ছিল। সঙ্গে সঙ্গে সে স্টার্ট দিলে। কোর্টের কাজ শেষ হতেই সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছিল। ট্যাক্সিটা কোথা দিয়ে ঘুরে ঘুরে একটা গলির ভেতরে এসে দাঁড়ালো। গলিতে বেশ লোকজনের যাতায়াতের ভিড়।

—এ কোথায় নিয়ে এলেন আমাকে ম্যানেজারবাবু?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—তোমার কিচ্ছু ভাবনা নেই মা। তোমার যাতে ভাল হয় সেই ব্যবস্থাই আমি করেছি। এখানে তোমার কোনও অসুবিধে হবে না—

সুখদা বললে—আমার কাপড়-চোপড় বাক্স-পেটরা সব যে সে-বাড়িতে রয়েছে—

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—তার ব্যবস্থাও আমি করে রেখেছি মা, তুমি কি ভেবেছ আমি অত ভুলো মানুষ?

বলেই বাড়িটার সামনে গিয়ে ডাকতে লাগলো—ও ভুলোর মা, ভুলোর মা—

একজন বুড়ি এসে হাজির হলো। ভালো করে তীক্ষ্ম নজর দিয়ে সুখদার দিকে দেখতে লাগলো সে।

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—অত দেখছো কী গো ভুলোর মা? ঘরের চাবি খুলে দাও—

ভুলোর মা তাড়াতাড়ি কোমর থেকে চাবির গোছা বার করে দোতলার চাবি খুলে দিলে।

সঙ্গে সঙ্গে ভূপতি ভাদুড়ীও সুখদাকে নিয়ে গেল। আলো জেবলে দেওয়া হলো ঘরের। বেশ খোলামেলা ঘর।

ভূপতি ভাদুড়ী ভুলোর মাকে বললে—কই গো, তোরঙ্গটা কোথায়? যাতে মেয়ের শাড়ি-ব্লাউজ সব আছে? যাও যাও, তোরঙ্গটা নিয়ে আসতে বলো—

তারপর ভূপতি ভাদুড়ী এদিক-ওদিক দেখিয়ে দিলে সুখদাকে। এই হচ্ছে কলঘর, এই হচ্ছে ছাদে ওঠবার সিঁড়ি। এখানে আয়েস করে এখন ঘুমোও—কেউ বিরক্ত করতে আসবে না তোমাকে—

—রান্নাঘর? রান্নাঘরটা কোথায়?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—রান্নাটান্না তোমায় কবতে হবে না। সে আমি লোকজনের ব্যবস্থা করেছি। একটা পেটের জন্যে আবাব তুমি রান্না করবে কেন মিছিমিছি?

কথা শেষ হলো না, তার আগেই একজন মহিলা এসে ঘরে ঢুকলো। বেশ ফরসা গিন্নীবান্নি মোটাসোটা মানুষ। নাকের বাঁ দিকে আবার একটা হীরের নাকছাবি। হাসি-হাসি মুখ। ঠোঁট লাল করে পান খেয়েছে। পানের গুলিতে একটা গাল একদিকে ফুলে রয়েছে।

—এই যে মাসী, তুমি এসে গেছ, আমি তোমার কথাই ভাবছিলুম, এই দেখ, এই আমার মেয়ে—

মাসী তখন সুখদাকে একদৃষ্টে দেখছে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দেখে বললে—বাঃ, এ তো বেশ লক্ষ্মী মেয়ে দেখছি। তোমার নাম কী বাছা?

ভূপতি ভাদুড়ী সুখদার দিকে চেয়ে বললে—বলো, বলো, তোমার নাম বলো—এ আমার মাসী হয়—

সুখদাও ভালো করে দেখছিল মহিলাটিকে।

—বলো না মা, তোমার নাম বলো। ভারি লক্ষ্মী মেয়ে দেখছি তোমার ম্যানেজারবাবু—

বলে সুখদার চিবুকটা ধরে সুখদাকে আদর করতে লাগলো মাসী। সুখদার বড় ভালো লাগলো। একেবারে আদরে গলে গেল এক মুহূর্তে।

মাসী বললে—তুমি আমাকে দিদি বোল ভাই, আমি তোমার দিদিভাই—

তারপর আবার বললে—এখানে তোমার কোনও ভয় নেই ভাই। যা কিছু অসুবিধে হবে আমাকে বলবে। আজ রাত্তিরে তুমি কী খাবে বলো তো ভাই? রুটি খাও, না ভাত?

সুখদা বললে—আমি আজ কিছু খাবো না—

মাসী বললে—ওমা, তা কী হয়? পেটে কিছু না দিলে ঘুম আসবে কেন? কথায় বলে রাত-উপোসে হাতী মরে—না না, উপোস করবে কোন্ দুঃখে?

সুখদা বললে—আমার ক্ষিদে নেই—

—না থাক, কিছু মুখে দিতেই হবে। তোমার জন্যে আমি পরোটা আর মাংস করতে বলে দিয়েছি—

এমন সময় একটা লোক একটা ট্রাংক মাথায় নিয়ে ঘরে ঢুকলো। মাসী বললে—ওইখানে রাখ, ওই কোণের দিকে—

কোণের দিকে ট্রাংকটা রেখে লোকটা চলে যাচ্ছিল।

মাসী বললে—ওরে, দেখে আয় তো, আমার দিদির পরোটা-মাংস হয়েছে কিনা—

লোকটা চলে গেল।

ভূপতি ভাদুড়ী এবার বললে—তাহলে আমি চলি মাসী? তোমার জিম্মায় আমি আমার মেয়েকে রেখে গেলাম, দেখো যেন কোনও কষ্ট না হয় মেয়ের। আবার যেদিন মামলার দিন পড়বে, সেইদিন এসে নিয়ে যাবো—

তারপর সুখদার দিকে চেয়ে বললে—তাহলে আসি মা?

সুখদা বললে—আবার কবে আসবেন আপনি?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—সে তোমায় ভাবতে হবে না। আমি বাড়ি চলে গেলেও মন আমার এখানেই পড়ে রইল। বাড়িতে না-গেলেও যে নয়, মা-মণির অসুখ তো এখনও সারছে না, কী যে করি—

তারপর একবার চলতে গিয়েও পেছন ফিরে বললে—চলি তাহলে মা, চলি।

বলে সেই অন্ধকারের মধ্যেই ভূপতি ভাদুড়ী পা বাড়িয়ে দিলে। আর ভেতরে তখন মাসী সুখদার গা, হাত, পা টিপে দেখতে লাগলো।

সুখদা বললে—কী দেখছেন?

মাসী বললে—ওমা, তুমি আবার আপনি-আজ্ঞে করে কথা বলছো কেন? আমি তো দিদিভাই, দেখছি দিদিভাই-এর গতর কেমন।

সুখদা বললে—গতর দেখে আপনার লাভ কী?

মাসী বললে—লাভ কিছুই নেই। টিপতে ভালো লাগলো তাই টিপলুম। তুমি অত রেগে যাচ্ছ কেন ভাই? আমি কি রাগের কিছু করেছি? আর অতই যদি রাগ করো তো চললুম বাছা—

বলে মাসী চলে গেল। এতক্ষণে সুখদা ভাল করে যেন নিজেকে নিয়ে

ভাববার সময় পেলে। সুখদার মনে হলো ভাগ্যদেবতা তাকে এ কোথায় এনে ফেললে? এই-ই কি সে চেয়েছিল? কোথায় রইল তার সেই ছোড়দার আশ্বাস-বাণী? আরো বড়লোক হবার কামনা তাকে এমন করে কেন ছলনা করতে গেল? আশ্চর্য, এখানে এসেই তার প্রথম মনে হয়েছিল, জীবনে পূর্ণচ্ছেদ টানতে গেলে বোধহয় মানুষ এখানেই আসে। বিষের বড়ি খেয়ে জীবনের ওপর পূর্ণচ্ছেদ টানার চেয়ে এখানে এমনি করে থাকলেই বোধহয় পূর্ণচ্ছেদ টানা সহজ হয়।

একদিন এইরূপ পরিবেশের মধ্যেই আবার হঠাৎ দেখা হয়েছিল সুরেনের সঙ্গে। এখানে এসেও যে আলোর পৃথিবীর কারো সঙ্গে দেখা হওয়া সম্ভব, তা সেদিন সুখদা ভুলেই গিয়েছিল। কিন্তু জীবন বোধহয় বড় বিচিত্র এক নৌকো। ঘাটে ঘাটে ভিড়লেও কখন যে সে আঘাটার মধ্যেও গন্তব্যস্থলের আস্বাদ পায় তা কেউ বলতে পারে না।

সেদিন সুরেন সুখদাকে দেখে চমকে উঠেছিল।

বলেছিল—এ কী? তুমি?

তখন সুখদা অনেক যৌবন অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছে অনেক অযোগ্যকে। অনেক রাত-জাগার অনেক কলঙ্ক তখন তাকে ম্লান করে দিয়েছে। কিন্তু নিষ্পাপ চোখ দুটো তার সুখদাকে চিনতে একেবারেই ভুল করেনি।

সুখদা বলেছিল—আমায় তাহলে চিনতে পেরেছ?

সুরেন বলেছিল—কিন্তু না চিনতে পারলেই দেখছি ভালো হতো।

সুখদা জিজ্ঞেস করেছিল—কিন্তু আমি তো আর সুখদাবালা দাসী নয় এখন।

সুরেন বলেছিল—হ্যাঁ, তাই-ই তো দেখছি, এখন দেখছি সান্ত্বনা বোস।

তখন ভোটের সময়। সার বেঁধে ভোট দিতে গিয়েছিল সুখদা ওই একখানা কার্ড নিয়ে। কার্ডের ওপরে ওই নামই লেখা ছিল তার—সান্ত্বনা বোস!

সুরেন বলেছিল—নিজের অভিভাবকের দেওয়া নামটা বদলাতে গেলে কেন?

সুখদা বলেছিল—মাত্র পাঁচ মিনিটের জন্যে বদলিয়েছি, একটু পরেই আবার সুখদাবালা দাসী হবো।

—তার মানে?

সুখদা বলেছিল—তার বদলে যে কুড়িটা টাকা পেয়েছি—

বলে দুটো দশ টাকার নোট বার করে সুরেনকে দেখিয়েছিল।

—তা কুড়িটা টাকাই তোমার কাছে আজ বড় হলো?

সুখদা সেই ভিড়ের মধ্যেই সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বলেছিল—কুড়িটা টাকা কি কম হলো? চব্বিশ ঘণ্টা মেহনত করে তুমি কুড়ি টাকা উপায় করতে পারো?

সুরেনের মুখটা ঘেন্নায় যেন কালো হয়ে গিয়েছিল। এখানে আসার পর সেই-ই প্রথম দেখা। তখন সুখদার গলায় সোনার হার, হাতে সোনার চুড়ি, কানে মুক্তোর গয়না। সব জড়িয়ে যেন সুরেন সুখদাকে দেখছিল না, সান্ত্বনা বোসকেই দেখছিল।

তখন ভোট দেওয়া হয়ে গিয়েছে।

সুরেন জিজ্ঞেস করেছিল—তুমি কোথায় থাকো?

সুখদা বলেছিল—কেন, তুমি আমার বাড়ি যাবে?

সুরেন বলেছিল—আগে বলোই না ঠিকানাটা, তারপরে যাবো কিনা ভাববো।

সুখদা বলেছিল—কিন্তু ঠিকানা শুনে যদি তুমি না যাও—

—আমি গেলে তবে তুমি ঠিকানা বলবে?

তখন সুখদা বলেছিল—আটাশ নম্বর দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রীট!

সুরেন ঠিকানাটা শুনে সুখদার আপাদমস্তক ভালো করে চেয়ে দেখেছিল একবার। তারপর চলে যেতে যেতে বলেছিল—আচ্ছা যাই—

সুখদা কিন্তু যেতে দিলে না। পথটা আটকে দাঁড়ালো।

বললে—রাস্তার নামটা শুনেই চলে যাচ্ছ যে? যাবে কিনা বললে না তো?

সুরেন বললে—আমার কাজ আছে, সরো—

কথাটা শুনেই সুখদা খুব রেগে গিয়েছিল। রেগে গিয়ে বলেছিল...

কিন্তু কবেকার কথা সে-সব। সে অনেক পরে। অনেক পরের কথা অনেক পরে বলাই ভালো। তবু মাঝে মাঝে আজও মনে পড়ে সেই সব কথা। মনে পড়ে প্রথম যে-দিন এসেছিল, প্রথম যেদিন মাসী তার গা-হাত-পা টিপে টিপে দেখেছিল।

হঠাৎ দরজার বাইরে সেই লোকটি আবার এসে হাজির হলো। তার হাতে কাঁসার থালা, আর জলের গ্লাস।

সুখদা জিজ্ঞেস করলে—ও কী?

লোকটা বললে—দিদিমণি, তোমার খাবার।

পেছনে ভুলোর মা-ও এসেছে। বললে—এবার খেয়ে নাও বাছা। সারাদিন খুব খাটাখাটনি গেছে, উঠে হাত-মুখ ধুয়ে খেয়ে নাও—

সুখদা বললে—আমি এখন খাবো না, আমার ক্ষিধে নেই—

ভুলোর মা গালে হাত দিলে।

—ও মা, তোমার জন্যে গাওয়া ঘিয়ে ভাজা পরোটা আর মাংস নিয়ে এলুম, তুমি খাবে না কী বলছো? না খেলে গতর টিকবে কেন বাছা? এ হলো মেহনতের লাইন, মেহনত করে পেট পুরে খেতে হবে যে—

সুখদা আর তর্ক করতে পারলে না। বললে—ওইখানে খাবারটা রাখতে বলো, রেখে চলে যাও তোমরা, আমার ক্ষিধে পেলে আমি খেয়ে নেব'খন—

বলে পাশ ফিরে শুলো।

পর্মিলি যখন বাড়ি ফিরলো তখন বিকেল। পুণ্যশ্লোকবাবু অন্য কারো গাড়ি নিয়ে বেড়িয়ে গেছেন। সকাল কেন, কাল রাত থেকেই পর্মিলির মনটা বিষিয়ে উঠেছিল। বিষিয়ে উঠেছিল কারোর একলার বিরুদ্ধে নয়, মনে হয়েছিল সে নিজেই যেন নিজের সবচেয়ে বড় শত্রু। এতদিন শুধু মিথ্যের পেছনে সে ছুটে বেড়িয়েছে। মনে হচ্ছিল, যারা তার আপনজন তারা যেন তার আপন নয়। আর যারা পর তারাও যেন কোনও দিন তার আপন হবে না।

রঘু সামনে এসে দাঁড়ালো—দিদিমণি, খাবেন না?

পর্মিলি বললে—না, আমাকে এক বালতি গরম জল দিতে বল বাথরুমে—

তারপর যেন একটা কথা মনে পড়ে গেল, বললে—হ্যাঁ রে, বাবা আমাকে খুঁজেছিল?

—হ্যাঁ, বাবু জিজ্ঞেস করেছিলেন গাড়ি কোথায় গেল।

—বাবা গেলেন কী করে?

—প্রজেশবাবুর গাড়িতে, প্রজেশবাবু গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গেলেন।

পর্মিলি নিজের ঘরের দিকে যেতেই রঘু বললে—আপনার চিঠি এসেছে একটা—

পর্মিলি হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিয়ে দেখলে আমেরিকা থেকে এসেছে। ফিলাডেলফিয়ার ছাপ রয়েছে।

খামটা ছিঁড়তেই দেখলে চিঠি লিখেছে সুব্রত! সুব্রত লিখেছে, তার কোর্স শেষ হয়ে গেছে। আসছে আগস্টে ইণ্ডিয়ায় ফিরবে—

সুব্রতর চিঠিটা পেয়ে পর্মিলির যেন বড় ভাল লাগলো।

যে-সময়ে সংসারে, সংসারের বাইরে সমস্ত কিছু তার বিরুধে শত্রুতা করছে বলে মনে হচ্ছিল, ঠিক সেই সময়েই সুব্রতর চিঠি আসাটাকে যেন আশীর্বাদ বলে মনে হলো। মনে হলো এখনও এমন একজন আছে যে তার পক্ষে। সুব্রতই যেন একমাত্র মানুষ যে তাকে বাঁচাতে পারে।

রঘু আবার ঘরে এল। বললে—দিদিমণি, বাবু আপনাকে টেলিফোনে ডাকছেন—

পর্মিলিকে ডাকছে পুণ্যশ্লোকবাবু! পর্মিলি উঠে গিয়ে পাশের ঘরে টেলিফোন ধরলে।

—হ্যালো!

ওধার থেকে পুণ্যশ্লোকবাবুর মোটা গলার আওয়াজ হলো—কে? পর্মিলি? কোথায় গিয়েছিলে? কখন এলে?

পর্মিলি উত্তর দিলে—এই এখুনি।

—কিন্তু কোথায় গিয়েছিলে?

—একটা বিশেষ কাজে!

পুণ্যশ্লোকবাবু যেন ভ্রূকুটি করলেন। বললেন—বিশেষ কাজে? তোমার আবার বিশেষ কাজ কী? যদি বিশেষ কাজই ছিল তো আমাকে বলে গেলে না কেন? আমার নিজেরও তো বিশেষ কাজ ছিল। তুমি জানো আমি ব্যস্ত লোক। আমার অনেক কাজ। অনেক দিক আমাকে সামলাতে হচ্ছে। একা আমি কত দিক দেখবো? এর ওপর আবার যদি তোমাকে সামলাতে হয় তো সে আমার পক্ষে এক মহা বিপদ! তুমি এখন বড় হয়েছ, তুমি সবই বোঝ—

পর্মিলি বললে—আর কিছু বলবে তুমি আমাকে?

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—কেন, আমার কথাগুলো কি তোমার খারাপ লাগছে?

পর্মিলি বললে—হ্যাঁ, খারাপ লাগছে।

—কেন, খারাপ লাগছে কেন? আমি কি তোমাকে অন্যায় কিছু বলেছি? তোমার জন্যে কি আমি ভাবি না? তুমি কোথায় যাও, কেন যাও তা আমাকে ভাবতে হয় না?

পর্মিলি বললে—আমার কথা তুমি আর ভেবো না—

—কেন ভাববো না? তোমার জন্যে ভাবাই তো আমার ডিউটি।

পর্মিলি বললে—বার বার কেন ওসব কথা বলছো? আমার ওসব কথা শুনতে ভালো লাগে না।

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—ঠিক আছে, পরে আমি তোমার সঙ্গে কথা বলবো। সামনে ইলেকশান, তাই নিয়ে আমি এখন খুব ব্যস্ত আছি—আমি ফোন ছেড়ে দিলাম—

পুণ্যশ্লোকবাবু টেলিফোনের রিসিভারটা রেখে দিলেন। দিয়ে কিছুক্ষণ যেন নির্জীব হয়ে রইলেন। তারপর ঘরের অন্য লোকদের দিকে চেয়ে দেখলেন। সবাই জটিল তর্ক জুড়ে দিয়েছে। ইলেকশানে পার্টি থেকে টাকা না দিলে খরচ চালানো যাবে না।

তা খরচ দেবার জন্যে লোকও আছে। তারা খরচ দিতেও চায়। তারা খরচ দিয়েই কৃতার্থ। যত লাগে। দু' লাখ তিন লাখ টাকার কমে ইলেকশান হয় না। গোয়েঙ্কারা কটন মিল বানায়, সুগার মিল বানায়, কলকাতার বড় রাস্তার ধারে দশতলা, এগারোতলা বাড়ি তৈরি করে। সব কাজের সুরাহার জন্যে মিনিষ্টারদের ইলেকশানের খরচও জোগায়।

—মিষ্টার রায়. আপনি গাড়ি আনেননি?

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—না, মেয়ে নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল।

—আপনার মেয়ে? মেয়ের গাড়ি কী হলো?

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—আমার মেয়ের গাড়িটা যে পুড়িয়ে দিয়েছে ওরা। মেয়ের জন্যে আর একটা গাড়ি কিনতে হবে।

গোয়েঙ্কাজী এতক্ষণ পাশে বসে শুনছিল। বললে. সে কি রায় সাহেব, আমার কোম্পানীর ছ'টা গাড়ি রয়েছে, আপনি একখানা নিয়ে যান, ড্রাইভার ভি দিয়ে দিচ্ছি—

একখানা গাড়ির দাম আর কত! বারো হাজার কি তেরো হাজার! ওর বেশি কোনও গাড়ির দাম ছিল না তখন। সেই গাড়িরও ডবল দাম উঠে আসে যদি একটা এক্সপোর্ট লাইসেন্সের পারমিট পাওয়া যায়। একটা ইমপোর্ট লাইসেন্সের পারমিটের ব্ল্যাক দাম দু' লাখ টাকা, আর হোয়াইট দাম তার দশ ভাগের এক ভাগ। আসলে যে-কোনও একটা পারমিট পেলেই হলো। তার জন্যে শুধু গাড়ি কেন, তোমাকে একটা বাড়িও করে দিতে পারি। যতদিন ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ছিল ততদিন আমরা কিছুই করতে পারিনি। তখন কংগ্রেসকে লাখ-লাখ টাকা চাঁদা দিয়েছিলুম কীসের জন্যে? দেশ স্বাধীন করবার জন্যে? ঝুট্ বাত্। আমরা চাঁদা দিয়েছিলাম নাফা বানাবার জন্যে। কংগ্রেসকে আমরা তুলেছি আমাদেরই গরজে। কারণ কংগ্রেসরাজ হলে আমরাই নাফা বানাবো। কটন মিল সুগার মিল, জুট মিল বানাবো।

—আপনার গাড়ি কোথায় গোয়েঙ্কাজী?

গোয়েঙ্কাজী শশব্যস্তে উঠে দাঁড়ালো। বললে—এখ্খুনি টেলিফোন করে দিচ্ছি কোম্পানীতে, গাড়ি এসে যাবে।

এমনি করেই ভোটের আগে শকুনেরা এগিয়ে আসে শ্মশানের দিকে। তারা সবকিছু লুটপাট করে নিতে চায়। শুধু খবরটা পাওয়া চাই যে ভোট এসেছে। তারা তার জন্যে তৈরিই থাকে আগে থেকে। তখন হরির লুঠ চলে হাটে-বাজারে। টাকার হরির লুঠ। তখন মাথাপিছু পাঁচ টাকা রেট ক্যানভাসারদের। বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে শুধু বলতে হবে—আপনারা দয়া করে পুণ্যশ্লোকবাবুকে ভোট দেবেন—

যদি কেউ জিজ্ঞেস করে—কেন. পুণ্যশ্লোকবাবুকে ভোট দিতে যাবো কেন মশাই? তিনি আমাদের কী উব্কারটা করেছেন?

ভলান্টিয়াররা পাঁচ টাকা রোজের চাকর।

তারা বলে—তিনি দেশের জন্যে নিজের সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন, লাখ-লাখ টাকা চ্যারিটি করেছেন, আর ছ' সাত বছর জেল খেটেছেন!

কিন্তু যারা ভোটার তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার বুদ্ধিমানও হয়। তারা এক-একজন জিজ্ঞেস করে—তার মেয়েটা অত মদ খায় কেন মশাই? বিলিতি মদ?

এই সব ক্ষেত্রে প্রজেশ ঝাঁপিয়ে পড়ে। সে বলে—দেশের কাজের জন্যে যিনি নিজেকে উৎসর্গ করেছেন, তাঁর কি সংসারের দিকে নজর থাকে? মহাত্মা গান্ধী কি নিজের ছেলেদের মানুষ করবার সময় পেয়েছিলেন? সি আর দাশের ছেলে কি মানুষ হয়েছিল? সংসারের দিকে যদি পুণ্যশ্লোকবাবু দেখবার সময় পেতেন তো দেশের কাজ আর করতে পারতেন না। আমাদের দেশব্রতী পুণ্যশ্লোক রায়—সেই পুণ্যশ্লোকবাবুকেই আপনারা ভোট দিন। দেশব্রতীর স্বপ্ন সফল করুন—

কথাটা পছন্দ হয় অনেক ভোটারের। তারা হাততালি দিয়ে ওঠে। বলে—লোকটা ঠিক বলেছে—

প্রজেশ আসতেই পুণ্যশ্লোকবাবু উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞেস করেন—কী খবর? হাওয়া কোনদিকে, কিছু বুঝছো?

প্রজেশ বলে—আপনি নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমোন, আমি আজকের মীটিং-এ হাওয়া ঘুরিয়ে দিয়ে এসেছি। নাইনটি পারসেন্ট ভোট আপনার বাঁধা।

—বাঁধা তো?

পুণ্যশ্লোকবাবু ড্রয়ার থেকে তাড়া তাড়া নোট বার করেন। বার করে প্রজেশের দিকে এগিয়ে দেন।

বলেন—এগুলো তুমি রাখো প্রজেশ!

—এত টাকা কী হবে? ওদের পাঁচ টাকা করে মাথাপিছু রোজ তো দিচ্ছি—

পুণ্যশ্লোকবাবু বলেন—আরে সেটা তো ওদের মজুরি। আরো কিছু রাখো। একটু আগেই গোয়েঙ্কাজী আমাকে দিয়ে গেল। ওর পাপের টাকা অন্ততঃ একটা পুণ্য কাজে খরচ হোক।

বলে হো-হো করে হেসে উঠলেন।

প্রজেশ চলে যাচ্ছিল। পুণ্যশ্লোকবাবুর একটা কথা মনে পড়লো।

বললেন—হ্যাঁ, পর্মিলি আজকাল কী বলছে? সেই রকম মনমরা হয়েই আছে নাকি?

প্রজেশ বললে—না, আজকাল আর কোথাও বেরোয়-টেরোয় না—

—বেরোয় না তো কী করে সময় কাটায়?

প্রজেশ বললে—আমিও তো তাই বলি, একটু একটু বাইরে যাওয়া উচিত। একেবারে বাড়ির মধ্যে বসে থাকলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে!

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—তা তো বটেই, একটু একটু বেরোতে বলো ওকে। মাঝে মাঝে তুমি একটু ওকে নিয়ে বেরোও না!

প্রজেশ বললে—আমি যে সময় পাচ্ছি না মোটে। আমার এখনও দশটা পাড়া বাকি আছে—

—আর, ওই বৌবাজারের দিকটা? ওখানে তো সলিড ভোট আমার বাঁধা—

প্রজেশ বললে—বৌবাজারের জন্যে ভাবছি না। ওটা কংগ্রেসের স্ট্রং হোলড্—

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—আর কোথাও যায়-টায় এখন পর্মিলি? সেই যেখানে যেত?

প্রজেশ বললে—কই, দেখি না তো? আমি তো জগন্নাথকে জিজ্ঞেস করি। জগন্নাথের খুব আরাম। কোনও কাজই করতে হয় না তাকে। গাড়িও আইড্‌ল্

পড়ে থাকে—

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—আমার সঙ্গেও তো আর তেমন কথা বলে না। কী যে করে, বুঝতে পারি না। এরকম করলে তো চলবে না বেশি দিন! তবে একটা সুখবর, সুব্রত আসছে—

—তাই নাকি?

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—হ্যাঁ। পর্মিলিকে চিঠি লিখেছে। সামনের আগস্টেই আসবে। আমি চিঠি লিখে দিয়েছি তাড়াহুড়ো করবার দরকার নেই। যদি আরো কিছুদিন থাকতে চায় তো থাকুক। ইচ্ছে হলে কনটিনেন্টটা ঘুরে দেখে আসুক। ততদিনে আমার ইলেকশানের ঝামেলাটাও মিটে যাবে। তখন আমি ফ্রি থাকবো—

পর্মিলি সিঁড়ি দিয়ে নামছিল। সেদিকে পুণ্যশ্লোকবাবুর নজর পড়লো।

পুণ্যশ্লোকবাবু সোজা মেয়ের দিকে এগিয়ে গেলেন।

বললেন—এ কী, হঠাৎ কোথায় চলেছো?

পর্মিলির মুখটা গম্ভীর।

বললে—বাইরে—

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—দ্যাটস্ গুড। তোমার কাছে টাকা আছে তো?

পর্মিলি বললে—আছে—

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—তাড়াতাড়ি ফিরো কিন্তু পর্মিলি, আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করবো।

পর্মিলি সে কথার কোনও উত্তর দিলে না। অনেক দিন পরে বেরোচ্ছে সে। জগন্নাথ গাড়ি নিয়ে তৈরি ছিল। পুণ্যশ্লোকবাবু ও প্রজেশ দু'জনেই চেয়ে দেখলেন। পর্মিলি খুব সেজেছে আজকে।

পর্মিলি গাড়িতে উঠতেই জগন্নাথ গাড়িতে ষ্টার্ট দিলে।

পুণ্যশ্লোকবাবু জিজ্ঞেস করলেন—পর্মিলি কোথায় গেল বলো তো প্রজেশ?

প্রজেশ বললে—আমিও তো সেই কথাই ভাবছি।

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—দেখ তো, আমি ইলেকশানের দিকে মন দেবো, না মেয়ের দিকে মন দেবো বুঝতে পারছি না। বেশ মন দিয়ে পলিটিকস্ করবো তারও উপায় নেই মেয়ের জ্বালায়।

তারপর বললেন—এদিকে আজকের কাগজ দেখেছ তো?

প্রজেশ ঠিক বুঝতে পারলে না। বললে—কোন্ খবরটার কথা বলছেন? এনকোয়ারি কমিশন?

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—হ্যাঁ, এনকোয়ারি কমিশন কেন যে ডাক্তার রায় বসাচ্ছেন বুঝতে পারছি না। আমাদের যখন মেজরিটি রয়েছে হাউসে, তখন কাকে আমরা কেয়ার করি? পুলিশ আমাদের হাতে, মিলিটারি আমাদের হাতে, তবু কাকে ভয়? দেশের মানুষ তো সব ভেড়া। এমনকি, খবরের কাগজগুলো পর্যন্ত আমাদের দলে।

প্রজেশ বললে—যাক গে স্যার, তা নিয়ে ভাবনার কী আছে? ওসব কিছু ভাববেন না। আমি নিজে সাক্ষী জোগাড় করে দেবো। এক-একজনের হাতে কিছু গুঁজে দিলেই হবে'খন। নাম-কো-ওয়াস্তে হোক না, তাতে আমাদের ক্ষতি কী?

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—না, ক্ষতি কিছুই নেই, শুধু একটু ঝামেলা—

প্রজেশের তখন অনেক কাজ। সে তাড়াতাড়ি তার গাড়ি নিয়ে চলে গেল।

কলকাতার ইতিহাসে সেই উনিশশো ছাপ্পান্ন সাল বড় জটিল সাল। আট বছর হলো ইণ্ডিয়া স্বাধীন হয়েছে। আট বছরের মধ্যে অনেকগুলো ড্যাম হয়েছে, ব্যারেজ হয়েছে, দামোদর ভ্যালি করপোরেশন হয়েছে। বাইরে থেকে যে-সব বিদেশী ডেলিগেট ইণ্ডিয়া দেখতে এসেছে, তারা এসব দেখে অবাক হয়ে গেছে! কংগ্রেস এই আট বছরের মধ্যেই তো অনেক কাজ করে ফেলেছে।

এ তো গেল বাইরের চেহারা।

কিন্তু ভেতরের চেহারাও অনেক বদলে গিয়েছে। যারা পাকিস্তান থেকে এখানে এসেছে তারা এখনও থাকবার জায়গা পায়নি। খাবার রুজি-রোজগার জোগাড় করবার সংস্থান পায়নি। শেয়ালদ' আর হাওড়া স্টেশনে উদ্বাস্তুরা যেন চিরস্থায়ী বাসা-বাড়ি তৈরি করে বসে পড়েছে। ওঠবার নাম করছে না।—উঠলে যাবো কোথায় তাই আগে বলে দাও!

এক-একটা মিছিল বেরোয় রাস্তায় আর ঠিক রাজভবনের সামনে গেলেই পুলিশ লাঠি মেরে তাদের সরিয়ে দেয়। কিন্তু পরদিনই আবার সেখানে আর একটা দল মিছিল করে হাজির হয়। তারাও লাঠির ঘায়ে পালিয়ে যায়।

তা যাক, কিন্তু দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রীট থেকে শুরু করে ঢাকুরিয়া পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চলে সুখদা, সুরেন, টুলু, প্রজেশ, পর্মিলি, পুণ্যশ্লোকবাবুরা তখন বিচ্ছিন্নভাবে কলকাতার বুকে আঁকড়ে থেকে আর এক কলকাতাকে আবিষ্কার করবার চেষ্টা করে। মাথার ওপর ডাক্তার রায়। কিন্তু তাঁর তখন পঁচাত্তর বছর বয়েস।

একজন পারিষদ গিয়ে বলে—স্যার, এবার আপনাকে একটু পাড়ায় ঘুরতে হবে।

কথাটা যেন বিশ্বাস হয় না ডাক্তার রায়ের। বাঙলাদেশের জন্যে সারা-জীবন ধরে তিনি এত করে এলেন, আর এখন কিনা তাঁকে হাতজোড় করে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট চাইতে হবে!

—ওসব আমার দ্বারা হবে না হে!

—কিন্তু তা না করলে আপনার পক্ষে জেতা একটু মুশকিল হবে!

—কী রকম?

—হ্যাঁ স্যার, আপনাদের সে কলকাতা আর তেমন নেই। আমূল বদলে গেছে! পার্টিশান হবার পর থেকেই বদলেছিল, এখন একেবারে অন্যরকম অবস্থা। লোক এখন বেপরোয়া। কংগ্রেসের নাম শুনলে হাসে।

—তাই নাকি?

বৌবাজার বনেদী পাড়া। সেখানকার বাঙালীরা পুরুষানুক্রমে ওই একই পাড়ায় বাস করে আসছে। কিন্তু তারাও যেন আর তেমন চিরাচরিত জিনিসকে শ্রদ্ধা দেখাতে পারছে না। তাদেরই সামনে দিয়ে যখন লাল-ফ্ল্যাগ নিয়ে বড় বড় মিছিল ধর্মতলার দিকে যায়, তখন ডাক্তার বিধান রায়ের বাড়ির সামনে গিয়ে যেন বেশি করে চেঁচায়।

বলে—মুখ্যমন্ত্রী জবাব দাও
নয়তো গদি ছেড়ে দাও॥

তারপর সন্ধ্যেবেলা আবার তারা ওই পথ দিয়েই ফেরে। একেবারে রাস্তা কাঁপিয়ে চিৎকার করতে করতে শ্যামবাজারের মোড়ে গিয়ে থামে।

সুরেন বেরোচ্ছিল। ভূপতি ভাদুড়ী বললে—আবার কোথায় যাচ্ছিস? দুর্বল শরীরে না-ই বা গেলি?

সুরেন বললে—একটু যাবো আর চলে আসবো।

বলে হাঁটতে হাঁটতে ট্রাম রাস্তায় গিয়ে পৌঁছুলো। এ-আবার কাদের মিছিল? এ-কোন পার্টি?

একজন বললে—পি-এস-পি—

কত রকম পার্টিই হলো। সবাই চায় সরকারকে হঠাতে। একটা ট্রাম আসছিল এদিকে। সুরেন সেটাতেই উঠে পড়লো; তারপর সুকীয়া স্ট্রীটের মোড়ের কাছে আসতেই নেমে পড়লো। পুণ্যশ্লোকবাবু দেখতে পেলে নিশ্চয় জিজ্ঞেস করবেন—এতদিন কোথায় ছিলে?

তখন কী উত্তর দেবে সুরেন?

আস্তে আস্তে সে রাস্তা দিয়ে এগোতে লাগলো। পুণ্যশ্লোকবাবুর বাড়ির সামনে গিয়ে দেখলে, সেই একটা পুলিশ যথারীতি টুলের ওপর বসে আছে। সুরেনকে চেনে, কিছুই বলবে না হয়তো তাকে। কিন্তু যদি জিজ্ঞেস করে তো সে বলবে, পুণ্যশ্লোকবাবুর মেয়ে পর্মিলির সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। পর্মিলি নিশ্চয়ই বাড়িতে আছে।

পর্মিলির সঙ্গে দেখা করে সে সেদিনকার সমস্ত ঘটনাটা বুঝিয়ে বলবে। বুঝিয়ে বলবে টুলুর কথা। টুলুর সঙ্গে তার সম্পর্কের কথাটা সে পরিষ্কার করে দেবে। টুলুকে সে ডাকেনি। টুলু নিজের থেকেই যদি আসে তো তাতে সুরেনের দোষ কী?

সুরেন সোজা গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। পুলিশটা তাকে কিছুই বললে না। বাগানের রাস্তা পেরোলেই পোর্টিকো। পোর্টিকোর নিচেয় দাঁড়িয়ে কাউকে দেখবার চেষ্টা করলে। কিন্তু কেউ কোথাও নেই। পুণ্যশ্লোকবাবুর ঘরটা খোলা। সেখানে গিয়ে দেখলে হরিলোচন মুহুরী একমনে নিজের কাজ করছে।

তারপর আবার বাইরে বেরিয়ে এল।

হঠাৎ রঘুকে দেখা গেল।

—রঘু, দিদিমণি আছে?

রঘু বললে—না তো, দিদিমণি বেরিয়ে গেছে।

সুরেন বললে—দিদিমণি বাড়িতে এলে বলে দিও আমি এসেছিলুম—

বলে সুরেন আবার গেটের দিকে হাঁটতে লাগলো। না-ই বা দেখা হলো, অন্ততঃ পর্মিলি তো জানবে সে এসেছিল। সেইটেই যথেষ্ট। আস্তে আস্তে গেটের কাছে আসতেই হঠাৎ একটা গাড়ির সঙ্গে মুখোমুখি হলো। গাড়িটাও আসছিল ভিতরে। সুরেন চেয়ে দেখলে গাড়ির ভেতরে পর্মিলি।

সুরেন গাড়িটাকে পথ দেবার জন্যে একপাশে সরে দাঁড়াতেই গাড়িটা সেখানে থেমে গেল।

পমিলিও তাকে দেখতে পেয়েছিল।

দাঁড়ানো গাড়িটার ভেতর থেকে মুখ বাড়িয়ে পমিলি জিজ্ঞেস করলে—তুমি?

সুরেন বললে—তোমার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছিলুম।

—আমার সঙ্গে? কেন?

পমিলি গাড়ির দরজা খুলে বাইরে নামলো। বললে—আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলে কিসের জন্যে? আমার সঙ্গে কী দরকার!

সুরেন বললে—আগেই আমার আসা উচিত ছিল পমিলি, আমি আগেই আসতুম, কিন্তু এতদিন শরীরটা দুর্বল ছিল খুব। এখনও খুব দুর্বল, তবু না এসে পারলুম না—

পমিলি বললে—সে তো দেখতেই পাচ্ছি, কিন্তু কেন?

সুরেন বললে—সেদিন তুমি অমন করে চলে এলে কেন? তুমি জানো না, তুমি চলে আসার পর থেকে আমি এ ক'দিন রাত্তিরে মোটে ঘুমোতে পারিনি—

পমিলি বললে—তুমি ভেবেছ ওই কথা শুনলে আমি সব অপমান ভুলো যাবো?

—অপমান? অপমানের কথা বলছো কেন? কে তোমাকে অপমান করেছে? আমি?

পমিলি বললে—দেখ, অনেক দিন থেকে তোমাকে দেখে আসছি। ভেবো না আমি তোমাকে চিনতে ভুল করেছি। তোমার সঙ্গে আমার অবস্থার অনেক ফারাক আছে। তোমরা গরীব, আমি ঘটনাচক্রে বড়লোক হয়ে জন্মেছি। আর সেই জন্যে তোমার সঙ্গে আমার মনের গঠনেরও অনেক ফারাক। কিন্তু তবু ভাবতুম, হয়ত এক-জায়গায় কোথাও আমরা মিলতে পারি। নইলে তোমার সঙ্গে আমার কীসের সম্পর্ক?

সুরেন বললে—তা আমি জানি।

পমিলি বললে—যদি তুমি তা জানো তাহলে কেন আবার আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছ? আমার সঙ্গে তোমার কীসের দরকার?

সুরেন বললে—শুধু দরকারটাই কি সব? দরকার ছাড়াও তো মানুষ আরো অনেক কিছু চায়?

পমিলি বললে—বলো, কী চাও তুমি আমার কাছে?

সুরেন বললে—আমি ক্ষমা চাই—

পমিলি বললে—ক্ষমা?

সুরেন বললে—আমি জানি না আমি কী অপরাধ করেছি। তবু অপরাধই যদি না করবো তো তুমিই বা অমন রাগ করে তখন চলে এলে কেন? যা হোক, তুমি অমন করে চলে আসার পর থেকে আমি আর শান্তি পাচ্ছি না। যেমন করে হোক, আমাকে তুমি একটু শান্তি দাও পমিলি, আমি অন্ততঃ একটু বাঁচি! আমাকে তুমি বলে দাও আমি কী করি?

পমিলি বললে—তুমি এখন যাও সুরেন, আমার মনটা এখন খুব ক্লান্ত, আমি একটু একলা থাকতে চাই—

সুরেন বললে—তুমি তো একলা থাকবে, তোমার একলা থাকার অনেক সুবিধে, জীবনে তুমি অনেক পেয়েছ, হয়ত আরো অনেক পাবে, কিন্তু আমি?

পমিলি বললে—তোমার মুখ থেকে ওসব কথা আমার শুনতে ভালো লাগে না। আমার সামনে ও-কথা আর কখনও বোল না। তুমি এখন যাও—

সুরেন বললে—আমি তো থাকতে আসিনি পমিলি, চলেই যাবো। তার আগে শুধু তুমি বলো, আমাকে তুমি ক্ষমা করেছ?

পমিলি বললে—তা আমি ক্ষমা করলেই তোমার স্বর্গ লাভ হবে?

সুরেন বললে—তোমার মুখের কথাটাই আমার কাছে যথেষ্ট। তারপর আমি আর কিছু চাইব না—

—কিন্তু তার আগে একটা কথা বলো দিকিনি, তুমি কি নিজে নিজেকে ক্ষমা করতে পারবে?

সুরেন খানিকক্ষণ পমিলির মুখের দিকে চেয়ে রইল। মনে হলো পমিলি যেন তার চোখের সামনে একটা প্রহেলিকা হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

বললে—আমার কথা বলছো? কিন্তু আমার নিজের কথা তো আমি কখনও ভাবিনি। আজ তোমার কথা ভেবেই আমি এখানে চলে এসেছি।

পমিলি বললে—আমি তো তোমাকে আগেই বলে দিয়েছি, তোমার সঙ্গে আমার আর কোনও সম্পর্ক নেই। আমিও তোমার কেউ নই, তুমিও আমার কেউ নও।

সুরেন বললে—কিন্তু সম্পর্ক তো আগেও কিছু ছিল না।

পমিলি বললে—যেটুকু সম্পর্ক ছিল তাও তুমি সুব্রতর বন্ধু বলে। আর কিছু নয়।

সুরেন বললে—তাই যদি হয় তো এখনও তো আমি সুব্রতর বন্ধুই আছি। সুব্রত এখানে নেই বলেই কি সে সম্পর্ক ঘুচে গেল?

পমিলি সে কথার কোনও উত্তর দিলে না। শুধু বললে—তোমার অসুখের খবরটা পেয়েই তোমাদের বাড়িতে গিয়েছিলুম। কিন্তু দেখলুম তোমার সেবা করবার লোকের অভাব নেই।

সুরেন বললে—এ কথার উত্তর এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেওয়া যায় না—

পমিলি বললে—আমি তো এর উত্তর তোমার কাছ থেকে চাইনি। আর এত-দূর কষ্ট করে আমাদের বাড়িতে এসে দেখা করতেও বলিনি। তোমার নিজেকে অপরাধী মনে হয়েছে তাই তুমি এসেছ—

সুরেন বললে—অপরাধী মনে হবে না? আমার বাড়িতে গিয়ে অকারণে টুলুর সঙ্গে ঝগড়া করে এলে, সে বেচারা কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি চলে গেল, এ তো আমারই অপরাধ।

পমিলি বললে—তাই বুঝি তুমি তোমার টুলুর হয়ে সাফাই গাইতে এসেছ?

সুরেন বললে—সত্যিই তার কোনও দোষ নেই পমিলি। সে খুব গরীব মেয়ে। দেবেশদের পার্টিতে কাজ করে। কাজ করে সামান্য কিছু টাকা পায়। তার সঙ্গে তোমার তুলনাই হয় না। তার কথায় তুমি রাগ কোর না।

পমিলি বললে—আমি যদি রাগই করি তো তোমার কী?

সুরেন বললে—এও তোমার রাগের কথা। তুমি শুধু এইটুকু জেনে রাখো পমিলি, সংসারে আমি যেমন অনাথ, সেও প্রায় তেমনিই। তার বা আমার ওপর রাগ করলে আমাদের দু'জনেরই গায়ে লাগে। তার চেয়ে এক কাজ করি। একদিন না হয় তাকে তোমার কাছে নিয়ে আসবো, সে নিজের মুখেই তোমাকে সব খুলে বলবে, তোমার কাছে ক্ষমা চাইবে।

পমিলি বললে—না, ওরকম কেলেংকারি যেন কখনও কোর না, আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি—

সুরেন বললে—না, তুমি আপত্তি করতে পারবে না, দেখবে সে কত ভাল

—তোমার সঙ্গে তার কতদিনের পরিচয় ?

সুরেন বললে—বেশি দিন নয়, কিন্তু অল্প দিনেই বুঝতে পেরেছি বাঙলা-দেশে ওদের সংখ্যাই বেশি। ওদের দেখলেই বোঝা যায় বাঙালীরা কত গরীব। ওদের অবস্থা ভাল না হলে বাঙলাদেশের অবস্থাও কখনো ভাল হবে না তা জানো ? ওর বাবা অন্ধ, ওর ছোট বোনটা পরের বাড়িতে ঝি-গিরি করে—অথচ ওরাও তো একদিন ভদ্রলোক ছিল, ওদেরও ভালো কাপড়-জামা পরতে ইচ্ছে করে, ভালো খাবার খেতে ইচ্ছে করে!

পর্মিলি হঠাৎ বললে—তুমি হঠাৎ ওদের প্রোসেশানে গিয়েছিলে কেন ?

সুরেন জিজ্ঞেস করলে—কেন, গিয়ে কি খুব অন্যায় করেছি ?

পর্মিলি বললে—কিন্তু সেদিন যদি পুলিশের গুলীটা তোমার বুকে গিয়ে লাগতো ?

সুরেন বললে—সে-কথা কি আর আমি ভাবিনি ভাবছো? অনেকবার ভেবেছি। কিন্তু জানি না তুমি বুঝবে কিনা, ওদের সঙ্গে মিশে আমার কেবলই মনে হয়েছে, শুধু খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার মধ্যে কোনও সার্থকতা নেই মানুষের। কারোর জন্যে কিছু করতে পারলে, মানুষের কোনও কাজে লাগলে যেন আমি বেঁচে যাই। আমি সেই বাঁচতেই গিয়েছিলুম ওদের সঙ্গে—

—কিন্তু তুমি জানো, ওরা আমার গাড়িটাও পুড়িয়ে দিয়েছে?

সুরেন বললে—আমি তা পরে শুনলাম, শুনলাম তাতে তোমার কোনও ক্ষতি হয়নি, ক্ষতি হয়েছে তোমার গাড়িটার। কিন্তু সে-গাড়ির টাকা তো ইন্সিওরেন্স কোম্পানী দেবে—

পর্মিলি বললে—তা দেবে ঠিক, কিন্তু আমার নিজেরও তো ক্ষতি হতে পারতো ?

সুরেন বললে—সে কথাও ভেবেছি, কিন্তু দেখ, ভাবলে তো অনেক কথাই ভাবা যায়। বন্যা যখন আসে, তখন তাতে বাঘ-ভাল্লুকও ভেসে যায়, মানুষও ভেসে যায়। তাতে তোমার রাগ করা উচিত নয়।

পর্মিলি বললে—এত কথা তোমায় বুঝি ওই টুলুই শিখিয়েছে ?

সুরেন বললে—তা কেন, আমিও তো টুলুকে ওসব কথা শেখাতে পারি—। আর তাছাড়া, এসব কাউকে শেখাতে হয় না। এসব কথা হাওয়ায় ভাসে আজ-কাল। কলকাতার মানুষ তো সব দেখতে পাচ্ছে, সবই শুনতে পাচ্ছে—। শুধু তুমিই চোখ বুজে রয়েছ। কারণ চোখ বুজে থাকা ছাড়া তোমার কোনও উপায়ও নেই—

—কেন ? কেন উপায় নেই ?

সুরেন বললে—পুণ্যশ্লোকবাবু মিনিস্টার, তাঁর মেয়ে হয়ে এসব কথা হয়ত শোনাও পাপ।

পর্মিলি বললে—হ্যাঁ, পাপই তো! তা না হলে বাবার সঙ্গে আমার দিন-রাত ঝগড়া হচ্ছে কেন ?

সুরেন অবাক হয়ে গেল। বাবার সঙ্গে দিন-রাত ঝগড়া করছে পর্মিলি ?

পর্মিলি বললে—বাবা আমাকে গাড়ি দিয়েছে, কলকাতার পাঁচটা ক্লাবের মেম্বর করে দিয়েছে, অজস্র টাকা দিয়েছে, যা-কিছু করবার স্বাধীনতা দিয়েছে, এসব নিয়েই ঝগড়া।

কথা বলতে বলতে বাগান দিয়ে বাড়ির দিকে এগিয়ে চলছিল পর্মিলি। সুরেনও সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছিল।

হঠাৎ পমিলি বললে—কিন্তু তবু কিছুই ভালো লাগে না আমার তা জানো? বাবার সঙ্গে ঝগড়া করি, অথচ বাবার এ-বাড়ি ছেড়ে কোথাও চলে যাবারও উপায় নেই। আমি যে কী করি!.

সুরেন বললে—কেন, বাড়ি ছেড়ে তুমি চলে যাবেই বা কেন?

পমিলি বললে—তুমিই বা বার বার বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে চেয়েছ কেন?

সুরেন বললে—তোমার সঙ্গে কি আমার তুলনা?

পমিলি বললে—বাইরে থেকে তুলনা করা যায় না বটে, কিন্তু আসলে ও একই। কিছুই আমার ভালো লাগে না। বাবা তো নিজের কেরিয়ার নিয়েই মশগুল! কিন্তু আমি? আমি কী নিয়ে কাটাই?

সুরেন বললে—আমার মামাও তো আমাকে সেই কথাই বলে। বলে—মা-মণি মারা যাবার পর সব সম্পত্তি যখন আমার হয়ে যাবে, তখন সেই সব সম্পত্তি দেখা শোনা করাও তো একটা কাজ! সেই কাজ করেই নাকি আমি সময় পাবো না—

পমিলি বললে—আমার তা নয়। আমি ক্লাবে গিয়ে দেখেছি, ড্রিংক করে দেখেছি, ফ্লার্ট করে দেখেছি। কলকাতায় আমাদের সমাজের মেয়েরা যা করে সময় কাটায় আমি সব করে দেখেছি। দেখেছি সব ভুয়ো, ওতে শান্তি নেই। আমি একেবারে ফেড্‌আপ্‌ হয়ে গেছি—

সুরেন বললে—তোমার সঙ্গে আর একটা কথা ছিল পমিলি, বলবো?

—কী কথা? ইলেকশানের কথা?

সুরেন বললে—জানি না তুমি আমার কথা রাখবে কিনা—

পমিলি বললে—বলোই না, কী কথা?

সুরেন বললে—দেখছিলুম একটা এনকোয়ারি কমিশন বসাতে রাজী হয়েছে ডাক্তার বিধান রায়। ওই সেদিনকার পুলিশের গুলী চালানো নিয়ে—

পমিলি বললে—হ্যাঁ, আমি তা দেখেছি—

সুরেন বললে—ওই সম্বন্ধেই একটা কথা বলতে চাই। তুমি তো নিজে সমস্ত জিনিসটা দেখেছ।

পমিলি বললে—হ্যাঁ—

সুরেন বললে—শুধু একটা অনুরোধ করবো তোমাকে, তুমি যদি ওখানে সাক্ষী হও—

পমিলি বললে—আমি সাক্ষী হলে তোমার কী লাভ?

সুরেন বললে—আমি আমার লাভের কথা ভাবছি না। আমার মত কলকাতার আরো অনেকের তাতে লাভ। আমি চাই যেটা সত্যি ঘটনা সেটা অন্ততঃ লোকে জানুক, আর কিছু নয়।

পমিলি বললে—আমাকে এ অনুরোধ করতে কে তোমাকে বলেছে? দেবেশ?

সুরেন বললে—দেবেশ তো জেলে। তাছাড়া অন্য কে আর আমাকে বলবে? আমি নিজে থেকেই বলছি।

হঠাৎ বাইরে থেকে একটা গাড়ি এসে ঢুকলো। সুরেন চেয়ে দেখলে গাড়ি চালাচ্ছে প্রজেশ সেন।

সুরেন পমিলির দিকে চেয়ে বললে- তাহলে এবার আমি যাই—

কিন্তু ততক্ষণে প্রজেশ গাড়ি থেকে নেমে এসেছে। সুরেনের দিকে চেয়ে প্রজেশ বললে—একি মিস্টার সান্ন্যাল, তুমি?

পমিলি প্রজেশের দিকে চেয়েও বললে—একি, তুমি যে এখন?

প্রজেশ বললে—তোমার জন্যেই এলুম। কোথায় ছিলে সারাদিন? সব

জায়গায় তোমার খোঁজ নিলুম। কোথাও তুমি নেই। মিস্টার রায় তো খুব ভাবনায় পড়েছিলেন তোমার জন্যে। তা মিস্টার সান্যালের সঙ্গে বেরিয়েছিলে বুঝি?

সুরেন বললে—না, আমি তো এখনই এলুম—

পর্মিলি বললে—ওর সঙ্গে যদি বেরিয়েই থাকি তো দোষের কী?

প্রজেশ নিজেকে সামলে নিয়ে বললে—না না, আমি কি তাই বলছি?

পর্মিলি বললে—হ্যাঁ, তুমি তো তাই-ই বলছো। কথা ঘুরিয়ে লাভ কী? দেখ প্রজেশ, একটা কথা তোমাকে বলে রাখছি, আমার কোনও ব্যাপারে তুমি ইনটারফিয়ার করতে এসো না। খবরদার, আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, আমি আর তাহলে তোমাকে সহ্য করবো না। আমি যেখানে যখন খুশী যাবো, যার সঙ্গে ইচ্ছে বেরোব, তাতে তোমার কিছু বলবার রাইট নেই। এই কথাটা তুমি মনে রেখো—

প্রজেশ সেন পর্মিলির কাছ থেকে আচম্‌কা এই আঘাত পেয়ে আম্‌তা আম্‌তা করে কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই পর্মিলি তাকে থামিয়ে দিলে।

বললে—স্টপ্ দ্যাট্, আর কোনও কথা তোমার শুনতে চাই না, গেট আউট—গেট আউট—

প্রজেশ ভয় পেয়ে গেল।

বলতে গেল—পর্মিলি আমি...

পর্মিলি চিৎকার করে উঠলো—আই সে, নো টক্, গেট আউট ফার্স্ট—

প্রজেশ ভয়ে দু'পা পিছিয়ে আসছিল—

পর্মিলি আবার চিৎকার করলে—গেট আউট, গেট আউট অফ্ মাই সাইট, গেট আউট—

পর্মিলির এই রূপ সুরেন আগে কখনও দেখেনি। ভয়ে সে থরথর করে কাঁপতে লাগলো। একবার এগিয়ে গিয়ে বললে—পর্মিলি, থামো, থামো, আমারই দোষ, আমি চলে যাচ্ছি—

পর্মিলি রাগের মাথায় সুরেনের সার্টের কলার ধরে পাশে সরিয়ে দিয়ে বললে—তুমি থামো—

তারপর তেড়ে গেল প্রজেশের দিকে। বললে—গেট আউট স্কাউন্ড্রেল, গেট আউট—

প্রজেশ আর উপায় না দেখে গাড়িতে উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই গোয়েঙ্কাজীর দেওয়া নতুন গাড়িটা চড়ে পুণ্যশ্লোকবাবু ভেতরে ঢুকে পড়েছেন। সামনের কাণ্ডটা দেখে তিনি বুঝেছিলেন যে, একটা কোন বিপর্যয় ঘটে গেছে।

তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমেই মেয়ের দিকে চেয়ে বললেন—কী হয়েছে, কী? প্রজেশকে গেট আউট বলছো কেন? ও কী করেছে পর্মিলি?

পর্মিলির বোধহয় তখনও রাগ পড়েনি। সে তখনও প্রজেশের দিকে চেয়ে চিৎকার করে বলছে—গেট আউট প্রজেশ, আই সে গেট আউট—

পুণ্যশ্লোকবাবু মেয়ের হাতটা ধরে ফেললেন। বললেন—কাকে কী বলছো পর্মিলি? ও যে প্রজেশ—

পর্মিলি তখন রাগে ফুলছে। সে বললে—আগে ও বেরিয়ে যাবে, তবে আমি উত্তর দেবো তোমার কথার। ও আগে বেরিয়ে যাক।

—কিন্তু ও কী করেছে তা বলবে তো?

পর্মিলি সে কথার উত্তর না দিয়ে বললে—ও আগে বেরিয়ে যাক, স্কাউণ্ড্রেলটা কেবল আমাকে পেস্টার করতে আসে। ও ভেবেছে কী, আমি ওকে বিয়ে করবো? আমি যদি সুরেনের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে যাই তাতে ওর কী বলবার আছে? হু ইজ হি?

সুরেন আর সবটা শুনলো না। সবটা শোনবার আগেই সে সকলের অলক্ষ্যে নিঃশব্দে বাগান পার হয়ে গেট দিয়ে বাইরের রাস্তায় এসে পড়লো। তারপর অস্পষ্ট অন্ধকারের মধ্যে দুর্বল শরীরটা নিয়ে গা ভাসিয়ে দিলে। তার মনে হতে লাগলো, কেন সে এ সময়ে এসেছিল পর্মিলিদের বাড়িতে! সে যদি না আসতো তো এসব কোনও ঘটনাই আর ঘটতো না। পর্মিলি যা বলেছে হয়ত তাই-ই ঠিক, হয়ত এই সব কারণের জন্যেই পর্মিলির কিছু ভালো লাগে না। এই জন্যেই হয়ত সে বাড়ি থেকে মাঝে মাঝে বাইরে পালিয়ে যায়। এই জন্যেই হয়ত সে এত দুঃখ করছিল।

ভাবতে ভাবতে প্রায় ট্রাম-রাস্তার কাছে এসে পড়েছিল। এমন সময় পুণ্যশ্লোকবাবুর চাকর এসে ডাকল—দাদাবাবু—দাদাবাবু—

সুরেন পেছন ফিরতেই তাকে চিনতে পারলে। বললে—কী?

চাকরটা বললে—আপনাকে বাবু ডেকেছেন?

—কেন?

—তা জানি না।

সুরেন আবার ফিরলো। তাকে হঠাৎ পুণ্যশ্লোকবাবু কেন আবার ডাকতে গেলেন? তাকে দিয়ে তাঁর কীসের দরকার?

বাগানে ঢুকে কিন্তু কাউকে দেখা গেল না। চাকরটা বললে—বাবু ভেতরে—

পুণ্যশ্লোকবাবুর ঘরে ঢুকতেই দেখলে, পুণ্যশ্লোকবাবু বসে আছেন। ঠিক তার পাশেই প্রজেশ সেন। আর পেছন দিকে হরিলোচন মুহুরী একমনে নিজের কাজ করছে। কিন্তু পুণ্যশ্লোকবাবুর মুখটা যেন অন্য দিনের চেয়ে আরো গম্ভীর।

সুরেন ঢুকতে অন্য দিনের মত পুণ্যশ্লোকবাবু তাকে বসতেও বললেন না। শুধু গম্ভীর গলায় বললেন—দেখ, এরপর থেকে আর কোনও দিন যেন তোমায় আমার এই বাড়ির মধ্যে না দেখি।

সুরেন চুপ করে কথাগুলো শুনছিল।

পুণ্যশ্লোকবাবু আবার বললেন—এই শেষবার। বুঝলে?

তবু সুরেন কোনও কথার উত্তর দিলে না।

পুণ্যশ্লোকবাবু টেবিলের ওপর একটা ঘুষি মারলেন জোরে। বললেন—কথার জবাব দিচ্ছ না কেন? শুনতে পেয়েছ, না শুনতে পাওনি?

সুরেন বললে—হ্যাঁ, শুনেছি।

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—এই তোমায় লাষ্ট ওয়ার্নিং দিচ্ছি। আর যদি কখনও তোমাকে দেখতে পাই এখানে তো তোমাকে আমি এ্যারেস্ট করিয়ে দেবো। আমার গেটের পুলিশকেও আমি সেই অর্ডার দিয়ে দেবো। থানাতেও আমি এখন সেই অর্ডার দিয়ে দিচ্ছি। যাও—

সুরেন আর দাঁড়ালো না। পেছন ফিরে আস্তে আস্তে আবার সে সেই বাগান পেরিয়ে গেট দিয়ে রাস্তায় পড়লো। মাথার ভেতর পুণ্যশ্লোকবাবুর শেষ কথাগুলো তখনও গুঞ্জন করছে : এই তোমাকে আমি লাষ্ট ওয়ার্নিং দিয়ে

দিচ্ছি, আর যদি কখনও তোমাকে এখানে দেখতে পাই তো আমি তোমাকে এ্যারেস্ট করিয়ে দেবো। আমার গেটের পুলিশকেও আমি সেই অর্ডার দিয়ে দেবো। থানাতেও আমি এখন সেই অর্ডার দিয়ে দিচ্ছি, যাও—

এ সেই ১৯৫৬ সালের কথা। ভারতবর্ষের ইতিহাস তখন অনেক সংগ্রামের পথ মাড়িয়ে নতুন স্বাধীনতার সূর্যোদয় দেখছে। কলকাতার মানুষ, ভারতবর্ষের ভগ্নাংশ হলেও দিল্লী, গুজরাট, বোম্বাই, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ তখনও ঘুমিয়েই আছে। তারা শুধু জেনেছে ইণ্ডিয়া স্বাধীন হয়েছে। ইণ্ডিয়াতে ফাইভ-ইয়ার-প্ল্যান হয়েছে। আরো কিছুদিন ধৈর্য ধরো। আরো কিছুদিন কম খাও, আরো কিছুদিন পরিশ্রম করো, তখন তোমাদের প্রত্যেকের ঘর-বাড়ি হবে, প্রত্যেকে পেট ভরে খেতে পাবে—

এসব কথাগুলো যাদের জন্যে বলা তারা নেহরুজীর কথায় বিশ্বাস করলো। তারা একবারও প্রশ্ন করলে না, তোমরা কেন ধৈর্য ধরছো না। তোমরা কেন মন্ত্রী হবার জন্যে হুড়োহুড়ি করছো। তোমাদের মন্ত্রিত্ব বজায় রাখবার জন্যে তোমরা কেন তোমাদের বশংবদদের লাইসেন্স-পারমিট দেবার ব্যস্ততা দেখাচ্ছো। তারা একবারও প্রশ্ন করলে না, তোমরাও কি কম খাচ্ছো? তোমরাও কি পরিশ্রম করছো?

ওরা প্রশ্ন করলে না বটে, কিন্তু প্রশ্ন করলে বাঙালী জাতি।

তাই বাঙলাদেশেই প্রথম গজিয়ে উঠলো একাধিক পার্টি। এই সব পার্টির মেম্বাররা একদিন কংগ্রেসেরই মেম্বার ছিল। কিন্তু এবার তারা কংগ্রেস ছেড়ে দিলে। তারা বললে—কংগ্রেস হলো বিড়লা-গোয়েঙ্কার দালাল—

ডাক্তার বিধান রায়ের কানেও কথাটা গেল। সবাই জিজ্ঞেস করলে—তাহলে কী হবে ডাক্তার রায়?

ডাক্তার রায় বললেন—কথাটা তো মিথ্যে নয়—যারা এতদিন কংগ্রেসকে টাকা দিয়ে হেলপ্ করে এসেছে, এখন ইংরেজরা চলে যাবার পর তারা ঘাড়ে চেপে বসবেই। তাদের আর ঠেকানো যাবে না।

—তাহলে?

ডাক্তার রায় বললেন—এখন পার্টি ভেঙে যাবে—

পুণ্যশ্লোকবাবু জিজ্ঞেস করলেন—তাহলে আপনি কী করতে বলেন?

ডাক্তার রায় বললেন—তাহলে'র কথা আমি ভাববো না, সে তোমরা ভাববে। আমার তো এই শেষ টার্ম। আমি অত দিন বাঁচবোই না—

সেই থেকেই সবাই বুঝতে পেরেছিল যে, দিন ঘনিয়ে আসছে। দেবেশই খবরটা দিয়েছিল সুরেনকে। সুরেন বাড়িতে নিজের বিছানায় শুয়ে ছিল। হঠাৎ একদল লোক এসে হাজির। বললে—ভূপতি ভাদুড়ীবাবু আছেন?

ভেতরে খবর গেল। যেতেই ভূপতি ভাদুড়ী এসে হাজির।

—আপনার নামই ভূপতি ভাদুড়ী? আমরা এসেছি ভোটের ব্যাপারে?

—ভোট? ভূপতি ভাদুড়ী অবাক হয়ে গেল। ভোট হচ্ছে নাকি?

ভূপতি ভাদুড়ী ভোটের মত অনাবশ্যক ব্যাপারে বড় একটা মাথা ঘামায় না। ভদ্রলোকরা গোটাকতক কাগজ দিলে। ছাপানো কাগজ।—এগুলো পড়ে

দেখবেন। আর কংগ্রেস সম্বন্ধে বোধহয় আর কিছু বলতে হবে না আপনাকে। আপনি বিবেচক লোক, সবই তো জানেন! এই কংগ্রেসের জন্যে কত মানুষ জীবন দিয়েছে। কত পরিবার সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছে, সে তো আপনার মতন শিক্ষিত লোকের জানতে বাকি নেই। আর পুণ্যশ্লোকবাবুর মত সর্বত্যাগী দেশনায়কের কথা আর বেশি করে কী বলবো। তিনি ওকালতি করতেন। ওকালতিতে প্রচুর উপার্জন করতেন। এই কংগ্রেসের ডাকেই তিনি সব ত্যাগ করে এখন দেশ-সেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন। আগের বারে আপনারা এই পুণ্যশ্লোকবাবুকেই ভোট দিয়েছিলেন, এবারও আশা করি আপনারা তাঁকে ভোট দিতে ভুলবেন না—

—আচ্ছা, লাবণ্যময়ী দাসীর নাম রয়েছে ভোটার্স-লিস্টে। বয়েস পঁচাত্তর। ইনি আছেন তো?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—আছেন না তো যাবেন কোথায় মশাই? তাঁরই তো নিজের বাড়ি এটা। কিন্তু তিনি শয্যাশায়ী, ভোট দিতে যেতে পারবেন না—

ভদ্রলোকরা বললে—তাতে কী হয়েছে? আমরা তাঁকে পোলিং-বুথে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করবো। আমরা গাড়ি আনবো তাঁর জন্যে। স্ট্রেচার আনবো, ডাক্তার আনবো। আপনাদের কিচ্ছু ভাবনা নেই—

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—না না, সেসব হবে না মশাই, ডাক্তার একেবারে নাড়াচাড়া করতে বারণ করে দিয়েছে—

এমন সময় হঠাৎ সুরেনের সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে গেল।

—আপনি?

—তুমি?

প্রজেশও অবাক হয়ে গেছে। সুরেনও অবাক।

প্রজেশ বললে—এটা তোমাদের বাড়ি নাকি?

সুরেন বললে—হ্যাঁ, আমি তো এই বাড়িতেই থাকি।

—তাহলে এই লাবণ্যময়ী দাসী কে তোমার?

সুরেন বললে—আমার মা-মণি!

—কী রকম মা-মণি?

সুরেন বললে—আমার নিজের কেউ নয়। কিন্তু ইনি আমার নিজের পরমাত্মীয়ের চেয়েও বড়। আমার নিজের মা নেই, তাই আমি এঁকেই আমার মায়ের মত দেখি!

প্রজেশ বললে—ও—

ঠিক এই প্রজেশের সামনেই সেদিন পুণ্যশ্লোকবাবু তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন তা যেন প্রজেশ ভুলেই গেছে, এমনি ভাব। সুরেন ভালো করে চেয়ে দেখলে প্রজেশ সেনকে। এ যেন অন্য মানুষ একেবারে। এরাই বোধহয় সত্যিকারের দালাল। অন্যদিন স্যুট পরে থাকে। আজকে ভোট চাইবার সময় খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবি পরেছে, চটি পরেছে। ভোট শেষ হবার পর আবার এরা কোট পরবে, প্যাণ্ট পরবে, তখন আর কাউকে চিনতেই পারবে না আবার।

—আচ্ছা, এই যে সুখদা দাসীর নাম দেখছি। ইনি আছেন তো?

সুরেন বললে—না—

—ইনি কোথায়?

উত্তরটা দিলে ভূপতি ভাদুড়ী। বললে—সে তার শ্বশুরবাড়িতে গেছে। তার বিয়ে হয়ে গেছে—

প্রজেশ সেন দলবল নিয়ে চলে যাচ্ছিল। বাইরে তাদের গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। ভূপতি ভাদুড়ীও সঙ্গে সঙ্গে গেল।

উঠোনের মধ্যে সুরেন তখন একলা সেইদিকে তাকিয়ে দেখছিল। হঠাৎ পাশে এসে সুধন্য দাঁড়ালো। এতক্ষণ সেও কথাবার্তা সব শুনেছে। বললে—কেমন আছেন দাদা? শুনলাম পুলিশের গুলী লেগেছিল আপনার গায়ে!

সুরেন চিনতে পারলে। অনেকদিন পরে দেখা হলো।

বললে—বুড়োবাবুর খবর কী?

সুধন্য বললে—তাঁকে দেখতেই তো আসি রোজ। আর বেশি দিন নয়। আপনার কথা প্রায়ই বলেন। আপনি একবার দেখা করলেই তো পারেন!

সুরেন বললে—আমি তো এখনই যেতে পারি। চলুন না—

সুধন্য বললে—ওঁকে কেউ আর এখন দেখে না, জানেন? আজকাল আমি আর কাউকে কিছু বলি না, নিজেই ওষুধপত্র গেঞ্জি-ধুতি কিনে নিয়ে আসি ওঁর জন্যে।

হঠাৎ পেছন থেকে জোরে দেবেশের গলা শোনা গেল। সে হৈ-হৈ করতে করতে দল নিয়ে এসে হাজির।

বললে—কী ব্যাপার রে সুরেন? কেমন আছিস?

সুরেন দেবেশকে দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেছে। বললে—কবে জেল থেকে ফিরলি?

দেবেশ বললে—আজ। আজ ফিরেই তোর খবর পেলাম।

—কার কাছে?

দেবেশ বললে—টুলুর কাছে। তা তোর সঙ্গে টুলুর কী হয়েছে রে? তুই কী করেছিস?

তারপর বললে—ভোটের জন্যে বেরিয়েছি। পূর্ণবাবু এবার পুণ্যশ্লোক-বাবুর এগেন্স্টে!

সুরেন বললে—এই একটু আগেই পুণ্যশ্লোকবাবুর তরফ থেকে লোক এসেছিল। প্রজেশ সেনকে চিনিস তো? খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবি পরে একেবারে দিশি সাজে এসেছিল।

দেবেশ বললে—এবার আর পুণ্যশ্লোকবাবুর কোনও চান্স নেই। আমরা চারদিকে ক্যাম্পেন আরম্ভ করে দিয়েছি। মানুষ কংগ্রেসের ধাপ্পায় আর ভুলছে না এবার। তোর মামা কাকে ভোট দিচ্ছে?

সুরেন বললে—মামা ভাই সেকেলে লোক। কংগ্রেস ছাড়া কাউকে চেনে না। আর সব পার্টিকে বলে গুন্ডার দল। আমি সেদিন তোদের মিছিলে গিয়েছিলাম বলে খুব বকে দিয়েছে। কত চেষ্টা করলুম বাড়িটা ছাড়তে, কিন্তু দেখ না, আবার সেই এইখানেই আসতে হলো!

দেবেশ সুরেনকে ডেকে একটু আড়ালে টেনে নিয়ে গেল। সঙ্গের ছেলেরা একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইল। কাছেই সুধন্য দাঁড়িয়ে ছিল এতক্ষণ। দেবেশ জিজ্ঞেস করলে—ও ছোকরাটা কে রে?

সুরেন বললে—ও এ-বাড়ির কেউ নয়। এখানে ওর ভোটও নেই।

দেবেশ বললে—ভালোই হয়েছে। তোকে চুপি চুপি একটা কথা বলি। টুলুকে কী করেছিস বল তো তুই? সে আর আগেকার মত নেই। একেবারে বদলে গেছে। তোর কথা তাকে জিজ্ঞেস করলুম, সে বললে. সে কিছু জানেই না। তোর সঙ্গে কি তার আর দেখাই হয় না?

সুরেন সমস্ত ব্যাপারটা খুলেই বললে দেবেশকে। তারপর বললে—এতে আমার কী দোষ তাই বল? আমি তো কোনও অন্যায় করিনি। মাঝখান থেকে একটা ভুল-বোঝাবুঝি হয়ে গেল শুধু। সবাই আমাকে সারাজীবন ভুলই বুঝলে ভাই।

দেবেশ বললে—তা তোর কাছেই বা মেয়েরা এত আসে কেন? পর্মিলি হচ্ছে মিনিষ্টারের মেয়ে, অন্য পার্টির লোক তারা, তুই তো তার পায়ের নখের যুগ্যিও না, তবু কেন আসে? তুই দেখছি মাইরি কলির কেষ্ট একেবারে। কই, আমার কাছে তো কেউ আসে না! কোনও মেয়েছেলে আমার ছায়া পর্যন্ত মাড়াতে সাহস পায় না। আসলে তোরই হচ্ছে সব দোষ।

সুরেন বললে—আমার কী দোষ?

দেবেশ বললে—তাহলে কেন তুই পর্মিলির কাছে যাস? আমি তোকে বারণ করিনি যে, ওরা হচ্ছে অন্য ক্লাসের লোক। ওদের সঙ্গে আমাদের মিলবে না। তুই কি ভেবেছিস ও তোকে বিয়ে করবে? ওকে বিয়ে করে তুই ওর বাপের সম্পত্তি পাবি? সে গুড়ে বালি, তা বলে রাখছি।

সুরেন লজ্জায় আধমরা হয়ে গেল। বললে—দূর, তুই যে কী বলিস?

দেবেশ বললে—আমি যা বলি ঠিক বলি। দেবেশ কখনও কারো খাতির রেখে কথা বলে না। সত্যি কথা সোজা করে বলবো তাতে ভয় কী রে শুনি? এইবার ইলেকশানেই ঠ্যালা বুঝিয়ে দেবো। আর মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে না কংগ্রেসকে। এইবার এনকোয়ারি কমিশন বসে গেছে শুনেছিস তো? বিধান রায় বাপ-বাপ্ বলে রাজী হতে বাধ্য হয়েছে!

সুরেন বললে—কেন রাজী হলো বল তো?

দেবেশ বললে—ঠেলার নাম বাবাজী! লোককে আর কদ্দিন বাছাধনরা ধাপ্পা দেবে? লোকে এখন বলতে শুরু করেছে, কংগ্রেস-রাজত্বের চেয়ে ব্রিটিশ-রাজত্ব ভাল ছিল। নইলে শুনেছিস তো, যে বিধান রায় কখনও ভোটের সময় রাস্তার মাটিতে পা দেয়নি, এবার বৌবাজারে প্রত্যেক বাড়িতে বাড়িতে হাত জোড় করে ধর্ণা দিতে শুরু করেছে। এরই নাম হলো গুঁতো। বন্দুক দিয়ে কি আর মানুষের পেট ভরানো যায়?

তারপর প্রসঙ্গ বদলে বললে—তোকেও ক্যানভাসিং-এ নামতে হবে ভাই। বাড়ি বাড়ি ঘুরতে হবে আমাদের সঙ্গে—

সুরেন বললে—তা ঘুরবো!

দেবেশ বললে—আর এবার যেদিন আসবো, সেদিন তোকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবো টুলুদের বাড়ি। না বলতে পারবি না। টুলুর কাছে তোকে ক্ষমা চাইতে হবে, এই বলে রাখলুম। বার বার পর্মিলির বাড়িতে যেতে পারিস আর টুলুর বাড়িতে তো একবারও যেতে পারলি না। কেন, টুলরা গরীব বলে?

তারপর একটু দম নিয়ে বললে—এই তোকে আজকে ফোরকাস্ট করে যাচ্ছি, এই বেটাদের দিন ঘনিয়ে এসেছে! তখন ওই পুণ্যশ্লোক রায় রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করে বেড়াবে। তখন লবচবানি বেরিয়ে যাবে পর্মিলির। তখন কোথায় থাকবে গাড়ি, শাড়ি আর লিপষ্টিক, তা দেখে নেব—

কথা বলতে বলতে অনেকক্ষণ সময় কেটে গিয়েছিল। দেবেশ বললে—এবার যাই, তুই একটু ভালো হয়ে ওঠ, তখন তোকে নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরবো—এখন চলি—

বলে যেমন হৈ-হৈ করতে করতে এসেছিল, তেমনি আবার হৈ-হৈ করতে

করতে চলে গেল।

সুধন্য তখন নেই আর। কেউই নেই। উঠোনটা ফাঁকা। সুরেন দেবেশদের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ! দেবেশ লেখাপড়া শিখলো না, চাকরি-বাকরিও নিলে না। অথচ কোথা থেকে ওই অত মনের জোর পায়! পুণ্যশ্লোক-বাবু রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করবে! কী বলে ও? এতদিন জেল খেটে, গুলী খেয়ে, লাঠি খেয়েও একটু দমলো না। যত বয়েস বাড়ছে, ততই যেন হৈ-চৈ করা বেড়ে যাচ্ছে দেবেশের!

আর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়লো টুলুর কথা!

বড়লোক বলেই কী সেদিন সে পমিলির বাড়িতে গিয়েছিল! আর গরীব বলেই টুলুর বাড়িতে যায়নি। হয়ত কথাটা মিথ্যে নয় দেবেশের। হয়ত সত্যিই। সেই জন্যেই তো সুরেনকে ওই শাস্তিটা পেতে হলো। ওদের বাড়িতে যাওয়াটা চির-কালের মত বন্ধ হয়ে গেল। পুণ্যশ্লোকবাবু তাকে শেষবারের মত তাড়িয়ে দিয়েছে বাড়ি থেকে। আর কখনও দেখা হবে না পমিলির সঙ্গে। পমিলির সঙ্গে তার সব সম্পর্ক চিরকালের মত ছিন্ন হয়ে গেল।

দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রীটের গলির মধ্যেকার জীবন বড় জটিল। এর আগে সুখদা আর একটা গলিতে দিন কাটিয়েছে। কিন্তু সে এ-রকম নয়। এখানে দিনের বেলা কোনও বিশেষ সাড়া-শব্দ থাকে না, কিন্তু সন্ধ্যে হবার পর থেকে একেবারে অন্য চেহারা। এ ব্রিটিশ আমলেও যেমন ছিল, এখন এই ১৯৫৬ সালের কংগ্রেস আমলেও তাই। হুবহু একরকম। কোনও তফাত নেই।

সেই বুড়ি ঝি-টা রোজই আসে। এসে সুখদাকে আদর করে।

বলে—কিছু ভেবো না দিদি। ভাবলে শুধু শরীরই খারাপ হবে। তার চেয়ে সাজগোজ করো। কালকের খোঁপা তোমার পছন্দ হয়েছিল তো? আজকে আবার অন্য রকম খোঁপা বেঁধে দেবো। এর নাম নাগর-ভোলানো খোঁপা—

বুড়িটা মন্দ নয়। নতুন নতুন কথা শোনায়। ভালো ভালো খাবার এনে দেয়। ঘি দিয়ে ভাজা পরোটা, তার সঙ্গে ডিম-চচ্চড়ি! এসব নতুন খাবারের নাম। এ নাম আগে কখনও শোনেনি সুখদা।

তারপর সাজগোজ হবার পর সেই মেয়েমানুষটা আসে। বেশ বয়েস হয়েছে তার। কিন্তু সেজেগুজে খোঁপা বেঁধে, মুখে রং মেখে বয়েসটাকে কমিয়ে রেখেছে।

এসেই বলে—ওমা, কী হলো? চুপ করে বসে কেন গো মেয়ে? রেডিওটা খুলে দাও না—

বলে নিজেই এগিয়ে গিয়ে আবার রেডিওটা খুলে দেয়। আর সঙ্গে সঙ্গে গান বেজে ওঠে।

মেয়েমানুষটা বলে—একলা থাকতে নেই, বুঝলে? মেয়েমানুষের একলা থাকতে নেই। একলা থাকলে মাথার মধ্যে যত উদভুট্টি ভাবনা আসে মা। ওতে মন খারাপ হয়ে যায়—

তারপরে হঠাৎ বুঝি সুখদার খোঁপাটার দিকে নজর পড়ে যায়। বলে—ওমা, এ কী খোঁপা বাঁধার ছিরি! এ কে বেঁধে দিয়েছে? ওলো, ও বুড়ি—বুড়ি—

বলে চিৎকার করে ডাকে বুড়ি-ঝিকে।

বুড়ি-ঝি আসতেই বলে—এ কী খোঁপার ছিরি গা বুড়ি? আমার মেয়েকে যে বাঙাল-বাঙাল দেখাচ্ছে। বলি আমার ভালো-মানুষ মেয়েকে পেয়ে যেমন-তেমন করে খোঁপা বেঁধে দিলেই হলো। খোঁপা হলো মেয়েমানুষের শোভা। সেই খোঁপা এমন করে বাঁধতে হয়?

বুড়ি-ঝি বলে—ওতো নাগর-ভোলানো খোঁপা মাসি—

মাসি সুখদার খোঁপাটা এক টানে খুলে ফেলে বলে—মর মাগী, এ খোঁপা দেখে নাগর ভুলবে না ছাই, নাগর ভেগে পালিয়ে যাবে। আমি বেঁধে দিচ্ছি—

বলে মাসি নিজেই সুখদার খোঁপা বাঁধতে বসে।

যেমন ইচ্ছে ওদের তেমনি করেই ওরা সাজিয়ে দেয়। দু'বেলা কলতলায় নিয়ে গিয়ে সারা গায়ে সাবান ঘষে-ঘষে চান করিয়ে দেয়।

মাসি বলে—আমার সামনে লজ্জা কোর না মা, আমি তোমার মাসি হই। আমি আবার নোংরা দেখতে পারি না। নোংরা আমার দু'চক্ষের বিষ।

তারপর চান করার পর শায়া-ব্লাউজ দেয়, শাড়ি দেয়। পাউডার, স্নো-ক্রীম-পমেটম্ দেয়।

ভিজে গামছা দিয়ে সিঁথি ঘষে-ঘষে সিঁদুরটা প্রথম দিনই মুছিয়ে দিয়েছিল।

মাসি বলে—ভাতার যখন দেখে না, তখন ভাতারের চিহ্ন না রাখাই ভাল মা, সেই যে কথায় আছে না, ভাত দেবার ভাতার নয়, কিল মারবার গোঁসাই, তোমার হয়েছে তাই। সে যখন তোমায় দেখে না, তুমি বাছা কেন তাকে দেখতে যাবে? বেশ করেছ এখেনে চলে এসেছ। গতর যখন রয়েছে অমন ভাতার তখন ঝুড়ি ঝুড়ি আসবে। ভাতারের ভাবনা কী মা—

বলে আলতার শিশিটা বার করে সুখদার পায়ে আলতা পরিয়ে দেয়।

পরাতে পরাতে বলে—আমি আবার নোংরা দেখতে পারিনে, নোংরা আমার দু'চক্ষের বিষ—

সন্ধ্যের আগে থেকেই সুখদার তোয়াজ শুরু হয়ে যায় বেশি করে। এমন আদর বোধহয় জীবনে মা-মণিও তাকে করেনি কখনও। তারপর একটু রাত হলেই ওদিককার ঘরগুলো থেকে গান-বাজনার শব্দ ভেসে আসে।

এটুকু সুখদা এই ক'দিনেই বুঝতে পেরেছে যে পাড়াটা আর যা-ই হোক, ভদ্রপাড়া নয়।

তারপর আবার একদিন ভূপতি ভাদুড়ী এল।

ঘরে ঢুকেই ভূপতি ভাদুড়ী বললে—কেমন আছ মা?

সুখদা বললে—ভালো—

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—পাড়াটা তো ভালো নয়। কিন্তু এরা লোক ভালো। সেই জন্যেই তোমাকে এখেনে রেখেছি। কোনও অসুবিধে হলেই মাসিকে ডাকবে, বুঝলে মা? মাসি বড় ভালো লোক, তোমাকেও খুব ভালো লেগেছে মাসির—

সুখদা জিজ্ঞেস করলে—মামলা আর কতদিন চলবে?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—মামলার জন্যে তোমাকে কিচ্ছু ভাবতে হবে না মা, সে তো আমি আছি। আর তুমি তো তোমার অপরাধ স্বীকার করেই নিয়েছো।

—তাতে কী হবে?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—তাতে কী আর হবে? কিছুই হবে না। বেকসুর খালাস করে দেবে! তোমার কম বয়েস, তার ওপর অন্য লোক তোমাকে উস্কে

দিয়েছে চুরি করতে। অপরাধ যারা করেছে, তারাই হলো আসল, তাদেরই শাস্তি হবে!

—সেই ছোড়দা? ছোড়দার কী হবে?

—নরেশ দত্তর কথা বলছো তো? নরেশ দত্তই তো আসল কাজের কাজী! তার তো দু'বছরের জেল হবেই। সে-ই তো আসল পাণ্ডা। ব্যাটা নিজেও ডুবলো, সকলকেও ডোবালে। ওই হারামজাদাই তো এত কাণ্ড করলে। নইলে তোমার মত ভালো মেয়ের এই দুর্দশা হয়? তা ভগবানও আছে মাথার ওপর। জজ শাস্তি দেবার আগে ভগবানই তাকে শাস্তি দিচ্ছে—

—কেন? কী শাস্তি দিচ্ছে?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—আরে তা বুঝি জানো না? তোমাকে তা বলাই হয়নি। সে যে মরো-মরো—

—মরো-মরো মানে?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—মানে, সে তো শুয়ে পড়ে আছে পক্ষাঘাতে। স্ট্রোক হয়েছে। চলতে পারে না, হাঁটতে পারে না, কথাও বলতে পারে না। হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে ভুগছে—কে বলে ভগবান নেই? ভগবান না থাকলে এমন হয়?

সুখদা খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। ভূপতি ভাদুড়ী বললে—তাহলে এখন আমি চলি মা, আমার আবার ওদিকে ঝঞ্ঝাট, মা-মণিরও তো ওদিকে অবস্থা খারাপ। তাকেও তো আমার দেখতে হচ্ছে। ডাক্তার-বদ্যি যা-কিছু সব তো আমাকেই করতে হবে।

—কথা বলতে পারে?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—কথা বললে তো তবু বুঝতুম! এ কথাও বলতে পারে না, উঠে বসতেও পারে না। কী যে কষ্ট হচ্ছে তাও বুঝতে পারি না। তরলাই সব করছে। আর একা তরলাই বা কত পারবে! আমাকেও সব দেখা-শোনা করতে হয়—

বলে ছাতাটা নিয়ে ভূপতি ভাদুড়ী বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

তারপর ভেতর-বাড়ির বারান্দায় আসতেই মাসি ধরেছে।

বললে—কী? কী বললে ছুঁড়ি?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—না, কোনও কষ্ট নেই আর। বেশ তো আরামেই আছে দেখলাম। ক'দিনের মধ্যে চেহারাটাও ফুলে-ফেঁপে উঠছে যেন।

মাসি বললে—তা ফাঁপবে না? গতর তো নাড়তে হচ্ছে না। এ ক'দিনে কত খরচ হয়ে গেল জানো ম্যানেজার! ডিম-মাংস-পরোটা, বসে বসে খাইয়ে যাচ্ছি। আরো শ'খানেক টাকা তোমাকে দিতে হবে বাপু!

—কেন, তোমাকে যে সেদিন টাকা দিয়ে গেলুম? সেসব ফুঁকে দিলে?

—আরে, সে তো দু'শো টাকা দিয়ে গিয়েছিলে মাত্তোর! সেই টাকায় এত ডিম-মাংস-পরোটা চলে? তারপর শাড়ি-ব্লউজ্-আলতা, স্নো-ক্রীম, সবই তো আছে। তারও তো দমকা খরচা আছে! না না, আরো শতখানেক টাকা না হলে আর ছাড়ছি নে, দাও, টাকা ছাড়ো—

ভূপতি ভাদুড়ী দু'পা পিছিয়ে এল।

বললে—আরে, আমি কি পালিয়ে যাচ্ছি নাকি? শ'খানেক টাকার জন্যে কি ভাবছো আমি পালিয়ে যাবো? অমন লোক আমাকে পাওনি—

তারপরে ট্যাঁক থেকে খুঁজে খুঁজে কয়েকখানা নোট বার করলে।

বললে—দ্যাখো, এতে ক'টা টাকা আছে, গুনে দ্যাখো—

মাসি টাকাগুলো হাতে নিয়ে গুনতে গুনতে গোনা শেষ করে বললে—এ তো তিরিশ টাকা। তিরিশ টাকায় আমার চলবে না। তাহলে বাপু আমি মেয়েকে ঘর থেকে বার করে দেবো—এই বলে রাখলুম—

ভূপতি ভাদুড়ী ভয় পেয়ে গেল। বললে—তুমি রাগ করছো কেন মাসি—তুমি আমাকে কিনা অবিশ্বাস করছো? আমি কি তেমন লোক?

মাসি ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো। বললে—আমার খুব লোক দেখা আছে। লোক দেখতে দেখতে আমি বুড়ো হয়ে গেলুম। আমায় আর তুমি লোক দেখিও না ম্যানেজার। বলে কত লোক এ-বাড়িতে এল-গেল! তুমি তো কোন্ ছার! টাকার বেলায় সব সমান! যে টাকার জন্যে নিজের বাড়ির মেয়েকে চোর বলে পুলিশে ধরিয়ে দিতে পারে, তাকে আবার বিশ্বাস কী গা? সে কেমনধারা লোক?

ভূপতি ভাদুড়ী এবার ভয় পেয়ে গেল আরো।

বললে—চুপ করো মাসি! চুপ করো। তুমি তো দেখছি আচ্ছা জাঁহাবাজ মেয়েমানুষ। তুমি দেখছি মানুষ খুন করতে পারো—

বলে আর একটা ট্যাঁক হাতড়ে অনেক কষ্টে আরো কুড়ি টাকা বেরোল। সে টাকাটা মাসির হাতে দিয়ে বললে—এই নাও, হলো তো?

মাসি বললে—এই কুড়ি আর তিরিশ মিলিয়ে তো মোট পঞ্চাশ টাকা হলো, আর বাকি পঞ্চাশ?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—আর নেই রে বাবা, দেবো কোত্থেকে? কাছে যে নেই আর—

মাসি বললে—তাহলে কাছাটা দেখি?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—এ তো ভারি মুশকিল হলো দেখছি। কাছা দেখবে কী গো? তোমার সামনে আমি কাছা খুলবো?

—হ্যাঁ, খোল। তোমাদের পুরুষমানুষদের বিশ্বাস নেই। তোমরা সব পারো। খোল কাছা—

তা কাছা খুলতেই কিন্তু আরো তিরিশটা টাকা বেরিয়ে পড়লো।

—এ টাকা কোত্থেকে এল শুনি? খুব যে বলছিলে আর টাকা নেই! এখন কোত্থেকে বেরোল টাকা?

সব মিলিয়ে আশি টাকা নিয়ে মাসি যেন খুশী হলো একটু। টাকাগুলো আঁচলে বাঁধতে বাঁধতে বললে—আর পাওনা রইল কুড়ি টাকা। ও টাকাটা কবে দেবে?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—সত্যি, লোকে যে তোমাদের বাঘ বলে তা মিথ্যে নয়। আরে, আমি পালিয়ে গেলে তোমার লোকসানটা কীসের? মাল তো তোমার ঘরে রইল। মাল ভাঙিয়ে ভাঙিয়ে খাবে।

মাসি বললে—অত সোজা নাকি? পোষ মানাতে হবে না? পোষ মানাবার খরচা নেই, খাটুনি নেই?

ভূপতি ভাদুড়ী অল্পের ওপর দিয়ে রেহাই পেয়ে দাঁড়ালো না আর। সোজা সিঁড়ি দিয়ে নেমে একেবারে রাস্তায় বেরিয়ে ছাতা খুলে আড়াল করে নিলে নিজেকে। তারপর ছাতায় মুখ ঢেকে চলতে লাগলো ট্রাম-রাস্তার দিকে। ভাগ্যিস পেটকাপড়ে হাত দেয়নি মাগীটা। সেখানেও শতখানেক টাকা লুকানো ছিল। পেটকাপড়ে হাত দিয়ে টাকাটা আছে কিনা একবার দেখে নিলে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। ওখানে রাখাটা নিরাপদ। কলকাতার রাস্তায় যা চোর-ডাকাত তাতে ওখানে না রাখলে কি থাকে?

তারপর ট্রাম আসতেই ভূপতি ভাদুড়ী চিৎকার করে উঠলো—একদম রোখকে, একদম রোখকে, বুড্‌ঢা আদমি হ্যায় বাবা, বহুত বুড্‌ঢা আদমি হ্যায়—

কিন্তু সেদিন অদ্ভুত একদল লোক এসে হাজির। এপাড়ায় নানা ধরনের লোক আসতে দেখেছে। কিন্তু এমন লোক আগে কখনও দেখেনি মাসি।

বেলা দশটা নাগাদ খবর গেল মাসির কাছে। মাসি তখন সবে চানটান সেরে চুল এলো করে দিয়ে পান সাজতে বসেছে।

বুড়ি-ঝি এসে বললে—কোথাকার বাবুরা এসেছে মাসি—

—বাবুরা? কোথাকার বাবুরা রে?

বুড়ি বললে—তা জানিনে।

—তা সেটা জেনে আয়। এত সকালে বাবুরা কি কখনও আসে? বাবুরা তো এখন বাড়িতে গিয়ে যে-যার ঘরে ঘুমোচ্ছে—এ-বাবুরা কোত্থেকে এসেছে জিগেস্ করে আয়—যা—

বুড়ি আবার গেল। আবার ফিরে এল।

বললে—ভোটের বাবুরা—তোমার সঙ্গে কথা বলবে—

ভোট! মাসি খানিকটা অবাক হয়ে গেল। ভোট আসছে নাকি আবার? বহু-দিন আগে একবার দল বেঁধে অনেক লোক এসেছিল পাড়ায় পাড়ায়। সেবার মাসি দলবল নিয়ে সেজেগুজে ভোট দিতে গিয়েছিল। এবার বোধহয় তাহলে আবার সেই ভোট এসেছে। মাসি গায়ের কাপড়টা ঠিক করে সামলে নিয়ে বসলো।

বুড়ি তিন-চারজন ভদ্রলোককে নিয়ে এল ঘরে।

প্রজেশ ছিল দলের পাণ্ডা। সে আগে ঘরে ঢুকলো।

বললে—মানদা দাসী কার নাম?

মাসি বললে—আমারই নাম বাবা—তা তোমাদের ভোট চাই বুঝি?

প্রজেশের পেছন পেছন তখন আরো সবাই ঘরে ঢুকে পড়েছে। অন্ধকার ঘর, কিন্তু খাটে আলমারিতে সব ঝকঝক, তকতক করছে। মানদা দাসীর যৌবনকালের মস্ত ফ্রেমে বাঁধানো ফটো দেয়ালে টাঙানো রয়েছে।

প্রজেশ বললে—না, আমরা ভোট চাইতে আসিনি, আমরা অন্য কাজে এসেছি—

মানদা দাসী হাসিমুখে বললে—কী কাজ বলো বাবা?

প্রজেশ বললে—আমরা জনাদশেক মেয়ে ভাড়া চাই—

মানদা দাসী বুঝতে পারলে না কথাটা। জিজ্ঞেস করলে—মেয়ে ভাড়া?

প্রজেশ বললে—হ্যাঁ, দশটা মেয়ে হলেই চলবে।

মানদা বললে—তা তো বুঝলুম। দশটা কেন, বিশটা মেয়ে মানদা দাসী যোগান দিতে পারে। মেয়ে আমার কাছে কম নেই বাবা। কিন্তু কাজটা কী?

প্রজেশ বললে—ভোট দিতে হবে—

—ভোট? আবার ভোট আসছে বুঝি?

প্রজেশ বললে—হ্যাঁ, সেই পাঁচ বছর আগে একবার ভোট হয়েছিল, আবার এবার সেই ভোট হচ্ছে। আমি যে-সব মেয়েদের নাম দেবো, সেই সব নামে নামে ভোট দিয়ে আসতে হবে।

মানদা দাসী বললে—তা মেয়ে যোগান দিতে পারবো না কেন? খুব পারবো। কত কাজে কত মেয়েদের যোগান দিই আমি, আর এ তো ছোট কাজ। গেল বারের ভোটেও তো আমি মেয়ে যোগান দিয়েছি। আমার এক-একটা মেয়ে দশটা-বারোটা করে ভোট দিয়ে এসেছে। কেউ কিছু ধরতে পারেনি।

প্রজেশ বললে—কিন্তু নানান বয়েসের মেয়ে চাই আমার। কেউ বুড়ি, কেউ কম বয়েসী, কেউ মাঝ বয়েসী। কিছু হিন্দুস্থানী, কিছু মারোয়াড়ী, সব রকম জাতের মেয়েমানুষ দরকার—

মানদা দাসী বললে—সব দিতে পারবো বাবা, তোমাদের কিচ্ছু ভাবতে হবে না। চীনে মেয়ে চাইলে চীনে মেয়ে পর্যন্ত দিতে পারি। টাকা দিলে আমি জাপানী মেয়ে পর্যন্ত যোগান দিতে পারবো—

এবার প্রজেশ হেসে ফেললে।

বললে—না না, তার দরকার হবে না—তাহলে কবে আসবো বলে দিন?

মানদা বললে—তোমাদের কবে দরকার তাই বলো-না। আমার বাড়িতে তো মেয়ে মজুতই আছে সব সময়। আমাকে একদিন আগে নোটিশ দিলেই চলবে—

প্রজেশ আর কিছু বললে না। দলবল নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল।

বুড়ি এতক্ষণ পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। বললে—বাবুরা কী করতে এসেছিল গা?

মানদা বললে—দূর মাগী, তোর এসব কথায় থাকার দরকার কী? দে, আমায় চা দে, ভোর থেকে এখনও ভালো করে চা মুখে দিতে পারলুম না, আজকাল তোদের কী যে চা-করা হয়েছে বুঝতে পারিনে বাপু! জপতপ করে উঠে একটু যে আয়েস করে চা খাবো, তোদের জন্যে তাও খাবার উপায় নেই—চা না তো যেন ঘোড়ার পেচ্ছাব—

বলে মোটা শরীরটা নিয়ে মানদা চেয়ার থেকে উঠে বিছানায় গা এলিয়ে দিলে।

এ সেই যুগ। এ সেই যুগের কথা লিখছি, যখন দেশের মানুষ সবে ঘুম থেকে উঠে জপতপ সেরে একটু ভালো করে চা খাবার জন্যে আকুলি-বিকুলি করছে। কোন্‌টা ভালো কোন্‌টা মন্দ তা বোঝবার মত বুদ্ধি তখনও হয়নি। একদিন ব্রিটিশরা এসেছিল। তারা রাজা হয়ে অনেক দিন কাটিয়ে গিয়েছে। তাদের আমলে কাউকে চাকরি দিয়ে, কাউকে বা খেতাব দিয়ে তারা তাদের দলে টেনে নিয়েছিল। কিছু লোক স্বদেশী করেছে, কিছু লোক আবার বোমা-বারুদ নিয়ে সাহেব খুন করেছে। বিদেশীর সম্পত্তি লুঠপাট করেছে। ব্রিটিশরা তাদের জেলে পুরেছে। আর নিজের দলের যো-হুজুরদের খেতাব দিয়ে খুশী করেছে। কাউকে রায়সাহেব, কাউকে রায়বাহাদুর, আবার কাউকে নাইট উপাধি। এসব বহুদিন ধরে চলে এসেছে।

কিন্তু তারা চলে যাবার পর থেকেই যত গণ্ডগোলের সূত্রপাত হলো। সবাই তখন দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রীটে ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন। রাতের পর রাত আসে আর আফিমের নেশায় বেশ আমেজ আসে শরীরে। চোখ খুলতে ইচ্ছে করে না কারো। শম্ভু চৌধুরীর বাড়ির ভেতরে বুড়োবাবু তক্তপোষটার ওপর চিত হয়ে

শুয়ে শুয়ে শুধু অন্তিম মুহূর্তের জন্যে অপেক্ষা করে থাকে। ভূপতি ভাদুড়ী শুধু সম্পত্তি হাতাবার মতলব নিয়ে ট্যাঁকে আর কাছায় তার সব ষড়যন্ত্র লুকিয়ে রাখে। পর্মিলিরা বার বার বিলাসের মধ্যে সব যন্ত্রণা ভোলবার জন্যে চেষ্টা করেও যন্ত্রণা না ভুলতে পেরে সেই যন্ত্রণায় ছটফট করে। আর কলকাতার লক্ষ লক্ষ লোক মিছিলের বাইরে দাঁড়িয়ে তামাসা দেখে। যেন চোখ দিয়ে সব কিছু দেখেও কিছুই দেখতে পায় না তারা। বুঝতে পারে না পুণ্যশ্লোকবাবু কোন্ উদ্দেশ্য নিয়ে ওকালতি ছেড়ে রাইটার্স বিল্ডিং-এর গদিতে গিয়ে বসেছেন। বুঝতে পারে না যাদবপুর ঢাকুরিয়ার লক্ষ লক্ষ লোক কেমন করে তাদের জীবিকা চালায়। আরো বুঝতে পারে না কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে এত লোক কেন রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামায়!

ঠিক এই সময়েই আরম্ভ হলো এই নাটক। জীবন-মৃত্যুর এই মর্মান্তিক পাঁচ অঙ্কের নাটক।

সকালবেলাই একেবারে সুরেন গিয়ে হাজির হয়েছে ঢাকুরিয়ায় টুলুদের বাড়িতে। কিন্তু সেখানে গিয়ে টুলুদের বাড়িতে দরজার কড়া নাড়তে হলো না। টুলুই সশরীরে বাড়ি থেকে বেরোচ্ছিল। সামনে সুরেনকে দেখে অবাক হয়ে গেল।

সুরেনও কম অবাক হয়নি টুলুকে এত সকালে বাড়ি থেকে বেরোতে দেখে।

—এত সকালে তুমি বেরোচ্ছ?

টুলু প্রথমটায় একটু আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বললে—হ্যাঁ, কিন্তু তুমি?

সুরেন বললে—কেন, তোমার কাছে আসতে নেই?

টুলু বললে—না, তা বলছি না! কিন্তু আমি ভেবেছিলাম আমার সঙ্গে বুঝি সব সম্পর্ক ত্যাগ করলে! অবশ্য আমারই সেদিন অন্যায় হয়েছিল, তাও তোমার কাছে স্বীকার করছি—

সুরেন বললে—তোমার কিছু অন্যায় নেই টুলু! দেবেশের সঙ্গে সেদিন দেখা হয়েছিল। সে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে আমাদের বাড়ি ভোট ক্যানভাস করতে এসেছিল। তাকেও আমি এই কথাই বলেছি। তাই আজ ঘুম থেকে উঠেই ভাবলুম তোমার সঙ্গে দেখা করতে যাই—

টুলু বললে—ভালোই করেছ, চলো—

—কোথায়?

টুলু বললে—ওই ভোট ক্যানভাস করতে—

সুরেন জিজ্ঞেস করলে—কোন্ দিকে? আমাদের পাড়ায়?

টুলু বললে—সে অফিসে গিয়ে যেমন হুকুম হবে তেমনি করবো। পূর্ণদা দাঁড়িয়েছে, তা তো জানো?

সুরেন বললে—শুনলাম। পুণ্যশ্লোকবাবুর বিরুদ্ধে—

টুলু বললে—হ্যাঁ। এখন আমাদের জীবন-মরণ সমস্যা।

সুরেন বললে—চলো, আমিও সঙ্গে চলি—

টুলু বললে—কিন্তু তোমার তাতে ক্ষতি হবে না তো কিছু?

সুরেন বললে—ক্ষতি? আমার ক্ষতি হবে কেন?

—পুণ্যশ্লোকবাবুর বিরুদ্ধে ক্যামপেন করলে পুণ্যশ্লোকবাবু নিশ্চয় রাগ করবেন তোমার ওপর। তাছাড়া পুণ্যশ্লোকবাবু না রাগ করুন, পুণ্যশ্লোক-বাবুর মেয়ে তো রাগ করতে পারে?

—পমিলি? পমিলির কথা বলছো?

টুলু বললে—আমি জানতুম না যে উনি পুণ্যশ্লোকবাবুর মেয়ে। তাহলে আমি কিছুই বলতুম না। দেবেশদা আমাকে সব বললে!

—দেবেশ তোমাকে বলেছে? আর কী বলেছে?

—দেবেশদা বলেছে, ওর সঙ্গে তোমার নাকি অনেকদিন থেকে জানাশোনা। অনেকদিন থেকেই তুমি নাকি ওদের ব্যাড়ি যাও—! সত্যিই বলছি আমি এসব কিছুই জানতুম না। জানলে আর আমি সেদিন অমন করে তোমাদের বাড়ি বসে থাকতুম না, উনি ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গে আমি উঠে চলে আসতুম।

বাস এসে গিয়েছিল। বাসের ভিড়ের মধ্যে টুলু কোথায় মেয়েদের জায়গায় গিয়ে বসে পড়লো। আর কোনও কথা হলো না টুলুর সঙ্গে। টুলুদের অফিসের সামনে আসতেই টুলু বললে—এসো, এখানে নামো—

সুরেন নেমে পড়লো টুলুর পেছন পেছন। অনেক দিন পরে আবার দেবেশ-দের অফিসে এসেছে। ঠিক সেই আগেকাব চেহারা। এতটুকু বদলায়নি।

সুরেন বললে—এবার আমি যাই টুলু—

টুলু খপ করে সুরেনের হাতটা ধরে ফেললে। বললে—যাবে কেন? এসো—

সুরেন বললে—তোমাদের ওদিকেই যাবো আমরা আজকে—একটু দাঁড়াও—

হঠাৎ দেবেশও হৈ-হৈ করতে করতে এসে গেছে।

—একী রে, তুই?

সুরেন বললে—টুলুদের বাড়িতে গিয়েছিলুম। সেখান থেকেই আসছি। টুলু জোর করে টেনে নিয়ে এল—

দেবেশ বললে—একটু দাঁড়া, আসছি—

বলে ভেতরে চলে গেল। সকালবেলাই নানা ধরনের লোক এসে জুটে গেছে। সবাই যেন খুব ব্যস্ত! দেয়ালের গায়ে পোস্টার আঁটা রয়েছে সার সার। আজ পর্যন্ত যত পোস্টাব ছাপা হয়েছে সবগুলো ঘরময় আঁটা রয়েছে। সুরেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেগুলো দেখতে লাগলো। ইতিহাসের পাতা থেকে সব ঘটনাগুলো যেন পোস্টারের মধ্যে এসে ঠাঁই নিয়েছে।

হঠাৎ ভেতরে যেন হট্টগোল আরো বেড়ে গেল। সবাই যেন খুব আনন্দ করতে শুরু করেছে। সুরেন কিছু বুঝতে পারলে না। কীসের আনন্দ ওদের? কী হয়েছে হঠাৎ? আওয়াজটা যেন আরো বাড়তে লাগলো ক্রমে!

দেবেশ দৌড়তে দৌড়তে এসে বললে—চল—

—কোথায়?

দেবেশ বললে—ভেরি গুড নিউজ। ডাক্তার রায় এনকোয়ারি কমিশন বসাতে অর্ডার দিয়ে দিয়েছে। সাক্ষী হবো আমরা—

সুরেন তখনও বুঝতে পারলে না।

বললে—কীসের সাক্ষী?

দেবেশ বললে—তদন্ত কমিটি বসে গেছে। আমি গিয়ে সাক্ষী হিসেবে নাম দিয়ে আসবো আজকে। আমি সাক্ষী হবো, টুলু সাক্ষী হবে। সবাই সাক্ষ্য দেবে—

সুরেন বললে—সেখানে গিয়ে কী কী বলতে হবে?

—তুইও সাক্ষী হতে পারিস! সেদিন তুইও তো আমাদের সঙ্গে ছিলি। তোর হাতেও তো গুলী লেগেছিল। কিন্তু তোর মামা কিছু বলবে না তো?

সুরেন বললে—মামা বললেই বা, মামার কথা শুনলে তো!

—কিন্তু পুণ্যশ্লোকবাবুর বিরুদ্ধেও তো তোকে বলতে হবে। তোকে মাসে মাসে দেড়শো টাকা দিয়ে কংগ্রেসের ইতিহাস লিখতে বলেছিল। তুই তো পুণ্যশ্লোকবাবুর সব কীর্তি জানিস! পারবি না বলতে?

সুরেন বললে—তা পারবো।

—কিন্তু তোর পর্মিলি? পর্মিলি যদি কিছু মনে করে?

সুরেন বললে—পর্মিলির সঙ্গে আমার আর কোনও সম্পর্ক নেই, তা জানিস—

—সে কীরে? কেন?

সুরেন বললে—হ্যাঁ—

—কেন, হলো কী হঠাৎ? ঝগড়া হয়ে গেল?

সুরেন বললে—না, পুণ্যশ্লোকবাবু আমাকে ওদের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। বলেছে আর যদি কখনও ওদের বাড়িতে যাই তো আমাকে পুলিশ দিয়ে এ্যারেষ্ট করিয়ে দেবে।

দেবেশ বললে—কুছ পরোয়া নেই। না যেতে বলে দিয়েছে, ভালোই করেছে। আমি তোকে গোড়াতেই বারণ করে দিয়েছিলুম, বড়লোকের বাড়ি যাসনি। ও শালারা মানুষ মনে করে না আমাদের।

ইতিমধ্যে টুলুও এসে গেছে। বললে—চলো দেবেশদা—

দেবেশ বললে—এই সুরেনকেও নিয়ে যাচ্ছি—

—সুরেনদাও সাক্ষী হবে নাকি?

দেবেশ বললে—না, ওর বোধহয় ভয় করছে, শেষকালে পর্মিলি কী মনে করবে!

সুরেন বললে—না ভাই, আমিও সাক্ষী হবো।

—তুই সাক্ষী হবি?

সুরেন বললে—হ্যাঁ, হবো—

—কিন্তু শেষে যেন আমাকে দোষ দিসনি—

সুরেন বললে—পর্মিলি কী মনে কবলো আর না করলো, আমি অত কেয়ার করি না, তুই আমার নাম দিয়ে দে, আমি সাক্ষী হবো—

এসব বাইরের জগতের খবর। বাইরে যখন রাজনীতির ষড়যন্ত্র চলছে, মাধব কুণ্ডু লেনের বাড়ির ভেতরে তখন পুরোন ষড়যন্ত্রটা আরো জটিল-কুটিল হয়ে উঠছিল। নরেশ দত্তকে আর কালীকান্ত বিশ্বাসকে কায়দা করে পাশ কাটিয়ে দিয়ে ভূপতি ভাদুড়ী খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়েছিল। এখন তার মুখে হাসি বেরোতে শুরু করেছিল। এখন আর আগেকার মত অত রাগ হতো না কারোর ওপর।

বাকি ছিল সুখদা! তাকেও প্রায় কাবু করে এনেছিল। তারপর একবার যখন মানদাব হাতে গিয়ে পড়েছে তখন আর কোনও ভয় নেই। এখন একটু খেলাচ্ছে বটে, কিন্তু আর কিছুদিন সময় পেলেই একেবারে ডাঙায় তুলে ছেড়ে দেবে!

সেদিন কাগজপত্র নিয়ে ভূপতি ভাদুড়ী হরনাথ উকিলের বাড়িতে গিয়ে হাজির।

হরনাথ উকিল এমনিতে ব্যস্ত মানুষ। শম্ভু চৌধুরীর আমলে দু' হাতে পয়সা লুটেছে। কিন্তু সে ছিল অতীতের কথা। তখন চালের মণ ছিল তিন টাকা, এখন সেই চালই আবার তিরিশ টাকায় উঠেছে। হরনাথ উকিল আগে দু' টাকা করে ফি নিয়েছে, এখন সেই ফি-ই বেড়ে হয়েছে পঁচিশ টাকা। তাও উকিলবাবু বলে—পঁচিশ টাকায় আর হয় না ভূপতি. এখন থেকে পঞ্চাশ টাকা দিতে হবে—

ভূপতি ভাদুড়ী হাত জোড় করে। বলে—আমাকে মাফ করবেন উকিলবাবু, আমি মারা যাবো, একেবারে সবংশে মারা যাবো। এই উইলের একটা ফয়সলা হয়ে যাক, তখন যা নিতে হয় নেবেন, তার আগে আমায় রেহাই দিন—

উকিলবাবু বলে—তা উইলের জন্যে অত ভাবনা কিসের তোমার? উইল তো আমি করেই দিয়েছি—

ভূপতি ভাদুড়ী বলে—উইল তো করেছেন, কিন্তু সে উইলে তো এখনও সই হয়নি—

—কেন, সই হয়নি কেন?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—সই হয়েছিল, কিন্তু সে উইল আমার পছন্দ হয়নি উকিলবাবু—তাই ছিঁড়ে ফেলেছি—

—কেন, পছন্দ হয়নি কেন? উইল করেছেন তোমার মা-মণি, তাতে তোমার পছন্দ-অপছন্দের কী আছে? তিনি যা উইল করবেন তাই-ই তো হবে।

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—কিন্তু তাতে আমি যে এত করলুম, আমার কী থাকবে?

—তোমার? তোমার আবার কী থাকবে? তুমি তো বরাবর মাইনে পেয়ে এসেছ মাসে মাসে!

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—বা রে, মাইনে পেয়েছি কত করে? ষাট টাকা। ষাট টাকায় কি এত খাটুনি পোষায়?

হরনাথবাবুর ঘরে ভাগ্যিস কোনও লোক ছিল না। ভূপতি ভাদুড়ীর মতলবটা সে আগে থেকেই বুঝেছিল, এবার আরো স্পষ্ট করে বুঝে নিলে।

বললেন—দেখ ভূপতি, তুমি সরকারি করো, আর আমিও ওকালতি করে খাই, আমারই বা এই পঁচিশ টাকায় চলে কী করে?

—তা না চলে তো আপনিও একটু রেট বাড়িয়ে নিন! কিন্তু সে উইলটার বদলে আমায় আর একটা নতুন উইল করে দিতে হবে!

হরনাথবাবু বললে—কী রকম?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—আগেরটাতে সুখদাকে সম্পত্তির কিছু অংশ দেবার কথা ছিল। গয়না-গাঁটি, টাকা-পয়সার ভাগ দেওয়ার কথাও ছিল। কিন্তু সে তো এখন আর নেই—

—নেই মানে?

ভূপতি ভাদুড়ী সব ব্যাপারটা খুলে স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিলে। তারপর বললে—এখন মনে করুন সেই সুখদা তো বেশ্যা হয়ে গেছে। তাকে সম্পত্তি দেবার তো আর প্রশ্ন নেই।

—তা সত্যিই বলছো সেই মেয়ে বেশ্যা হয়ে গেছে?

—আজ্ঞে আপনার বিশ্বাস না হয় আপনি দুর্গাচরণ মিত্তির স্ট্রীটে গিয়ে দেখে আসুন, তার বাড়িউলি মানদা দাসীকে জিজ্ঞেস করুন গিয়ে। আমি কি মিথ্যে কথা বলছি আপনার সঙ্গে?

—আর সেই মামলা?

—মামলায় বেকসুর খালাস!

—কেন?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—সাক্ষী তো পেলে না পুলিশ।

—সাক্ষী পেলে না কেন?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—আজ্ঞে সাক্ষী ছিল আমাদের চৌধুরীবাড়ির তরলা, বাদামী আর জনার্দন, তারা সব উল্টোপাল্টা কথা বলতে লাগলো কোর্টে গিয়ে! এরপরে আর জজ সাহেব ছেড়ে দেবে না তো, কী করবে?

হরনাথবাবু এতকাল ওকালতি করছে, এত চরিত্র দেখেছে, কিন্তু এমন একখানা চরিত্র জীবনে কখনও দেখেনি। বললে—তুমি তো খলিফা লোক ম্যানেজার। তুমি আমাদের ওকালতি লাইনে এলে বাজার মাৎ করে দিতে পারতে, এই তোমায় বলে রাখলুম ভূপতি!

ভূপতি ভাদুড়ী এত প্রশংসায় বিগলিত হয়ে গেল একেবারে। হাতজোড় করে সবিনয়ে বললে—আজ্ঞে কী যে বলেন, আমি তো আপনাদের মতন লেখাপড়া শিখিনি উকিলবাবু।

হরনাথবাবু বললে—লেখাপড়া শেখনি তাই রক্ষে, শিখলে তুমি ব্যারিষ্টারদের ভাত মারতে ভূপতি—তুমি একলা এত ম্যানেজ করলে কী করে?

—আপনাদের আশীর্বাদে—আর কী করে? আমার নিজের তো কোনও বাহাদুরি নেই আজ্ঞে, আমি তো সামান্য ব্যক্তি! একলা মানুষ, সব দিকে আমাকেই সামলাতে হচ্ছে—

হরনাথবাবু বললে—আর সেই নরেশ দত্ত? সেই লোফারটা?

—তার কপাল খারাপ উকিলবাবু। সে ব্যাটা পুলিশের হাজতেই হার্ট-ফেল করে মারা গেল। ওঃ, আমাকে এতদিন বহু জ্বালিয়েছে।

—যাক, তাহলে তো তুমি এখন রাজা ভূপতি! নরেশ দত্তটা মরলো, ওদিকে জামাইটাও নিরুদ্দেশ! এখন ছ' লাখ টাকার সম্পত্তি সব তো তোমার বাগে এসে গেল?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—এবার উইলটা পাকা করে দিন, আমি ঠনঠনের কালীবাড়িতে গিয়ে পুজো দিয়ে আসি!

—কিন্তু আমাকে কী দেবে আগে তাই বলো তুমি।

—আপনাকে আমি খুশী করে দেবো উকিলবাবু! আপনি আমার কাজটা আগে পাকা করে দিন। আপনি যা পেলে খুশী হবেন আমি তাই-ই দেবো কথা দিচ্ছি। একেবারে পাকা কাজ করে দিতে হবে। ও কাঁচা-টাচা নয়। এমন করে দিন যাতে মা-মণি মারা যাবার পর কোনও মামলা-মকদ্দমা না হয়—

হরনাথবাবু বললে—আমরা উকিল মানুষ ভূপতি, আমরা হলুম রক্ত-চোষার জাত। আমরা কারো কথায় বিশ্বাস করি না। আমার সঙ্গে লেখাপড়া করতে হবে!

—কী রকম, বলুন?

—আমাকে পঞ্চাশ হাজার দিতে হবে!

—পঞ্চাশ হাজার টাকা? যেন চমকে উঠলো ভূপতি ভাদুড়ী!

হরনাথবাবু বললে—পঞ্চাশ হাজার টাকা যদি দাও তো এমন পাকা কাজ করে দেবো যে, মা-মণি মারা যাবার পর তুমি পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে বসে হাওয়া খাবে, আর কিছু করতে হবে না। আর তোমার ভাগ্নেই সম্পত্তির দেখা-

শোনা করবে।

ভূপতি ভাদুড়ী ভাগ্নের উল্লেখ শুনেই ক্ষেপে গেল। বললে—আমার ভাগ্নের আর নাম করবেন না আপনি। সে একটা অপোগণ্ড, অপদার্থ জীব। সে যদি মানুষ হতো তো আজ আমার ভাবনা?

—কেন? কী করলে সে?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—আজ্ঞে সে কমিউনিষ্টদের দলে গিয়ে ভিড়েছে—

—সে কী?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ! আমি কোথায় তার ভালোর জন্যে এত ভাবছি। এতদিন এত টাকা খরচ করে তাকে বি-এটা পাশ করালুম। ভাবলুম তাকে ল'টা পড়াবো। ল'টা পড়লে তবু সম্পত্তির ব্যাপারে সাহায্য হবে। তা না, সে বললে—না, ল' পড়বো না—

—কেন? ল' পড়লে তো ভালোই হতো! পড়লো না কেন?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—আমার ভাগ্নে কী বলে জানেন? বলে—ওকালতি তো জোচ্চোরদের কাজ! কোর্টটা হলো জাল-জোচ্চুরির জায়গা। জজ-টজ সব ব্যাটা নাকি জোচ্চোর।

হরনাথবাবু বললে—এঃ, তোমার ভাগ্নেটা তো একেবারে গোল্লায় গেছে দেখছি! ওর একটা এই বেলা বিয়ে দিয়ে দাও। আর দেরি কোর না।

—বিয়ে তো দিতুম! এদিকে এইসব ঝঞ্ঝাট না থাকলে আমি কবে ওর বিয়ে দিয়ে দিতুম! আমার যে এতদিন কী বিপদ যাচ্ছিল, তা তো আপনি জানেন!

হরনাথবাবু বললে—তা যাক, তাহলে একটা দলিল করে ফেলি আজ?

—কীসের দলিল?

—ওই যে তুমি তোমার সম্পত্তি পেলে আমাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দেবে?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—তা করুন! কিন্তু ষ্ট্যাম্প?

হরনাথবাবু বললে—ওসব তোমায় ভাবতে হবে না। আমি এতকাল এ কাজ করে আসছি আর আমাকে তুমি দলিল করা শেখাবে?

ভূপতি ভাদুড়ী আর কোনও কথা বললে না। হরনাথবাবু নিজের টেবিলের ড্রয়ার থেকে কাগজপত্র টেনে বার করলে। তারপর কী সব লিখতে লাগলো নিজের মনে—

ভূপতি ভাদুড়ীর দিকে চেয়ে বললে—আগে আমি ড্রাফট্ করে নিই ম্যানেজার, তারপরে তোমাকে পড়িয়ে শোনাবো—

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—ঠিক আছে, আমি বসছি—

কিন্তু সেদিন রাত্রেই হঠাৎ এক অঘটন ঘটলো।

সুখদাকে সেদিনও মানদা এসে সন্ধ্যেবেলাই সাজিয়ে-গুজিয়ে দিয়ে গেছে। ভালো কাপড় পড়িয়েছে, মুখে স্নো ক্রীম-পাউডার মাখিয়ে দিয়ে গেছে।

বলেছে—সাজো মা, সাজো, মেয়েমানুষের সাজা ছাড়া আর কী কাজ আছে মা?

সুখদা বলেছে—কেন, এত সেজে কী হবে? আমি তো ঘরেই বসে আছি, কোথাও তো বেরোচ্ছি না আমি—

—তা হোক মা, না-ই বা কোথাও বেরোলে! সাজলে মনটাও তো ভালো থাকে মানুষের। আমি আবার নোংরা মোটে দেখতে পারিনে যে!

কিন্তু সাজগোজ যখন শেষ হয়ে গেছে, তখন হঠাৎ এক ভদ্রলোক ঘরের মধ্যে ঢুকলো! বেশ গিলে-করা পাঞ্জাবি, পায়ে লপেটা, বাহারে তেড়ি। গা দিয়ে ভুরভুর করে দোক্তা আর এসেন্সের গন্ধ বেরোচ্ছে।

লোকটা তখনও একদৃষ্টে সুখদার দিকে দেখছে!

এতক্ষণে বোধহয় মানদার নজরে পড়লো। নজরে পড়তেই একেবারে লাফিয়ে উঠেছে।

বললে—ওমা, কোথায় যাবো গো, ছেলে যে!

ছেলে তখনও একদৃষ্টে সুখদাকে হাঁ করে যেন গিলছে।

—ওমা, এসো বাবা, এসো, তা তুমি কী করে জানলে বাবা যে আমি এ-ঘরে? কে বললে তোমাকে?

লোকটা বললে—কস্তুরির গন্ধ কি চাপা থাকে মাসি?

—বেশ বলেছ, বোস বোস, এই এইখানে এই বিছানার ওপর বোস।

বলে নিজে উঠে দাঁড়ালো।

সুখদা ভয় পেয়ে গিয়েছিল। একজন অচেনা পুরুষ মানুষকে ঘরে ঢুকতে দেখে প্রথম থেকেই সে আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল। মাসি উঠতেই সেও বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ালো।

মানদা বললে—ওমা, তুই আবার উঠছিস কেন? ওকে তোর ভয় কীসের? ও তো আমার ছেলে রে। এসো বাবা, এসো—

লোকটা হাতের সিগ্রেটে একটা টান দিলে।

তারপর সুখদার দিকে ফিরে বললে—আপনি উঠছেন কেন, আপনি বসুন না, আমি আপনাকে খেয়ে ফেলবো না, আমি বাঘও নই, ভাল্লুকও নই—

লোকটা বেশ গুছিয়ে বসলো খাটের ওপর। একেবারে দুটো পা তুলে। তারপর মাসির দিকে ফিরে বললে—কই, একটা ছাইদান-টান দাও, সিগ্রেটের ছাই ঝাড়বো কোথায়?

মানদা বললে—ওমা, তাইতো—

বলে নিজেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বোধহয় ছাইদানি আনতে গেল।

লোকটা সুখদার দিকে চেয়ে বললে—একী, আমি বসলুম বলে তুমি উঠে দাঁড়ালে নাকি?

সুখদা বললে—না—

—তাহলে? তুমি যদি না বসো, তাহলে তো আমাকে আবার উঠে দাঁড়াতে হয়! আমার সঙ্গে কি এক বিছানায় বসবে না? আমি কি এতই ঘেন্নার মানুষ?

বলে ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালো।

সুখদা বললে—আপনি উঠলেন কেন?

ভদ্রলোক বললে—আমি বসতে পারি, কিন্তু তাহলে তোমাকেও বসতে হবে—

সুখদা বললে—আমি বরং এই চেয়ারটায় বসি—

—না না, তা হবে না, বসলে দু'জনে এক জায়গাতেই বসবো! আর তাছাড়া আমাকে তোমার ভয়ই বা কীসের? আমি কি বাঘ না ভাল্লুক? দেখছো আমার দুটো হাত দুটো পা, দুটো চোখ, দুটো ঠোঁট! সব তো মানুষের মত!

বলে লোকটা সুখদার হাতটা ধরে ফেললে। ধরে বললে—এসো, রাগ কোর না, মনের মিল থাকলে দু'জনকে এক খাটে খুব ধরবে—

সুখদা নিজের হাতটা টানতে চেষ্টা করে বললে—হাত ছাড়ুন—

ভদ্রলোক বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেল খানিকক্ষণ।

বললে—ও বাবা, তোমার যে আবার সতীপনা আছে ষোল আনা।

সুখদা আবার বললে—কই, হাত ছাড়ুন—।

ভদ্রলোক বললে—কেন, তোমার হাত কি ক্ষয়ে যাবে নাকি?

—বলছি হাত ছাড়ুন!

ভদ্রলোক তখনও জোর করে হাতটা চেপে ধরে আছে। ধরে আছে আর সুখদার দিকে চেয়ে মিটিমিটি হাসছে।

—আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন না? বলছি হাত ছাড়ুন। নইলে কিন্তু আমি চেঁচাবো বলে দিচ্ছি—

ভদ্রলোক বোধহয় আগে থেকেই নেশা করে এসেছিল। তার ভয় হলো হয়ত দামী নেশাটা কেটে যাবে!

—ছাড়ুন হাত?

তাতেও যখন হাত ছাড়লো না লোকটা, তখন সুখদা চিৎকার করে উঠলো—মাসী-ই-ই—

চিৎকারটা যেন সারা বাড়িতে প্রতিধ্বনি তুলে আবার মিলিয়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে মানদা ঘরে ঢুকেছে ছাইদানি নিয়ে। ঢুকে কাণ্ড দেখে একেবারে অগ্নিশর্মা।

বললে—এ কী লা? চেঁচালি কেন?

সুখদা বললে—দেখ না, এ গায়ে হাত দিচ্ছে। হাত ছাড়ছে না—

ভদ্রলোক তখনও সুখদার হাতটা চেপে ধরে মিটিমিটি হাসছে।

মানদা বললে—হাত ছাড়ছে না তো কী হয়েছে? তোর হাত ক্ষয়ে গেছে?

ভদ্রলোক বললে—বলো তো মাসি, তুমিই বলো। অমন মাখনের মত হাত একটু ছুঁতে ইচ্ছে করবে না?

মানদা বললে—হ্যাঁ লা, ছেলে তোর হাতটা একটু ধরেছে আর তোর জাত চলে গেছে নাকি?

সুখদা বললে—কেন হাত ধরবে ও?

মানদা বললে—তা তোর জাত নিয়ে কি তুই ধুয়ে খাবি লা? জাত ধুয়ে খেলে তোর পেট ভারবে?

সুখদা বললে—কিন্তু হাত ধরবে কেন? আমি ওর কে?

মানদা বললে—বেশ করবে, হাজার বার হাত ধরবে! তুই বলবার কে? আমার ছেলে তোর হাত ধরেছে, এ তোর বাপের চোদ্দপুরুষের ভাগ্যি!

তারপর মানদা ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে বললে—ধরো তো বাবা তুমি আবার ওর হাত ধরো তো, দেখি ও কী করে? ধরো তো—

ভদ্রলোক ততক্ষণে টানাটানিতে হাত ছেড়ে দিয়েছিল। মানদার কথায় আবার সুখদার হাত ধরতে গেল। সুখদা তখন ভয়ে আরো দূরে সরে গেছে।

মানদা বললে—যাও, এগিয়ে যাও, ধরো, জোর করে ধরো—

ভদ্রলোক টলতে টলতে যত এগিয়ে যায় সুখদাও তত সরে সরে অন্যদিকে চলে যায়।

মানদা বললে—তুমি পুরুষমানুষ হয়ে ওর কাছে হেরে যাচ্ছ বাবা? ওকে জাপটে ধরতে পারছো না?

কিছুতেই যখন কিছু হয় না, তখন মানদা আর চুপ করে দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলে না। নিজেই গিয়ে জাপটে ধরলে সুখদাকে।

বললে—এসো বাবা, এবার ধরো মেয়েকে, দেখি এবার মেয়ে কোথায় পালায়—

সুখদা এবার কেঁদে ফেললে।

বললে—মাসি, আমাকে বাঁচাও তুমি মাসি, আমি ওর কাছে যাবো না।

মানদা ধমক দিলে—দূর হ হারামজাদী, আমি কোথায় তোর ভালোর জন্যে করছি, আর তুই কিনা ছেলের সঙ্গে বেয়াড়াপনা লাগালি? আমি তোকে এ্যাদ্দিন খাওয়াইনি, পরাইনি? এ্যাদ্দিন বসে বসে তোর তোয়াজ করিনি! যখন এয়েছিলি তখন তো রোগা পটকা। এখন যত গতর সেরেছে, তত তোর তেল বেড়েছে—

সুখদা তখন মাসিকে জড়িয়ে ধরে হাপুস-নয়নে কাঁদছে। মাসির বুকের ভেতর মুখ লুকিয়ে রেখে নিজের সম্ভ্রম বাঁচাবার চেষ্টা করছে।

মানদা ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে বলে উঠলো—তুমি হাঁ করে দেখছ কী বাছা? নাও, এসো। তুমি ভেবেছ তুমি হাঁ করে থাকবে আর আমি তোমার মুখের ভেতর খাবার পুরে দেবো? অত পারবো না বাপু, নাও এসো, ধরো, তোমার জিনিস তুমি ধরো—

এবার আর লোকটার দেরি হলো না। এক লাফে এসে সুখদার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। মানদা সুখদাকে ছেড়ে নিজে সরে এল।

সুখদা তখনও চিৎকার করে কাঁদছে—মাসি, ও মাসি, আমাকে ফেলে যেও না মাসি—আমাকে ফেলে যেও না—

কিন্তু তখন কোথায় মাসি! লোকটা এমন সুযোগ আর হাতছাড়া করতে প্রস্তুত নয়। সে তখন দুটো হাত দিয়ে সুখদাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জাপটে ধরেছে।

মানদা লোকটাকে উদ্দেশ করে বললে—তুমি এখন যা করবার করো—

বলে ঘরের বাইরে গিয়ে দরজায় শেকল তুলে দিলে।

ওদিকে আসল আপদটা গেছে এইটেই বাঁচোয়া। নরেশ দত্তটা কি কম হারামজাদা ছিল নাকি! দুয়ে দুয়ে কত হাজার টাকা নিয়েছে তার কি কোনও ঠিক আছে নাকি? ব্যাটা যেমন হারামী করেছিল তেমনি শাস্তি পেয়েছে। থানার হাজতের মধ্যে মরবার সময় একফোঁটা জল পর্যন্ত তার মুখে পড়েনি। ভগবান আছেই, নইলে ব্যাটা মরবেই বা কেন?

নরেশ দত্তর মরবার খবর পেয়ে ভূপতি ভাদুড়ী নিজে কালীঘাটে গিয়ে পুজো দিয়ে এসেছে। মা-কালীর সামনে হাত-জোড় করে বলেছে—মা, তোমার ভক্তকে দেখো মা। আমি বড় অনাথ মা। আমার কেউ নেই। আমার অনেক দিনের সাধ আমি ওই চৌধুরী বাড়ির সম্পত্তিটা নেব। আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর মা। যেদিন আমি সম্পত্তি পাবো, সেদিন পেট ভরে তোমাকে পাঁঠার রক্ত খাওয়াবো মা—

তারপর উকিলবাবুর সঙ্গেও সব কথা পাকাপাকি বন্দোবস্ত হয়ে গিয়েছিল! ছ' লাখ টাকার সম্পত্তির জন্যে পঞ্চাশ হাজার টাকা কিছুই না। ওটুকুন দালালি ন্যায্য দালালি। এখন ভালোয় ভালোয় সব-কিছুর সুরাহা হয়ে গেলে হয়।

রাস্তাটা বড় খারাপ। পাড়াটার আবহাওয়াও ভালো নয়। অবিরত

ফেরিওয়ালা আর যত গুন্ডার আনাগোনা চলছে। একটা কিছু গণ্ডগোল হলেই একেবারে ছুরি মারামারি হয়ে যায়।

বাইরে থেকে তখনও সুখদার আর্তনাদ শোনা যাচ্ছিল—ও মাসি, মাসি, আমাকে একলা ফেলে যেও না—ও মাসি—

নিচেয় ভূপতি ভাদুড়ী তখন চুপ করে বসে ছিল। আর বার বার বাইরের দিকে তাকাচ্ছিল। অনেকক্ষণ থেকেই এসে বসে আছে। আজকে ভূপতি ভাদুড়ী নিজের মুখে শুনে যাবে সুখদাকে ঠিক মত লাইনে নামানো গেছে কিনা।

মানদা বলেছিল—আরে তুমি ভাবছো কেন ম্যানেজার, আমি অমন কত মেয়ে দেখেছি। এ লাইনে কি এই প্রথম? বেশি ট্যান্ডাই-ম্যান্ডাই করলে আমি মেরে ঢিট করে দেবো না? লোহার শিক পুড়িয়ে ছ্যাঁকা দিয়ে দেবো না?

তা বটে। ঠিক জুতসই জায়গাতেই ভূপতি ভাদুড়ী সুখদাকে এনে তুলেছে। এখান থেকে পালাবার আর কোনও উপায় নেই সুখদার। এ-পাড়ায় আইন-কানুন আলাদা। এখানে পুলিশেরও কিছু করবার ক্ষমতা নেই। যে পুলিশ কিছু করতে চাইবে, তাকেও টাকা দিয়ে হাত করে রেখেছে মানদা। মানদার এ-পাড়ায় অপ্রতিহত ক্ষমতা।

সদর রাস্তা থেকে বাড়িতে ঢুকতে গেলে সরু রাস্তা দিয়ে ঢুকতে হয়। তার দু'পাশে ঘর। সেই রাস্তা দিয়ে সোজা ঢুকলেই চারচৌকো উঠোন। বাঁ-পাশের ঘরটাতে ভূপতি ভাদুড়ী চুপ করে বসে ছিল। মানদার কাছে খবরটা শুনলেই ছুটি! তখন আর আসতে হবে না এখানে। তখন মাধব কুণ্ডু লেনের বাড়িতে গিয়ে পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে আরাম করবে।

হঠাৎ বাইরে কার পায়ের আওয়াজ হতেই দরোয়ান জিজ্ঞেস করলে—কে? কাকে চাই?

কার একজনের গলার আওয়াজ শোনা গেল।

সে বললে—এটা কি মানদা দাসীর বাড়ি?

দরোয়ান বললে—হ্যাঁ—

—মানদা দাসী কোথায়?

দরোয়ান বললে—বাড়ির ভেতরে।

—একবার ডেকে দিতে পারো? তুমি বলো গিয়ে আমরা ভোটের জন্যে এসেছি পার্টি অফিস থেকে।

দরোয়ান অবাক হয়ে গেল। বললে—ভোট?

ভদ্রলোক বললে—হ্যাঁ—

দরোয়ান বললে—আপনারা এই ঘরে বসুন, আমি ডেকে আনছি—

বলে দরোয়ান ভেতরে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তিনজন ঘরে ঢুকলো। ভূপতি ভাদুড়ী একজনকে দেখেই চমকে উঠেছে।

—কী রে তুই?

সুরেন দেবেশের পেছনে পেছনে ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিল। সেও যেন সাপ দেখে দশ হাত পেছিয়ে এসেছে।

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—বল, তুই এখানে কী করতে?

ঠিক এমনভাবে যে সেদিন ভূপতি ভাদুড়ীর সঙ্গে তার দেখা হয়ে যাবে তা সুরেন ভাবতে পারেনি। আর সুরেনের সারা জীবনই এমনি অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনার মধ্যে দিয়ে কেটেছে। কোথায় কোন্ গ্রামে সে জন্মেছিল, সে গ্রামের

নামও সে আজ ভুলে গেছে। তারপর ভাগ্যের কোন্ অদৃশ্য ইঙ্গিতে সে এই কলকাতা সহরে চলে এসেছে। সেই দিন থেকে চলমান জীবনের স্রোতে ভাসতে ভাসতে সে যে এখানে এই অবস্থায় এসে পৌঁছবে তা কে জানতো! কে জানতো সে কলকাতা সহরের প্রাণকেন্দ্রের সঙ্গে এমন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে যাবে।

আজও চোখ বুজলেই সুরেন দেখতে পায় মা-মণির জীবনের সেই শেষ মুহূর্তটুকু। চোখ দুটো বোঁজা। শরীরে প্রাণ আছে কি নেই বোঝা যায় না। অতীত জীবনের সমস্ত ব্যর্থতা নিয়ে একটা জীবন্ত ইতিহাস যেন বিছানার ওপর মুমূর্ষু অবস্থায় শুয়ে প্রাণ-বায়ুর জন্যে নিঃশব্দ চেষ্টা করে চলেছে।

ভূপতি ভাদুড়ী ডাক্তার নিয়ে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। শেষকালে ডাক্তারবাবুর মুখটাও যেন কেমন হতাশাক্লিষ্ট হয়ে উঠলো।

সুরেনের ইচ্ছে হয়েছিল একবার শেষবারের মত মা-মণিকে ডেকে কথা বলে। কিন্তু কার সঙ্গে কথা বলবে? কে তার কথার উত্তর দেবে? যদি মা-মণির কথা বলবার ক্ষমতা থাকতো তো সে জিজ্ঞেস করতো—তোমার এখন কেমন লাগছে মা-মণি?

সত্যিই, মৃত্যুর আগের মুহূর্তে মানুষের কেমন লাগে তা খুব জানতে ইচ্ছে করে সুরেনের। জীবনের সব অভিজ্ঞতার শেষে যখন মানুষ তার অন্তিম ক্ষণ-টুকুতে এসে পৌঁছোয় তখন কোন্ কামনা তাকে পীড়িত করে? সে কি বাঁচবার কামনা, না যন্ত্রণা থেকে মুক্তির কামনা? নাকি হাজার যন্ত্রণা থাকলেও এই জীবনটাকেই সে আঁকড়ে থাকতে চায়?

সেদিন হঠাৎ কেন কে জানে হরনাথ উকিলও এসে হাজির হয়েছিল। মা-মণির জীবন-মৃত্যুর সঙ্গে যেন হরনাথ উকিলেরও বাঁচা-মরা জড়িয়ে গিয়ে-ছিল।

এক-একবার ভূপতি ভাদুড়ী তেতলা থেকে দৌড়তে দৌড়তে নেমে আসে আর হরনাথ উকিল উদ্‌গ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করে—কী হলো? সই করালে?

ভূপতি ভাদুড়ীরও তখন যেন শ্বাসরোধ হবার অবস্থা। একবার ওপরে যায়, আর একবার নিচেয় আসে। কী যে করবে ভূপতি ভাদুড়ী তা যেন বুঝতে পারে না।

হরনাথ উকিলেরও উদ্বেগ কম নয়। তারও পঞ্চাশ হাজার টাকা মা-মণির জীবন-মৃত্যুর সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে।

ভূপতি ভাদুড়ী বলে—একবারও যে জ্ঞান হচ্ছে না—

হরনাথ উকিল বলে—তা কোনও রকমে বুড়ো আঙ্গুলটা দিয়ে একটা টিপসই করিয়ে দিতে পারছো না?

—আজ্ঞে, অত লোকের সামনে করি কী করে?

—আরে, তোমার দ্বারা কিচ্ছু হবে না। বলি এতদিন তো উইল তৈরি হয়ে গিয়েছে, এর মধ্যে একবারও একটু সময় পেলে না?

ভূপতি ভাদুড়ী বলে--আপনি তো কেবল আমারই দোষ দেখলেন! আজ এক বছর ধরে মানুষটা ভুগছে, কথা বলবার ক্ষমতা নেই, পাশ ফিরতে পর্যন্ত পারে না, আমি কখন সই করিয়ে নেব? ভেবেছিলুম একটু সুস্থ হলেই কাজটা হাসিল করে নেব--

হরনাথ উকিলের রাগে আঙ্গুল কামড়াতে ইচ্ছে করলো। বললে—তাহলে তুমি মরো, আমি আর কী করবো! আমার কলাটা- যা কিছু লোকসান তোমারই -

সুরেন সমস্ত ক্ষণ ধরে এই সবই লক্ষ্য করেছিল সেদিন। আর মনে মনে মানুষের প্রকৃতির কথা ভেবে লজ্জায় আধমরা হয়ে গিয়েছিল। এই তো পৃথিবী! এখানে মানুষের কল্যাণের নামে তবু পার্টির লোকেরা কাজ করে। আর যে মানুষদের নামে তারা কাজ করে তাদের স্বরূপ এই। অথচ এদেরও ভোট আছে। এদের ভোট আছে বলেই তো সব পার্টির লোককে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটের জন্যে খোসামোদ করতে হয়।

মনে আছে, সেদিন দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রীটে গিয়ে যে ঘটনা ঘটেছিল তার জের অনেকদিন পর্যন্ত চলেছিল।

বাড়িতে এসে মামা বলেছিল—তুই কেন ওখানে গিয়েছিলি বল? ওখানে তোর কীসের কাজ?

সুরেন বলেছিল—আমি তো বলেছি ভোটের জন্যে। ওপাড়াতেও তো সকলের ভোট আছে—

—ভোট আছে তা তো জানি, কিন্তু তোর সঙ্গে ভোটের কীসের সম্পর্ক?

সুরেন বললে—ওরা যে আমাকে ওখানে নিয়ে গিয়েছিল—

—ওরা কে? যত সব বাউন্ডুলে ছেলের দল। ওই চোয়াড়ে চেহারা দেখেই বুঝতে পেরেছিলুম ওরা পার্টির লোক। ওদের না আছে চাল, না চুলো—, যত সব বখাটে লোক—

এসব মামার মুখ থেকে শোনা সুরেনের গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল। তাই সেদিন সে ঐ বাড়িটা থেকে বেরিয়ে আসার সময় দেবেশ বললে—তোকে আজ বাড়ি ফিরে গিয়ে বকুনি খেতে হবে রে—

সুরেন বললে—ওসব আমার গা-সওয়া হয়ে গেছে—চল, এবার কোথায় যাবি, চল—

দেবেশ বললে—আজকে আর নয়, অনেক হয়েছে—এবার ফিরে চল—

তখন সন্ধ্যে হয়েছে ও-পাড়ায়। আস্তে আস্তে এবার পাড়াটা জেগে উঠবে। মানদা দাসী এবার সন্ধ্যে-আহ্নিক সেরে ঠাকুর-ঘরে গিয়ে শাঁখ বাজাবে। তারপর একে একে বাবুরা আসতে শুরু করবে। তখন ঘরে ঘরে আসর বসে যাবে। কোথাও বসবে গান-বাজনার আসর, কোথাও মাইফেলের। সেই গান-বাজনা আর মাইফেলের ফুর্তির আওয়াজে সুখদার গলার আওয়াজ ঢেকে যাবে। কিন্তু তবু সে চিৎকার করে যাবে—ও মাসি, মাসি, আমাকে একলা ফেলে যেও না, ও মাসি—

দেবেশের পেছন পেছন সুরেন দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রীট পেরিয়ে বড় রাস্তায় এসে পড়লো।

ব্রজেশের তখন অনেক কাজ। কাজের শেষ নেই তখন তার। একে তার অফিস, তার ওপর ভোট আছে আর তার সঙ্গে আছে এনকোয়ারি কমিশন। পুণ্যশ্লোকবাবুরও দুর্ভাবনার শেষ নেই। পাঁচটা বছর কোনও রকমে কাটানো গেল। কিন্তু পাঁচটা বছরেই যেন সমস্ত দেশের লোক হাঁফিয়ে উঠেছে।

বলেন—হাওয়া কোন্ দিকে বুঝছো বলো তো ব্রজেশ, তুমি তো ঘুরছো সব দিকে?

প্রজেশ বলে—যতই চেঁচাক ওরা, কংগ্রেস জিতবেই—এই আমি আপনাকে বলে রাখলুম—

পুণ্যশ্লোকবাবুর তবু সন্দেহ যায় না। বলেন—তুমি ঠিক বলছো তো?

প্রজেশ গলা নিচু করে দিলে। বললে—তবে আপনাকে বলি, আমি পাঁচশোর মতন ফলস্ ভোটের ব্যবস্থাও করে ফেলেছি।

পুণ্যশ্লোকবাবু খবরটা শুনে কেমন মনমরা হয়ে গেলেন। অথচ এককালে এই কংগ্রেসের নামে লোকে হাসিমুখে ফাঁসিকাঠে ঝুলেছে।

বললেন—কিন্তু এরকম কেন হলো বলো তো? আমরা তো দেশের কম কাজ করিনি। এই ন'বছরে দেশের লোকের কত পয়সা বেড়েছে। বিদেশ থেকে কত জিনিস আনা বন্ধ করেছি। চিত্তরঞ্জনে গিয়ে দেখলাম আমাদের ইঞ্জিনীয়াররাই একটা রেলের ইঞ্জিন তৈরি করেছে। আরো কত ইঞ্জিন তৈরি হবে। তাতে কত কোটি টাকা দেশের বেঁচে যাবে বলো তো? এসবই তো কংগ্রেস করেছে। এসব কথা কি দেশের লোকের মাথায় ঢুকছে না?

প্রজেশ বললে—নেমকহারাম স্যার, নেমকহারাম! সাধে কি এদের এত গালাগালি দিই আমি? তাছাড়াও ভাবুন তো আপনি দেশের মানুষের জন্যে কী-ই না করেছেন? সে কথা কি কেউ মনে রেখেছে? ওসব আপনি ভাববেন না—

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—অথচ আগের বারে তো কাউকে বলতেও হয়নি, কারোর বাড়িতেই যাইনি। সবাই নিজের থেকে এসে ভোট দিয়ে গেছে—

প্রজেশ বললে—এবার সে রকম হবে না স্যার। তাইতো আমি আর রিস্ক নিলুম না—

পুণ্যশ্লোকবাবু এবারে বললেন—আচ্ছা তোমাকে আগে কত টাকা দিয়েছি কিছু হিসেব আছে তোমার!

প্রজেশ বললে—আমার সব লেখা আছে, আপনি আমাকে এপর্যন্ত দেড় লাখ দিয়েছেন—

—সব খরচ হয়ে গেছে নাকি?

প্রজেশ বললে—না না, সব খরচ হবে কেন? এখনও কিছু আছে আমার কাছে, এই হাজার দশেকের মতন।

—আরো কত লাগবে মনে হচ্ছে?

প্রজেশ বললে—সেবারের চেয়ে একটু বেশি লাগবে। সেবারে মোটামুটি তিন লাখের মত খরচ হয়েছিল, এবারে চার ছাড়িয়ে যাবে না। খুব যদি বেশি লাগে তো সাড়ে তিন—

—ঠিক আছে।

পুণ্যশ্লোকবাবু মনে মনে হিসেব কবে নিলেন। বললেন—তাহলে গোয়েঙ্কাকে আজকেই একটা টেলিফোন করে দিই—

প্রজেশ বললে—শুধু একলা গোয়েঙ্কাকে বলে কী লাভ.? পোদ্দারকেও একবার বলুন না! রঘুবীর পোদ্দারকে আপনি অত বড় হোটেল করবার লাইসেন্স পাইয়ে দিলেন। সে তো এখন হোটেল করে লাখ লাখ টাকা কামাচ্ছে. তারও কিছু খসুক না! তাকেও বলুন লাখখানেক দিতে হবে। ভোটের সময়েই যদি না দেবে তো কখন দেবে সে?

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—তা ঠিক। দেখি আজকেই একবার টেলিফোন করবো তাকে—

প্রজেশ বললে—হ্যাঁ, আপনি মিছিমিছি ঘর থেকে টাকা বের করবেন কেন?

পুণ্যশ্লোকবাবু হঠাৎ প্রসঙ্গ বদলে বললেন—ভলান্টিয়ারদের কত করে দিচ্ছ?

প্রজেশ বললে—ও তো বাঁধা রেট আছে, তিন টাকা রোজ—

—এবার তাহলে ওদের পাঁচ টাকা করে দিয়ে দাও। আরো বেশি খাটবে ওরা। সবাই যেন খুশী হয়ে কাজ করে। আর মাঝে মাঝে যেন পাড়াগুলোর ভেতর দিয়ে 'বন্দে মাতরম' বলতে বলতে যায়—

প্রজেশ বললে—না পুণ্যদা, 'বন্দে মাতরম' শ্লোগান আজকাল আর কেউ শুনতে চায় না। আগেকার মতন, এখন তারা বলছে 'ভোট ফর কংগ্রেস'—আব মাঝে মাঝে 'ভোট ফর পুণ্যশ্লোক রায়'—

বলে প্রজেশ উঠলো। বললে—আমি এখন যাচ্ছি পুণ্যদা, আবার সন্ধ্যে-বেলার দিকে আসবো—

কিন্তু কথা শেষ করবার আগেই বাইরে থেকে আব একটা আওয়াজ কানে এল। সুকীয়া স্ট্রীটের ওপর দিয়েই যাচ্ছে মিছিলটা। তারাই চিৎকার করছে—ইনক্লাব জিন্দাবাদ—ইনক্লাব জিন্দাবাদ—

আওয়াজটা পুণ্যশ্লোকবাবুর বাড়ির সামনে এসেই যেন বেশি জোরদার হলো। যেন গলাবাজি আরো বেড়ে গেল—'ভোট ফর সি পি আই', 'ভোট ফর পূর্ণ বিশ্বাস', 'পূর্ণ বিশ্বাস জিন্দাবাদ', 'কংগ্রেস মুর্দাবাদ', 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ'—

একটার পর একটা শ্লোগান।

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—অনেক বড় প্রোসেশান মনে হচ্ছে—ওদের লোক খুব বেশি নাকি?

প্রজেশও কান পেতে শুনছিল। বললে—দেখছেন, বদমাইসি করছে কি রকম, ঠিক এই বাড়ির সামনে এসেই বেশি করে চেঁচাচ্ছে—

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—তুমি একবার গিয়ে দেখে এসো তো, কত লোক ওদের—

প্রজেশ ঘর থেকে বেরোল। বেরিয়ে আস্তে আস্তে বাগানের পাশ দিয়ে পাঁচিলের কাছে গেল। সেখান দিয়ে দেখলে ছেলেরা শূন্যে মুঠি পাকিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে আর চিৎকার করে বলছে—ইনক্লাব জিন্দাবাদ—

আবার বলছে—'ভোট দেবেন কীসে, কাস্তে ধানের শীষে—'

মিছিলের মধ্যেই ছিল সুরেন। সুরেনও চেঁচাচ্ছিল। পুণ্যশ্লোকবাবুর বাড়িটার সামনে আসতেই সে ওপর দিকে চেয়ে দেখলে। পমিলির ঘরটা দেখা যায় না। উঁচু পাঁচিল ঘেরা চারদিকে। এ আওয়াজ হয়ত পমিলির কানেও যাচ্ছে। আর যদি পুণ্যশ্লোকবাবু বাড়ি থাকেন তাঁর কানেও যাচ্ছে নিশ্চয়ই। ওই পুণ্যশ্লোকবাবু তাকে ভয় দেখিয়েছেন—যদি সে আর কখনও ও বাড়িতে ঢোকে তাহলে তাকে এ্যারেস্ট করাবেন। তা ঠিক আছে! ওখানে আর কখনো ঢুকবেও না সুরেন! ওখানে ঢুকতে না পারার জন্যে তার যেন ঘুম হচ্ছে না! পমিলি হাজার বললেও আর ওখানে ঢুকছে না সে!

টুলুও চলেছে মেয়েদের দলের মধ্যে! সেও সমানে চিৎকার করে চলেছে। আজ আর কাউকেই ভয় নেই। সবাই প্রাণপণে চেষ্টা করবে পূর্ণদাকে জিতিয়ে দিতে। সবাই যেন প্রাণপণ করে নেমেছে—যেমন করে হোক কংগ্রেসকে হারাতেই হবে—

প্রজেশ দেয়ালের ছোট ফাঁক দিয়ে দেখছিল। প্রায় দু' হাজার লোক জড়ো

করেছে ওরা। আস্তে আস্তে মিছিল চলেছে আমহার্স্ট স্ট্রীটের দিকে।

হঠাৎ নজরে পড়লো সুরেনকে। সেও চলেছে ওদের সঙ্গে। তার হাতেও একটা পোস্টার। পোস্টারের ওপর লেখা আছে—'কমিউনিস্ট পার্টিকে ভোট দিন'—

শুধু সেদিনই নয়, ক'দিন ধরেই কলকাতা সহরের বুকে শব্দের সমুদ্র-গর্জন চলতে লাগলো। সকালবেলার দিকটা মোটামুটি এক রকম থাকে। লোকে বাসে-ট্রামে ঝুলতে ঝুলতে গিয়ে অফিস, ফ্যাক্টরি, কাছারিতে পেঁছোয়। কিন্তু বেলা দুটো তিনটের পর থেকে আর বাস-ট্রাম নড়ে না। তখন থেকে যত দিন বাড়ে, যত বেলা পড়ে আসে, ততই সব কিছু অচল হয়ে যায়। বিকেল পাঁচটার পর আর কেউ অফিস থেকে ঠিক সময়ে বাড়ি ফিরতে পারে না। বাস-স্টপে দাঁড়িয়ে বাদুড়ঝোলা বাসগুলোতে ওঠবার চেষ্টা করেও পেছিয়ে আসে।

কেউ কেউ কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করে—হ্যাঁ মশাই, কী হলো হঠাৎ! বাস-ট্রামের হলোটা কী?

এক ভদ্রলোক অফিস-ফেরত অনেকক্ষণ ধরে বিরক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বললে—আর কী হবে, শালার বেটাদের ভোট হচ্ছে—

—তা ভোট যেদিন হবে সেদিন হোক না, রাস্তার মধ্যে গণ্ডগোল করছে কেন?

গণ্ডগোল যে কেন করছে সবাই, তা কেউ বিশেষ বুঝতে পারে না। যারা বুঝতে পারে তারা বলে—এর পেছনে অনেক কাণ্ড আছে মশাই—অনেক কাণ্ড—

—কী কাণ্ড?

একজন সবজান্তা বলে—সবাই টাকা পায়, তা জানেন?

—টাকা? কারা টাকা পায়?

—ওই যারা 'ভোট' 'ভোট' বলে চেঁচাচ্ছে, ওই যারা শ্লোগান দিচ্ছে। ওদের মেহনতের মজুরি দিতে হবে না? ওরা কি ওমনি-ওমনি খাটবে?

এ খবরটা জানা ছিল না কারো। মিছিলে থাকলে, মিছিলের সঙ্গে চেঁচালে যে টাকা পাওয়া যায়·তা ভিড়ের মধ্যে কারোরই বিশেষ জানা ছিল না।

—কত করে দেয়?

—এক টাকা, পাঁচ সিকের মতন।

—কারা দেয়? কংগ্রেস না কমিউনিস্ট পার্টি?

—ও সবাই দেয় মশাই। দুটো তো দল। দু'জনই টাকা খরচ করে।

—এত টাকাই বা পায় কোত্থেকে ওরা?

ভদ্রলোক বললে—টাকা দেবার লোকের কি অভাব আছে মশাই। কংগ্রেসকে দেয় আমেরিকা, আর কমিউনিস্ট পার্টিকে দেয় রাশিয়া। আসলে মশাই আমাদের দেশ কেবল নামেই স্বাধীন, আমাদের মনটা যে এখনও পরাধীন রয়ে গেছে, নইলে এমন কাণ্ড হয়? নইলে আমরা চুপ করে থাকি ভেড়ার মত?

এসব আলোচনা বাসে-ট্রামে সর্বত্র চলে। সবাই ভাবে তাদের তো কেউ টাকা দেয় না। আমেরিকার টাকাই হোক আর রাশিয়ার টাকাই হোক·; আসলে টাকা তো। সে টাকার গায়ে তো আর নাম লেখা থাকে না। তারই কিছু অংশ যদি

আমাদের হাতে আসতো তো আমরা তবু খেয়ে-পরে বাঁচতুম। তাহলে আর এমন করে দাসত্ব করতে হতো না। পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে আরাম করে পলিটিক্স করতে পারতুম!

যত দিন যায় ততই যেন আকাশ-বাতাস গরম হয়ে ওঠে। কারো সঙ্গে কারো দেখা হলেই জিজ্ঞেস করে, কাকে ভোট দিচ্ছেন?

পাশের ভদ্রলোক বলেন—না মশাই, এবার আর কংগ্রেসকে দেবো না—

—ঠিক করেছেন মশাই, আমিও ঠিক করেছি ওদের দেবো না। এই ন'বছর তো দেখলুম, কেবল সব বড় বড় কথা। মিনিষ্টাররা পার্কে পার্কে মীটিং-এ শুধু উপদেশ দিতে ওস্তাদ। এদিকে দিনে দিনে বাড়ি ভাড়া কী রকম বাড়ছে দেখছেন। আবার শুনছি হিন্দু কোড বিল পাশ করবে। তাতে নাকি মেয়েরাও ছেলেদের মত সম্পত্তির ভাগ পাবে—

—ভাগ পাবে মানে?

পাশের ভদ্রলোক বললেন—ভাগ পাবে মানে, ধরুন বাপ মারা যাবার পর এতদিন তো ছেলেদের মধ্যেই সম্পত্তি ভাগ হতো, এবার থেকে মেয়ে থাকলে তারাও ভাইদের সঙ্গে সমান ভাগ পাবে। মেয়েদের বিয়ে দিতে কত হাজার হাজার টাকা খরচ করতে হয়, তার ওপর আবার সম্পত্তিরও সমান ভাগ! মাঝ-খান থেকে হবে কি, ভাইবোনে মামলা-মোকদ্দমা লেগে যাবে, উকিল, এ্যাটর্নিতে টাকা লুটবে আর সম্পত্তি-টম্পত্তি সব বিক্রি করে মামলার পেছনে ঢালতে হবে।

এও এক সমস্যা! যখন স্বাধীন হয়েছিল দেশ তখন অনেক স্বপ্ন দেখেছিল মানুষ। দু'শো বছর পরে ইংরেজরা গেছে, এবার আমাদেরই রাজ্য, আমাদেরই সবকিছু।

কিন্তু শনিবার হলেই যেন বেশি মিছিল বেরোয়। সেদিন অফিসের লোক-দের সকাল সকাল ছুটি। কিন্তু সকাল সকাল ছুটি হলেই যে সকাল সকাল বাড়ি ফিরতে পারবে এমন কোনও কথা নেই। সেদিন মনুমেণ্টের তলায় লাল শালু দেওয়া ফেস্টুন টাঙানো হয়ে যায়। লোকে বুঝতে পাবে ওখানে মীটিং হবে। কিছু বেকার লোক প্রথমে এসে জোটে। তারপরে জোটে অফিস-ফেরতার দল।

সেখানে বিকেল হলেই পার্টির লোক গিয়ে হাজির হয়। একখানা টেবিল আর দু'খানা ভাঙা চেয়ার।

সেখানে পূর্ণবাবুই প্রেসিডেণ্ট আর পূর্ণবাবুই বক্তা। বহুদিন ধরে বক্তৃতা দিয়ে দিয়ে আর শুনে শুনে কিছু লোকের কাছে একঘেয়ে হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ভোট কাছাকাছি আসতেই আবার মীটিং গরম হয়ে উঠতে আরম্ভ করেছে। আবার আজকাল বেশি বেশি লোক এসে জড়ো হচ্ছে। আবার গরম গরম বক্তৃতা শুনে লোকের মাথার রক্ত গরম হয়ে উঠছে।

মীটিং যখন শেষ হয় তখন আবার মিছিল ক'রে শ্যামবাজার আর ভবানী-পুরের দিকে শ্লোগান দিতে দিতে ভিন্ন ভিন্ন দলে এগিয়ে চলে তারা।

সেদিন মীটিং-এর শেষে দেবেশ দৌড়তে দৌড়তে এল।

সুরেন বললে—কী রে? কী ব্যাপার?

সুরেন তখন সবে ঘুরে-ফিরে বাড়ি এসেছে। তখনও হাত-পা-মুখ ধোওয়া হয়নি। সমস্ত বাড়িটাতেও তখন একটা থমথমে ভাব। মা-মণির এখন যায় তখন যায় অবস্থা।

দেবেশ বললে—শুনেছিস? সুব্রতর বোন নাকি সাক্ষী হচ্ছে?

—সুব্রতর বোন! পমিলি? কোথাকার সাক্ষী?

দেবেশ বললে—আরে তদন্ত কমিশনে? তুই, আমি, টুলু সবাই নাম দিয়ে এলুম, তোর মনে নেই?

সুরেন বললে—কিন্তু পমিলি কোন্ পক্ষের সাক্ষী হচ্ছে? ওর বাবার পক্ষের? মানে কংগ্রেসের ফেবারে?

দেবেশ বললে—তা কী করে জানবো? আমি তো তোকে সেই কথাই জিজ্ঞেস করতে এসেছি। তুই একবার পমিলির সঙ্গে গিয়ে দেখা করে আয় না!

সুরেন বললে—সেদিন যে ওর গাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছিল ধর্মতলার মোড়ে। গুন্ডারা তাড়া করেছিল, সেই সব কথাই হয়ত বলবে!

—তা তুই গিয়ে একবার দেখা করে আয় না!

সুরেন বললে—কিন্তু আমার যে আর যাবার উপায় নেই পমিলির কাছে।

—কেন? কী হলো তোর? তুই যে অত যেতিস ওদের বাড়িতে?

সুরেন বললে—সে যাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে। পুণ্যশ্লোকবাবু আমার ওপর চটে গিয়েছে।

—কেন, হঠাৎ চটলো কেন? কী করেছিলি তুই?

সুরেন বললে—পুণ্যশ্লোকবাবু জানতে পেরেছে, আমি তোদের পার্টির সঙ্গে মেলামেশা করি, তোদের সঙ্গে মীটিং করি, পূর্ণবাবুর হয়ে ভোট ক্যানভাস করি। সমস্ত খবরই পেয়ে গেছে। ও-বাড়িতে যাবার আর আমার মুখ নেই—

ওদের কথার মধ্যেই কখন সুধন্য কাছে এসে দাঁড়াল। মুখটা তার কাঁচুমাচু দেখাচ্ছে।

সুরেন বললে কী খবর? আপনাকে যে দেখিনি অনেকদিন?

সুধন্য বললে—আমি তো রোজই আসি, বরং আপনাকে দেখতে পাই না—আপনি বেরিয়ে যান রোজই—

দেবেশ বললে—তাহলে আমি আসি রে—

সুরেন বললে- এখন কোথায় যাচ্ছিস?

দেবেশ বললে—এখন আজ আর কোথাও বেরোব না। কাল ভোর চারটে থেকে শুরু হবে আবার।

—তোর সঙ্গে আবার কখন দেখা হচ্ছে?

দেবেশ তখন দরজার দিকে এগোচ্ছে, সুরেন তাকে এগিয়ে দিতে একেবারে রাস্তা পর্যন্ত হাজির হলো।

দেবেশ জিজ্ঞেস করলে—ও লোকটা কে রে?

সুরেন বললে—ও এ-বাড়ির কেউ না -

—এ-বাড়ির কেউ নয় তো এখানে কী করতে এসেছে! ভদ্রতা জানে না এতটুকু, আমরা দুজন কথা বলছি তার মধ্যে এসে নাক গলায়? লোকটা কে?

সুরেন বললে—ও ওই রকম। তোর সঙ্গে আমার কী কথা হচ্ছে, সেইটে জানতে চায়। শুধু আমাদের কথা নয়, এবাড়ির যা-কিছু, হবে ও সেইখানে নাক গলাবে। আসলে এবাড়িতে সেকালের একটা বুড়ো চাকর আছে, তারই ভাইপো। তার খুব বয়েস হয়েছে। তাকে দেখতে আসে আর কি! তা কালকে তুই কোথায় থাকবি?

দেবেশ বললে -কাল আমার সঙ্গে যাবি? আমি বীরভূমের দিকে যাবো। শুধু তো কলকাতাটা দেখলে চলবে না। মফঃস্বলের দিকেও যেতে হবে। ওখানকার ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলে আসতে হবে—

—তা তুই তো সেবার সব জায়গায় ঘুরে এলি রে।

দেবেশ বললে—হাওয়াটা দেখে আসতে যাচ্ছি। কংগ্রেস শুনলুম ওদিকে টাকা ছড়াচ্ছে। কিন্তু যাদের হাতে টাকা দিলে কাজ হবে তাদের হাতে তো টাকা পেঁাছোচ্ছে না।

সুরেন বললে—কেন?

দেবেশ বললে—সব তো চোর। ওই যে প্রজেশ, প্রজেশ সেন, পুণ্যশ্লোক-বাবু তো ওকেই সবচেয়ে বিশ্বাস করে। বিশ্বাস করে সব টাকাকড়ি ওকেই দেয়! কিন্তু প্রজেশ নিজেই তো একটা বাড়ি করে ফেলেছে সেই টাকা দিয়ে—

সুরেন বললে—আমি তোর সঙ্গে যাবো?

দেবেশ বললে—চল না, দু'দিন থেকেই চলে আসবো। তা আমার সঙ্গে তুই ঘুরতে পারবি তো? মাঠে মাঠে চাষাদের সঙ্গে রোদে পুড়তে হবে কিন্তু।

সুরেন বললে—তা পারবো—

দেবেশ বললে—আমি দেরী করবো না বেশি। প্রথমতঃ ভোট রয়েছে। তার ওপর তদন্ত কমিশন বসবে—সমস্ত তোড়জোড় তো আমাকেই করতে হবে—

—আমি তাহলে কখন যাবো তোর ওখানে?

দেবেশ বললে—ভোর চারটের মধ্যে পার্টির অফিসে চলে আয়—

সুরেন বললে—আচ্ছা—

—আমি কিন্তু তোর জন্যে বসে থাকবো। টুলুকেও সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি—

—ঠিক আছে—

বলে দেবেশ চলে গেল।

সকাল হয়েছে। সকাল নয় ঠিক, ভোর বলাই ভালো। বাহাদুর সিং তখন সবে ঘুম থেকে উঠে সদর গেট খুলছে। হঠাৎ একটা গাড়ি এসে বাইরে দাঁড়াল।

—সুরেন সান্ন্যাল আছে?

বাহাদুর সিং গাড়ি দেখে একটু সমীহ করে দরজা খুলে দিলে।

বললে—আপনি কোথা থেকে আসছেন হুজুর? কী নাম বলবো?

লোকটা বললে—বলো, তার বন্ধু সুব্রত। সুব্রত রায়, আমেরিকা থেকে এসেছে—

বাহাদুর সিং আমেরিকার নাম শুনে আর গাড়ি দেখে একটা সশ্রদ্ধ সেলাম করলে। তারপর দৌড়লো ভাগ্নেবাবুকে ডাকতে। সুব্রত গাড়িতেই বসে বসে অপেক্ষা করতে লাগলো।

কিন্তু সুরেনকে তখন কোথায় পাবে বাহাদুর? সুরেন সেদিন রাত তিনটের সময় উঠেছে ঘুম থেকে। তখন অন্ধকার চারদিকে। মাধব কুণ্ডু লেনের বাড়িটা তখন ঘুমে অচৈতন্য। আস্তে আস্তে বিছানা ছেড়ে কলতলায় গেল সে। উঠোনের আলো জ্বাললে। তারপর দুখমোচনের ঘরের দিকে কলঘরের দিকে যেতেই পেছন থেকে আওয়াজ হলো—কে?

সুরেন বুড়োবাবুর গলা শুনেই চিনতে পেরেছে।

কাছে গিয়ে বললে—আমি বুড়োবাবু, আমি।

—ও, ভাগ্নেবাবু?

সুরেন বললে—হ্যাঁ, আপনি ঘুমোননি?

বুড়োবাবু বললে—আমার ঘুম আসে না রাত্তিরে ভাগ্নেবাবু। রাত্তির হবার আগে মনে হয় খুব ঘুম আসবে, চোখ বুজে শুয়ে থাকি, কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসে না, সারারাত জেগে কাটাই—

সুরেন বললে—তাহলে তো তোমার খুব কষ্ট বুড়োবাবু? মানুষ না ঘুমোলে বাঁচবে কী করে? ডাক্তার কী বলছে?

বুড়োবাবু হাতের পাতাটা উল্টে বললে—ডাক্তার আর কী বলবে? আমি তো গঙ্গার দিকে পা বাড়িয়ে বসেই আছি. ডাক্তার তো মরা মানুষকে আর বাঁচাতে পারবে না—

সুরেন বললে—ওসব কথা ভাববেন না। মানুষের হাতে তো কোনও ক্ষমতা নেই, ভগবান যেমন করাচ্ছেন, আমরা তেমনিই করছি—

বুড়োবাবু বললে—এই কথাটা যা বলেছ, একেবারে খাঁটি কথা। তুমি যে এই বয়েসে ভগবানের নাম করলে বাবা, তাইতে আমি বড় খুশী হয়েছি। তোমার মত বয়েসে বাবা আমি ভগবান-টগবান কিছু মানতুম না, এখন তাই এত ভুগছি—

সুরেন বললে—আমিও পুরোপুরি ভগবান মানি না বুড়োবাবু। মানতে পারি না।

—তুমি ভগবান মানো না? কেন?

সুরেন বললে—কী করে মানবো বলুন? ভগবান কি আছে? ভগবান যদি থাকতো তাহলে কি আপনার এই দুর্দশা হতো, না মা-মণির এত দুঃখ-কষ্ট হতো? মা-মণি কার ওপর কী অন্যায় করেছে যে এত ভুগছে? মা-মণির অসুখ তো কই সারছে না?

বুড়োবাবু কোনও উত্তর দিলে না। সুরেনের মনে হলো মা-মণির কথা শুনে যেন বুড়োবাবুর আর কিছু বলবার রইল না। এতদিন ধরে সুরেন বুড়োবাবুকে দেখে আসছে। অসুখ ছাড়া কখনও দেখেনি সে বুড়োবাবুকে। কলতলায় স্নান সেরে যখন জামা-কাপড় বদলে রাস্তায় বেরিয়েছে তখনও কথাগুলো সুরেনের মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগলো। সেই ছোটবেলা থেকে কত কী দেখলে সে এখানে এসে। সত্যিই তো, কত সে দেখেছে, তবু যেন দেখার অনেক বাকি আছে তার। ওই তো পুণ্যশ্লোকবাবু, ওই পুণ্যশ্লোকবাবুর মেয়ে পর্মিলি, ছেলে সুব্রত। ওই দেবেশ ওই টুলু, ওদের ওই পার্টি! সবাই কীসের নেশায় ছুটে চলেছে? তাতে কার কী লাভ-লোকসান হবে? সেই আদিকাল থেকে কত হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি মানুষ আগেও এসেছে, এখনও আসছে; আবার ভবিষ্যতেও আসবে। তারাও ঠিক এমনি করে অর্থের পেছনে, খ্যাতির পেছনে, ক্ষমতার পেছনে ছুটেছে। এমনি করে তারাও মানুষের কল্যাণের জন্যে, মানুষের উপকারের জন্যে, আবার কেউ কেউ বা মানুষের ক্ষতির জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছে। কিন্তু তাতেই বা কার কী লাভ লোকসান হয়েছে!

ভাবলে অনেক সময় অবাক হতে হয়। সুরেনও অবাক হয়ে যায় ভেবে। কী জন্যে সে এই পৃথিবীতে জন্মেছে! সে কি এখানে এসেছে এই মাধব কুণ্ডু লেনের বাড়ির মালিকের সম্পত্তি পাবার জন্যে? না দেবেশের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে পার্টির কাজ করবার জন্যে? না কি ইতিহাসের এই জয়যাত্রা দেখবারই জন্যে!

যদি দেখতেই এসেছে তো দেখে তার কী লাভ-লোকসান হবে?

রাত পাতলা হয়ে আসছে। রাত তিনটের সময় স্নান করে সে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। তারপর সে হাঁটতে হাঁটতে বৌবাজারে দেবেশদের পার্টির অফিসের কাছে এসে পড়েছে। এখন ভোর চারটে। অন্ধকার এখন পাতলা হয়ে এল।

অত সকালেই সদর দরজা খোলা হয়ে গেছে।

সুরেন সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠলো। একজন-দুজন মেম্বার তখন উঠে পড়েছে। কয়েকজনের মুখ একটু একটু চেনা।

সুরেন বললে—দেবেশ উঠেছে নাকি? একবার ডেকে দেবেন—

একজন একটু আগ্রহ দেখালে। বললে—দেবেশদা? দেবেশদা তো চলে গেছে—

—সে কী, বীরভূম চলে গেছে দেবেশ? কিন্তু আমার যে সংগে যাবার কথা ছিল?

ছেলেটা বললে—তা তো জানি না। এই একটু আগে চলে গেল।

—যাবার সময় কিছু বলে যায়নি?

—না, কিছু বলে যায়নি তো?

—তাহলে এখন শিয়ালদা স্টেশনে গেলে দেখা হবে?

ছেলেটা বললে—তা তো বলতে পারি না—

সুরেন আর কিছু বললে না। সোজা আবার সিঁড়ি দিয়ে রাস্তায় নেমে এল। ক'টার সময় ট্রেণ ছাড়ে অত জানা নেই। বুড়োবাবুর সংগে কথা বলতে গিয়েই বুঝি দেরি হয়ে গেল। তা না হলে হয়ত দেবেশের সংগে তার দেখা হয়ে যেত! তবু হাঁটতে হাঁটতে শেয়ালদা স্টেশনের দিকেই চলতে লাগলো সুরেন।

সুব্রত ভোরবেলাই চলে এসেছিল মাধব কুণ্ডু লেনে। ভেবেছিল এত ভোরে নিশ্চয়ই সুরেনের সংগে দেখা হবে। কিন্তু এত ভোরে কোথায় বেরিয়ে গেছে সে! কলকাতায় নেমে পর্যন্ত সুব্রত অবাক হয়ে গেছে। আগেও এই কলকাতা ছিল। কিন্তু এ কলকাতাকে যেন সে আর চিনতে পারছে না আজকে। যেন সমস্ত বদলে গেছে। আমেরিকায় যাবার আগের কলকাতার সংগে যেন এর কোনও মিল নেই।

প্লেন থেকে নেমেই অবাক হয়ে গিয়েছিল সুব্রত!

ভেবেছিল বাবা আসবে, কিংবা হয়ত পার্মিলি।

কিন্তু তা নয়, শুধু একা জগন্নাথ গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

মালপত্র তখনও ছাড়ানো হয়নি। জগন্নাথ দেখতে পেয়েই কাছে এল। বললে—নমস্কার দাদাবাবু—

—কী রে, জগন্নাথ না? গাড়ি এনেছিস?

জগন্নাথ হেসে জবাব দিলে—হ্যাঁ—

—আর কেউ আসেনি?

জগন্নাথ বললে—না—

সুব্রত আর কিছু বলেনি। একটু অবাক হয়ে গিয়েছিল শুধু। কিন্তু রাস্তায় আসতে আসতে গাড়িটা হঠাৎ আটকে গেল। লম্বা প্রসেশান চলেছে একটা রাস্তা জুড়ে। নড়বার নাম নেই। বাস, ট্রাম, রিকশা সাইকেল সব জ্যাম।

সুব্রত বিরক্ত হয়ে উঠলো। জিজ্ঞেস করলে—এসব কী কাণ্ড রে?

জগন্নাথ বললে—এরকম রোজ হয় দাদাবাবু।

—এ কাদের প্রসেশান?

—ইনক্লাব জিন্দাবাদীদের!

—তার মানে? ইনক্লাব জিন্দাবাদীদের মানে কী?

—আজ্ঞে দাদাবাবু, এ রোজ বেরোয়। লাল-ঝাণ্ডাওয়ালাদের মিছিল। এখন এক ঘণ্টা আটকে থাকতে হবে এখানে।

তা জগন্নাথের কথাই সত্যি হলো। এক ঘণ্টার আগে এক পা-ও নড়লো না। রাস্তা, ফুটপাথ সব একাকার হয়ে গেল মানুষের ভীড়ে! মানুষ অফিসে যেতে পারলে না, কাজকর্ম সব প্রায় বন্ধ রইল ততক্ষণের জন্যে! সুব্রত নাকে রুমাল চাপা দিয়ে গাড়ির মধ্যে চুপচাপ বসে ঘামতে লাগলো।

জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁ রে, বাবা কিছু বলে না এদের?

জগন্নাথ বললে—বাবুর কথা আর কেউ তেমন শোনে না দাদাবাবু!

সুব্রত অবাক হয়ে গেল। বললে—তাই নাকি? কেন রে? শোনে না কেন?

—না দাদাবাবু, কংগ্রেসের কথা আর কেউ শুনতে চায় না। শুনছি তো এবার ভোট হবে, কেউ নাকি কংগ্রেসকে ভোট দেবে না, বাবুকেও ভোট দেবে না—

—ভোট দেবে না বাবাকে?

জগন্নাথ বললে—না—

—কেন?

জগন্নাথ বললে—তা জানি না।

বলে আবার গাড়ি চালাতে লাগলো। সুব্রত বললে—দিদি কেমন আছে রে? দিদিমণি আজকে এয়ারপোর্টে এল না কেন?

জগন্নাথ বললে—দিদিমণির অসুখ—

—অসুখ? কী অসুখ? আমাকে তো বাবা চিঠিতে কিছু লেখেনি! এখন কেমন আছে?

জগন্নাথ বললে—এখনও তো বাড়ি থেকে বেরোয় না। শুধু চুপচাপ শুয়ে থাকে—কারো সঙ্গে বেশি কথাও বলে না।

কথাটা শুনে সুব্রতর মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল। সুব্রত ভেবেছিল, সে কলকাতায় আসবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বাড়িতে উৎসবের ঢেউ উঠবে। এতদিন পরে সে ফিরছে! এতদিন অপেক্ষা করেছে সে এই দিনটির জন্যে। ভেবেছিল আর কেউ না আসুক, পর্মিলি নিশ্চয়ই আসবে। কিন্তু সব যেন উল্টে-পাল্টে গেল।

—হ্যাঁ রে, আমার সেই বন্ধুর খবর কী? সেই সুরেন? সেই যার সঙ্গে আমি এক স্কুলে এক ক্লাশে পড়তুম। সে আসে আমাদের বাড়িতে?

—আগে আসতেন মাঝে মাঝে, এখন আর আসেন না!

সুব্রত বললে—কেন? বিয়ে-টিয়ে করে সময় পায় না বুঝি আর?

জগন্নাথ বললে—না, বাবু বারণ করে দিয়েছে আসতে—

—কেন? বাবা কেন বারণ করেছে? কী করেছিল সে?

জগন্নাথ বললে—সুরেনবাবু যে লাল-ঝাণ্ডার দলে গিয়ে ভিড়েছে—

—সে কী?

জগন্নাথ বললে—হ্যাঁ দাদাবাবু। কমিউনিষ্টরা দিদিমণির গাড়িটা একদিন পুড়িয়ে দিয়েছিল—

সুব্রত চমকে উঠলো।—পর্মিলির গাড়ি? পুড়িয়ে দিয়েছিল? কেন?

জগন্নাথ বললে—বাবু যে কংগ্রেসের লোক। কংগ্রেসের লোকের গাড়ি পেলেই পুড়িয়ে দেয়।

—তা দিদির গাড়ি কে চালাচ্ছিল?

—আমি।

সুব্রত বললে—তুই? তুই চালাচ্ছিলি? তোর কিছু হয়নি?

জগন্নাথ বললে—আমি সঙ্গে সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিলুম তাই বেঁচে গেছি।

—আর দিদিমণি?

জগন্নাথ বললে—দিদিমণিকে পুলিশ উদ্ধার করে কংগ্রেস অফিসে নিয়ে গিয়ে তুলেছিল—সেই সব ব্যাপারের খোঁজখবর করবার জন্যেই তো এখন কমিটি বসেছে। সেই কমিটির সামনে আমাকে বাবু সাক্ষী হতে বলেছেন। আমিও তো সাক্ষী দেবো—

ততক্ষণে তারা বাড়ি এসে গিয়েছিল। গাড়ী থেকে নেমেই সুব্রত দৌড়ে বাবার ঘরে গেল।

—বাবা—বাবা—

হরিলোচন মুহুরী রোজকার মতন দফ্‌তরে বসে কাজ করছিল। সাহেবের ছেলেকে আসতে দেখেই উঠে দাঁড়ালো।

—কেমন আছেন হরিলোচনবাবু? ভালো তো সব?

হরিলোচন মুহুরী তোবড়া গালে হাসি ফোটালো।

বললে—হ্যাঁ খোকাবাবু, ভালো—

—বাবা কোথায়?

হরিলোচন মুহুরী বললে—তিনি তো বেরিয়ে গেছেন—

সুব্রত বললে—ঠিক আছে, আপনি কাজ করুন—

তারপর হঠাৎ কী মনে পড়ে গেল। আবার ফিরে এল ঘরের ভেতর। বললে—আচ্ছা হরিলোচনবাবু, জগন্নাথ বলছিল বাবা নাকি সুরেনকে এবাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে?

হরিলোচনবাবু বললে—হ্যাঁ—

হরিলোচনের চোখের সামনেই সেদিন ব্যাপারটা ঘটেছিল। কিন্তু ব্যাপারটা খোকাবাবুকে বলা উচিত হবে কিনা ঠিক বুঝতে পারলে না।

—কেন তাড়িয়ে দিলে? কী করেছিল সুরেন?

হরিলোচনবাবু বললে—আমি তা ঠিক জানি না—

—ও—বলে সুব্রত সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে ওপরে উঠতে উঠতে চেঁচাতে লাগলো—দিদি, এই দিদি, আমি এসেছি রে—

বলে পমিলির ঘরের সামনে এসে দরজা ঠেলতে গিয়ে দেখলে দরজায় খিল দেওয়া।

চিৎকার করে ডাকতে লাগলো—এই দিদি, দরজা খোল, আমি এসেছি, এত বেলা পর্যন্ত তুই ঘুমোচ্ছিস! খোল, দরজা খোল—

পমিলি ভেতর থেকে কোনও উত্তর দিলে না। যেন কিছুই শুনতে পাচ্ছে না সে। তবে কি তার ঘুম ভাঙেনি নাকি? এত বেলা পর্যন্ত ঘুমোচ্ছে দিদিটা!

কিন্তু আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা যায়!

নিচে থেকে দৌড়তে দৌড়তে রঘু এসে হাজির। অপরাধীর মত সে কাছে এসে দাঁড়ালো।

সুব্রত বললে—কোথায় ছিলি তুই এতক্ষণ? আমি কখন এসে গেছি আর

তোর দেখা নেই—
রঘু সে কথার উত্তর না দিয়ে হঠাৎ দাদাবাবুর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে একটা প্রণাম ঠুকে দিলে।
বললে—কেমন আছেন দাদাবাবু?
সুব্রত গলে গেল যেন। রঘুর বুদ্ধি দেখে হেসে ফেললে।
বললে—তোর তো খুব পাকা বুদ্ধি হয়েছে দেখছি। ভেবেছিস প্রণাম করলেই সব দোষ মকুব হয়ে যাবে, না? কতক্ষণ এসেছি, তোদের কারো সাড়া-শব্দ নেই? দিদিমণি কি এত বেলা পর্যন্ত ঘুমোয় নাকি আজকাল?
রঘু বললে—আপনার ঘরে চলুন দাদাবাবু, আপনার ঘর আমি সাজিয়ে-গুছিয়ে রেখেছি। বাবু আমাকে সমস্ত ঠিকঠাক করে রাখতে বলেছিলেন—
সত্যিই পুণ্যশ্লোকবাবু সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখতে বলেছিলেন ছেলের ঘরটা। নতুন ফার্নিচার কেনা হয়েছিল, নতুন সব কিছু। ছেলে এখন বড় হয়েছে। আমেরিকা ঘুরে এসেছে। তার রুচির সঙ্গে মিলিয়ে ঘর সাজিয়ে দিতে হবে। বউবাজারের সেরা দোকানে অর্ডার দিয়ে ফার্নিচার করিয়ে নিয়েছিলেন। টাকার প্রশ্ন নয়, আসলে হলো রুচি। যেন ছেলের রুচির সঙ্গে মেলে, খাপ খায়। আসলে এই প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তির সমস্ত কিছুর ডিভিডেন্ড যেন সুব্রত পায়। পুণ্যশ্লোকবাবু সারা জীবন নিজের প্র্যাকটিস নষ্ট করেছেন, জেল খেটেছেন, বড়লোকের ছেলে হয়েও বস্তিতে-বস্তিতে ঘুরে সোস্যাল ওয়ার্ক করেছেন। কীসের জন্যে করেছেন? পরোপকার করবার জন্যে? পরোপকার করা ভালো। ওতে পরকালের সুখ হয়। কিন্তু পরকালটা তো অবাঙ্‌মনসোগোচর। সেসব কথা পরে ভাবা যাবে। আগে ইহকালটা তো রক্ষে হোক। ঐহিক সুখের জন্যেই এত কিছু করা—এই কংগ্রেস-ফংগ্রেস যা কিছু। তা ইহকালে সেই কাজের জন্যে পুরো ডিভিডেন্ড তো তিনি পাচ্ছেনই। ভালোই পাচ্ছেন। নিজে যেটা পাচ্ছেন, সেটা যাতে ছেলে পায় তার ব্যবস্থাও করে যাচ্ছেন। এই যে সামনে ভোট আসছে, এতে তো তাঁকে নামতে হবে। নেমে জিততে হবে। তারপর যখন তিনি থাকবেন না, তখন ছেলেও আবার ভোটে নামবে। সেও আবার মিনিস্টার হবে। এমনি করে তাঁর মতই ছেলেও বরাবর ডিভিডেন্ড পেয়ে যাবে। তারপর তাঁর ছেলের ছেলে। ছেলের ছেলের ছেলে। বংশানুক্রমে এমনি করে তাঁর পদমর্যাদার ধ্বজা উত্তরাধিকারীরা বয়ে নিয়ে চলবে। এই-ই তো তাঁর কামনা, এই-ই তো তাঁর আকাঙ্ক্ষা!
সন্ধ্যেবেলা পুণ্যশ্লোকবাবু বাড়ি এলেন। এসেই জগন্নাথকে ডাকলেন। বললেন—দাদাবাবুকে আনতে গিয়েছিলি এয়ারপোর্টে?
জগন্নাথ বললে—গিয়েছিলুম।
পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—কোনও অসুবিধে হয়নি তো? ঠিক সময়ে প্লেন এসেছিল?
জগন্নাথ বললে—হ্যাঁ—
—দাদাবাবু বাড়িতে আছে?
জগন্নাথ বললে—না, তিনি বেরিয়ে গিয়েছেন—
—সে কী? এসেই বেরিয়ে গেল? খাওয়া-দাওয়া?
—খাওয়া দাওয়া সেরে বেরিয়েছেন।
—কোথায় গেল রে? গাড়ি? গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছে?
জগন্নাথ বললে—হ্যাঁ, দিদিমণির গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছেন—

আর কিছু বললেন না পুণ্যশ্লোকবাবু। অনেক সমস্যা তখন তাঁর মাথায় ঘুরছে। ইলেকশানের ভাবনা আছে, এনকোয়ারি কমিশনের ভাবনা আছে। পার্টি নমিনেশনের ভাবনা আছে। ভাবনা কি কম তাঁর? শুধু ডিভিডেন্ড তো নয়, ডিভিডেন্ডের জন্যে ইনভেষ্টমেণ্টও তো করতে হবে। হেভি ইনভেষ্টমেণ্ট! এত কালের জেল খাটা আছে, এতদিনের সোস্যাল ওয়ার্ক আছে, এত লাখ লাখ টাকা খরচ আছে। ওগুলোই তো ইনভেষ্টমেণ্ট। ওই ইনভেষ্টমেণ্ট তিনি করেছিলেন বলেই তো আজ তিনি মিনিষ্টার। এখন তিনি যেখানে যান সেখানে লোকে তাঁর কথা শোনে। তাঁকে লোকে খাতির করে! কিন্তু এ খাতির তাঁকে আর কতদিন করবে? এবারের ইলেকশনে তিনি যদি ঠিক মত ভোট না পান?

কথাটা ভাবতেও তাঁর আতঙ্ক হয়। পাঁচ বছর পর পর এই আতঙ্কের মুখোমুখি হতে হয়। জীবনে কিছুই তো চিরস্থায়ী নয়। টাকাও যেমন চিরস্থায়ী নয়, সম্মান প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠাও তাই। কেউই বলতে পারে না কতদিন পর্যন্ত তার আয়ু। বিশেষ করে রাজনীতিতে তো. তা আরও বেশি করে ক্ষণস্থায়ী। কেন তিনি রাজনীতিতে এলেন? কে তাঁকে এ-লাইনে নিয়ে এল! আজ যে খাতির তাঁর হাতের মুঠোয় রয়েছে কাল তা থাকবে তো?

সারাদিন পুণ্যশ্লোকবাবুর বড় যন্ত্রণা গেছে। একবার কংগ্রেস অফিস, আর একবার রাইটার্স বিল্ডিং, কোথাও গিয়ে শান্তি পাননি তিনি। ফাইলগুলো টেবিলের ওপর পাহাড় হয়ে উঠেছে। অফিসের ক্লার্করাও যেন বুঝতে পেরেছে মিনিষ্ট্রি বদলে যাবে। যেন আগেকার মত আর তেমন ভয়-ভক্তিও করে না তারা! তবে কি তিনি তাদের সকলের চোখে হঠাৎ বড় ছোট হয়ে গেলেন? এতদিন ধরে যে তিনি জেল খেটেছেন, এতদিন ধরে যে এতগুলো লোককে চাকরি দিয়েছেন, এত লাইসেন্স পারমিট বিলিয়েছেন, সে কি এই জন্যে? তার কি কোনও মূল্য নেই? আমাকেই যদি তোমরা না দেখবে, তবে আমিই বা তাহলে তোমাদের দেখতে গেলাম কেন?

—বাবু, আপনার খাবার দেবে?

হঠাৎ চমক ভাঙলো পুণ্যশ্লোকবাবুর।

বললেন—হ্যাঁ রে, খোকা এসেছে?

—না বাবু।

ঘড়ির দিকে দেখলেন পুণ্যশ্লোকবাবু। রাত ন'টা! রাত ন'টা পর্যন্ত কোথায় রয়েছে সে? কলকাতা সহরে এত যাবার জায়গা তার কবে হলো? আজই আমেরিকা থেকে ফিরে এসেই তাদের সঙ্গে দেখা না করলে তার চলতো না? বাড়িতে আমি ছিলুম না সত্যি কথা, কিন্তু আমিও তো কাজের মানুষ! সমস্ত দেশের সমস্যা আমার নিজের সমস্যা। আমি যদি নিজে এয়ারপোর্টে না যেতে পেরে থাকি তো কী এমন অন্যায়টা হয়েছে?

—হ্যাঁ রে, দিদিমণি গিয়েছিল খোকাকে আনতে?

রঘু বললে—না, জগন্নাথ একলাই গাড়ি নিয়ে গিয়েছিল।

—কেন, আমি যে পমিলিকে বলেছিলুম এয়ারপোর্টে যেতে?

—না, দিদিমণি অনেক দেরি করে ঘুম থেকে উঠেছে! দাদাবাবুর সঙ্গে দেখাই হয়নি।

পুণ্যশ্লোকবাবু অবাক হয়ে গেলেন! এতদিন পরে সুব্রত এল আর পমিলি তার সঙ্গে দেখাই করলে না। এ কী রকম সম্পর্ক! অথচ আগে তো এমন ছিল না। আগে তো দু'জনে খুব ঝগড়া করতো। ঝগড়াও করতো আবার ভাবও

করতো! হঠাৎ এই ক'বছরের মধ্যে এমন কী হলো যে সব কিছু বদলে গেল?

—হ্যাঁ রে, দিদিমণি ঘরে আছে নাকি?

রঘু বললে—হ্যাঁ, আছেন।

পুণ্যশ্লোকবাবু উঠলেন। বললেন—আজকে আমি খাবো না, খেয়ে এসেছি বাইরে থেকে, দিদিমণি যদি খায় তো তাকে খাবার দি গে যা—

রঘু বললে—দিদিমণি খেয়ে নিয়েছেন।

সে কী! পুণ্যশ্লোকবাবু রঘুর দিকে একদৃষ্টে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন। যেন তিনি পর্মিলিকেই দেখছেন রঘুর মধ্যে দিয়ে। এমন তো হয় না। এত রকম মন-কষাকষির মধ্যেও তো পর্মিলি যেদিন বাড়িতে থেকেছে সেদিন পুণ্যশ্লোক-বাবুর সঙ্গে এক সঙ্গেই খেতে বসেছে। তাছাড়া এখন সুব্রত এসেছে। এতদিন পরে বাড়িতে এসেছে, এই অবস্থায় কেন সে তাড়াতাড়ি একলা খেয়ে নিলে!

—আচ্ছা, তুই যা—

বলে আস্তে আস্তে পর্মিলির ঘরের দিকে চলতে লাগলেন। রঘু আগেই তার নিজের কাজে চলে গিয়েছিল। পুণ্যশ্লোকবাবু গিয়ে দাঁড়ালেন পর্মিলির ঘরের সামনে।

ডাকলেন—পর্মিলি—পর্মিলি—

অনেকক্ষণ ডাকবার পর পর্মিলি দরজা খুলে দিলে ভেতর থেকে! পুণ্য-শ্লোকবাবু চেয়ে দেখলেন মেয়ের মুখের দিকে।

বললেন—কী হয়েছে রে তোর পর্মিলি? শরীর খারাপ নাকি?

পর্মিলি দরজা খুলে দিয়ে আবার গিয়ে বিছানায় বসলো। পুণ্যশ্লোক-বাবুও আস্তে আস্তে ভেতরে ঢুকলেন। তারপর একটা চেয়ারের ওপর বসলেন।

বললেন—কী হয়েছে মা তোমার? শুনলুম সুব্রতর সঙ্গে তোমার দেখাই হয়নি। এতদিন পরে সুব্রত এল, তার সঙ্গে তুমি একবার দেখাই করলে না। সে কী ভাবলে বলো তো?

পর্মিলি কিছু উত্তর দিলে না।

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—কই, উত্তর দিচ্ছ না যে?

পর্মিলি বললে—আমার কিছু ভালো লাগছে না—

—ভালো লাগছে না মানে?

পর্মিলি বললে—বললুম তো কিছু ভালো লাগছে না—

—কেন ভালো লাগছে না কিছু?

পর্মিলি বললে—তা জানি না।

পুণ্যশ্লোকবাবু গলা চড়িয়ে বললেন—কেন জানো না? তোমার ভালো না-লাগার কারণ কি অন্য লোকে জানবে? বলো, উত্তর দাও—

পর্মিলি চুপ করে রইল।

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—তোমার কী হলো বলো তো? কী হয়েছে তোমার? তুমি কী চাও?

পর্মিলি বললে—আমি কিছুই চাই না। তুমি এ-ঘর থেকে এখন যাও—

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—কেন যাবো? তোমার ভালো-মন্দ সম্বন্ধে জানবার অধিকার আছে আমার। বলো তোমার কী হয়েছে? কেন তুমি আর ক্লাবে যাও না?

পর্মিলি বললে—আমি তো বলেছি আমি কিছুই চাই না।

—কিন্তু কেন চাও না? কে তোমায় চাইতে বারণ করেছে? আমি তোমা:

ব্যাঙ্ক এ্যাকাউণ্ট করে দিয়েছি, সেখানে তোমার আরও টাকা দরকার?

—না।

—শাড়ি, গয়না?

—না না, কিছুই আমার চাই না। আমি বার বার বলছি আমার কিছুই চাই না। তবু তুমি আমায় বিরক্ত করছো মিছিমিছি!

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—আমি তোমার বাবা। তোমার মা নেই। ছোটবেলা থেকে একাধারে আমিই তোমার বাবা, আবার আমিই তোমার মা! আমার কাছে কিছু বলতে লজ্জা কোর না। বলো, তুমি বিয়ে করবে?

—না।

—কাউকে ভালোবেসেছ তুমি? বলো, লজ্জা কোর না!

পর্মিলি হঠাৎ রেগে উঠলো। বললে—উঃ, তুমি কি আমাকে মেরে ফেলতে চাও? আমি তোমার কী ক্ষতি করেছি যে এমন করে তুমি আমায় বলছো? তুমি কেন আমার ঘরে এলে? তোমার তো বাইরে অনেক কাজ আছে, তুমি তোমার কাজ নিয়ে থাকো গে না! তোমার কংগ্রেস আছে, তোমার ভোট আছে, তোমার রাইটার্স বিল্ডিং আছে, কেন আমাকে বিরক্ত করতে আসো তুমি?

বলে নিজের শাড়ির আঁচলটা দিয়ে মুখ ঢেকে যেন নিজের লজ্জা, নিজের যন্ত্রণা ঢাকলো। আর পুণ্যশ্লোকবাবুর মনে হলো পর্মিলি যেন আঁচলের আড়ালে নিঃশব্দে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

পুণ্যশ্লোকবাবু হতবাক্ হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। কী করবেন বুঝতে পারলেন না। সারাজীবন তিনি নিজের উন্নতির চেষ্টায় উন্মত্ত হয়ে ছুটে চলেছেন। যাকে খোসামোদ করলে উন্নতির সিঁড়ির ধাপগুলো অনায়াসে অতিক্রম করা যায়, কংগ্রেসের সেই সব মহারথী পান্ডাদের উমেদারী করে এসেছেন। ওয়ার্কিং কমিটির মেম্বারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সুযোগ পেলেই তোয়াজ করে করে আজকে এই অবস্থায় এসে পৌঁছিয়েছেন। কিন্তু তার পরিবর্তে? তার পরিবর্তে কি এই দাম দিয়েছেন!

কিন্তু আর বেশিক্ষণ নিজেকে চেপে রাখতে পারলেন না পুণ্যশ্লোকবাবু।

বললেন—মুখ খোল পর্মিলি, মুখ খোল। আমার কথার জবাব দাও। মুখ খোল—

পর্মিলি বোধহয় ততক্ষণে সামলে নিয়েছে। আঁচলটা মুখ থেকে নামিয়ে দিলে।

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—একটা খবর শুনলাম, তুমি বলো সেটা সত্যি কিনা!

—কী খবর?

—এনকোয়ারি কমিশনে তুমি নাকি পুলিশের বিরুদ্ধে সাক্ষী হিসেবে নাম দিয়েছ? সত্যি?

পর্মিলি মাথা উঁচু করে বাবার দিকে তাকালো।

বললে—হ্যাঁ, সত্যি?

—কেন তুমি সাক্ষী হতে গেলে?

পর্মিলি বললে—আমার ইচ্ছে।

—তোমার ইচ্ছে মানে? তুমি কি মনে করেছ, তুমি যা ইচ্ছে তাই করতে পারবে? আমার ইচ্ছে বলেও তো একটা কথা আছে। তুমি জানো আমি একজন মিনিস্টার! সমাজে, গভর্ণমেণ্টে আমার একটা পোজিশন আছে! দশটা লোকে

আমার কথা শোনে।

পর্মিলি বললে—সেই জন্যেই আমি সাক্ষী হয়েছি। তোমার কথা সবাই শোনে আর আমার কথা কেউ শোনে না—তাই আমি চাই আমার কথাও কেউ শুনুক।

—তোমার আবার কী কথা?

—আমার কথা আমি জাজের কাছে গিয়ে শোনাবো।

—কিন্তু তোমার কী কথা তাই আমাকে বলো! তোমার বয়েস কত যে তোমার আবার কথা থাকবে? বলো তুমি সেখানে গিয়ে কী বলবে? গভর্ণমেণ্টের এগেনস্টে তোমার কী কথা বলার থাকতে পারে? তুমি গভর্ণমেণ্টের কতটুকু জানো?

পর্মিলি বললে—আমি সব জানি।

—সে সবটা কী?

—আমি তো বলেছি সে আমি জাজের কাছে গিয়ে বলবো।

—তবু বলবে না? আমিই তো গভর্ণমেণ্ট। বলো গভর্ণমেণ্টের কী দোষ তুমি দেখেছ? গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বলবে মানে তুমি আমার বিরুদ্ধে বলবে? আমার পুলিশের বিরুদ্ধে? কংগ্রেসের বিরুদ্ধে?

পর্মিলি বললে—বার বার তুমি আমাকে এত কথা জিজ্ঞেস কোর না। আমি জানি না কে গভর্ণমেণ্ট, কে কংগ্রেস। আমার সে সব জানতে বয়ে গেছে। আই ডোণ্ট কেয়ার টু নো আইদার। আমি যা জানি তাই-ই আমি এভিডেন্স দেবো।

পুণ্যশ্লোকবাবু গম্ভীর হয়ে গেলেন।

বললেন—তুমি কি তাহলে আমার কেরিয়ার নষ্ট করতে চাও?

পর্মিলি বললে—তোমার কেরিয়ার নষ্ট হলে আমার কী? আমি তো গভর্ণমেণ্টও নই, কংগ্রেসেরও কেউ নই!

—তার মানে?

—সোজা বাঙলা কথারও কি মানে বুঝিয়ে বলতে হবে?

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—দেখ, মানুষের টলারেন্সেরও একটা সীমা আছে। তুমি সেই সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছো কিন্তু পর্মিলি!

পর্মিলিও কঠিন হয়ে উঠলো! বললে—তুমি কি আমাকে ভয় দেখাচ্ছো?

—কিন্তু মনে রেখো তুমি আমার ডিপেনডেণ্ট। এখনও আমার টাকা নিয়েই তোমার যা কিছু বাবুয়ানি। জানো আমি এক মুহূর্তে তোমার এ্যালাউন্স স্টপ্ করে দিতে পারি?

পর্মিলি বললে—কিন্তু আমার আর কোনও ডাউট নেই যে, তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ। তবে এটাও জেনে রাখো যে আমি ভয় পাবার মেয়ে নই। তুমি এ্যালাউন্স বন্ধ করলেও আমি ভয় পাবো না। আমি যা ভেবেছি তা করবোই—

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—কিন্তু আমি যদি তোমাকে সাক্ষী হতে না দিই—

—তুমি আমাকে বাড়িতে আটকে রাখবে?

—ধরো যদি আমি তা-ই করি!

—কী করে তুমি আটকাবে? ঘরে তালাচাবি দিয়ে বন্ধ করে রাখবে? তুমি কি এত নীচ হতে পারো?

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—পর্মিলি, এখনও বলছি তুমি তোমার মত বদলাও—

পর্মিলি বললে—কেন বদলাবো? তোমার ভয়ে?

—ভয়ে না-ই বা বদলালে, না-হয় আমার অনুরোধেই বদলালে।

পর্মিলি বললে—কেন, আমার নিজের স্বাধীন ইচ্ছে বলে কি কিছু নেই?

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—হাজার বার আছে। তোমার স্বাধীন ইচ্ছেতে হাত দেবার অধিকার কারোর নেই! কিন্তু তোমার স্বাধীন ইচ্ছে যদি অন্য লোকের স্বাধীন ইচ্ছের ওপর বাধা জন্মায়, তাহলে? যদি তাতে অন্যের ক্ষতি হয়, তাহলে?

—আমার জন্যে যদি তোমার ক্ষতি হয় তো আমি কী করতে পারি?

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—দেখ পর্মিলি, আমি আর এসম্বন্ধে কিছু কথা বলতে চাই না। কিন্তু একটা কথা জেনে রেখো, পলিটিক্স যারা করে, তারা সেন্টিমেন্টের ধার ধারে না। তা যদি হয় তো আমিও ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারি—

পর্মিলি বললে—তার মানে?

—তার মানে আমাকে জিজ্ঞেস কোর না! যা করবো তা আমিই জানি—

—কী করবে খুলেই বলো না—

হঠাৎ রঘু বাইরে এসে দাঁড়ালো।

পুণ্যশ্লোকবাবু তাকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন—কী রে? কিছু বলবি?

রঘু বললে—দাদাবাবু এসেছেন—

আর সঙ্গে সঙ্গে সুব্রত এসে ঘরে ঢুকলো।

সেদিন যে-কাণ্ড সেই ঘরের ভেতরে অনুষ্ঠিত হলো তা সুব্রতকে অবাক করে দিলে। বহুদিন ধরেই সে কলকাতায় আসতে চাইছিল। বিদেশে গিয়ে তার মনে হয়েছিল সে যেন প্রবাসী। কিছুতেই বিদেশটাকে নিজের দেশে রূপান্তরিত করতে পারেনি। বার বার মনে হয়েছে কলকাতায় সে কবে ফিরবে! কিন্তু যত-বারই সে ফিরতে চেয়েছে, ততবারই পুণ্যশ্লোকবাবু লিখেছেন আরো কিছুদিন ওখানে থাকতে। কারণ রোজ রোজ তো আর আমেরিকায় যাওয়ার সুযোগ ঘটবে না। ওখানে যদি ভালো না লাগে তো কন্টিনেন্টে যাও। কন্টিনেন্টে কিছুদিন বেড়িয়ে এসো। টাকার যখন অভাব নেই, তখন তোমার বেড়াতে দোষ কী? বেড়ানোও তো এক রকম এডুকেশন। আমি যতদিন আছি, ততদিন তোমার কীসের ভাবনা! ঘুরে নাও এখন। তারপর যখন জীবিকার জোয়ালে আটকে যাবে, তখন আর ছুটি পাবে না।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর থাকতে পারলে না সুব্রত। দিনের বেলাটা তার সেখানে বেশ কাটতো। কোনও রকমে কলেজ, দোকানপাট, রাস্তাঘাট, মানুষজন দেখতে দেখতে কেটে যেত। চারদিকের ব্যস্ততা। সবাই যেন ছুটছে। কীসের জন্যে ছুটছে কে জানে। কেউ ছুটছে টাকার জন্যে, কেউ খ্যাতির জন্যে, কেউ বা ভোগের জন্যে। কিন্তু আসলে ছুটতে ছুটতে সবাই হয়রান। কেন যে ছুটছে তাও তখন তারা ভুলে গেছে। যেন ছোটার জন্যেই তখন তারা ছুটছে। আর যখন রাত নামে তখন আছে ট্র্যানকুইলাইজার। তখন আছে স্লিপিং-পিল্। তারই যে-কোনও একটা মুখে দিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দাও। এক ঘুমে রাত কাবার হয়ে যাবে।

ইন্ডিয়ার জীবনের সঙ্গে সেখানকার জীবনের যেন আকাশ-পাতাল ফারাক।

সেখানে কয়েক বছর সুব্রত কাটিয়েছিল বটে, কিন্তু সেখানকার জীবনের সঙ্গে সে একাকার হতে পারেনি। বার বার তাই কেবল বাড়ির কথা মনে পড়তো। যেদিন কাজ ফুরিয়ে গেল, সেদিন আর এক মুহূর্ত থাকতে ইচ্ছে হলো না তার। সোজা পাড়ি দিলে দেশের দিকে। চিঠি লিখে দিলে দিদিকে—আমি যাচ্ছি। কিন্তু ওদিক থেকে তেমন কোনও সাড়া না পেয়ে সুব্রত বড় বিব্রত বোধ করলে। তাহলে সে ইণ্ডিয়ায় ফিরে যাক এ কি চায় না কেউ?

এয়ারপোর্টে নেমে যখন কাউকে সে দেখতে পেলে না, তখন তার ধারণা যেন আরো দৃঢ় হয়ে গেল। শুধু জগন্নাথ এসেছে তাকে নিতে। আর কেউ এল না কেন? কেন বাবা এল না? আর বাবার না-হয় অনেক কাজ থাকতে পারে, কিন্তু পমিলি? যাবার দিন তো পমিলিই এয়ারপোর্টে এসে তুলে দিয়ে গিয়েছিল তাকে। এবার ফিরে আসার সময় এল না কেন? তার কীসের কাজ এত? তার ফিরে আসাতে কি কেউ খুশী নয়?

তারপর বাড়িতে এসেও কারোর সঙ্গে দেখা হলো না। পমিলি কি জানতো না যে সে আজ ফিরে আসবে?

মনটা এমনিতেই ভারি হয়ে গিয়েছিল সুব্রতর, তার ওপর কারো সঙ্গে দেখা না হওয়াতে আরো ভারি হয়ে গেল। বাবা কি তার জন্যে সমস্ত কাজকর্ম কয়েক ঘণ্টার জন্যে স্থগিত রাখতে পারতো না?

গাড়িটা নিয়ে তখনই সে বেরিয়ে গেল। কোথায়ই বা যাবে সে? তবু সেই ছোটবেলাকার কলকাতাটা ঘুরে দেখতে গেল। কিন্তু সে কলকাতাকে যেন সে চিনতে পারলে না। এ কী হয়েছে এ সহরের! কলকাতার পার্কগুলোর এ কী চেহারা! সেই আগেকার কার্জন পার্কের চেহারা এই রকম হয়েছে? সবুজ ঘাস আর মাঠ ছিল যেখানে, সেখানে উদ্বাস্তুদের বাজার হয়েছে। এসব কী হলো? এসব কেন হলো?

গাড়িটা নিয়ে চলতে চলতে একটা জায়গায় এসে থামলো সে। গাড়িটা রাস্তার ধারে পার্ক করে চাবি বন্ধ করে দিয়ে সে ফুটপাথে নামলো। ফুটপাথে দলে দলে সব লোক দাঁড়িয়ে আছে, ঘোরাফেরা করছে। এ যেন এক অন্য কলকাতা দেখছে সে। যেন এ এক অন্য সহর।

একজন ভদ্রলোক সুব্রতর দিকে চেয়ে দেখছিল অনেকক্ষণ ধরে। সুব্রতও দেখলে সেদিকে চেয়ে।

বললে—আপনি আমায় কিছু বলবেন?

ভদ্রলোক বললে—আচ্ছা, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি। আপনার নাম কি দেবাশীস? দেবাশীস সেন?

সুব্রত বললে—না তো, আমার নাম সুব্রত। সুব্রত রায়—

—ও, আমি ভুল করেছিলুম, কিছু মনে করবেন না। দেবাশীসকে ঠিক আপনার মত দেখতে—

বলে ভদ্রলোক খুব লজ্জিত হয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছিল। কিন্তু সুব্রত বললে—না, মনে করবার কী আছে আমার! এ রকম ভুল তো হতেই পারে—

তারপর আবার বললে—আমি অনেকদিন কলকাতায় ছিলুম না, তাই কলকাতাটা একটু দেখে বেড়াচ্ছি—

ভদ্রলোক কৌতূহলী হয়ে উঠলো—কোথায় ছিলেন?

সুব্রত বললে—আমেরিকায়—

ভদ্রলোক যেন হঠাৎ মুখর হয়ে উঠলো। বললে—তা আমেরিকায় গিয়ে-

ছিলেন তো ফিরলেন কেন মশাই? অমন আরামের দেশ ছেড়ে কেউ এই জঘন্য দেশে আসে? না ফিরলেই পারতেন!

সুব্রত বললে—কী বলছেন আপনি? নিজের জন্মভূমিতে ফিরে আসবো না?

—আরে মশাই, এ দেশকে আমাদের জন্মভূমি বলতেও লজ্জা করে। এমন নচ্ছার দেশ দুনিয়ায় আছে? এই দেখুন না, এক ঘণ্টা ধরে বাসে উঠবো বলে দাঁড়িয়ে আছি, বাদুড়-ঝোলা হয়ে সব মানুষগুলো আসছে। এসব দেখবারও কেউ নেই, এর প্রতিকারও করবার কেউ নেই। জানোয়ার না হলে কেউ এ দেশে বাস করে?

সুব্রত জিজ্ঞেস করলে—আপনি কতদূর যাবেন?

—আমি যাবো যাদবপুর! আমরা মধ্যবিত্ত লোক, যাদবপুর-ঢাকুরিয়া ছাড়া থাকবো আর কোথায় বলুন? কোথাও তো বাড়ি-ভাড়া পাওয়া যাবে না আমাদের মত লোকের।

সুব্রত বললে—তাহলে, আপনার যদি আপত্তি না থাকে তো চলুন না, আমার গাড়ি আছে, আমি আপনাকে সেখানে পৌঁছিয়ে দিতে পারি—

গাড়ি আছে! ভদ্রলোক যেন কেমন বিহ্বল হয়ে গেল!

বললে—একদিন গাড়ি চড়লে তো আমার দুঃখ ঘুচবে না। তা চলুন, আপনার একটু পেট্রল পুড়বে! আপনি কোন্ দিকে থাকেন?

বলে ভদ্রলোক সুব্রতর গাড়িতে গিয়ে উঠলো। সুব্রতও গাড়ি ছেড়ে দিলে।

সুব্রতর পাশে বসে চলতে চলতে ভদ্রলোক বললে—আপনারা মশাই বড়-লোকের ছেলে, আপনাদের ভাবনা কী, আমাদের খেটে খেতে হয়, খেটে খেটে আমাদের জান প্রায় শেষ হয়ে গেল—

সুব্রত বললে—আমাকেও এবার খেটে খেতে হবে। চিরকাল তো আর বাবার হোটেলে থাকা চলবে না—

—আপনার বাবা নিশ্চয়ই বড়লোক।

সুব্রত হাসলো—হ্যাঁ, তা বড়লোক একথা অস্বীকাব কববার উপায় নেই।

—তাহলে? আপনি আমাদের দুঃখ বুঝবেন কী করে?

—কিছু কিছু বুঝবো বৈ কি! আপনি বলুন না?

ভদ্রলোক বললে—কাঁধে বগলে হাতে ঝুলিয়ে রেশন আনা কাকে বলে তা আপনি জানেন? আপনি জানেন না। রেশনের দোকান কাকে বলে তাও আপনি কখনও নিজের চোখে দেখেননি। দেখেননি তার কারণ আপনার বাবা বড়লোক—

গাড়ি চালাতে চালাতে সুব্রত বললে—আমি স্বীকার কবছি আমি বড়লোক। বড়লোকের ছেলে। বড়লোকের ছেলে হওয়া যদি অপরাধ হয় তো আমি অপরাধী—

ভদ্রলোক বললে—আপনি কিছু মনে করবেন না। আমি ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে বলছি না। আমাদের দেশের মাথাওয়ালা লোকরা যদি একবার বুঝতো যে বাসে-ট্রামে ঝুলে ঝুলে আসা-যাওয়ার কী ঝামেলা, তাহলে আর এরকম অব্যবস্থা চলতো না—

সুব্রত বললে—তা আপনারা এব প্রতিবাদ করেন না কেন?

ভদ্রলোক বললে—কার কাছে প্রতিবাদ করবো? দেশের রাজা কে?

সুব্রত বললে—কেন, কংগ্রেস!

ভদ্রলোক বললে—কংগ্রেস মানে তো গুণ্ডা মশাই! সেই আগেকার মহাত্মা গান্ধীর কংগ্রেস কি আর আছে?

সুব্রত অবাক হয়ে গেল। বললে—কেন? সে কংগ্রেস নেই?

ভদ্রলোক বললে—আপনি বাইরে ছিলেন তাই জানেন না মশাই, আসলে সব জোচ্চোর। মাথার ওপরে ডাক্তার বিধান রায় আছেন, তিনি ডাক্তার, ডাক্তারি নিয়ে থাকলেই পারেন, তা নয়, পলিটিক্সে আসার তাঁর দরকার কী মশাই? আর এক-জন আছেন পুণ্যশ্লোক রায়। ভদ্রলোক উকিল ছিল। ওকালতিতে পয়সা হচ্ছিল না, এসেছে কংগ্রেসে—

সুব্রত কেমন বিব্রত হয়ে পড়লো। বললে—আপনি পুণ্যশ্লোক রায়কে চেনেন?

ভদ্রলোক বললে—আরে মশাই, কারো হাঁড়ির খবর জানতে গেলে কি আর তাকে চিনতে হয়? এসব খবর হাওয়ায় ভাসে। তার একটা মেয়ে আছে, জানেন? সে কেবল মদ খায় আর ছেলেদের সঙ্গে মাইফেল করে বেড়ায়। এসব কথা কারো আর জানতে বাকি নেই—মেয়েটার নাম পর্মিলি। আপনি কলকাতা সহরে যাকে জিজ্ঞেস করবেন সেই বলে দেবে—

—আপনি ঠিক জানেন?

ভদ্রলোক বললে—আমার কথায় কাজ কি মশাই? আপনি রাস্তায় যে-কোনও একটা লোককে ধরে জিজ্ঞেস করুন না, হাতে পাঁজি মঙ্গলবার—

ভদ্রলোক সেই কথার জের টেনে বলতে লাগলো—এই কিছুদিন আগে যে-কান্ডটা ঘটে গেল, আপনি জানেন হয়তো—

সুব্রত জানতো না। বললে—কী কান্ড?

ভদ্রলোক বললে—আরে মশাই, লাল-ঝান্ডারা মিছিল করে যাচ্ছিল, তার ওপর পুলিশ গুলী চালিয়ে ক'জনকে তো মেরেই ফেললে—পুণ্যশ্লোকবাবুর মেয়ের গাড়িটা পর্যন্ত শেষকালে রেগে গিয়ে লাল-ঝান্ডারা পুড়িয়ে ছাই করে দিলে—

—তাই নাকি? তারপর কী হলো?

ভদ্রলোক বললে—কী আর হবে। মেয়েটা তখন মদের নেশায় চুর হয়ে ছিল, সেই অবস্থায় তাকে কংগ্রেস ভবনে নিয়ে গিয়ে তুললো পুলিশ।

সুব্রত উদ্‌গ্রীব হয়ে এতক্ষণ শুনছিল। বললে—কিন্তু পুলিশ গুলী করলেই বা কেন?

ভদ্রলোক বললে—ওদের গুন্ডা আছে যে—

—কাদের?

—ওই পুণ্যশ্লোকবাবুদের। ওদের পোষা গুন্ডা আছে সব। সেই সব গুন্ডাদের ওরা কাউকে পারমিট দিয়েছে, লাইসেন্স দিয়েছে। এইভাবে সবাইকে ওরা সব পুষে রেখেছে এতকাল। এখন দরকার পড়েছে তাই কোনও মিছিল ভাঙবার দরকার হলেই তাদের কাজে লাগায়। তারা মিছিলের মধ্যে ঢুকে পড়ে পুলিশের দিকে লক্ষ্য করে সোডার বোতল ছোঁড়ে, ঢিল ছোঁড়ে, বোমা ছোঁড়ে, আর তারপরই পুলিশ জো পেয়ে গুলী চালায়। এসব মতলব ওই পুণ্যশ্লোক-বাবুর। খুব ঘুঘু লোক যে...

হঠাৎ ভদ্রলোক বলে উঠলো—এবার এসে গেছি, এখানে থামান, আর যেতে হবে না। সত্যি খুব উপকার করলেন মশাই। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে—

ভদ্রলোক নামলো গাড়ি থেকে। হাতজোড় করে একটা নমস্কার করলে।

সুব্রত বললে—একটা কথা, আপনি যা যা বললেন, তার সবই সত্যি তাহলে?

ভদ্রলোক বললে—আমার কথা বিশ্বাস না হয়, ওই যে লোকটা যাচ্ছে, ওকে

ডেকে জিজ্ঞেস করুন, দেখুন-না কী বলে!

—আর ওই যে বললেন, পুণ্যশ্লোকবাবুর মেয়ের কথা। পমিলির কথা। ওটাও কি সত্যি?

ভদ্রলোক বললে—দেখুন, কিছুই আমার নিজের চোখে দেখা নয়। সবই শোনা কথা। আপনি এখানে থাকতেন না তাই। নইলে আপনার কানেও কথাটা যেত—

তারপর বললে—ওই দেখুন, ওইটে আমাদের বাড়ি—

—আপনাদের নিজের বাড়ি?

—না, ভাড়াটে আমরা। যদি কখনও এদিকে আসেন তো দেখা করবেন। সন্ধ্যেবেলা বাড়িতেই থাকি—তা আপনাকে খুবই কষ্ট দিলুম। আপনার নামটা কিন্তু জিজ্ঞেস করা হয়নি।

—আমার নাম সুব্রত রায়।

ভদ্রলোক বললে—আমার নাম সুরেশ, সুরেশ ভট্টাচার্যি, আমি মার্কেণ্টাইল অফিসের ক্লার্ক।

ভদ্রলোক অনেকবার ধন্যবাদ জানালে সুব্রতকে। গাড়িতে ধর্মতলা থেকে তুলে এনে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছে বলে অনেক উপকার হয়েছে তার। তার ওপর কয়েকটা পয়সা বাস-ভাড়াও বেঁচে গেছে।

ভদ্রলোক চলে যাবার পর সুব্রত গাড়িটা ঘুরিয়ে নিলে। কোথায় আমেরিকা আর কোথায় কলকাতা! সময় এমন কিছু বেশি লাগেনি তার। কিন্তু তার মনে হলো যেন এই একদিনের কলকাতার মধ্যেই সে আবার নতুন করে বিশ্ব-পরিক্রমা করে নিলে। এই ক'বছরের মধ্যেই এমন পরিবর্তন হয়ে গেছে কল-কাতার! শুধু কলকাতার পরিবর্তন নয়, পরিবর্তন তার বাবার, সকলের—

গাড়িটা তখন আরো জোরে উত্তর দিকে ছুটে চলেছে।

সেদিন সুব্রতর কেমন যেন অবাক লেগেছিল। যখন সে কলকাতা ছেড়ে চলে গিয়েছিল তখন তো এমন ছিল না। তখন পুণ্যশ্লোকবাবুর নাম শুনে লোকে ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রকাশ করতো। কত লোকজন আসতো তাদের বাড়িতে। সকাল থেকে ভিড় লেগে যেত বাবার বসবার ঘরে। কত লোকের কত রকম তদবির। কিন্তু এবার কলকাতায় ফিরে এসে বসবার ঘরটা ফাঁকা দেখে সুব্রত অবাক হয়ে গিয়ে-ছিল। সেই তখনই সে গাড়িটা নিয়ে বেরিয়েছিল রাস্তায়। কোথাও যাবার উদ্দেশ্য ছিল না তার। আর কোথায়ই বা যাবে সে। কলেজ স্ট্রীট থেকে হ্যারিসন রোড ধরে হাওড়ার দিকে গেল। সেখান থেকে ধর্মতলা। একটা দোকানে বসে খেয়ে নিলে। লোকে যা বলাবলি করছিল তা কান পেতে শুনতে লাগলো। সব জায়গাতেই ওই এক কথা। সবাই যেন রেগে আছে। কেউ খুশী নয়। জীবনের ওপর খুশী নয়, গভর্ণমেণ্টের ওপর খুশী নয়, মানুষের ওপর খুশী নয়, এমনকি নিজের ওপরেও খুশী নয় কেউ। এমন তো ছিল না। এই ক'বছরে এমন কি ঘটলো যাতে সব ওলোট-পালট হয়ে গেল! সবাই ভোটের কথা বলছে, এনকোয়ারি কমিশনের কথা বলছে। বলছে, এবার আর কংগ্রেসকে ভোট দেবে না।

একবার মনে পড়লো সুরেনের কথা। জগন্নাথ বলেছে তাকে বাবা বাড়িতে ঢুকতে বারণ করে দিয়েছে। সে তো মাধব কুণ্ডু লেনে থাকতো। সেখানে কি আছে এখনও?

তারপর গাড়িটা ঘুরিয়ে নিয়ে সোজা সেই মাধব কুণ্ডু লেনের ভেতরেই গাড়িটা নিয়ে গেল। সেই পুরোন বাড়িটা। বাড়িটার চেহারা সেই এক রকমই আছে।

সেই পুরোন দরোয়ানটা বসে ছিল।

কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে—সুরেনবাবু বাড়িতে আছে?

দরোয়ানটা জবাব দিলে—ভাগ্নেবাবু তো বাইরে বেরিয়ে গেছে!

—কখন আসবে?

দরোয়ানটা বললে—তা জানি না।

সুব্রত চলে আসছিল। কিন্তু আবার কী মনে হলো, ফিরে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে—কাল ভোরবেলা এলে দেখা হবে?

দারোয়ান বললে—জী হাঁ—

সুব্রত আর কোনও কথা না বলে গাড়িটা আবার স্টার্ট দিয়ে সোজা ট্রাম-রাস্তায় এসে পড়লো। একবার মনে হলো বাড়িতে যাবে সে। কিন্তু বাড়িতে গিয়েই বা কী হবে এখন? তার চেয়ে সেই কলকাতাটাকে আরো ভালো করে দেখা ভালো। সোজা চলতে লাগলো ধর্মতলার দিকে। আবার সেই ধর্মতলা। ঘুরে ঘুরে যেন ক্লান্তি আসে না, আশাও মেটে না। যেন অনেককালের চেনা মানুষকে সে প্রাণভরে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে চায়।

যখন প্রায় বেলা পড়ে এসেছে, তখন ওই লোকটার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ওই সুরেশ ভট্টাচার্যি। লোকটা মার্কেন্টাইল অফিসের একজন কেরাণী। লোকটার কথায় মনে হলো কলকাতার সমস্ত লোকের মনের কথা বলেছে সে। তার মুখ দিয়েই কলকাতার সমস্ত লোকের মনের কথাগুলো বেরিয়ে এসেছে।

তারপর যখন বাড়ির দিকে ফিরলো, তখন রাত হয়ে গেছে; যখন বাড়ির ভেতর ঢুকলো তখন সমস্ত বাড়িটা কেমন নিস্তব্ধ!

রঘু দৌড়ে এল। সুব্রত জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁ রে, বাবা এখনও বাড়ি আসেনি?

রঘু বললে—হ্যাঁ, বাবু এসেছেন—

—কোথায়?

রঘু বললে—দিদিমণির ঘরে কথা বলছেন—

সুব্রত গাড়িটা গ্যারাজের মধ্যে পুরে বললে—সকলের খাওয়া হয়ে গেছে নাকি?

রঘু বললে—না। বাবু আপনার কথা জিজ্ঞেস করছিলেন। আমি বলেছি, দাদাবাবু গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেছেন—

রঘু সুব্রতর আগে আগে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলো। পুণ্যশ্লোকবাবু তখন দিদিমণির সঙ্গে কথা বলছেন।

বললে—দাদাবাবু এসেছে, বাবু—

ততক্ষণে সুব্রতও পেছন পেছন ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

অনেক দিন পরে ছেলের সঙ্গে দেখা। কয়েকটা মুহূর্ত লাগলো বিস্ময়ের ঘোরটা কাটতে। যেন অনেক পরিবর্তন হয়েছে সুব্রতর। যেন এতদিনে পূর্ণ পুরুষ হয়েছে সুব্রত। একটু সমীহ করে কথা বলতে হবে তার সঙ্গে।

পুণ্যশ্লোকবাবু জোর করে মুখে হাসি ফোটাবার চেষ্টা করলেন।

বললেন—এসো—কোথায় ছিলে সারাটা দিন?

পমিলি মুখ ভারি করে বসে ছিল সামনেই। সেও চেয়ে দেখলে সুব্রতর দিকে। সুব্রতও অবাক হয়ে গেল পমিলির চেহারা দেখে! এই কি তার দিদি! যে দিদি মদ খেয়ে যার-তার সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়! সেই সুরেশ ভট্টাচার্যি তো এর কথাই বলছিল এতক্ষণ!

কিন্তু এক মুহূর্তের মধ্যেই সুব্রত সামলে নিয়েছে নিজেকে। বললে—এই ঘুরে ঘুরে কলকাতা সহরটা দেখছিলুম—

পুণ্যশ্লোকবাবু প্রথমে কী বলবেন বুঝতে পারলেন না। অনেকদিন পরে সুব্রতর সঙ্গে দেখা। একটি ছেলে তাঁর, আর এই একটি মেয়ে। স্ত্রী মারা যাবার পর এদের মানুষ করে তোলার মধ্যেই তিনি নিজের সময় আর অর্থ ব্যয় করে জীবন কাটিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু তা করেননি তিনি। তিনি নিজের উন্নতির কথাই ভেবেছেন কেবল। ওরা বড় হয়েছে তাঁরই অর্থে বটে, কিন্তু ওদের দিকে তিনি তেমন ফিরেও তাকাননি কখনও। হয়ত এমনি করেই চিরকাল চলতো। কিন্তু আজকে হঠাৎ এই জায়গায় এসে পৌঁছে তাঁকে পেছন ফিরে তাকাতে হলো।

—তোমার কোনও অসুবিধে হয়নি তো সুব্রত? গাড়ি ঠিক সময়ে এয়ার-পোর্টে গিয়েছিল?

সুব্রত বললে—হ্যাঁ—

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—আমি জরুরী একটা কাজে আটকে গিয়েছিলুম, সেখান থেকে আসতে পারিনি ঠিক সময়ে। তা কোথায় ছিলে তুমি সারাদিন? আমি এসে শুনলুম তুমি নাকি বাড়িতে এসেই বেরিয়ে গিয়েছিলে? কোথায় ছিলে সারাদিন?

সুব্রত বললে—কোথাও না, এমনি ঘুরছিলুম—

—ঘুরছিলুম মানে? কোথায় ঘুরছিলে?

সুব্রত বললে—কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছিলাম—

—সে কী? রাস্তায় রাস্তায়? কেন? রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে কী দেখছিলে?

সুব্রত বললে—দেখছিলুম এই সহরের চেহারা কেমন হয়েছে।

—তা তুমি তো এতদিন ন্যু-ইয়র্কে ছিলে, তার কাছে কী আর এই কলকাতা! এখানে দেখবার আর কী-ই বা আছে? এখানে তো শুধু ময়লা আর জঞ্জাল, শুধু 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ' চিৎকার। কোনো প্রোসেশান দেখতে পেলে না?

—হ্যাঁ, দেখলুম।

—দেখলে তো গুণ্ডাদের কাণ্ডকারখানা? এখানে আজকাল কেবল ওই সবই হচ্ছে। সেই জন্যেই তো তোমাকে লিখেছিলাম, এখন তোমার এখানে এসে দরকার নেই। ইলেকশানের পরে এলে ভালো হতো। কলকাতার মানুষ বড় বেয়াড়া হয়ে গেছে। ইলেকশানের পরে আমরা এদের শায়েস্তা করে দেবো, তার আগে আমরা বড্ড ব্যস্ত আছি—

তারপর হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেল। বললেন—তুমি খাবে তো এখন? তোমার তো খাওয়া হয়নি?

সুব্রত বললে—না—

—তাহলে যাও, খেয়ে নাও। আমি খেয়েই এসেছি—আমি আর কিছু খাবো না—

সুব্রত পমিলির দিকে চাইলে। বললে—দিদি খাবে না?

পুণ্যশ্লোকবাবু পমিলির দিকে চাইলেন। পমিলি চুপ করে এতক্ষণ বসে ছিল। যেন কোনও কথাই তার কানে ঢোকেনি।

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—আমি পমিলির মতিগতি কিছুই বুঝতে পারছি না। অনেকদিন ধরেই ও কারো সঙ্গে ভালো করে কথাও বলছে না। দেখ না, আমি ওকে বলে গেলাম এয়ারপোর্টে গিয়ে তোমাকে রিসিভ করে আনতে, কিন্তু এখন শুনছি, ও যায়নি।

সুব্রত পমিলির দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে—কেন রে দিদি, কী হয়েছে তোর?

পমিলি কিছু উত্তর দিলে না। চুপ করে যেমন বসে ছিল, তেমনিই বসে রইল।

সুব্রত আবার জিজ্ঞেস করলে—কী রে দিদি, কথা বলছিস না কেন?

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—ও ওইরকম, আমার সঙ্গেও ক'দিন ধরে কথা বলছে না—ওর কী হয়েছে জিজ্ঞেস করো তো, আমার কথার তো উত্তর দেবে না ও, দেখ তোমার কথার যদি উত্তর দেয়—

পমিলি হঠাৎ বললে—কী উত্তর দেবো আমি, দেখতেই তো পাচ্ছ সবাই, আমি কেমন আছি!

সুব্রত বললে—কিন্তু এতদিন পরে আমি এলুম, আমার সঙ্গে একটা কথাও তো বলবি! কী হলো তোর সেইটে বল না?

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—একটা এনকোয়ারি কমিশন হচ্ছে কংগ্রেসের এগেনস্টে, তাতে ও সাক্ষী হবে--

সুব্রত বললে—তা সাক্ষী হলে ক্ষতি কী? হোক না!

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—বলছো কী তুমি? আমার মেয়ে হয়ে আমারই বিরুদ্ধে সাক্ষী হবে? দেশে আমার তো একটা পোজিশন আছে—আমি তো এতক্ষণ সেই কথাই বোঝাচ্ছিলুম। ও বললে, ওরও নাকি অনেক কথা আছে! ও চায় ওর কথাগুলো সবাই জানুক, সবাই শুনুক—

সুব্রত জিজ্ঞেস করলে—কী কথা?

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—কে জানে কী কথা! আমি বুঝতে পারছি না ওর আবার কী কথা থাকতে পারে! আমি বলেছিলুম ওকে ক্লাবে যেতে—ওকে চার-পাঁচটা ক্লাবের মেম্বরও করে দিয়েছিলুম। প্রথম প্রথম সেখানে ও যেতও, কিন্তু এখন তাও ছেড়ে দিয়েছে—

সুব্রত উত্তরে কিছু বললে না। সেই রাস্তার সেই লোকটা—সুরেশ ভট্টাচার্যির কাছে যা শুনে এসেছিল, সেইগুলো বলবার ইচ্ছে হচ্ছিল একবার। কিন্তু তারপর কী ভেবে আর সে-কথা তুললে না।

বললে—যাই, আমি খেয়ে আসি—

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—হ্যাঁ চলো, আমিও যাই, তোমার সঙ্গে আমার গোটাকতক কথা আছে—

সুব্রতর সঙ্গে পুণ্যশ্লোকবাবুও খাবার ঘরে গিয়ে বসলেন। ছেলের সঙ্গে অনেক কথা ছিল তাঁর। ছেলে এখন আর ছোট নেই। এখন সে বড় হয়েছে। তার সঙ্গে বন্ধু হিসেবে কথা বলা ভালো। তাছাড়া এতকাল সে বাইরে ছিল। সেখানকার সমাজ সে দেখে এসেছে। বৃহত্তর পৃথিবীর মুখোমুখি হয়ে সে ভালো-মন্দর তফাত বুঝে এসেছে। তার চোখের দৃষ্টি উদার হয়েছে। সে বুঝতে

পারবে পুণ্যশ্লোকবাবুর কথাগুলো। কিন্তু কেমন করে কথাগুলো পাড়বেন, সেই কথাই ভাবতে লাগলেন। তিনি তো শুধু তার বাবা নন, এ প্রদেশের মিনিস্টারও বটে একজন। সমস্ত দেশের মানুষের ভালো-মন্দর ধারক আর বাহক।

—তোমাকে কয়েকটা কথা বলি সুব্রত।

সুব্রত খেতে খেতে বললে—বলো।

—ইণ্ডিয়াতে ফিরে এসে কী করবে তুমি ভেবেছ? এবার একটা চাকরি-বাকরি কিছু করতে হবে তো? চাকরি যদি তুমি করতে চাও তাহলে বলো, আমি তার ব্যবস্থাও করতে পারি। আগে তুমি বলো কী ধরনের চাকরি তোমার পছন্দ।

সুব্রত বললে—আমার কোনও পছন্দ-অপছন্দ নেই। আমি স্কুটার ইঞ্জি-নীয়ারিং শিখে এসেছি। আমার ইচ্ছে ছিল আমি স্কুটার তৈরির ফ্যাক্টরি করবো একটা—

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—নট এ ব্যাড আইডিয়া। তাহলে আমাকে একবার দিল্লী যেতে হবে। কারণ ও ব্যাপারে সেণ্টার পারমিশন না দিলে কিছু করতে পারা যাবে না! তাহলে কিছুদিন বসে থাকতে হবে তোমাকে। কত ক্যাপিট্যাল লাগবে? তুমি আমাকে একটা স্কিম দাও—

সুব্রত বললে—আমি দেবো—

—আর একটা কথা।

পুণ্যশ্লোকবাবু আবার বললেন—আর একটা কথা, তুমি যে কলকাতা দেখে গিয়েছিলে সে কলকাতা এখন আর নেই, আজ তুমি নিশ্চয় দেখে এলে সেসব স্বচক্ষে। এখন কমিউনিস্টদের সংখ্যা বেড়ে গেছে কলকাতায়, কথায় কথায় গুণ্ডামি, মারামারি, সোডার বোতল ছোঁড়া শুরু হয়েছে।

সুব্রত বললে—আমি বুঝতে পেরেছি—

—তুমি বুঝতে পেরেছ তো? তা আজও হচ্ছিল নাকি কোথাও?

সুব্রত বললে—হয়নি, কিন্তু আমি শুনলুম লোকের মুখে আজকাল নাকি ওই সব খুব হচ্ছে। আরো অনেক কথাই শুনলুম। সমস্ত কলকাতাই ঘুরে বেড়ালুম কিনা—

—আর কী শুনলে?

সুব্রত বললে—দিদির কথাও শুনলুম।

পুণ্যশ্লোকবাবু সোজা হয়ে বসলেন। জিজ্ঞেস করলেন—পর্মিলির কথা? পর্মিলির কথা কী শুনলে?

সুব্রত বললে—সেসব কথা তোমার না শোনাই ভালো।

—তবু বলো না শুনি। আমার শোনা দরকার।

সুব্রত বললে—পর্মিলি নাকি রাস্তায়-ঘাটে মদ খেয়ে মাতলামি করে বেড়ায়। সবাই নাকি দেখেছে।

—সে কী? এই কথা লোকে বলাবলি করছে নাকি? তোমাকে কে বললে?

সুব্রত বললে—রাস্তার লোক, আবার কে বলবে! তবে চিনতে পারেনি যে, পর্মিলিই আমার দিদি। আমিও কিছু ভাঙিনি, শুধু শুনে গেলাম। দেখলুম কংগ্রেসের নামেও সবাই চটে গেছে। বললে, এবার নাকি ইলেকশানে কেউ কংগ্রেসকে ভোট দেবে না।

—ওই কথা বললে তোমাকে সবাই?

সুব্রত বললে—হ্যাঁ—

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—ওই, ওরাই হচ্ছে সব কমিউনিস্ট! আমি তোমাকে বললুম-না এখন ওদের খুব প্রতিপত্তি চলেছে সহরে! কেউ কাউকে মানতে চায় না। সেই তোমার ক্লাশ-ফ্রেন্ড, কী নাম যেন তার, সুরেন, তাকে আমি আমার বাড়িতে আসতে বারণ করেছি, জানো?

সুব্রত খেতে খেতে মুখ তুললো। বললে—বারণ করে দিয়েছ? কেন?

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—সে কমিউনিস্ট। সে পূর্ণবাবুর দলে জয়েন করেছে। পূর্ণবাবুকে জানো তো? ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে তোমাদের বাঙলা পড়াতো! সেই পূর্ণবাবুই তো আমার এগেনস্টে ভোটে দাঁড়িয়েছে—

সুব্রত বললে—কিন্তু সুরেন কী করেছিল?

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—দেখ, আমি তাকে অনেক ভাবে সাহায্য করবার চেষ্টা করেছি। তাকে মাসে মাসে দেড়শো টাকা মাইনে দিয়ে আমার লাইব্রেরিতে কাজও দিয়েছিলুম। কিন্তু দেখলুম সে একেবারে বয়ে গেছে। আমার কাছে টাকা নিয়ে ওদের পার্টির কাজ করে। আর তাছাড়া পর্মিলির যে এই রকম চেঞ্জ হয়েছে এও তো সুরেনের জন্যে। আগে তো পর্মিলি এমন ছিল না—

ঠাকুর খাবার পরিবেশন করছিল। হঠাৎ রঘু এসে বললে—আপনার টেলিফোন—

টেলিফোনের কথা শুনেই পুণ্যশ্লোকবাবু উঠলেন। বললেন—ওই, ডাক্তার রায় বোধহয় টেলিফোন করছেন, আমি আসছি, তুমি খাও—

বলে তিনি বাইরে চলে গেলেন।

এনকোয়ারি কমিশনের জন্যে ক'দিন থেকেই তোড়জোড় চলছিল। ধর্মতলা স্ট্রীটের মিছিলের ওপর পুলিশের গুলী মারার ব্যাপারে সারা কলকাতায় গুঞ্জন শুরু হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে এ খবরটাও কেমন করে রটে গেল যে পুণ্যশ্লোক-বাবুর মেয়েও নাকি কমিশনে সাক্ষী হয়ে আসবে।

ইলেকশানের তোড়জোড়ও চলছিল জোর কদমে। সমস্ত সহরের মানুষের মুখে যেন তখন আর কোনও কথা থাকতে নেই। অফিস-কাছারির কেরানী মহলে জোর আলোচনা। এবার কংগ্রেস হারবে। এবার আর রক্ষে নেই বাছাধন-দের। অনেকদিন রাজত্ব করেছ তোমরা। আজ ন'বচ্ছর ধরে তোমাদের দেখে আসছি। এবার আর তোমাদের ভোট দেবো না। এবার মুখ বদলাবো আমরা। বাসে-ট্রামে ঝুলতে ঝুলতে আসি, জিনিস-পত্তোরের আকাশ-ছোঁওয়া দাম। আমরা কি মানুষ নই নাকি? তোমরা বেশ নিজেদের ছেলেমেয়েদের বড় বড় চাকরি জোগাড় করে দিয়েছ। নিজেরা মোটা মোটা টাকার সম্পত্তি করে নিয়েছ। আমাদের দিকে একবার চোখ চেয়ে দেখনি পর্যন্ত। গুণ্ডা পুষে রেখে আমাদের ভয় দেখিয়ে এতদিন যা-খুশী তাই করেছ. এবার সরে পড়ো।

রাস্তার মোড়ে মোড়ে ছোট ছোট মীটিং-এ লোক জমায়েত হয়। সেখানে দাঁড়িয়ে দেবেশ লেকচার দেয়। বলে—মানুষের সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গেছে। মেহনতী মানুষ দুনিয়ার সব জায়গায় আজ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। কায়েমী-স্বার্থের দিন আজ খতম। আপনারা আগামী ভোটের সময় শপথ নিন—বামপন্থী সরকার প্রতিষ্ঠা করে জনগণের রাজ কায়েম করবেন। ইনক্লাব জিন্দাবাদ—

একলা দেবেশই প্রায় সারা সহর লেকচার দিয়ে মাত করে রেখেছে। সঙ্গে থাকে সুরেন। দেবেশের লেকচার শুনে শুনে সুরেনও খানিকটা লেকচার দিতে শিখে গেছে।

দেবেশ বলে—এবার তুই দাঁড়া—

প্রথম প্রথম ভয় করতো সুরেনের। এতগুলো লোকের সামনে দাঁড়িয়ে লেকচার দেওয়া সোজা কথা নাকি? কিন্তু দেবেশ অভয় দিত। বলতো—ভয় কীসের? এই রকম করে না দাঁড়ালে জীবনে কোনওদিন ভয় ভাঙবে না। দাঁড়া, আমি তো পাশে রয়েছি—

সুরেন বলতে আরম্ভ করতো—বন্ধুগণ, আজ আমরা ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছি। একদিকে কংগ্রেস সরকার আর একদিকে মেহনতী মানুষ। এই মেহনতী মানুষের সহ্যের সীমা আজ অতিক্রম করে গেছে। সারা দুনিয়ার মেহনতী মানুষ আজ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। কায়েমী স্বার্থের দিন আজ খতম। আপনারা আজ শপথ নিন, আগামী ভোটের সময় আপনারা বামপন্থী সরকার প্রতিষ্ঠা করে জনগণের রাজ কায়েম করবেন। ইনক্লাব জিন্দাবাদ!

প্রথম দিন বুকটা খুব কাঁপছিল সুরেনের। দেবেশ এসে সুরেনের পিঠটা চাপড়ে দিলে।

বললে—সাবাস! খুব ভাল হয়েছে রে, খুব ভাল হয়েছে। ফাইন—

সুরেন বললে—আমার বুকটা কিন্তু খুব কাঁপছিল ভাই, আমি কী বলেছি আমার নিজেরই কানে ঢোকেনি।

দেবেশ বললে—না, তুই এই টুলুকে জিজ্ঞেস কর, আমি ঠিক বলছি কিনা—

টুলুও পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। বললে—না সুরেনদা, খুব ভালো হয়েছে আপনার বক্তৃতা—পাবলিকেরও খুব ভালো লেগেছে—

এমনি করে প্রায়ই রাস্তার মোড়ে মোড়ে মীটিং করতো দেবেশরা। আর রোজই সুরেন লেকচার দিত। তার লেকচার শুনলেই রাস্তার লোকের শরীরের রক্ত গরম হয়ে উঠতো। তারা যত উত্তেজিত হয়ে উঠতো, সুরেনের লেকচারও তত ভালো হতো।

সেদিন লেকচার দিয়ে নেমেই জিজ্ঞেস করলে—কী রে দেবেশ, কেমন হলো?

দেবেশ বললে—খুব ভালো, এই তো চাই, এখন বেশ সড়গড় হয়েছে তোর গলা—

টুলুও বললে—হ্যাঁ, আজকাল আপনার আড়ষ্টতা একেবারে কেটে গেছে—

হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন ডাকলে—এই সুরেন—

সুরেন পেছন ফিরলো। কিন্তু প্রথমে চিনতে পারেনি।

—আমায় চিনতে পারিসনি? আমি সুব্রত রে!

সুব্রত! সুরেনের মুখে বিস্ময়ের হাসি ফুটে উঠলো এক মুহূর্তে। সঙ্গে সঙ্গে একেবারে দুই হাতে জড়িয়ে ধরেছে সুব্রতকে।

—তুই কবে এলি রে? আমি তো জানতে পারিনি কিচ্ছু।

সুব্রত বললে—আমি এসেই তো তোদের মাধব কুণ্ডু লেনের বাড়িতে গিয়েছিলুম, তুই ভোরবেলাই নাকি কোথায় বেরিয়ে গিয়েছিলি। আজকে রাস্তায় যেতে যেতে হঠাৎ তোকে দেখে থেমে গেলাম। তুই খুব ভালো লেকচার দিতে পারিস তো, অথচ আগে কত লাজুক ছিলি—

—তোর ভালো লেগেছে?

সুব্রত বললে—খুব ভালো লেগেছে। এখন তো মীটিং ভেঙে গেল, তুই বাড়ি যাবি তো এখন?

সুরেন বললে—হ্যাঁ, কতদিন পরে তোর সঙ্গে দেখা—

—তাহলে চল—

এতক্ষণে সুরেনের যেন মনে পড়লো দেবেশের কথা, টুলুর কথা। বললে—এই দেবেশকে তো তুই চিনিস, আমাদের সেই দেবেশ রে!

সুব্রত দেবেশের দিকে চেয়ে হাসলো। বললে—কী? কেমন আছ?

দেবেশ মুখ গম্ভীর করে বললে—ভালো।

—আর এই হলো টুলু, আমার বন্ধু—

সুব্রত তাকে দুই হাত তুলে নমস্কার করলে। টুলুও নমস্কার করলে সুব্রতকে।

সুরেন বললে—এ খুব কাজের মেয়ে জানিস। পার্টির জন্যে প্রাণ দিয়ে খাটে—

সুব্রত একটু পরে বললে—যাবি তো চল, এখন এখানে কিছু কাজ আছে নাকি তোর?

সুরেন বললে—না, কাজ আর কী—

সুব্রত সুরেনের হাত ধরে টেনে নিয়ে চললো। বললে—তুই আর আমাদের বাড়ি আসিস না কেন? আমি এসেই তোর কথা জিজ্ঞেস করেছি। পমিলিও কিছু বলছে না। সে তো কথাই বলে না কারো সঙ্গে। শুধু চুপচাপ ঘরের মধ্যে থাকে। সব কী হলো বল তো? এতকাল পরে কলকাতায় এসে দেখছি এখানকার সব কিছু একেবারে আগাগোড়া বদলে গেছে—

বলে সুরেনকে গাড়িতে তুলে নিলে। তারপর ইঞ্জিনে স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিলে।

সুরেন বললে—কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস আমাকে?

সুব্রত বললে—আমাদের বাড়িতে—

—তোদের বাড়িতে?

—কেন, দোষ কী?

—যদি কেউ কিছু বলে?

—বাড়ি তো আমাদের, কে কী বলবে?

সুরেন বললে—তোর বাবা কিন্তু তোদের বাড়িতে ঢুকতে বারণ করেছে আমাকে—

সুব্রত বললে—বাবা যাই বলুক, আমি নিজে তোকে নিয়ে যাচ্ছি, তোর ভয় কী?

বলতে বলতে গাড়িটা একেবারে সুকীয়া স্ট্রীটে পুণ্যশ্লোকবাবুর বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়লো।..

রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে টুলু তখন বললে—দেবেশদা, ও ছেলেটা কে?

দেবেশের চেহারা থেকে তখন রাগ যায়নি। বললে—ওই-ই তো সুব্রত, পুণ্যশ্লোকবাবুর ছেলে. এই সবে আমেরিকা থেকে ইণ্ডিয়াতে ফিরেছে—

সুরেন প্রথমে এ বাড়িতে আসতে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। যে-বাড়ি থেকে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, সেখানে সে কোন্ মুখে ঢুকবে? হতে পারে সুব্রত তার বন্ধু, কিন্তু সুব্রত তো এ বাড়ির মালিক নয়। এ বাড়ির মালিক তো তার বাবা!

সুব্রত সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে—ও মেয়েটা কে রে সুরেন? ওই যে তোর পাশে দাঁড়িয়েছিল?

সুরেন বললে—ও তো টুলু! ওরা রেফিউজী!

—তোদের পার্টিতে কাজ করে বুঝি?

সুরেন বললে—হ্যাঁ, কেন?

সুব্রত বললে—না, তাই জিজ্ঞেস করছি। আগে তো এরকম ছিল না এখানে। এবার কলকাতায় এসে দেখছি অনেক কিছু বদলে গেছে।

সুরেন জিজ্ঞেস করলে—আমেরিকা থেকে তুই কী শিখে এসেছিস?

—স্কুটার মেকানিজম।

—তুই স্কুটারের কারখানা খুলবি নাকি?

সুব্রত বললে—ঠিক বলতে পারছি না। একটা কিছু করতে তো হবেই। শুধু শুধু বাপের হোটেলে বসে খেলে তো চলবে না।

সুরেন বললে—তোর বাবা আছে, তোর কীসের ভয়? ভয় সাধারণ লোকের, যাদের দেখবার কেউ নেই।

তারপর হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেল। বললে—তোর বাবা বাড়িতে নেই তো? তোর বাবা থাকলে কিন্তু আমাকে দেখে রাগ করবেন।

—কিন্তু তোর ওপর বাবার রাগ কীসের জন্যে বল তো?

সুরেন বললে—পুণ্যশ্লোকবাবুর ধারণা আমি কমিউনিষ্ট—

সুব্রত বললে—কে বললে তুই কমিউনিষ্ট? তুই কি পূর্ণবাবুদের পার্টির মেম্বার?

—না।

—তাহলে?

সুরেন বললে—তুই তো জানিস, দেবেশের সঙ্গে আমরা এক ক্লাশে পড়েছি। তুই আমেরিকায় চলে গেলি, তারপর থেকেই আমি ওর সঙ্গে মিশছি। ওর সঙ্গে মিশলেই কমিউনিষ্ট হওয়া হয়? আর কমিউনিষ্টরা কি খারাপ লোক?

সুব্রত বললে—কিন্তু তুই তো জানিস বাবা ওদের পছন্দ করে না।

সুরেন বললে—তা তো জানি—

—আর এও তো জানিস, বাবা ইলেকশানে দাঁড়াবে কংগ্রেসের তরফ থেকে, আর পূর্ণবাবু দাঁড়াবে বাবার এগেনষ্টে।

সুরেন বললে—হ্যাঁ, তাও জানি।

—আর আমি তো নিজেই শুনলুম, তুই বাবার বিরুদ্ধে লেকচার দিচ্ছিলি। তুই কি মনে করিস আমার বাবা সত্যিই খারাপ লোক? বাবা কি দেশের লোকের জন্যে কিছুই করেনি? তাহলে সারা জীবন জেল খাটতে গেল কেন? বাবার কি কোনও স্যাক্রিফাইস নেই মনে করিস?

সুরেন বললে—আমাকে এই সব কথা শোনাবি বলেই কি তুই আমাকে এখানে নিয়ে এলি? এসব আলোচনা নাই বা করলি। তুই আমার বন্ধু, আমি তোর বন্ধু, এই সম্পর্কটাই তো ভালো।

সুব্রত বললে—না, তুই ঠিকই বলেছিস। কিন্তু তুই জানিস না ইণ্ডিয়াতে ফিরে আসার পরদিন থেকেই আমার খুব খারাপ লাগছে।

—কেন?

সুব্রত বললে—আমার সব কিছু কানে এসেছে। সবাই জেনে গেছে যে পর্মিলি মদ খেয়ে রাস্তায়-ঘাটে মাতলামি করে। সবাই জেনে গেছে আমার বাবা কংগ্রেসে ঢুকে প্রচুর টাকার মালিক হয়েছে। এই যে কলকাতায় কেউ বাসে-ট্রামে ওঠবার জায়গা পায় না, তাও কংগ্রেসের দোষ, জিনিসপত্রের দাম যে দিন দিন বাড়ছে তাও কংগ্রেসের দোষ, লোকে সস্তায় বাড়ি ভাড়া পাচ্ছে না, তাও কংগ্রেসের দোষ।

সুরেন বললে—তা কথাটা কি মিথ্যে?

সুব্রত সুরেনের দিকে চাইলে। বললে—তুইও এই কথা বললি?

সুরেন বললে—তা পুণ্যশ্লোকবাবু রিজাইন করছেন না কেন? এই ন'বছর ধরে তো মন্ত্রী হয়ে কাজ চালিয়েছেন!

ততক্ষণে পর্মিলির ঘরের সামনে এসে গিয়েছিল তারা। সুব্রত দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকতে লাগলো—পর্মিলি, এই দ্যাখ কাকে নিয়ে এসেছি—সুরেন এসেছে—

দরজা বোধহয় ভেতর থেকে খোলাই ছিল। সুব্রত সেটা ঠেলতেই খুলে গেল। ঘরে ঢুকতেই সুরেন পর্মিলিকে দেখে চমকে উঠলো। এ কী চেহারা হয়েছে তার! খানিকক্ষণ মুখ দিয়ে তার কোনও কথাই বেরোল না। একদৃষ্টে সে চেয়ে রইল পর্মিলির দিকে। পর্মিলিও তাকে দেখলে।

সুব্রত বললে—শুনলাম বাবা নাকি ওকে বাড়িতে আসতে বারণ করেছে, তাই অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ওকে নিয়ে এলুম।

তারপর সুরেনের দিকে চেয়ে বললে—কী রে, অত লজ্জা করছিস কেন? মীটিং-এ দাঁড়িয়ে খুব লম্বা লম্বা বক্তৃতা করছিলি তো। তার বেলায় তো তোর লজ্জা হয়নি?

হঠাৎ পর্মিলি কথা বলে উঠলো।

বললে—কেন তুমি আবার আমাদের বাড়িতে এলে?

সুরেন কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

পর্মিলি আবার বললে—তোমাকে যে-বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, সে-বাড়িতে আসতে তোমার লজ্জা করলো না—

সুব্রত মুশকিলে পড়লো। বললে—পর্মিলি, আমি সঙ্গে করে জোর করে নিয়ে এসেছি বলেই ও এসেছে, নইলে ও আসতে চায়নি। তুই কেন ওকে ওকথা বলছিস—

পর্মিলি বললে—বেশ করছি বলছি। ও কেন আসবে এখানে? ও কচি খোকা নাকি? ওর একটা আত্মসম্মানজ্ঞান নেই! তুই জোর করে নিয়ে এলেই ও আসবে?

উত্তরে কী বলবে তা সুরেন ভেবে পেলে না। শুধু বললে—আচ্ছা আমি চলে যাচ্ছি—

বলে দরজার দিকে পা বাড়াচ্ছিল, কিন্তু সুব্রত তার একটা হাত ধরে ফেললে

বললে—না, তুই যেতে পারবি না। দিদি বললে বলেই তুই চলে যাবি? দিদি তো তোকে ডেকে আনেনি, আমি তোকে ডেকে এনেছি, তুই যেতে পারবি না, দাঁড়া—

কিন্তু পর্মিলি যেন তখন ক্ষেপে গেছে। তাড়াতাড়ি সুরেনের অন্য হাতখানা ধরে টানতে লাগলো।

বললে—না, ও দাঁড়াবে না, ও চলে যাবে—

তারপর সোজা সুরেনের দিকে চেয়ে বললে—যাও, তুমি এখুনি চলে যাও এখান থেকে—

দু'জনের টানাটানির মাঝখানে পড়ে সুরেন তখন হাঁফিয়ে উঠেছিল।

বললে—আমি আসতে চাইনি পর্মিলি, কিন্তু সুব্রত আমাকে জোর করে এখানে নিয়ে এসেছে।

পর্মিলি বললে—কিন্তু তুমি কি কচি খোকা? তোমার নিজের একটা আত্মসম্মানজ্ঞান থাকতে নেই? তুমি এখানে এলে কী বলে?

সুরেন বললে—সুব্রতর কাছে শুনলুম তুমি কারো সঙ্গে কথা বলছো না, তাই তোমাকে দেখতে এসেছিলুম।

—আমাকে দেখতে? আমাকে দেখার কী আছে? নিজের আত্মসম্মানের চেয়ে আমাকে দেখাটাই তোমার বড় হলো? আমি তোমার কে যে, আমাকে দেখতে তুমি এসেছ?

উত্তরে কিছু বলতে পারলে না সুরেন। সে খানিকক্ষণ পর্মিলির আর সুরেনের মুখের দিকে চেয়ে রইল। তারপর সুব্রতকে বললে—আমাকে ছেড়ে দে তুই সুব্রত, আমাকে যেতে দে—

সুব্রত রেগে উঠলো। বললে—কেন যেতে দেবো? দিদির ভয়ে?

সুরেন পর্মিলির দিকে চাইলে। বড় করুণ সে চাউনি। বললে—পর্মিলি, তোমাদের দু'জনের ঝগড়া, আমাকে কেন সেই ঝগড়ার মধ্যে টানছো?

পর্মিলি বললে—সেদিনকার পুলিশের বন্দুকের গুলী খাওয়া এত শিগগির-শিগগির ভুলে গেলে তুমি? এর চেয়ে সেদিন হাসপাতালেই মরে গেলে না কেন? তাও তো এর চেয়ে ভালো ছিল। তাতেও বুঝতুম তোমার মধ্যে মনুষ্যত্ব বলে একটা জিনিস আছে তবু। যাও, এখনও বলছি চলে যাও—

হঠাৎ নিচেয় একটা গাড়ি আসার শব্দ হলো। সুব্রত ঝুঁকে দেখলে, বাবা এসেছে। বললে—ওই বাবা এসেছে—

পুণ্যশ্লোকবাবুর আসার খবরটা পেয়ে সুরেন আরো আড়ষ্ট হয়ে গেল। পুণ্যশ্লোকবাবু বাড়িতে এসেই বোধহয় খবরটা পেয়েছিলেন কারো কাছে। একেবারে সোজা ওপরে উঠে এলেন। আসতেই সমস্ত কাণ্ডটা দেখে রেগে উঠলেন।

বললেন—কী হলো? এখানে আবার এসেছ কেন? আমি তোমাকে এখানে আসতে বারণ করেছি না?

সুরেন এ কথার কোনও উত্তর দিলে না। সুব্রতও তার হাতটা ছেড়ে দিলে।

পুণ্যশ্লোকবাবু আবার হুঙ্কার দিলেন—হু টোল্ড ইউ টু কাম? কে তোমাকে আসতে বলেছে এখানে? এখখুনি চলে যাও—

একবার বললেই হতো যে সে নিজের ইচ্ছেয় এখানে আসেনি, সুব্রত তাকে জোর করে নিয়ে এসেছে। কিংবা সুব্রত নিজে থেকেই বলতে পারতো সে কথা। কিন্তু সুব্রতও তখন চুপ—

পুণ্যশ্লোকবাবু আবার বললেন—দাঁড়িয়ে আছ কেন, যাও—

সুরেন সমস্ত অপমানের বোঝা মাথায় নিয়ে চলে যাবারই উদ্যোগ করছিল, কিন্তু পমিলি এক কাণ্ড করে বসলো। হঠাৎ প্রতিবাদ করে উঠলো। বললে—না, ও যাবে না—

—যাবে না মানে? আমার হুকুম মানবে না?

পমিলি বাঘের মতন রুখে উঠে দাঁড়ালো। বললে—না, আমার হুকুম, ও যাবে না—

পুণ্যশ্লোকবাবু সারাদিন পার্টির কাজের ঝামেলায় নাস্তানাবুদ হয়ে বাড়ি ফিরে এসেছিলেন। ভেবেছিলেন এখানে এসে রাতটুকুর জন্যে শান্তি পাবেন। কিন্তু এখানে এসেও সেই ঝামেলা। পমিলির সাহস দেখে তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তাঁর সেক্রেটারিয়েটে যদি কেউ এমন করে তাঁর মুখের ওপর কথা বলতো তো তিনি তখনই তাকে সাসপেণ্ড করতেন। তার নামে চার্জশীট ইস্যু করতেন। কিন্তু এটা তো অফিস নয় তাঁর। এটা তাঁর বাড়ি। আর পমিলি যে তাঁর মেয়ে। মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে তিনি খানিকক্ষণ তার স্পর্ধায় হতবাক্ হয়ে রইলেন।

বললেন—তুমি ওকে ছাড়বে না?

পমিলি বললে—না—

পুণ্যশ্লোকবাবু আবার গর্জন করে উঠলেন—তুমি ওকে ছাড়বে না?

পমিলিও গলার সুর তেমনি চড়িয়ে বলে উঠলো—না—না—না—

বলে আর দাঁড়ালো না সেখানে। সুরেনকে এক হ্যাঁচকা টানে ঘরের ভেতরে ঢুকিয়ে নিয়ে দরজায় খিল লাগিয়ে দিলে।

ঘরের বাইরে সুব্রত এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল আর দেখছিল। এবার ঘটনার গতির এই অস্বাভাবিক পরিণতিতে সে অবাক হয়ে গেল। অবাক হয়ে পুণ্যশ্লোকবাবুর দিকে চেয়ে দেখলে। পুণ্যশ্লোকবাবুর ফরসা মুখখানা তখন লজ্জায়, ক্ষোভে, ধিক্কারে, অপমানে লাল হয়ে উঠেছে।

হঠাৎ বলে উঠলেন—দেখলে তো সুব্রত? দেখলে তো? পমিলির কাণ্ডটা দেখলে তো? আমি তোমাকে আগেই বলেছিলুম, পমিলি দিন দিন অসহ্য হয়ে উঠছে। আমার জীবনে ক্রমেই অশান্তি সৃষ্টি করে চলেছে। আজ তো তুমি তা নিজের চোখেই দেখলে। এই জন্যেই তোমাকে আমি এখন ইণ্ডিয়াতে ফিরতে বারণ করেছিলুম। এই জন্যেই আমি ওই সুরেনকে এ বাড়িতে আসতে বারণ করে দিয়েছিলুম! তা সত্ত্বেও কেন তুমি ওকে আজ এ বাড়িতে ডেকে আনলে?

সুব্রত বললে—আমি তো এসব জানতুম না—

—জানতে না তো আমাকে জিজ্ঞেস করলে না কেন? আমি তোমাকে সব বুঝিয়ে বলতুম। কেন তোমাকে এখন আসতে বারণ করেছিলুম, কেন সুরেনকে এ বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলুম, সবই আমি তোমাকে বুঝিয়ে বলতুম। কিন্তু একবার তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করলে না কেন?

হঠাৎ সিঁড়ি দিয়ে প্রজেশ উঠছিল। সে সকলকে সেখানে ওই অবস্থায় দেখে অবাক।

বললে—কী হয়েছে পুণ্যদা?

পুণ্যশ্লোকবাবুর যেন হঠাৎ চমক ভাঙলো। বললেন—তা তুমি এই সময়ে?

—আমি এসেছিলুম একটা কাজে। হরিলোচনবাবু বললে আপনি ওপরে আছেন। আরো কিছু টাকার দরকার ছিল পুণ্যদা—

—তুমি বরং কাল সকালে এসো প্রজেশ। আমি এখন খুব এজিটেটেড। পমিলি আজ আবার বেয়াড়া হয়ে উঠেছে।

প্রজেশ জিজ্ঞেস করলে—আবার কী করলে পমিলি?

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—তুমি তো জানো আমি সুরেনকে এ বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলুম?

—হ্যাঁ, তা তো জানি! তা সে আবার এসেছে নাকি?

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—হ্যাঁ, এই দেখ না, এই ঘরের মধ্যে পমিলি আর সে ঢুকেছে, ঢুকে দরজায় খিল দিয়েছে—

—সে কী? এখন? এখন ভেতরে রয়েছে সে?

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—হ্যাঁ। আমি তোমাকে বার বার বললুম তুমি একটা কিছু ব্যবস্থা করো, তা তো তুমি করলে না! এখন কী করবো, বলো?

—তা কোন্ সাহসে সে এখানে এল? কে তাকে নিয়ে এল?

সুব্রত দাঁড়িয়েছিল এতক্ষণ চুপ করে। বললে—আমি! আমিই তাকে ডেকে এনেছি—

সুব্রতর দিকে প্রজেশ চাইলে এবার। বললে—তুমি বুঝি কিছু জানতে না?

সুব্রত বললে—হ্যাঁ জানতুম—আমি সব শুনেছি।

—তা সব জেনেও তাকে তুমি এ বাড়িতে নিয়ে এলে?

সুব্রত বললে—কিন্তু আমি শুনেছি আপনিও নাকি এর জন্যে দায়ী!

—আমি দায়ী? প্রজেশ যেন আকাশ থেকে পড়লো।

বললে—কে বললে আমি দায়ী?

সুব্রত বললে—আমি কলকাতায় এসে ক'দিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেছি। অনেক লোকের সঙ্গে মিশেছি। সবাই জানে সব। সবাই বললে—পমিলির এই ব্যাপারে শুধু আপনি নন, আমার বাবাও দায়ী—

পুণ্যশ্লোকবাবু বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। বললেন—কে এসব কথা বলেছে তোমাকে?

সুব্রত বললে—লোকে বলে। আবার কে বলবে, আমি আর কোত্থেকে জানবো? তুমি নিজের পার্টি নিয়ে থাকো, আর মিনিষ্ট্রি নিয়ে থাকো, দিদিকে দেখবার কেউ ছিল না। তাকে প্রজেশদার হাতে ছেড়ে দিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত রয়েছ—

—লোকে তোমাকে এই সব কথা বলেছে? নাম কী তাদের?

সুব্রত বললে—তাদের নামও আমি জানি না, আমার নামও তারা জানে না। আমি যা শুনেছি তাই-ই তোমাদের বললুম। আর এখন তো নিজের চোখেই সব দেখছি। এখন ভাবছি তারা যা বলেছে তা মিথ্যে নয়—

প্রজেশও উত্তেজিত হয়ে উঠলো।

বললে—কিন্তু পমিলি? পমিলির কী ওপিনিয়ন? পমিলিও কি তাই বলে?

—সে আপনি পমিলিকেই জিজ্ঞেস করুন!

প্রজেশ আর তর্ক করে সময় নষ্ট করলে না। দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলো—পমিলি, পমিলি, দরজা খোল—

ভেতর থেকে কোনও সাড়াশব্দ নেই।

প্রজেশ আবার দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলো—পমিলি, দরজা খোল। আমরা সবাই দাঁড়িয়ে আছি এখানে, দরজা খোল—

এবার হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে দরজা খুলে গেল। দরজা খুলে যেতেই পমিলি বাইরে বেরিয়ে এল। আর পেছন পেছন বেরিয়ে এল সুরেন। পমিলি

ততক্ষণে শাড়িটা বদলে নিয়েছে। চুল, খোঁপা, সাজগোজ ঠিক করে নিয়েছে। তারপর কারো দিকে না চেয়ে, কোনো কিছু ভ্রূক্ষেপ না করে, সুরেনের হাত ধরে একেবারে সোজা সিঁড়ি দিয়ে নিচেয় নেমে গেল। আর তারপর একেবারে পোর্টিকো পেরিয়ে গ্যারাজের কাছে গিয়ে গাড়িতে উঠলো।

প্রজেশ এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল সব। এবার আর থাকতে পারলে না। বললে—পর্মিলি গাড়িতে উঠলো যে—গাড়ি স্টার্ট দিচ্ছে—

জগন্নাথ কাছাকাছিই ছিল। সে এগিয়ে এসে বললে—আমি চালাবো দিদিমণি—

পর্মিলি বললে—না, তোর দরকার নেই—

বলে এক-পা ক্লাচে লাগিয়ে আর এক পা এ্যাক্সিলারেটারে লাগালো। গাড়ির ইঞ্জিনটা মৃদু গর্জন করে উঠলো, হেড-লাইট জ্বললো, তারপর...

প্রজেশ সিঁড়ি দিয়ে তর তর করে নেমে এসে গাড়ির সামনে রাস্তা বন্ধ করে দাঁড়ালো।

বললে--পর্মিলি, কোথায় যাচ্ছ? দাঁড়াও, তোমার সঙ্গে কথা আছে—

কিন্তু সে কথার উত্তর না দিয়ে পর্মিলি সেই অন্ধকারের বুকে তীব্র হেড-লাইটের ছুরি বিঁধিয়ে গেট পার হয়ে বাইরের রাস্তায় গিয়ে পড়লো। প্রজেশ গাড়ি থামাবার শেষ চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়ে কোনও রকমে পাশে সরে দাঁড়িয়ে আত্মরক্ষা করলে।

বারান্দার ওপর থেকে পুণ্যশ্লোকবাবু আর সুব্রত সমস্ত দৃশ্যটা দেখলে।

এ সেই যুগ যখন কংগ্রেস ন'বছর ধরে মাত্র রাজত্ব করছে। কিন্তু সেই ন'বছরের রাজত্বেই দেশের মানুষ সমালোচনা করতে শুরু করে দিয়েছে কংগ্রেসের। তারা বলতে আরম্ভ করে দিয়েছে, এ গভর্ণমেণ্ট বড়লোকের গভর্ণ-মেণ্ট। এ সরকার পুঁজিপতিদের সরকার। এ রাজ্যে বড়লোকের সাত খুন মাপ। কিন্তু এ তো আমরা চাইনি। আমরা তো ভাবিনি এমন হবে। আমরা তো ভেবে-ছিলুম এ স্বাধীনতা সবাই মিলে ভোগ করবো। এখানে পুণ্যশ্লোকবাবুর যত-খানি অধিকার, আমাদের অধিকারও ঠিক ততখানি। মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহরু থেকে আরম্ভ করে সবাই তো আমাদের কেবল ধাপ্পা দিয়েই এসেছে বড় বড় কথা বলে। এর নাম যদি স্বরাজ হয়, এর নাম যদি রামরাজ্য হয়, তাহলে এর জন্যে লক্ষ লক্ষ লোক কেন প্রাণ দিলুম, কেন লক্ষ লক্ষ পুলিশের লাঠি খেলুম?

রাস্তায়, বাসে-ট্রামে, অফিসের ঘরে ঘরে জোর আলোচনা চলে। বলে—এবার দেখবো কেমন করে ভোট পায় কংগ্রেস—

কেউ টিপ্পনি কাটে—আরে মশাই রেখে দিন, আপনাদের ওই মুখেই যত বড়াই। যেই নেহরু এসে লেকচার দেবে আর সঙ্গে সঙ্গে সবাই সুড়সুড় করে কংগ্রেসকে ভোট দিতে ছুটবেন। আপনারা সব ভেড়া মশাই, ভেড়ার পাল—আমার সব দেখা আছে--

এসব আলোচনা ডালহৌসি স্কোয়ার থেকে শুরু করে একেবারে দুর্গাচরণ মিত্তির স্ট্রীট পর্যন্ত সব জায়গায় চলে।

মানদা দাসী বলে—তুই থাম মা, থাম। যতদিন গতর আছে ততদিনই খাতির। আমাদের দেশের রাজা যে-ই হোক, আমাদের তো সেই গতর খাটিয়েই খেতে হবে। স্বদেশীবাবুরা কি আমাদের বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াবে লা?

আগে ভোট ছিল না মানদা দাসীদের। অনেক চেঁচামেচি করে, অনেক মিটিং করে তবে এখন ভোট হয়েছে।—কিন্তু ভোট হয়ে আমাদের কী সুবিধেটা হয়েছে বাছা? ভোট পেয়ে কি আমরা সাপের পাঁচ পা দেখেছি? আমাদের তো সেই গতর খাটিয়েই খেতে হচ্ছে! মাথাপিছু আমাদের দশ টাকা করে দাও, তোমরা যাকে বলবে আমরা ভোট দেবো। কেউ কি আমাদের পর? যে আমাদের পয়সা দেবে সে-ই আমাদের নিজের লোক। যখন যার সঙ্গে বিছানায় শোব তখন সে-ই আমাদের ভাতার।

এসব কথা সুখদার কানে যায়, কিন্তু এ নিয়ে সে মাথা ঘামায় না। যখন মাসী ঘরে আসে, তখন আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকে।

মানদা রেগে যায়। বলে—কী লা মেয়ে, এমনি করে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে? সন্ধ্যে হয়ে এল, সাজগোজ করতে হবে না? এখনি যে সব বাবুরা এসে পড়বে লা!

সুখদার ঢং দেখে মানদার রাগ ধরে যায়।

বলে—আমি আর এমনি তোমাকে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াতে-পরাতে পারবো না মা, তেমন জমিদারী আমার চোদ্দপুরুষ রেখে যায়নি। এই তোমাকে বলে রাখছি। তুমি খাটবে তবে খেতে পাবে—এই আমার বাড়ির নিয়ম। তোমার বয়েসে গতর খাটিয়েছি, তাই এখন বসে বসে খাচ্ছি। গতর যদি খাটাতে না পারো, তবে বাছা বিদেয় হয়ে যাও, আমার শূন্য গোয়ালই ভালো—

বলতে বলতে আবার ঘর থেকে বেরিয়ে যায় মানদা। এ বাড়ি, ও বাড়ির বারান্দা পেরিয়ে সোজা কলতলার উঠোনের ওপর থেকে ডাকলে—ও বুড়ি, বুড়ি! বলি কানের মাথা খেয়েছিস নাকি? বুড়ি—

বয়েস হবার সঙ্গে সঙ্গে বুড়ি কানে কমই শোনে। এক ডাকে তার জবাব পাওয়া যায় না।

হঠাৎ পেছন থেকে দরোয়ান এসে বললে—মাসীবিবি ভূপতি ভাদুড়ীবাবু এসেছে—

মানদার মুখখানা তিরিক্ষি হয়ে উঠলো। বললে—মড়া এসেছে? ডাক এখানে মড়াকে। মড়ার মজা দেখাচ্ছি আমি—

ভূপতি ভাদুড়ী দৌড়তে দৌড়তে এসে হাঁফাচ্ছিল। বললে—আমাকে ডেকেছ তুমি?

ভূপতি ভাদুড়ীর সত্যিই জ্বালা হয়েছে। ওদিকে মা-মণিও মরছে না, এদিকে ক্রমাগত টাকাও ঢেলে দিতে হচ্ছে মানদা দাসীকে। যতদিন মা-মণি বেঁচে থাকবে ততদিন এমনি করে মানদা দাসীকে টাকা দিয়ে যেতে হবে। এই-ই কড়ার। এর আগে নরেশ দত্তও এমনি করে কয়েক হাজার টাকা খসিয়েছে। সারা জীবন এমনি করে টাকা দিয়ে দিয়েই ফতুর হয়ে যেতে হলো। এরপর কবে মা-মণি মারা যাবে তারও কিছু ঠিকঠাক নেই। এখন কপাল। কপালের ওপর ভরসা করেই ভূপতি ভাদুড়ী বেঁচে আছে। এই কপাল ফেরাবার আশাতেই দু'বেলা ঠনঠনে কালীবাড়ির উদ্দেশে ভক্তিভরে প্রণাম করে। বলে—হে মা, হে মা-কালী, আর টানতে পারছি না মা, এবার মা-মণিকে নাও--

এখানে আসবার আগেও ভূপতি ভাদুড়ী ঠনঠনে ঘুরে এসেছে। সেখানে মা-

কালীর কাছে নিজের মনস্কামনা জানিয়ে বলেছে—হে মা কালী, মানদা যেন আর টাকা না খসায় আমার। আর কিছু দিন যেন সে সুখদাকে খাওয়ায়-পরায়।

ইচ্ছে ছিল না তার আসবার। কিন্তু দরোয়ান দিয়ে ডেকে পাঠিয়েছে মানদা, যেতেই হবে। কিন্তু টাকা সঙ্গে বেশি আনেনি। পঞ্চাশ টাকা তিন-চার জায়গায় গুঁজে গুঁজে রেখে দিয়েছে। তিরিশ টাকা এনেছে কাছার খুঁটে, দশ টাকা রেখেছে ট্যাঁকে, আর দশটা টাকা জামার বুক-পকেটে। বুক-পকেটের দশ টাকা দিয়ে যদি রেহাই পাওয়া যায় তো আর ট্যাঁকের টাকাটা বার করতে হবে না।

কিন্তু মানদা দাসী ছিনে জোঁককেও হার মানায়। তার খদ্দেরদের কাছ থেকে টাকা ছিনিয়ে নিয়ে নিয়েই সে আজ এত বড় হয়েছে। সোনাগাছির ছ'খানা বাড়ির মালিক হয়েছে। একখানা এ্যামবাসাডব গাড়িরও মালিকানা স্বত্ব তার।

—আমাকে ডেকেছ তুমি মাসী?

মানদা দাসীর সামনে বিনয়ের অবতার সাজাই ভালো। ওতে কাজ উদ্ধার হয়।

কিন্তু মানদা দাসী সে পাত্রীই নয়। বিনয়ের তারিফ করলে যে আখেরে লোকসান হয়, তা তার ভালো করেই দেখা আছে।

বললে—ডেকেছি কি সাধে? ভূতের কিলুনির জ্বালায় ডেকে পাঠিয়েছি। তোমার মেয়েকে নিয়ে তো আর পারছিনে আমি। আমাকে এবার মুক্তি দাও বাবা তুমি, ও এঁড়ে মেয়ের চেয়ে আমার শূন্য গোয়াল ভালো।

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—তা এঁড়ে মেয়ে বলছো কেন? অমন শরীরের বাঁধুনি তুমি ক'জন মেয়েতে পাবে শুনি?

মানদা দাসী বললে—তা দুধ না দিলে এঁড়ে মেয়ে বলবো না? দুধ দেবার নাম নেই, কেবল গুঁতিয়ে দেয় গয়লাকে। এসব তো এঁড়ে মেয়ের লক্ষণ! মেয়ে চরিয়ে আমি চুল পাকিয়ে ফেললুম, আমাকে তুমি মেযে চেনাবে?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—না না, তা কেন বলবো? যার যা কারবার। তুমি মেয়েছেলের কারবার করো, তুমি মেয়েছেলে চেনো। আমি বাড়ির কারবার করি, আমি ভাড়াটে চিনি। কিন্তু মেয়েমানুষ যে একেবারে চিনিনে তা তো নয়! চিনি। কাকে বলে এঁড়ে মেয়ে তা চিনি—

মানদা দাসী মুখ ঝামটা দিয়ে উঠলো। বললে—এঁড়ে মেয়ে যদি চেনো বাবা, তাহলে সে মেয়েকে আমার ঘাড়ে চাপালে কেন? আমি তোমার কাছে কী এমন অপরাধ করেছি? তুমি আমায় টাকাও ঠিকমত দিচ্ছ না, আবার ওই এঁড়ে মেয়েকেও ঘাড়ে তুলে দিলে, এখন আমি করি কী?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—তা সুখদার দরুণ তুমি তো টাকা পাচ্ছ। পাচ্ছ না?

—ছাই পাচ্ছি, ছাই। এমন এঁড়ে মেয়ে যে, বেটাছেলের মুখ দেখলে ওর বমি আসে। ও মেয়ে কী করে কাববার করবে বলো দিকিনি?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—তা সারা দিন কী করে সুখদা?

মানদা দাসী বললে–কী আর করবে, কেবল বালিশে মুখ গুঁজে বিছানায় শুয়ে থাকে। আমার বাড়িতে তো এত মেয়ে আছে, সবাই সন্ধ্যে হলেই সাজ-গোজ করে, বেলফুলওলার কাছ থেকে মালা কিনে দোকান সাজিয়ে বসে থাকে। তা খদ্দের হলো লক্ষ্মী, লক্ষ্মীকে সাধ্যি-সাধনা না করলে লক্ষ্মী থাকে?

তারপর একটু থেমে বললে—তা আমার মত কথায় কাজ কী, তোমার মেয়ে তুমি বুঝবে, আমাকে এর মধ্যে মিছিমিছি জড়িয়েছ কেন বাবা। আমার যা টাকা

গচ্চা গেছে তা শোধ করে দিয়ে তুমি মেয়ের অন্য জায়গা দ্যাখো; আমি মুক্তি পাই—হ্যাঁ—

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—তা এই জন্যে বুঝি আমাকে ডেকেছিলে? তা সে-কথা আমাকে খোলাখুলি বলবে তো?

বলে পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বার করে মানদার দিকে এগিয়ে দিতে গেল।

মানদা দাসী টাকাটা লক্ষ্য করে বললে—ক'টা দিচ্ছ?

—একটা।

—একটা দশ টাকার নোট! ও টাকা আমায় দিতে হবে না, তুমি তোমার পকেটে পুরে রেখে দাও—

ভূপতি ভাদুড়ী মানদা দাসীর দিকে চেয়ে বললে—তুমি এখন এইটে নাও না। আর তো দুটো দিন! দুটো দিন পরেই তো বুড়ি মারা যাচ্ছে।

মানদা দাসী বললে—তোমার বুড়িও মরবে না, আর আমারও ঝামেলা যাবে না। বুড়ি যদি না মরে তো মাথায় লাঠি মেরে শেষ করে ফেলতে পারো না?

ভূপতি বললে—তুমি অত চটছো কেন? আমি তো আর বুড়িকে নিজের হাতে খুন করতে পারি না! বুড়ি যদ্দিন না মরে তদ্দিনের জন্যে তোমার কাছে মেয়েকে রেখেছি। তোমাকে তো বলেইছি, ক'টা মাত্তোর দিন, তারপরেই আমি মেয়েকে নিয়ে যাবো—

মানদা দাসী বললে—আজ ছ' মাস ধরে তো কেবল ওই কথাই শুনছি। শেষকালে আমি মলে তুমি মেয়েকে নিয়ে যাবে। কিন্তু আর আমি শুনছিনে। পাঁচশো টাকা আজকে আমার চাই—

—পাঁচশো টাকা!

যেন টাকার অঙ্কটা শুনে আঁতকে উঠেছে ভূপতি ভাদুড়ী।

বললে—পাঁচশো টাকা আমি কোথায় পাবো বল দিকিনি? আমার কি টাকার গাছ আছে ভেবেছ? আমাকে কাটলেও পাঁচশো টাকা বেরোবে না—

মানদা দাসী বললে—বেশ, তাহলে তুমি তোমার মেয়েকে নিয়ে যাও, আমি এনে দিচ্ছি—

বলে তাড়াতাড়ি একেবারে ভেতরে চলে গেল।

ভূপতি ভাদুড়ী ডাকতে লাগলো—ওগো, শোনো—শোনো—

আর শোনো! ততক্ষণে মানদা দাসী একেবারে সোজা সুখদার ঘরে চলে গেছে। সুখদা তখন বিছানার ওপর মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ে ছিল। মানদা দাসী তার হাত ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে একেবারে একতলার বৈঠকখানা ঘরে ভূপতি ভাদুড়ীর সামনে নিয়ে এল।

ভূপতি ভাদুড়ী বসেছিল। সুখদাকে সামনে রেখে সোজা উঠে দাঁড়ালো। মানদা দাসী সুখদাকে ভূপতি ভাদুড়ীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে—নাও, একে নিয়ে যাও—সুখের চেয়ে আমার স্বস্তি ভালো—

ভূপতি ভাদুড়ী প্রথমে কী করবে বুঝতে পারলে না। তারপর হঠাৎ বললে—তোমাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছিল মা, তাই একবার ডেকে পাঠিয়েছিলুম। কেমন আছ মা তুমি?

সুখদা ডুকরে কেঁদে উঠলো। বললে—ম্যানেজারবাবু, আমাকে এখান থেকে নিয়ে চলুন, এখানে আমার ভালো লাগছে না, এ জায়গা ভালো নয়। এখানে থাকলে আমি মরে যাবো—

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—আমি তো তোমাকে নিয়ে যেতে পারি মা, কিন্তু তোমার যে মামলা চলছে। মামলাটা মিটে গেলেই তোমাকে বাড়ি নিয়ে যাবো—

—কিন্তু মামলা আর কতদিন চলবে?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—হা কপাল, মামলা কি আমার হাতে? আমার হাতে যদি থাকতো তো আমি বলতে পারতুম কবে মামলা খতম হবে! তবে মামলা তো আর চিরকাল চলে না, শেষ একদিন হয়ই। তবে এ তো ফৌজদারী মামলা, এ বেশিদিন চলবে না। মাস দু'একের মধ্যেই খতম হলো বলে। তখন মা আমি তোমাকে বাড়ি নিয়ে যাবো। এক'টা দিন একটু কষ্ট করে থাকো মা এখানে!

সুখদা বলল—কিন্তু আমার যে এখানে আর থাকতে ভালো লাগছে না—

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—তা তোমার কষ্টটা এই মাসীকে বোলো। বললেই মাসী তোমার কষ্ট দূর করে দেবে—আর কষ্ট কার না আছে? আমার কষ্ট নেই? এই তোমার মাসীর কষ্ট নেই? আর মা-মণির কষ্টর কথাটা একবার ভাবো দিকিনি।

মা-মণির কথা মনে পড়তেই সুখদার চোখ দুটো যেন একটু সজল হয়ে উঠলো। বললে—কেমন আছে এখন মা-মণি?

—আরে, তার আর থাকা! সেই মা-মণিকে নিয়েই তো এখন দিনরাত ব্যস্ত থাকতে হয় মা, নইলে তো আমি ঘন ঘন তোমার কাছে আসতে পারতুম। এখন তার যাওয়াই ভালো মা। সে কষ্ট আর চোখ মেলে দেখতে পারি না। তাই তো দিনরাত ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি, যেন ভালোয় ভালোয় মা-মণি চলে যেতে পারেন—

—আমার কথা কিছু বলে না?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—তোমার কথা ভেবে ভেবেই তো মা-মণির এত কষ্ট! কেবল বলে—সুখদার মুখ আর দেখবো না। যে মেয়ের জন্যে আমি এত করেছি, সে-ই কিনা আমার এত বড় সর্বনাশ করলে?

কথাগুলো সুখদা মন দিয়ে শুনলে, কিন্তু মুখে কিছু বললে না।

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—তার জন্যে কিছু মন খারাপ কোর না মা, মা-মণি যা-ই বলুক, আমি তো আছি, আমি তো এখনও মরিনি। মা-মণি মারা যাবার পরদিনই আমি তোমাকে মাধব কুণ্ডু লেনে নিয়ে যাবো মা, আর তদ্দিনে মামলাটাও মিটে যাবে—তুমি মা মন খারাপ কোর না, আমি তোমায় কথা দিচ্ছি, আমি নিজে এসে ট্যাক্সি করে তোমাকে নিয়ে যাবো—

মানদা দাসী এতক্ষণে কথা বললে। বললে—কিন্তু ম্যানেজার, তুমিও কথা-গুলো বললে, আর ও-ও মন দিয়ে শুনে গেল, এখন সন্ধ্যে হয়ে এলো, এইবার সব আমার ছেলেরা আসবে, একটু বুঝিয়ে বলো তো ওকে সাজগোজ করতে—

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—হ্যাঁ মা, মাসী তো ঠিক কথাই বলছে, সেজেগুজে তৈরি হয়ে নেওয়াই ভালো। ভদ্দরলোকের ছেলেরা আসছে। তারা ফুর্তি করতে এখানে আসে, ভূতের মতন চেহারা দেখলে তারা কী ভাববে বলো দিকিনি, নাও মা, সেজেগুজে তৈরি হয়ে নাও তো—

সুখদা বললে—কিন্তু তারা যে মদ খায় ম্যানেজারবাবু!

ভূপতি ভাদুড়ী অবাক হওয়ার ভাণ করলে—মদ খায়? তা মদ কে না খায়? মদ তো সবাই খায় মা আজকাল। মদ খাওয়াবার জন্যে মন্ত্রী রয়েছে গভর্ণ-মেন্টের। মদ না খেলে গভর্ণমেন্ট চলবে কী করে বলো তো? দেখেছ তো নরেশ দত্ত কত মদ খেত, কালীকান্ত বিশ্বাস কত মদ খেয়ে মাতলামি করতো, আমি

কখনও কিছু বলেছি? ভেবেছি, যাক বাবা, খাক ওরা মদ, দেশের তো উন্নতি হবে—

সুখদা বললে—কিন্তু আপনি জানেন না, একদিন বিছানায় বমি করে দিয়েছিল।

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—তা মানুষের অসুখ করে না? এই তো মা-মণি বিছানায় শুয়ে শুয়ে বাহ্যে-বমি করছে! আমার কি ভালো লাগছে? কিন্তু অসুখ হলে কী করবে মানুষ? অসুখের ওপর তো কারো হাত নেই! আর যে-দিন বমি করবে, সেদিন বিছানায় না শুলেই হলো! সেদিন মাসীর ঘরে গিয়ে শোবে। দুটো দিন কষ্ট করো মা, তারপর তো আমি আবার তোমাকে মাধব কুণ্ডু লেনে নিয়ে তুলবো।

সুখদা কোনও কথার উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইল।

খানিক পরে বলল—অন্য কোনও বাড়িতে আমায় রেখে দিতে পারেন না?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—অন্য বাড়িতে যে যাবে তুমি, তা সেখানেও ওই একই কাণ্ড হবে মা। কলকাতায় কি মানুষ আছে মা? সব যে জানোয়ার হয়ে গেছে। সবাই কেবল মদ, মেয়েমানুষ আর টাকার জন্যে হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছে। তুমি তো বাড়ির ভেতরে থাকো, তাই কিছু দেখতে পাও না, আমি সব দেখি। দেখি আর ভাবি, দেশটার কী হলো!

তারপর একটু ভেবে বললে—যাক গে, ওসব বাজে কথা, এখন সন্ধ্যে হয়ে এলো, তুমি সাজগোজ করে তৈরি হয়ে নাও গে, আমিও এবার যাবো—

সুখদা আর দাঁড়ালো না। আস্তে আস্তে ভেতরে চলে গেল।

ভূপতি ভাদুড়ী মানদা দাসীর দিকে চেয়ে বললে—কী গো মাসী, এখন হলো তো? খুব যে তুমি বলছিলে এঁড়ে মেয়ে, এখন? তুমি মেয়েমানুষের কারবার করলে কী হবে, আমি বিয়ে-থা করিনি বটে, তবু মেয়ে-মানুষের কারবার আমি তোমাকে শেখাতে পারি, বুঝলে?

মানদা দাসী তবু দমবার পাত্রী নয়। বললে—কিন্তু আসল কথা তুমি চাপা দিচ্ছ কেন? টাকা ছাড়ো? টাকা না ছাড়লে আমি তোমায় এখেন থেকে আজ যেতে দেবো না—দাও, টাকা ছাড়ো!

ভূপতি ভাদুড়ী পকেটের সেই দশ টাকার নোটটা আবার বার করলে। বললে—টাকা তো তোমায় দিচ্ছি, তুমিই তো নিচ্ছ না—

মানদা দাসী বললে—ও-টাকায় আমি পেচ্ছাব করে দিই—তোমার কাছায় কত টাকা আছে, তাই আগে দেখাও তো! আমি তোমার শয়তানি বার করে দিচ্ছি—

ভূপতি ভাদুড়ী দু'পা পিছিয়ে এল।

বললে—তুমি আমার কাছা খুলে দেবে নাকি? কী কাণ্ড!

মানদা দাসী বললে—শুধু কাছা খুলবো? তোমাকে আমি ন্যাংটো করে ফেলবো তবে ছাড়বো। আমি সোনাগাছির খানকি, আমার কাছে চালাকি? সোজা আঙুলে তোমার কাছ থেকে ঘি বেরোবে!

বলে মানদা দাসী ভূপতি ভাদুড়ীর ধুতির কোঁচা ধরে টানতে গেল। ভূপতি ভাদুড়ীও নাচার হয়ে ঘরের এ-কোণ ও-কোণ করতে লাগলো। বললে—আরে, এ কী কাণ্ড বল দিকিনি, ছি, ছি, শেষকালে কি আমাকে তুমি বে-ইজ্জৎ করে ছাড়বে নাকি?

—ওঃ, তোমার আবার ইজ্জৎ! তোমার ইজ্জৎ থাকলে তো বে-ইজ্জতি করবো!

ভূপতি ভাদুড়ী বলে উঠলো—মাইরি, এ কী ইয়ারকি করছো বলো তো মাসী,

এ-রকম আমার ভাল্লাগে না!

মানদা দাসীও নাছোড়বান্দা। বললে—তোমার সঙ্গে আমি ইয়ারকি করবো? তোমার সঙ্গে কি আমার ইয়ারকির সম্পক্কো নাকি যে, ইয়ারকি করবো তোমার সঙ্গে? ইয়ারকি করবার কি আমার লোকের অভাব? যখন তোমার বয়েস ছিল তখন এ-বাড়িতে ইয়ারকি করতে আসোনি? সেসব দিনের কথা কি আমি ভুলে গেচি নাকি? এসো—সরে এসো বলছি—

ভূপতি ভাদুড়ী দুই হাতে নিজের ধুতির কোঁচাটা জাপটে ধরে বললে—আমি তো বলছি আমার কাছে টাকা নেই। সত্যি বলছি মাইরি, টাকা নেই আমার কাছে—

মানদা দাসী বললে—ওঃ, খুব সত্যপীর এসেছে একেবারে! টাকা নেই? এখ্খুনি তো সুখদার সামনে মিছে কথা বললে—

—কী মিছে কথা বললুম?

মানদা দাসী বললে—তুমি বললে না যে মামলা এখনও চলছে! তুমিই আমাকে সেদিন বলে গেছে যে, সুখদা মামলায় খালাস পেয়ে গেছে। পুলিশ মামলা তুলে নিয়েছে—

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—আরে, ও-রকম বলতে হয়। ও-রকম না বললে এখ্খুনি মাধব কুণ্ডু লেনের বাড়িতে গিয়ে উঠতে চাইবে। কত কষ্ট করে মেয়েটাকে ও-বাড়ি থেকে সরিয়েছি—

মানদা দাসীও বোধহয় কী একটা বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় দরোয়ান দৌড়ে এসে ঘরে ঢুকলো।

বললে—মাঈজী, পুলিশ এসেছে সদরে—

—পুলিশ?

মানদা দাসী পুলিশের নাম শুনে থমকে দাঁড়ালো।

পুলিশের এ-বাড়িতে আসা এমন কিছু বিচিত্র ঘটনা নয়। পুলিশের মোকাবিলা করার অভ্যেস আছে মানদা দাসীর। পুলিশকে টাকা দিলেই সে ঠাণ্ডা। সকলের কাছ থেকে চুষে আর পুলিশকে টাকা দিয়ে হাতে রেখেই মানদা দাসী আজ এতগুলো বাড়ির মালিকানা পেয়েছে। কিন্তু তারা তো এসব ব্যাপারে সন্ধ্যেবেলায় আসে না। তাদের যা-কিছু গতিবিধি সব দিনের আলোয়। তাহলে এ-সময়ে তারা হঠাৎ এলো কেন?

ভূপতি ভাদুড়ীর দিকে চেয়ে মানদা দাসী বললে—তুমি টপ্ করে ভেতরে গিয়ে লুকোও—

ভূপতি ভাদুড়ী ছাড়া পেয়ে যেন বাঁচলো। আর কোনও কথা না বলে একেবারে অন্দরমহলে গিয়ে গা ঢাকা দিলে।

তারপর দরোয়ান থানার বড় দারোগাবাবুকে নিয়ে ঘরে ঢুকলো। বড় দারোগাবাবুর পেছনে দুজন কনস্টেবল।

মানদা দাসী ভক্তিভরে মাথা নিচু করে দুই হাত জুড়ে প্রণাম করলে।

—আসুন বড় দারোগাবাবু, আসুন। আমার কী সৌভাগ্য, আপনার পায়ের ধুলো পড়লো গরীবের বাড়িতে—তা সরবত খাবেন? সরবত তৈরি করতে বলবো?

বড় দারোগাবাবু গম্ভীর হয়ে বললে—না, সরবত খাবার সময় নেই। আমি এন্কোয়ারিতে এসেছি। এখেনে তোমার বাড়িতে সুখদা বলে কোনও মেয়ে আছে? সুখদাবালা বিশ্বাস?

—সুখদা? সুখদাবালা বিশ্বাস?

নামটা শুনে যেন আকাশ থেকে পড়লো মানদা দাসী!

বড় দারোগাবাবু বললে—হ্যাঁ, তাকে এখানে এনে লুকিয়ে রাখা হয়েছে, তার স্বামী কমপ্লেন করেছে—

মানদা দাসী প্রথমে একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিল। পুলিশ আসা তার বাড়িতে নতুন নয়। এসব ব্যাপার তার গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে।

বড় দারোগাবাবু বললে—আমি কিন্তু খবর পেয়েছি, সুখদা দাসী নামে একজন বিবাহিতা মেয়ে এখানে আছে—

—ওমা, সে কী কথা! কী সব্বোনাশের কথা বলছেন আপনি! ও নামে তো আমার বাড়িতে কখনও কেউ ছিল না—

বড় দারোগাবাবু বললে—তাহলে তো আমাকে বাড়ি সার্চ করতে হয়—

ভূপতি ভাদুড়ী অন্দরমহলে ঢুকে একেবারে দোতলায় উঠে পড়েছিল। তারপর সেখান থেকে একেবারে সুখদার ঘরে।

—ও মা, মা—

সুখদা চমকে উঠলো। পেছন ফিরতেই দেখলে দরজা খুলে ভূপতি ভাদুড়ী সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভূপতি ভাদুড়ী বললে—আমার কপালের দুর্ভোগ মা, তাই আবার এলুম—

—বলুন, কী বলবেন!

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—বাড়িই চলে যাচ্ছিলুম, তবু আবার এলুম। ভাবলুম মেয়েকে একটু সান্ত্বনা দিয়ে আসি। কিছু মনে কোর না মা। আমার নিজের মাথার কিছু ঠিক নেই নানান জ্বালায়, তাই যখন-তখন যাকে-তাকে যা-তা বলে ফেলি। তুমি কিছু মনে করোনি তো?

সুখদা বললে—না, আমি কিছু মনে করিনি—

—আমি জানি তুমি কিছু মনে করবে না। তুমি তো লক্ষ্মী মা আমার! কিন্তু মা-মণির যে কী হয়েছে, তোমার নাম পর্যন্ত এখন সইতে পারে না। আমি বলেছিলুম তোমার কথা, কিন্তু কী বলে জানো? বলে—সুখদার মুখ পর্যন্ত আমি দেখতে চাই না—

সুখদা কথাটা শুনলো, কিন্তু কিছু উত্তর দিলে না।

—তুমি কিছু মনে কোর না মা। মামলাটা চুকে গেলেই, তুমি আগে ছাড়া পাও, তখন আমি নিজে এসে তোমাকে মাধব কুণ্ডু লেনের বাড়িতে নিয়ে যাবো। এখন মাসীর কাছে একটু কষ্ট করে থাকো মা।

বলে ভূপতি ভাদুড়ী উঠলো। কিন্তু তার আগেই মানদা দাসী এসে হাজির।

বললে—কী হলো, মেয়ের মন ভিজেছে?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—হ্যাঁ, মন ভেজাবার জন্যেই তো এসেছিলাম। আমি ওকে সব বুঝিয়ে বললুম, এখন ঠাণ্ডা হলো।

মানদা দাসী বললে—চলো, এবার বাইরে চলো, তোমার সঙ্গে কথা আছে—

ভূপতি ভাদুড়ীকে নিয়ে মানদা দাসী বাইরে এল। ভূপতি ভাদুড়ী জিজ্ঞেস করলে—কী গো মাসী, কী হলো? পুলিশ চলে গেছে?

মানদা দাসী চট করে কথাটার উত্তর দিলে না। অন্ধকার সিঁড়িটার নিচে নেমে এসে বললে—তোমার জন্যে আমার এ কী জ্বালা হলো বলো তো?

ভূপতি ভাদুড়ী অবাক হয়ে গেল। বললে—কেন? আমি কী করলাম?

মানদা দাসী বললে—তোমার জন্যে আমার পাঁচশো টাকা খেসারত দিতে হলো।

—কাকে খেসারত দিতে হলো?

—আবার কাকে? পুলিশকে! পাঁচশো টাকা দাও আমাকে এখন। টাকা না দিলে তোমার আমি আজ আর ছাড়ছিনে—

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—তা পুলিশকে তুমি টাকা দিতে গেলে কেন?

মানদা দাসী বললে—টাকা দেবো না? তোমার জন্যেই তো টাকা দিতে হলো। তোমার মেয়েকে যে খুঁজে বার করতে চাইছিল! বলছিল আমি নাকি লুকিয়ে রেখেছি সুখদাবালা দাসীকে—

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—তা তুমি কী বললে?

—আমি বললুম সুখদা বলে কেউ নেই আমার বাড়িতে।

—তারপর? একটা অন্য নাম বলে চালিয়ে দিলে না কেন?

মানদা দাসী খেঁকিয়ে উঠলো। বললে—তা আমি কি বলিনি ভেবেছ? আমি তো বলেছি সান্ত্বনাবালা দাসী বলে একটা মেয়ে আমার বাড়িতে নতুন এসেছে—

—তা তারপর?

—তারপর পুলিশ বললে বাড়ি তল্লাসী করবো। বাড়ি যদি তল্লাসী করতো তো তখন যে হাটে হাঁড়ি ভাঙত!

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—তা একেবারে পাঁচশো টাকা দিয়ে দিলে? পঞ্চাশটা টাকা দিলেই তো মামলা চুকে যেত।

মানদা দাসী বললে—তাহলে থানা থেকে বড় দারোগাবাবুকে ডেকে আনব? তার সামনে ওই কথা বলবে তুমি?

ভূপতি ভাদুড়ী হাসলে। বললে—আরে না না, তা নয়, আমি বলছি একেবারে পাচশো টাকা দিতে গেলে কেন?

মানদা দাসী বললে—তা দেবো না? পুলিশ কি টাকা না নিয়ে ছাড়বে?

ভূপতি ভাদুড়ী ভয় পেয়ে গেল। বললে—পাঁচশো টাকা আমি কোথায় পাবো এখন বলো তো?

—টাকা তোমার কাছে আছেই। টাকা না দিয়ে কোথায় যাবে তুমি? দাও, টাকা দাও।

ভূপতি ভাদুড়ী মানদার সামনে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করলে।

বললে—মাইরি বলছি, টাকা নেই আমার কাছে, আমাকে বিশ্বাস করো—

—টাকা নেই মানে? তোমার কাছে টাকা থাকবে না, এটা কি বিশ্বাস করতে হবে নাকি আমাকে? টাকা না ছাড়লে তোমাকে আমি এখেনে সারা রাত আটকে রাখবো।

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—তা টাকা না থাকলে আমি কোত্থেকে দেবো বলো দিকিনি? আমি কি টাকার বাচ্চা পাড়াবো?

মানদা এবার এগিয়ে এল। বললে—দেখি, তোমার পকেট দেখি—

মানদা খপ করে ভূপতি ভাদুড়ীর বুক-পকেটটা চেপে ধরলো।

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—পকেটে তো মাত্তোর দশ টাকা আছে, তুমি তো তা নেবে না—

—দশ টাকা নিয়ে কি আমি ধুয়ে খাবো? আমার করকরে পাঁচশো টাকা সিন্দুক থেকে বেরিয়ে গেল, সেই টাকা না দিলে আমি ছাড়ছি না।

কিন্তু কোথায় টাকা! বুক-পকেট খোঁজা হলো, পাশ-পকেটও খোঁজা হলো।

কোথাও নেই টাকা। শেষে মানদা বললে—দেখি, দেখি, এবার আর ছাড়বো না, এবার তোমার কাছা দেখবোই—

বলে খপ করে কাছাটায় টান দিয়ে সেটা খুলতে গেল।

—আরে, তুমি কি আমায় সত্যি-সত্যিই ন্যাংটো করে দেবে নাকি? এ কী কান্ড? বলে কাছাটা এঁটে ধরলে ভূপতি ভাদুড়ী—

কিন্তু মানদা দাসী এ বাড়ির মালিক সহজে হয়নি। অনেক কষ্টের টাকা তার। অনেক কষ্টে সে পরের পকেট কেটে বড়লোক হয়েছে। তার লজ্জা সম্ভ্রম মান-অপমান জ্ঞান থাকলে চলবে না। সে গায়ের জোরে কাছা টানতে লাগলো—ছাড়ো, কাছা ছাড়ো আগে—

হঠাৎ বাইরে থেকে ডাক এলো—মাসী। ও মাসী—

মানদার হাত হঠাৎ থেমে গেল।

ভূপতি ভাদুড়ীর তখন ধড়ে প্রাণ এসেছে।

মানদা বললে—পালিও না যেন, আমি আসছি—

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—ও আবার কারা?

মানদা বললে—এই পার্টির ছেলেরা, ভোটের জন্যে এসেছে—তুমি এখেনে দাঁড়াও, পালিয়ে যেও না যেন—

বলে বাইরে চলে গেল।

কিন্তু দেবেশদের পার্টি অফিসে কাজের কামাই নেই। কোথায় কোন্ অফিসে লেবার ইউনিয়নের ঝামেলা চলছে তার ফয়সলা করবে দেবেশ। টুলুও সংগে থাকে এক-এক সময়। কিন্তু এক-এক সময় তাকে একলাও বেরিয়ে যেতে হয় ইউনিয়নের কাজে।

সেদিন দেবেশ তখনও আসেনি। এনকোয়ারি কমিশন বসেছে। এক-একদিন এক-একজনের সাক্ষ্য নেওয়া হচ্ছে। সেই সূত্রে পার্টির উকিলের কাছে যেতে হয়। উকিলের সংগে পরামর্শ করতে হয়। পরের দিন যার সাক্ষ্য নেবে তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে দেওয়া হয়। সমস্ত সহরের লোক হাঁ করে থাকে পরের দিন খবরের কাগজের রিপোর্ট পড়বার জন্যে।

কেউ বলে—না মশাই, দেখবেন, ও কিচ্ছু হবে না। সব গভর্ণমেণ্টর ধাপ্পাবাজি—

আবার কেউ বলে—আরে মশাই, ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। দেখবেন এবার আর কংগ্রেস পার পাবে না—

পাশের লোকটি বলে—রেখে দিন মশাই, সে যুগ আর নেই। এখন জজ-ম্যাজিস্ট্রেটরাও তেমনি, এখন তাদেরও কেউ বিশ্বাস করে না। এখন যে রক্ষক সেই ভক্ষক—

কিন্তু এনকোয়ারি কমিশনের সামনে প্রতিদিন উকিল, এ্যাডভোকেটের গাড়ি এসে হাজির হয়। জজ সাহেব ঠিক সময়ে এসে চেয়ারে বসে। ঠিক সময়ে শুনানী শুরু হয়! খবরের কাগজের রিপোর্টারেরা ঠিক সময়ে এসে কাগজ-পেন্সিল নিয়ে তাদের চেয়ারে বসে খস খস করে তাদের পেন্সিল চালায়।

পরের দিন অফিসে কাছারিতে আলোচনা চলে জোর।

একজন বলে—দেখছেন মশাই, কংগ্রেসের কীর্তি দেখেছেন?

পাশের মানুষ বলে—ওসব দেখে কিছু লাভ নেই মশাই, প্রোসিকিউশন আবার দেখবেন সব একদিন নাকচ করে দেবে। আপনারা আইনের কূট মার-প্যাঁচ জানেন না—

টুলু প্রতিদিনই যায়, আর সব যখন মিটে যায় তখন ফিরে আসে পার্টির অফিসে। সঙ্গের সাক্ষীরাও সঙ্গে সঙ্গে ফিরে আসে। তারা কেউ পার্টির লোক, কেউ পার্টির লোক নয়। এক একটা জেরার উত্তরে তারা সাফ সাফ জবাব দেয়।

ডিফেন্স উকিল জিজ্ঞেস করে—দুর্ঘটনার সময় আপনি কোথায় ছিলেন?

সাক্ষী বলে—ধর্মতলা স্ট্রীটে—

—ধর্মতলা স্ট্রীটে আপনি গিয়েছিলেন কেন?

—আমার কাজ ছিল।

—কী কাজ?

সাক্ষী বলে—চাঁদনী থেকে আমি একটা জিনিস কিনতে গিয়েছিলুম—

—আপনি কখন জানতে পারলেন যে ওখানে গুলী চলছে?

সাক্ষী বলে—আমি চোখের সামনে দেখলুম প্রোসেশান শান্তভাবে চলেছে, আর কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ সোডার বোতল পড়তে লাগলো মিছিলের ওপর।

—কারা সোডার বোতল ছুঁড়লো আপনার মনে হলো?

সাক্ষী বললে—পুলিশ পক্ষের লোক বলেই মনে হলো।

—তাদের কাউকে কি আপনি নিজের চোখে দেখতে পেয়েছেন?

—হ্যাঁ। আমার পাশ থেকেই একজন ধুতি-সার্ট পরা লোক মিছিলের ওপর ইঁট ছুঁড়তে লাগলো দেখলুম।

—কেন ইঁট ছুঁড়লো? আপনি কি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন?

সাক্ষী বললে—না।

—কেন জিজ্ঞেস করেননি?

সাক্ষী বললে—আমি ভয়ে জিজ্ঞেস করিনি। আমার মনে হলো আমি যদি তাকে জিজ্ঞেস করি তো আমাকে সে মারধোর করবে। কারণ, তার হাবভাব দেখে আমার মনে হলো সে পুলিশেরই ভাড়া করা লোক।

—কীসে আপনার সেই সন্দেহ হলো?

সাক্ষী বললে—আমি নজর করে দেখলুম, সে একজন পুলিশের সঙ্গে কথা বলছে।

উকিল জিজ্ঞেস করলে—পুলিশের সঙ্গে একবার কথা বললেই কি কেউ পুলিশের লোক হয়ে যায়?

সাক্ষী বললে—কিন্তু যখন সে লোকটা পুলিশের চোখের ওপরেই মিছিলের ওপর ইঁট ছুঁড়লে, তখন পুলিশ তো কিছু বললে না। তাতেই আমার সন্দেহ হলো লোকটা পুলিশের দলের—

এরপর সাক্ষীকে আর কোনও প্রশ্ন করা হলো না। সাক্ষীকে উকিল বললে—আচ্ছা আপনি বসুন—

সেদিনও ঠিক এমনি জেরা চলছিল!

একজন সাক্ষী দাঁড়াতেই উকিল প্রশ্ন করলে—আপনার নাম?

সাক্ষী তার নাম বললে।

—পেশা ?

—দালালী !

—আপনি ওই তারিখে ধর্মতলা স্ট্রীটে গিয়েছিলেন কেন ?

সাক্ষী বললে—আমি আমার ছেলের জামা কিনতে গিয়েছিলাম।

—কী দেখলেন সেখানে ?

দেখলাম একটা প্রোসেশান চলেছে লম্বা, আর তারা শ্লোগান দিচ্ছে—

—দেখে কী মনে হলো ?

—মনে হলো কমিউনিষ্ট পার্টির মিছিল।

—কী করে বুঝলেন কমিউনিষ্ট পার্টির মিছিল ?

সাক্ষী বললে—দেখলাম লাল ফেস্টুন, আর শ্লোগান দিচ্ছে 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ'—

—কংগ্রেসের মিছিলে কী শ্লোগ্যান দেয় ?

—বন্দে মাতরম্।

—আপনি কোন্ পার্টির মেম্বার ? কমিউনিষ্ট পার্টি, না কংগ্রেস পার্টির ?

সাক্ষী বললে—আমি স্যার কোনও পার্টির মেম্বারই নই, আমি একজন সাধারণ ভদ্রলোক—

কোর্টের মধ্যে চাপা হাসির আওয়াজ শোনা গেল।

—তারপর গুলী চলাটা কখন দেখলেন ?

সাক্ষী বললে—আমি তখন ফুটপাথে জামা কিনছি, হঠাৎ দুম করে বন্দুক ছোঁড়ার আওয়াজ হলো...

কমিশনের সামনে এইভাবে যথারীতি বিভিন্ন সাক্ষীর জেরা চলছে। পার্টির ভলান্টিয়াররাও আসে। তারা ক'দিন থেকে উত্তেজনায় ফেটে পড়ছে। একটা কিছু সিদ্ধান্তের জন্যে তারা উদ্গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছে। শুধু তাই-ই নয়। অন্যদিকে আছে ভোট। পার্টির ছেলেমেয়েরা ভোটের জন্যে বাড়ি বাড়ি যাচ্ছে। সকালবেলাই তারা বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। তারপর যার যার অঞ্চলের অফিসে গিয়ে জড়ো হয়। সেখানে পোস্টার লেখা হয়। ছাপানো পোস্টার নিয়ে বাড়ির দেয়ালে দেয়ালে মেরে দিয়ে আসে। আর গভীর শীতের রাতে বেরোয় আলকাতরার টিন নিয়ে। বড় বড় অক্ষরে আলকাতরা দিয়ে লিখে দেয়—মেহনতী মানুষের স্বার্থে বামপন্থী দলের প্রার্থী পূর্ণচন্দ্র বিশ্বাসকে ভোট দিন।

ওদিকে পুণ্যশ্লোকবাবুর দলের ছেলেরাও বসে নেই। তারাও আবার পরের দিন তারই পাশে আলকাতরা দিয়ে বড় বড় করে লিখে যায়—চীনের দালালদের চিনে রাখবেন, পুণ্যশ্লোকবাবুকে ভোট দেবেন।

রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কিংবা বাসে-ট্রামে যারা যাতায়াত করে তারা দেয়ালের লেখাগুলো পড়ে আর নানান মন্তব্য করে।

বলে—এবার আর কংগ্রেসের রক্ষে নেই—

কেউ বলে—টাকার শ্রাদ্ধ মশাই, কেবল টাকার শ্রাদ্ধ। যারা টাকা ঢালতে পারবে তারাই জিতবে, এ-যুগ তো টাকারই যুগ—

অন্যদিক থেকে একদল বলে—এবার আর টাকা নয় মশাই, রক্ত ! টাকার চেয়ে রক্তের দাম বেশি। এবার রক্ত দিয়ে মানুষ কংগ্রেসকে রুখবে—

একজন দার্শনিক ধরনের লোক বলে ওঠে—রক্ত দিয়ে রক্তের দেনা শোধ হবে হে—

কত লোক কত কথা বলে, তার কি সব লেখাজোখা আছে! যারা নিরীহ মানুষ, শুধু খবরের কাগজ পড়ে দেশের অবস্থা বিচার করে, তারা ভয়ে কাঁপে। বলে—আহা, সেকাল আর ফিরে আসবে না—

সেকালে যে কত সুখ ছিল তার সবিস্তার ফিরিস্তি দেয় তারা। এক টাকায় একটা সার্ট, সাড়ে তিন টাকা জোড়া জুতো, বারো সের দুধ টাকায়, সেসব আর ফিরে আসবে না হে। এখন টাকার যুগ। টাকা দিয়ে আমি সব কিনে নেব। তোমাকে কিনবো, তোমার মানমর্যাদা, তোমার পাপপুণ্য, তোমার বিবেক-বিবেচনা পর্যন্ত কিনে নিয়ে তোমাকে আমার স্লেভ করে রেখে দেবো। আমাকে তুমি ভোট দিতে বাধ্য! মুখে তোমাকে আমি অনেক আশার কথা বলবো। গরীবকে বড়লোক করে দেবার স্তোকবাক্য শোনাবো। আমি বলবো—আমাকে তুমি ভোট দাও, আমিই তোমাকে রক্ষে করবো। আমি মাঠে মাঠে লেকচারে ঘোষণা করবো—এসো গরীব মজদুর, কুলি, কৃষাণ, রিকশাওয়ালা, ট্যাক্সি-ড্রাইভার, তোমরা সবাই আমার ভাই। তোমাদের রক্তের বিনিময়ে আমরা স্বাধীন হয়েছি, সুতরাং সমাজের সবচেয়ে উঁচু স্থানটা তোমাদের। আজ তোমরা সবাই এগিয়ে এসো, এগিয়ে এসে আমাকে কোল দাও! এসব কথা আমাদের বলতে হয় বলেই বলবো, কিন্তু আমরা তোমাদের সঙ্গে সামিল হবো না। আমাদের যেন তোমরা তোমাদের সঙ্গে রাস্তায় রাস্তায় হেঁটে যেতে বোল না। আমরা সামনের সারিতে গাড়িতে চড়ে চলবো, আর তোমরা আমাদের পেছনে হেঁটে আসবে। কারণ আমরা তোমাদের সঙ্গে হেঁটে আসবো কী করে? আমরা যে লীডার, আমরা কি তোমাদের সঙ্গে একাকার হতে পারি? তোমাদের সঙ্গে এক হয়ে গেলে আমাদের তোমরা ভয়-ভক্তি করবে কেন? লোকে আমাদের মানবে কেন? তাহলে আমরা তোমাদের শাসন করবো কি করে? তোমরা যে আমাদের মাথায় উঠে বসবে? তোমরা মাথায় উঠে বসলে তো আমাদের কাজ চলবে না।...

অনেকক্ষণ পরে পর্মিলি কথা বললে।

বললে—কী হলো, তুমি চুপ করে রইলে কেন? কথা বলছ না?

সুরেন পাশে বসে ছিল চুপ করে। বললে—কী বলবো বলো? অপরাধীর কি কিছু বলার থাকতে পারে?

পর্মিলি বললে—তুমি অপরাধী?

সুরেন বললে—নিশ্চয়। সবার সামনে সকলের ইচ্ছের বিরুদ্ধে তুমি আমাকে গাড়িতে তুলে নিয়ে এলে। সকলের চোখে তো আমিই গিল্‌টি হয়ে রইলুম।

পর্মিলি বললে—চিরকাল মাথা নিচু করে থেকে থেকেই তোমার মনে একটা কম্‌প্লেক্স গড়ে উঠেছে। ওটা গ্রো করলে মানুষ আস্তে আস্তে জানোয়ার হয়ে যায়—

—তাহলে সেই জানোয়ারটাকে তুমি এমন করে সম্মান দিলে কেন?

পর্মিলি বললে—ধরে নাও তোমাকে মানুষ করবার জন্যে।

সুরেন বললে—কিন্তু আমাকে মানুষ করবার দায়িত্ব তুমি নিজের ঘাড়ে তুলে নিচ্ছ নাকি! আর তা ছাড়া আমি যে অমানুষ তা কে তোমায় বলেছে?

পর্মিলি বোধহয় [illegible] সুরেনের মুখ থেকে এ কথা আশা করেনি। তাই সে চুপ করে রইল।

সুরেন আবার বললে—তার চেয়ে বরং তুমি আমায় এখানে নামিয়ে দাও—

—এখান থেকে তুমি কী করে বাড়ি যাবে?

—এ কোথায়?

এতক্ষণ সুরেন লক্ষ্য করেনি কোথায় কত দূরে সে এসেছে। চারদিকে চেয়ে দেখলে এবার। কিন্তু চিনতে পারলে না জায়গাটা।

জিজ্ঞেস করলে—এ কোথায় এলুম?

পমিলি বললে—ডায়মণ্ডহারবারের রাস্তা দিয়ে চলেছি আমরা—

—কিন্তু এদিকে কেন এলে?

পমিলি বললে—কেন, তোমার ভয় করছে নাকি?

সুরেন বললে—ভয় করবে না? তুমি যা জোরে গাড়ি চালাচ্ছো. যদি কোনও এ্যাকসিডেন্ট হয়?

পমিলি নির্বিকার মুখে বললে—এ্যাকসিডেন্ট হলে মরবো!

সুরেন বললে—কী বললে?

পমিলি বললে—বললাম মরবো! কেন, তোমার মরতে ইচ্ছে করে না?

সুরেন বললে—বা রে, শুধু শুধু মরতে ইচ্ছে করবে কেন? তোমার মরতে ইচ্ছে করে নাকি?

পমিলি বললে—খুব—

বলে সে হাসতে লাগলো। তারপর হাসতে হাসতেই বললে—এসো না, আজ দু'জনে একসঙ্গে মরি—

সুরেন বললে—সে কী? তুমি কি পাগল হয়ে গেলে নাকি?

পমিলি বললে—কিন্তু সুরেন, এক এক সময় আমার খুব মরতে ইচ্ছে করে। মনে হয় যদি একটা সঙ্গী পেতুম তো একসঙ্গে মরতুম। সব কাগজে পরের দিন খবর বেরোত—এক জোড়া প্রেমিক-প্রেমিকার চরম আত্ম-নিবেদন—

—কিন্তু ও রকম ইচ্ছে হয়ই বা কেন তোমার? তোমাদের কত টাকা, কত নাম-ডাক, কত প্রতিপত্তি, তুমি মরতে যাবে কোন্ দুঃখে?

পমিলি সে কথায় কান না দিয়ে বললে—দেখ, সামনের ওই বিরাট গাছটায় গিয়ে একটা প্রচণ্ড রকমের ধাক্কা লাগাই—

সুরেন তাড়াতাড়ি পমিলির একটা হাত চেপে ধরলে। বললে—দোহাই তোমার পমিলি, দোহাই, পাগলামি কোর না—

পমিলি খিলখিল করে হেসে উঠলো।

বললে—আমি সকলকে চিনে নিয়েছি, আজ তোমাকেও চিনে নিলুম। কেউ আমার সঙ্গে মরতে রাজী নয়!

সুরেন বললে—কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না তুমি মরতে যাবে কীসের দুঃখে?

পমিলি বললে—শুধু কি দুঃখেই মানুষ মরে, বেশি সুখেও তো মানুষ মরতে চায়!

—সুখে মানুষ মরতে চায়? তুমি বলছো কী?

পমিলি বললে—তুমি ছেলেমানুষ তাই জানো না। সুখ যখন গলা পর্যন্ত উপচে ওঠে তখন সেই সুখকে চিরস্থায়ী করবার জন্যেও কোনও কোনও মানুষ মরতে চায়।

—তোমার বুঝি তাই হয়েছে?

পমিলি বললে—হ্যাঁ, আজকে আমার মত সুখী কেউ নয়—

—কেন? এত সুখ কীসের?

পমিলি কোনও উত্তর দিলে না। যেমন গাড়ি চালাচ্ছিল, তেমনি চালাতে

লাগলো।

—কই, বললে না তো কীসের এত সুখ?

পর্মিলি হঠাৎ গাড়িটা থামিয়ে দিলে। বললে—তোমার জন্যে—

—আমার জন্যে? বলে অবাক হয়ে সুরেন পর্মিলির দিকে চাইলে।

পর্মিলি হঠাৎ একটা কান্ড করে বসলো। একেবারে ঝুঁকে পড়লো সুরেনের দিকে। সুরেন কী করবে বুঝতে পারলে না। তাড়াতাড়ি সরে যেতে যেতে বললে—করছো কী, করছো কী?

কিন্তু ততক্ষণে পর্মিলি যা করবার করে ফেলেছে। সুরেনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার কাঁধের ওপরই তার দু'পাটি দাঁত বসিয়ে দিয়েছে—পর্মিলির সমস্ত শরীরটা এক মুহূর্তে যেন একটা দৈত্যে পরিণত হয়েছে...

অসহ্য যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলো সুরেন—উঃ—

রাত একদিন সকাল হয়। আবার সকালও গড়িয়ে গড়িয়ে একসময় রাতের অন্ধকারে বিলীন হয়। কলকাতার জীবনের মানুষের একদিন সকাল হয়েছিল। সেদিন বিশ্বাস ছিল দৃঢ়, সংগ্রাম ছিল কঠোর। কিন্তু এখন সে বিশ্বাসও নেই, সংগ্রামও নেই। এখন মানুষ দিশেহারা হয়ে শুধু আকাশের দিকে চেয়ে থাকে—কে তাদের বাঁচাবে? আর যারা কোনও কিছুতেই বিশেষ বিচলিত হয় না, তারা দুর্গা নাম জপ করতে করতে যথারীতি অফিসের দিকে ছোটে আর দিনশেষের ক্লান্তি নিয়ে বাড়ি ফিরে আচ্ছন্নের মত পড়ে থাকে। তাদের রক্ষাকর্তা যারা তারা বলে—আমরা জনগণের রক্ষক। জনগণই আমাদের রাজা। তোমরা আমাদেরই ভোট দাও—

কিন্তু ইতিমধ্যে আর একদল রক্ষাকর্তা গজিয়ে উঠেছে। তারা বলে—আমরাই হলুম জনগণের আসল রক্ষক। জনগণই আমাদের একমাত্র রাজা। তোমরা যদি নিজেদের মঙ্গল চাও তো আমাদের ভোট দাও—

প্রকৃতপক্ষে কে যে আসল রক্ষক তা কেউ বুঝতে পারে না। বুঝতে পারে না বলেই একবার পূর্ণবাবুর লেকচার শুনতে যায়, আবার একবার পুণ্যশ্লোক-বাবুর লেকচার শুনতে যায়। দুজনের কথার মধ্যেই যুক্তি আছে, দুজনেই জেল খেটেছে। তফাত শুধু একটা বিষয়ে। পূর্ণবাবুর নিজের সংসার বলতে কিছু নেই। আর পুণ্যশ্লোকবাবু সংসারী—তার ছেলেটি আমেরিকা-ফেরত, আর মেয়েটি মদখোর।

যার সন্দেহ হয় সে জিজ্ঞেস করে—আচ্ছা, সত্যিই পুণ্যশ্লোকবাবুর মেয়ে মদ খায় নাকি?

যে সবজান্তা সে বলে—আরে মশাই, আমি নিজের চোখে ওঁর মেয়েকে মদ খেতে দেখেছি—

যারা পুণ্যশ্লোকবাবুর টাকা খায়, তারা বলে—মদ কে না খায়? মদ খেলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়? জওহরলাল নেহরু মদ খায় না? রবি ঠাকুর মদ খেত না? তা ছাড়া মদও তো একটা খাবার জিনিস মশাই। মদ যদি খাবার জিনিস না হবে তো গভর্ণমেণ্ট তাহলে মদের ব্যবসার জন্যে পারমিট লাইসেন্স দেয় কেন? আর শুধু কি মদ খায়, সিগারেটও তো খায় পুণ্যশ্লোকবাবুর মেয়ে।

—সে কি মশাই, মেয়েমানুষ সিগারেট খায়?

লোকটা বলে—হ্যাঁ খায়, তার বাপের পয়সায় খায়। আপনার পয়সা থাকলে আপনিও খান না, কে বারণ করছে?

তর্ক করতে করতে যখন ব্যাপারটা ঝগড়ায় পরিণত হবার মতন হয়, তখন শান্তিপ্রিয় যারা তারা চুপ করে যায়। আর কোনও কথা তারা বলে না। দরকার কী অত ঝগড়া করে। ভোট যখন দেবার সময় হবে তখন দেবো।

সেদিন পার্কের মীটিং সেরে পুণ্যশ্লোকবাবু দেরি করে বাড়ি এলেন। সুব্রত কাছে আসতেই জিজ্ঞেস করলেন—পমিলি বাড়ি ফিরেছে?

সুব্রত বললে—না—

—এত রাত্রেও বাড়ি ফিরলো না?

তারপর কী যেন ভাবলেন। আবার বললেন—সুরেনের বাড়িতে গিয়ে একবার খোঁজ নিয়ে এসো না—সে হয়ত এতক্ষণে ফিরেছে—

সুব্রত বললে—সুরেন ফিরলে পমিলিও ফিরতো—

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—তা কি বলা যায়? পমিলি হয়ত তাকে নামিয়ে দিয়ে অন্য কোথাও গেছে—

—অন্য কোথায় যাবে?

পুণ্যশ্লোকবাবু তখন মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠেছেন। বললেন—তোমাদের দু'জনের কথা কারো কিছু বোঝবার উপায় নেই। আমি কি কম ভুগছি তোমাদের জন্যে?

সুব্রত বললে—কিন্তু আমি কী করলুম?

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—তোমারও তো অন্যায়। আমি তোমাকে বলে-ছিলুম আরো কিছুদিন ওখানে থাকতে। আরো কিছুদিন পরে ইণ্ডিয়ায় এলে তোমার কী ক্ষতিটা হতো? দেখছো এখন আমি আমার ইলেকশান নিয়ে ব্যস্ত, আমার মরবার পর্যন্ত সময় নেই এখন, এই সময় এখানে আসতে হয়! ইলেক-শানের পরে এলে তোমাকে একটা ভালো জায়গায় প্রোভাইড করতে পারতুম, তোমারও তো একটা জায়গায় ফিকস্ হয়ে যাওয়া উচিত—

সুব্রত বললে—আমার কথা এখন আপনাকে আমি ভাবতে বলছি না—

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—তুমি তো ভাবতে বলছো না, কিন্তু ফাদার হিসেবেও তো আমার সেটা ভাবা উচিত—আমার নিজেরও তো তোমার ওপর একটা দায়িত্ব আছে। এখন ইলেকশানে যদি খারাপ কিছু হয় তো তোমার কী হবে বলো তো? তোমারই বা কী হবে আর পমিলিরই বা কী হবে? মিনিস্টার থাকতে থাকতে তো একটা কিছু করে দিতে হবে তোমাদের। আমি তো চির-কাল বেঁচে থাকবো না—

সুব্রত এ কথার কোনও উত্তর না দিয়ে বললে—আমি যাচ্ছি—

—কোথায় যাচ্ছ?

সুব্রত বললে—ওই যে বললেন সুরেনদের বাড়ি যেতে—

—আচ্ছা, তাই যাও—

বলে অন্য ঘরে চলে গেলেন। সুব্রত গাড়িটা নিয়ে গেট পেরিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। যেতে আসতে কত আর সময় লাগবে। সুকীয়া স্ট্রীট থেকে মাধব কুণ্ডু লেনে যেতে গাড়িতে পনেরো মিনিট সময়ই লাগুক! পুণ্যশ্লোকবাবু নিজের ঘরে গিয়ে আলো জ্বাললেন। তারপর খদ্দরের পাঞ্জাবিটা খুললেন। মনের গভীরে একটা চিন্তা দানা বেঁধে উঠতে চাইছে, সত্যিই তাঁর

জীবনে যেন এতদিন পরে আবার রাত নেমে আসছে। এ রাত আবার কতদিনে ভোর হবে কে জানে! বহুদিন আগে ব্রিটিশদের আমলে তাঁর জীবনে রাত নেমে এসেছিল। বছরের পর বছর তিনি জেল খেটেছেন। ব্রিটিশ আমলের পুলিশের হাতে লাঠি খেয়েছেন। লাঠি খেয়ে তাঁর হাড় ভেঙে গেছে। তবু তিনি 'বন্দে মাতরম্' বলা থামাননি। তবু তিনি খদ্দর পরাও ছাড়েননি। সেই দিনের অত ত্যাগস্বীকারের ফল কি এই? এখন লোকে তাঁকে বলে আমেরিকার দালাল। এখনকার যুগের কলকাতার ছেলেরা সেসব দিনের কথা ভুলে গেছে। সেই জন্যেই তো তিনি ইতিহাস লিখিয়ে রেখে যেতে চাইছিলেন। যে ইতিহাসে কংগ্রেসেরও কথা লেখা থাকবে, মহাত্মা গান্ধীর কথা লেখা থাকবে, তাঁর জেল খাটা, তাঁর ত্যাগস্বীকারের কথাও লেখা থাকবে। কিন্তু তাও তো হলো না। এবার সব বোধহয় বানচাল হতে চলেছে—

হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠলো।

পুণ্যশ্লোকবাবু রিসিভারটা তুললেন। বললেন—হ্যালো—

তারপর যে খবরটা শুনলেন, তাতে তাঁর প্রেসার যেন হঠাৎ অসম্ভব রকম বেড়ে উঠতে চাইল।

বললেন—শুধু গাড়িটা পড়ে আছে?

—হ্যাঁ।

—গাড়িটা ওখানে কে নিয়ে গেল?

—তা জানি না।

—আশেপাশে খোঁজ নিয়ে দেখেছ?

—আজ্ঞে দেখেছি। একেবারে ঠিক ডায়মণ্ডহারবার রোডের ওপরেই গাড়িটা খালি পড়ে আছে। ব্লু-বুকে আপনার নাম দেখে আপনাকে টেলিফোন করছি।

—গাড়ির চাবি? গাড়ির চাবি কোথায়?

লোকটা বললে—গাড়ির চাবিটাও নেই।

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—তাহলে একটা মোটর মেকানিক ডেকে চাবির একটা ব্যবস্থা করে গাড়িটা যে কোনও রকমে আমার বাড়িতে পাঠিয়ে দাও—

অনেকদিন পরে টুলু এ-বাড়িতে এসেছিল। এই মাধব কুণ্ডু লেনের বাড়িতে। কেমন যেন তার সন্দেহ হয়েছিল, তাদের পার্টি থেকে সুরেনদাকে ওরা ভাঙিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এখন রাস্তার ফুটপাথে, পার্কে, গ্রামে, সহরে সব জায়গায় মীটিং চলেছে। ভোটের মীটিং। যেমন করে হোক নিজেদের পার্টির ক্যানডিডেট-দের দাঁড় করাতেই হবে। সন্দীপদা সেদিন সেই কথাই বলে দিয়েছে সবাইকে। ভোটের সময়টাই হলো সবচেয়ে বিপজ্জনক। এই সময়টাতে কংগ্রেস চারদিকে কোটি কোটি টাকা ছড়াবে। মারোয়াড়ী গুজরাটি বাঙালী পাঞ্জাবী কারবারীরা ঢেলে টাকা দেবে কংগ্রেসকে। কারণ টাকা না ঢাললে তাদের স্বার্থ কে দেখবে?

কিন্তু আসলে সুরেনদা কে? কেউই না। সুরেন সান্যাল নামে কোনও একজন ছেলে যদি পার্টি ছেড়ে চলে যায় তো তাতে কোনও ক্ষতি নেই কারো। পার্টিরও কোনও লোকসান নেই। পৃথিবীর সব পার্টিতেই এমন হয়েছে। কত পার্টির কত মেম্বারকে খুন করা হয়েছে, পার্টি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

পার্টি যখন বড় হয় তখন কত রকম খারাপ লোক খারাপ মতলব নিয়ে সে পার্টিতে ঢুকে পড়ে। যখন তারা ধরা পড়ে, তখন তাদের লাথি মেরে বার করে দিতেও কারো দ্বিধা হয় না।

সহদেববাবু বলতো—ওরে, আর কতদিন এ রকম করে চালাবি তুই? এবার একটা কাজকর্ম কিছু কর—

টুলু বলতো—কাজকর্মই তো করছি বাবা—

সহদেববাবু কলকাতার সমাজের কিছুই বুঝতো না। অন্ধ মানুষের চোখে সেই আগেকার দেখা সমাজের ছবিটাই যেন জ্বলজ্বল করতো। সেই আগেকার যুগের মানদণ্ড দিয়েই বিচার করতো মানুষকে। সহদেববাবু জানে, মেয়ে বড় হলে বিয়ে করবে, ছেলেমেয়ে হবে, সংসার করবে। সেইটেই মেয়েদের জীবনের আদর্শ। কিন্তু টুলু-ফুলুদের জীবনযাত্রা তার কাছে ভালো লাগতো না। যে মেয়ের বিয়ের বয়েস হয়েছে, তার পক্ষে এমন করে বাইরে বাইরে ঘুরে বেরানো ভালো দেখায় না। কিন্তু ভালো না দেখালেই বা কী করবে সহদেববাবু। পেটের জন্যে সব সহ্য করতে হয়। মেয়ের বাইরে যাওয়াও সহ্য করতে হয়, মেয়ের দেরি করে বাড়ি ফিরে আসাও সহ্য করতে হয়।

সেদিন মীটিং থেকে হঠাৎ চলে যাওয়ার পরই টুলুর যেন টনক নড়লো। জিনিসটা যেন ঠিক পছন্দ হলো না তার। কে একজন এসে হঠাৎ কী বললে আর সুরেনও চলে গেল, এটা কারই বা ভালো লাগে!

ব্যাপারটা টুলু কিছুতেই ভুলতে পারছিল না। সবাই যখন মীটিং-এর পর পার্টির অফিসে গিয়ে হাজির হলো, নানা কাজে মশগুল হয়ে পড়লো, তখনও টুলু ভুলতে পারলে না কথাটা। অনেক রাত্রে ঢাকুরিয়ার বাড়িতে ফিরলো। কিন্তু তখনও মনটার মধ্যে যেন খচখচ করে কথাটা বিঁধছিল।

সহদেববাবু বরাবর মেয়ে ফিরে আসা পর্যন্ত জেগেই থাকে। যতক্ষণ টুলু বাড়িতে না আসে ততক্ষণ তার অন্ধ চোখে ঘুম আসে না। বার বার ফুলুকে জিজ্ঞেস করে—কী রে ফুলু, তোর দিদি এখনও এলো না যে—

ফুলুর অত ভাবনা নেই। সে ভাত নিয়ে বাবাকে খাইয়ে নিজে খেয়ে হাঁড়ি-কুঁড়ি তুলে নিজের জায়গায় শুয়ে পড়ে। সহদেববাবুর কথা তার কানেও যায় না।

সেদিন টুলু বাড়ি আসতেই সহদেববাবু জিজ্ঞেস করলে—কী রে, এত দেরি হলো যে মা?

টুলু বললে—আজকাল একটু দেরিই হবে বাবা—

সহদেববাবু বললে—এত কাজ করলে শেষকালে শরীর যে ভেঙে যাবে তোর?

টুলু বললে—না বাবা, আমার শরীর ভাঙবে না—

সহদেববাবু তবু ছাড়ে না। বললে—এই সেদিন অত বড় দুর্ঘটনা থেকে উঠলি, আমার যে ভয় করে মা—

টুলু বললে—ভোট যত এগিয়ে আসছে আমাদের কাজও তত বাড়ছে—আর ক'টা মাস একটু খাটুনি আছে। তারপরে বিশ্রাম—

—তোর আর বিশ্রাম! আমি মরে গেলে তোর বিশ্রাম হবে।

টুলু বাবার কথার জবাব দিচ্ছিল বটে, কিন্তু তার মন পড়ে ছিল অন্য-দিকে। হঠাৎ বললে—বাবা, জানো এবার যদি ভোটে আমরা জিতি তো তোমার সাধ আমি পূর্ণ করবো—

সহদেববাবুর মুখখানা আশায় উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বললে—আমার সাধ

আর এ জীবনে পূর্ণ হবে না রে, আমি আর বেশি দিন বাঁচবো না—

টুলু বললে—তুমি বেঁচে থাকতে থাকতেই সব দেখে যাবে বাবা—

সহদেববাবু বললে—ছাই দেখবো রে, ছাই দেখবো। তুই বিয়ে করলে তবু মনের একটা সাধ পূর্ণ হতো—

—বিয়ে আমি করবো বাবা। বিয়ে করবো না কেন!

সহদেববাবু যেন মেয়ের কথায় আনন্দে লাফিয়ে উঠতে যাচ্ছিল। বললে—তুই বিয়ে করবি মা? বিয়ে তুই করবি?

টুলু বললে—হ্যাঁ বাবা, তুমি দেখো, ভোটটা মিটে গেলেই আমি বিয়ে করবো।.

সহদেববাবু বললে—হ্যাঁ মা, তাই যেন হয়, আমি যাবার আগে তোর বিয়েটা যেন দেখে যেতে পারি মা। তাই তো ভাবছিলাম, তুই বাইরে বাইরে এত ঘুরিস আর কাউকে তোর পছন্দ হলো না—

টুলু বললে—এবার পছন্দ হয়েছে বাবা—

সহদেববাবু যেন আনন্দে অস্থির হয়ে উঠলো। বললে—ছেলেটি কেমন রে? তোর মনের মত হয়েছে তো মা?

টুলু বললে—হ্যাঁ বাবা—

সহদেববাবুর বুক থেকে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরোল। হাত দুটো জড়ো করে কপালে ঠেকিয়ে কার উদ্দেশে যেন প্রণাম করলে। তারপর বললে—ভালো হলেই ভালো মা, আজকাল ভালো কিছু হবে ভাবতেই ভয় করে। ভগবান কি আমার মুখ রাখবেন...

তারপর হঠাৎ সহদেববাবুর যেন কী সন্দেহ হলো। বললে—কই রে, তুই খেলিনে যে?

—আমি পার্টির অফিস থেকে খেয়ে এসেছি, এখন আর খাবো না।

বলে সে তার বিছানায় শুয়ে পড়লো। আলোটা জ্বলছিল, সেটাও হাত বাড়িয়ে নিভিয়ে দিলে। ঘরটা অন্ধকার হয়ে গেল। কিন্তু অন্ধকারের মধ্যেও টুলুর মনটা যেন নির্জন হতে পারলো না। মনে হলো যেন চারদিক থেকে সবাই বড় ঘিরে রয়েছে তাকে। যেন পার্টি অফিসের সব প্রোগ্রাম তাকে গ্রাস করতে আসছে। নতুন নতুন মেম্বার করতে হবে, নতুন ভোটার লিস্ট তৈরি করতে হবে, নতুন কনষ্টিটিউএন্সিতে গিয়ে ক্যানভাস করতে হবে। কত কাজ তার। শুধু কি কাজ, কত দায়িত্ব তার মাথার ওপর। তার ওপর আছে এনকোয়ারি কমিশন। উকিলের কাছে গিয়ে পরামর্শ চাওয়া। সন্দীপদার কাছে পুরো রিপোর্ট দেওয়া। কত, কত কাজ তার। কাজ করতে করতে কত বয়েস বেড়ে গেল তার, তবু কাজের যেন আর শেষ নেই। সেই কবে সে একদিন দেশ ছেড়ে শেয়ালদা স্টেশনে এসে উঠেছিল ভাই-বোনের হাত ধরে। ভাইটা মারা গেল ইষ্টিশানের প্লাট-ফরমে। তারপর আস্তে আস্তে চোখের সামনে কলকাতা সহরটা বদলে গেল। আগেকার মানুষগুলো আরো হিংস্র, আরো কুটিল হয়ে উঠল। নোংরা সহর আরো নোংরা হয়ে উঠলো। লোভ বেড়ে গেল মানুষের। টাকার অঙ্ক ফুলে ফেঁপে জনাকয়েকের সিন্দুকে গিয়ে পাহাড় হয়ে উঠলো। আর যারা কিছু পেলে না তারা মরিয়া হয়ে উঠলো পাবার জন্যে। তখন পূর্ণদা, সন্দীপদা এগিয়ে এল নতুন পার্টি তৈরি করতে। মনে পড়ে, দেবেশদাই একদিন তাকে বলেছিল—তুমি আমাদের পার্টিতে কাজ করবে?

টুলুর তখন এমন কিছু একটা বয়স নয়। কী ভেবে সে বলেছিল—আপনারা

টাকা দেবেন?

দেবেশদা চমকে উঠেছিল—বা রে, এইটুকু মেয়ে, এই বয়েসেই বেশ পয়সা চিনেছ তো!

টুলু বলেছিল—বা রে, পরের বাড়িতে কাজ করে যে আমি টাকা পাই। তারা মাইনে দেয় আর আপনারা মাইনে দেবেন না?

সেইদিনই টুলুকে ভারি পছন্দ হয়ে গেল দেবেশদার। বেশ চালাক চতুর মেয়ে। পাকিস্তানের উদ্বাস্তু। ওদের দিয়েই ভালো কাজ হবে। পাড়া থেকে আরো কয়েকটা ছেলেমেয়ে জোগাড় হয়ে গেল।

দেবেশদা বললে—দিনে এক টাকা করে দেবো তোমাদের সবাইকে, রাজী তো? তোমাদের আরো কর্মী জোগাড় করে দিতে হবে—

প্রথম প্রথম ওই কাজটাই ছিল টুলুদের। পাড়ায় পাড়ায় ছেলেমেয়েদের মধ্যে থেকে পার্টির কর্মী জোগাড় করা। তারপর শুরু হলো চাঁদা তোলার কাজ। একটা মস্ত লাল কাপড়ের চারটে কোণ ধরে চৌরঙ্গীর ফুটপাথে ভিক্ষে চাওয়া। কেউ পয়সা দিত, কেউ বা চোখ রাঙিয়ে এড়িয়ে চলে যেত। তবু সারা দিনে যা আদায় হতো তা গুণে গেঁথে দিয়ে আসতে হতো পার্টি অফিসে সন্দীপদার হাতে। এমনি রোজ। তারপর এল ইলেকশান। সেটা ১৯৫২ সাল। একটা জায়গাতেও জিততে পারলে না পূর্ণবাবুরা। দেবেশদা বললে—ওতে ঘাবড়ে গেলে চলবে না, পরের বার দেখা যাবে—

তারপরে পাঁচটা বছর কেটে গেছে। এবার আবার এসেছে ইলেকশান। এই পাঁচটা বছর যে কোথা দিয়ে কেটে গেল তা টুলুর খেয়াল ছিল না। এই পাঁচ বছরের মধ্যেই যেন টুলু অনেক দেখেছে, অনেক শিখেছে। দেখেছে, দিনে দিনে তাদের দল যেমন ভারি হয়েছে, তেমনি তাদের কাজও বেড়েছে। এখন আর শুধু চাঁদা তোলা নয়। এখন সেই চাঁদার টাকা দিয়ে ফ্যাক্টরীর মজুরদের ইউনিয়নের কাজ শুরু হয়েছে। এখন এমনি কত ইউনিয়ন যে তাদের খাতায় নাম লিখিয়েছে তার শেষ নেই। এখন কারখানাগুলোর মজুররা পূর্ণবাবুর দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকে। তারা বলে—এবার আপনাদের ভোট দেবো বাবু—আমাদের মাইনেপত্তর বাড়িয়ে দেবেন তো আপনারা?

দেবেশদা বলে—নিশ্চয় বাড়িয়ে দেবো। একবার আপনারা আমাদের কমরেড পূর্ণবাবুকে ভোট দিয়ে দেখুন, তখন দেখবেন আপনাদের অবস্থার কোনও উন্নতি হয় কিনা। শুধু তাই নয়, মানুষ যেখানেই মানুষের ওপর অত্যাচার করছে, সেখানেই আমাদের পার্টি নির্মম আঘাত হানবে—

এসব কথা শুনতে শুনতে টুলুরও মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। তাদের পার্টি ক্ষমতা হাতে পেলেই আগে গরীবদের অবস্থার উন্নতি করবে। মুষ্টিমেয় বুর্জোয়াদের হাত থেকে সমস্ত ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে সর্বহারাদের মধ্যে তা বিলিয়ে দেবে। দেশে এক শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করবে। এই সর্বহারাদের রাজ প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের কাজ। মার্ক্সবাদ জিন্দাবাদ! ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি জিন্দাবাদ!

মজুররা এক সঙ্গে চিৎকার করে উঠতো—জিন্দাবাদ! জিন্দাবাদ—

এমনি করেই এতদিন, এত বছর চলছিল। কোথা থেকে কীভাবে দিন কেটে যাচ্ছিল, সেদিকে ফিরে তাকাবার ফুরসতও ছিল না তার। পার্টির কাজে ব্যস্ত থাকাতে কোথা দিয়ে যে বয়েস বেড়ে যাচ্ছিল তাও বুঝতে পারেনি। পার্টির কাজ করতে হবে, ইউনিয়নের কাজ করতে হবে, সর্বহারাদের রাজ প্রতিষ্ঠা

করতে হবে, এই-ই ছিল তার দিন-রাত্রির প্রতিজ্ঞা। কিন্তু হঠাৎ একটা বিশেষ দিন থেকেই যেন তার মনে পড়লো সে মেয়েমানুষ। বাসের ধাক্কা খেয়ে সে যখন হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে পড়ে ছিল ঠিক সেই দিন। সুরেনদা একদিন এল তাকে দেখতে। গায়ে জ্বর আছে কিনা কপালে হাত দিয়ে দেখলে। সঙ্গে সঙ্গে টুলুর মনে হয়েছিল, সারা শরীরে যেন আবার নতুন করে জ্বর এলো তার।

সুরেন বললে—এ কী, তুমি বললে জ্বর নেই, এদিকে গা যে পুড়ে যাচ্ছে—

সেই-ই প্রথম! তারপর থেকেই টুলু মরেছে। কিন্তু তার মনে হলো, যদি মরতেই হলো শেষ পর্যন্ত তো এমন করে বেহিসেবী মৃত্যু কেন হলো তার! নিঃশব্দে বিনা যন্ত্রণায় মরলে কার কী এমন ক্ষতি হতো? এই দুঃখ-দুর্দশা-দারিদ্র্যের সঙ্গে কেন আর একজনের জীবনকে সে জড়াতে চাইলে? সে তো টুলুর কোনও ক্ষতি করেনি!

ভাবতে ভাবতে যেন অভ্যেসের বশেই তার তন্দ্রা এল। তন্দ্রার মধ্যেও সহদেববাবুর নাক ডাকার শব্দ কানে আসতে লাগলো। বাবা যেন আজকে সত্যিই মনে মনে শান্তি পেয়েছে। এমন নিশ্চিন্তে নির্বিঘ্নে বাবা যেন বহুকাল ঘুমোয়নি। সত্যি হোক মিথ্যে হোক, বাবা যে একটু শান্তি পেয়েছে মনে, এতেই টুলুর শান্তি! টুলু তো বাবাকে এতদিন কোনও সান্ত্বনা দিয়েই খুশী করতে পারেনি। এখন যদি বাবা একটা রাত্রির জন্যে একটু শান্তি পেয়ে থাকে তো পাক না।

হঠাৎ দরজার কড়া নড়ে উঠলো। কড়া নাড়ার শব্দেই ঘুমটা ভেঙে গেছে তার। চোখ মেলে তাকিয়ে দেখলে বাবা ঘুমোচ্ছে। ফুলুও পাশে অঘোরে ঘুমোচ্ছে তখন।

কিন্তু এত সকালে কে দরজা ঠেলে!

তাড়াতাড়ি চাদরটা সরিয়ে সে বাইরে এসে সদর দরজা খুলে দিলে।

—এ কী, সুরেনদা, তুমি? তুমি এত সকালে!

সুরেন বললে—কাল আমার সারা রাত ঘুম হয়নি টুলু—

টুলুর মনে হলো সে যেন সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কেঁদে ফেলবে।

—তুমি বাইরে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? এসো ভেতরে এসো—

সুরেন তবু এক-পা নড়লো না।

খানিক পরে বললে—সেদিন তুমি কিছু মনে করোনি তো?

—কবে? কেন? কী হয়েছিল?

—তোমাকে কিছু না বলে আমি হঠাৎ তখন মীটিং থেকে সুব্রতর সঙ্গে চলে গিয়েছিলুম।

টুলু বুঝতে পারলে না। বললে—সুব্রত? সুব্রত কে?

সুরেন বললে—ওই যে পুণ্যশ্লোকবাবুর ছেলে, আমার পুরোন বন্ধু! আমরা একদিন এক সঙ্গে পড়েছি কিনা। আর ও তো এতদিন আমেরিকায় ছিল এই সবে ফিরেছে। অনেকদিন পরে প্রথম ওর সঙ্গে দেখা। তা...

টুলু হাসলো। বললে—তা তুমি তোমার বন্ধুর সঙ্গে যাবে তাতে দোষ কী?

সুরেন বললে—না, ভাবলুম তুমি হয়ত কিছু মনে করেছ, তাই...

টুলু তেমনি হাসতে হাসতেই বললে—তা, আমি কী মনে করলুম না-করলুম, তাতে তোমার কী এলো গেল সুরেনদা? আর তা ছাড়া আমি তোমার

কে যে, আমার জন্যে তুমি এই সাত-সকালে এত রাস্তা ঠেঙিয়ে আমাদের বাসায় এলে?

সুরেন যেন আর থাকতে পারলে না। কথাটা শোনবার সঙ্গে সঙ্গেই একেবারে বুকের কাছাকাছি এসে বড় ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়াল। বললে—আমাকে কি তুমি এতই পর ভাবো টুলু?

টুলু তেমনি ভাবেই বললে—আমি পর না ভাবলেই বা, লোকে তো জানে আমি তোমার কেউ নই—

সুরেন টুলুর দুটো কাঁধ দু'হাত দিয়ে ধরে বললে—লোকে যাই জানুক, তুমি নিজে তো জানো তুমি আমার কে? এতদিন মিশছি তোমার সঙ্গে, আমার মনের কথা তুমি এখনও জানতে পারোনি?

—তোমার মন? মন বলে তোমার কিছু আছে নাকি?

সুরেন যেন আঘাত পেলে। বললে—সে কী? তুমি বলছো কী? আমার মন বলে কিছু নেই?

টুলু হঠাৎ যেন ডুকরে উঠলো। বললে—আছে? সত্যি বলো তো তোমার মন বলে কোনও জিনিস আছে? মন থাকলে তুমি আমায় এমন করে কষ্ট দিতে পারতে? মন থাকলে তুমি একটা মাতাল মেয়ের সঙ্গে এক গাড়িতে ঘুরতে পারতে? মন থাকলে আমাকে ফেলে তুমি তোমার বড়লোক বন্ধুর সঙ্গে চলে যেতে পারতে? বলো, বলো, চুপ করে রইলে কেন? কথার জবাব দাও। অমন করে চুপ করে থেকো না সুরেনদা। দাও, একটা কিছু জবাব দাও, একটা কিছু কথা বলো। সত্যি কথা না বলতে পারো তো অন্ততঃ একটা মিথ্যে কথা বলে আমাকে সান্ত্বনা দাও, চুপ করে থেকো না—লক্ষ্মীটি, তুমি কথা বলো, কথা বলো সুরেনদা—

বলে সুরেনদার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে টুলু হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগলো।

আর সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ সহদেববাবুর গলার শব্দ কানে এল।

—ওরে ও টুলু, কাঁদছিস কেন মা? টুলু, ঘুমুতে ঘুমুতে স্বপ্ন দেখছিস নাকি?

তাড়াতাড়ি চোখ খুলে চারদিকটা দেখে কেমন যেন লজ্জায় পড়ে গেল টুলু। চাদরটা সরিয়ে উঠে বসলো। ছি ছি, কী কাণ্ড! এমন স্বপ্ন সে কেন দেখতে গেল! এ স্বপ্ন সে কেন দেখতে গেল! এ স্বপ্ন দেখবার তার কীসের দরকার ছিল! সে তো এমন ভাবনাকে মনের মধ্যেও ঠাঁই দেয়নি!

সহদেববাবু বললে—শরীর খারাপ হয়নি তো মা তোমার?

টুলু বললে—এখন রাত ক'টা?

সহদেববাবু বললে—এই তো একটু আগে পাশের বাড়ির ঘড়িতে ঢং ঢং করে দুটো বাজলো—

রাত দুটো মোটে! টুলু আবার শুয়ে পড়লো। ছি ছি, কী বিশ্রী স্বপ্ন। কেন সে এমন স্বপ্ন দেখতে গেল। ভাগ্যিস নিজের স্বপ্ন অন্য কেউ দেখতে পায় না। দেখতে পেলে কী লজ্জাতেই না পড়তে হতো। বাবা তখন আবার তার তক্তপোষের ওপর গিয়ে শুয়ে পড়েছে। টুলু তার চাদরটা গায়ে টেনে দিয়ে আবার পাশ ফিরে ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগলো।

মাধব কুণ্ডু লেনের বাড়ির সামনে সেদিন অনেক চেষ্টা করেও ঢুকতে কেমন দ্বিধা হচ্ছিল টুলুর। যে লোক সেদিন তাকে অমন করে তাচ্ছিল্য করতে পারলো, মেয়েমানুষ হয়ে তারই খোঁজে আসা যেমন অপমানকর, তেমনি লজ্জার। অনেকবার ভেবেছে টুলু যে, না এলেই হয়ত তার ভালো হতো। কিন্তু তার ইচ্ছের কাছে তার সংকল্প শেষ পর্যন্ত হার মানতে বাধ্যই হয়েছে। পার্টির কাজ শেষ হতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। তারপর বাড়ি যাওয়াই তার উচিত ছিল। কিন্তু কখন যে সে উল্টোদিকের বাসে উঠে বসেছে তাও তার খেয়াল ছিল না। একেবারে মাধব কুণ্ডু লেনের মোড়ের মাথায় এসে নেমে যেন সে নিশ্চিন্ত হয়েছে। মনে মনে ঠিক করেছিল, একটিবার শুধু সুরেনদার মুখের কৈফিয়ত-টুকু শুনেই সে সোজা বাড়ি চলে যাবে। কিন্তু তা আর হলো না।

বাড়ির ভেতরে গিয়ে যখন সে শুনলো যে সুরেনদা বাড়ি নেই, তখন যেন একটা মুক্তির নিঃশ্বাস বেরোল তার বুক থেকে। হাঁফ ছেড়ে সে যেন বাঁচলো। কিন্তু ফেরার পথে পা বাড়াতেই এক ভদ্রলোকের সঙ্গে একেবারে মুখো-মুখি হয়ে গেল।

—দেখুন, আপনি কি বলতে পারেন সুরেন বাড়ি আছে কিনা?

প্রথমটায় টুলু ভেবেছিল ভদ্রলোকের কথার জবাব দেবে না, কিংবা বলবে—আমি এ বাড়ির কেউ নই। কিন্তু তারপর ভদ্রলোকের চেহারাটা দেখেই কী যেন মনে হলো। বললে—আমিও তাকেই খুঁজতে এসেছিলাম—

সুব্রত বললে—ও, কিছু মনে করবেন না। আমি ভেবেছিলাম আপনি বুঝি এ বাড়িরই লোক—

তারপর হতাশ হয়ে ফিরে আসতে গিয়ে সুব্রত আবার পেছন ফিরে দাঁড়ালো। জিজ্ঞেস করলে—কখন সে বেরিয়েছে কিছু শুনলেন?

টুলু বললে—না।

সুব্রত বললে—কখন বেরিয়েছে জানতে পারলে ভালো হতো, আমার খুব জরুরী দরকার ছিল—

টুলু বললে—আমারও জরুরী দরকার ছিল খুব—

সুব্রত বললে—তাহলে চলুন না, জিজ্ঞেস করে আসি—

টুলু প্রথমে কী বলবে বুঝতে পারলে না। তারপর বললে—আপনার সঙ্গে সুরেনদার কত দিনের পরিচয়?

সুব্রত বললে—সুরেন আমার ছোটবেলার ক্লাশফ্রেণ্ড। আর আপনি? আপনার সঙ্গে কত দিনের জানাশোনা?

টুলু বললে—আমার সঙ্গে বেশি দিনের নয়—

সুব্রত বললে—কিন্তু এত রাত পর্যন্ত বাইরে কী কাজ তার, বুঝতে পারছি না—

টুলু উত্তর দিলে না সে কথার। বললে—আমি আসি তাহলে—

বলে বাইরের দিকে হাঁটতে লাগলো। সুব্রতও সঙ্গে সঙ্গে আসছিল। গেটের বাইরেই সুব্রতর গাড়িটা দাঁড়িয়ে।

সুব্রত গাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে বললে—আপনি যদি কিছু না মনে করেন তো

আমি আপনাকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দিতে পারি, আমার কোনও অসুবিধে হবে না—

টুলু বললে—কিন্তু আমাকে যে গাড়িতে যেতে বলছেন, আমাকে তো আপনি ঠিক চেনেন না—

সুব্রত বললে—তা অবশ্য চিনি না, কিন্তু আপনিও তো সুরেনের বন্ধু—

টুলু বললে—বন্ধু কিনা সেটা কী করে জানলেন? শত্রুও তো হতে পারি।

সুব্রত হাসলো। বললে—আপনি স্ত্রীলোক, রাতও অনেক হয়েছে, এত রাত্তিরে আপনাকে সাহায্য করা আমার কর্তব্য। আপনি সুরেনের বন্ধুই হোন আর শত্রুই হোন, তাতে আমার কিছু এসে যায় না! তাছাড়া আর একটা কথা—শত্রু হলে কি এই অসময়ে সুরেনের বাড়িতে আপনি আসতেন?

কথাগুলো হাসির। কিন্তু টুলু একথা শুনে হাসতে পারলে না। গায়ে পড়ে আলাপ করার এই প্রকৃতিটাও তার যেন ভালো লাগলো না।

বললে—না, আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না, আমি যাই—

সুব্রতও আর পীড়াপীড়ি করলে না। নিজের গাড়িতে উঠে বসলো। গাড়িটা চালিয়ে খানিকটা এগিয়ে একটা মোড় ফিরে আবার ঘুরিয়ে নিলে। তারপর গলি দিয়ে বড় রাস্তার মুখে আসতেই দেখলে, টুলু আস্তে আস্তে ট্রাম-রাস্তার দিকে এগোচ্ছে।

হঠাৎ টুলুর পাশে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে দিলে সুব্রত।

বললে—আর একবার অনুরোধ করছি আপনাকে, যাবেন?

টুলু বললে—মাপ করবেন, আমি বাস ধরে চলে যাবো—

সুব্রত বললে—কিন্তু আমি তো ওই দিকেই যাচ্ছি, আপনাকে তুলে নিলে আমার তো আর বেশি পেট্রল পুড়বে না—

টুলু বললে—আপনাদের টাকা আছে, পেট্রল পুড়লে আপনার কোনও ক্ষতি নেই, কিন্তু আমি কেন তার দায়ভাগী হবো—

সুব্রত বললে—আপনি কোন্ দিকে থাকেন?

টুলু বললে—ঢাকুরিয়াতে, অনেক দূরে—

সুব্রত বললে—গাড়িতে আর দূর কী? গাড়িতে এক ঘণ্টার মধ্যে আপনাকে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসতে পারি—

টুলু বললে—আপনার অশেষ দয়া, কিন্তু আমার জন্যে আপনাকে অত কষ্ট করতে হবে না—

হঠাৎ কথার মাঝখানেই সুরেন এসে দাঁড়ালো। তার উস্কোখুস্কো চুল, আলুথালু চেহারা, সমস্তই যেন কেমন অস্বাভাবিক।

—কী রে সুরেন? এত রাত্তিরে কোত্থেকে ফিরলি?

সুরেন সেই রাস্তার মধ্যে অত রাত্রে টুলুকে আর সুব্রতকে দেখে কম অবাক হয়নি।

বললে—তোরা এখেনে?

তারপর টুলুর দিকে ফিরে বললে—তুমি সুব্রতকে চেনো নাকি?

টুলু সে কথার উত্তর না দিয়ে বললে—আমি এখন যাই সুরেনদা, অনেক রাত হয়ে গেছে, আমাকে আবার অত দূরে ফিরতে হবে—

সুরেন বললে—এখ্খুনি চলে যাবে কী? আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলে, দেখা না করেই চলে যাবে?

টুলু আর যেন দেরি সহ্য করতে পারছিল না। বললে—না, আমি আসি,

আমার ফিরতে দেরি হয়ে যাবে, বাবা আবার ভাববে খুব—

সুরেন বললে—তোমার দেরি হবে না—এই সুব্রতর গাড়ি রয়েছে, সুব্রত তোমাকে গাড়িতে করে বাড়ি পেঁাছে দেবে।

সুব্রতর দিকে চেয়ে সুরেন বললে—তুই টুলুকে একটু পেঁাছিয়ে দিতে পারবি না?

সুব্রত ততক্ষণে গাড়ি থেকে নেমে রাস্তায় দাঁড়িয়েছে। বললে—আমি তো সেই কথাই এতক্ষণ ওঁকে বলছিলুম, উনি তো কিছুতেই গাড়িতে উঠতে চাইছিলেন না—

সুরেন দুজনেরই একটা করে হাত ধরে টানতে লাগলো। বললে—এসো এসো, এতদূর এসে তোমরা বাড়ি ফিরে যাবে কেন? আমার একটু ফিরতে দেরি হয়ে গেল, চলো, বাড়ির ভেতরে চলো—

টুলু কিন্তু হাত টেনে নিলে।

বললে—না সুরেনদা, আমাকে ছেড়ে দাও—আমার সত্যিই দেরি হয়ে যাবে—

সুরেন বললে—আরে, তোমার সঙ্গে সুব্রতর আলাপ নেই বলেই তুমি ও-কথা বলছো। সুব্রতকে তুমি চেনো না। ও যে আমার ক্লাশফ্রেন্ড। ওর কথা তো তোমাকে আগেও বলেছি—

নামটা শুনেই টুলু যেন কেমন হয়ে গেল। সুব্রতর মুখের দিকে তাকালে। তারপর বললে—সুরেনদা, তুমি আমাকে মাপ করো, আমি যাই—

সুরেন বললে—আরে, তোমার এত ভয় কীসের? বলছি তো সুব্রত আমার ক্লাশফ্রেন্ড। ওদের অনেক টাকা, এক গ্যালন পেট্রল পুড়লে ওদের কিছু গায়ে লাগবে না। আর তাছাড়া...

সুব্রত আগ বাড়িয়ে বললে—আপনি কেন ভাবছেন, আমার কোনও অসুবিধে হবে না, আপনাকে বাড়ি পেঁাছিয়ে দিয়ে আমি আবার চলে আসবো—

তারপর সুরেনকে বললে—তোর সঙ্গে বোধহয় ওঁর কিছু কথা ছিল, আমি এখানে একটু দূরে সরে দাঁড়াচ্ছি, তোরা যা বলবার বলে নে না—

টুলু তাড়াতাড়ি বললে—না. আমার কিছু কথা বলবার নেই, আপনার যদি কিছু বলবার থাকে আপনি আড়ালে গিয়ে বলে নিতে পারেন—

সুব্রত বললে—না, আমার কিছু গোপন কথা বলবার নেই, আমি শুধু আমার বোনের কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছিলুম—

—পমিলির কথা? সুরেন যেন অবাক হয়ে গেল।

বললে—পমিলির কী কথা?

সুব্রত বললে—পমিলি সেই কখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল, তারপর এত রাত হলো, এখনও ফেরেনি, তাই বাবা খুব ভাবছে ভাই, আমি ভাবলুম তোর বাড়িতে এসে যদি তার কোনও খোঁজ পাই—

সুরেন বললে—কিন্তু তোর বাবা এত ভাবছেন কেন? পমিলির তো দেরি করে বাড়ি ফেরার অভ্যেস আছে—

সুব্রত বললে—একে তো বাবার চারদিকে ঝঞ্ঝাট, নানান কাজের ঝামেলা, তার ওপর এই সমস্যা। আমারও ভালো লাগছে না কিছু—

সুরেন বললে—বাড়িতে গিয়ে দেখবি এতক্ষণে হয়ত ফিরে এসেছে, যাবে আর কোথায়?

সুব্রত বললে—এলে তো ভালোই, নইলে এখুনি আবার আমাকে নানান জায়গায় খুঁজতে বেরোতে হবে—

তারপর একটু থেমে বললে—আমি তাহলে এখন চলি। আবার পরে দেখা হবে—

বলে চলেই যাচ্ছিল। হঠাৎ টুলুর দিকে ফিরে বললে—তাহলে আপনি যাবেন না?

সুরেনও বললে—তুমি কী বলতে এসেছিলে বলো না টুলু? বাবা কেমন আছেন তোমার?

টুলু শুধু বললে—ভালো—

—কিন্তু কী বলতে এসেছিলে বলছো না তো?

টুলু বললে—এমন কিছু কথা ছিল না—

ততক্ষণে সুব্রত তাদের কথা বলবার সুযোগ দেবার জন্যে একটু দূরে সরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। গাড়িতে গিয়ে তখনও ওঠেনি।

সুরেন বললে—তুমি আমার ওপর রাগ করেছ বুঝতে পারছি—

টুলু বললে—না, রাগ করিনি, শুধু জিজ্ঞেস করতে এসেছিলুম সেদিন তুমি আমাদের মীটিং ছেড়ে, হঠাৎ কেন চলে এসেছিলে? আর কিছু নয়—

সুরেন বললে—আমি জানতুম তুমি রাগ করবে, কিন্তু বলে আসবার সময়ও যে তখন ছিল না আমার। ওই সুব্রতই সেদিন হঠাৎ গাড়িতে তুলে নিয়ে চলে এসেছিল—

—গাড়িতে করে তুলে নিয়ে এল বলে তুমি চলে এলে?

সুরেন বললে—গাড়ি চড়ার লোভ আমার নেই—পুরোন বন্ধুর সঙ্গে অনেকদিন পরে দেখা, তাই। কেন, দেবেশ কিছু বলেছে নাকি?

টুলু বললে—দেবেশদা তোমাকে চেনে বহুদিন থেকে, আমিই প্রথম তোমাকে নতুন করে চিনলুম!

—এই দেখ, তুমি আমাকে আবার ভুল বুঝছো।

টুলু বললে—যদি ভুল বুঝতুম তাহলে ভিখিরির মত এই অসময়ে আজ তোমার কাছে আসতুম না। আমি তোমাকে বলতে এসেছিলুম যে, এমন করে নিজেকে তুমি ঠকিও না। এটা অন্যায়। এর চেয়ে তুমি বরং আমাদের পার্টি ছেড়ে দাও—

সুরেন বললে—দেখছি, তুমি সত্যিই আমার ওপর রাগ করেছ! এই রাগের সময় তুমি ঠিক আমার কথা বুঝবে না। বরং এখন রাত হয়ে যাচ্ছে, বাড়ি যাও, পরে আমি তোমাকে সব বুঝিয়ে বলবো—

টুলু বললে—যাবো তো নিশ্চয়ই, তোমার কাছে থাকতে আমি আসিনি। কিন্তু যে আমাদের এ্যান্টি-পার্টির লোক তার গাড়িতে চড়ে আমাকে তুমি বাড়ি যেতে বলছো কী করে তাই ভাবছি—

—সুব্রত এ্যান্টি-পার্টির লোক হতে পারে, কিন্তু ও তো আমার বন্ধুও বটে!

টুলু বললে—এ্যান্টি-পার্টির লোক তোমার এত ঘনিষ্ঠ বন্ধু হতে পারে কী করে তাই আগে বলো?

—তা ও যে আমার ক্লাশফ্রেন্ড! বন্ধুত্ব হবে না?

—তা যদি হয়, তাহলে তোমার সঙ্গে আমাদের আর কোনও সম্পর্ক রাখা সম্ভব নয়—

বলে টুলু চলে যাচ্ছিল। সুরেন ডাকলে—শোনো টুলু, শোনো, শোনো—

হঠাৎ ভূপতি ভাদুড়ী বাড়িতে আসার পথে কাণ্ড দেখে অবাক। সারাদিন

অনেক ঝামেলা গেছে। দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রীট থেকে গিয়েছিল হরনাথ উকিলের বাড়ি। সেখানেও অনেক ঝামেলা গেছে। নতুন আইন হচ্ছে, সেই কথা শুনেই মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল ভূপতি ভাদুড়ীর। সেই কথা ভাবতে ভাবতে বাড়ি আসার পথে এই কাণ্ড দেখে থমকে দাঁড়ালো। তারপর একবার সুব্রতর দিকে, একবার টুলুর দিকে, আর একবার তার ভাগ্নের দিকে চাইতে লাগলো।

তারপর বললে—এখানে কী হয়েছে রে? এরা কারা? কী করছিস, রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে?

ডাকাডাকিতে টুলু থামেনি। সে তখনও সোজা চলছিল।

সুরেন মামার কথায় কান না দিয়ে টুলুকে আবার ডাকলে—টুলু, শোনো, শোনো, চলে যেও না—

বলে রাস্তার দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো। ভূপতি ভাদুড়ী হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল সেখানে কিছুক্ষণ। একে সারাদিন তার ঝামেলা গেছে, ছ'লাখ টাকার সম্পত্তির ভাবনা তার মাথায়, তার ওপর বাড়ির সামনে এসেও এক নতুন ঝামেলা। মেয়েটার সঙ্গে সুরেনের কী কথা কে জানে! ভূপতি ভাদুড়ী সোজা এগিয়ে গেল তাদের দিকে।

কাছে গিয়ে বললে—কী রে, আমি ডাকছি শুনতে পাচ্ছিসনে?

সুরেন বললে—তুমি এখন যাও না এখান থেকে, আমি একটু পরে বাড়িতে যাচ্ছি—

ভূপতি ভাদুড়ীর কানে সুরেনের কথাগুলো ভালো লাগলো না।

বললে—এরা কারা রে? দিন নেই, রাত নেই, সব সময় এরা তোর কাছে কেন আসে?

তারপর সুরেনের জবাবের অপেক্ষা না করেই সুব্রতর দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে—তোমাদের কি কোনও কাজকর্ম নেই বাছা, এই রাত্তির পর্যন্ত গুজুর-গুজুর ফিসিরফিসির করতে আসো? তোমাদের বাড়িতে বাপ-মা'রাও কেউ কিছু বলে না?

তারপর টুলুর দিকে চেয়ে বললে—আর তোমাকেও বলি মা, তুমি হলে মেয়েমানুষ। বিয়ের বয়েস হয়েছে, তুমি মা বেটাছেলের মত ধেই ধেই করে সুরেনের কাছে কী করতে আসো শুনি? তোমরা না লাল ঝাণ্ডার দলের লোক, তা লাল ঝাণ্ডার দলের লোক বলে কি বাছা কাণ্ডাকাণ্ডি জ্ঞানও থাকতে নেই?

—আঃ!

সুরেন চিৎকার করে উঠলো। বললে—তুমি এখান থেকে যাও না, তোমাকে এখানে কে আসতে বলেছে? তোমার কি কোনও কাজকম্ম নেই? তুমি যদি ফের আমার কথায় কোনো কথা বলতে আসো তো আমি আবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবো—

বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার কথা শুনে যেন ভূপতি ভাদুড়ী ভয় পেয়ে গেল। যেন একটু নরম সুরে বললে—তুই রাগ করিস কেন বাবা, আমি তো তোর ভালোর জন্যেই বলি। এত অনিয়ম করলে তোর শরীর টিকবে? অসুখ হলে তখন তো সেই আমাকেই দেখতে হবে—

সুরেন বললে—আচ্ছা, আচ্ছা, খুব হয়েছে, তুমি এখন যাও—

ভূপতি ভাদুড়ী গজগজ করতে করতে বাড়ির দিকে চলে গেল।

সুব্রত হাসলো। বললে—তোর মামা এখনও ঠিক সেইরকমই আছে দেখছি—

সুরেন বললে—না, সেই রকম নেই, এখন টাকা টাকা করে আরো পাগল হয়েছে—অথচ এত টাকা নিয়ে যে কী করবে বুঝতে পারি না!

টুলুর তখন অসহ্য লাগছিল। বললে—আমাকে আর আটকে রেখো না সুরেনদা, আমি চলি—

তারপর সুব্রতর দিকে চেয়ে বললে—আচ্ছা আসি, নমস্কার—

সুব্রত বললে—বার বার আর আপনাকে অনুরোধ করবো না, তাহলে হয়ত ভাববেন আমার কোনও স্বার্থ আছে—

টুলু এবার হাসলো। বললে—আমাদের দুঃখ চিরকালের, একদিনের জন্যে আপনার গাড়ি চড়লে তো আমাদের দুঃখ ঘুচবে না—

সুরেন বললে—আমাদের দেশে একটা কথা আছে, বাড়া ভাত আর সাজা তামাক কখনও ফেলতে নেই, তুই টুলুকে নিয়ে যা সুব্রত, গাড়ি করে বাড়ি পৌঁছে দিস—

টুলু উঠলো গাড়িতে। সুব্রত গাড়ির দরজা বন্ধ করে দিয়ে নিজেও উঠলো। তারপর ইঞ্জিনে স্টার্ট দিলে।

কলকাতা সহরের মানুষের জীবনে যেন এক ওলোটপালোট হয়ে গেছে। একদিকে ইলেকশান, অন্যদিকে এনকোয়ারি কমিশন। মাথা ঘামাবার বিষয়-বস্তুর অভাব নেই মানুষের। সবাই আপন আপন কাজ গুছিয়ে নেবার নেশায় ছটফট করছে। পুণ্যশ্লোকবাবু, পূর্ণবাবু, দেবেশ কারোই সময় নেই স্থির হয়ে কিছু ভাববার। সাধারণ মানুষেরই কি কিছু ভাববার সময় আছে সুস্থির হয়ে? দু'শো বছর নিশ্চিন্ততায় কাটিয়ে হঠাৎ যেন বাসুকী আবার তার ফণা নাড়িয়েছে। পৃথিবী বুঝি এবার পাশ ফিরবে!

পুণ্যশ্লোকবাবু বাড়ির সামনেই চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হঠাৎ একটা ট্যাক্সি ঢুকলো।

ট্যাক্সিটা ভেতরে আসতেই ভেতর থেকে পর্মিলি নিচেয় নেমে গাড়ির ভাড়া মিটিয়ে দিলে। তারপর তর তর করে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছিল।

নিচে থেকে পুণ্যশ্লোকবাবু ডাকলেন—পর্মিলি, শোনো—

পর্মিলির কানে কথাটা গেল কি গেল না বোঝা গেল না। সে যেমন সিঁড়ি দিয়ে উঠছিল, তেমনিই উঠতে লাগলো।

পুণ্যশ্লোকবাবু আবার ডাকলেন—পর্মিলি শোনো—

শেষ পর্যন্ত যখন পর্মিলি কিছুতেই কথা শুনলো না, তখন পুণ্যশ্লোক-বাবু নিজেই পর্মিলির পেছন পেছন গেলেন। পর্মিলি তখন নিজের ঘরে ঢুকছে।

পুণ্যশ্লোকবাবু পেছন থেকে আবার ডাকলেন—পর্মিলি—

কিন্তু পর্মিলি ততক্ষণে ভেতরে ঢুকে দরজায় খিল দিয়ে দিয়েছে। পুণ্যশ্লোকবাবু বন্ধ দরজার সামনে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে আবার আস্তে আস্তে নিচের দিকে নামতে লাগলেন।

দেশের মানুষের চিন্তার জগতে যে আলোড়ন শুরু হয়েছিল, তার মধ্যেই এলোমেলোভাবে সুরেন নিজের জীবন কাটিয়ে দিচ্ছিল। বিশেষ করে পর্মিলির

দিক থেকেই জটিলতাটা বেড়ে উঠেছিল বেশি করে। বাড়ির সমস্যাটাও ছিল তার। কিন্তু সে সমস্যা মেটবার যখন কোনও আশা ছিল না, তখন তা নিয়ে আর বেশি মাথা ঘামাবার কিছু ছিল না। ও তো থাকবেই। বাড়ি মানেই তার কাছে একটা মাথা গোঁজবার আশ্রয়, আর তার সঙ্গে খেতে পাবার একটা সুযোগ। মামা তার নিজের স্বার্থেই সেটা তাকে যুগিয়ে যাবে। আর তা ছাড়া বাড়ি থেকে যদি কোনও দিন চলে যেতেই হয় তো দেবেশদের পার্টি অফিস তো রয়েছেই। পার্টির এখন অনেক কাজ। পার্টির হয়েই সে রাস্তায় রাস্তায় চাঁদা তুলে বেড়াবে। যেমন দেবেশরা করে।

কিন্তু পর্মিলি?

ডায়মণ্ডহারবারের রাস্তা পেরিয়ে সেই রাতটার কথাও মনে পড়লো তার! সুরেনই জিজ্ঞেস করেছিল পর্মিলিকে—হঠাৎ আমাকে নিয়ে এই নিরিবিলি জায়গায় এলে কেন?

পর্মিলি বলেছিল—কেন, আমাকে ভয় করছে তোমার?

সুরেন বলেছিল—ভয়? ভয় যদি করেই তো কিছু অন্যায় আছে তাতে?

—তা তুমি কি ভেবেছ আমি তোমায় খুন করতে এখানে নিয়ে এসেছি?

—না, তা কেন ভাববো, আমাকে খুন করে তোমার কী-ই বা লাভ হবে? আর তাছাড়া আমি জানি তোমারও মায়া-দয়া বলে একটা জিনিস আছে!

পর্মিলি বলেছিল—তাহলে একটা কথার উত্তর দাও, মানুষ যখন পাগল হয়ে যায়, তখন তার বাঁচবার কি কোনও প্রয়োজন থাকে?

—তার মানে? তুমি কি মনে করো তুমি পাগল হয়ে গেছ?

পর্মিলি বলেছিল—হ্যাঁ, পাগল হলে মানুষের যে যে সিমটম হয়—

সুরেন তাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই বললে—এত রাত্রে এই কথা বলবার জন্যেই তুমি আমাকে এখানে নিয়ে এসেছ নাকি?

পর্মিলি বললে—হ্যাঁ, তাছাড়া আমি এসব কথা তুমি ছাড়া আর কাকে বলবো? কে শুনবে আমার কথা?

সুরেন বললে—কেন, এ কথাটা কি কলকাতা সহরে কোনও রেস্টুরেণ্টে বসে চা খেতে খেতে বলা যেত না?

পর্মিলি বললে—সব কথা কি সব জায়গায় বলা যায়?

সুরেন বললে—কিন্তু এত রাত্রে এভাবে মাঠে নামলে কেন? গাড়িতেও তো বলা যেত?

পর্মিলি বললে—গাড়ির ভেতরে কথাগুলো তুমি ঠিক বুঝতে পারবে না। চলো কোনও একটা গাছের তলায় গিয়ে বসি—

সুরেন ভয় পেয়ে গেল। বললে—তোমার কি সাপখোপেরও ভয় নেই পর্মিলি? জানো না এসব জায়গায় সাপ থাকে!

পর্মিলি বললে—থাকুক, তবু তো সাপ মানুষের চেয়ে ঢের ভালো। সাপকে বোঝা যায়, কিন্তু মানুষকে যে আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না—

মাথার ওপর শীতের আকাশ আর পায়ের তলায় ধানক্ষেত। ধানগুলো কবে চাষারা কেটে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর শুধু খোঁচা খোঁচা ধান গাছের মাথাগুলো দাঁড়িয়ে আছে ক্ষেতের ওপর।

আর তারপরেই সেই দুর্ঘটনাটা ঘটলো।

আশেপাশে কোথাও কোনও মানুষের বসতি নেই। দূরে রাস্তার ওপর ইলেকট্রিকের আলোগুলো কুয়াশায় ঝাপসা হয়ে আছে। হু-হু করে উত্তরের

হাওয়া এসে গায়ে লাগছে। এ কোন্ পরিস্থিতি, এ কোন্ দিগন্ত? সারা জীবনের মধ্যে এমন অস্বাভাবিক আতঙ্কে কখনও ভোগেনি সুরেন। অথচ অন্য পরিস্থিতি হলে এমন নিরিবিলি তার ভালোই লাগতো।

পমিলি একটা গাছের তলায় বসলো। তারপর সুরেনের হাতটা ধরে টানলে। বললে—বোস এখানে—

সুরেন বললে- এখানে বসে কী করবো?

পমিলি বললে—সেই কথাটা তোমাকে বলবো।

—কোন্ কথা? তুমি বলো আমি শুনছি—

পমিলি হঠাৎ কাঁদতে লাগলো। দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেললে।

সুরেন বললে—এ কী, কী হলো তোমার? কাঁদছো কেন? আরে, আমাকে এই কান্না শোনাবার জন্যে এখানে নিয়ে এলে নাকি? এ কী পাগলামি তোমার! ওঠো ওঠো, পাগলামি ছাড়ো—

পমিলি তবু বসে রইল সেখানে হাতে মুখ ঢেকে।

বললে—আমাকে তুমি বিষ দাও সুরেন, একটু বিষ এনে দাও

সুরেন এবার আর থাকতে পারলে না। পমিলির একটা হাত জোর করে ধরে টানতে লাগলো। বললে—সত্যিই তুমি পাগল হয়ে গেছ দেখছি! তুমি নিজেও বিপদে পড়বে, আমাকেও বিপদে ফেলবে। ওঠো। আর তুমি যদি না ওঠো তো, আমি চলে যাচ্ছি—

পমিলি যেন একটু শান্ত হলো। বললে—তুমি এত কাওয়ার্ড তা জানতাম না।

সুরেন বললে—তোমার এসব ছেলেমানুষি কাণ্ড শোনবার সময় নেই আমার। তুমি যাবে কিনা তাই বলো।

পমিলি বললে—যদি না যাই, যদি মাঠের মধ্যেই রাত কাটাই?

সুরেন বললে—তাতে কিন্তু তোমার ইজ্জৎ বাড়বে না পমিলি।

পমিলি বললে—তুমি তোমার বদনামের কথা ভেবে ভয় পাচ্ছো, না? তাই-ই হয়, মানুষ এমনি করেই নিজেকে ঠকায়।

সুরেন বললে—তুমি তো তা বলবেই, কারণ তুমি পুণ্যশ্লোকবাবুর মেয়ে, আর আমি সাধারণ কোথাকার কে এক ভূপতি ভাদুড়ীর ভাগ্নে! আমার কথা আর কেই বা বিশ্বাস করবে?

পমিলি বললে—তার চেয়ে এসো না, দুজনে একসঙ্গে বিষ খাই—

—বিষ? বিষ কোথায় পাবে এখন?

পমিলি বললে—বিষ আমার সঙ্গে আছে—

বলে হঠাৎ নিজের ব্যাগ থেকে একটা ছোট শিশি বার করলে। বললে—এটা স্লিপিং পিল—এ রকম দুটো ভর্তি শিশি আমার কাছে আছে—

সুরেন অবাক হয়ে গেল। কেমন ভয় করতে লাগলো তার। তবে কি মরবার প্ল্যান করে পমিলি এখানে তাকে নিয়ে এসেছে নাকি?

বললে—তবে যে তুমি একটু আগে আমাকেই বিষ যোগাড় করে দিতে বললে?

পমিলি হাসলো। একেবারে খিল খিল করে হাসিতে ভেঙে পড়লো। তারপর হাসি থামিয়ে বললে দেখলুম তোমার সাহস কতটা! তুমি যে এত কাওয়ার্ড তা আমি আগেই জানতুম।

বলে আবার হাসতে লাগলো।

সুরেনের কেমন যেন সন্দেহ হলো। জিজ্ঞেস করলে—তুমি কি আবার মদ খেয়েছ নাকি?

পর্মিলি বললে—মদ খেলেই বুঝি লোকে মরতে চায়?

সুরেন বললে—মদ না খেলে এরকম করে এত রাত্তিরে কেউ গাড়ি ছেড়ে মাঠের মধ্যে এসে কাব্যি করে? মদ না খেলে কেউ ব্যাগের মধ্যে স্লিপিং পিল নিয়ে এসে মরতে চায়? মদ না খেলে কেউ অন্য লোককে গলা জড়াজড়ি করে মরতে বলে?

পর্মিলি বললে—মদ আমি খাই না এ কথা আমার শত্রুরাও বলবে না, কিন্তু যারা সুইসাইড করে তারা সবাই কি মদ খেয়ে তা করে? মদের চেয়েও কি বড় নেশা নেই?

—মদের চেয়েও বড় নেশা? সেটা আবার কী?

পর্মিলির কথাগুলো যেন জড়িয়ে জড়িয়ে যাচ্ছিল। বললে—কেন, বাঁচা? বাঁচার নেশা কি কিছু কম?

—তা বাঁচতেই যদি চাও তাহলে আবার মরতে চাইছো কেন?

পর্মিলি বললে—এতদিন বেঁচে সেই বাঁচার ওপর আমার যে ঘেন্না ধরে গেছে--

সুরেন বললে—সে কী? বাঁচার ওপর ঘেন্না ধরে গেছে মানে? কত লোক তো বেঁচে আছে, তারা তবু আরো বেশি দিন বাঁচতে চায়। একটু অসুখ হলে ওষুধ কিনে খায়। আর তোমারই যত ঘেন্না ধরে গেল বাঁচার ওপর?

পর্মিলি মুখ নিচু করলে—তুমি সে কথা বুঝবে কী করে বলো? তোমায় আমি কী করে বোঝাবো যে, বড়লোকের মেয়ে হওয়ার মত যন্ত্রণা আর নেই পৃথিবীতে। তার চেয়ে তোমাদের ওই টুলুর মত গরীব হওয়া ঢের ভালো--

—টুলুর দুঃখ যদি তুমি জানতে, তাহলে আর ওকথা বলতে না।

পর্মিলি বললে—তবু আমার চেয়ে তারা অনেক সুখী, একদিন যদি তাদের টাকা হয় তো তাদের সব দুঃখ ঘুচে যাবে; কিন্তু আমার? আমার দুঃখ ঘুচবে কীসে? আমি কোন্ আশায় বাঁচবো?

সুরেন বললে—লোকের কাছে এসব কথা বোল না পর্মিলি, শুনলে তারা হাসবে। বলবে, এ তোমার বিলাস, এক রকমের দুঃখ-বিলাস--

পর্মিলি বললে লোকে যা ইচ্ছে বলে বলুক, লোকে তো আমার সম্বন্ধে অনেক কথাই বলে, না-হয় আরো কিছু বেশি বলবে। তার জন্যে আমি ভয় পাই না। কিন্তু আমি তো তাদের বলতে যাচ্ছি না, আমি শুধু তোমাকে বলছি, তুমিও কি আমাকে ভুল বুঝবে?

সুরেন বললে—আসলে কিন্তু লোকে তোমাকে হিংসেই করে পর্মিলি; বলে—তোমার মত সুখী কেউ নয়, মিনিষ্টারের মেয়ে তুমি, কত তোমার সুখ, কত তোমার খাতির—

—কিন্তু তুমি তো আমার সব জানো সুরেন, তুমিও কি তাই বলো?

সুরেন বললে আমার কথা ছেড়ে দাও, আমার কথা নাই বা শুনলে!

পর্মিলি বললে সত্যি বলো না, আমার শুনতে বড় ইচ্ছে করছে। লোকে যাই বলুক, তুমিও কি আমাকে পাগল বলো?

সুরেন বললে—তোমার ব্যাপারে আমার কিছু বলা চলে না পর্মিলি—

—কেন, বলা চলে না কেন?

সুরেন বললে—তোমার সঙ্গে কি আমার তুলনা?

—কেন, তুলনা নয় কেন? আমি বড়লোকের মেয়ে বলে কি মানুষ নয়? আমারও যেমন মন আছে, তোমারও তো তেমনি আছে। আমার যেমন কিছু ভালো লাগে না, তোমারও তো তেমনি কিছু ভালো না লাগতে পারে? তোমারও তো আমার মতন বাড়িতে থাকতে ভালো লাগে না। তাহলে তফাতটা কোথায়?

সুরেন বললে—তবু তুমি আমি এক নয় পর্মিলি, তুমি আমি আলাদা—

—কিন্তু আমরা দু'জনে কি এক হতে পারি না?

সুরেন বললে—অসম্ভব!

পর্মিলি সুরেনের একটা হাত ধরলে। বললে—কেন অসম্ভব বলছো তুমি? আমি কী দোষ করেছি?

সুরেন বললে—দোষ তোমার নয়, দোষ আমার!

—কেন, তোমার কী দোষ? কী দোষ তুমি করেছ?

সুরেন বললে—আমি দোষ করিনি? তাহলে আমি গরীব হলুম কেন? আর গরীব যদি না হবো তো তোমার বাবা আমাকে তোমাদের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলেন কেন? আর তাছাড়া আমি একলাই কি গরীব? কোনও গরীবকে কি তোমার বাবা দেখতে পারেন? দেখতে পারেন না বলেই তো তারা আজ দল বেঁধে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে—

—কিন্তু বাবার কথা উঠছে কেন? তার কথা অনুযায়ী কি আমি চলি? আমি যদি মদ খাই, যখন যেখানে খুশী যাই, সে সবই কি বাবার মত নিয়ে করি? আমি যে এই স্লিপিং পিল কিনে এনেছি এখানে মরবো বলে, এতেও কি বলতে চাও আমি বাবার মত নিয়েছি?

সুরেন হঠাৎ পর্মিলির ব্যাগটা ছোঁ মেরে কেড়ে নিলে।

পর্মিলি শিউরে উঠলো। হাত দুটো বাড়িয়ে বললে—দাও, আমার ব্যাগ দাও—আমার ব্যাগ নিলে কেন, দাও—

—কিছুতেই দেবো না, তুমি যা ইচ্ছে করতে পারো, করো।

বলে রাস্তার দিকে চলতে লাগলো।

—আমার ব্যাগ দাও সুরেন, ব্যাগ দাও—

বলে পর্মিলিও পেছনে দৌড়ে এল। এসেই সুরেনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। বললে—দাও, আমার ব্যাগ দাও—

সুরেনও দেবে না, পর্মিলিও কেড়ে নেবে। সুরেন ব্যাগটা পর্মিলির হাতের নাগালের বাইরে রেখে বললে—আমি দিতে পারি, কিন্তু ভেতরের ফাইল দুটো আমাকে বার করে নিতে দাও—ও তুমি কিছুতেই পাবে না—

—দাও, লক্ষ্মীটি, দাও আমাকে। ওটা না হলে যে আমি বাঁচবো না—

সুরেন এক হাতে পর্মিলিকে সরিয়ে দিয়ে আর একটা হাতে ব্যাগটা তার নাগালের বাইরে রেখে বললে—না, তোমাকে আমি কিছুতেই মরতে দেবো না—

—দাও, লক্ষ্মীটি, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমার ব্যাগ দাও, আমার সব প্ল্যান যে নষ্ট হয়ে যাবে। আজকে না মরলে যে আমার আর কোনও দিন মরা হবে না—

সুরেন বললে—না, আগে কথা দাও আর কখনও এমন করে আত্মঘাতী হবার চেষ্টা করবে না—

—তুমি বলছো কী? তুমি একে আত্মঘাতী হওয়া বলছো? এমন করে আত্মঘাতী হতে পারলে যে আমি বেঁচে যাবো সুরেন! তুমি জানো না, বাঁচতে আমার কত সাধ! আমার মত এমন করে আর কেউ বাঁচতে চায়নি আগে! কিন্তু

কেউ যে আমায় বাঁচতে দিতে চায় না। সবাই চায় আমি গাড়ি নিয়ে, ক্লাব নিয়ে, হুইস্কি নিয়ে ফুর্তির মধ্যে ডুবে থাকি, তাহলে তারা বেশ আরামে নিশ্চিন্তে দিন কাটাতে পারে। সংসারে কেউ যে আমার ভালো চায় না—

সুরেন বললে—ওকথা বোল না পমিলি। অন্য লোকে যাই চাক, সুব্রত তো তোমার ভালো চায়।

—সুব্রতর কথা এখন থাক—

সুরেন বললে—প্রজেশ সেনও তো তোমার ভালো চায় আমি জানি। কত-দিন আমার কাছে কেঁদেছে তোমার জন্যে। তুমি রাগ করলে প্রজেশবাবুর বুক ফেটে যায় তা জানো?

—ওদের কথা থাক, কিন্তু তুমি?

সুরেন বলে উঠলো—তুমি পাগলের মত কথা বোল না পমিলি। টক সেন্স।

—আমি সত্যি কথা বলছি সুরেন, আমি আজ সকাল থেকে এক ফোঁটাও এ্যালকোহল ঠোঁটে ছুঁইনি। আর আজ সকালই নয় শুধু, আজ দেড় মাস ধরে আমি এ্যালকোহল ছোঁয়া ছেড়ে দিয়েছি, আমি যা বলছি পুরো সেন্স নিয়েই বলছি.

ততক্ষণে দুজনে কথা বলতে বলতে ডায়মণ্ডহারবারের রাস্তার কাছে এসে গিয়েছিল। হঠাৎ দুজনেরই নজরে পড়লো গাড়িটা নেই। গাড়িটা কোথায় গেল? কেউ চুরি করলে নাকি? তাহলে বাড়ি যাবে কী করে?

তারপরে কেমন করে হাঁটতে হাঁটতে সোজা ডায়মণ্ডহারবারে গিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরলো- সেসব অনেক কথা। সেখান থেকে ফিরে সোজা পমিলিকে নামিয়ে দিয়ে মাধব কুণ্ডু লেনের গলির মোড়ে যে আবার সুব্রত আর টুলুর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে তা সুরেন কল্পনাও করতে পারেনি।

নিজের ঘরখানার মধ্যে বিছানায় শুয়ে সুরেন সেই কথাগুলোই ভাবছিল। উন্মুক্ত মাঠের মধ্যে পমিলির সেই প্রলাপ! হ্যাঁ, প্রলাপই তো! প্রলাপ না হলে কি ও ধরনের কথা কেউ বলে! কোথায় সামান্য একজন নিরাশ্রয় সে, আর কোথায় পুণ্যশ্লোকবাবুর মেয়ে পমিলি! ভাবলেও হাসি পায়। কিন্তু বুদ্ধি করে সে স্লিপিং-পিলের ফাইল দুটো কেড়ে নিয়েছিল তাই রক্ষে। নইলে পমিলি হয়ত ওই মাঠের মধ্যে তারই চোখের সামনে মুখের মধ্যে উপুড় করে দিত। তখন? তখন কী করতো সে? কী জবাবদিহি করতো সে পুলিশের কাছে?

শিশি দুটো আলমারির ড্রয়ারের ভেতর রেখে সুরেন আলো নিভিয়ে দিয়ে আবার শুয়ে পড়লো।

একটা জায়গায় আসতেই টুলু বললে—এইখানে থামুন—

সুব্রত গাড়িতে ব্রেক কষে চারদিকে চেয়ে দেখলে। অন্ধকার বস্তির মত জায়গাটা।

বললে- কোন্ বাড়িটা আপনাদের?

টুলু রাস্তায় নেমে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে। বললে—ওই যে, ওইটে—

একটা ঝুপসি মতন অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলো না সুব্রত। বললে - কোনটা?

—ওই যে টিনের চালাটা, ওরই একটা অংশ—

সুব্রত বললে—আচ্ছা তাহলে আমি এখন আসি—

টুলু বললে—রাত হয়ে গেছে। আপনারও দেরি হয়ে যাবে. নইলে আমাদের বাড়িতে একটু বসে যেতে বলতাম—কিন্তু সত্যি বলতে কী. আপনাদের মত লোকদের বাড়িতে বসতে বলতেও আমাদের ভয় করে—

সুব্রত বললে—সুরেন আপনাদের এখানে আসে তো?

টুলু বললে—মাঝে মাঝে—

সুব্রত বললে—আমিও তাহলে মাঝে মাঝে আসবো. আমায় আসতে বাধা দেবেন না।

টুলু বললে—সুরেনদার সঙ্গে কি আপনি এক?

সুব্রত বললে—এক নই? আমরা তো এককালে দুজনে এক স্কুলে এক ক্লাশেই পড়েছি. দেবেশও আমার ক্লাশফ্রেণ্ড ছিল এককালে—বড় হবার সঙ্গে সঙ্গেই কি মানুষ আলাদা হয়ে যায়? আমি আমেরিকা চলে গিয়েছিলুম বলে কিছু দশটা হাত গজায়নি আমার!

টুলু বললে—তা জানি না. তবে আপনারা তো বড়লোক. দেশের মাথা; লোকে বলে যারা বড়লোক. যারা দেশের মাথা. তাদের দশটা করে হাত। তারা দশ হাতে যা ইচ্ছে তাই করে—

সুব্রত বললে—আপনারা তাই ঠিক করেছেন. তাদের দশটা হাত কেটে দেবেন—

টুলু সংশোধন করে দিলে। বললে—না. দশটা হাত নয়. আটটা হাত কেটে দেবো দুটো হাত রেখে দেবো যাতে খাওয়া-পরার কাজটুকু করতে পারে।

- কেন সে দুটোই বা রাখবেন কেন. সে দুটোও কেটে দিলে পারেন. যাতে খাওয়া-পরাটুকুও না করতে পারে।

টুলু হাসলো না। বললে আপনি কি বলতে চান আমরা নিষ্ঠুর. নির্মম, পিশাচ? আমাদের দয়া-মায়া নেই?

সুব্রত বললে- রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এত কথার জবাব দেওয়া যায় না, বরং আর একদিন আলোচনা করা যাবে—

এই ভালো! তবে আপনার সঙ্গে আর কবেই বা দেখা হচ্ছে -

হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন ডাকলে- টুলু! কী ব্যাপার?

সুব্রত যেন সামনে ভূত দেখেছে! দেবেশ! দেবেশ আরো দু'চারজন ছেলের সঙ্গে সেখানে এসে হাজির।

সুব্রতকে সেখানে টুলুর সঙ্গে কথা বলতে দেখে দেবেশ যেন এক মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়ালো।

সুব্রতই প্রথম কথা বললে। বললে -দেবেশ. তুই?

দেবেশ বললে- তুই? তুই এখানে?

সুব্রত বললে -ওই ওঁকে এখানে একটা লিফট্ দিলাম—

খবরটা শুনে দেবেশ আরো অবাক হয়ে গেছে। টুলুর দিকে চাইতেই টুলু বললে হ্যাঁ দেবেশদা. সুব্রতবাবু আমাকে দয়া করে এখানে পৌঁছে দিয়ে গেলেন -

দেবেশ বললে কিন্তু তুমি ছিলে কোথায়? আমরা যে সবাই খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছি -

—সুরেনদার বাড়িতে গিয়েছিলুম।

দেবেশ আরো আশ্চর্য হয়ে গেল। বললে—কেন, সুরেনের বাড়িতে কেন? সে তো আমাদের অফিসেও ক'দিন আসেনি। তার খবর কী?

টুলু বললে—ভালো, তা সেখানেই এই সুব্রতবাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। রাত হয়ে গেছে বলে উনি আমাকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দিয়ে গেলেন।

সুব্রত এতক্ষণে কথা বললে—কেন, আমি কিছু অন্যায় করে ফেলেছি নাকি?

দেবেশ বললে—অন্যায় কেন, তুই দয়া করেছিস! তোরা তো চিরকালই গরীবদের ওপর দয়া করে আসছিস! এ কি কিছু নতুন?

সুব্রত বললে—তুই দেখছি সেই আগেকার মতই আছিস!

দেবেশ বললে—ঠিক আগেকার মত নেই, অনেক বদলে গেছি। আগে ভাবতুম, হাতজোড় করে কাজ আদায় হয়। এখন বুঝেছি, জোর করে কেড়ে নিতে না জানলে জীবনে অনেক দুর্গতি হয়।

—বাঃ, তুই তো আজকাল খুব ভালো ভালো কথা শিখেছিস দেখছি!

দেবেশ বললে—শুধু ভালো ভালো কথাই শিখিনি, ভালো ভালো কাজ করতেও শিখেছি। দেখছি ভালো ভালো কথায় আর কিছু হয় না! ভালো ভালো কাজও করতে হয়।

—কী ভালো কাজ করছিস? কংগ্রেসকে নিন্দে করাটাই বুঝি খুব ভালো কাজ?

—নিশ্চয়ই ভালো কাজ। যারা এই টুলুদের মত মানুষদের উদ্বাস্তু করেছে, তাদের গালাগালি দেওয়া ভালো কাজ নয়? তার চেয়ে ভালো কাজ আর কী আছে? একদিকে যারা মানুষদের সর্বস্বান্ত করে, আর অন্যদিকে তাদের মোটরে করে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে দয়া দেখায়, তাদের গালাগালি দেওয়াটাকে আমরা ভালো কাজ বলেই মনে করি।

সুব্রতর মুখটা রাগে লাল হয়ে উঠলো। হঠাৎ যেন তার মুখে কথা বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিলে সে।

বললে—ঠিক আছে, আমি এতটা ভেবে এ কাজ করিনি—

দেবেশ বললে—ভেবে কাজ করিনি বললে অপরাধের গুরুত্ব কিছু কমে না। অপরাধ অপরাধই থেকে যায়।

সুব্রত বলে উঠলো—তাহলে কি বুঝতে হবে এর মধ্যে কিছু মতলবের আভাস আছে? আমি আমার স্বার্থসিদ্ধির জন্যেই ওঁকে বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিয়ে গেছি?

দেবেশ বললে—নিশ্চয়ই, নইলে এতখানি পেট্রল পুড়িয়ে একটা উদ্বাস্তু মেয়েকে শ্যামবাজার থেকে ঢাকুরিয়া পৌঁছিয়ে দেবার মানেটা কী?

টুলু এবার এগিয়ে এল। বললে—দেবেশদা, তুমি থামো, তুমি এসব কী বলছো?

—তুমি থামো টুলু। সুব্রতকে আর চেনাতে হবে না। আমি ওকে ওর ঝাড়ে-বংশে চিনি। এত রাত্তিরে তোমাকে এতদূরে গাড়ি করে বাড়ি পৌঁছিয়ে দেবার মানে বোঝবার মতন বুদ্ধি আমার আছে—

টুলু দেবেশের মুখের সামনে এসে আড়াল করে দাঁড়ালো। বললে—দোহাই তোমার দেবেশদা, তুমি চুপ করো, সুরেনদা অনেক পীড়াপীড়ি করলে বলে আমি সুব্রতবাবুর গাড়িতে উঠতে রাজী হলুম। তুমি মিছিমিছি ওঁকে অপমান কোর না—

দেবেশ বললে—অপমান করার কথা বলছো? অপমান আমি কতটা করেছি?

আমি যদি সত্যি সত্যিই অপমান করতুম তো সুব্রত এতক্ষণ এখানে দু' পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারতো?

সুব্রত হঠাৎ টুলুর দিকে চেয়ে হাতজোড় করে বললে—আমাকে মাফ করবেন আপনি। এত কান্ড হবে জানলে আমি কিছুতেই আপনাকে গাড়িতে তুলে নিতুম না—আমি এখন আসি—

বলে সুব্রত গাড়িতে উঠতে যাচ্ছিল। টুলু হঠাৎ বলে উঠলো—আপনি একটু দাঁড়ান সুব্রতবাবু—

বলতে বলতে সে গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। তারপর কাছে গিয়ে বললে—দয়া করে রাগ করবেন না আমাদের ওপর. আপনি এতদিন দেশের বাইরে ছিলেন তাই জানেন না। আসলে আমরা অন্য পার্টির লোক. তাই আপনার সঙ্গে আমাদের কিছুতেই বনবে না। আপনি হাজার ভালো ব্যবহার করলেও বনবে না। আপনি যেন আমাদের ভুল বুঝবেন না—

উত্তরে সুব্রত শুধু বললে—নমস্কার—

বলে গাড়ির ইঞ্জিনে স্টার্ট দিয়ে ধুলো উড়িয়ে বড় রাস্তার দিকে চলে গেল।

মাধব কুণ্ডু লেনে প্রতিদিনের মত সেদিনও ভোর হয়েছে। সেদিনও যথারীতি দুখমোচন ঝাঁটা নিয়ে উঠোন ঝাঁট দিয়েছে। রূপচাঁদ চৌধুরীর আমলে ঝাঁট দেওয়ার পর কোথাও আবার এতটুকু ধুলো থাকলে তিনি আবার নতুন করে ঝাঁট দেওয়াতেন। ওই দুখমোচন এখন বুড়ো হয়ে গিয়েছে। আগেকার মতন গায়ের শক্তি আর নেই। কিন্তু এখনও সে নিজের হাতে সারা উঠোনটা ঝাঁট দেয়। সেদিনও তেমনি করে সে ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেছে। আর তার ছেলে অর্জুনকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিয়ে বলেছে—ওঠ অর্জুন. ওঠ—

অর্জুন এককালে ম্যানেজারবাবুর ভাগ্নের সঙ্গে খেলাধুলো করেছে। তারপর কত বছর কেটে গেছে, এখন অর্জুনের অন্য দল হয়েছে। সে তাদের সঙ্গে মেশে, তাদের সঙ্গেই গল্প করে। কখনও দূর থেকে দেখে ভাগ্নেবাবুকে। দেখে কত রকম লোক আসছে ভাগ্নেবাবুর কাছে। ছেলেরা আসে, মেয়েরা আসে। কত গাড়ি এসে দাঁড়ায় বাড়ির সামনে। বাড়ির কাজ করতে করতে ভাগ্নেবাবুকে দেখেই বলে—কালকে তোমার সঙ্গে একজন দেখা করতে এসেছিল ভাগ্নেবাবু—

সুরেন জিজ্ঞেস করে—কে?

অর্জুন বলে—তা কী জানি বাপু, আমাকে নাম বলে যায়নি—

এমন কত লোক আসে সুরেনের কাছে। কিন্তু ক'জনের সঙ্গেই বা সে মেলামেশা করে। হয়ত দেবেশ, নয়তো টুলু। আর নয়তো পমিলি। আর আজকাল আসে সুব্রত। আমেরিকা থেকে ফিরে এসে সুব্রত আবার তার বাড়িতে আসা-যাওয়া শুরু করেছে।

সেদিন সমস্ত রাত ঘুম হয়নি সুরেনের। হঠাৎ মনে হলো কে যেন তার জানালায় এসে টোকা মারছে। প্রথমটায় অতটা বুঝতে পারেনি। কিন্তু তারপরে আবার। শেষ পর্যন্ত কেমন যেন সন্দেহ হলো সুরেনের। এত রাত্রে কে তাকে ডাকতে এল?

সুরেন জিজ্ঞেস করলে—কে?

কারো উত্তর নেই। বাইরের লোক যদি হয় তো সে জন্যে তো বাহাদুর সিং আছে। বাহাদুর সিং তো অচেনা লোককে ভেতরে ঢুকতে দেবে না। অচেনা লোক হলে তো সে গেটের চাবি খুলবে না। তবে কি চেনা কেউ?

—দরজা খুলুন, দরজা খুলুন।

এবার জোরে জোরে কড়া নাড়তে লাগলো।

সুরেন আর চুপ করে বিছানায় শুয়ে থাকতে পারলে না। তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুলে দিতেই দেখলে পুলিশ! ঘুমের চোখ দুটো রগড়ে আবার ভালো করে দেখলে। হ্যাঁ, সত্যিই পুলিশ। একজন পুলিশের ইন্সপেক্টার, আর সঙ্গে দু'জন কনস্টেবল!

সুরেনের সারা শরীরটা যেন ঝিমঝিম করে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল দেবেশদের কথা। হয়ত দেবেশকে ধরেছে, টুলুকেও ধরেছে। হয়ত পার্টি অফিসের সবাইকেই এ্যারেস্ট করবার হুকুম হয়েছে।

—আপনাকে আমরা এ্যারেস্ট করলুম। আপনার নামই তো সুরেন সান্ন্যাল?

সুরেন সান্ন্যালের মুখ দিয়ে কোনও রকমে একটা শব্দ বেরোল—হ্যাঁ—

—আমাদের সঙ্গে থানায় চলুন!

সুরেন বললে—তা না হয় যাচ্ছি, কিন্তু আমি কী করেছি?

দারোগা বললে—সেকশান থ্রি-হানড্রেড এণ্ড টু, তিনশো দুই ধারা—

—তার মানে?

—আপনি খুন করেছেন!

—খুন?

—হ্যাঁ, খুন!

সুরেন বিস্ফারিত দৃষ্টি দিয়ে চেয়ে দেখলে বড়বাবুর মুখের দিকে। বললে—আপনি ঠিক বলছেন আমি খুন করেছি? কাকে? কাকে খুন করেছি?

—পর্মিলি রায়কে।

—পর্মিলি রায়!

—হ্যাঁ, আপনি তাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে গাড়ি করে ডায়মণ্ডহারবারে নিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর সেখান থেকে তাকে অনেক রাত্রে বাড়িতে পৌঁছে দেন। বাড়িতে পৌঁছিয়ে দেবার আগে আপনি তাকে মদের সঙ্গে হেভি ডোজে স্লীপিং-পিল খাইয়ে দেন। আর তারপরেই সে বাড়িতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে যায়—

—তারপর?

—সে মারা গেছে।

—মারা গেছে! কিন্তু, কিন্তু আমি তাকে স্লীপিং-পিল খাইয়েছি কে বললে?

বড়বাবু বললে—সে কথার জবাব থানায় গিয়ে শুনবেন। এখন চলুন আপনার ঘরটা আমরা সার্চ করে দেখব।

সুরেন বললে—কেন? আমার ঘর সার্চ করবেন কেন? আমার ঘরে কী আছে?

—আমরা দেখবো স্লীপিং-পিলের ফায়েল আছে কিনা—

বলে বড়বাবু সঙ্গের পুলিশ কনস্টেবলদের ইঙ্গিত করতেই সবাই জোর করে ঢুকে পড়লো তার ঘরের ভেতর। সুরেনের বুকটা ভয়ে থর থর করে কেঁপে উঠলো। যদি সত্যিই ফাইল দুটো খুঁজে পায় ওরা! আলনায় তার জামা ঝুলছিল। তার পকেটগুলোর ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দেখতে লাগলো। বিছানাটা

হাঁটকে ওলোট-পালোট করে দিলে। তারপর ট্রাংকটা খুলে ফেললে চাবি চেয়ে নিয়ে। তার ভেতরে জামা-কাপড় সব এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে ফেলে ছত্রখান করে দিলে। কোথাও কিছু পাওয়া গেল না। তারপর আলমারী। আলমারীর একটা ড্রয়ার খুলতেই কাগজপত্রের মধ্যে হঠাৎ হাঁ করে উঠেছে স্লীপিং-পিলের শিশি।

—এই তো পেয়েছি!

বলে শিশি দুটো বার করে সুরেনকে দেখালে। সুরেনের সমস্ত শরীর বেয়ে তখন ঝর ঝর করে ঘাম ঝরছে।

—চলুন, আপনি থানায় চলুন!

বড়বাবুর মুখখানার চেহারা দেখে সুরেনের কান্না পেয়ে গেল। বললে—বিশ্বাস করুন আপনি, আমি মার্ডার করিনি—

—কিন্তু আপনার ঘরেই বা এই দু' শিশি স্লীপিং-পিল থাকে কেন? এ শিশি দুটো আপনি পেলেন কোথায়?

সুরেন বললে—আমি পর্মিলির কাছ থেকেই ও দুটো শিশি কেড়ে নিয়েছি।

—কেন?

—কাল পর্মিলি ওই পিল খেয়ে সুইসাইড করতে যাচ্ছিল। তাই আমি ওর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে নিজের কাছে রেখেছিলাম।

—কিন্তু আমি যদি বলি তিনটে শিশি কিনেছিলেন, একটা শিশির পিল খাইয়েই কাজ খতম হয়েছে বলে বাকি দুটো আর কাজে লাগাননি?

সুরেন এর কী জবাব দেবে!

শুধু বললে—কিন্তু আমি তো বলছি আমি খুন করিনি পর্মিলিকে। আর পর্মিলিকে আমি খুন করবোই বা কেন? মানুষ যাকে ভালবাসে তাকে কি কেউ খুন করে?

বড়বাবু বিজ্ঞের মত মৃদু হাসলেন। বললেন—করে করে, এখন অত বুঝিয়ে বলবার সময় নেই, যা বোঝবার থাকবে তা কোর্টের ম্যাজিস্ট্রেটই আপনাকে বুঝিয়ে দেবে—চলুন—

সুরেন চলতে একটু ইতস্তত করছিল, কিন্তু পুলিশ দুটো এগিয়ে এসে তার হাত দুটো ধরে ফেললে। বড়বাবু জোরে চিৎকার করে উঠলো—চলুন বলছি—

আর সঙ্গে সঙ্গে কী যে হলো, সেই চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেল তার। আতঙ্কে অস্থিরতায় সাহায্যের জন্যে চারদিকে চেয়ে দেখলে। জানলা দিয়ে বাইরের অন্ধকাব নজরে পড়লো। তত ঘন অন্ধকার নয়, একটু যেন পাতলা-পাতলা হয়ে এসেছে সে অন্ধকার! তবে কি রাত ভোর হয়ে এল নাকি? এত শিগ্‌গির রাত শেষ হয়ে এল? এই তো কিছুক্ষণ আগেই সে ঘুমোতে গেল! কিন্তু কী বিশ্রী স্বপ্ন? এমন স্বপ্ন সে কেন দেখতে গেল? স্বপ্ন কি সত্যি হতে পারে? আসলে তো স্বপ্ন মিথ্যেই। কিন্তু এত স্বপ্ন থাকতে এই খারাপ স্বপ্নটাই বা সে দেখলো কেন?

তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে ঘরের আলোটা জ্বাললে। ঘরের জিনিসপত্র যেখানে যেমন ছিল সব ঠিক তেমনি আছে। কোথাও কিছু বদলায়নি। বিছানাও যেমন ছিল তেমনি আছে। ট্রাংকটাও বন্ধ। সত্যিই তো, বাহাদুর সিং গেটের পাশেই থাকে। গেটেও চাবি-তালা বন্ধ থাকে। রাত্রে বাইরের কেউ ঢুকলে তো বাহাদুর সিং জানতেই পারতো।

—এ কী ভাগ্নেবাবু, আজকে এত্‌না ভোরে উঠে পড়েছেন?

কলঘরে যাবার পথে উঠোন ঝাঁট দিচ্ছিল অর্জুন। অর্জুনকে দেখে সুরেন জিজ্ঞেস করলে—তুমি আজ ঝাড়ু দিচ্ছ যে? দুখমোচন কোথায়?

—বেমার বাবুজী, সে শুয়ে আছে—

আর কিছু বললে না সুরেন। কলঘরে মুখে-চোখে জল দিয়ে খানিকটা যেন সুস্থ বোধ করলে। তারপর বাইরে বেরিয়ে এল। পাশের দিকে বুড়ো-বাবুর ঘর। সেদিক থেকে কোনও সাড়া শব্দ আসছে না। বোধহয় ঘুমোচ্ছে, কিংবা জেগে জেগেই শুয়ে আছে। আহা, সুরেনের কেমন দয়া হলো। এমন করে মানুষটাকে বাঁচিয়ে রেখে ভগবানের কী লাভটা হচ্ছে। মেরে ফেললেই হয়। হয়ত একদিন হঠাৎ মারা যাবে। ঘরের মধ্যে তক্তপোষটার ওপরই মরে পড়ে থাকবে। কেউ দেখতে পাবে না, জানতেও পারবে না মানুষটা মারা গেছে।

মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল সুরেনের। ওই যে মা-মণি—মা-মণিই বা বেঁচে আছে কেন? বেঁচে থেকে কার কী লাভ হচ্ছে?

তখনও রাস্তার আলোগুলো জ্বলছে। সুরেন জামাটা গায়ে দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো। তার আর ভালো লাগছিল না কিছু। কেন সে অমন স্বপ্ন দেখলে? পমিলিকে সে খুন করেছে এ স্বপ্ন সে দেখতে গেল কেন? কাল রাত্রের ঘটনাটাও মনে পড়ে গেল। সেই অন্ধকার মাঠের ওপর পমিলির সেই কথাগুলোও তার কানে ভেসে আসতে লাগলো। অথচ এ কথাগুলো কাউকে বললে সে কি বিশ্বাস করবে? সে কি বুঝতে পারবে পুণ্যশ্লোকবাবুর একমাত্র মেয়ের এত দুঃখ থাকতে পারে?

খানিকক্ষণ এলোপাথাড়ি ঘোরাঘুরির পর পাঁচ মাথার মোড়ের ওপর এসে সে দাঁড়ালো। ততক্ষণে ট্রাম-বাস চলতে শুরু করেছে। খবরের কাগজের হকাররা সাইকেলে কাগজ বোঝাই করে দৌড়োদৌড়ি শুরু করে দিয়েছে। কাগজের প্রথম পাতায় বড় বড় করে এনকোয়ারি কমিশনের খবর ছাপিয়েছে। এবার কংগ্রেসের বড় দুঃসময়। ডাঃ বিধান রায় স্টেটমেণ্ট দিয়েছেন—দেশে শান্তি বজায় রাখতে জাতীয় কংগ্রেসকে শক্তিশালী করুন।

সেই এক খবর, একই ধরন। চিরকাল ধরে একই ধারায় সব কিছু চলছে। খবরের কাগজের লোকদেরই শুধু লাভ। যত অশান্তি বাড়ছে তত তাদের কাগজ বিক্রি হচ্ছে। রাস্তার লোকগুলো হুমড়ি খেয়ে পড়েছে কাগজের ওপর। ঘুম থেকে উঠেই তারা এমন কিছু খবর শুনতে চায়, যাতে একটু রোমাঞ্চ পেতে পারে। বারো পয়সা খরচ করে বাহান্ন রকমের মজা!

রাস্তার আরো এদিকের রেলিংটা তখন ফাঁকা। একটু বেলা হলেই সেই ক্যালেণ্ডারওয়ালাটা এসে সার সার ক্যালেণ্ডার সাজিয়ে দেবে রেলিং-এর গায়ে। একপাশে স্বামী বিবেকানন্দের পাগড়ি পরা ছবি, তার পাশেই পাখাওয়ালা ন্যাংটো মেয়েমানুষ!

—এই যে ভাগ্নেবাবু, মর্ণিং-ওয়াক হচ্ছে বুঝি?

সুরেন প্রথমটায় চিনতে পারেনি। তারপর যেন ক্ষীণ একটা সূত্র ধরে আস্তে আস্তে মনে পড়লো।

বললে—খুব চেনা চেনা যেন মনে হচ্ছে। আপনি কালীকান্ত বিশ্বাস মশাই না?

লোকটার মুখে একটা কদর্য হাসি ফুটে উঠলো। বললে—যাক, তবু ভালো, চিনতে পেরেছো দেখছি তুমি—

—কিন্তু আপনার এ দশা হলো কেন? এ কী চেহারা হয়েছে?

কালীকান্ত বিশ্বাস করুণ হয়ে উঠলো। বললে—হবে না? তুমি জানো না, তোমার মামাটা আমার কী সব্বোনাশ করেছে? আমার বউটাকে বেশ্যা করে দিয়েছে?

সুরেন যেন আকাশ থেকে পড়লো। বললে—সে কী!

কালীকান্ত বিশ্বাস বললে—কেন, তুমি কিছু জানো না? কিছু শোনোনি?

সুরেন বললে—কই, না তো?

কালীকান্ত উত্তেজনায় পকেট থেকে একটা আস্ত বিড়ি বার করে ধরিয়ে ফেললে। বললে—তবে আর তুমি শুনলেটা কী? তুমি কি কলকাতা সহরে থাকো না নাকি? এ খবর যে সব্বাই জেনে গেছে। তোমার বদমাইশ মামাটা একটা খুনী—কী করেছে জানো না তুমি?

সুরেন বললে—কী করেছে?

—আরে, তুমি দেখছি কিছুই খবর রাখো না। ছোড়দা মারা গেছে জানো তো?

সুরেন বললে—ছোড়দা কে?

—আরে, তুমি ছোড়দাকেই চেনো না? হাটখোলার অত বড় রাজবংশের ছেলে, এক ডাকে তাকে সব্বাই চেনে। তুমি নরেশ দত্তর নাম শোনোনি? সে তো মারা গেছে হাজতখানায়।

—হাজতখানায়?

কালীকান্তর তখন দম টেনে টেনে বিড়িটা নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। বললে—তাহলে তোমাকে সব কথা গোড়া থেকে বলতে হবে। অনেক টাইম লাগবে। চলো, একটু চা খাওয়াও দিকিনি ব্রাদার। সকাল থেকে এক কাপ চাও পেটে পড়েনি। ওই চায়ের দোকানটায় চলো দিকিনি—

সুরেন বললে—এখন একটু ব্যস্ত আছি আমি, আপনি এখানে দাঁড়িয়েই বলুন না—

কালীকান্ত বললে—চা খেতে কতক্ষণ লাগবে? চলো চলো, এক কাপ চা তো খাওয়াবে তাতে কী এমন রাজকার্যের ক্ষতি হবে তোমার?

বলে কালীকান্ত সুরেনের একখানা হাত ধরে জোর করে টানতে টানতে নিয়ে গেল চায়ের দোকানের দিকে। দোকানটায় তখন ভিড় বেশ। সার সার বেঞ্চি পাতা ভেতরে। সেখানে বসে রেসের বই নিয়ে জোর গবেষণা চলেছে। সিগারেটের আর চায়ের ধোঁয়ায় ঘর ভরপুর। তারই এক ফাঁকে কালীকান্ত সুরেনকে নিয়ে গিয়ে বসালো। তারপর চিৎকার করে বললে—দুটো ডবল-হাফ চা দেখি ভাই, আর চারটে করে গরম সিঙাড়া

সুরেন বললে—না না, আমি কিছু খাবো না—

—কেন? চা খাবে না?

—না, চায়ের আমার নেশা নেই। আর সিঙাড়া হজম করতে পারবো না

কালীকান্ত বললে—সে কী হে? মদ খেলে না, নেশাভাঙ করলে না, মাঝ-খান থেকে লিভারটার বারোটা বাজিয়ে বসে আছ—

সুরেন বললে—না তা নয়, লিভারের জন্যে নয় আমার এত ভোরে খাওয়ার অভ্যেস নেই। আজকে আমার মনটাও ভালো নেই। মাঝরাত্তিরে ঘুম ভেঙে গেছে, আর ঘুম আসেনি তাই রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছি।

—তা ভোর রাত্তিরে ঘুম তো ভাঙবেই। সেই জন্যেই তো রাত্তিরে মাল খাই আমরা। মাল খাই কি সাধে? মাল খাই ওই ঘুমটির জন্যে। মাল খেতে শুরু

করো, দেখবে ঘুমের ঘোরে আর চোখ খুলতে পারবে না—

তারপর দোকানদারকে লক্ষ্য করে বললে—দু' কাপ দিতে হবে না হে, একটা ডবল-হাফই দাও—আর সিঙাড়া আটটাই দাও, ক্ষিদে পেয়েছে খুব—

বলে আর একটা বিড়ি ধরালো কালীকান্ত। ধরিয়ে লম্বা করে ধোঁয়া ছেড়ে বললে—হ্যাঁ, যে কথা বলছিলুম, আমার মত রোজ সন্ধ্যেবেলা দু' নম্বরের পাঁট একটা করে ধরো দিকিনি, দেখবে ওই অনিদ্রা-টনিদ্রা কোথায় পোঁ-পোঁ দৌড় দিয়েছে—

হঠাৎ সুরেন বললে—আচ্ছা কালীকান্তবাবু, আপনি রাত্তিরে স্বপ্ন দেখেন না?

কালীকান্ত অবাক হয়ে গেল ভাগ্নেবাবুর কথা শুনে।

বললে—সে কী হে, স্বপ্ন কে না দেখে—

সুরেন বললে—না, তাই বলছি, স্বপ্ন দেখলে তা ফলে?

—আরে দূর, স্বপ্ন কখনও ফলে? আমি তো কতবার স্বপ্ন দেখেছি রেসে ট্রিপল-টোট্ মেরে দিয়েছি। স্বপ্নে খুব লাফাচ্ছি, জেগে উঠে ফক্কা—

সুরেন চুপ করে গেল। ততক্ষণে চা এসে গিয়েছিল। ডবল-হাফ। চায়ের কাপটা নিয়ে চুমুক দিয়েই বললে—বাঃ, বেড়ে করেছে। তুমি, তাহলে দামটা দিয়ে দাও ভাগ্নেবাবু, আটটা সিঙাড়া আর একটা ডবল-হাফ। মোট দশ আনা—

সুরেন পকেটে হাত দিয়ে অবাক হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি বেরোতে গিয়ে পকেটে পয়সা আনতে তো সে ভুলে গিয়েছে। কী আশ্চর্য!

সুরেন বললে—বিশ্বাস মশাই, আমি তো পয়সা আনিনি—

কালীকান্ত বিশ্বাস চা খেতে খেতে চমকে উঠেছে। তার মুখের চা'টা হঠাৎ বড় তেতো ঠেকলো।

বললে—পয়সা নেই পকেটে? তাহলে কী হবে? আমার পকেটেও যে পয়সা নেই—তা এক কাজ করো না, দৌড়ে বাড়ি থেকে গিয়ে নিয়ে এসো না! এই তো কাছেই মাধব কুণ্ডু লেন—

—আপনার কাছে পয়সা নেই?

কালীকান্ত বললে—আমার কাছে পয়সা থাকলে আমি তোমাকে দিতে বলি?

সুরেন বললে—তাহলে বসুন, আমি এখ্খুনি গিয়ে বাড়ি থেকে নিয়ে আসছি। আমি যাবো আর আসবো।

তাড়াতাড়ি বাড়ির পথে পা বাড়ালো সে। ততক্ষণে কলকাতা সহরে আরো চঞ্চলতা বেড়ে গেছে। রাস্তায় লোকজন বেরিয়েছে বেশি সংখ্যায়। সুরেন হন হন করে বাড়ির দিকে চলতে লাগলো। আশ্চর্য ওই লোকটা। পৃথিবীতে কত কী ঘটে যাচ্ছে, কিছুই খেয়াল রাখে না। ওদের কাছে কংগ্রেসও নেই, কমিউনিষ্ট পার্টিও নেই। শুধু যেমন করে পারে দু'বেলা ফুর্তি উড়োতে পারলেই হলো। কালীকান্ত বিশ্বাসের মত আরো অমনি কত লোক যে আছে! হয়ত বেশির ভাগই সেই রকম। তার নিজের মামাই বা কী! মামাও তো ওই রকম। টাকা উপায় করা ছাড়া আর সবকিছুকে যেন পণ্ডশ্রম মনে করে। টাকা উপায় করা ছাড়া তাদের কাছে যেন আর কোনও করবার মত কাজ নেই।

বাহাদুর সিং তখন চান করে নিয়েছে। এখুনি ডিউটি দিতে শুরু করবে। সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল। সুরেন ভেতরে ঢুকতেই সে সেলাম করলে—রাম রাম ভাগ্নেবাবু—

সুরেন বললে—রাম রাম—

তারপর নিজের ঘরে গিয়ে টেবিলের ড্রয়ার থেকে টাকা-পয়সা বার করলে। বার করে আবার তেমনি অবস্থাতেই বাইরে এল।

বাহাদুর তখনও দাঁড়িয়ে ছিল।

সুরেন জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা বাহাদুর, রাত্তিরে বাড়িতে কেউ ঢুকে-ছিল? তুমি জানো কিছু?

বাহাদুর বললে—নেহি হুজুর, কৌন্ ঘুষে গা?

সুরেন বললে—পুলিশ?

বাহাদুর বললে—পুলিশ? পুলিশ কেন ঘুষবে? পুলিশ এলে তো আমি জানতে পারতুম হুজুর।

সুরেন বুঝলে সমস্ত ব্যাপারটাই কি অদ্ভুত একটা স্বপ্ন! একেবারে আজগুবি স্বপ্ন। স্বপ্ন না হলে কেউ একথা কল্পনা করতে পারবে যে. সে পর্মিলিকে খুন করেছে? পর্মিলি কী করেছে তার?

তারপর ভাবতে ভাবতে রাস্তায় নামলো সুরেন। কালীকান্ত বিশ্বাসটা বোধহয় এখনও চায়ের দোকানে রাস্তার দিকে চেয়ে হাঁ করে বসে আছে। সুরেন না গেলে আর দোকান ছেড়ে যেতে পারবে না। তাকে পয়সার জন্যে বেইজ্জতি করবে। সুরেন তাড়াতাড়ি করে পা চালিয়ে চলতে লাগলো।

আজ এতদিন পরে সেদিনকার কথাগুলো ভাবতে গিয়ে সুরেনের যেন কেমন ভয় করে। সেদিনকার সেই কলকাতা। সেদিনকার সেই জটিল কলকাতা আজ জটিলতর হয়েছে। দেবেশদের পার্টি আজ মিনিষ্ট্রি পেয়েছে। কিন্তু যেন সব কিছু ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে মানুষের। মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা আজ শতধা হয়ে মানুষকেই গ্রাস করতে চাইছে। এ কেন হলো? এমন কেন ঘটলো?

সেই ১৯৫৬ সাল। ১৯৫৬ সাল তখন শেষ হবো-হবো। মানুষ বড় আশা করেছিল ১৯৪৭-এর পর। আশা করেছিল এবার আর তাদের ভাবনা নেই। এবার তাদের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে। দেবেশও তাই বলেছিল সুরেনকে। বলেছিল—দেখবি ব্রিটিশরাই যত নষ্টের মূল। এবার এদেশ ছেড়ে চলে গেলেই ওদের এম্পায়ার চলে যাবে।

কিন্তু তা হলো না। ব্রিটিশ-রাজ চলে গেল বটে, কিন্তু তার জায়গায় এল আর-এক রাজ।

দেবেশ বললে—এরাই হলো বুর্জোয়া, এই বুর্জোয়াদের হাত থেকে নিষ্কৃতি না পেলে সাধারণ গরীব মানুষদের কোনও ভরসা নেই—

সুরেন বুঝতে পারেনি ঠিক মত। জিজ্ঞেস করেছিল—বুর্জোয়া মানে কী?

দেবেশ বলেছিল—সে কী রে, তুই বি-এ পাশ করেছিস. বুর্জোয়া মানে জানিস না? বুর্জোয়া মানেই তো এই কংগ্রেস। আমাদের পূর্ণদা সন্দীপদা বলেছে, এই বুর্জোয়াদের না তাড়ালে দেশের কোনও উন্নতি নেই।

দেবেশরা তাই বৌবাজারে নতুন পার্টি খুললে।

সে-সব কতকাল আগের কথা। তার সঙ্গে আরো কত মানুষ, কত সেণ্টি-মেণ্ট, কত ট্র্যাজেডি জড়িয়ে গিয়েছিল তার কি ঠিক আছে? জীবনে কত কিছু

দেখলে সে, কত কিছু অনুভব করলে, কত প্রাণ খুলে হাসলে, কত চোখের জলে ভাসলে, তার কি ইয়ত্তা আছে। আর তাছাড়া কলকাতার ব্যস্ত জীবনের কাজ-কর্মের তলায় কখন যে সে-সব তলিয়ে গেল কারো ডায়েরিতে তো তা লেখা নেই যে, ভবিষ্যতের মানুষ এসে তা পড়বার সুযোগ পাবে।

আর সুরেনই কি ভাবতে পেরেছিল, তার জীবনের ঘটনাগুলোই একদিন মূল্যবান ইতিহাস হয়ে উঠবে, আর আমি তাই নিয়ে আবার উপন্যাস লিখবো। তা যদি সে জানতো তাহলে সে-ই তো রোজ ঘুমোতে যাবার আগে একপাতা দু'পাতা করে লিখে রেখে যেতো!

তখন রোজ কমিশনের শুনানী চলছে। দুটো পার্টি থেকেই সাক্ষী-সাবুদের তোড়জোড় চলছে। পুণ্যশ্লোকবাবুদের তরফ থেকে প্রজেশ সেন সারা কলকাতা ঘুরে ঘুরে তম্বির করে বেড়ায়। আর এদিকে দেবেশ। দেবেশরা সাক্ষীদের দিয়ে প্রমাণ করাতে চাইবে যে কংগ্রেস এই পুলিশি হামলার পেছনে যুক্ত আছে। তাদের ষড়যন্ত্রেই এত লোক রাইফেলের গুলীতে প্রাণ হারিয়েছে।

মাধব কুণ্ডু লেনটা যেখানে ট্রাম-রাস্তায় এসে পড়েছে, সেখানেই সেদিন হঠাৎ দেবেশের সঙ্গে সুরেনের মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল।

সুরেন অত সকালে দেবেশকে ওখানে দেখতে পাবে তা' আশা করেনি। জিজ্ঞেস করলে- কী রে, তুই এত সকালে?

দেবেশ বললে—কাল রাত্তিরে টুলুর কাছে সব শুনলুম—

—কাল টুলু তো আমার বাড়িতে এসেছিল। তখন অনেক রাত। তোর সঙ্গে কোথায় দেখা হলো?

দেবেশ বললে—ওদের ঢাকুরিয়াতে যে আমরা কাল গিয়েছিলুম। দেখি আমাদের সুব্রত তাদের বাড়িতে গেছে।

সুরেন বললে—আমিই সুব্রতকে বলেছিলুম টুলুকে একটা লিফট্ দিয়ে দিতে—

দেবেশ বললে—দেখলুম সুব্রতটা টুলুদের বাড়ির সামনের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দাড়িয়ে খুব জমিয়ে ভাব করবার চেষ্টা করছে তার সঙ্গে—। দেখা হলে তুই সুব্রতকে বলে দিস বুর্জোয়াদের সঙ্গে আমাদের মিলবে না। আমার মনে হচ্ছে এর পেছনে মতলব আছে—

সুরেন বললে—কী মতলব? কী মতলব থাকতে পারে সুব্রতর?

দেবেশ বললে- আমি সেই জন্যেই তো তোর কাছে এসেছি। আমার মনে হচ্ছে সুব্রত টুলুকে রেজিমেন্টেশন করতে চাইছে। আসলে এনকোয়ারি কমিশনের এভিডেন্স সব ভণ্ডুল করে দেবে।

--কী করে ভণ্ডুল করবে?

দেবেশ বললে—কেন? খুব সহজ, সাক্ষী ভাঙিয়ে—

— কিন্তু টুলু কি সেই রকম মেয়ে? টুলুকে ভাঙানো কি সোজা? ও কি সুব্রতকে চেনে না জানে না সুব্রত কোন্ লোকের ছেলে? সবই তো জানে।

দেবেশ বললে —না, তা পারবে না, কিন্তু সুব্রতর চেষ্টা করতে দোষ কী? আর একটা কথা, তোর সঙ্গে ওর বোনের কী রকম সম্পর্ক রে?

—তার মানে?

দেবেশ বললে- মানে তুই তো এককালে ওদের বাড়িতে খুব যাতায়াত করতিস' তোর সঙ্গে তো পমিলির কি রকম একটু ঘনিষ্ঠতাও ছিল।

সুরেন বললে- কী যে তুই বলিস! আমি কোথাকার কে আর সেই বা কে!

তার সঙ্গে কি আমার তুলনা?

দেবেশ বললে—ওসব ছেঁদো কথা ছাড়। একটা কাজ করতে পারবি? তোর কথা তো পমিলি খুব শোনে। মাঝে মাঝে তোর সঙ্গে দেখাও হয়। একটা কাজ করতে বলতে পারিস?

সুরেন জিজ্ঞেস করলে—কী কাজ?

দেবেশ বললে—ও তো খুব মদ খায়। ওকে মদ খাওয়াবার যা খরচ লাগবে তা না হয় দেওয়া যাবে।

সুরেন বললে—বলছিস কী তুই? আর সেই সঙ্গে আমাকেও বুঝি একটু-আধটু খেতে হবে?

দেবেশ বললে—তা দরকার হলে খাবি। খাবার জিনিস, খেতে দোষ কী? না হয় পার্টির জন্যে একটু-আধটু মদই খেলি। তাতে তো তোর জাত যাবে না রে!

সুরেন বললে—না ভাই, সে আমি পারবো না। পমিলি আসলে ভালো মেয়ে, আমি তার কোনও ক্ষতি করতে পারবো না।

দেবেশ বললে—এই মরেছে, তোর দেখছি সেই বামন হয়ে চাঁদে হাত দেবার সখ!

সুরেন বললে—তা, কী করতে হবে তাই বল না—

দেবেশ বললে—আসল কথাটা হলো এনকোয়ারি কমিশনে পমিলিকে সাক্ষী দাঁড় করাতে হবে। ওর এভিডেন্স খুব জরুরী।

সুরেন বললে—পমিলি তো বলছিল ও সাক্ষী হবে। কারণ যখন গণ্ডগোল হচ্ছিল, তখন তো পমিলি ছিল তার মধ্যে। ওর গাড়ি তো পুড়ে গিয়েছিল। গুণ্ডারা পুড়িয়ে দিয়েছিল।

দেবেশ বললে—না, তা নয়, তা বলছি না। ওকে জিজ্ঞেস করতে পারিস, ও কোন পক্ষের সাক্ষী হবে, আমাদের ফেবারে, না কংগ্রেসের ফেবারে?

সুরেন বললে—কিন্তু পুণ্যশ্লোকবাবু চান না পমিলি সাক্ষী হোক—

দেবেশ বললে—কিন্তু তুই ওকে যা' করেই হোক রাজী করিয়ে দে আমাদের ফেবারে সাক্ষী হতে—

—আমি কী করে রাজী করাবো? আমার কথা পমিলি শুনবে কেন?

দেবেশ বললে—দ্যাখ, আমার কাছে মিথ্যে কথা বলিসনি। আমি সব জানি। আমাদের সব জানতে হয়। তুই বললেই পমিলি রাজী হয়ে যাবে।

সুরেন বললে—কিন্তু আমার কথায় সে বাবার বিরুদ্ধে এভিডেন্স দেবে?

—নিশ্চয় দেবে। তোরা তো একসঙ্গে প্রায়ই ঘুবিস।

—কে বললে একসঙ্গে ঘুরি? কে বলেছে তোকে?

দেবেশ বললে—কেন, টুলু বলেছে!

—টুলু কি আমাকে পমিলির সঙ্গে ঘুরতে দেখেছে?

দেবেশ বললে—তাহলে কাল রাত্তিরে তুই কোথায় গিয়েছিলি? অত রাত পর্যন্ত তুই কোথায় ছিলি? টুলু তোর বাড়িতে রাত্তিরে এসে তোকে পায়নি। বল কোথায় ছিলি?

সুরেন চুপ করে রইল। কোনও উত্তর তার মুখে যোগালো না।

বল কোথায় ছিলি? বল তুই পমিলির সঙ্গে ঘুরিসনি? পমিলির সঙ্গে তুই কোথায় ঘুরেছিলি অত রাত্তির পর্যন্ত?

সুরেন কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপরে বললে—ও আমাকে জোর করে

গাড়িতে তুলে নিয়ে গিয়েছিল।

—কোথায়?

—সেই ডায়মণ্ডহারবারের দিকে।

দেবেশ বললে—কেন? তোর সঙ্গে পর্মিলির অত ভাব কেন? পর্মিলি হলো বড়লোকের মেয়ে, আর তুই হলি মধ্যবিত্ত বেকার ছেলে। তোর সঙ্গে পর্মিলির কীসের সম্পর্ক?

সুরেন চুপ করে রইল। কোনও উত্তর দিলে না।

দেবেশ বললে—তুই কি চিরটাকাল একরকম রয়ে গেলি? বড়লোক হলেই কি তুই তাদের পা চাটবি? দ্যাখ, কথায় আছে—পতি পরম গুরু। মেয়েদের খোঁপার চিরুণীতে সেকালে বড় বড় অক্ষরে লেখা থাকতো। তোরও দেখছি তাই। তুইও তোর গায়ে একটা সাইন বোর্ড ঝুলিয়ে দিয়ে তাতে লিখে রাখ—পুঁজিপতি পরম গুরু। পুঁজিপতিদের ওপরে তোর এত কিসের ভালবাসা? তুই না আমাদের পার্টির মেম্বার? আমাদের পার্টির মেম্বার হয়ে তুই কী বলে পর্মিলির সঙ্গে ঘুরে বেড়াস? ও তোকে টাকা দেবে? ও তোকে বিয়ে করবে?

সুরেন বলে উঠলো—কী যে বলিস তুই?

দেবেশ বললে—ঠিকই বলেছি। তুই একথা কখনও ভাবিসনি যে ওকে তুই বিয়ে করতে পারবি। সেদিকে বুর্জোয়া মেয়েরা খুব সেয়ানা। সময় বুঝে তোকে লাথি মেরে নর্দমায় ফেলে দেবে। তুই বুর্জোয়াদের এখনও চিনতে পারলি না। ওরা এক-একটা শয়তান। তা জানিস?

সুরেন বললে—জানি—

দেবেশ বললে—ছাই জানিস! জানলে আর মেয়েটার পা চাটতে ডায়মণ্ড-হারবারে যেতিস না।

তারপর একটু থেমে বললে তা না হয় গেছিস বেশ করেছিস, তা পর্মিলির সঙ্গে যদি তোর এতই ভাব তো তাহলে তুই ওকে দিয়ে নিজের কাজ গুছিয়ে নে—

সুরেন বুঝতে পারলে না। বললে—কী কাজ?

দেবেশ বললে—সেই কথা বলতেই তো এত ভোরে সব কাজ ফেলে তোর কাছে এসেছি। তাহলে শোন। যদি নিজের ভালো চাস, যদি তুই দেশের ভালো চাস তো আমি যা বলছি তাই কর—

সুরেন বললে—কী? পর্মিলির সঙ্গে মিশবো না তো?

দেবেশ বললে—না, তুই মিশবি এবং আরো বেশি করে মেলামেশা করবি। এ সম্বন্ধে তোর সঙ্গে নিরিবিলিতে বসে কথা বলতে হবে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে হবে না, তোর ঘরে গিয়ে বসে বলবো, চল—তোর ঘরে যাই—

দেবেশকে নিয়ে সুরেন তার নিজের ঘরে এসে বসলো।

অত সকালে তখনও বিছানাটা পরিষ্কার করা হয়নি। সারা ঘরটাই অগোছালো রয়েছে বলতে গেলে।

দেবেশ একেবারে সুরেনের বিছানাটার ওপরেই বসে পড়লো।

[illegible] এই কথাটা [illegible] ভোরবেলা সব ফেলে চলে এলুম আসলে [illegible] আমার মাথায় [illegible] দিলে।

[illegible]

[illegible] পর্মিলি [illegible]

[illegible] পর্মিলিকে [illegible]

[illegible] করতে হবে

[illegible]

তাও তোকে করতে হবে।

—জোরজবরদস্তি? তার মানে?

দেবেশ বললে—জোরজবরদস্তি মানে বুঝিস না? মানে ফোর্স! ফোর্স এ্যাপ্লাই করতে হবে। সহজে তো কেউ সংস্কার থেকে ছাড়া পেতে চায় না। বরাবর তো ওরা পুণ্যশ্লোকবাবুর আওতার মধ্যে মানুষ হয়েছে, পুণ্যশ্লোক-বাবুর টাকা, প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি, সব ওদের রক্তের মধ্যে জড়িয়ে একাকার হয়ে গিয়েছে। ওসব থেকে বেরিয়ে আসা কি সহজ? তোকে ওদের টেনে বার করে বাইরে আনতে হবে।

তারপর একটু থেমে বললে—তুই এক কাজ কর, ওর কথায় তুই ওঠবোস কর, শেষে তোকে যদি ওর পছন্দ হয় তো একদিন তোর কথাতেই ও ওঠবোস করবে—

—তাতে লাভ?

দেবেশ বললে—তাতে আমাদের পার্টিরই লাভ- তুই যা বলবি তাই-ই ও শুনবে। তুই যদি ওর বাবার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বলিস তো তাই-ই ও দেবে। ওর বাবার বিরুদ্ধে ভোটও দেবে।

সুরেন বললে--তাই কখনও কেউ দেয়?

দেবেশ বললে—নিশ্চয়ই দেবে। তুই একটু জোরজবরদস্তি করলেই দেবে--

—কী করে জোরজবরদস্তি করবো?

--তা সেটাও কি তোকে শিখিয়ে দিতে হবে? তুই বেটাছেলে, তাও জানিস না? একসঙ্গে তো তোরা বেড়াতে বেরোস! নিরিবিলিতে কথাবার্তাও বলিস, বলিস না?

সুরেন বললে--তা হয়ত বলি।

—আর কী করিস?

--কী আর করবো, শুধু কথা বলি।

—শুধু কথা বলিস? কী এত তোদের কথা?

সুরেন বললে—কী কথা বলি, তার কোনও মানে নেই। আজেবাজে সব রকমের কথাই হয়। কালকে তো পর্মিলি আমাকে জোর করে নিয়ে গেল ডায়মন্ডহারবারের দিকে। একেবারে নির্জন ধানক্ষেতের কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে বসালে...

—তারপর?

সুরেন বললে—তারপর অনেক কথা। পর্মিলি খুব কষ্টে আছে, জানিস? কাউকে যেন বলিসনি তুই, ও আত্মহত্যা করতে চায়।

দেবেশ বললে—সে কী রে? তোরা কি প্রেমে পড়ে গেছিস নাকি? প্রেমে পড়ে হাবুডুবু খেলে অনেক সময় তো ওই রকম আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করে। তুই দেখছি মরবি, নির্ঘাৎ মরবি—

সুরেন বললে—দূর, তা নয়। আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে গেলে আমি কী করবো?

দেবেশ বললে—তা আত্মহত্যা করতে চাইছিল কেন! কষ্টটা কীসের? তোকে বিয়ে করতে চায়?

--দূর! তা কেন? এত লোক থাকতে আমার মত গরীব লোককে বিয়ে করবে কেন? আমার চালচুলো কিছু আছে?

দেবেশ বললে—ওসব কথা ছাড়, প্রেমের ব্যাপারে চাল-চুলোর দরকার হয়

না। এত বয়সে হলো তোর, আর এটা বুঝলি না? তুই দেখছি এখনও নাবালক আছিস এ ব্যাপারে। যা'হোক, খুব মজার ব্যাপার তো? তারপর? তারপর কী হলো?

সুরেন বললে—এসব কথা তোকে বলেই বলছি, কাউকে বলিসনি যেন।

—তা না-হয় বললাম না, কিন্তু তারপর কী হলো তাই বল না?

সুরেন বললে—তারপর ব্যাগ থেকে দুটো স্লীপিং-পিলের ফাইল বার করে খেতে যাচ্ছিল, আমাকেও খেতে বলছিল। বলছিল, দুজনে একসঙ্গে মরবো—

দেবেশ উত্তেজিত হয়ে উঠলো। বললে—খুব ইণ্টারেস্টিং তো—তারপর?

—তারপর আমি ফাইল দুটো কেড়ে নিলুম। নিয়ে চলে আসছিলুম, শেষকালে কোনও উপায় না পেয়ে ও আমার পেছন পেছন চলে এলো। কারণ ততক্ষণে কিছু লোকের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। কিন্তু রাস্তায় এসে দেখি গাড়িটা তার উধাও হয়ে গেছে। শেষকালে অনেক কষ্টে ডায়মণ্ডহারবারে ফিরে গিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরে ওকে বাড়িতে পেঁীছিয়ে দিই।

—তারপর?

সুরেন বললে—তারপর রাত্রে ঘুমোতে ঘুমোতে ভাই একটা বিচিত্র স্বপ্ন দেখলুম। স্বপ্ন দেখলুম যেন আমাকে পুলিশ এ্যারেস্ট করতে এসেছে। পুলিশ বললে, আমি নাকি পর্মিলিকে মার্ডার করেছি। কিন্তু খানিক পরেই আমার ঘুম ভেঙে গেল।

তারপর একটু থেমে বললে—সেই তখন থেকে আর ঘুম আসেনি। মনটা তখন থেকেই এত খারাপ লাগছিল, তারপর বাড়ি থেকে বাইরে বেরিয়ে পড়েছিলুম—

দেবেশ বললে—তাহলে তো খুব সুখবর রে!

—কেন?

—সুখবরই তো!

দেবেশ যেন হঠাৎ এতদিনে একটা প্রতিশোধ নেবার মত উপায় পেয়ে গেছে। সে উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে উঠে পড়লো। বললে—খুব সুখবর, তুই কিছু ভাবিসনি, আমি কাউকে বলবো না। এখন তোর একমাত্র কাজ পর্মিলির সঙ্গে রোজ মেলামেশা করা। ওকে দিয়ে এখন থেকে তোকে অনেক কাজ করাতে হবে। বুর্জোয়াদের হারিয়ে দিতে গেলে এর চেয়ে বড় অস্ত্র আর নেই—

সুরেন তবু কিছুই বুঝতে পারছিল না। বললে—তুই কী বলছিস আমি বুঝতে পারছি না—

দেবেশ বললে—ওকে এনকোয়ারি কমিশনে একজন সাক্ষী করে দে না। সেখানে ও তার বাবার পার্টির বিরুদ্ধে বলুক—তারপর সামনে ভোট আসছে, সেই ভোটে বাবার বিরুদ্ধে ক্যামপেন করুক—

সুরেন বললে—কিন্তু সে ব্যাপারে সে আমার কথা শুনবে কেন?

দেবেশ বললে—যদি না শোনে তো তার কীসের ক্ষমতা? তোর সঙ্গে এত মিশছে, আর তুই তার দুর্বলতার সুযোগ নিতে পারবি না?

—যদি না পারি?

দেবেশ বললে—আগে থেকেই হতাশ হচ্ছিস কেন? চেষ্টা কর, নিশ্চয়ই পারবি। রাশিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টির হিষ্ট্রি পড়িসনি? ট্রটস্কির কী হলো?

সুরেন বললে ট্রটস্কি তো খুন হয়েছিল? আমিও কি খুন করবো?

দেবেশ বললে—দরকার হলে তা তুই করবি না?

খুনের কথা শুনে সুরেনের বুকটা দুরদুর করে কেঁপে উঠলো। কালকের রাতের কথা মনে পড়লো, স্বপ্নের কথাটাও মনে পড়লো। দেবেশের মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে থেকে কথাটার মানে বোঝবার চেষ্টা করলে সুরেন। এ কী বলছে দেবেশ? পমিলিকে খুন করতে বলছে?

খুন। খুন কল্পনা করতে গিয়েই সুরেনের চোখের সামনে এক ঝলক রক্ত ভেসে উঠলো। লাল টকটকে তাজা রক্ত। তার সমস্ত মাথাটা ঘুরতে লাগলো। সে কি না প্রয়োজন হলে পমিলিকে খুন করবে?

দেবেশ তখনও দাঁড়িয়ে ছিল।

সুরেনের অবস্থা দেখে অভয় দিলে। বললে—তুই অত ভাবছিস কী? আমি কি তোকে সত্যি সত্যিই খুন করতে বলছি? বলছি, যদি শেষ পর্যন্ত রাজী না হয় তো খুনই তোকে করতে হবে। খুনের ভয় দেখাতে হবে। আমাদের এ্যাগ্রেসিভ না হলে চলবে না। বুর্জোয়াদের সহজে তাড়ানো যাবে না, এমনভাবে ওরা জাল পেতে রেখেছে সব জায়গায়, ওখান থেকে ওদের হঠাতে গেলে আমাদের শুধু মীটিং আর মিছিল করলে চলবে না, এ্যাগ্রেসিভ হতে হবে—

হঠাৎ বাইরে যেন কার জুতোর আওয়াজ হলো। জুতোর আওয়াজ শুনে দেবেশ চুপ করে গেছে। সুরেন বাইরের দিকে চেয়ে দেখলে মামা আসছে!

ভূপতি ভাদুড়ী সরাসরি ঘরে ঢুকে দেবেশকে দেখে একটু থমকে দাঁড়ালো। দেবেশ বললে—ঠিক আছে, তাহলে ওই কথা রইল, আমি আসি—

বলে চলে গেল।

ভূপতি ভাদুড়ী জিজ্ঞেস করলে—ও ছোকরা কে রে?

সুরেন বললে—তুমি কী বলতে এসেছিলে বলো, ও আমার একজন বন্ধু—

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—তা এই এত ভোরেই বন্ধু? কাল অত রাত্তিরেও দেখলুম বন্ধু, আজ এত ভোরেও দেখছি বন্ধু। দেখছি তোর বন্ধুরাই তোকে খাবে। একটা সৎ পরামর্শ দেবার নাম নেই, কেবল ধান্দা নিয়ে তোর পেছনে ঘুরছে। কী চায় ওরা, টাকা? তোর টাকা দেখেছে বুঝি? আর টাকা যদি না হয় তো এত কীসেব কথা? কী এত কথা থাকতে পারে তোদের মধ্যে? রাত্তিরে কথা বলেও শেষ হলো না, আবার ভোরবেলা এসেছে?

সুরেন বললে—আমার ব্যাপারে তোমার এত মাথাব্যথা কেন, তুমি কী বলতে এসেছিলে বলো না—

ভূপতি ভাদুড়ী বুঝলো সুরেন রেগে গেছে। তাই একটু নরম হয়ে গেল সে। বললে—আরে রাগ করছিস কেন তুই? আমি রাগের কথা কী বলেছি তোকে?

বলে ট্যাঁক থেকে দুটো দশ টাকার নোট বার করলে। বললে—এটা রাখ, রেখে দে—সোমত্থ ছেলে, হাতখরচের টাকা তো তোর দবকাব, নে—

সুরেন বললে—টাকা তো এখন আছে আমাব কাছে—

তা হোক, এখন নে। তারপর যখন তোর নিজের টাকা হবে, তখন না-হয় তুই-ই আমাকে দিস। এখন টাকা নে--

সুরেন নোট দুটো নিয়ে পকেটে রেখে দিলে।

ভূপতি ভাদুড়ী যেন একটু আশা পেলে। গলাটা একটু নিচু করে বললে—ওরে তোর ভালোর জন্যেই আমি এত বলি, নইলে কার জন্যে আমার এত ভাবনা? আমি আর ক'টা দিন! তখন এসব সম্পত্তি তো তোরই হবে। তখন তুই-ই আয়েস করে পায়ের ওপব পা তুলে দিয়ে বসে থাকবি। তখন বুঝবি তোর

মামা তোর জন্যে কী করেছিল!

সুরেন এবারে বললে—যা বলবার বলো শুনি, অত ভণিতা করছো কেন? কিছু কাজ করতে হবে?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—কাজের কথা বলতেই তো এসেছি রে। তা আমার ওপর অত চটছিস কেন? আমি তো তোর ভালোর জন্যেই বলছি—

সুরেন হঠাৎ বললে—সুখদাকে তুমি দুর্গাচরণ মিত্তির স্ট্রীটে রেখে দিয়ে এসেছ?

ভূপতি ভাদুড়ী আকাশ থেকে পড়লো। বললে—সুখদা? সুখদাকে আমি কোথায় রেখে এসেছি, বললি?

—দুর্গাচরণ মিত্তির স্ট্রীটে!

—দুর্গাচরণ মিত্তির স্ট্রীটে আমি সুখদাকে রেখে এসেছি? কে বললে তোকে? কোন্ হারামজাদা বললে? তাকে ডেকে নিয়ে আয় আমার কাছে, দেখি সে কত বড় সত্যিবাদী। আমার মুখের ওপর সে বলুক ওই কথা। কত বড় তার বুকের পাটা দেখে নিই—ডেকে আন তাকে—

সুরেন বললে—তা তুমি সব পারো মামা, তোমার অসাধ্য কিছু নেই। টাকার জন্যে তুমি সব পারো।

ভূপতি ভাদুড়ীর গলাটা ধরে এল। চোখ দুটোও বুঝি ভিজে ভিজে হয়ে উঠল একটু। হঠাৎ সুরেনের মুখোমুখি তক্তপোষের ওপরটায় বসে পড়লো।

বললে—হ্যাঁ রে, তুই আজ আমায় এই কথা বললি? যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর? টাকা কি আমি নিজের জন্যে চাইছি? টাকা নিয়ে কি আমি সগ্যে যাবো? তোর বাবা যখন মারা গেল, তখন আমি না থাকলে কে তোকে দেখতো? কে তোকে ছোটবেলা থেকে খাইয়ে-পরিয়ে মানুষ করেছে? কে তোকে গাঁটের পয়সা খরচ করে বি-এ পাশ করিয়েছে? এখন আমিই তোর কেউ না, আর তোর কাছে তোর বন্ধুরাই হলো সব? তারাই হয়ে গেল আপন আর আমিই পর?

সুরেন চুপ করে রইল।

ভূপতি ভাদুড়ী একটু যেন ঠাণ্ডা হলো। বললে—তা রাগারাগির কথা থাক গে, কাজের কথা বলি—উকিলবাবু এসেছিল, বুঝলি, তাকে বলে-কয়ে বুঝিয়ে সব ঠিকঠাক করিয়েছি, তোকে একবার যেতে হবে তাঁর কাছে। কবে যেতে পারবি? কাল সময় হবে তোর? সকালে?

সুরেন বললে—হবে।

—তাহলে ঠিক মনে থাকে যেন, আমায় যেন আবার মনে করিয়ে দিতে না হয়।

বলে ভূপতি ভাদুড়ী ঘরের বাইরে বেরিয়ে চলে গেল।

তখন যে সে কী জটিল সমস্যা তা সুরেনের আজও মনে আছে। দেবেশের কথাগুলো তখনও তার মনের মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছিল। একদিকে দেবেশদের অনুরোধ, অন্যদিকে জীবনের তাগিদ। সকলের সব তাগিদ মিটিয়ে বেঁচে থাকা। সেই সংগ্রামের কথা কোনও দিন কি ভুলতে পারবে সে? সেই একচোয়ারি

কমিশন, সেই ভোট, সেই খুনের আসামী হয়ে কোর্টের কাঠগড়ায় দাঁড়ানো। কত ঝঞ্ঝাটই গেল তার জীবনটার ওপর দিয়ে!

—বলুন, ফরিয়াদীর কন্যাকে খুন করার পেছনে আপনার কী স্বার্থ ছিল?

—আমি খুন করিনি!

—আপনি যদি খুন না করে থাকেন তো আপনি চলে আসার পরই কেন তাঁর মৃতদেহ দেখতে পাওয়া গেল?

মাঝে মাঝে তার মাথার মধ্যে এখনও কথাগুলো প্রতিধ্বনি তোলে। একলা থাকলেই আজকাল একগাদা ভাবনা এসে মাথায় ঢোকে। আর মনে হয় যেন তার আশা করবার আর কিছু নেই, আকাঙ্ক্ষা করবারও আর কোনও কিছু নেই। সে যেন অনড়-অসাড় হয়ে জীবনধারণ করছে।

কোথা দিয়ে সেই দিনগুলো সেই মাসগুলো সেই বছরগুলো চলে গেল, আজ ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। তখন কেবল ভাবতো, কেমন করে সে সেই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবে! কেমন করে মামার ষড়যন্ত্র থেকে সে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে আনবে। কেমন করে দেবেশদের পার্টির আওতা থেকে সে দূরে কোথাও নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে।

ক'দিন থেকেই সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেত। কোথাও গিয়ে সে স্বস্তি পেত না। অথচ বাড়িতেও যেন তার আশ্রয় ছিল না। সকালবেলা খেয়েদেয়ে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়তো নিরুদ্দেশের পথে। একেবারে গঙ্গার ধারে গিয়ে জাহাজ-ঘাটার কাছে চুপ করে বসে থাকতো। সেখানে কুলি-মজুররা মাথায় করে মোট বইতো। জাহাজটা বলা-নেই-কওয়া-নেই হঠাৎ খাপছাড়া সুরে ভোঁ বাজিয়ে দিত। আবার কখনও বা দেখতো পায়ের কাছে দেবেশদের পার্টির মত পিঁপড়ের দল এঁকেবেঁকে সার বেঁধে কোথায় হামলা করতে চলেছে। ঠিক যেমন করে তারা রাইটার্স বিল্ডিং-এর দিকে হামলা করতে যায়। দূর থেকে কখনও কখনও আওয়াজ ভেসে আসতো—ইনক্লাব জিন্দাবাদ—ইনক্লাব জিন্দাবাদ!

আবার কখনও কখনও কানে আসতো—বন্দে মাতরম্—বন্দে মাতরম্—

একদিন সুরেন সকালবেলার দিকে ঐ পথে যেতে যেতে দেখলে একজন সাধুকে ঘিরে একদল লোক জড়ো হয়েছে। ভেতর থেকে ধুনির আগুনে ধোঁয়া উঠছে আর সাধুবাবা একমনে গাঁজার কলকে টানছে।

সুরেনও আস্তে আস্তে সেখানে গিয়ে দাঁড়ালো। বেশির ভাগই কুলি-মজুর লোক। দেবেশরা যাদের বলে মেহনতী মানুষ, তারা। তারা সবাই হাত দেখাচ্ছে সাধুবাবাকে। সবারই এক প্রশ্ন—বাবা আমার কী হবে বলে দাও—

হঠাৎ তাদের মধ্যে কেমন একজন বুর্জোয়া শ্রেণীর লোক দেখে সবাই বোধ-হয় একটু সমীহ করে তাকে বসবার জায়গা ছেড়ে দিলে। কিন্তু সুরেন বসতে গিয়েও সেখানে বসলো না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সাধুবাবার কাণ্ডকারখানা দেখতে লাগলো। সাধু গাঁজা খায় আর সকলের ভবিষ্যৎ বলে দেয়—

মনে আছে, সেদিন সে কিছুই জিজ্ঞেস করতে পারেনি সাধুকে। বা জিজ্ঞেস করার ইচ্ছেও হয়নি তার। নিজের মনের জগতে সে বন্দী হয়ে আছে, সেখানে তো বাইরের লোকের প্রবেশ নিষেধ।

বাড়িতে ফিরে এলেই প্রতিদিন বাহাদুর সিং খবর দেয় কে কে ভাগনেবাবুকে খুঁজতে এসেছিল—

সুরেনের মনে হতো, আসুক। যাসুক সবাই তাকে খুঁজতে। এলে তো সেই তারাই আসবে সেই দেবেশ, নয়তো টুনু। কিংবা সুব্রত, নয়তো পাঁচালি। আর

নয়তো সেই কালীকান্ত! কিন্তু সবাই তো তার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে তার যন্ত্রণার কারণ হয়ে আছে। তাদের সকলকে এড়াবার জন্যেই তো সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

সেদিন সাধুবাবা একেবারে একলা বসে ছিল। এমন কখনও হয় না। চারিদিকে পোড়া কাঠ, ছাইএর গাদা, আর গাঁজার কলকে নিয়ে একা চুপ করে বসে ছিল।

সাধুবাবা ডাকলে সুরেনকে। বললে—আয় বেটা, আয়—

সুরেন সামনে গিয়ে বসতেই সাধুবাবা ভাঙা হিন্দীতে তার অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যতের সমস্যাগুলো সব গড় গড় করে বলে যেতে লাগলো।

—বেটা, খুব সাবধানে থাকবি, সামনে তোর খুব বিপদ আছে রে—

এতদিন পরে সেই সাধুবাবাকে আর একবার দেখতে পেলে আরো অনেক কথা জিজ্ঞেস করতো সুরেন। কিন্তু সেদিন তাকে বুজরুক মনে করে সুরেন চলেই তো এসেছিল। কিন্তু কেন বিশ্বাস হয়নি তার কথা? অসম্ভব অবাস্তব অযৌক্তিক বলে? কিন্তু এতদিন বেঁচে সুরেন আজও বলতে পারে না, কোন্‌টা অবাস্তব আর কোন্‌টাই বা অসম্ভব!

—একদিন তোর ফাঁসি হবে, খুব সাবধান!

—ফাঁসি? ভয়ে নীল হয়ে গিয়েছিল সুরেন। এমন কথা তো সে কখনও কল্পনাও করেনি।

জিজ্ঞেস করেছিল—কেন ফাঁসি হবে? কী অপরাধ?

—খুনের অপরাধে। তুই একজনকে খুন করবি বেটা। তোর নসীবে অনেক হয়রানি আছে বেটা, অনেক হয়রানি। রাম নাম জপ কর, সব দুঃখকষ্ট দূর হবে তোর—

—কাকে খুন করবো?

—একঠো আওরাতকে!

জীবনে পরম-লগ্ন একবারই আসে। সেই পরম-লগ্নে যদি কোনও বাধা আসে তো চিরকালের মত তা স্থায়ী হয়ে যায়। সেসব দিনের কথা ভাবতে বসলে সুরেনের আজও চোখ দুটো ছল ছল করে ওঠে। মিথ্যে দিয়ে মানুষ ক'দিন সান্ত্বনা পায়? সত্যকে ঢেকে রাখলে একদিন মিথ্যেটাই স্থায়ী হয়ে জীবনকে বিড়ম্বিত করে। তখন মিথ্যেটাই সত্যি হয়ে যায়।

সুরেনের এখন তাই-ই হয়েছে। পুরোন দিনগুলোর দিকে চেয়ে দেখলে সমস্ত জীবনটাকেই ফাঁকা মনে হয়, মনে হয় সমস্ত জীবনটাই তার ব্যর্থ হয়ে গেছে।

কোর্টের মধ্যে সেদিনও এক ভাবে জেরা চলছে। সেই একই প্রশ্ন, সেই একই ধরনের উত্তর।

প্রশ্ন হলো—যেদিন মিছিল চলছিল সেদিন আপনি কোথায় ছিলেন?

উত্তর দিলে সাক্ষী। বললে—আমি ধর্মতলায় গিয়েছিলুম কেনাকাটা করতে—

আপনি কি পুলিশ দেখতে পেয়েছিলেন?

সাক্ষী উত্তর দিলে—দেখেছিলুম। দেখেছিলুম দলে দলে পুলিশ লাঠি-বন্দুক নিয়ে ফুটপাথে পাহারা দিচ্ছে—

—কত পুলিশ হবে আন্দাজ?

—তা আন্দাজ পাঁচ ছ'শো পুলিশ হবে।

—মিছিল কি শান্ত ছিল? তারা কি মুঠি পাকিয়ে শ্লোগান দিচ্ছিল?

—মিছিলের ছেলেমেয়েরা বেশ শান্তভাবেই শ্লোগান দিতে দিতে এগিয়ে যাচ্ছিল।

—তাহলে পুলিশ হঠাৎ অকারণে ক্ষেপে গেল? পুলিশের গায়ে আঘাত না লাগলে সে কেন মিছিলকে আক্রমণ করতে যাবে? কেউ কারো কাছ থেকে আঘাত না পেলে কি কাউকে আক্রমণ করে? এক হাতে কি তালি বাজে!

সাক্ষী উত্তর দিলে—বাজে।

—কী রকম?

সাক্ষী বললে—যদি দুটো পার্টিতে ঝগড়া বাধে তো একটা পার্টির লোক অনেক সময় অন্য পার্টিকে প্ররোচনা দিয়ে ক্ষেপিয়ে তোলে।

প্রশ্ন হলো—এখানে কে প্ররোচনা দিয়েছিল?

সাক্ষী বললে—পুলিশ! কংগ্রেসের হাতেই এখন পুলিশ। কংগ্রেস গভর্ণমেণ্টের হাতেই পুলিশের চাকরি নির্ভর করছে। সেই কংগ্রেস গভর্ণমেণ্টই পুলিশকে দিয়ে প্ররোচনা দিয়েছিল মিছিলের লোকদের, যাতে মিছিল ক্ষেপে যায়—

—তা আপনি এসব বুঝলেন কী করে?

সাক্ষী উত্তর দিলে—রাস্তার লোক তাই-ই বলাবলি করছিল—

—তা রাস্তার লোক যে সত্যি কথা বলছে তা আপনি কী করে জানলেন?

সাক্ষী বললে—যখন সবাই-ই একই কথা বলে তখন তার মধ্যে কিছু সত্যি কথা থাকে না কী?

—তা সে-কথা থাক, আপনি সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী দেখলেন?

সাক্ষী যা-যা দেখেছিল সব বলে গেল। কেমন করে পুলিশ নিরীহ নিরস্ত্র মিছিলের লোকদের ওপর গুলী চালিয়েছে। কেমন করে রাস্তায় যাকে পেয়েছে, তাকে মিছিলের লোক মনে করে লাঞ্ছিত করেছে। সমস্ত হলসুদ্ধ লোক নির্বাক স্তব্ধতায় বসে বসে সেসব বিবরণ শুনতে লাগলো। শুধু একজন নয়, একটা পার্টি নয়, বিভিন্ন লোকের মুখে সেই একই কথা শুনতে শুনতে মানুষ গভর্ণমেণ্টের নিষ্ঠুরতার বীভৎসতায় স্তম্ভিত হয়ে গেল। মানুষের মনে হলো তারা যেন ষোড়শ সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীর সামন্ততন্ত্রের যুগে বাস করছে, বিংশ শতাব্দীর কলকাতায় যেন নয়, অতীতের আফ্রিকার জঙ্গলে যেন বাস করছে! তারপর যখন তারা হল ছেড়ে বাইরে আসে, তখন বাইরের আলো-ঝলমল রাস্তা-ঘাট মোটর নিওন্‌সাইন দেখে তারা যেন কেমন হতবুদ্ধি হয়ে যায়। তাদের মনে হয়, এ কোথায় এলুম! এই কি তাদের চিরকালের সেই চেনা কলকাতার চেহারা? এই কি তাদের, আর তাদের পিতৃ-পুরুষের চিরকালের জন্মভূমি?

সেদিন হঠাৎ প্রজেশ সেন গাড়িতে করে যেতে যেতে একেবারে সুরেনের পাশ ঘেঁষে এসে দাঁড়ালো।

সুরেন একলা একলা রাস্তা দিয়ে হাঁটছিল। হঠাৎ একটা গাড়ি পাশে এসে

দাঁড়াতেই সে এক-পা সরে গেল।

—এ কি, মিষ্টার সান্ন্যাল, তুমি এখানে?

সুরেন অবাক হয়ে দেখলে, প্রজেশ সেন ষ্টিয়ারিং ধরে বসে আছে। বললে—আপনি?

প্রজেশ চুরোটটা মুখ থেকে সরিয়ে হাসলো। বললে—আমার কথা ছেড়ে দাও, আমার এখন সকাল থেকে নাইবার-খাবার সময় নেই। এইতো সেই কোন্ সকালে বেরিয়েছি, এখনও পেটে কিচ্ছু পড়েনি।

—এত কীসের কাজ?

প্রজেশ সেন বললে—আর কীসের, ভোটের! তুমিও তো ভোটের কাজ করছো।

—আমি?

সুরেন আবার বললে—আমি কার ভোটের কাজ করছি? আমি তো কিছু কাজই করছি না। চাকরি-বাকরিও নেই যে অফিস-কাছারি যাবো।

প্রজেশ বললে—কেন, পুণ্যদা তো চাকরি দিয়েছিল তোমাকে, তুমি তো ছেড়ে দিলে—

সুরেন বললে—ছাড়িনি ঠিক, তিনিই আমায় ছাড়িয়ে দিলেন।

প্রজেশ সেন সেসব কথা জানে। বললে—চাকরি তুমি করতে চাও? করতে চাও তো বলো।

সুরেন বললে—চাকরি কে না করতে চায় বলুন! চাকরি মানেই তো নিজে খেটে আয় করা। কে না নিজের আয়ে চালাতে চায়? আমার তো নিজের আয় বলে কিছু নেই—

প্রজেশ সেন বললে—তা এতদিন সেকথা বলোনি কেন?

সুরেন বললে—আমি তো আগেই আপনাকে বলেছিলুম। চাকরি খুঁজতেই তো গিয়েছিলুম আপনার অফিসে। সেখানেই তো প্রথম আপনার সঙ্গে আলাপ—

প্রজেশ সেন বললে—তাহলে এসো, উঠে এসো আমার গাড়িতে, উঠে এসো—

বলে গাড়ির দরজাটা খুলে দিলে।

সুরেন গাড়িতে উঠে বসে বললে—কোথায় যাবেন?

প্রজেশ সেন বললে—আমার বাড়িতেই চলো না, তোমার কোনও কাজ নেই তো এখন?

সুরেন বললে—এখন আপনার বাড়িতে গিয়ে মিছিমিছি কী করবো?

প্রজেশ এখন গাড়ি চালাতে আরম্ভ করেছে, গাড়ি চালাতে চালাতে বললে—সারা দিন খুব খাটুনি গেছে, তাই এখন একটু বাড়িতে যেতে চাই।

সুরেন বললে—বরং অন্য একদিন যাবো, আমাকে গ্রে স্ট্রীটের মোড়ে নামিয়ে দিন—

প্রজেশ সেন বললে—তা তোমরা কী রকম কাজ করছো? তোমাদেরও তো খুব খাটুনি চলছে

সুরেন বললে—আমার কথা বলছেন? আমি কোথায় খাটছি?

—কেন? পূর্ণবাবুর হয়ে তুমি খাটছো না? আমি তো দেখেছি রাস্তার মোড়ে মোড়ে তুমি গরম গরম লেকচার দিচ্ছ?

সুরেন বললে—সে তো মুখস্থ করা বুলি!

—মুখস্থ করা বুলি হলেও শুনতে খুব ভালো লেগেছে আমার। তুমি

তো খুব রপ্ত করে নিয়েছ হে। বেশ রপ্ত করেছ—তা কত করে তোমাকে দেয় ওরা?

সুরেন অবাক হয়ে গেল। বললে—তার মানে?

প্রজেশ সেন বললে—তোমাকে তো কিছু দেয় ওরা, কত টাকা পাও তুমি? ইলেকশানের তো কিছু খরচপত্তোর আছে!

সুরেন বললে—খরচ তো আছে, কিন্তু লেকচার দেবার জন্যে টাকা খরচ করতে হয় নাকি?

প্রজেশ বললে—তা খরচ করতে হয় না? এই যে আমি পুণ্যশ্লোকবাবুর জন্যে খাটছি, টাকা পাচ্ছি না?

—আপনি টাকা নিচ্ছেন?

প্রজেশ সেন বললে—তা কাজ করবো পয়সা নেব না? আমাদের পার্টির হয়ে যারাই কাজ করছে, তারাই পয়সা নিচ্ছে। সে ব্রিটিশ আমলে যারা কাজ করতো তারা টাকা নিত না। এখন স্বদেশী আমল, এখন কুটোটি নাড়লে টাকা। এখন টাকা ছাড়া কথা নেই। এখন সব কাজে আগে টাকা। আগাম টাকা চাই—

সুরেন জিজ্ঞেস করলে—যারা লেকচার দেয় আপনাদের পার্টির, তারা কত করে পায়?

প্রজেশ বললে—যারা লেকচার দেয় তারা একটু বেশি পায়। রোজ পনেরো টাকা—

—পনেরো টাকা!

সুরেন বললে—লেকচার দেওয়া তো খুব সহজ। তার জন্যেও পনেরো টাকা?

প্রজেশ বললে—সব জিনিসেরই তো দাম বাড়ছে। আগের বারে ছিল দশ টাকা করে, এইবার বাড়িয়ে পনেরো টাকা করা হয়েছে। তুমি আমাদের পার্টিতে এসো না, তোমাকেও রোজ পনেরো টাকা করে দেবো। তা তুমি কত করে পাও?

সুরেন বললে—আমি তো কিছু পাই না—

প্রজেশ বললে—সে কী, একটা পয়সাও পাও না?

সুরেন বললে—না—

—সত্যি কথা বলছো?

সুরেন বললে—মিথ্যে কথা কেন বলতে যাবো? আমি সত্যিই কিছু পাই না। আর পেলেও আমি নিতুম না—

—কেন, নিতে না কেন?

সুরেন বললে—পয়সা নিয়ে ভাড়াটে স্বদেশীপনাতে আমি বিশ্বাস করি না।

প্রজেশ সেন বললে—তুমি দেখছি এখনও ছেলেমানুষ আছ। দিনকাল বদলে গেছে তা জানো না? এখন টাকা দিয়ে সব জিনিসের যাচাই হয় তা তো জানো?

সুরেন বললে—লোকে যাচাই করলেও আমি সে ভাবে জিনিসটা দেখি না। আমি বিশ্বাস করি দেশসেবার মধ্যে টাকার নামগন্ধ থাকতে নেই—

প্রজেশ সেন গাড়ি চালাতে চালাতেই হো হো করে হেসে উঠলো।

বললে—তুমি দেখছি মহাপুরুষ একজন—

বলে আবার চুরোট টেনে ধোঁয়া ছেড়ে বললে—ওসব ধারণা বেশি দিন থাকবে না তোমার, একটু বয়েস হলেই বদলে যাবে—

সুরেন বললে—আমার যথেষ্ট বয়েস হয়েছে, ও আর বদলাবার নয়—

প্রজেশ সেন বললে—যদি কুড়ি টাকা রোজ দিই?

সুরেন বললে—কুড়ি হাজার টাকা রোজ দিলেও নয়—

প্রজেশ এবার সুরেনের দিকে একদৃষ্টে একবার চাইলে।

বললে—আমার সামনে যা বললে তা বললে, একথা আর কাউকে বোল না—

—কেন?

প্রজেশ সেন বললে—লোকে হাসবে।

সুরেন বললে—হাসুক। পৃথিবীতে অন্ততঃ একজনও থাকুক যে এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে, বিদ্রোহ করতে পারে—

প্রজেশ সেন বললে—ভালো ভালো—ভেরি গুড—

তারপর একটু থেমে বললে—দেখ, কোনও জিনিসেরই বেশি বাড়াবাড়ি ভালো নয়।

ততক্ষণে গ্রে স্ট্রীটের মোড় এসে গিয়েছিল।

সুরেন বললে—এখানে একটু থামান, আমি নামবো—

প্রজেশ সেন ফুটপাথ ঘেঁষে গাড়ি থামালো।

সুরেন গাড়ি থেকে নামতেই প্রজেশ সেন বললে—আবার একদিন শিগ্গিরই দেখা হবে।

সুরেন বুঝতে পারলে না প্রজেশ সেনের কথাটা। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলে প্রজেশ সেনের দিকে।

—তুমি সেই বাড়িতেই এখনও আছ তো?

সুরেন বললে—হ্যাঁ. কেন?

—আমি তোমাকে আমার বিয়ের নেমন্তন্নর চিঠি দিতে যাবো। আমার বিয়েতে তোমাকে যেতে হবে কিন্তু—

সুরেন আরো অবাক হয়ে গেল। বললে—আপনার বিয়ে? কবে?

প্রজেশ সেন হাসলো। বললে—খুব শিগগিরিই—

—কোথায় বিয়ে হচ্ছে? কার সঙ্গে?

প্রজেশ সেন বললে—পমিলির সঙ্গে—

কথাটা শুনেও যেন বিশ্বাস হলো না সুরেনের। হঠাৎ যেন কেমন মাথাটা ঘুরে গেল। বাড়ির দিকেই সে পা বাড়িয়েছিল, কিন্তু কথাটা শুনেই আবার ফিরে দাঁড়ালো।

জিজ্ঞেস করলে—কার সঙ্গে?

প্রজেশ বললে—পমিলির সঙ্গে। কেন, তুমি জানতে না নাকি? পমিলির সঙ্গে আমার বিয়ের কথা তো বহুদিন আগে থেকেই চলছে। তুমি কি শুনে অবাক হয়ে গেলে নাকি?

সুরেন যেন ঝিমিয়ে পড়লো। বললে—না, এমনি—

বলে আর দাঁড়ালো না সেখানে। আবার মাধব কুণ্ডু লেন ধরে বাড়ির দিকে চলতে লাগলো। কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেল সমস্ত। মনে হলো তার এতদিনকার সমস্ত ধ্যানধারণা. সব কিছু যেন উল্টেপাল্টে গেল। কিন্তু কেন? এইতো সে কাল এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছে। অবশ্য স্বপ্নের কোনও মানে হয় না। স্বপ্ন মানেই মিথ্যে। পমিলিকে সে খুন করতে যাবেই বা কেন? সে তার কে? বরং ওটা তার একটা উদ্ভট স্বপ্ন বললেই ঠিক বলা হয়। কিন্তু শুধু স্বপ্নই বা বলি কেন? তার হাতের দাগে নাকি লেখা আছে, সে একজন মেয়েমানুষকে খুন করবে। সে কি পমিলি, না টুলু, না...। কিন্তু কাউকে খুনই

বা সে করতে যাবে কেন? জীবনে তো কারো সঙ্গে সে ঝগড়া করেনি। কারোর ওপর রাগ করেও কখনও কাউকে সে কড়া কথা বলেনি। তাহলে?

আর, আর এই যে আজ প্রজেশ সেন পর্মিলিকে বিয়ে করতে যাচ্ছে, তাতে তো তার মনও খারাপ হয়নি। কেন মন খারাপ হতে যাবে! পর্মিলিই বা তার কে, আর প্রজেশ সেনই বা কে তার? ওরা দুজনেই তার কেউ নয়! শুধু ওরা দুজন কেন, পৃথিবীতে কেউই তার কেউ নয়। যেদিন থেকে সে পৃথিবীতে এসেছে, সেদিন থেকেই সে ছন্নছাড়া। তার আপন বলতে কেউই নেই এ পৃথিবীতে। সে একলা। একলাই সে থাকতে চায় পৃথিবীতে।

সে তাড়াতাড়ি বাড়িতে এসে নিজের ঘরে ঢুকে গেল।

এই পৃথিবীর পথে চলতে গিয়ে কত মানুষকে কত বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে জীবন অতিক্রম করতে হয়েছে। কেউ বড়লোক, কেউ গরীব, কেউ দেশ-সেবক, কেউ নায়ক। আবার কেউ সংসার সমাজ ছেড়ে বনবাসে গিয়ে সাধন-ভজনের মধ্যে মুক্তির সন্ধান করেছে। কেউ আবার কিছুই করেনি। কিছু করতে পারেনি। শুধু জন্মেছে, চাকরি করেছে, সন্তানের জন্ম দিয়েছে, মামলা-মকদ্দমা করেছে, আবার একদিন মরেও গিয়েছে।

কেন এমন হয়? একজন আপ্রাণ চেষ্টা করলেও কিছু পায় না, আবার একজন না চেষ্টা করতেই সমস্ত কিছু পেয়ে যায়। এরই বা রহস্য কী?

বহুদিন পরে একদিন একজন ভদ্রলোককে সুরেন একথা জিজ্ঞেস করে-ছিল। ভদ্রলোকের অলৌকিক সব ক্ষমতা দেখে সুরেন চমকে গিয়েছিল।

সুরেন জিজ্ঞেস করেছিল—আচ্ছা বলুন তো, কেন এমন হয়? আমি তো সবই পেয়েছিলুম, তবু কেন এমন হলো?

ভদ্রলোক প্রচুর পণ্ডিত। সংসারে থেকেও সংসারের ঊর্ধ্বলোকে বাস করতেন। সুরেনের দিকে চেয়ে হাসলেন।

বললেন—তুমিই বাবা প্রথম এমন একটা প্রশ্ন করলে, এ প্রশ্ন তো আজ পর্যন্ত কেউ করেনি আমার কাছে—

তারপর আপাদমস্তক ভালো করে দেখে নিয়ে বললেন—তুমি জীবনে অনেক আঘাত পেয়েছ?

সুরেন বললে—অনেক—

ভদ্রলোক হেসে বললেন—খুব ভাগ্যবান তুমি ঈশ্বর যাঁদের ওপর বিশেষ কৃপা করেন, বেছে বেছে তাঁদেরই তিনি বেশি আঘাত দেন—

তারপর একটু থেমে বললেন—আঘাত না পেলে কি তুমি ঈশ্বরের কথা ভাবতে, না আমাকেই তুমি ওই প্রশ্ন করতে! তুমি আর একদিন আমার কাছে এসো বাবা।

সত্যিই তারপরে একদিন আবার গিয়েছিল সুরেন তাঁর কাছে। অনেক কথা তিনি বললেন। কিন্তু সেকথা এখন থাক...

আগে টুলুর কথা বলি। পর্মিলির কথা বলি। সুখদার কথাও বলি। কত মানুষের কথা বলবো! কত ঘটনার কথা বলবো!

সেদিন মাধব কুণ্ডু লেনের গেটের সামনে সুব্রত এসে গাড়ি থামালো।

বাহাদুর সিং সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল যথারীতি। সুব্রত জিজ্ঞেস করলে বাবু আছে?

—হাঁ হুজুর—

বলে সেলাম করলে। সুব্রত উঠোন পেরিয়ে সুরেনের ঘরে যেতেই থামলো।

সেখানে দেবেশও রয়েছে, সুরেনও রয়েছে। তারা দুজনে কথা বলছিল তখন সেখানে বসে বসে।

সুব্রত বললে—আমি এসে বাধা দিলাম নাকি?

তিনজনেই এককালে একসঙ্গে এককলাশে পড়েছে। কিন্তু একসঙ্গে তিন-জনের দেখা হলো বহুদিন পরে।

সুরেন বললে—কী হলো, দাঁড়িয়ে আছিস কেন, বোস!

সুব্রত বললে—তোদের কোনও গোপন কথা হচ্ছিল হয়ত, হঠাৎ আমি বিনা-নোটিশে এসে পড়লুম—আর দেবেশ তো সেদিন আমাকে সামনাসামনি গালা-গালিই দিলে।

সুরেন অবাক হয়ে গেল। বললে—কেন? কবে?

সুব্রত একপাশে বসতে বসতে বললে—সেদিন তুই সেই মহিলাটিকে বাড়ি পৌঁছে দিতে বললি, তাই সেই পৌঁছে দেওয়াই আমার অপরাধ হয়ে গেল। ইণ্ডিয়াতে আসার পর দেখছি কলকাতা সহরটাই অন্য রকম হয়ে গেছে।

দেবেশ বললে—পৌঁছিয়ে দেওয়াটা অপরাধ নয়, অপরাধ তার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অতক্ষণ কথা বলা।

সুব্রত বললে—কী কথাটা বলেছি সেটা তো ঠিক দেখলে না, কথা বলেছি সেইটেই অপরাধ হয়ে গেল?

দেবেশ বললে—যার বোন মদ খেয়ে মাতলামি করে, তার ভাই হয়ে ওই রাত্তিরে অচেনা একটা মেয়ের সঙ্গে কথা বলা অন্যায় বই কি!

সুব্রত বলে উঠলো—আমার দেখছি এখানে এ সময়ে আসাই অন্যায় হয়েছে। তোরা কথা বল, আমি উঠছি—

সুরেন বললে—না না, বোস না। আমাদের তেমন কোনো কথা নেই—

দেবেশ বললে—তাহলে আমি এখন উঠি—

বলে উঠে দাঁড়ালো। সুরেন বললে—বোস না, এখুনি যাচ্ছিস কেন?

দেবেশ বললে—আমার আর দাঁড়াবার সময় নেই। আজকে আবার কমিশনের হিয়ারিং আছে। তাছাড়া বরানগরেও মিটিং ডেকেছি, তার জন্যেও তোড়জোড় করতে হবে—

—তাহলে তোর সঙ্গে আবার কবে দেখা হচ্ছে?

দেবেশ বললে—আমি খবর দেবো! এখন এমন কাজ পড়েছে যে, কখন কোথায় থাকি তার ঠিক নেই—ওদিকে প্রজেশ সেন আবার আমাদের লোক ভাঙিয়ে নেবার চেষ্টা করছে, সাবধান না হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে—

সুব্রত বললে—তার চেয়ে তুই বোস দেবেশ, আমিই যাচ্ছি, আমারও কাজ আছে—

দেবেশ সে কথার উত্তর না দিয়ে বললে—তুইও বুঝি সুরেনকে ভাল মানুষ পেয়ে ভাঙচি দিতে এসেছিস?

সুব্রত বললে—তার মানে? ভাঙচি দিতে এসেছি, মানে কী?

দেবেশ বললে—প্রজেশ সেন তো কংগ্রেসের হয়ে সুরেনকে কুড়ি টাকা করে রোজ দিতে চেয়েছিল—

—কেন?

—রাস্তায়, ময়দানে লেকচার দেবার জন্যে। কিন্তু কংগ্রেস জানে না যে টাকা দিয়ে সবাইকে কেনা যায় না। শুধু সুরেন কেন, আমাদের পার্টির অনেককেই কিনতে চেয়েছিল প্রজেশ সেন। তার বদলে পুণ্যশ্লোকবাবু ভোটে জিততে

পারুন আর না পারুন, প্রজেশ সেন তো নিজের কাজ গুছিয়ে নিতে পারবে।

—কী কাজ!

—পুণ্যশ্লোকবাবুর জামাই হতে পারবে।

বলে আর দাঁড়ালো না সে। ঝোলাটা কাঁধে গলিয়ে নিয়ে ঘর থেকে বাইরে রাস্তার দিকে বেরিয়ে পড়লো।

দেবেশ চলে যাবার পর কিছুক্ষণ কারো মুখেই কোন কথা বেরোল না। দুজনেই যেন বোবা হয়ে গেছে!

খানিক পরে সুরেনই বললে—দেবেশের কথায় তুই কিছু মনে করিসনে সুব্রত, দেবেশটা বরাবরই ওই রকম—

সুব্রত সে কথার ধার দিয়ে গেল না। বললে—প্রজেশদার সঙ্গে তোর দেখা হয়েছিল?

সুরেন বললে—হ্যাঁ।

—তোকে কুড়ি টাকা করে রোজ দেবে বলেছিল?

সুরেন বললে—হ্যাঁ—

সুব্রত জিজ্ঞেস করলে—তুই কী বললি?

সুরেন বললে—আমি আর কী বলবো। টাকাটাই যদি বড় কথা হতো তো আমি আমার মামারই খোসামোদ করে চলতুম! আমি যদি একটু খোসা-মোদ করি মামাকে তো আজকে মামাই আবার আমার সঙ্গে অন্য রকম ব্যবহার করবে—

সুব্রত বললে—কিন্তু দেবেশটা আমার ওপর রাগ করেছে কেন? আমি পুণ্যশ্লোকবাবুর ছেলে বলে? আমি কি কংগ্রেসের কেউ?

সুব্রত আরো অনেক কথা বলে গেল। ছোটবেলা থেকে এতবড় হওয়া পর্যন্ত যা কিছু দেখেছে, জেনেছে, শুনেছে সেই সব কথা বলতে লাগলো।

তারপর বললে—জানিস, আজকে বাবার সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়ে গেছে—

সুরেন অবাক হয়ে গেল। বললে—সে কী, কেন?

সুব্রত বললে—প্রজেশ সেনের সঙ্গে পমিলির বিয়ে হচ্ছে—

সুরেন বললে—আমিও শুনেছি, মিষ্টার সেনই আমাকে একদিন বলেছিলেন। পমিলির এ-বিয়েতে মত আছে?

সুব্রত বললে—মতও নেই আবার অমতও নেই—

—কিন্তু এ বিয়ের প্রস্তাবটা দিলে কে?

—আমার বাবা।

সুরেন আরো অবাক হয়ে গেল। বললে—কিন্তু আর কোনও পাত্র পাওয়া গেল না? পমিলি কী বলছে?

সুব্রত বললে—সে তো বহুদিন থেকেই কারো সঙ্গে বিশেষ কথা বলছে না। বাবা কিছু বলতে গেলে চুপ করে থাকে, কোনও উত্তর দেয় না। জানি না তার কী হয়েছে! আমি কথা বলতে গেলেও কোনও জবাব দেয় না। বাবা তো ইলেকশান নিয়ে ব্যস্ত। দিনরাত পার্টির লোকজন আসছে, তাদের কথা শুনতে শুনতেই সারা দিন কেটে যায়, এখন আমাদের কথা শোনবারই সময় নেই—

তারপর একটু ভেবে বললে—বাড়িতে থাকতে ভালো লাগছিল না তাই তোর কাছে এলুম। তোর কাছে এসেও সেই একই বিপত্তি—

সুরেন বললে—তোর চাকরির কী হলো?

সুব্রত বললে—চাকরি তো কলকাতায় পেয়েছিলুম। দু' হাজার টাকা

মাইনে। বাবার একটা কথায় চাকরি হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু নিলুম না। বাবা খুব রাগ করলে—

—কেন? অত টাকা মাইনের চাকরি, ভালোই তো। নিলি না কেন?

সুব্রত বললে—এ চাকরি নিলে কলকাতায় থাকতে হয়। কলকাতায় থাকতে আমার ভালো লাগছে না। মনে হচ্ছে যত শিগগির কলকাতা ছাড়তে পারি ততই ভালো। আমেরিকা থেকে ফিরে আসবার সময় কত আশা ছিল, দেশে ফেরবার জন্যে কত আগ্রহ ছিল। এখন ভাবছি এখানে না ফিরলেই ভালো হতো। বাবা বার বার বলেছিল ইলেকশানের পরে ফিরতে—

সুরেন বললে—আমারও মনটা ভালো নেই, জানিস!

—কেন?

সুরেন বললে—ক'দিন আগে একটা বড় খারাপ স্বপ্ন দেখেছি ভাই। খুব খারাপ স্বপ্ন—

—কী স্বপ্ন?

সুরেন বললে—সে তোর শুনে দরকার নেই। অত খারাপ স্বপ্ন কেউ দেখে না। অথচ আমি জীবনে কারো কোনও ক্ষতির চিন্তাও করিনি।

সুব্রত বললে—আমিই কি কারো কোনও ক্ষতি করতে চেয়েছি? না আমার বাবাই কারো কিছু ক্ষতি করতে চেয়েছে! অথচ কার ভালোটা হচ্ছে?

সুরেন বললে—কিন্তু পমিলির জন্যে আর কোনও ভালো পাত্র পাওয়া গেল না? তোর বাবার এত জানাশোনা! পমিলির মত ভালো মেয়ের কি ভালো পাত্রের অভাব?

সুব্রত বললে—আমাদের সঙ্গে তো পমিলি কথাই বলে না। তুই একবার যাবি পমিলির কাছে?

—আমি?

সুরেন চমকে উঠলো। আবার বললে—আমি? আমার কথা সে শুনবে?

সুব্রত বললে—কিন্তু পমিলি যে আমার সঙ্গেও কথা বলে না। ওকে নিয়ে আমরা কী করি তুই বল?

সুরেন বললে—কিন্তু তোদের বাড়ি গেলে তোর বাবা যদি রাগ করেন আবার? আমাকে দেখে যদি বাড়ি থেকে বার করে দেন? শেষকালে মিছিমিছি একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে যাবে।

সুব্রত বললে—বাবা যখন বাড়ি থাকবে না তখন যাস। এক কাজ কর না, তুই বিকেলবেলা আয় না—আজই—বাবা ও সময়ে থাকেন না বাড়িতে—

সুরেন বললে—আর তুই?

সুব্রত বললে—আমি বরং বাড়ি থাকবো না তখন। আমার তখন না থাকাই তো ভালো—

সুরেন বললে—ঠিক আছে—আমি আজই যাবো'খন—

সুব্রত আবার গাড়িতে গিয়ে উঠলো। সুরেন তাকে এগিয়ে দিয়ে এসে আবার নিজের ঘরে ঢুকলো। কিন্তু ঘরে এসেই কেমন মনে হলো, কেনই বা সে যাবে! কেন সে যেতে রাজী হলো! বাইরের উঠোনে তখন রোদ হেলে গেছে। শান্ত হয়ে এসেছে বাড়ির আবহাওয়া। ওদিকে রান্নাবাড়ির কলতলায় তখন বাসনের ডাঁই জমে গেছে। অন্দরমহলের এঁটো বাসনকোসন এসে জড়ো হয়েছে সেখানে। দুখমোচনরা স্নান করতে শুরু করেছে।

ঠাকুর একসময় এসে বললে—খাবেন না ভাগ্নেবাবু?

সুরেন বললে—আজকে বড় সকাল সকাল তোমাদের হয়ে গেল দেখছি। মামাবাবুও কি খেয়ে নিয়েছে নাকি?

ঠাকুর বললে—হ্যাঁ, তিনি তো কোর্টে গেছেন—

—কোর্টে? কেন?

ঠাকুর বললে—উকিলবাবুর সঙ্গে কাজ আছে বললেন। আর বেলাও কি কম হলো নাকি? ক'টা বেজেছে তা জানেন? বেলা একটা। আপনি তো ভদ্র-লোকদের সঙ্গে ঘরে বসে গল্প করছিলেন, তাই আর ডাকিনি—

সুরেন বললে—ঠিক আছে, তুমি একটু তেল দাও তো, মাখি—

বলে রান্নাবাড়ির পৈঠের সামনে গিয়ে ডান হাতের পাতাটা পাতলো—

বিকেল হয়েছে কি হয়নি, সুরেন গিয়ে হাজির হলো সুকীয়া স্ট্রীটে পুণ্য-শ্লোকবাবুর বাড়িতে। বাড়ির পাঁচিল পোষ্টারে পোষ্টারে ভর্তি হয়ে গেছে। বেশির ভাগই পুণ্যশ্লোকবাবুর দলের পোষ্টার। মাঝে মাঝে দু' একটা পূর্ণ-বাবুর পার্টির। লুকিয়ে লুকিয়ে কখন কোন্ ফাঁকে তারা এসে লাগিয়ে দিয়েছে। কয়েকটা ছেঁড়া।

দারোয়ান চেনে সুরেনকে। সুরেন ঢুকছে দেখে বললে—সাহেব কোঠি মে নেহি হ্যায় হুজুর—

সুরেন বললে—আমি দিদিমণির সঙ্গে দেখা করবো—

—দাঁড়ান, আমি জিজ্ঞেস করে আসি দিদিমণিকে—

বলে ভেতরে চলে গেল। এরকম আগে কখনও ঘটেনি। আগে যখন-তখন সে এসেছে গেছে, কেউ কোনওদিন তাকে কিছু বলেনি। বরং সমীহ করে সেলাম করেছে।

একবার মনে হলো সে বাড়ি ফিরে যায়। সাধ করে এই অপমান কেন সে গিলতে গেল! কেন সে এল এমন করে! সুব্রতর কথায় আজ না এলেই হতো। হয়ত পুণ্যশ্লোকবাবু চাকর-বাকর, দরোয়ান সবাইকেই হুকুম দিয়ে দিয়েছে, যেন তাকে কেউ এ বাড়িতে ঢুকতে না দেয়। সত্যিই কেন সে এলো! এখানে আসায় তার কীসের স্বার্থ। পর্মিলির বিয়ে কার সঙ্গে হলো না হলো তাতে সুরেনের কী?

একটা অপমানবোধ মনের মধ্যে চাড়া দিয়ে উঠলো। এমন করে অনুমতি না নিয়ে দেখা করতে আসাই তো অপমান। কিন্তু কেনই বা সে সুব্রতর কথায় এখানে এমন করে দেখা করতে এল? তবে কি সে পর্মিলির সঙ্গে মিশতে চায়? তবে কি পর্মিলির সান্নিধ্য তার ভালো লাগে?

কথাটা মনে উদয় হতেই সমস্ত মন যেন কেমন বিদ্রোহ করে উঠলো। পর্মিলি তার কে? তার অবস্থার সঙ্গে সুরেনের অবস্থার মিল কোথায়? কেন সে ভিখিরির মতন তার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে এত লালায়িত হয়? সুরেনের নিজের ওপরেও ঘেন্না হলো!

দারোয়ানটা ভেতরে গেছে গেট ছেড়ে দিয়ে।

সেই সুযোগে সুরেন রাস্তার দিকে মুখ ফেরালো। তারপর আবার যে রাস্তা দিয়ে এসেছিল, সেই রাস্তা দিয়েই হন হন করে ট্রাম-রাস্তার দিকে চলতে

লাগলো।

বিকেলের শুরু সবে। এখনও কোনও অফিসের ছুটি হয়নি. একটু পরেই এই রাস্তা দিয়ে পিল পিল করে অফিস ফেরতা লোক ট্রাম থেকে নেমে বাড়ির দিকে ফিরবে। তখন এত তাড়াতাড়ি সুকীয়া স্ট্রীট দিয়ে হাঁটা যাবে না।

হঠাৎ মনে হলো পেছন থেকে কে যেন তাকে ডাকছে।

—বাবু, বাবুজী!

সুরেন মুখ ফিরিয়ে দেখলে দারোয়ানটা তার দিকেই দৌড়ে আসছে। আর অনেক দূরে তার পেছনে গেটের কাছে একেবারে সদর রাস্তার সামনে তার দিকেই চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে পর্মিলি।

পর্মিলি দূর থেকে তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

দারোয়ানটা ততক্ষণে তার কাছে এসে গেছে। বললে—বাবুজী, আপনাকে দিদিমণি ডাকছে, আইয়ে—

সুরেন আবার উল্টোদিকে এগিয়ে গেল। পর্মিলির কাছাকাছি যেতেই পর্মিলি বললে—কী হলো. তুমি চলে যাচ্ছিলে কেন?

সুরেন কী বলবে, কার বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে বুঝতে পারলে না। পাশেই দারোয়ানটা দাঁড়িয়ে ছিল। তার দিকে চেয়ে সুরেন বললে—এ তো আমাকে বাড়ির ভেতর ঢুকতে দিলে না—

পর্মিলি বললে—আমি একে খুব বকে দিয়েছি, এ আর কখনও এরকম করবে না—

তারপর দারোয়ানটার দিকে চেয়ে বললে—খবরদার বলছি, এরপর আর যদি কখনও শুনি তো চাকরি থাকবে না বলে রাখছি। যা—

সুরেনের দিকে চেয়ে পর্মিলি বললে—এসো, ভেতরে এসো—

সুরেনের মনে পড়লো সুব্রতর কথাগুলো। পর্মিলির দিকে ভালো করে চেয়ে দেখলে। এই ক'দিনেই যেন চেহারাটা কেমন রোগা হয়ে গেছে। ক'দিন ধরে ঠিকমত না খাওয়ার, না ঘুমোনর চিহ্ন সমস্ত শরীরে।

জিজ্ঞেস করলে—এ তোমার কী চেহারা হয়েছে?

পর্মিলি বললে—আমার চেহারার কিচ্ছু হয়নি, তোমার কী খবর তাই বলো?

সুরেন বললে—আমার আবার কী খবর? আগেও যেমন, এখনও তেমন—

—তাহলে হঠাৎ এলে যে?

—কেন, আসতে নেই?

পর্মিলি বললে—না, তা নয়, এসেছ ভালো করেছ, কিন্তু এতদিনই বা আসোনি কেন?

সুরেনের সেই রাতটার কথা মনে পড়লো। সেই ডায়মন্ডহারবারের মাঠের ওপরের কান্ডকারখানা। কিন্তু কই, পর্মিলি তো সে সব কথা কিছুই বলছে না। এত সহজে সে কথাগুলো ভুলে গেল কেমন করে? সেদিন যে কান্ড পর্মিলি বাধিয়েছিল, তারপরে কি এখানে বড় মুখ করে আসা যায়?

হঠাৎ পর্মিলি জিজ্ঞেস করলে—কোথাও বেরোবে? আমি অনেকদিন বাড়িতে আটকে আছি—

সুরেন বললে—আমি কিন্তু খুব ভয়ে ভয়ে তোমার কাছে এসেছি—

—কেন? ভয় কীসের?

পর্মিলি যেন অবাক হয়ে গেছে সুরেনের কথা শুনে। বললে—এসো, এসো

ভেতরে এসো—

বলে সুরেনের হাত ধরে টান দিলে। সুরেন কম্পাউণ্ডের ভেতর ঢুকে এগোতে লাগলো।

চলতে চলতে সুরেন জিজ্ঞেস করলে—পুণ্যশ্লোকবাবু বাড়িতে নেই তো?

পমিলি বললে—নেই, থাকলেই বা কী দোষ হতো? আমি কি কাউকে কেয়ার করি। বাবা যদি আমাকে তোমার সঙ্গে মিশতে বারণ করে তো আমি কি তা শুনবো?

সুরেন বললে—কিন্তু তোমার ওপর রাগ না করলেও তিনি আমার ওপর তো রাগ করতে পারেন—

পমিলি বললে—আমার যা খুশী তাই করবো, কেউ বলতে এলে শুনবো না। তোমার ব্যাপারে যদি বাবা আর কিছু করে, আমি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবো—

সুরেন বললে—না না, ও কাজ কোর না, অমন করলে আমারই বদনাম হবে মাঝখান থেকে—

—তোমার কোনও ভয় নেই। এখুনি চলো না বেরোই, চলো—

বলে পমিলি নিজের গাড়িটার দিকে এগিয়ে গেল। গাড়িটাতে উঠে ইঞ্জিনে স্টার্ট দিলে।

বললে—উঠে এসো—

সুরেন কেমন সঙ্কোচ করতে লাগলো। উঠবে কি উঠবে না!

বললে—কোথায় যাবে এখন?

—যেখানে খুশী।

সুরেন বললে—না, তোমার সঙ্গে গাড়িতে উঠতে আমার ভয় করে। শেষকালে হয়ত কোথাও নিয়ে চলে যাবে সেদিনকার মত—

—কেন, এত ভয় কেন তোমার? আমার সঙ্গে যে কোনও ছেলে উঠতে পেলে ধন্য হয়ে যায়, তা জানো?

সুরেন বললে—তাদের কথা আলাদা—

—কেন, তুমি কি দলছাড়া মানুষ নাকি? সৃষ্টিছাড়া?

সুরেন বললে—তা জানি না। তবে একটু আলাদা বৈকি! আলাদা না হলে এত অপমানের পরেও তোমাদের বাড়িতে আসি?

পমিলি বললে—ওসব কথা পরে হবে, আগে তুমি গাড়িতে ওঠো—

তারপর কী ভেবে গাড়ি থেকে নামলো। বললে—তুমি একটু দাঁড়াও, আমি এখুনি আসছি—

বলে হন হন করে বাড়ির ভেতরে চলে গেল। তারপর তরতর করে দোতলায় উঠতে লাগলো সিঁড়ি দিয়ে। ওপরে উঠে কিন্তু নিজের ঘরে ঢুকলো না। তারপরে সুব্রতর ঘর। সেখানেও ঢুকলো না। তারপরে বাবার ঘর। সেই ঘরের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলো। বাবার শোবার খাটের পেছনে একটা আয়রণ-সেফ। সেফ-এর চাবিটা কোথায় থাকে তা পমিলি জানতো। ঘরের পশ্চিমদিকের জানালার মাথায় একটা ছোট ফাঁকের ভেতরে। কিন্তু যদি চাবিটা সেখানে না থাকে?

হাতটা সেখানে ঢুকিয়ে দিতেই দুটো চাবি পাওয়া গেল। চাবি দিয়ে আয়রণ-সেফটা খুলে ফেললে। সামনেই একটা ড্রয়ার। অন্য চাবিটা দিয়ে সেই ড্রয়ারটাও খুলে ফেললে। ড্রয়ারটা খুলতেই একটা বাক্স বেরোল। তার ভেতরে

ছিল একটা রিভলবার। পেছন ফিরে চারদিকে একবার ভালো করে দেখে নিলে পর্মিলি। না, আশেপাশে কেউ কোথাও নেই—

রিভলবারটা নিয়ে পর্মিলি সেটা নিজের ব্লাউজের ভেতরে বুকের মধ্যে পোরবার আগে একবার দেখে নিলে। লোডেড্ আছে তো ঠিক!

সত্যিই গুলী পোরা ছিল না। পর্মিলি সেটাতে গুলী ভরে নিলে। তারপর ব্লাউজের ভেতরে বুকের ভেতরে লুকিয়ে ফেললে। তাড়াতাড়িতে আয়রণ-সেফ্‌টা চাবি-বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটাও বন্ধ করলে। বন্ধ করে চাবি দুটো আবার জানালার ওপরে ছোট ফাঁকটার ভেতরে যেমন ছিল, তেমনি রেখে দিলে। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দা পেরিয়ে আবার সিঁড়ি দিয়ে নিচেয় নেমে এসে গাড়িতে উঠলো।

সুরেন তখনও দাঁড়িয়ে পর্মিলির কাণ্ডকারখানা দেখছিল।

পর্মিলি বললে—কই, গাড়িতে ওঠো, যাবে না?

সুরেন জিজ্ঞেস করলে—বাড়ির ভেতর কী করতে গিয়েছিলে?

পর্মিলি বললে—বারে, পার্স নেবো না?

—পার্স কী হবে? কতদূর যাবে?

—সে এখনও ঠিক করিনি। সে রাস্তায় বেরিয়ে ঠিক করবো।

সুরেন কিছু উপায় না পেয়ে উঠে বসলো গাড়িতে। তারপর পর্মিলি গাড়ি ছেড়ে দিলে।

সুরেনের জীবনের আদিকাল থেকে এমনভাবে ঘটনাগুলো ঘটে গেছে, ঠিক যেন উপন্যাসের মত। উপন্যাসের মতই সাজানো তার ঘটনা। যেন একটা একটা করে ঘটনা সাজিয়ে সাজিয়ে কেউ উপন্যাস লিখেছে তা দিয়ে। নইলে কেনই বা সে সুব্রতর কথায় সেদিন পুণ্যশ্লোকবাবুর বাড়িতে গিয়েছিল। আর সুব্রতই বা কেন অমন করে তাকে তাদের বাড়িতে যেতে বলেছিল!

আর ঠিক তারপরের ঘটনাগুলো এমনভাবে ঘটতে লাগলো যেন অদৃশ্য হাতে কেউ তা ঘটিয়ে চলেছে।

রোজ এন্‌কোয়ারি কমিশন বসে। দু'পক্ষের কাউন্‌সেল বাদ-প্রতিবাদে সারা ঘর আর পরের দিনের খবরের কাগজগুলো সারা সহর সরগরম করে রাখে। এক-দিকে ভোট আর অন্যদিকে এনকোয়ারি কমিশনের রিপোর্ট সহরের লোকদের মাতিয়ে রেখে দেয়। লোকে যেন অনেকদিন পরে আবার একটা মুখরোচক খোরাক পেয়েছে। জীবন নয়, জীবনের এঁটো-কাঁটা আর ছিব্‌ড়ে নিয়ে কুকুরের মত সারা সহরের মানুষের কাড়াকাড়ি চলতে থাকে। কে কত গালাগালি দিতে পারে, কার কত গলার জোর, কে কত খিস্তি করতে পারে, তারই যেন কেবল প্রতিযোগিতা চলেছে এখানে।

একদল পার্টির মেয়েদের নিয়ে ভোটের কাজ করতে বেরিয়েছিল টুলু। টুলু কাজের মেয়ে। বহুদিন থেকে পার্টির কাজ করে আসছে। প্রত্যেক বাড়ি বাড়ি গিয়ে মেয়েদের ভোটের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে।

সঙ্গে থাকে বটে মেয়েরা, কিন্তু যা কিছু কথা বলবার তা সবই একলা বলতে হয় টুলুকে। টুলুই সকলের হয়ে কথা বলে।

বলে—দেখুন, আপনারা জানেন কংগ্রেসের অত্যাচারে আমরা কোথায় কত নিচেয় নেমে এসেছি—এবার সামনের ভোটে আপনাদের ভরসাতেই আমরা প্রমাণ করে দিতে চাই, আমরা মহিলা সমাজ কংগ্রেসকে চাই না—

এক-একজন মহিলা বলেন—তা তোমরা কারা বাছা?

টুলু বলে—আমরা বামপন্থী নেতা পূর্ণবাবুর পার্টির লোক, তাঁর হয়ে আমরা ভোট চাইতে এসেছি—

এক-একজন মুখফোঁড় মহিলাও আছেন যাঁরা স্পষ্ট কথা খুলে বলেন। তাঁরা বলেন—কে আমাদের কথা কত ভাবে তা দেখা আছে. সবাই তো স্বার্থপর। আমরা তা জানিনে ভেবেছ তোমরা?

টুলু বলে—তা পাঁচ বছরের জন্যে একবার পূর্ণবাবুকে আপনারা ভোট দিয়েই দেখুন না—

তাঁরা বলেন—ভোটের সময় তো তোমরা এসেছো বাছা, ভোটের পর তোমাদের মুখ দেখতে পাওয়া যাবে তো?

টুলু বলে—ওকথা কেন বলছেন মা? আমাদের কখনও ভোট দিয়ে দেখেছেন?

এই রকম কত করে বোঝাতে হয় সকলকে। কেউ শোনে, আবার কেউ-বা শোনে না। বোকা কেউই নয়। কিন্তু টুলুদের চেষ্টার যেন তবু শেষ নেই।

টুলু দলের মেয়েদের বলে—এসব কথা শুনে তোমরা যেন আবার রেগে যেও না ভাই। পার্টির কাজ করতে গেলে এখন এসব সহ্য করতেই হবে। এসব কথা আমি দেবেশদার কাছে শিখেছি। দেবেশদা বলে এসব কাজে ধৈর্য দরকার। হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিলে চলবে না—

হঠাৎ রাস্তার মধ্যেই একটা গাড়ি এসে তাদের পাশে দাঁড়ালো।

টুলু গাড়িটার দিকে চেয়ে দেখলে—সুব্রত। সুব্রত রায়। সুরেনদা'দের বন্ধু। পুণ্যশ্লোকবাবুর ছেলে।

—একি, আপনারা?

টুলু বললে—আপনি এখানে?

সুব্রত গাড়ি পাশে রেখে রাস্তায় নেমে এলো।

বললে—আমার তো বাড়ি ওইটে—

বলে পুণ্যশ্লোকবাবুব বাড়িটা দেখিয়ে দিলে।

টুলু বললে—ও—

তারপর একটু থেমে বললে—আমরা আমাদের পার্টির তরফ থেকে ভোট ক্যানভাসিং করে ফিরছি—

সুব্রতও বললে—আমি তো আপনার বন্ধুর বাড়ি থেকে ফিরছি।

—আমার বন্ধু?

—হ্যাঁ, সুরেন। সুরেন সান্ন্যাল। সেখানে দেবেশও ছিল—

তারপর বললে—এতদূর যখন এসেছেন, তখন একবার গরীবের বাড়িতে পায়ের ধুলো দিয়ে যান না—

—গরীবের বাড়ি? বলছেন কী আপনি? ঠাট্টা করছেন?

সুব্রত বললে—আমার বাবা অবশ্য বড়লোক, কিন্তু আমি তো গরীব। আমি তো বেকার। এখনও বাবার হোটেলে খাই—

তারপর সকলের দিকে চেয়ে বললে—আপনারা সবাই-ই আসুন না। সকাল থেকে ঘুরছেন, একটু চা আর সামান্য জলযোগ করে বেরোবেন—

—কিন্তু আপনার বাবা যদি জানতে পারেন? জানতে পেরে যদি আপত্তি করেন?

সুব্রত বললে—সে দায়িত্ব আমার। আপনারা আমার অতিথি। অতিথির সমাদর কী করে করতে হয় তা আমি কারোর চেয়ে কম জানি না। আপনারা আসুন, আমি তার প্রমাণ দিয়ে দেবো—

টুলু বললে—আচ্ছা, ঠিক আছে, ওরা থাকুক, আমিই যাচ্ছি—

সুব্রত বললে—কেন, ও'রা এলে আমি আরো খুশী হবো—

টুলু বললে—না, অত সময় আমাদের হাতে নেই, এখনও আমাদের হাতে অনেক কাজ রয়েছে। এরপর বিকেলবেলা আবার কমিশনের কাজে সেখানে যেতে হবে—আমি আপনার বাড়িতে শুধু যাবো আর আসবো—

—তা তাই চলুন। তবু বুঝবো সেদিন আপনি আমার ওপর রাগ করেননি।

সকলকে সেখানেই দাঁড়াতে বলে টুলু সুব্রতর সঙ্গে বাড়ির ভেতরে বাগানে ঢুকলো। সুব্রত গাড়িটাকে ভেতরে ঢুকিয়ে রাখলে।

টুলু ভেতরে ঢুকে চারদিকের ঐশ্বর্য দেখতে লাগলো। কেমন সাজানো বাড়ি!

বললে—আপনারা যে বড়লোক তা আগেই দেবেশদার কাছে শুনেছিলুম। সুরেনদাও বলেছিল। কিন্তু আপনারা যে এত বড়লোক তা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতুম না—

বাগানের পথ দিয়ে চলতে চলতে কথা বলছিল টুলু।

—বাড়িতে এখন কে কে আছেন?

সুব্রত বললে—কেউই নেই, এক পর্মিলি ছাড়া। তাকে আপনি দেখেছেন নিশ্চয়ই? আর বাবার তো এখন ভীষণ কাজ। বাবা তো সকালবেলাই কংগ্রেস অফিসে চলে গেছেন, ভোটের কাজে। তারপর সেখান থেকে সোজা রাইটার্স বিল্ডিংএ—

—আর আপনার মা?

সুব্রত বললে—আমার মা নেই। মা আমার জন্মের পরেই মারা যান—

বাগান পেরিয়ে বারান্দা। বারান্দার পশ্চিমেই সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠলো দুজনে। ওপরে উঠে প্রথমেই বাঁ দিকে যে দরজাটা সেটা দেখিয়েই সুব্রত বললে—এইটে পর্মিলির ঘর—

—পর্মিলি দেবী কোথায়?

সুব্রত বললে—ঘরেই আছে। আর দেখুন, এইটে আমার ঘর। আর এদিকে আসুন, এই ঘরটা আমার বাবার শোবার ঘর।

টুলু বললে—আপনার বাবার ঘরের দরজাটা খোলা রয়েছে দেখছি!

সুব্রত বললে—বাবার ঘর এমনি বরাবর খোলাই পড়ে থাকে। আর তাছাড়া, বাড়ির গেটে দরোয়ান রয়েছে, চাকর-ঠাকুর-ঝি সবই সেকালের। আর একটা কথা—বাবার ঘরে কখনও তেমন কিছু থাকেও না—

—কিছুই থাকে না?

সুব্রত বললে—না। টাকা-কড়ি তো কিছু বাবা বাড়িতে রাখে না। থাকার মধ্যে আছে একটি রিভলবার, তা সেও ওই আয়রণ-সেফটা রয়েছে, ওরই মধ্যে থাকে। তার চাবি কোথায় থাকে তাও কেউ জানে না—

—রিভলবার? রিভলবার কেন?

সুব্রত বললে—ও বহুদিন আগে রায়টের সময়ে বাবা একটা রিভলবারের

লাইসেন্স করিয়ে নিয়েছিল, তখন থেকেই ওটা রয়ে গেছে। বাবা যখন বাইরে কোথাও যায়, তখন মাঝে মাঝে সঙ্গে নিয়ে যায়—

তারপর বললে—দাঁড়ান, আপনাকে একটু চা-টা কিছু দিতে বলি রঘুকে—

টুলু ব্যস্ত হয়ে উঠলো।

—না না, চা-টা কিচ্ছু খাবার সময় নেই আমার। আর তাছাড়া ওরা সবাই বাইরে দাঁড়িয়ে আছে; এখনও অনেকগুলো বাড়িতে ক্যানভাসিং বাকি রয়েছে। তারপর আবার কমিশনের ব্যাপার আছে—

—কিন্তু আপনি আজই প্রথম আমাদের বাড়ি এলেন—আপনাকে কিছু না খাইয়ে ছাড়বো না—

টুলু বললে—অসম্ভব। বরং অন্য একদিন এসে খেয়ে যাবো, আজ কিছুতেই নয়—ওরা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, আমি চলি—

বলে আর দাঁড়ালো না টুলু। ভাবলে, দাঁড়ালেই হয়ত দেখা হয়ে যাবে পমিলির সঙ্গে। অযথা কিছু কথা বাড়বে। তাতে অকারণ তিক্ততাও বাড়বে।

আসবার সময় সুব্রত টুলুকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিলে।

বললে—এদিকে এলে কিন্তু আমাদের বাড়িতে আসতে ভুলবেন না।

টুলু বললে—যাদের গেটে দরোয়ান বসে থাকে, তাদের বাড়িতে যখন-তখন ঘন ঘন আসতে কিন্তু আমার ভয় করে।

সুব্রত বললে—কিন্তু সুরেনদের বাড়িতে? তাদের গেটেও কিন্তু দরোয়ান বসে থাকে!

টুলু বললে—কিন্তু আপনি তো সুরেনদা নন।

সুব্রত হাসলো। বললে—তা বটে! আমার বাবা যে মিনিষ্টার সে কথা ভুলেই গিয়েছিলুম।

টুলু বললে—তা সে যা হোক, আমি কথা দিলুম সুযোগ আর সময় পেলেই আসবো।

বলে আর দাঁড়ালো না সেখানে। বাইরে আসতেই সবাই ছেঁকে ধরলে টুলুকে।

—কী বলছিল টুলুদি? পুণ্যশ্লোকবাবুর ছেলে বুঝি? তোমার সঙ্গে এত ভাব করতে চায় কেন? কিছু মতলব আছে বুঝি?

সকলের নানান রকম প্রশ্ন। টুলু কিন্তু কারোর কোনও প্রশ্নেরই উত্তর দিলে না। কেবল যন্ত্রের মত একটার পর একটা বাড়িতে গিয়ে নিয়মমাফিক কাজ করে বেরিয়ে এল। কেমন যেন তার একটা ভাবান্তর হলো, তার কারণ সে নিজে চেষ্টা করেও বুঝতে পারলে না, বা বুঝতে চেষ্টা করলে না। যে বাড়ির ভেতরে ঢুকেছিল, সেই বাড়িটাই যেন তাকে তখনও গ্রাস করে রয়েছে। তারপর যখন সব কাজ সেরে আবার পার্টি অফিসে এসেছে, তখনও যেন তার ঘাড় থেকে ভাবনার ভূতটা নামেনি।

সন্দীপদাও একটু অবাক হয়েছিল। বললে—কী হলো টুলু, খুব ক্লান্ত নাকি? শরীর ভালো আছে তো তোমার?

কিন্তু পার্টি অফিসে বেশি কথা বলবার সময়ও নেই কারো। যত দিন এগিয়ে আসছে, ততই যেন কাজের পাহাড় জমছে চারদিকে। একটা ইলেকশন মানে হাজার হাজার মানুষের দশ বছরের পরমায়ুর ক্ষয়। হাজার হাজার মানুষ পার্টির জন্যে প্রাণ দিয়ে একটা মানুষকে নির্বাচন করবে। সেই মানুষটা জিতলেই যেন অক্ষয় স্বর্গলাভ হবে আমাদের। সেই মানুষটা মন্ত্রী হলেই যেন আমরা সবাই

চাকরি পাবো, আমরা সবাই বাড়ি পাবো, গাড়ি পাবো, আমরা সুখে শান্তিতে ঘর-সংসার করতে পারবো।

তবে এও হয়ত অনিবার্য। বিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশকে এসে ভারতবর্ষের মানুষ হয়ত এইখানে এসেই ঠেকেছে। নইলে সুরেন, দেবেশ, পমিলি, সুখদাকে নিয়ে এ-উপন্যাস লেখবার প্রয়োজনই বা হবে কেন?

বিকেলবেলার দিকেই আবার টুলু গিয়ে বসলো কমিশনের চেম্বারে। সে-দিনও এক এক করে সাক্ষীর শুনানী চলছে আর বাদী-বিবাদী পক্ষের উকিল-ব্যারিষ্টার জেরা করছে। এও যেন এক মজা। শুধু মজা নয়, এক পরিহাস। মানুষকে স্তোকবাক্য শোনাবার, মানুষকে শান্ত করবার এ এক রাজনৈতিক প্রহসন। প্রহসনের অভিনয়। অথচ খরচ? খরচের হিসেব তো কেউ চাইবে না। খরচ দেবে তুমি আমি আর সহরের, গ্রামের কোটি কোটি নিরীহ মেহনতী মানুষ।

হঠাৎ নজর পড়তেই টুলু দেখলে যে, কিছু দূরেই সুরেনদা আর পমিলি বসে আছে পাশাপাশি। মনটা যেন ছ্যাঁৎ করে উঠলো। এর মধ্যে কখনই বা ওরা একসঙ্গে মিললো আর কখনই বা এখানে এসে উপস্থিত হলো!

সামনে তখন বেশ জোর জেরা চলেছে। আরো সাক্ষীর জবানবন্দী হচ্ছে। সমস্ত ঘরটায় লোকজনদের চাপা গলায় গুনগুন করে কথাবার্তা চলছে। খবরের কাগজের রিপোর্টাররা খস খস করে কাগজের ওপর লিখে চলেছে। পার্টির 'স্বাধীনতা' কাগজের রিপোর্টাররাও রয়েছে সেখানে। কিন্তু কোনও দিকে আর নজর গেল না টুলুর। সে একদৃষ্টে চেয়ে দেখতে লাগলো ওদের দিকে।

হঠাৎ মনে হলো সুরেনদা যেন তাকে দেখতে পেয়েছে। টুলু চোখ ফিরিয়ে নিয়ে আবার সামনের দিকে চেয়ে দেখতে লাগলো। তার সমস্ত শরীরটার ভেতরে যেন মোচড় দিতে লাগলো। মনে হলো সে বুঝি ওখানেই বেঞ্চি থেকে টলে পড়ে যাবে। যদি সত্যি সত্যিই পড়ে যায়, তখন কী হবে? কিন্তু মাথাটা সে সোজা করে রাখতেই বা পারছে না কেন? তার হয়েছে কী? কেন এমন হলো?

হঠাৎ তার কানে গেল—একটু জল, একটু জল দিন মাথায়—

পাশ থেকে কে একজন বললে—আরে, এদের পার্টির লোক সব কোথায় গেল?

আবার কার গলার আওয়াজ—আপনারা এখান থেকে সরে যান, একটু হাওয়া আসতে দিন, মেয়েটি অজ্ঞান হয়ে গেছে—সরে যান—

চারদিকে যেন সব কিছু গোলমাল হয়ে গেছে। শব্দগুলো ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছে। আর তারপর সব চুপ। আর কোনও দিকে কোনও গোলমাল, কোনও আওয়াজ নেই—

দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রীটের গলিতে তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল হবো হবো। মানদা দাসীর সেই সময়েই আসল কাজ। তখন ঘরে ঘরে গিয়ে তাগাদা দিতে হয়। মেয়েরা সারা রাত জেগে দিনের বেলা ঘুমোয়। একবার ঘুমোলে আর কারো সাড়া থাকে না। ঘুমোলে একেবারে মড়া। তখন কারো গায়ের শাড়ি-ব্লাউজের ঠিক-ঠিকানা মেলা ভার।

তখন মানদা গিয়ে সকলকে ঠেলে উঠিয়ে দেয়।

বলে—ও লো ও মেয়ে, ওঠ—ওঠ—বেলা পড়ে গেল যে—

দরজা-জানালা বন্ধ ঘরের ভেতর থেকে বেলা পড়ে আসার খবর জানবার কথা নয় কারো। একবার চোখ চেয়ে দেখে আবার আড়মোড়া ভাঙে।

—ওরে ওঠ, ওঠ! চেয়ে দেখছিস কী? চারটে বেজে গেছে। কলঘরে যা, গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে এসে চা খেয়ে নে!

ঘুম থেকে উঠে চা খাবার লোভ বড় কম লোভ নয়। ঘুমের পর গরম চা মুখে পড়লে তবে সারা রাত-ভোর ফুর্তির ব্যথা মরে।

মানদার প্রতিদিনের নিত্যনৈমিত্তিক কাজ এই।

বলে—কী মেয়ে মাগো, রাত তো আমরাও এককালে জেগেছি মা, কিন্তু এমন মড়া হয়ে তো কখনও ঘুমোইনি। এ তো ঘুম নয়, একেবারে মিত্যু-ঘুম লা—

এক এক করে তখন সবাই ওঠে। এক এক করে সবাই কলঘরে যায়। তখন মানদা মাসির রান্নাঘরে বাটি বাটি চা তৈরি হয়। সবাই একে একে এসে যার যার চায়ের বাটি নিজের নিজের ঘরে নিয়ে চলে যায়। চা খেয়ে খোপা বাঁধা। তারপর কাপড়চোপড় কেচে গা ধোওয়া। গা ধোওয়া আর ঘরে এসে সাজগোজ করা। তখন সবাই তৈরি।

কিন্তু সুখদার ঘরে গিয়ে মানদা দাসী অবাক। সুখদা কোথায় গেল?

তাড়াতাড়ি ভুলোর মা'কে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকলে—বুড়ি, ও বুড়ি—

তা বুড়ি তো বুড়িই বটে। সত্যিই বুড়ি থুত্থুড়ি। নড়তে চড়তেই তার এক বছর।

বুড়ি কাছে আসতেই জিজ্ঞেস করলে—কই, এ ঘরের মেয়ে কোথায় গেল আমার? সুখদা? কলঘরে গেল নাকি?

বুড়ি বুড়ি হলে কী হবে, কে কোথায় কখন কী করছে তার হিসেব তার মুখস্থ।

বললে—কলঘরে তো নেই, কলঘরে অন্য মেয়ে গেছে—

—তাহলে? ঘরেও নেই, কলঘরেও নেই, তাহলে গেল কোথায়?

মানদা মাসি বললে—তাহলে দ্যাখ তো ছাদে গেছে কিনা হাওয়া খেতে—

তা ছাদে গিয়েও দেখে এল বুড়ি। সেখানেও নেই। ছাদে যাবার মেয়ে তো নয় সুখদা। কারোর ঘরেও যায়নি। কাল রাত্রে যত লোক ফুর্তি করতে এ বাড়িতে এসেছিল সবাই যার যার ঘরে ঢুকেছিল. তারা ভোর রাত্রে চলে যাবার পর বাড়ি আবার ভোঁ-ভাঁ হয়ে গিয়েছিল। এ পাড়ার বাড়িগুলো তাই দুপুর-বেলা নিঃঝুম হয়ে থাকে। বাড়ির দারোয়ান থেকে কুকুরটা পর্যন্ত তাই তখন নিশ্চিন্তে নাক ডাকিয়ে ঘুমোয়। তখন তাই কারো কোনও দায়িত্ব থাকে না।

কিন্তু এখন? এই বিকেলবেলা?

এই বিকেল বেলা থেকেই তো শুরু। এখন থেকে শুরু হয়ে শেষ হবে সেই ভোর রাত্তিরে। এই সময় কিনা সুখদাকে পাওয়া যাচ্ছে না? তাহলে গেল কোথায় সে?

কিন্তু কেউ-ই জানে না কাল রাত্রে সুখদার ঘরে কে এসেছিল। চেহারাটা অবশ্য জানে। কিন্তু কী যে তার নাম-ধাম, কী যে তার কুলজি, তা কে জানতে গেছে! একজন ক্ষয়াপানা লোক এসে অনেক বাছ-বিচার করে মাসির হাতে টাকা গুঁজে দিয়ে সুখদার ঘরে ঢুকেছিল। এমন তো রোজই হচ্ছে। কে তাদের হিসেব রাখে? অত হিসেব রাখতে গেলে কি এই মেয়েমানুষের কারবার চলে?

তারপর? তারপর লোকটা কখন গেল?

—ডাকো, দরোয়ানকে ডাকো।

দরোয়ান এসে সেলাম ঠুকলো।

—দারোয়ান, তুমি জানো, সুখদা মেয়ের ঘরে যে লোকটা ঢুকেছিল সে কখন বেরিয়ে গেল?

দরোয়ান কি সকলের মুখ চিনে রেখেছে যে জিজ্ঞেস করলেই জবাব দিতে পারবে?

দরোয়ান বললে—তা তো বলতে পারবো না মাসি—

মানদা রেগে গেল। বললে—তাহলে সোনাগাছিতে কীসের দারোয়ানি করছো তুমি? আমি তোমাকে মুখ দেখাতে রেখেছি? দাও, চাকরি ছেড়ে দাও, দিয়ে তোমার ছাপরা জিলায় গিয়ে চাষবাষ করো গে। আমাকে আর জ্বালিও না বাপু—হ্যাঁ।

কিন্তু এরা না জানুক, সুখদা জানে কাল রাত্তিরে কে এসেছিল। প্রথমে বুঝতে পারেনি। তারপর কাছে আসতেই চমকে উঠেছে। এক-পা পেছিয়ে এসে বললে—তুমি?

কালীকান্ত বিশ্বাস মুখে আঙুল দিয়ে চুপ করতে ইঙ্গিত করলে—চেঁচিও না, চেঁচালে তোমারও ক্ষতি, আমারও ক্ষতি। অনেক কষ্টে, মাসির হাতে দশটা টাকা দিয়ে তবে ঢুকেছি। চেঁচিও না—

সুখদা বললে—কিন্তু তুমি কেন এখেনে এলে? তুমি কেন আবার এলে?

কালীকান্ত বিশ্বাস দাঁতের পাটি বার করে হাসতে লাগলো।

বললে—কেন, তুমি চাও না আমি আসি? ছোড়দা তো মরে বেঁচেছে, জানো তো?

সুখদা বললে—মরেছে, আপদ গেছে, তা তুমি মরতে পারলে না? তুমি মরলে আপদের শান্তি হতো—

কালীকান্ত বিশ্বাস বললে—আমি মরলে যে তুমি বিধবা হবে, তাই আর মরলুম না—

—ও, আমার ওপর কী অসীম দয়া!

কালীকান্ত বিশ্বাস বললে—আমাকে ঠাট্টা করছো? তা করো। কিন্তু তোমার ভালো না করে আমি ছাড়বো না, মাইরি বলছি। বিশ্বাস করো—

সুখদা এবার আরো গম্ভীর হয়ে গেল। বললে—গাঁজাড়ে, রেসুড়ে, মাতালের আবার কথা!

কালীকান্ত বললে—আমাকে তুমি গাঁজাড়ে, রেসুড়ে বললে? আর তুমি? তুমি বুঝি সতী?

—তুমি কি তা শুনতে চাও?

—হ্যাঁ, শুনতে চাই।

—আমি সোনাগাছির বেশ্যা।

বলে হঠাৎ শাড়ির আঁচল চাপা দিয়ে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলো। তারপর সে কান্না আর তার থামতে চায় না।

কালীকান্ত বললে—এই দ্যাখ, এ কী কান্ড! লোকে শুনতে পেলে বলবে কী? আরে থামো, থামো—বলে সুখদার পিঠে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিতে লাগলো।

বললে—ছি ছি, তোমার কি একটা কান্ডজ্ঞান নেই? আমি যে তোমার বর

এটা ভুলে গেলে? কঁদবার কী আছে! আমি যে তোমাকে নিতে এসেছি—

সুখদা হঠাৎ মুখের আঁচল খুলে ফেললে। বললে—নিতে এসেছ তুমি? আমাকে নিতে এসেছ তুমি? কিন্তু আমাকে নিয়ে গেলে তুমি মুশকিলে পড়বে তা বলে রাখছি—

—কেন?

—আমি যে চোর। কাছারিতে যে আমার নামে মামলা চলছে।

কালীকান্ত বললে—তা চলুক. আমি থানা-পুলিশকে ভয় করিনে। ওসব তো ম্যানেজার শালার কাণ্ড. তা আমি বুঝিনে ভেবেছ? আমার নামেও তো শালা হুলিয়া বার করেছে. আমি তো তাই লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছি—নইলে তোমাকে কি আমি এখানে এমনি করে থাকতে দিতুম! কবে তোমাকে এখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতাম।

তারপর একটু থেমে বললে—কিন্তু এসব কথা বলতে আমি তোমার কাছে আসিনি—আমি এসেছি তোমাকে একটা খবর দিতে—

—কী খবর?

কালীকান্ত বললে—মা-মণি তো তোমার ভালো হয়ে উঠেছে. অসুখ সেরে গেছে—

—তার মানে?

—হ্যাঁ, ওই ব্যাটা ম্যানেজার তোমার মা-মণিকে ভালো করে তুলেছে।

—তা. হঠাৎ ম্যানেজারবাবু মা-মণিকে ভালো করে তুললো যে?

কালীকান্ত বললে—ম্যানেজার নিজেরই স্বার্থে করেছে। মা-মণিকে দিয়ে সমস্ত সম্পত্তি লিখিয়ে নেবে ওর ভাগ্নেটার নামে।

—তা এতদিনেও লিখিয়ে নেয়নি?

—নেবে কী করে? মা-মণির তো সই করবারও ক্ষমতা ছিল না এ্যাদ্দিন। উঠে বসতেই পারতো না. এই সময়ে তোমার একবার মা-মণির কাছে যাওয়া উচিত। একবার যদি তোমার কথায় মন ভিজে যায় তো তোমাকেও কিছু সম্পত্তি দিয়ে যেতে পারে বুড়ি—

সুখদা কথাটা শুনে চুপ করে রইল।

তারপর বললে—কিন্তু আমি যে মা-মণির সিন্দুক খুলে গয়না চুরি করেছিলুম—

—আরে দূর. তুমিও যেমন বোকা. সেসব কথা কি বুড়ির এখন মনে আছে নাকি? সে অসুখের ঘোরে কবে সব ভুলে মেরে দিয়েছে—এই সময় যাওয়াই তো ভালো—

কথাটা সুখদার যেন কেমন মন্দ লাগলো না। যদি কিছু টাকা পাওয়া যায়, তাহলে আর মাসির এই আদর খেতে হয় না। মাসির আদরের ওপর ঘেন্না ধরে গেছে তার। এ আর কতদিন এমন করে চালাবে এখানে।

সুখদা জিজ্ঞেস করলে—আমি যাবো? গেলে তাড়িয়ে দেবে না তো?

কালীকান্ত বললে—না না. তাড়িয়ে দেবে কেন? তুমি নিশ্চয় যাবে। গেলে দেখবে তোমাকে কত আদর করে। আর সেই ম্যানেজারের ভাগ্নেটা' সে শালা তো আজ মেয়েমানুষ নিয়ে ফুর্তি করে বেড়াচ্ছে দেখি—। তার এদিকে মন নেই। ওই ম্যানেজারটাকেই যা ভয়। তা সে রকম কোনও কাণ্ড হলে আমি তো আছি। ছ'লাখ টাকার সম্পত্তি. সোজা কথা?

—তাহলে আমি যাবো, বলছো তুমি?

—যাবে না তো কী এই সোনাগাছিতে পচে মরবে? এখানে ভদ্দরলোকের মেয়েছেলে থাকতে পারে? তুমি নিশ্চয়ই যাবে, কালই দুপুরবেলা যাবে—

তারপর কথাগুলো বলে বাইরের দিকে পা বাড়াচ্ছিল কালীকান্ত। কিন্তু যেতে গিয়েও ফিরে দাঁড়ালো। বললে—দশটা টাকা দিতে পারো সুখদা?

সুখদা বললে—টাকা কী হবে?

কালীকান্ত বললে—তুমি হাসালে মাইরি, টাকায় কী না হয় তাই বলো। এই যে বাড়িউলি মাসিকে দশটা টাকা গুণোগার দিলুম, সেই টাকাটা অন্ততঃ তুমি শোধ করো—

সুখদা আর বাক্যব্যয় করলে না। আলমারি খুলে দশটা এক টাকার নোট বার করে কালীকান্তর হাতে দিতেই সে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে গেল।

তারপর বারান্দা পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে একতলায় নেমে একেবারে সদর গেটে এসে দাঁড়ালো। দরোয়ান দাঁড়িয়ে ছিল। পাশে কয়েকজন মেয়েও জটলা করছিল। দরোয়ানটার হাতে একটা টাকা গুঁজে দিয়ে হন হন করে দুর্গাচরণ মিত্তির স্ট্রীটের ভিড়ের মধ্যে কালীকান্ত অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

পরদিন ঝাঁ ঝাঁ করছে দুপুর।

একটা চাদর মুড়ি দিয়ে সুখদা ঘর থেকে বেরোল। আগের রাতে এপাড়ায় সারা রাত ফুর্তি চলেছে। সমস্ত পাড়া তখন ঘুমোচ্ছে অঘোরে। গেটের কাছে এসে দেখলে দরোয়ানও ঝিমোচ্ছে। আস্তে আস্তে দরজার খিলটা খুলে আবার সেটা ভেজিয়ে দিলে। তারপর সোজা রাস্তা। গলিটা এঁকেবেঁকে একেবারে বড় রাস্তায় পড়েছে। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে সোজা উত্তরদিকে বরাবর চলা। তারপর একটা রাস্তা ছেড়ে অন্য একটা রাস্তা ধরে মাধব কুণ্ডু লেন।

মাধব কুণ্ডু লেনেও তখন ভরা দুপুরের নিস্তব্ধতা।

বাহাদুর সিং হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে একটা সেলাম করলে। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলে—দিদিমণি—

সুখদা জিজ্ঞেস করলে—তুমি ভালো আছ বাহাদুর?

বাহাদুর বললে—হ্যাঁ দিদিমণি, ভালো—

—মা-মণি কোথায়, ওপরে? আমি মা-মণির সঙ্গে একবার দেখা করতে এসেছি—

বাহাদুর বলতে যাচ্ছিল—আমি ধনঞ্জয়কে খবর দিচ্ছি—

সুখদা বললে—না, তুমি আরাম করো, কাউকে খবর দিতে হবে না, আমি একলাই ওপরে যেতে পারবো—

বলে সুখদা ভেতর-বাড়ির দিকে চলে গেল।

ভেতরে ঢুকেই সিঁড়ির মুখে তরলার সঙ্গে দেখা।

—ওমা, দিদিমণি!

মুখে যেন কথা আটকে গেল তরলার। চোখ দিয়ে হঠাৎ ঝর ঝর করে জল পড়তে লাগলো তার। বললে—এমন করে আমাদের ভুলে যেতে হয় দিদিমণি!

সুখদা বললে—শুনলুম মা-মণি নাকি এখন অনেকটা ভালো হয়ে উঠেছে—

—ওমা, কোথায় ভালো! মা-মণি কথা বলতেও পারে না, লোকও চিনতে

পারে না। ওই ঘরে গিয়ে দেখ না, শুয়ে শুয়েই সব করছে। তাই ভাবি অমন ভালোমানুষের এমন হলো। মা-মণি তো কারোর কোনও ক্ষেতি করেনি কখনও, তবে তার কেন এমন হলো—

সুখদা আর দেরি করলে না। সোজা মা-মণির ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। সেই শোবার ঘর, সেই খাট, সেই মানুষ! আগে যেমন দেখে গিয়েছিল ঠিক তেমনি করেই পড়ে আছে। চোখ দুটো বোঁজা।

সুখদা আস্তে আস্তে খাটখানার কাছে এগিয়ে গেল।

একদৃষ্টে দেখতে লাগলো মা-মণিকে। আরো রোগা, আরো বুড়ো হয়ে গেছে। শরীরটা মিশে গেছে বিছানার সঙ্গে। অথচ এককালে এই মানুষের কী-ই না রূপ ছিল। বয়েস হয়েছিল বহুদিন, কিন্তু রূপ তা বলে এতটুকু কমেনি। মাথার কাছে মেঝের ওপর বাদামী শুয়ে ছিল।

সুখদাকে দেখে সেও উঠে বসতে চেষ্টা করলে।

বললে—ওমা, কে? সুখদা নাকি?

সুখদা বললে—উঠো না, উঠো না তুমি কষ্ট করে, শুয়ে থাকো। এই তোমা-দের একটু দেখতে এলুম—

বাদামী চোখে ভালো করে দেখতে পায় না। কানেও কম শোনে।

বললে—আর কী করতেই বা এলে সুখদা! আমি রইলুম আর ওই তোমার মা-মণিই যেতে বসেছে। ভগমান কানা মা, ভগমান কানা। ওর বদলে আমাকে নিতে পারছে না! আমি আর কতদিন পোড়া কপাল নিয়ে থাকবো?

বলে বুড়ি আঁচলে চোখ মুছতে লাগলো।

তারপর একটু সুস্থ হয়ে বললে—ওই মা-মণিকে আমিই বিয়ে দিয়ে সঙ্গে করে শ্বশুরবাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলাম বিয়ের পরের দিন। ভগমানকে তো তাই বলি মা যে, আমাকে এবার নাও ঠাকুর, তা ভগমান কি আর আমার মত পোড়াকপালীর কথা শুনবে?

সুখদা তখনও মা-মণির মুখের দিকে চেয়ে দেখছে একদৃষ্টে। হয়ত আর বেশিদিন বাঁচবে না মা-মণি। ওই তো মাথার কাছেই লোহার সিন্দুকটা রয়েছে। ওর ভেতরে কি এখনও টাকা-কড়ি থাকে? গয়না-গাঁটি থাকে? যদি থাকে তো চাবি কার কাছে? কে চাবি খোলে আর বন্ধ করে?

বাদামী হঠাৎ বললে—আজ আর যেও না মা, আজ রাত্তিরটা এখানেই থেকে যাও তুমি—

তরলা পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল। সেও বললে—হ্যাঁ দিদিমণি, বাদামী ঠিকই বলেছে, দুটো দিন এখানে থেকে যাও। আমরা যে কী কষ্টে আছি তোমাকে কী বলবো দিদিমণি!

সুখদা জিজ্ঞেস করলে—মা-মণি কি কথা বলতে পারে না?

বাদামী বললে—কথা বলবে কী বাছা, হাত-পা পর্যন্ত নড়াতে পারে না মা-মণি! কী কষ্টে যে আমরা দিন কাটাচ্ছি তা আমরাই জানি।

সুখদা হঠাৎ বললে—আমি যদি এখানে কিছুদিন থাকি বাদামী-দিদি তো তোমাদের কিছু আপত্তি আছে?

তরলা বললে—ওমা, ওকথা বলছো কেন দিদিমণি, তুমি কি এ বাড়ির পর নাকি গো! এ তো তোমার নিজের বাড়ি। আমরাই তো পর। আমরা বাইরে থেকে এ বাড়িতে গতর খাটাতে এসেছি পেটের দায়ে—

কথাগুলো শুনতে শুনতে সুখদার চোখ দুটো যেন ভারি হয়ে এলো।

বললে—ওকথা বোল না তরলা, আমিও পর, তুমি কিছু জানো না তাই বলছো—

তরলা বললে—ছি, ওকথা বলতে আছে! রাঙা পিসির কত সাধের নাতনী তুমি। কত ছোট ছিলে তুমি, তোমাকে কত ছোট দেখেছি আমি। তোমার ঘরখানা এখনও খাঁ খাঁ করছে। ও ঘরে যাই আর আমার মনটা হু হু করে কেবল—

—আচ্ছা তরলা, আমি চলে যাবার পর কেউ আমার সম্বন্ধে কিছু বলেনি?

তরলা বললে—কেন, কে কী বলবে?

সুখদা বললে—আমাকে পুলিশে ধরে নিয়ে গিয়েছিল বলে মা-মণি কিছু বলেনি?

তরলা বললে—মা-মণির কি কিছু হুঁশ ছিল তখন?

—কিন্তু পরে যখন হুঁশ হলো?

—পরেও আর হুঁশ হয়নি মা। সেই থেকেই তো বেহুঁশ হয়ে রয়েছে মানুষটা।

সুখদা হঠাৎ যেন মনে মনে সিদ্ধান্ত করে ফেলেছে। বললে—দেখ তরলা, আমি তাহলে আজকে থাকবো এখানে। আজকের রাতটা—

তরলা বললে—জামাইবাবু যদি কিছু না বলে তাহলে তুমি থাকো না! আর তাছাড়া আজকেই শুধু কেন, এখন কিছুদিন থাকো না!

—জ্ঞান হলে মা-মণি রাগ করবে না তো?

তরলা বললে—কী যে তুমি বলো সুখদাদিদি তার ঠিক নেই। তোমার সেই মা-মণিকে কি তুমি ভুলে গেলে নাকি?

সুখদা বললে—কিন্তু যখন শুনবে আমি চোর, আমি চুরি করেছি—

তরলা বললে—ওমা, কে বলেছে তুমি চোর?

সুখদা বললে—এ বাড়ির সবাই তো তাই জানে। ধনঞ্জয়, দুখমোচন, অর্জুন, কারোর তো জানতে আর বাকি নেই। আর ম্যানেজারবাবুও তো সবই জানে—

তরলা বললে—তা যে যা জানে জানুক গে। ওরা তো পর। ওরা তো বাইরের লোক। তোমার চেয়ে আপনজন আর কে আছে বলো না! কেউ যদি কিছু বলে তো তোমার কী? তুমি পরের কথা কেন শুনবে?

বলে সুখদার হাত ধরে টানলে। বললে—চলো, চলো তোমার ঘরে চলো—ওসব কথা ভেবো না—

সুখদাকে তার ঘরে নিয়ে গিয়ে তরলা বললে—এ তোমার বাড়ি, তোমার ঘর। তুমি এ বাড়িতে থাকবে তার আর বলাবলি কী? নাও, এখন একটু শুয়ে পড়ো, দুপুরবেলা তেতেপুড়ে এসেছো, একটু জিরোও—

তরলা চলে যাচ্ছিল তার নিজের কাজে।

সুখদা আবার ডাকলে। বললে—আর একটা কথা তরলা—

তরলা ফিরে দাঁড়ালো।

—আচ্ছা সেই সে আছে?

—কে?

—ওই সেই ম্যানেজারবাবুর ভাগ্নে, সুরেন?

তরলা বললে—ওমা, সে থাকবে না তো যাবে কোথায়? সবাই আছে। তুমি ছাড়া আর এ বাড়িতে সবাই আছে। আমি যাই দিদিমণি, মা-মণিকে গিয়ে আবার ওষুধ খাওয়াতে হবে এখন—

হঠাৎ সিঁড়ি থেকে ম্যানেজারবাবুর গলা শোনা গেল।

—ও তরলা, তরলা—

সুখদার সমস্ত শরীরটা যেন অবশ হয়ে গেল। তাহলে বোধহয় ম্যানেজারবাবু টের পেয়ে গেছে যে সে এসেছে। বিছানার ওপর বসে ছিল সুখদা। ম্যানেজারবাবু আসছে শুনে সে উঠে দাঁড়ালো।

—হ্যাঁ রে তরলা, সুখদা দিদিমণি এসেছে বুঝি? কই, কোথায়, মা কোথায়?

বলতে বলতে বারান্দা পেরিয়ে একেবারে সুখদার ঘরের সামনে এসে হাজির হলো।

বললে—কই, আমার সুখদা মা কই—

তরলাও নির্বাক, সুখদাও তাই।

ভূপতি ভাদুড়ী কিন্তু দমবার পাত্র নয়। সুখদাকে দেখতে পেয়ে বললে—এই এখনি আমি বাহাদুরের কাছে শুনলুম তুমি মা এতদিন পরে এসেছ। তা এসে ভালোই করেছ। আর কী দেখতে এসেছ মা, এ বাড়ির হাল সেই রকমই আছে! তুমি এসেছ, নিজের চোখে সব দেখে যাও। তোমার কাছে এই যাবো যাবো করছিলুম মা। এখন ভালোই হলো মা যে, তুমি নিজেই এসেছো।

তারপর তরলার দিকে চেয়ে বললে—হ্যাঁ গো তরলা, মা-মণিকে তুমি ওষুধ খাইয়েছ নাকি?

তরলা বললে—এইবার খাওয়াতে যাচ্ছি—

ভূপতি ভাদুড়ী ছটফট করে উঠলো—এখন খাওয়াতে যাচ্ছো? এই দ্যাখ, এই করেই তোমরা দেখছি মা-মণিকে মেরে ফেলবে। আমি যেদিকে না দেখবো সেই দিকেই চিত্তির। যাও যাও, শিগগির ওষুধটা খাইয়ে এসো গে—

বলতে বলতে আবার সুখদার দিকে চাইলে।

বললে—দেখলে তো মা, তরলার আক্কেলখানা দেখলে তো? আমি একা মানুষ, হাজারটা ঝামেলা আমার, আমি কতদিকে নজর দিই বলো তো?

তরলা ততক্ষণে মা-মণিকে ওষুধ খাওয়াতে ঘর ছেড়ে চলে গেছে।

সুখদা তখনও ম্যানেজারবাবুর কথার কোনও উত্তর দিলে না।

ভূপতি ভাদুড়ী নিচেয় নামতে গিয়েও আবার ফিরে দাঁড়ালো।

বললে—একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি মা, তুমি যে এখানে চলে এসেছ, তা মাসী জানে? মানে মাসীকে বলে-কয়ে এসেছ?

সুখদা বললে—না—

—না মানে?

সুখদা বললে—ও বাড়িতে সবাই তখন ঘুমোচ্ছিল—

—তা ঘুমোচ্ছিল যদি তো কাউকে জাগিয়ে তুলে বলে এলে না কেন?

সুখদা আবো সামলে নিলে নিজেকে। বললে- তাহলে যে মাসী কিছুতেই আসতে দিত না আমাকে।

ভূপতি ভাদুড়ী এমন স্পষ্ট উত্তরে খানিকটা হতবাক্ হয়ে গেল যেন। এমন সাহস মেয়েটা পেলে কোত্থেকে! এমন তেজ তো আগে ছিল না মেয়েটার!

বললে—কিন্তু তোমার নামে যে কেস চলছে মা, সেটা বুঝি তোমার মনে ছিল না? এরপর যদি কোর্ট থেকে তোমার নামে হুলিয়া বেরোয় তখন কী করবে? তখন যে পুলিশ এসে তোমার হাতে হাতকড়া পরাবে। তখন তো আমি তোমাকে বাঁচাতে পারবো না। তুমি কার পরামর্শে এখানে এলে? কে তোমাকে এখানে আসতে শলাপরামর্শ দিয়েছে বলো তো? কালীকান্ত! কালীকান্ত বিশ্বাস?

সুখদা চুপ করে রইল। কিছু উত্তর দিলে না।

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—কই, জবাব দিচ্ছ না যে মা? জবাবটা দাও, অন্ততঃ আমি জেনে নিই কে তোমার পেছনে আছে—

সুখদা বললে—আপনি যা ইচ্ছে করতে পারেন, আমার খুশী আমি এখানে এসেছি—

—তোমার খুশী?

সুখদা বললে—আমাকে আর জ্বালাবেন না, আপনি এখন যান আমার সামনে থেকে—

ভূপতি ভাদুড়ী অপমানে গর গর করতে লাগলো। কিন্তু মুখে যা আসছিল তা আর বাইরে প্রকাশ করলে না।

বললে—ঠিক আছে, দেখি আমি এর কী বিহিত করতে পারি। আমার অনেক টাকা গেছে নরেশ দত্তর পেটে, অনেক টাকা গেছে পুলিশের পেটে, আবার আরো অনেক টাকা গেছে মানদা দাসীর পেটে, এখন দেখি আমার বুড়ো হাড়ে আর কি ভেলকি খেলাতে পারি—

বলে সিঁড়ি দিয়ে তর তর করে নিচেয় নেমে গেল।

সাধারণতঃ এই সব ব্যাপারে উকিল, এ্যাটর্ণী, পুলিশ বেশ মোটা কিছু পেয়ে যায়। সংসারে মানুষের সম্পত্তি নিয়ে যত ঝামেলা হবে, তাদের তত লাভ।

ভূপতি ভাদুড়ী আর দেরি করলে না। বাড়ি ভাড়ার টাকাগুলো তখনও তার ক্যাশবাক্সে ছিল। তার থেকে শ' দুই টাকা পকেটে পুরলে। তারপর ছাতাটা নিলে। চটি জোড়া পায়ে গলিয়ে দিলে। তারপর দুর্গা দুর্গা বলে রাস্তায় বেরোল।

হরনাথবাবু তখন কোর্টে। কোর্টে হঠাৎ ভূপতি ভাদুড়ীকে দেখে উকিল-বাবু অবাক।

বললে—এ কি ম্যানেজার, তুমি যে?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—আজ্ঞে, আপনার কাছেই এলুম—

হরনাথবাবু বললে—আবার কী হলো? মা-মণির জ্ঞান হয়েছে?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—আজ্ঞে তা না, আর এক সর্বনাশ হয়েছে। আর এক ভাগীদার এসে হাজির হয়েছে বাড়িতে—

—কে ভাগীদার?

সেই যে সেই এক মাগী ছিল বাড়িতে, যাকে সেই চুরির আসামী করে বাড়ির বাইরে হটিয়ে দিয়েছিলুম, সে হঠাৎ আবার আজকে এসে হাজির হয়েছে।

—সেই সুখদা দাসী!

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—হ্যাঁ, সেবার আপনার পরামর্শে তো তাকে মানদা দাসীর কাছে রেখে এসেছিলুম। সেখান থেকে পালিয়ে এসেছে—এখন কী হবে? এ তো দেখছি আমার সব টাকাগুলো গচ্চা গেল।

হরনাথবাবু বললে—ঠিক আছে, এখন আমি একটু ব্যস্ত আছি, রাত্তিরে তুমি আমার বাড়িতে এসো। একটা মতলব বার করতে হবে—

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—না, আর দেরি করবেন না উকিলবাবু, এখুনি একটা কিছু মতলব দিন, আর একটা দিনও ওকে থাকতে দেবো না আমাদের বাড়িতে। কী মতলবে এসেছে কে জানে! আমার মনে হচ্ছে পেছনে বদমাইশ জামাইবেটা আছে, সেই কালীকান্ত বিশ্বাস। বেটা নরেশ দত্ত যে আমার পিছনে

কী বাঁশই দিয়ে গেছে! নিজে মরে গেল, কিন্তু শালটাকে আমার পেছনে ঢুকিয়ে দিয়ে গেল—

—ঠিক আছে, একটা কাজ করো!

—কী কাজ?

—মানদা দাসীকে দিয়ে সেকশান ফোর টুয়েন্টির একটা কেস ঠুকে দিতে বলো কোর্টে। চুরি-চামারি করে দুর্গাচরণ মিত্তির স্ট্রীটের বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে—

মতলবটা মন্দ নয়! মাথাটা যেন একটু ঠান্ডা হলো ভূপতি ভাদুড়ীর, বললে—ঠিক আছে, আমি রাত্তিরে যাবো'খন আপনার বাড়ি—

কিন্তু কথা শেষ হবার আগে হরনাথবাবু হন হন করে বাইরে বেরিয়ে গেল। তার তো আর একটা মক্কেল নিয়ে থাকলে চলবে না!

ভূপতি ভাদুড়ী কোর্ট থেকে আবার মাধব কুণ্ডু লেনের বাড়ির দিকে পা বাড়ালো। যেন অনেকটা স্বস্তি পেয়েছে মনে। মানদা দাসীকে দিয়ে একটা কেস ঠুকে দিতে হবে, তবে মাগী জব্দ হবে।

কিন্তু বাড়িতে এসেও মাথার মধ্যে ঘুর ঘুর করতে লাগলো কথাটা। কিছুতেই যেন আর সন্ধ্যে হয় না। সন্ধ্যে হলেই উকিলবাবুর বাড়িতে গিয়ে সব বন্দোবস্ত পাকা করতে হবে।

সন্ধ্যে যখন ঠিক হবো হবো, ভূপতি ভাদুড়ী বেরোতে যাবে, তখন হঠাৎ বাইরে থেকে কে যেন ডাকলে—ম্যানেজারবাবু, ম্যানেজারবাবু—

ভূপতি ভাদুড়ী চিৎকার করে জবাব দিলে—কে?

—আজ্ঞে আমি ধনঞ্জয়!

—ধনঞ্জয়, কী খবর?

দরজাটা খুলতেই ভূপতি ভাদুড়ী চমকে উঠলো ধনঞ্জয়ের চেহারা দেখে!

—কী রে, মা-মণির কিছু হয়েছে নাকি?

ধনঞ্জয় বললে—আজ্ঞে ভাগ্নেবাবু!

—ভাগ্নেবাবু? আমার ভাগ্নে সুরেন? তার কী হয়েছে?

—আজ্ঞে সুরেনবাবু খুন করেছে।

ভূপতি ভাদুড়ীর মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো।

বললে—বলছিস কী তুই? কাকে খুন করেছে সুরেন? কোথায় খবর পেলি তুই? কে খবর দিলে তোকে?

মানুষ কি সহজে মানুষ হয়? গাছপালা কিন্তু বড় সহজেই গাছপালা। পশু-পাখীও বড় সহজেই পশু-পাখী। অনেক আনন্দ, অনেক যন্ত্রণা অতিক্রম করে, অনেক বাধা উত্তীর্ণ হয়ে তবে মানুষকে মানুষ হতে হয়। এই মানুষ হওয়ার চেষ্টাতেই সুরেন একদিন নিঃসহায় হয়ে গ্রাম থেকে এসে পৌঁছেছিল এই সহরে। তারপর কত বিরাগ, কত অনুরাগের সমুদ্রে অবগাহন করে যেখানে এসে সে দাঁড়িয়েছিল, সেখান থেকে আর সে ফিরে যেতে পারেনি। যত বাধাই আসুক, তাকে তখন তা অতিক্রম করতে হবেই।

শুধু ভূপতি ভাদুড়ী নয়, কথাটা সকলের কানেই এসেছিল। নিরীহ ছেলে

সুরেন কেন এমন কাজ করতে গেল? কী তার উদ্দেশ্য ছিল?

দেবেশ পার্টির কাজে বীরভূমে গিয়েছিল।

শেয়ালদা স্টেশনের প্ল্যাটফরমে নেমেই খবরটা সে পেলে।

পার্টির ছেলেমেয়েরা কেউ কেউ গিয়েছিল স্টেশনে। দেবেশদাকে দেখেই একজন এগিয়ে গেল। দেবেশ জিজ্ঞেস করলে—কী খবর?

—শুনেছ দেবেশদা, সুরেনদা মার্ডার করেছে।

—মার্ডার?

—হ্যাঁ, প্রজেশ সেনকে খুন করেছে সুরেনদা।

দেবেশ অবাক হয়ে গেল। বললে—প্রজেশ সেনকে? প্রজেশ সেন কী করেছিল? কী করেছিল প্রজেশ সেন?

—তা জানি না।

—কখন খুন করেছে?

—আজই বিকেলবেলা। আমি বাসে আসতে আসতে শুনলুম।

—কী ভাবে খুন করলে?

—শুনছি তো রিভলবার দিয়ে। কোত্থেকে রিভলবার পেলে তাও বুঝতে পারছি না।

দেবেশ বললে—তোরা যা, আমি দেখছি, আমি একবার যাচ্ছি মাধব কুণ্ডু লেনে। কী খবর সেটা জেনে আসতে হবে।

তারপরে আর দাঁড়ায়নি সেখানে দেবেশ। সামনে ভোটের ঝামেলা আছে সারা দেশের লোককে সজাগ করে দিতে হবে। একলা মানুষ কত দিকে দেখবে সে! মোড়ের ওপর থেকে একটা বাস ধরেই একেবারে সোজা মাধব কুণ্ডু লেনের সামনে এসে নামলো। দূর থেকে দেখা গেল বাড়িটার গেটের সামনে যেন অনেক লোকের ভিড় জমেছে।

দেবেশ সামনে এগিয়ে গেল।

গেটের সামনে বাহাদুর দাঁড়িয়ে আছে। কাউকে ঢুকতে দিচ্ছে না।

দেবেশ গিয়ে ছেলেদের জিজ্ঞেস করলে—এখানে কী হয়েছে ভাই?

একজন বললে—এ বাড়িতে পুলিশ এসেছে সার্চ করতে।

—কেন?

ভদ্রলোক বললে—আপনি শোনেননি কিছু? গ্রে স্ট্রীটে এক ভদ্রলোককে খুন করেছে এ বাড়ির একটা ছেলে—

দেবেশ জিজ্ঞেস করলে—কিন্তু সেই ছেলেটা কোথায়?

ভদ্রলোক বললে—তাকেও পুলিশ ধরে এনেছে। বাড়ির ভেতরে গেছে--

বাড়ির ভেতরে কাউকেই ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। কিন্তু সকলেরই আগ্রহ যে খুন করেছে তাকে দেখবে। এই বাড়ির ছেলে সুরেনকে তারা আগে কখনও দেখেনি তা নয়। তারা জানে এ বাড়ির বুড়ো ম্যানেজারবাবুর ভাগ্নে সে। ছোট বেলা থেকেই তারা তাকে দেখে এসেছে। কিন্তু আজকে আসামী সুরেন সান্ন্যালকে দেখতে যেন তাদের বড় লোভ। তারা দেখবে খুনী আসামীকে কেমন দেখতে লাগে। যে মানুষ খুন করে তার কিছু বৈশিষ্ট্য আছে নিশ্চয়ই।

নানা রকম কথা মুখে মুখে ফিরছিল। কেউ বলছিল রিভলবার দিয়ে খুন করেছে। কেউ আবার বলছে ছোরা দিয়ে। কেউ বলছে বোমা মেরে।

কিন্তু খুন করলেই বা কেন?

একজন বললে—এ মশাই পলিটিক্যাল ঝগড়া—কমিউনিষ্ট পার্টির মেম্বার

ছিল সুরেন।

দেবেশ পাশে দাঁড়িয়ে শুনছিল সব। তার কোনও কথাই যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না। প্রজেশ সেনকে সুরেন খুন করতে যাবেই বা কেন? আর তাছাড়া সুরেন তো সে জাতের ছেলেই নয়। সে যতখানি অনুভব করে, তার চেয়ে প্রকাশ করে কম! আর রিভলবার দিয়েই যদি খুন করে থাকে তো রিভলবার সে পেলে কোথা থেকে? কে তাকে রিভলবার দিলে? সে রিভলবার চালাতে শিখলো কোথায়?

রাত ঘন হয়ে আসছে আরো। দুদিন ধরে বীরভূমে অনেক খাটুনি গেছে। ইলেকশনের কাজে মাঠে মাঠে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরতে হয়েছে। নিঃশ্বাস ফেলবার সময় ছিল না ক'দিন ধরে। দিনরাত খাওয়া নেই, শোওয়া নেই, কেবল দরজায় দরজায় ঘুরেছে। ভোটের ব্যাপারে ওদিকটায় যেন কোনও ফাঁকি না থাকে। তার মধ্যে হঠাৎ এই দুর্ভোগ।

বাড়িটার ভেতর থেকেও কাউকে বাইরে বেরুতে দেওয়া হচ্ছে না, বাইরে থেকেও কাউকে ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না।

হঠাৎ মনে হলো যেন পুলিশের দল এতক্ষণে উঠোন পেরিয়ে বাইরের দিকে আসছে।

ভিড়ের মধ্যে সবাই চুপ হয়ে গেল। এবার সব রহস্যের উন্মোচন হবে। এবার উসখুস শুরু হলো ভিড়ের মধ্যে।

দেখা গেল একদল পুলিশ উঠোন পেরিয়ে সামনে আসতেই বাহাদুর গেট খুলে দিলে, তাদের মাঝখানে সুরেন আর টুলু!

টুলুকে দেখে চমকে গেল দেবেশ। টুলু এর মধ্যে কেন?

গেটের বাইরে আসতেই দেবেশ এগিয়ে গেল। হয়ত কিছু জিজ্ঞেস করতে গিয়েছিল ওদের। কিন্তু পুলিশ দেবেশকে দূরে সরিয়ে দিলে।

সুরেন আর টুলুও তাকে দেখতে পেয়েছিল। দুজনের চেহারাই যেন কেমন গম্ভীর গম্ভীর। চারদিকের ভিড় থেকে আত্মগোপন করতে অস্থির। দেবেশের দিকে দেখেও যেন কেউ দেখলে না ভালো করে।

সামনেই একটা লোহার জাল ঘেরা ভ্যান দাঁড়িয়ে ছিল, তার ভেতরেই পুলিশরা দুজনকে পুরে দিলে। তারপর ইঞ্জিনটা স্টার্ট দিয়ে গাড়িটা বড় রাস্তার দিকে চলে গেল।

আশেপাশে যারা দাঁড়িয়ে ছিল, তারাও তখন আস্তে আস্তে নড়তে শুরু করেছে। তাদের মুখে নানা রকম আলোচনা। সুরেনই যদি খুনী হয় তো ঐ মেয়েটা আবার কে?

একজন বললে—মেয়েটা কমিউনিষ্ট পার্টির মেম্বার, চেহারা দেখে বুঝতে পারছিস না?

আর একজন বললে—আরে তা নয়, আসলে ওই মেয়েটাই খুন করেছে—

আগের লোকটা বললে—মেয়েটা যদি খুন করে থাকে তো ছেলেটাকেই বা পুলিশ ধরেছে কেন?

কে একজন পাশ থেকে বললে—এক ঝাড়ের বাঁশ যে।

আশপাশের লোকজন কথাটা শুনে হাসলো।

দেবেশ আর থাকতে পারলে না। বললে—আপনারা না জেনেশুনে কী সব বলছেন? জানেন আমি দুজনকেই জানি! দুজনের কেউই খুন করেনি। কেউ খুন করতে পারে না—

—আপনি কে মশাই?

দেবেশ বললে—আমি যে-ই হই, আপনারা ভদ্রলোকের ছেলেমেয়ের নামে যা-তা বলছেন কেন?

হঠাৎ নজরে পড়লো সুরেনের মামাকে। ভূপতি ভাদুড়ী পুলিশের পেছন পেছন রাস্তা পর্যন্ত তাদের এগিয়ে দিতে এসেছিল। তখনও তার চোখ ছল ছল করছে।

বললে—হ্যাঁ বাবা, তুমি তো সুরেনের বন্ধু, তোমাকে তো আমার সুরেনের সঙ্গে অনেকবার দেখেছি। তুমি তো এ বাড়িতে অনেকবার এসেছো—

দেবেশ বললে—হ্যাঁ, সুরেন আমার বন্ধু। আমি আপনাকে চিনি—

ভূপতি ভাদুড়ী যেন অকূলে কূল পেলে।

বললে—এখন কী হবে বাবা? আমার যে ভয়ে হাত-পা বুকের মধ্যে সেঁদিয়ে যাচ্ছে। বাড়ির ভেতর পুলিশ দেখে আমার বুকের আদ্দেক রক্ত শুকিয়ে গেছে। দারোগা পুলিশকে আমি বড্ড ভয় করি বাবা, সেই পুলিশ কিনা আমার বাড়িতে ঢুকলো—

—কী সার্চ করলে?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—সব সার্চ করলে। যে ঘরে সুরেন শুতো, সে ঘরের সব উল্টেপাল্টে তছনছ করে দিয়েছে।

—কিছু পেয়েছে নাকি ধরবার মত?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—না, কিছু তো নিয়ে গেল না। কিন্তু ও মেয়েটাকে ধরেছে কেন বাবা? ও কী করেছে?

দেবেশ বললে—আমি তো ক'দিন কলকাতায় ছিলুম না। আমি কী করে জানবো? আমি তো আজই শেয়ালদা স্টেশনে এসে খবরটা শুনলুম, শুনেই সেখান থেকে সোজা চলে এসেছি এখেনে—

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—আমার তো মনে হয় ওই মেয়েটাই খুন করেছে। মেয়েছেলেদের বিশ্বাস নেই—তুমি কী বলো বাবা? আমার সুরেনকে আমি চিনি, সে তো এমন কাজ করার ছেলে নয়। এখন কী করি বলো তো বাবা, উকিলের কাছে যাবো? জামিনের চেষ্টা করবো?

দেবেশ বললে—জামিনের চেষ্টা করতে পারেন, কিন্তু খুনের আসামীকে এখনই জামিনে খালাস দেবে বলে মনে হয় না। উকিলের কাছে গিয়ে দেখুন, তিনি কী বলেন!

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—কিন্তু ওই মেয়েটাই তো বলছে ও খুন করেছে, সুরেন করেনি—

দেবেশ বললে—কে বললে আপনাকে? টুলু বললে?

—টুলু কে?

দেবেশ বললে—ওই মেয়েটার নামই তো টুলু। আমি তো ওকে চিনি। ও বলেছে ও খুন করেছে?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—আমাকে কেন বলবে? ওই পুলিশকেই বলছিল—আমি প্রজেশ সেনকে খুন করেছি, ওকে ছেড়ে দিন—

—কিন্তু টুলু কেন প্রজেশ সেনকে খুন করতে যাবে? ওর কীসের স্বার্থ?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—তা তো বুঝতে পারছিনে বাবা। দুজনে তো দু-রকম কথা বলছে, সুরেন বলছে—আমি মেরেছি, মেয়েটা বলছে—আমি মেরেছি। আমরা কার কথা বিশ্বাস করবো? তা প্রজেশ সেনকে তুমি চেনো নাকি বাবা? কে প্রজেশ সেন? এদের সঙ্গে তার কীসের সম্পর্ক?

দেবেশ বললে—সে আপনি চিনবেন না। সে কংগ্রেস পার্টির লোক! কিন্তু আজকে সুরেন বাড়ি থেকে কখন বেরিয়েছিল?

—দুপুরবেলা। আমি সকালবেলাও দেখেছি ওর এক বন্ধুর সঙ্গে গল্প করছে।

—কে বন্ধু? কী রকম বন্ধু?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—ওই যে গাড়ি চালিয়ে মাঝে মাঝে সুরেনের কাছে আসে। সে চলে যাবার পর খেয়েদেয়ে সুরেনও দেখলুম জামাকাপড় পরে বেরোচ্ছে। ও রকম তো রোজই বেরোয়। তবে আজকে একটু সকাল সকাল বেরোল দেখলুম—

—তারপর?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—তারপর আমারও তো অনেক কাজের ঝামেলা, আমিও নিজের কাজে বেরিয়ে গিয়েছি। বিকেলবেলা বাড়িতে এসে দেখি আর এক ঝামেলা। সে-সব ঝামেলার কথা বললে তুমি বুঝবে না বাবা। সেই নিয়ে আমাকে উকিলের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে একবার কোর্টে যেতে হয়েছিল। ফিরতে ফিরতে বিকেল। তারপর সন্ধ্যেবেলা বেরোব বেরোব করছি, এমন সময় ধনঞ্জয় এসে খবরটা দিলে। বললে—আমার ভাগ্নে নাকি কাকে খুন করেছে—তারপর এই তো এখন পুলিশ এসে হাজির—

তারপর কাপড়ের খুঁট দিয়ে মুখটার ঘাম মুছে নিয়ে বললে—এখন আমি কী করি বলো তো বাবা, কার কাছে পরামর্শ চাই, কে একটা সৎ পরামর্শ দেবে বলো তো?

দেবেশ তখন যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। বললে—আমি কী বলবো বলুন—

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—আমার আর কেউ নেই বাবা আপন বলতে। ওই ভাগ্নেটার মুখের দিকে চেয়ে আমি বেঁচে আছি, আমাব এমন সর্বনাশ কেন হলো বাবা? আমি তো জ্ঞানতঃ কারো কোনও ক্ষতি করিনি। কারো সম্বন্ধে কুচিন্তা করিনি—

—দেখুন, উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করে দেখুন, তিনি যা বলবেন, তাই-ই করবেন।

বলে দেবেশ আর দাঁড়ালো না, আস্তে আস্তে বড় রাস্তার দিকে পা বাড়ালো।

পুণ্যশ্লোকবাবু দুপুরবেলা যতক্ষণ রাইটার্স বিল্ডিং-এ ছিলেন ততক্ষণ কিছু খবর পাননি। টেলিফোনে হয়ত খবর গিয়েছিল, কিন্তু তখন তিনি আর সেখানে নেই। সেখান থেকে কংগ্রেস অফিসে গিয়ে খবর পেলেন যে প্রজেশকে কে নাকি মার্ডার করেছে তার বাড়িতে। শুনেই চমকে গেলেন। কিন্তু প্রজেশকে কে খুন করতে যাবে!

সঙ্গে সঙ্গে লালবাজারে ফোন করলেন।

জিজ্ঞেস করলেন—খবরটা কি সত্যি?

পুলিশ কমিশনার বললে—হ্যাঁ স্যার, সত্যি। তবে এখনও ইনভেস্টিগেশন চলছে। পরে আপনাকে খবর দেবো।

—আমি কি স্পটে যাবো?

পুলিশ কমিশনার বললে—না স্যার, এখন যাবেন না। আমি নিজে খবর রাখছি সব। মনে হচ্ছে অন্য কোনও পলিটিক্যাল পার্টি এর মধ্যে আছে।

—তাহলে এটা কি পলিটিক্যাল মার্ডার?

—হ্যাঁ, তাই তো মনে হচ্ছে। আমি আপনাকে রাত্রে খবর দেবো।

তারপরে পুণ্যশ্লোকবাবুর বাড়িতে ফিরে আসতে রাত হয়েছে। অনেক রাত। সব কাজকর্ম সেরে যখন বাড়ি এসেছেন, তখন ফোন এল।

—স্যার, আপনার রিভলবারটা কি আপনার বাড়িতে আছে?

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—নিশ্চয়ই। আমার রিভলবার যাবে কোথায়? কেন?

পুলিশ কমিশনার বললে—কিন্তু কালপ্রিটের কাছে যে রিভলবার পাওয়া গেছে তার নম্বরের সঙ্গে আপনার রিভলবারের নম্বর একই—

পুণ্যশ্লোকবাবু দমবার পাত্র নয়। বললেন—না না, তা কখ্খনো হতে পারে না। আমার রিভলবার আমার আয়রণ-সেফের মধ্যে থাকে। তার চাবি কোথায় থাকে তাও কেউ জানে না। কী বলছেন আপনি!

—কিন্তু আপনি একবার ভালো করে দেখুন তো।

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—রিসিভারটা ধরুন, আমি এখুনি দেখছি—

বলে চাবিটা যথাস্থান থেকে নিয়ে আয়রণ-সেফটা খুললেন। খুলেই একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। কই, সেটা গেল কোথায়? আমার রিভলবার? সেটা তো বরাবর এখানেই থাকে! কে নিলে এখান থেকে?

পুণ্যশ্লোকবাবুর মাথাটা বোঁ-বোঁ করে ঘুরে গেল। এমন তো হয় না। আজ কত বছর আগে থেকে ওটা রয়েছে, কিন্তু কখনও তো চাবির গোলমাল হয়নি কোনওদিন।

আবার এসে রিসিভারটা ধরলেন। বললেন—না, ওটা তো ওখানে নেই, আপনি ঠিকই বলেছেন—

তারপর আর কী বলবেন যেন ভেবে ঠিক করতে পারলেন না।

শুধু বললেন—কিন্তু আমার রিভলবার কে বার করে নিলে আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার রিভলবারে কেউ তো কখনও হাত দেয় না—

—আপনার বাড়ির সারভেন্ট কি মেড-সারভেন্ট কেউ জানে কোথায় থাকে রিভলবারটা?

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—কী করে জানবে? চাবিটা তো আমি লুকিয়ে রাখি। তাদের সামনে আমি কখনও বারই করি না। তাছাড়া আজ পাঁচ বছর ওটা রয়েছে আমার কাছে, আমি তো কখনও হাতও দিইনি। দু'বার দিল্লী যাবার সময় শুধু ওটা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলুম—

—আপনার ছেলে বা মেয়ে?

—ছেলে তো এই সবে আমেরিকা থেকে এসেছে. সে জানেও না যে আমার রিভলবারের লাইসেন্স আছে। আর মেয়ে? মেয়ের সঙ্গে আমার দেখাই বা হয় কখন? সে তো সারাদিন তার নিজের ঘরে থাকে। আজকাল সে কারো সঙ্গে মেলামেশাও করে না—

পুলিশ কমিশনার বললে—ঠিক আছে স্যার, আমি জানাবো পরে কী হলো—

দুজনেই রিসিভার রেখে দিলেন। কিন্তু পুণ্যশ্লোকবাবু আর এক মুহূর্তও দাঁড়ালেন না সেখানে। ঘর থেকে বেরিয়েই ছেলের ঘরে গেলেন।

ডাকলেন—সুব্রত—সুব্রত—

পুণ্যশ্লোকবাবুর গলা তখন কাঁপছে। সুব্রত বেরিয়ে আসতেই বললেন—সুব্রত, তুমি আমার রিভলবারে হাত দিয়েছিলে?

সুব্রত অবাক হয়ে গেছে।

—আপনার রিভলবার?

—হ্যাঁ, আয়রণ-সেফের ভেতরে আমার রিভলবার থাকতো—সেটা কোথায় গেল?

সুব্রত বললে—কিন্তু আমি তো তা জানি না—

—তাহলে রঘুকে ডাকো। —রঘু—রঘু—

বলে নিজেই ডাকতে লাগলেন। বাগানের কোণের দিকে রঘু থাকে। রাত্রে সমস্ত কাজের পর সে তখন নিজের ঘরের ভেতর ছিল। বাবুর ডাক শুনেই সে দৌড়ে এসেছে।

—তুই আমার ঘরে ঢুকেছিলি?

রঘু উত্তর দিতে গিয়ে একটু বিব্রত হয়ে পড়লো। তারপর বললে—আমি তো ঘর পরিষ্কার করতে ঢুকেছিলুম একবার।

—কখন ঢুকেছিলি?

রঘু বললে—বিকেলবেলা, যখন আমি রোজ ঘর পরিষ্কার করি—

—আমার লোহার সিন্দুকে হাত দিয়েছিলি তুই?

রঘু বললে—না বাবু, আমি শুধু ঝাঁট দিয়ে ধুলো পরিষ্কার করে বাইরে চলে এসেছি—

—এ ঘরে আর কাউকে ঢুকতে দেখেছিলি? জগন্নাথ কিংবা দরোয়ান, মুহুরীবাবু?

রঘু বললে—না, আমি কাউকেই দেখিনি—

—আচ্ছা, দরোয়ানকে ডাক তো—

রঘু যেন নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচলো। তাড়াতাড়ি নিচেয় গিয়ে দরোয়ানকে পাঠিয়ে দিলে।

—দরোয়ান, দুপুরবেলা কেউ বাড়িতে এসেছিল?

—না হুজুর। আমি কাউকে ঢুকতে দিইনি।

সুব্রতর দিকে চেয়ে পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—তুমি কতক্ষণ বাড়িতে ছিলে?

সুব্রত বললে—আমি ভোরবেলা বেরিয়েছিলুম, তারপর বেলা এগারটার মধ্যে বাড়ি ফিরে আসি।

—তারপর? তারপর আর বেরিয়েছিলে?

—হ্যাঁ, দুপুর একটার পর।

—কখন বাড়ি ফিরেছ?

—ছ'টা। তখন ছ'টা হবে।

—তার মধ্যে কাউকে বাড়িতে ঢুকতে দেখেছ?

—না।

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—পর্মিলি কোথায়? পর্মিলি কি সারাদিন বাড়িতে ছিল?

দরোয়ান বললে—দিদিমণি একবার গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছিল।

—কোথায় বেরিয়েছিল? আচ্ছা, ডাকো তো। পর্মিলিকে ডাকো তো একবার—

সুব্রত পর্মিলির ঘরের দিকে গেল। ভেতরে গিয়ে দেখলে পর্মিলির ঘর অন্ধকার। ডাকলে—পর্মিলি পর্মিলি—

পুণ্যশ্লোকবাবু বারান্দা থেকে বললেন—ঘুমিয়ে পড়েছে নাকি?

সুব্রত বললে—হ্যাঁ—

—কিন্তু পর্মিলি বাড়ি থেকে কোথায় বেরিয়েছিল, তুমি জানো?

সুব্রত বললে—তা আমি জানি না। কিন্তু হয়েছে কী? আপনার রিভলবার কোথায় থাকতো?

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—কোথায় আর থাকবে, আমার আয়রণ-সেফের ভেতরে। এখন দেখছি চাবি যেখানে ছিল সেখানেই রয়েছে, কিন্তু আসল জিনিসটাই নেই। এদিকে লালবাজার থেকে খবর পেলাম, প্রজেশ খুন হয়েছে তার বাড়িতে—

—আমাদের প্রজেশদা!

—হ্যাঁ। কালপ্রিট ধরা পড়েছে। আর যে-রিভলবার দিয়ে খুন হয়েছে, সেটা নাকি আমার রিভলবার। কিন্তু আমার সেফ থেকে রিভলবার কেমন করে বাইরে গেল? কে নিয়ে গেল? সামনে ইলেকশান আসছে, ওদিকে পুলিশ ফায়ারিং সম্বন্ধে এনকোয়ারি কমিশন বসেছে। এই সময়ে কিনা এই বিপদ? তোমরা যদি সবাই মিলে আমাকে এমনভাবে হ্যারাস করো, তাহলে আমি কোন্ দিকে যাই—

বলেই এগিয়ে গেলেন পর্মিলির ঘরের দিকে। বললেন—চলো, পর্মিলিকে ডাকি। এত সকাল সকাল সে ঘুমোচ্ছেই বা কেন?

দরজার কাছে গিয়ে ডাকলেন—পর্মিলি—পর্মিলি—

পর্মিলি হয়ত জেগেই ছিল। অনেক ডাকাডাকিতে আর থাকতে পারলে না। বললে—কী?

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন, তোমাকে এত করে ডাকছি, তুমি উত্তর দিচ্ছ না কেন? এসো, তোমার সঙ্গে জরুরী কথা আছে। শিগগির উঠে এসো—

পর্মিলি অনেক কষ্টে যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠে এল। সারাদিন বোধহয় তার খুবই ধকল গেছে।

—তুমি আজ কোথায় বেরিয়েছিলে?

পর্মিলি বললে—এ কথাটা জিজ্ঞেস করতে আমায় এত রাত্তিরে ডাকলে? কেন, সকালে জিজ্ঞেস করলে হতো না?

—না, হতো না। তুমি হয়ত শোনোনি, প্রজেশ খুন হয়ে গেছে—

পর্মিলি এবার ভালো করে পুণ্যশ্লোকবাবুর দিকে মুখ তুলে তাকালো।

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—হ্যাঁ, প্রজেশ খুন হয়েছে তার বাড়িতে। আর সেখানেই আমার রিভলবারটা পাওয়া গেছে—কিন্তু আমার রিভলবারটা সেখানে গেল কী করে, তুমি কিছু জানো?

পর্মিলি খানিকক্ষণ চুপ করে রইল।

—বলো, বাড়ি থেকে বেরোবার সময় তুমি আমার রিভলবার নিয়েছিলে কিনা? বলো—

পর্মিলি বললে—হ্যাঁ, নিয়েছিলুম।

—তুমি নিয়েছিলে?

—হ্যাঁ!

—কেন?

পর্মিলি তেমনি স্পষ্ট গলায়ই উত্তর দিলে—আমি সকলকে খুন করতে চেয়েছিলুম।

—বলছো কী তুমি? সকলকে খুন করতে চেয়েছিলে মানে? তুমি কি পাগল হয়ে গেলে? সে রিভলবার তুমি কাকে দিয়েছিলে?

—দিইনি কাউকে, সুরেন কেড়ে নিয়েছিল আমার কাছ থেকে।

—সুরেন? সে কী করে কেড়ে নিলে? তার সঙ্গে তোমার কোথায় দেখা হলো?

পর্মিলি বললে—সে আমাদের বাড়িতে এসেছিল।

—আবার সে এসেছিল? আমি সকলকে বারণ করে দিয়েছি না যে, তাকে এ বাড়িতে ঢুকতে দেবে না কেউ! কে তাকে ঢুকতে দিলে এ বাড়িতে? দরোয়ান কোথায়? দরোয়ান ছিল না? দরোয়ানকে ডাক তো এখানে—রঘু, দরোয়ানকে ডাক—

পুণ্যশ্লোকবাবুর চিৎকারে সমস্ত বাড়িটা যেন থর থর করে কাঁপতে লাগলো। বাগানের মালী, গ্যারাজের ড্রাইভার, আউট-হাউসের চাকর-বাকর তারাও সাহেবের চিৎকার শুনতে পেলে। আবার সাহেবের কী হলো? ক'মাস থেকেই সাহেবের মেজাজ বিগড়ে গিয়েছিল। ভোটের আগে বরাবর সাহেবের মেজাজ এমনি বিগড়েই যায়। কিন্তু এবার যেন একটু বেশি বিগড়ে গেছে।

জগন্নাথ দেখতে পেয়েছে রঘুকে। জিজ্ঞেস করলে—কী হয়েছে রে? সাহেবের মেজাজ হঠাৎ অমন বিগড়ে গেল কেন?

—দারোয়ান কোথায়? দারোয়ানকে ডাকছে সাহেব।

তখন আর বেশি কথা বলবার সময় ছিল না তার। দারোয়ানকে নিয়ে আবার সে সিঁড়ি দিয়ে দোতলার দিকে উঠতে লাগলো।

কলকাতার মানুষ তখন উত্তেজনার আর একটা নতুন খোরাক পেয়ে গেছে। উত্তেজনার কি আর অভাব আছে সহরের মানুষদের? রোজ সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই খবরের কাগজ পড়বার জন্যে সবাই হাঁ করে থাকে। এক একদিন এক একটা নতুন নতুন খবর পড়ে আর তাই রোমন্থন করেই সারাটা দিন শরীরটা বেশ গরম থাকে। কোনও দিন দুটো গাড়িতে ধাক্কা লাগে, আর কিছু লোক মারা যায়। কিংবা হঠাৎ একটা মিছিল বেরিয়ে বাস-ট্রাম বিপর্যস্ত করে দেয়। কিংবা আছে মীটিং। লাল ফ্ল্যাগ উড়িয়ে এমন লোক জড়ো হয় যে তার ঠেলা সামলাতে সহরের লোককে খেসারত দিতে দিতে প্রাণান্ত হতে হয়।

কিন্তু এক একদিন এমন ঘটনা ঘটে যায়, যার জের বহুদিন কেটে গেলেও থামে না। তেমনি ঘটনা এটা। গ্রে স্ট্রীটের গলির মধ্যে সেদিন বিকেলে যে ঘটনা ঘটেছিল তাও এমনি একটা ঘটনা। বাসে-ট্রামে কোর্ট-কাছারিতে এ ছাড়া যেন আর আলোচনার অন্য বিষয়বস্তু নেই।

—দিনে দিনে কী হলো মশাই!

তক্ষুনি আর একজন ভদ্রলোক পাশ থেকে বলে—এ আর কী হয়েছে মশাই, এরপর দেখবেন পাড়ায় পাড়ায় গুলী-গোলা চলবে। ইংরেজরা চলে গিয়ে দেশের কী হাল হলো রে বাবা—

অন্য এক ভদ্রলোক বলে—আরে মশাই, এর পেছনে রাশিয়ার হাত আছে, তা জানেন? নইলে এত পিস্তল এত রিভলবার আসে কোত্থেকে?

কিন্তু এবারকার সবচেয়ে মজার ঘটনা সেটা নয়। আসলে খুন এমন বড় বড় সহরে হয়েই থাকে। এবার অন্য রকমের মজা। কেমন করে সবাই জানতে পেরেছে এর পেছনে গভীর রহস্য আছে। এই রহস্যের মধ্যে একটা মেয়েও জড়িত আছে।

পুলিশের হাজতখানার ভেতরে টুলুকে আলাদা রেখে দিয়েছে পুলিশ। এক জায়গায় রেখেছে টুলুকে, অন্য একটা জায়গায় রেখেছে সুরেনকে।

টুলুর ঘরে আসে পুলিশের ইনসপেক্টার।

জিজ্ঞেস করে—কেমন আছেন টুলু দেবী? কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো আপনার? অসুবিধে হলে আমাদের বলবেন—

টুলু মাথা নিচু করে থাকে। বলে—না, কোনও অসুবিধে হচ্ছে না—

—আচ্ছা টুলু দেবী, ঠিক করে বলুন তো, আপনি যে বলছেন, আপনি প্রজেশ সেনকে খুন করেছেন, তা কেন ওকে খুন করতে গেলেন? আপনি কি ওকে আগে চিনতেন? ও কি আপনার কিছু ক্ষতি করেছিল?

টুলু কখনও চুপ করে থাকে, কখনও বা দু' একটা কথার উত্তর দেয়। শেষকালে যখন টুলু খুব রেগে যায়, তখন যা-তা বলে ওঠে।

বলে—কেন আমাকে বার বার বিরক্ত করতে আসেন আপনারা? আমি আপনাদের কোনও কথার উত্তর দেবো না, আপনারা আমার যা করতে পারেন করুন—

বলে শাড়ির আঁচলে নিজের মুখ ঢেকে কাঁদতো।

ভূপতি ভাদুড়ীর কিন্তু সেই দিন থেকেই বিশ্রাম চুকে গেছে। একবার করে বাড়ির ভেতরে যায় মা-মণির ঘরে, আর একবার দৌড়ে যায় থানা-পুলিশের কাছে। কোথাও গিয়েই কোনও কিছুর হদিস পায় না। তখন আবার যায় উকিলবাবুর বাড়ি। উকিলও তেমনি। মোটা টাকা বেরিয়ে যায় উকিলের পেছনে।

ভূপতি ভাদুড়ী বলে—তাহলে কী হবে উকিলবাবু?

উকিলবাবু বলে—কী আর হবে! আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন? আমি তো আছি—

যেন উকিলবাবুই ভূপতি ভাদুড়ীর সব মুশকিল আসান করে দেবে!

সেদিন অনেক ধরা-করা করে ভূপতি ভাদুড়ী একবার সুরেনের সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি পেলে। তখন দুপুর পেরিয়ে বিকেল নেমেছে।

গেটের কাছে যেতেই দেখলে সেই ছোকরাটা আসছে। সুরেনের বন্ধু।

দেবেশও দেখেছে ভূপতি ভাদুড়ীকে।

ভূপতি ভাদুড়ী হাউ হাউ করে কান্নায় ভেঙে পড়লো। বললে—তুমি কি বাবা সুরেনের সঙ্গে দেখা করলে নাকি?

দেবেশ বললে—হ্যাঁ—

—কেমন আছে বাবা সে?

দেবেশ বললে—সুরেন ছাড়া পাবে।

বলে দেবেশ চলে যাচ্ছিল, কিন্তু ভূপতি ভাদুড়ী ছাড়লে না। একেবারে ঘুরে গিয়ে তার সামনাসামনি দাঁড়ালো।

বললে—কী বললে তুমি? ছাড়া পাবে? নির্দোষ প্রমাণ হবে? আমি তখনই জানি বাবা যে আমার ভাগ্নে তেমন ছেলে নয়। খুন-খারাপির মধ্যে ও যেতে পারে না। তা খবরটা তোমায় কি সুরেনই দিলে?

দেবেশ বললে—না—

—তবে কে দিলে বাবা?

দেবেশ বললে—পুলিশের লোক—

ভূপতি ভাদুড়ীর মুখটা যেন খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো! বললে—পুলিশ যখন বলেছে তখন নিশ্চয়ই আমার সুরেনকে ছেড়ে দেবে, কী বলো বাবা? আমি ঠনঠনের কালীবাড়িতে ওর জন্যে মানত করে রেখেছি বাবা। আমি জোড়া পাঁঠা মানত করে রেখেছি। তোমরা জানো না বাবা, ওই বাপ-মা মরা ছেলেকে আমি ছোটবেলা থেকে কত কষ্টে মানুষ করেছি। এখন বড় হয়ে আমাকে মানতেই চায় না। এখন কমিউনিস্টদের সঙ্গে মেলামেশা করে একেবারে গোল্লায় চলে গেছে বাবা।

বলে ভূপতি ভাদুড়ী জামার খুঁট দিয়ে নিজের চোখ দুটো মুছে নিলে।

তারপর বললে—তাহলে আমি যাই বাবা, একবার ভেতরে গিয়ে দেখা করে আসি। তোমার কথা শুনে যে কত খুশী হলুম তা আর কী বলবো, তোমাদের মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক, তোমরা দীর্ঘজীবী হও বাবা।

ততক্ষণে দেবেশ যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছে। ভূপতি ভাদুড়ী আর দাঁড়ালো না। সোজা হাজতখানার দিকে এগিয়ে গেল। হে মা কালী, হে মা ভগবতী, আমার মনোবাঞ্ছা যেন পূর্ণ হয় মা। আমি তোমায় জোড়া পাঁঠা দেবো মা। তুমি আমার সুরেনকে ফাঁসির কাঠগড়া থেকে বাঁচিয়ে দাও—

বলে থানার বারান্দার ভেতরে ঢুকে পড়লো।...

হাজতখানা থেকে যখন ভূপতি ভাদুড়ী বেরোল, তখনও মাথার ওপর সেই কথাগুলো ঘুরছে। এ কী হলো? কেন এমন হলো?

কোথায় যেন একটা মহা গোলমাল বেধে গেছে। মানুষের মন এতদিন যে-গতিপথ ধরে চলছিল হঠাৎ যেন তা অন্যদিকে মোড় ঘুরেছে। বুড়ো মানুষ দেখলে যেন আর আগেকার মত কেউ সমীহ করে না। বুড়ো মানুষকে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে ফেলে ট্রামে বাসে উঠতেও কেউ যেন আর পেছপাও হয় না। এসব হলো কী? এমন হাল কেন হলো?

থানার বড়বাবুর কথাগুলোও মাথার মধ্যে ঘুর ঘুর করতে লাগলো। এই বড়বাবুকে কত টাকা দিয়েছে ভূপতি ভাদুড়ী, কত খোসামোদ করেছে। কারণে অ-কারণে গোছা গোছা নোট গুঁজে দিয়ে গেছে। আর সেই বড়বাবু আজকে অবস্থার ফেরে মুখ ফিরিয়ে রইল।

ভূপতি ভাদুড়ী বলেছিল—আমার মুখটা রাখুন বড়বাবু, আমার বাপ-মা মরা ভাগ্নে। ও কখনও খুন করতে পারে? ও বি-এ পাশ। অন্য কেউ খুন করে ওর নামে দোষ চাপিয়েছে, আপনি ভালো করে খোঁজখবর করুন, দেখবেন ও কখনও খুন করতে পারে না—

থানার বড়বাবুদের খুব ভালো করেই চিনে গিয়েছিল ভূপতি ভাদুড়ী। টাকা নেবার সময় যেমন ওদের দশটা হাত, কাজ কববার সময় তেমনি ঠুঁটো জগন্নাথ।

ভূপতি ভাদুড়ী অনুনয়-বিনয় করে অনেক বললে, তবু যেন বোবা হয়ে

রইল বড়বাবু। বললে—আমি কিছু করতে পারবো না ভূপতিবাবু, আমি নাচার। মিনিষ্টারের নিজের লোক খুন হয়েছে, এতে আমাদের কোনও হাত নেই আর। এ ব্যাপারে হাত দিলে আমার চাকরি চলে যাবে—

ভূপতি শেষকালে শেষ অস্ত্র ছাড়লে। চারদিকে ভালো করে চেয়ে নিলে একবার। তারপর কেউ কোথাও নেই দেখে বললে—কিছু না হয় আপনাকে ধরে দিতুম বড়বাবু। আপনাকে খুশী করে দিতুম—

কথাটা উচ্চারণ করবার সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন ক্ষেপে উঠলো বড়বাবু। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বললে—বেরিয়ে যান এখান থেকে বেরিয়ে যান—নইলে আপনাকে আমি এ্যারেষ্ট করবো এখুনি, বেরিয়ে যান। ভেবেছেন টাকা দিয়ে যা-ইচ্ছে তাই করা যায়?

ভূপতি ভাদুড়ী সেখানে আর দাঁড়াতে সাহস পেলে না। তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লো। তারপর পেছু হটতে হটতে একেবারে ঘরের দরজার বাইরে চলে এল।

তখনও ভেতর থেকে রাগে গর গর করতে করতে বড়বাবু চিৎকার করছে—বেরিয়ে যান ঘর থেকে, বেরিয়ে যান—

বড়বাবুর গলার আওয়াজ থানার সকলের কানেই গেছে। ছোটবাবু, মেজ-বাবু সবাই ভূপতি ভাদুড়ীর দিকে চেয়ে বললে—কী হলো ভাদুড়ী মশাই, করেছিলেন কী?

এককালে সুখদাকে ধরিয়ে দেবার সময় সবাই-ই মোটা মোটা টাকা খেয়েছে। এরাই সেই সব মানুষ। সেদিন এরাই কত হেসে কথা বলেছে। আজ আবার এরাই মুখ বাঁকাচ্ছে। ভূপতি ভাদুড়ীর ঘেন্না ধরে গেল পুলিশের ওপর। দূর হোক গে ছাই, এর চেয়ে ইংরেজ আমলের পুলিশ অনেক ভালো ছিল। তারা তখন ঘুষও নিত, কাজও করে দিত। দূর হোক, গোল্লায় যাক। দরকার নেই আর পুলিশের কাছে এসে। ও সবাই সমান। ঝাড়-কে-ঝাড় খারাপ লোক। ঝাড়ে-বংশে সবাই খারাপ। কাকে বাদ দিয়ে কাকে রাখি। এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ।

অথচ কার জন্যে সে এত ভাবছে রে বাবা! সুরেন তার কে? কিসের জন্যে তার ওপরে এত টান তার? সে মরুক-ঝরুক তাতে ভূপতি ভাদুড়ীর কী এসে যায়? কেন তার ভালোর কথা ভেবে এখানে সে এসে অপমান কুড়োতে গেল!

পেছন থেকে একজন কে ডাকলে—ও মশাই—

তখন একেবারে রাস্তায় এসে পড়েছে ভূপতি ভাদুড়ী। পেছন ফিরে দেখলে একজন পুলিশ কনষ্টেবল তার দিকে আসছে।

কাছে এসে বললে—আপনি খুনী আসামীর জন্যে এসেছিলেন তো?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—হ্যাঁ বাবা—

—আপনাকে বড়বাবু বকাবকি করছিল কেন?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—ভাই, আমার ভাগ্নেকে থানার হাজতে ধরে নিয়ে এসেছে তাই বলতে বড়বাবুর কাছে গিয়েছিলুম, তাই শুনে আমার ওপর তম্বি। তা আমি কী অন্যায়টা করেছি বলো দিকিনি! আমার বাপ-মা মরা ভাগ্নে, তার জন্যে আমি বলবো না? আমার আর তো কেউ নেই ভাই, আমার বউও নেই, ছেলেমেয়েও নেই। আমি ওই ভাগ্নে ছাড়া আর কার জন্যে ভাববো?

কনষ্টেবলটা বললে—তা একটা কাজ করলেই পারতেন—

—কী কাজ?

—হাতে কিছু গুঁজে দিলেই পারতেন। ল্যাঠা চুকে যেত!

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—আরে আমি সেই কথাই তো বলেছিলুম। আমি সেই কথা বলতেই তো অত ঝামেলা হলো।

কনষ্টেবলটা বললে—তা ওই রকম সোজাসুজি কি বলতে হয়? তাহলে আমরা আছি কী করতে?

ভূপতি ভাদুড়ী যেন অকূলে কূল পেলে। মুখ দিয়ে যেন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়লো।

বললে—তুমি কাজটা করে দেবে, বাবা? আমার ভাগ্নেকে ছেড়ে দেবে?

কনষ্টেবলটা বললে—ছেড়ে দেবার ক্ষমতা তো আমার নেই, বড়বাবুকে মেজবাবুকে দিয়ে বলাবো। তাহলেই ছেড়ে দেবে জামিনে—

—তা তাই জামিনেই ছেড়ে দাও না! কত দিতে হবে আমাকে তাই বলো।

—দু'শো টাকা এখন দিন! তার পরে দেখা যাবে।

ভূপতি ভাদুড়ী টাকা এনেছিল সঙ্গে করে। ট্যাঁক থেকে টাকা বার করে একটু আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালো। তারপর নোটগুলো গুণে গুণে কনষ্টেবলটার হাতে গুঁজে দিলে।

বললে—তুমি একটু দেখো বাবা। ওই ভাগ্নেটা ছাড়া আমার কেউ নেই। আসলে ওই মাগীটাই খুন করেছে, আমার ভাগ্নে তেমন ছেলে নয়, বুঝলে, আমার নিজের ভাগ্নেকে আমি চিনি না?

কনষ্টেবলটা বললে—সে তো বড়বাবুর হাতে। বড়বাবু যেমন কেস লিখবে তেমনি চালান হবে—

ভূপতি ভাদুড়ী কনষ্টেবলটার হাতটা জড়িয়ে ধরলে। বললে—বেঁচে থাকো বাবা, বেঁচে থাকো। তোমার বাবা আরো উন্নতি হোক, আমি তোমার চেয়ে বয়েসে বড়, তোমাকে আমি আশীর্বাদ করছি বাবা, তুমি বড় হয়ে দারোগা হবে—

কনষ্টেবলটা তখন টাকাটা নিজের পকেটে লুকিয়ে ফেলেছে। বললে—আপনি বাড়ি যান, আমি যা করবার তা করছি—

বলে আবার থানার ভেতরে গিয়ে ঢুকলো। ছোটবাবু, মেজোবাবু সবাই ততক্ষণ হাঁ করে ছিল।

ছোটবাবু বললে—কী রে, কত আদায় করলি?

কনষ্টেবলটা হাসতে হাসতে বললে—দু'শো—

বলে নোট ক'টা ছোটবাবুর দিকে এগিয়ে দিলে।

কিন্তু অত সহজে জিনিসটা শেষ হবার নয়। সমস্ত কলকাতার মানুষের মুখেই তখন ওই এক কথা। সকালবেলা অফিসে যাবার পথে ট্রামে-বাসে বেশ রং চড়িয়ে সবাই গল্প করতো। নানা লোক নানা রকম মজার মজার মন্তব্য করতো। কলকাতার মানুষের প্রতিদিনই মুখরোচক খোরাকের দরকার। খবরের কাগজে এই রকম একটা কিছু খবর না থাকলে তাদের ভাতই হজম হয় না। অথচ কেউই কংগ্রেসের মেম্বার নয়, কেউ কমিউনিষ্ট নয়।

একজন বললে—আরে এ হচ্ছে মশাই দু'পার্টির লড়াই। আমরা হলাম গিয়ে কাক, বেল পাকলে কাকের কী? যে পার্টিরই গভর্ণমেণ্ট হোক, আমরা যে

তিমিরে সেই তিমিরে—

আর একজন বলে—আরে এসব পার্টি-ফার্টির ব্যাপার নয়, এর মধ্যে মেয়েমানুষ আছে—

মেয়েমানুষ আছে তা সবাই জানে। একটা ছেলের সঙ্গে একটা মেয়েও ধরা পড়েছে যখন, মেয়েমানুষ এর মধ্যে আছে তা তো জানা কথা। কিন্তু কে কী জন্যে খুন করেছে সেই কথাটা জানবার জন্যেই সবাই উদ্‌গ্রীব। সেটা কেউই জানে না।

একমাত্র জানাতে পারতো সুরেন আর নয়তো টুলু। তা তারা দুজনেই তো হাজতখানায়। সুতরাং বাইরের লোকের কিছু জানবার কথা নয়। তবু সবাই জানতে চেষ্টা করে। যদি কেউ কিছু গোপন খবরের আভাস দিতে পারে। পুণ্যশ্লোকবাবুর রিভলবারটা যে কে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তাও তিনি জানতে পারলেন না।

কিন্তু পুলিশের টেলিফোন পেয়ে তিনি অবাক হয়ে গেলেন।

বললেন—কেন, আমার মেয়েকে কেন? আমার মেয়ে কী করেছে?

পুলিশের থানা থেকে বড়বাবু বললে—আমরা আপনার মেয়েকে জেরা করবো, তার স্টেটমেণ্ট নেবো। কারণ আপনার রিভলবার তার হাত দিয়ে কী করে অন্য লোকের হাতে গেল তাই আমরা জানতে চাই—তাহলে কি এখন যাবো আপনার বাড়িতে?

—আসুন।

পুলিশ আসবে। সুতরাং পুণ্যশ্লোকবাবু পর্মিলিকে ডাকলেন। বললেন—তুমি তৈরি হয়ে নাও।

পর্মিলি বললে—আমি তৈরিই আছি—

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—তুমি এইভাবেই পুলিশের সামনে হাজির হবে?

পর্মিলি বললে—আমি তো ভালো পোশাক পরেই আছি—

—তবে যা ইচ্ছে তুমি তাই করো। আমি আর তোমাদের সঙ্গে কিছু তর্ক করতে চাই না। তোমাদের জন্যে এবার ইলেকশানে হেরে যাবো দেখছি। আমার এতদিনের সার্ভিস, এত বছরের জেল খাটা, সব কিছু আজ নষ্ট হয়ে যাবে। আমি তোমাদের জন্যে এত করলুম আর তোমরা এখন তার উপযুক্ত প্রতিদান দিচ্ছ—

সুব্রত এতক্ষণ কিছুই বলেনি। সে তার পারিবারিক কুৎসার আতঙ্কে ক'দিন থেকেই বেশ জর্জরিত হয়ে আছে। সবাই দেখলেই তাকে জিজ্ঞেস করে—কী হয়েছে মিষ্টার রায়? নানান রকম ব্যাপার শুনছি—

—কী শুনছেন?

—শুনছি নাকি গ্রে স্ট্রীটে যে মার্ডার হয়েছে, সেখানে আপনাদের রিভলবারটা পাওয়া গেছে?

সুব্রত বলে—আমিও তো তাই শুনছি—

—কিন্তু, আপনার বাবার রিভলবারটা অন্য লোকের হাতে গেল কী করে!

সুব্রত বলে—কী জানি! পুলিশ ইনভেষ্টিগেশন চলছে। ইনভেষ্টিগেশনে যা বেরোবে তা আপনারাও জানতে পারবেন।

এর বেশী আর কোনও কথা হয় না। এই জবাবের পর আর কোনও কথা এগোয় না। কিন্তু সকলেরই কৌতূহল থেকে যায়। কৌতূহল বাড়তে বাড়তে তার ওপর লোকে রং চড়ায়। বহুকাল যার সঙ্গে দেখা হয়নি, সেও একদিন

সুব্রতদের বাড়ি এসে হাজির হয়।

—কী হে, তুমি? তুমি এতদিন পরে কী মনে করে?

ছেলেটি বলে—খবরের কাগজে দেখলুম। তোমাদের বাড়ির রিভলবার নিয়ে যেন কী হয়েছে। ব্যাপারটা কী?

সুব্রতর এ নিয়ে বেশি কথা বলতে ভালো লাগতো না আর। বললে—ভাই, এ নিয়ে পুলিশ ইনভেস্টিগেশন হচ্ছে। এর বেশি কিছু বলতে পারবো না।

—কিন্তু ওই সুরেন কি সেই আমাদের ক্লাশের সুরেন সান্ন্যাল? সে আবার কবে কমিউনিষ্ট হলো? সে তো নিরীহ-গোবেচারা গোছের ছেলে ছিল। লাজুক স্বভাব, তার পেটে পেটে এত বুদ্ধি?

এই রকম কত লোক কত কী বলে যায় তার শেষ নেই। সুব্রত শেষ পর্যন্ত তাদের সঙ্গে দেখাশোনাই বন্ধ করে দিলে। কেউ দেখা করতে এলে রঘু তাদের বলে দিত—ছোটবাবু এখন দেখা করবে না—

কিন্তু সেদিন পুলিশের গাড়িটা যেই বাড়িতে এসে ঢুকলো, সুব্রত নিজে নিচেয় এসে তাদের অভ্যর্থনা করলে—আপনারা বড়তলা থানা থেকে আসছেন?

বড় দারোগাবাবু নিজেই এসেছিল। জিজ্ঞেস করলে—মিষ্টার রায় কোথায়?

সুব্রত বললে—তিনি ওপরে আছেন, আসুন—

ওপরের হল-ঘরে পুণ্যশ্লোকবাবু, পমিলি দুজনেই হাজির ছিল। বড় দারোগাবাবু হল-ঘরে ঢুকেই বললে—আমি থানার ও-সি, স্যার—

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—আসুন, আসুন—

বড়বাবু খাতাপত্র বার করলে। সঙ্গের কনষ্টেবলটা দাঁড়িয়ে রইল। বড়বাবু পকেট থেকে কলম বার কবে বললে—আমি মিস রায়কে গোটা কতক কোশ্চেন করবো স্যার, আপনাদের একটু বাইরে যেতে হবে—

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—ঠিক আছে, আপনার ডিউটি আপনি করুন, আমরা বাইরে যাচ্ছি—

বলে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পথে আর একবাব থামলেন। জিজ্ঞেস করলেন—কতক্ষণ লাগবে আপনার?

—এই ধরুন হাফ এ্যান আওয়ার।

—ঠিক আছে, আমি নিচেয় আমার অফিস কামরায় আছি। শেষ হলে আমার সঙ্গে একবার দেখা করে যাবেন।

বলে তিনি উঠে গেলেন। সুব্রতও সঙ্গে সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে গেল।

বুড়োবাবুর অবস্থা তখন বড় খারাপ। সুধন্য সেই কত দূর থেকে আসে। ডালহৌসি স্কোয়ারের অফিসে চাকরি করে, আর ফেরবার পথে বুড়োবাবুকে দেখে যায়। যেদিন বুড়োবাবুর অসুখটা বাড়ে, সেদিন একটু বেশিক্ষণ থাকে, তার বুকে একটু হাত বুলিয়ে দেয়। কোনও দিন ডাক্তারবাবুকে ডেকে নিয়ে আসে। ডাক্তাববাবু যেমন যেমন ওষুধ লিখে দেয়, তেমনি তেমনি ওষুধ কিনে এনে খাইয়ে দেয় সুধন্য। তারপর যখন একটু সুস্থ হয়, তখন ওঠে।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা পায়ের আওয়াজ পেয়েই বুড়োবাবু জিজ্ঞেস করে উঠলো—কে? সুধন্য এলি?

সুধন্য ঘরে ঢুকেই বললে—একটা সর্বনাশ হয়ে গেছে কাকাবাবু—

—কী সর্বনাশ বাবা? বাড়িতে বৌমা, ছেলেমেয়েরা সবাই ভালো আছে তো?

সুধন্য বললে—না, তারা ঠিকই আছে, এদিকে এ বাড়ির ভাগ্নেবাবুকে পুলিশে ধরেছে, তা শুনেছ?

বুড়োবাবু ঝাপ্‌সা চোখ দুটো তুলে বললে—কই, শুনিনি তো কিছু। কেন, পুলিশে ধরেছে কেন?

সুধন্য বললে—সে এক কেলেঙ্কারি কাণ্ড। একজন কংগ্রেসের লোককে খুন করেছে ভাগ্নেবাবু—

তারপর সব শুনে বুড়োবাবু বললে—ওসব তুই আর আমাকে শোনাসনে সুধন্য। আমি আর ক'দিন? আমার তো যাবার সময় হয়ে এল। আমি আর ওসব ভেবে কী করবো?

কিন্তু কথাগুলো মুখে বললেও কোথায় যেন ভাবনার একটা গেরো পাকিয়ে থাকে বুড়োবাবুর মনের মধ্যে! যাবার আগে যেন সব কিছুর সুরাহা দেখে গেলে ভালো হতো। কিন্তু সুরাহা কী-ই বা হবে? জীবনে কী-ই বা চেয়েছিল বুড়োবাবু? কিছুই তো চায়নি সে। শুধু একটুখানি পেটভরে খেতে পাওয়া আর একখানার বদলে দু'খানা ধুতি বা গামছা। সারা কলকাতায় যখন লোকে নানা জিনিস চাইছে, তখন বুড়োবাবুর চাওয়াটা তো খুবই সামান্য।

বিকেলবেলা যখন রাস্তায় মিছিল যায় তখন ছোট ঘরখানার মধ্যে শুয়ে শুয়ে সেই চিৎকারগুলো শোনে বুড়োবাবু। কীসের চিৎকার তা বুঝতে পারে না। বুড়োবাবুর যখন যৌবন ছিল তখনও রাস্তায় চেঁচামেচি ছিল। কিন্তু সে অন্যরকম।

মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করতো—ও দুখমোচন, দুখমোচন—একবার এদিকে শুনে যা তো বাবা—

কাজ করতে করতে দুখমোচন বিরক্ত হয়ে ঘরে আসে।

বলে—কী?

বুড়োবাবু দুখমোচনের মুখ দেখেই বুঝতে পারে। বলে—রাগ করলি নাকি? রাগ করিসনে বাবা, বুড়ো মানুষের ওপর রাগ করতে নেই, দেখছিস আমি বুড়ো হয়ে গেচি, আমার ওপর কি রাগ করতে আছে? তা ও কীসের গোলমাল রে?

এসব কথায় দুখমোচন রেগে যায়। বলে—আমি জানি না, আমার কাজ আছে—

বলে আবার ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে নিজের কাজে মন দেয়।

তারপরে যেদিন বাড়িতে পুলিশ এসেছিল সেদিনও খবরটা বুড়োবাবুর কানে গিয়েছিল। কেবল জানতে ইচ্ছে হচ্ছিল কী হচ্ছে ভেতরে। ঘর থেকে হাঁটতে হাঁটতে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখলে, একগাদা লোক উঠোনে ভিড় করেছে।

বুড়োবাবু অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেও কিছু বুঝতে পারলে না।

শেষকালে একজনকে জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁ গো, এখানে কী হচ্ছে গো? পুলিশ এসেছে কী জন্যে?

তখন সবাই পুলিশের ব্যাপার জানতে ব্যস্ত, বুড়োমানুষের কথার জবাব কে দেবে? বুড়োবাবু জনে জনে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে। কিন্তু বুড়োবাবুর চোখের সামনে যেন সমস্ত পৃথিবীটাই কেমন দুষমনে ভরা মনে হলো। কেউ তার কথার জবাব দেয় না, কেউ তাকে গ্রাহ্য করে না। যেন সে [illegible] তার

জবাব দিলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় তোমাদের? আমি কি একটা মানুষ নই? আমাকে কি মানুষ বলেই তোমবা মনে করো না?

দূর হোক ছাই, আর কিছু না বলে বুড়োবাবু আবার উঠোন পেরিয়ে নিজের ঘরে এসে চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়ে। যার যা-খুশী হোক, সব পুড়ে-ঝুড়ে যাক, তা নিয়ে ভেবে আমার কী লাভ? আমি মরছি আমার নিজের জ্বালায়, আমাকে কে দেখে তার ঠিক নেই, আমি যাচ্ছি পরের ভাবনা ভাবতে!

আর ঠিক তার পরেই সুধন্য এল।

বুড়োবাবু সুধন্যকে বললে—আমার আর ওসব ভাবতে ভাল্লাগে না সুধন্য, আমি বলে নিজের ভাবনায় মরছি, আমাকে ওসব কথা বলতে এসো না—

সুধন্য বললে—কী বলছো কাকাবাবু, আমাদের এসব ভাবতে হবে না? এত টাকার সম্পত্তি নিয়ে সবাই ছিনিমিনি খেলবে, আর তুমি চোখ মেলে তাই দেখবে?

বুড়োবাবু রেগে যায়। বলে—তুই এখন যা তো। তুই যা। আমার কিছু ভাল লাগছে না, আমি বলে মরছি আমার নিজের জ্বালায়, আর কোথায় কাকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেল, তা আমার জেনে কী লাভ? তুই যা এখন, যা তুই—

বলে বুড়োবাবু আবার পাশ ফিরে শুলো।

কিন্তু জীবনের ইতিহাস তো পৃথিবীর ইতিহাসেব তুলনায় কিছু আলাদা নয়। পৃথিবী যেমন তার নিজের নিয়মে নিজের পথ করে নেয়, জীবনও তেমনি। জীবনের ইতিহাস খুঁজলে তাই দেখতে পাই, সেখানেও কখনও বাইরের নিয়ম-কানুন খাটেনি। জীবনেব ক্ষেত্রে যখনই কোনও বাইরের নিয়মকানুন খাটাতে গিয়েছি, তখনই সে যেন বেঁকে বসেছে।

বহুদিন পরে এ-কলকাতা আর একবাব অন্যদিকে মোড় ফিরেছিল। কিন্তু উনিশ শো ছাপ্পান্ন সালের সেই দুর্দিনে কে ভাবতে পেরেছিল, এমন কবে সে বছরটা শেষ হবে!

সন্দীপদা প্রতিদিনকার মত সেদিনও পার্টির অফিসে বসে কাজ করছিল। দেবেশ এল।

সন্দীপদা মুখ তুলে চাইলে। বললে—কী হলো দেবেশ? সিউড়ির খবর কী?

দেবেশ বললে—সিউড়ির খবর পরে বলছি, কিন্তু টুলুর খবর আগে বলি—

—টুলু? টুলুর কী খবর?

দেবেশ বললে—কাল রাত্তিরে শেয়ালদা স্টেশন থেকে নামতেই খবরটা পেলুম। আপনি শোনেননি?

—খবরটা কী তাই বলো না?

—প্রজেশ সেন খুন হয়েছে শুনেছেন?

সন্দীপদা বললে—সে তো শুনেছি। কিন্তু তাতে আমাদের কী? তা নিয়ে শুনছি কংগ্রেসের অফিসে আজ মীটিং বসছে—

দেবেশ বললে—কিন্তু তার সঙ্গে যে আমরাও জড়িয়ে গিয়েছি—

—কী রকম?

—টুলুকেও তো পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে।

—সে কী? সে তো সেই সুরেন সান্ন্যালকে ধবেছে। তার সঙ্গে টুলুব কী যোগাযোগ?

দেবেশ বললে—পুলিশ তো সেই জন্যেই সুরেনদেব বাড়ি সার্চ কবতে

গিয়েছিল।

সন্দীপদা কথাটা তবু বুঝতে পারলে না, বললে—সুরেন কি টুলুর নাম করেছে নাকি?

দেবেশ বললে—সুরেন কেন টুলুর নাম করবে? সেও যে এক রহস্য! সুরেন বলছে সে প্রজেশ সেনকে খুন করেছে। কিন্তু টুলু নাকি বলছে সে খুন করেছে—

—তার মানে?

—তার মানে তো পুলিশও বুঝতে পারছে না, আমিও বুঝতে পারছি না। যদি টুলু এর মধ্যে জড়িয়ে পড়ে, তাহলে তো ইলেকশান আমাদের বিরুদ্ধে যাবে। ভোটাররা বলবে যে, আমরা অপোনেন্ট পার্টির লোকদের খুন করে ভোট জিততে চাইছি।

সন্দীপদা বললে—বাজে কথা। ইলেকশান হচ্ছে সেণ্টিমেণ্টের ব্যাপার। ভোটারদের একবার শুধু ভালো করে বুঝিয়ে দিতে পারলেই হলো যে কংগ্রেস রাজত্ব খারাপ। তারা তো কংগ্রেস রাজত্বের ওপর অলরেডি চটেই আছে। তোমাদের শুধু সেই সেণ্টিমেণ্টের ওপর সুড়সুড়ি দিতে হবে!

—কিন্তু ওরা তো প্রোপাগাণ্ডা করবে আমরা কমিউনিষ্টরা খুনী!

সন্দীপদা বললে—খুনী কিনা সেটা তো কোর্টে প্রমাণ হবে! তোমরা প্রচার করবে, কংগ্রেস আমাদের পার্টি মেম্বারদের মিথ্যে করে খুনের কেসে জড়িয়ে দিয়েছে—

—কিন্তু তা বললে কি পিপল্ শুনবে?

—পিপলদের তুমি যা বোঝাবে তারা তাই-ই বুঝবে। পিপলদের কোনও জাত নেই। নির্ভর করছে তোমরা কেমন করে জিনিসটা ট্যাকল্ করো।

সন্দীপদা কথাগুলো বললেও কলকাতার মানুষের মনে কেমন যেন খটকা লেগে গেল। কংগ্রেস খারাপ তা স্বীকার করি। কিন্তু কংগ্রেসের বদলে যাকে আনতে চাইছি, তারাই কি ভালো! রাস্তায়, বাসে-ট্রামে, অফিস-কাছারিতেও সেই নিয়েই তুমুল আলোচনা চলতে লাগলো।

ঢাকুরিয়াতে গিয়ে দেবেশই খবরটা দিয়ে এল সহদেববাবুকে।

সহদেববাবু আকাশ থেকে পড়লো। কান্নায় অন্ধ চোখ দুটো ভারি হয়ে এল।

বললে—তাহলে কী হবে বাবা? তাহলে আমার টুলুর কী হবে?

দেবেশ বললে—আপনি কিছু ভাববেন না, আপনি বুড়োমানুষ, আপনি তো ভেবেও কিছু করতে পারবেন না। আমরাই যা হোক এর বিহিত করবো।

সহদেববাবু বললে—টুলুর যদি কিছু হয় তো আমরা কী নিয়ে বাঁচবো বাবা, আমার যে ওই এক মেয়েই ভরসা। আমি তখনই মেয়েকে পই পই করে বারণ করেছিলাম যে, এসব ঝঞ্ঝাটের মধ্যে যাসনি মা তুই, কিন্তু এখন যা হবার তাই হলো তো—আমি এখন কী করি? কার কাছে যাই? আমাদের কে দেখবে?

ফুলুও পাশে দাঁড়িয়ে শুনছিল কথাগুলো। তার মুখে কোনও কথা নেই—

দেবেশ তার মাথায় টোকা দিয়ে বললে—কিছু ভাবিসনি রে ফুলু, আমরা তো আছি। আর এই কুড়িটা টাকা রাখ, দিদি যতদিন না আসে, ততদিন মাঝে মাঝে আমি এসে তোদের টাকা দিয়ে যাবো, আর যদি কিছু দরকার হয় আমাদের অফিসে খবর দিস! তুই তো আমাদের অফিস চিনিস—

ফুলু ঘাড় নাড়লো।

দেবেশ আর দাঁড়ালো না। তার অনেক কাজ। একা টুলু দেবেশের অনেক কাজ করে দিত। টুলুর জন্যে তার মনটা কেমন হু হু করে উঠলো। তার মনে হলো সামনে যেন ঝড় আসছে। সমস্ত যেন উড়িয়ে নিয়ে যাবে। জোড়াসাঁকো অঞ্চলে কংগ্রেসের হ্যান্ডবিল ছড়ানো হয়ে গেছে। দেবেশদের পার্টির হ্যান্ডবিল এখনও ছাপানো হলো না। কত কাজ বাকি পড়ে আছে। ঠিক এই সময়ে টুলু এ কী কান্ড বাধিয়ে বসলো?

রাস্তায় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর একটা বাস এল। বাসে ওঠবার সংগে সংগেই বাসটা ছেড়ে দিলে। বাসের ভিড়ের মধ্যেও ওই একই আলোচনা চলেছে। ভোট। ভোট কাকে দেবে, কাকে দেওয়া উচিত তারই জোর আলোচনা। দু' দল দু' দিকে। একদল কংগ্রেসের পক্ষে, একদল বিরুদ্ধে। প্রজেশ সেনকে খুন করার কথাও আলোচনা হচ্ছিল। একদল বলছে কমিউনিষ্টরা গুন্ডা পুষেছে, আর একদল বলছে—না মশাই, কংগ্রেসও কিছু সাধু-পুরুষ নয়, তাদেরও গুন্ডা পোষা আছে—

বাঙালীরা কাজ কিছু করুক আর না করুক, তর্কতে সবিশেষ পটু। তর্ক পেলে তাকে আর কেউ রুখতে পারবে না।

অনেকক্ষণ ধরে দেবেশ শুনতে শুনতে গেল। বাসও চলেছে, তর্কও জমে উঠেছে।

দেবেশের মনে হলো যেন যতদূর বাস চলবে, ততদূর ধরে এদের তর্ক চলবে। এই জাতকে বোঝানো যেন লেনিনেরও অসাধ্য। লেনিনকে যদি এই বাঙলাদেশের ভোটের লড়াইতে ছেড়ে দেওয়া হতো তো তিনিও বোধহয় নাজেহাল হয়ে যেতেন।

কিন্তু হেরে গেলে আর যারই চলুক, দেবেশের চলে না। দেবেশ নিজে ঘর পায়নি, সংসার পায়নি, স্নেহ, ভালবাসা, মমতা পায়নি, তাই ওসবে কখনও বিশ্বাসও করেনি। একমাত্র বিশ্বাস করেছে কাজকে। যেমন করে হোক কাজের মধ্যে দিয়েই পার্টিকে ওঠাতে হবে। ক্ষমতা ক্যাপচার করতে হবে। তাতে যদি বন্দুকের গুলী খেতে হয় তো তাও খাবো। কিন্তু কাজ না করলে বেঁচে থেকে লাভ কী! ওরা মূর্খ সব। বোকা। শুধু ইস্কুল-কলেজে লেখাপড়া শিখেছে। শিখে বুর্জোয়া হয়েছে। মার্ক্স পড়েনি, লেনিন পড়েনি, স্ট্যালিন পড়েনি—কী করে জানবে তাঁদের এই দুঃখ-কষ্টের জন্যে দায়ী কে! সেই ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের আমল থেকে এই কংগ্রেসের আমল পর্যন্ত গতানুগতিক ধারায় ইস্কুল-কলেজে যা-যা পড়িয়েছে তাই-ই পড়েছে। কিন্তু রাশিয়ায় কী হয়েছে, চায়নাতে কী হচ্ছে তা তো জানতে পারেনি। কেউ তা ওদের জানায়ওনি। ওরা মূর্খ।

একটা স্টপেজে বাস থামতেই দেবেশ বাস থেকে নেমে পড়লো।

যদি দরকার হয়, টুলুর জন্যে তাই একটা উকিল দেওয়ার কথা সন্দীপদা বলেছিল। বাস থেকে নেমে একটা গলির ভেতরে ঢুকলো। ক্রিমিন্যাল কোর্টের উকিল, পশুপতি দাস। তখনও পশুপতিবাবুর সদর গেট খোলা ছিল। একগাদা কাগজপত্রের মধ্যে তখন ডুবে ছিলেন পশুপতিবাবু।

বললেন—কে?

চিনতে পারলেম দেবেশকে। আরো অনেকবার জামিন দাঁড়াতে হয়েছে দেবেশদের পার্টির মেম্বারদের হয়ে।

—এবার আবার কী?

দেবেশ বললে—খবরের কাগজে দেখেছেন তো। আমাদেরই পার্টির মেয়ে

টুলু। টুলু সরকার।

—কোন্ থানা?

দেবেশ বললে—বড়তলা—

পশুপতিবাবু বললেন—কিন্তু ও তো নন-বেলেবল্ কেস। ও কেসে তো আসামীকে জামিন দেবে না।

দেবেশ বললে—সে যা করবার আপনি করবেন—আপনার ওপরেই সব ভার দিয়ে গেলাম—

পশুপতিবাবু বললেন—তাহলে এই কাগজটাতে আসামীর নাম-ধাম ঠিকানা সব লিখে দিয়ে যাও—

বলে একটা কাগজ এগিয়ে দিলেন। দেবেশ তাতে টুলুর নাম, বাবার নাম, ঠিকানা সব কিছু লিখে দিয়ে উঠলো।

তারপর কাজ সেরে আবার রাস্তায় বেরিয়ে এল।

সেদিন সমস্ত কলকাতা সহর আবার তোলপাড় হয়ে উঠলো। বাসে-ট্রামে-অফিসে-কাছারিতে আবার সেই খবর। এবার বড় জবর খবর। এনকোয়ারি কমিশনের সামনে হঠাৎ সবাই দেখে অবাক হয়ে গেছে পর্মিলিকে। আগেও একদিন এসেছিল। সেদিন সঙ্গে ছিল খুনের আসামী সুরেন সান্যাল। এদিন একেবারে একলা।

যারা খবরের কাগজ পড়ে খবরটা জানতে পারলো, তারা আগে জানতে পারলে একবার দেখতে যেত।

—খুব সুন্দরী বুঝি মশাই?

—আরে পুণ্যশ্লোকবাবুর মেয়ে, সুন্দরী হবে না?

যারা সেদিন সেখানে ঘটনাচক্রে হাজির ছিল, তারা পর্মিলির রূপ দেখে অবাক। যেমন তার কথা বলার ভঙ্গি আর উচ্চারণ, তেমনি তেজ। তেজ বলে তেজ! তেজে যেন একেবারে ফেটে পড়ছে মেয়ে।

যারা রোজ ওখানে গিয়ে বসে বসে মজা দেখে তাদের মনে আছে। সেদিনও হৈ-চৈ হয়েছিল হলঘরটার মধ্যেখানে। কমিউনিষ্ট পার্টির একটা মেয়ে-ওয়ার্কার সেদিন ওখানে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। জেরা হতে হতে সব কাজ মাঝপথে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তারপরে জানা গেল সেই মেয়েটাই নাকি খুনের আসামী হয়েছে।

—যখন মিছিলের ওপর গুলী চলছিল তখন আপনি কোথায় ছিলেন?

—আমি তখন গাড়ি ড্রাইভ করে যাচ্ছিলাম।

—আপনি যখন দেখলেন যে সামনে প্রোসেশান চলেছে তখন ওদিকে গাড়ি চালালেন কেন?

পর্মিলি বললে—প্রোসেশান আসছে দেখে গাড়ি থামিয়ে দিলাম। ভাবলাম প্রোসেশান চলে গেলে আমি আমার গাড়ি ঘুরিয়ে নেব।

—আপনি গাড়িতে যখন বসে ছিলেন, তখন ধারে-কাছে কোথাও পুলিশ দেখেছেন?

পর্মিলি বললে—রাস্তার মোড়ে মোড়ে রাইফেল নিয়ে পুলিশ দাঁড়িয়ে ছিল।

—কিছু গোলমাল কি নজরে পড়েছিল আপনার?

পমিলি বললে—প্রথমে কিছু নজরে পড়েনি, কিন্তু হঠাৎ দেখলাম প্রোসেশানের মধ্যে থেকে কিছু গুণ্ডা পুলিশদের লক্ষ্য করে সোডার বোতল, ইঁট-পাটকেল ছুঁড়তে লাগলো।

—কী করে বুঝলেন তারা গুণ্ডা?

পমিলি সোজা করে জজের দিকে চাইলে। বললে—আমি চিনতে পারি। তাদের সকলকে টাকা দিয়ে প্রজেশ সেন মিছিলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিল।

—কোন্ প্রজেশ সেন? যে প্রজেশ সেন সম্প্রতি তার বাড়িতে খুন হয়েছে? তাকে আপনি চিনলেন কী করে?

পমিলি বললে—সে আমার বাবা পুণ্যশ্লোক রায়ের পার্সোন্যাল সেক্রেটারী ছিল।

—কী করে জানলেন তিনি গুণ্ডাদের টাকা দিয়েছিলেন?

পমিলি বললে—আমার সামনেই আমার বাবা তাকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছিলেন গুণ্ডাদের দিতে, যাতে প্রোসেশান ভেঙে দেয় তারা।

—আপনি যে এসব কথা বলছেন, আপনি কী জানেন এর পরিণাম কী হতে পারে?

পমিলি বললে—আমি সবরকম পরিণতির জন্যে প্রস্তুত হয়েই একথা বলছি।

—এই প্রজেশ সেনের সঙ্গেই কি আপনার বিয়ের সমস্ত বন্দোবস্ত পাকা হয়ে গিয়েছিল?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু আপনি আগে বলেছেন, আপনার গাড়ি ওরা পুড়িয়ে দিয়েছিল, বলতে পারেন কারা পুড়িয়ে দিয়েছিল? গুণ্ডারা?

—তা আমি দেখিনি। তার আগেই আমি গাড়ি থেকে নেমে পড়েছিলাম। পুলিশ তাদেব ভ্যানে করে আমাকে নিরাপদ জায়গায় রেখে দিয়ে এসেছিল—

—আপনি এই যে সাক্ষ্য দিচ্ছেন, এ নিয়ে আগে আর কারো সঙ্গে আলোচনা করেছেন?

কাউন্সিল এ কথাটায় আপত্তি জানাতেই এর আর জবাব দিতে হলো না পমিলিকে। সমস্ত হলঘরখানা নিস্তব্ধ হয়ে সাক্ষীর কথাগুলো যেন গিলছিল। খবরের কাগজের রিপোর্টাররা খস খস করে কাগজের ওপর তাদের বিপোর্ট লিখছিল। যেন কোনও কথা কোনও শব্দ না বাদ পড়ে। কাঠগড়া থেকে নেমে এসেই পুণ্যশ্লোকবাবুর মেয়ে গট গট করে জুতোর শব্দ করতে করতে সোজা সদর দরজার দিকে এগিয়ে গেল। তারপর গেট পেবিয়ে বাইরের রাস্তায় গিয়ে নামলো। সেখানে তার গাড়িখানা দাঁড়িয়েছিল। গাড়িটাতে উঠে নিজের মনেই ইঞ্জিনে ষ্টার্ট দিলে। তারপর একটা যান্ত্রিক শব্দ করে রাস্তার অসংখ্য গাড়ির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কখন যে পমিলি এখানে এসেছিল, তা আগে কেউই টের পায়নি, সারা কলকাতার লোক কেউই হয়ত ভাবতে পারেনি যে, একদিন রাজশক্তির ভেতর থেকেই তার ধ্বংসের বীজ মাথা তুলে মহীরূহ হয়ে নিজের স্বরূপ প্রকাশ করবে! মৃত্যু একদিন-না-একদিন তো আসবেই। কিন্তু তা বলে এমন করে আসবে কে ভেবেছিল? কে ভেবেছিল, পুণ্যশ্লোক রায়ের নিজের মেয়েই এমন করে তার সাক্ষ্য দিয়ে যাবে?

খবরটা কাগজে বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে আলোড়ন শুরু হয়ে গেল। এ কেমন ধারা বাপ, আর এই-ই বা কেমন ধারা মেয়ে!

বাস-ট্রামের আলোচনা যেন আরো তীব্র হয়ে উঠলো। কেউ আর কিছু করে না কোথাও। অফিসে ব্যাঙ্কে কোর্টে রাইটার্স বিল্ডিং-এ কেরাণীরা শুধু ঘোঁট পাকায়। তাদের হাতের কলম হাতেই থাকে, সকাল থেকে শুধু ওই একই আলোচনা।

একজন বলে—খুব জাহাঁবাজ মেয়ে মশাই—

আর একজন বলে—আরে, এ হলো সেই দৈত্যকুলে মেয়ে-প্রহ্লাদ—

পাশ থেকে একজন বলে—হলে কি হবে মশাই, এ মেয়ে তো আবার মদ খায়, তা জানেন না বুঝি?

পমিলি যে মদ খায়, মদ খেয়ে মাতাল হয়, তা আর কারো জানতে বাকি নেই। কোথায় যেন কেমন করে জীবনের অঙ্কে একটা ভুল হয়ে গেছে সকলের। কেউ যেন আর অঙ্ক মেলাতে পারছে না। যে নিয়মে পৃথিবীটা এতদিন চলে আসছিল, সেই নিয়মটাতেই যেন গরমিল ঢুকে পড়েছে। নইলে নিজের মেয়ে হয়ে কেউ বাপের মুখে এমন করে চুণ-কালি দেয়? এতে তো বাপেরই বদনাম হবে। এতে তো বাপই ইলেকশানে হেরে যাবে। পুণ্যশ্লোকবাবুকে কে আর ভোট দেবে আসছে ইলেকশানে!

পাড়ায় পাড়ায় তারই জের চলতে লাগলো। ভলান্টিয়াররা গিয়ে পাড়ার লোকদের বোঝায়।

বলে—আপনারা লোক চিনে রাখুন। রাইফেলের গুলী দিয়ে যারা নিরীহ মানুষ খুন করে তাদেরই ভোট দেবেন, না যারা সাধারণ মানুষদের খেয়ে-পরে শান্তিতে বাঁচতে দিতে চায়, তাদের ভোট দেবেন!

কলকাতার মানুষ যেন কেমন বিভ্রান্ত হয়ে যায়। সত্যিই তো, কাদের ভোট দেবে তারা? কে তাদের শুভাকাঙ্ক্ষী? কংগ্রেস না কমিউনিষ্ট পার্টি?

কিন্তু কেউ কিছুই ভেবে ঠিক করতে পারে না। তার চেয়ে আমরা সেই ইংরেজদের আমলে যেমন ছিলুম, তেমনি করে দাও বাবা, আমরা আর এসব ভোটাভুটি চাই না। আমরা ভুল করেছিলাম স্বাধীনতা চেয়ে। রেশনের খাওয়া খেয়ে আমরা আর পারছি না। সেই পাঁচ টাকা মণ চালের যুগে আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাও, আমরা একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। আমাদের মন্ত্রী হয়েও কাজ নেই, আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েও দরকার নেই। তখন তবু ছেলেমেয়েরা বাপ-মায়েদের মানতো। এ কোন্ যুগে আমরা বাস করছি রে বাবা!

অনেক রাত্রের দিকে বড়তলা থানার দারোগা হাজত-ঘরের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলো।

সুরেন অনেক দিন ঘুমোয়নি। কিন্তু তার যেন মনে হয়, অনেক যুগ সে বিনিদ্র কাটিয়েছে এই জেলখানার ভেতরে। জেলখানাই তো। সেই জন্ম থেকেই তো সে জেলখানায় কাটিয়েছে। তফাত শুধু এই যে, সেটা বড় জেলখানা, আর এটা একটা ছোট জেলখানা। সেই জেলখানাতেই সে বড় হয়েছে, সেই জেল-খানাতেই সে সমস্ত বুঝতে শিখেছে, ভাবতে শিখেছে। আজ এই ছোট জেল-

থানার মধ্যে বসে বসে সেই কথাই ভাবছে কেবল।

যথারীতি খাবার আসে। জঘন্য দুর্গন্ধময় কিছু ভাত আর তরকারী। তার সবটাই পড়ে থাকে। তারপর সময় হলেই একজন লোক এসে তা আবার তুলে নিয়ে যায়।

মনে পড়ে যায় বাইরের পৃথিবীর কথাগুলো। তার ধরা পড়ার খবর নিশ্চয় এতক্ষণে সবাই জেনেছে। সুব্রতও নিশ্চয় জানে। হয়ত তাকে বোকা ভাবে। কীসের জন্যে খুন করতে গেল প্রজেশ সেনকে? সে তার কী ক্ষতি করেছিল?

থানার বড়বাবু এসেও সেই একই কথা জিজ্ঞেস করে—কেমন আছেন সুরেনবাবু? খাবারদাবারের কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো?

সুরেন কিছু উত্তর দেয় না।

বড় দারোগা জিজ্ঞেস করে—কথা বলুন! আমার কথার জবাব দিন। চুপ করে থাকলে তো আপনার কোনও লাভ নেই। আপনারও লাভ নেই, আমারও লাভ নেই।

তারপর একটু থেমে আবার আরম্ভ করে—দেখুন, আপনি রেসপেকটেবল্ বংশের ছেলে। আমরা চাই না যে আপনার কোনও ক্ষতি হয়। আমি প্রাণপণে আপনাকে বাঁচাতে চেষ্টা করবো। কারো কিছু ক্ষতি হয় এটা আমি চাই না। আপনি শুধু বলুন, কে প্রজেশ সেনকে খুন করেছে?

সুরেন এতক্ষণে মুখ তোলে। বলে—বলেছি তো আমি খুন করেছি—

—কিন্তু কেন? কেন প্রজেশ সেনকে খুন করতে গেলেন আপনি? প্রজেশ সেন আপনার কী ক্ষতিটা করেছিল? প্রজেশ সেন তো নিখুঁত ভালো মানুষ ছিলেন, তিনি তো কারো কোনও ক্ষতি করেননি। তাকে আপনি খুন করতে গেলেন কেন? না কি অন্য কোনও কারণ ছিল?

সুরেন বলে—না, অন্য কোনও কারণ ছিল না।

—তাহলে আপনার বন্ধু টুলু দেবী যে বলেছেন তিনি খুন করেছেন?

সুরেন বললে—না, টুলু খুন করেনি। আমি খুন করেছি—

বড়বাবু বলে—দুজনে তো আর খুন করতে পারেন না আপনারা। আপনাদের মধ্যেই একজন-না-একজন খুন করেছেন। খুলেই বলুন না, আপনাদের মধ্যে কে খুন করেছেন সত্যি সত্যি?

কিছুতেই যখন উত্তর আদায় করতে পারে না, তখন আবার বড়বাবু টুলুর ঘরে যায়। টুলুর ঘরের দরজায় গিয়ে চাবি খোলে।

টুলুর সামান্য জীবনে যেন জন্মান্তরের লগ্ন এসেছিল। কোথায় বাঙলা দেশের কোন্ এক অখ্যাত প্রান্তে সে জন্মেছিল, তারপর কত ঝড়-ঝঞ্ঝা অতিক্রম করে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করতে করতে কলকাতার এক অখ্যাত পল্লীতে উঠে সে বুঝি মরেই গিয়েছিল। কিন্তু এই হাজতখানার অন্ধকার খুপরির ভেতরে সে যেন আবার নতুন করে জন্মগ্রহণ করলো।

বড়বাবু এসে বললে—কেমন আছেন টুলু দেবী? খাবারদাবারের কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো? হলে আমাকে বলবেন আপনি। ব্যাটারা আজকাল বড় বেয়াড়া হয়ে গিয়েছে। সব জিনিস চুরি করতে আরম্ভ করেছে।

এসব নিত্যনৈমিত্তিক কথা। এসব কথা শুনে শুনে টুলুর কান পচে গেছে। তবু সেই একই কথা একশোবার জিজ্ঞেস করে বড়বাবু।

টুলু এ কথার কোনও জবাব দেয় না।

—আচ্ছা টুলু দেবী, আপনাকে আমি আগেও জিজ্ঞেস করেছি, এখনও

জিজ্ঞেস করছি। প্রজেশ সেনকে কে খুন করেছে সত্যি করে বলুন তো?

টুলু বলে—আমি তো বলেছি আপনাকে, তবু বার বার একই কথা জিজ্ঞেস করেন কেন?

বড়বাবু রাগ করে না জবাব শুনে।

বলে—আপনি তো বুঝতে পারছেন আমাদের চাকরি করে পেট চালাতে হয়। এটা তো আমার ডিউটিও বটে। ওদিকে সুরেনবাবু বলছেন যে, তিনি খুন করেছেন প্রজেশ সেনকে। আবার এদিকে আপনি বলছেন যে, আপনি করেছেন। আমি কার কথা বিশ্বাস করবো?

টুলু বলে—আমায় আর আপনি বিরক্ত করবেন না, আপনি এখন যান—

—আপনি রাগ করছেন কেন টুলু দেবী? আমাকে তো আমার ডিউটি করতে দেবেন।

এরপর টুলু কথা বন্ধ করে দেয়। কোনও কথারই আর জবাব দেয় না। শেষকালে হতাশ হয়ে বড়বাবু বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। কিন্তু সুরাহা হয় না কিছুরই। সারা কলকাতার লোক হাঁ করে আছে কী হয়, কী হয়! তারা জানতে চায় আসল খুনী কে! তারা প্রত্যেক দিন খবরের কাগজের পাতা ওল্টায়। কিন্তু আসল রহস্য কেউ উদ্ঘাটন করতে পারে না।

ভূপতি ভাদুড়ী সেদিনও থানার দিকে পা বাড়াচ্ছিল। যেদিন থেকে ভাগ্নেটা ধরা পড়েছে সেই দিন থেকে ভূপতি ভাদুড়ীর এই একটা জ্বালা হয়েছে। কোথাও কোনও সুরাহা নেই, অথচ জলের মত টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে। পাগলের মত একবার উকিলেব বাড়ি যাচ্ছে, আর একবার যাচ্ছে থানায়। যদি মুখ ফুটে টাকা চায় তো সে এক রকম ভালো। তার তবু একটা মানে আছে। কিন্তু এ অন্য রকম। জিজ্ঞেস করলে কেউ কিছু কথা বলবে না। কিন্তু টাকা গুঁজে দিলে হাত পেতে নেবে। টাকা নেবে বটে, কিন্তু মাথা নিচু করবে না কেউ।

সেদিনও তেমনি ছাতাটা নিয়ে বেরোচ্ছিল ভূপতি ভাদুড়ী।

হঠাৎ সুধন্য এসে পেছন থেকে ডাকলো—ম্যানেজারবাবু—

ভূপতি ভাদুড়ী পেছন ফিরে দেখেই মুখ বেঁকালো। বললে—আবার পেছনে ডাকলে তো? কী হয়েছে বলো? কী চাও? একটা কাজে বেরোচ্ছি, ঠিক এই সময়ে না ডাকলে তোমার চলতো না?

সুধন্য বললে—বলছিলুম, কাকাবাবুর শরীরটা ভালো নয়, আর বোধহয় বেশি দিন নয়—

ভূপতি ভাদুড়ী রেগে গেল। বললে—এই কথা বলবার জন্যে পেছনে ডাকা? তা তোমার কাকাবাবু মরলো কি বাঁচলো তাতে আমার কী? বুড়ো হয়েছে, আর কতদিন বাঁচবে? এবার তো যাওয়াই উচিত।

সুধন্য বললে—হাজার হোক, তিনি তো আমার কাকাবাবু, তাঁর ভালো-মন্দর কথা তো আমাকে ভাবতে হয়—

ভূপতি ভাদুড়ী মুখ ফিরিয়ে আবার যেমন যাচ্ছিল, তেমনি চলতে লাগলো। উটকো লোকের সঙ্গে কথা বললেও সময় নষ্ট! মা-কালী যদি একবার মুখ তুলে তাকান তো ভূপতি ভাদুড়ী সেদিন সবাইকে দেখে নেবে। আগে তাড়াতে হবে সুখদাকে। এত কাণ্ড করেও ছুঁড়িটা আবার এ বাড়িতে এসে জুটেছে। এত কাণ্ড করেও তার হাত থেকে পার পাওয়া গেল না। আবার বলে কিনা—এখানে

থাকবে—

বাহাদুর সিং ম্যানেজারবাবুকে দেখে সেলাম করলে।

সেদিকে না চেয়েই ভূপতি ভাদুড়ী রাস্তায় গিয়ে পড়লো। এখান থেকে সেই বড়তলা থানা। হেঁটে যেতে যার নাম আধ ঘণ্টাটাক। সেখানে বড়বাবু ছোটবাবু সকলকে তরিবত করতে আরো আধ ঘণ্টা লাগবে। তারপর উকিল-বাবুর বাড়ি।

হঠাৎ দৌড়তে দৌড়তে পেছনে এসে ডেকেছে ধনঞ্জয়—ম্যানেজারবাবু—

ভূপতি ভাদুড়ী পেছন ফিরে ধনঞ্জয়কে দেখেই জ্বলে উঠলো—হ্যাঁ রা, তোদের কি পেছনে না ডাকলে চলে না? কী চাস, কী? কী হয়েছে?

—আজ্ঞে মা-মণি কেমন করছে! তরলাদি আপনাকে খবর দিতে বললে।

এক মুহূর্ত ভূপতি ভাদুড়ীর মুখ দিয়ে কিছু কথা বেরোল না। তারপর বললে—কী রকম করছে মানে? ভালো আছে, না মারা গেছে?

ধনঞ্জয় বললে—তা তো জানিনে ম্যানেজারবাবু—

—জানিসনে তো আমাকে পেছু ডাকতে আসিস কেন? তোরা কেউ কিছু জানবি না তো আছিস কী করতে? শুধু মাইনে খেতে? আর আমিই বুঝি সব জানবো?

এর উত্তরে ধনঞ্জয় আর কী বলবে? চুপ করে অপরাধীর মত শুধু দাঁড়িয়ে রইল।

ভূপতি ভাদুড়ী আরো রেগে গেল। বললে —তা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলেই চলবে? আয়, আমার সঙ্গে আয়।

বলে আবার বাড়ির দিকে ফিরতে লাগলো। জ্বালা হয়েছে ভূপতি ভাদুড়ীর। বুড়ি মরেও যেন মরতে চায় না। এই নিয়ে কতবার মরলো বুড়ি! একেবারে গলা টিপে মেরে ফেললেই ল্যাঠা চুকে যায়। তা নয়, শুধু শুধু অর্থ-দণ্ড আর হয়রানি!

বাড়ির ভেতরে ঢুকতে যা দেরি। তার মধ্যেই যেন কান্নার আওয়াজ কানে এলো।

কে যেন ভূপতি ভাদুড়ীর মাথায় বিদ্যুতের ছোঁওয়া লাগিয়ে দিলে হঠাৎ। তবে কি ধনঞ্জয় যা বলেছে তা সত্যি নাকি?

তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে ভূপতি ভাদুড়ী ওপরে উঠতে লাগলো। যত ওপরে উঠতে লাগলো কান্নার আওয়াজটা তত স্পষ্ট হতে লাগলো। তাহলে কি মা-মণি সত্যিই মারা গেছে!

আহা! ভূপতি ভাদুড়ীর মত মানুষের মুখেও আচমকা একটা আহা শব্দের দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। একেবারে তেতলায় উঠেই বাঁদিকের ঘরটা। বহুদিন ধরে বহুবার আসা এই ঘরখানা। কিন্তু সেই চিরকালের চেনা ঘরখানাও যেন চির-কালের অচেনা বলে মনে হলো ভূপতি ভাদুড়ীর কাছে।

সামনেই মুখে আঁচল চাপা দিয়ে কাঁদছিল সুখদা। ভূপতি ভাদুড়ী কাছে যেতেই সে একটু পাশে সরে দাঁড়ালো। কিন্তু কান্না থামলো না কারো। বাদামী বুড়ো হয়ে গিয়েছিল। কাঁদবার শক্তিটুকু পর্যন্ত সে হারিয়েছে আজ। কিন্তু তবু সেও কাঁদছে। আর তরলা! তরলা কাঁদবে না তো কে কাঁদবে? তার সেবাতেই এতদিন বেঁচে ছিল মা-মণি। এবার তারও কাজ ফুরোল। এবার থেকে কার সেবা করবে সে? কাকে চান করিয়ে দেবে? কাকে ওষুধ খাওয়াবে? কার ভরসায় এখানে সে চাকরি করবে? মা-মণি কি শুধু সকলের মনিব ছিল?

মা-মণি যে ছিল এ বাড়ির ঐতিহ্য। মাধব কুণ্ডু লেনের এই বাড়িটার মতই ছিল মা-মণির জীবনের ইতিহাস! মা-মণির সঙ্গে সঙ্গে যে সে ইতিহাসও নিঃশেষ হয়ে গেল।

ভূপতি ভাদুড়ী আস্তে আস্তে ঘরের ভেতরে গিয়ে দাঁড়ালো। তারপর একেবারে মা-মণির মাথার কাছে। যেন মৃত্যুকে অনুভব করতে চাইল। মৃত্যুকে স্পর্শ করতেও চাইলে! যে মৃত্যু মা-মণির এতদিনের কাম্য, সেই মৃত্যু কি এত-দিনে সত্যি-সত্যিই এসে পৌঁছুল নাকি? নাকি অন্য অন্য বারের মত এও এক ছলনা!

সমস্ত কান্না অতিক্রম করে তখন ঘরের মধ্যে যেন এক মহা নিস্তব্ধতা খাঁ খাঁ করছে। যেন অব্যক্ত ভাষায় বলতে চাইছে—আমি চললুম—আমি চললুম—। নিজে আমি চরম যন্ত্রণা পেয়েছি, কিন্তু তোমরা সুখী হোয়ো। তোমাদের আমি সব যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিয়ে গেলাম।

আশ্চর্য মানুষের মন, আর আশ্চর্য সেই মনের কামনা-বাসনা-আকাঙ্ক্ষা। শিবশম্ভু চৌধুরীর বড় সাধ ছিল, মেয়ে জীবনে সুখী হবে, মেয়ে সিঁথির সিঁদুর নিয়ে স্বামীর সংসার আলো করে থাকবে। কিন্তু মানুষ তার নিজের পছন্দমত স্বপ্ন দেখে আর মানুষের ঈশ্বর সে স্বপ্ন ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে তার নিজের ইচ্ছা সার্থক করে। আজ শিবশম্ভু চৌধুরী নেই। কিন্তু না থেকে ভালোই হয়েছে। নিজের চোখে নিজের এমন সর্বনাশ তাঁকে দেখতে হলো না। আর যেটুকু তিনি দেখে গেছেন সেটুকুই বা কম কী! তিনিও তো সেদিন এমনি করে তাঁর এই লাবণ্যময়ীকে রেখে চলে গিয়েছিলেন। সেদিন কি তিনি ভাবতে পেরেছিলেন, তাঁর লাবণ্যও একদিন তাঁরই মত এমন নিঃসহায় হয়ে চলে যাবে?

ভূপতি ভাদুড়ী খানিকক্ষণের জন্যে বোধহয় একটু অভিভূত হয়ে পড়ে-ছিল। পেছন ফিরে হঠাৎ ধনঞ্জয়কে দেখে যেন তার সংবিৎ ফিরে এল।

ধমকে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে—হাঁ করে আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখছিস কী? আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকলেই সব ফয়সলা হয়ে যাবে? ডাক্তারকে ডাকতে হবে না?

ধনঞ্জয় কথাটা শুনেই বাইরে বেরিয়ে গেল।

তখন যেন হঠাৎ ভূপতি ভাদুড়ীর খেয়াল হলো তারও একটু কাঁদা উচিত। একটু না কাঁদলে খারাপ দেখায়। হঠাৎ গলা দিয়ে একটা ঘড় ঘড় শব্দ বার করলে। গোঙানির মতন একটা অস্বাভাবিক শব্দ। তারপর একেবারে চাপতে না পেরে সেটা যেন বুক ফেটে গলা দিয়ে সশব্দে বাইরে বেরিয়ে এল।

যে বাড়ির গল্প নিয়ে এ উপন্যাস আরম্ভ হয়েছিল, মা-মণির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু তার কাহিনী শেষ হলো না। একদিন শিবশম্ভু চৌধুরী এই বিরাট সম্পত্তির ষোল আনা সমৃদ্ধি সাধন করেছিলেন। তাঁর মেয়ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কি তার সমাপ্তি ঘটতে পারে? মানুষ চলে গেলেই কি মানুষের ইতিহাস শেষ হয়ে যায়? ইতিহাসের তো মৃত্যু নেই। আর ইতিহাসের মৃত্যু নেই বলেই উপন্যাসও তাই এগিয়ে চলে। যেখানে জীবনের সাময়িক ছেদ পড়বে উপন্যাস সেখানেই শেষ হবে, কিন্তু ইতিহাস তার পরেও এগিয়ে চলে।

একটা সামান্য মৃত্যু শুধু। কিন্তু এই একটা মৃত্যুই সেদিন একটা মস্ত বড় ঘটনা হয়ে সুরেনের সমস্ত জীবনকে অন্যদিকে চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। আর শুধু তাকেই নয়, ওই বুড়োবাবু, সুধন্য, সুখদা সকলেই যেন ঝড়ের মুখে একটা অদ্ভুত পরিস্থিতিতে পড়ে নানা জায়গায় আশ্রয় খুঁজে নিয়ে অন্য রূপে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু সে কথা যথাসময়ে বলবো।

ওদিকে পুণ্যশ্লোকবাবুর তখন উদ্বেগের সীমা নেই। উদ্বেগ অন্য কিছুর জন্যে নয়, নিজের জন্যে। একমাত্র বিশ্বস্ত লোক ছিল প্রজেশ সেন। ঠিক এই সময়েই সে চলে গেল। আগে আগে প্রজেশই ইলেকশানের সব ঝামেলা পুইয়েছে। তার কাছে টাকা ফেলে দিয়েই নিশ্চিন্ত হয়েছেন পুণ্যশ্লোকবাবু। আর তাছাড়া, আগের বারগুলোতে কংগ্রেসের নাম করলে আর অন্য কিছু বলতে হতো না। লোকে কংগ্রেসের নাম শুনেই চোখ বুজে ভোট দিত। কিন্তু এখন যেন আর সেদিন নেই। বিশেষ করে ক'দিন আগে কমিউনিষ্টদের মিছিলের ওপর গুলী চলার পর যেন হাওয়া কেমন বদলে গিয়েছে। এবার তাই একটু ভাবনা হয়েছে। এবার তাই তিনি ভলাণ্টিয়ারদের সঙ্গে নিয়ে নিজেই বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন।

শুধু পুণ্যশ্লোকবাবু একলা নন, পার্টির সবাই এতদিন পরে রাস্তায় নেমেছেন।

পুণ্যশ্লোকবাবু গিয়ে হাতজোড় করে সকলের দরজায় দরজায় দাঁড়ান। বলেন—আপনাদের সেবায় আবার নেমেছি, এবার ভোট দেবার সময় আমার কথাটা একবার ভাববেন দয়া করে।

ভদ্রলোকরা বলে—নিশ্চয়, আপনি আবার কেন কষ্ট করে নিজে এসেছেন—আপনাকেই আমরা ভোট দেবো—

অনেক দিন হাঁটা অভ্যেস নেই পুণ্যশ্লোকবাবুর। রোদের মধ্যে পায়ে হেঁটে চলতে গিয়ে ঘেমে নেয়ে যান। সেইমত অবস্থায় পুণ্যশ্লোকবাবুকে দেখে সকলের মায়া হয়। কিন্তু তিনি চলে গেলেই সবাই আবার স্বমূর্তি ধরে। বলে—পাঁচ বছরের মধ্যে একদিন দেখা নেই, আজ ইলেকশান এসেছে বলে বাড়িতে এসে ধর্ণা দিচ্ছে—

সমাজসেবা করতে গিয়ে এসব কথা শুনে ভয় পেলে চলে না। পুণ্যশ্লোক-বাবুর কানেও এ কথাগুলো আসে। কিন্তু তিনি গায়ে মাখেন না। বলেন—ওসব ভাবলে কাজ চলে না ভাই আমাদের, সারা জীবন এই করেই চালিয়ে এলাম, যতদিন বাঁচবো ততদিন গালাগ্মাল শুনতে হবে—

কিন্তু সমস্ত পাড়া ঘুরে ঘুরে যখন বাড়িতে আসেন, তখন চাকর-বাকর সবাই ছুটে আসে। কেউ জুতো খুলে দিতে আসে, কেউ জামা। সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। আর জ্বালা তো তাঁর একটা নয়। অনেক। স্ত্রী নেই, তার ওপর বাড়িতে একটা মেয়ে, আর একটা ছেলে। মেয়ের ওপর নির্ভর করা চলে না। আর ছেলে? সে যে আমেরিকা থেকে এত পড়াশোনা করে এল, তাতে বাপের কী সাহায্যটা হলো?

এক এক সময় যখন ভীষণ ঝঞ্ঝাটে পড়তেন, তখন প্রজেশ ছিল, হরিলোচন ছিল। হরিলোচন এখনও আছে। কিন্তু তার দ্বারা তো বেশী কাজ হবার নয়। দু'একখানা চিঠি টাইপ করা আর হিসেবপত্র রাখা। আসলে পুণ্যশ্লোকবাবুর সমস্ত কাজ করে এসেছে প্রজেশ। সেই প্রজেশ আজ না থাকাতেই যত ঝামেলা।

এখন তেমন করে কাউকে বিশ্বাস করাও যায় না। মনের কথা বলবার লোকও একটা নেই তাঁর। এমন ছেলেমেয়ে থেকে তাঁর কী লাভ হলো? নিজের কাজের যদি কোনও সুবিধেই না হলো তো তাঁর লাভটা কীসের?

এক একটা দিন যায় আর ক্রমেই যেন দুর্ভাবনা ঘনিয়ে ওঠে। ভলান্টিয়াররা আসে আর হরিলোচন মুহুরীর কাছে টাকা চায়। বলে—আরো টাকা দিন হরিলোচনবাবু—

হরিলোচনবাবুর কাছে সব সময় মোটা একটা টাকার অঙ্ক জমা থাকে। টাকা দেয় হরিলোচন, আর সঙ্গে সঙ্গে একটা রসিদও লিখিয়ে নেয়। পুণ্যশ্লোকবাবু মাঝে মাঝে এসে দেখেন কত টাকা জমা আছে। দেখেন আর চমকে যান। টাকা যেন জলের মত খরচ হয়ে যাচ্ছে। এইভাবে যদি টাকা খরচ হয় তো শেষকালে যে আসলে গিয়ে হাত পড়বে!

পুণ্যশ্লোকবাবু বলেন—একটু টেনে টেনে খরচ করবে হরিলোচন—

হরিলোচন সবিনয়ে বলে—আজ্ঞে আমি টেনে টেনেই তো খরচ করি—

সেদিন সারাদিন বড় বেশী খাটুনি গেছে। এতদিনের দেশসেবার গায়ে হঠাৎ যেন কলঙ্ক লাগতে শুরু করেছে। প্রজেশ নেই, কোথায় কী ঘটছে তা নিজের চোখে না দেখলে যেন বিশ্বাস হয় না। সারা এরিয়াটাই শুধু ঘুরলে হয় না, পার্কে গিয়ে মীটিংও করতে হয়। একবার দেশবন্ধু পার্কে, তারপরই আবার গিরীশ পার্ক। আগে পুণ্যশ্লোকবাবু মীটিং করলে অনেক লোক জড়ো হতো। তারা তাঁর লেকচার মন দিয়ে শুনতো। এখন আর তেমন লোক হয় না। অথচ তিনি খবর নিয়ে দেখেছেন, ওদের মীটিং-এ ভিড় হয়, ওই পূর্ণবাবুদের। পূর্ণবাবুর লেকচার শুনতে শুনতে লোকের গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

মীটিং সেরেই পুণ্যশ্লোকবাবু বাড়ি এলেন। দেখলেন, দু'একজন ভোটের লোক পাশের ঘরে বসে কাজ করছে।

সেখানে ঢুকেই জিজ্ঞেস করলেন—আজ কতগুলো কার্ড হলো?

একটি ছেলে বললে—আজ্ঞে, দু' হাজারের ওপর—

—পোস্টারগুলো ছেপে এসেছে?

—আজ্ঞে না। এখনও আসেনি।

পুণ্যশ্লোকবাবু রেগে গেলেন। বললেন—এখনও ছেপে এলো না? তাহলে কবেই বা দেয়ালে মারা হবে আর কবেই বা সেগুলো লোকের নজরে পড়বে? তোমরা কোনও কাজের নও। প্রজেশ থাকলে এ সব নিয়ে আমাকে ভাবতে হতো না—

বলে আর সেখানে দাঁড়ালেন না। সোজা নিজের বসবার ঘরে ঢুকলেন। হরিলোচন বোধহয় তাঁর জন্যেই অপেক্ষা করছিল। পুণ্যশ্লোকবাবুকে দেখেই বললে—স্যার, আপনার টেলিফোন এসেছিল—

—কোত্থেকে?

—এসেছিল অনেকগুলো, কিন্তু ডাক্তার রায় একবার টেলিফোন করেছিলেন। আপনি এলেই তাঁকে ফোন করতে বললেন—

আর কথা নেই। পুণ্যশ্লোকবাবু ফোনটা ডায়াল করলেন। ওধার থেকে ডাক্তার রায় ধরলেন। বললেন—পুণ্য, তুমি শুনেছ কী কেলেঙ্কারী হয়েছে?

—কী কেলেঙ্কারী স্যার?

ডাক্তার রায় বললেন—তোমার মেয়ে আজকে এনকোয়ারি কমিশনের সামনে

কী এভিডেন্স দিয়েছে—শোনোনি কিছু?

—আজ্ঞে না তো স্যার। আমার মেয়ে? কী বলেছে?

ডাক্তার রায় বললেন—তোমার মেয়েকেই জিজ্ঞেস করো না! তোমার মেয়ে কিনা বলে এল কংগ্রেসের এগেনস্টে? তুমি পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে গুণ্ডা ভাড়া করে কমিউনিস্টদের মেরেছ? এসব কী কথা? আমি নেহরুর কাছে কী জবাব-দিহি করবো বলো দিকিনি?

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—আমি তো এসব কথা কিছুই শুনিনি স্যার। আমি তো এখ্‌খুনি গিরীশ পার্কে মীটিং সেরে এলুম।

ডাঃ রায় বললেন—আজ তুমি মেয়ের সঙ্গে কথা বলো. জিজ্ঞেস করো তাকে যে, সে কী বলেছে—

বলে টেলিফোন ছেড়ে দিলেন।

পুণ্যশ্লোকবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা দোতলায় উঠলেন গিয়ে। কিন্তু কোথায় পমিলি? পমিলির ঘর ফাঁকা পড়ে আছে। আর একটু এগিয়ে গেলেন। সুব্রতর ঘরটা পমিলির ঘরের পাশেই। সুব্রতও তার ঘরে নেই।

তারপর কী করবেন বুঝতে পারলেন না। সেখান থেকেই ডাকলেন—রঘু—রঘু—

রঘু কোথা থেকে দৌড়ে এলো। পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—কোথায় থাকিস তুই, সাড়া পাওয়া যায় না, দিদিমণি কোথায়?

রঘু বললে—আমি তো জানি না হুজুর—

—কখন বাড়ি থেকে বেরিয়েছে?

—সেই দুপুরবেলা।

—দুপুরবেলা কোথায় বেরিয়েছে? সঙ্গে তার কেউ ছিল?

রঘু বললে—না, একলাই তো বেরোলেন। কিছু বলে গেলেন না—

—আচ্ছা, তুই যা। কারো দ্বারা কোনও কাজ হবার উপায় নেই।

রঘু চলে গেল। পুণ্যশ্লোকবাবুও নিচেয় নামতে লাগলেন। মনটা তার বড় ভারি হয়ে গেল। এই একটু আগেই তিনি গিরীশ পার্কে গিয়ে গরম গরম লেকচার দিয়ে এসেছেন। খুব হাততালি দিয়েছে লোকে। তাই মনটাও খুব খুশী ছিল তাঁর। কিন্তু টেলিফোনটা পাবার পর থেকেই মনটা বেসুরো হয়ে গেল। যদি সত্যিই পমিলি কমিশনের সামনে সব কিছু ফাঁস করে দিয়ে থাকে তো সর্বনাশ! তাহলে তো কালকেই খবরের কাগজে সব ছাপা হয়ে বেরোবে! সমস্তই জানাজানি হয়ে যাবে।

নিচেয় নেমে এসেও কী করবেন বুঝতে পারলেন না। মনটা ছটফট করতে লাগলো। মনে হলো এখনি যদি পমিলিকে সামনে পেতেন তো একহাত নিতেন তার ওপর।

হঠাৎ সামনের গেট দিয়ে পমিলির গাড়িটা ঢুকলো। পুণ্যশ্লোকবাবু চলতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালেন।

পমিলি গাড়ি থেকে নেমে ওপরের দিকে যাচ্ছিল।

পুণ্যশ্লোকবাবু সেখানে দাঁড়িয়েই হাঁকলেন—দাঁড়াও—

পমিলি একবার দাঁড়ালো। তারপর যেমন ওপরের দিকে যাচ্ছিল, তেমনিই চলতে লাগলো।

পুণ্যশ্লোকবাবুর মনে হলো তাঁর নিজের মেয়েই যেন তাকে অগ্রাহ্য করলে। যেন পিঠে চাবুক পড়লো তাঁর।

আবার ডাকলেন—পর্মিলি—

কিন্তু পর্মিলি বোধহয় তখন নিজের কর্তব্য স্থির করে নিয়েছে। সে যেমন চলছিল, তেমনিই চলতে লাগলো। কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ করলে না। তারপর সিঁড়ির বাঁকের মুখে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পুণ্যশ্লোকবাবু রাগে ফেটে পড়তে লাগলেন। তারপর আর কিছু করতে না পেরে পেছন পেছন দোতলায় উঠতে লাগলেন।

বললেন—শুনছো, শোনো—

একেবারে ঘরের দরজার সামনে গিয়ে তবে পর্মিলি থমকে দাঁড়ালো।

পেছন থেকে পুণ্যশ্লোকবাবু কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। বললেন—তোমাকে তখন থেকে ডাকছি, শুনছো না কেন? আজকে তুমি কমিশনের অফিসে গিয়ে আমার এগেনস্টে এভিডেন্স দিয়ে এসেছ? বলো, জবাব দাও—

পর্মিলি বললে—হ্যাঁ—

পুণ্যশ্লোকবাবু আবার বললেন—কী এভিডেন্স দিয়েছ?

পর্মিলি বললে—যা সত্যি তাই-ই বলেছি—

—তার মানে? কতটুকু সত্যি তুমি জানো?

পর্মিলি ঘাড় বেঁকিয়ে বললে—আমি সব জানি। আমার সামনেই তুমি পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছ।

—পাঁচ হাজার টাকা?

—হ্যাঁ, গুণ্ডা লাগাবার খরচ। তুমি চাওনি যে ওদের প্রোসেশান পিসফুল হোক। গুণ্ডাদের দিয়ে পুলিশকে প্রোভোক করতে চেয়েছিলে। আর তাই-ই হয়েছিল শেষ পর্যন্ত।

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—তুমি এ বাড়ির মেয়ে, বাড়ির মেয়ের মত থাকবে। তুমি আবার পলিটিক্স নিয়ে মাথা ঘামাও কেন?

পর্মিলি বললে—আমি এ বাড়ির মেয়ে বলেই কি তুমি আমার সঙ্গে যার-তার বিয়ে দিতে চেয়েছিলে?

—যার-তার মানে? প্রজেশ কি অপাত্র?

পর্মিলি বললে—প্রজেশের সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে প্রজেশের দালালি তুমি পাকা করতে চেয়েছিলে, তাই না? ভেবেছিলে বরাবর সে তোমার বশংবদ হয়ে থাকবে, তাতে আমার যা-ই হোক!

পুণ্যশ্লোকবাবু হতবাক্ হয়ে গেলেন মেয়ের কথা শুনে। তারপর বললেন—এই জন্যেই কি আমার ওপর তোমার এত রাগ? একথা তুমি আমাকে আগে বললে না কেন?

পর্মিলি বললে—তোমাকে বলবো? তুমি নিজেকে ছাড়া আর কাউকে কখনও মানুষ মনে করেছ?

—এটা সত্যিই তোমার রাগের কথা পর্মিলি! আগেও তুমি আমাকে এই বলে দোষারোপ করেছ। আমি কি তোমাদের ভাইবোনের জন্য কিছুই করিনি?

পর্মিলি বললে—কিছু করেছ কি করোনি তা আমাকে জিজ্ঞেস না করে নিজেকেই করো, তাহলেই জবাব পাবে—এখন আমার আর কথা বলতে ভাল লাগছে না—

বলে পর্মিলি ঘরের ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিচ্ছিল। পুণ্যশ্লোক-বাবু মাঝখানে দাঁড়াতেই বাধা পড়লো। বললেন—কিন্তু আমার কথার জবাব না দিয়ে তুমি দরজা বন্ধ করতে পারবে না—

—তোমার কী কথা?

—ডাক্তার রায় তাহলে যা কিছু শুনেছেন সবই সত্যি?

—হ্যাঁ সত্যি।

—আমার মেয়ে হয়ে তুমি আমারই বিরুদ্ধে এভিডেন্স দিলে? আমি যে এটা কল্পনাও করতে পারছি না!

পর্মিলি বললে—তুমি বাবা হয়ে যদি মেয়ের শত্রুতা করতে পারো তো আমিই বা তোমার শত্রুতা করতে পারবো না কেন?

বলে একটু সুযোগ পেতেই পর্মিলি দরজার পাল্লা দুটো দড়াম করে পুণ্যশ্লোকবাবুর মুখের ওপর বন্ধ করে দিলে।

পুণ্যশ্লোকবাবু খানিকক্ষণ সেই বন্ধ দরজার সামনে হতবাকের মত দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর মনে হলো পর্মিলি তাঁর দুই গালে দুটো চড় মেরে তাকে অপমান করলে।

উকিল হরনাথবাবু খবরটা পেয়ে পরের দিনই মাধব কুণ্ডু লেনের বাড়িতে এসেছিল। আসতে হয়। খবরটা পরে পেয়েছে, তাই আগের দিন আসতে পারেনি। শিবশম্ভু চৌধুরীর বরাবরের উকিল হরনাথবাবু। কত বার কত কাজে এই হরনাথের কাছে তিনি পরামর্শ নিয়েছেন। সেসব কথা তার মনে পড়তে লাগলো।

শ্মশান থেকে ফিরতে সকলের রাত কাবার হয়ে গিয়েছিল। সেই অত রাত্রেই নিমতলায় যেতে হয়েছে ভূপতি ভাদুড়ীকে। সুধন্যও ছিল তখন। সে-ই বলতে গেলে সব কিছু করেছে। ছোকরা মানুষ। গায়ে শক্তি আছে।

সুধন্য বললে—আর কেঁদে কী করবেন ম্যানেজারবাবু, এ যাওয়া ভালোই হয়েছে—

শুয়ে শুয়ে ভোগার চেয়ে এ যে ভালো হয়েছে তা ভূপতি ভাদুড়ীও জানতো। কিন্তু তবু একটা মানুষ চোখের সামনে থেকে চলে গেলে কষ্ট হবে না?

যা হোক, শোক যতই গভীর হোক, কর্তব্য করে যেতেই হবে মানুষকে। শ্মশান থেকে ফিরে সমস্ত বাড়িটা যেন বড় ফাঁকা লাগল ভূপতি ভাদুড়ীর কাছে। উকিলবাবুর সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা হলো। যাবার সময় উকিলবাবু বললে—তাহলে সন্ধ্যেবেলা আমার বাড়িতে একবার যেও, তখন কথা হবে—

উকিলবাবু চলে গেল। তারপর রাজ্যের ভাবনা এসে মাথায় ঢুকলো হুড়-হুড় করে। এই বিরাট সম্পত্তি। এ সমস্তর ভারই এখন ভূপতি ভাদুড়ীর মাথার ওপর এসে পড়লো। শ্রাদ্ধ-শান্তির ব্যবস্থাও করতে হবে তাকে। আর শুধু কি তাই! এখন তো সমস্তই তার নিজের। নিজের সম্পত্তি।

ভূপতি ভাদুড়ী আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলো।

সমস্ত বাড়িটা যেন নিঃঝুম নিষ্প্রাণ হয়ে গেছে কাল রাত থেকে। মা-মণি এতদিন যদিও জীবন্মৃত অবস্থায় বেঁচে ছিল, তবু মানুষটার প্রাণ তো ছিল! মানুষটা যতদিন বেঁচে ছিল ততদিন তার অধিকারও ছিল। আইনের চোখে পুরো মাত্রাতেই ছিল। কিন্তু এবার সমস্ত অধিকার ভূপতি ভাদুড়ীর। এ সমস্ত কিছুরই মালিক ভূপতি ভাদুড়ী। ভাগ্নেটার কপালে নেই, নইলে এখন

কি আর তার ভাবনা থাকতো? এবার সবাইকে তাড়াতে হবে বাড়ি থেকে।

তরলার সঙ্গে মুখোমুখি হলো ওপরে উঠে।

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—কাঁদিসনে মা, কাঁদছিস কেন? আমি তো আর মারা যাইনি, আমি তো বেঁচে আছি এখনও—

তারপর একটু থেমে বললে—বাদামী কেমন আছে রে?

তরলা ধরা গলায় শুধু বললে—সেই রকমই—

বলে চলে গেল। ভূপতি ভাদুড়ী আস্তে আস্তে মা-মণির ঘরের দিকে গেল। কাল সন্ধ্যে পর্যন্ত ঘরটায় প্রাণ ছিল, আজ আর তা নেই। বাদামী অথর্ব হয়েই গিয়েছিল। কিন্তু কাল রাত থেকে যেন আরো অথর্ব হয়ে গিয়েছে। ঘরের মেঝের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে ছিল।

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—কেঁদো না বাদামী, উঠে বোস। আমি আছি, তোমার ভাবনা কী? আমি যদ্দিন আছি তদ্দিন কিছু ভেবো না তুমি—

তারপর আশেপাশে চেয়ে দেখলে। আর কেউ কোথাও নেই। চাবিটা কাল রাত্রেই ভূপতি ভাদুড়ী হাতিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু আরো তো কিছু বাকি থাকতে পারে।

হঠাৎ যেন কথাটা মনে পড়ে গেল। ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এলো। তারপর একেবারে বারান্দার শেষ প্রান্তে গিয়ে একটা ঘরের সামনে ডাকতে লাগলো—ও সুখদা—সুখদা—

সুখদা বেরিয়ে এল—আমাকে ডাকছেন?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—হ্যাঁ, বলছিলুম যা হবার তা তো হয়ে গেল! এখন আর ভেবে কী করবে? এবার নিজের পথ একটা দেখ—

সুখদার বুকের ভেতরটা থরথর করে কেঁপে উঠলো।

বললে—আমি কোথায় যাবো?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—কেন, তোমার যাবার জায়গার অভাব কী? কালীকান্ত কোথায় গেল? সেই কালীকান্ত বাবাজী? তুমি তো তার বিয়ে-করা বউ?

—আমি তো আর তার খোঁজখবর রাখি না ম্যানেজারবাবু!

ভূপতি ভাদুড়ী মোলায়েম গলায় বলতে লাগলো—তা বললে তো চলবে না মা, তোমার নিজের রাস্তা তো এবার তোমার নিজেকেই দেখতে হবে। আমি তো বরাবর তোমাকে খাওয়াতে পরাতে পারবো না। আর কোথাও যদি যাবার জায়গা না থাকে তো তোমার মাসী তো রয়েছে—

সুখদা বুঝতে পারলে না। বললে—কে মাসী?

—মাসীকে চেনো না? মানদা মাসী গো। বড় ভালো মানুষ। তোমাকে কত খাতির-যত্ন করতো, তুমি তার আদর-যত্ন পায়ে ঠেলে চলে এলে, এতে কি তোমার ভালো হবে ভেবেছ? ভালো হবে না। আর আমিও তোমাকে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াতে পারবো না মা। আমার জমিদারী নেই যে জমিদারী ভাঙাবো আর খাবো—বুঝেছ?

সুখদা পাথরের মত হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। বললে—কিন্তু সেখানে কি ভদ্র মেয়েদের যাওয়া চলে? আপনিই বলুন না!

সুখদার সামনে দাঁড়িয়ে বাজে কথা বলবার দিন চলে গিয়েছিল ভূপতি ভাদুড়ীর। আর তাছাড়া মা-মণি যখন নেই, তখন আর তার কোনও দায়-দায়িত্বই নেই কারোর ওপর। এখন ভূপতি ভাদুড়ী যা খুশী তাই করবে, যাকে-তাকে যা খুশী তাই বলবে। তাতে কেউ খুশীই হোক আর অখুশীই হোক,

তার কিছু আসে যায় না।

চলে যাবার আগে ভূপতি ভাদুড়ী বললে—আমি কথাটা বলে রাখলুম, তারপর তোমার যা মর্জি তাই কোর—

বলে নিচেয় নেমে এল। সুখদার সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাজে কথা বললেই তো আর তার চলবে না। তার অনেক কাজ। নিচের উঠোনে নেমে এসে সোজা রান্নাবাড়ির দিকে চলে গেল।

সেখানে গিয়ে ডাকলে—কই গো, ঠাকুর! ঠাকুর কোথায় গেলে?

ঠাকুর সেদিনও যথারীতি রান্নাবান্নায় ব্যস্ত ছিল। ম্যানেজারবাবুর ডাকে তাড়াতাড়ি হাত মুছতে মুছতে এসে হাজির হলো। বললে—আমাকে ডাকছেন বাবু?

—হ্যাঁ, ডাকছি। দেখ বাপু, তোমার কাজকর্মে আমি খুশী নই, ভালো করে মন দিয়ে কাজ না করলে তোমাকে এ বাড়ি থেকে সরে যেতে হবে, এই তোমায় বলে রাখছি—

তারপর একটু থেমে বললে—বুড়োবাবু কোথায়?

বলতে বলতে একেবারে সোজা উঠোনে নেমে একেবারে শেষ ঘরখানার দিকে চলে গেল। সেখান থেকেই চিৎকার করতে লাগলো—কই গো, বুড়োবাবু কই—

বুড়োবাবু সামনে ম্যানেজারবাবুকে দেখে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললে।

—আর মায়াকান্না কাঁদতে হবে না, আমার নামে কার কাছে লাগাবে এবার লাগাও! একখানা গামছার জন্যে মা-মণির কাছে আমার নামে চুকলি খেয়েছিলে, মনে পড়ে?

বুড়োবাবু বললে—আমি আর বেশীদিন নেই ম্যানেজারবাবু, যে ক'টা দিন বাঁচি এখানেই থাকতে দিন দয়া করে। আমি এই বুড়ো বয়েসে কোথায় যাবো? কোথায় কার কাছে এখন ঠাঁই পাবো?

ভূপতি ভাদুড়ী খেঁকিয়ে উঠলো—ওসব কথা আমি আর শুনছিনে। মা-মণি যখন ছিল তখন ছিল, এখন আমি মালিক, আমার হুকুমে সবাইকে চলতে হবে। আমি সবাইকে বরখাস্ত করে দেবো—

বলে আর দাঁড়ালো না সেখানে। মা-মণি মারা যাবার পর একটা কি দুটো দিন সবে কেটেছে। এখনও সকলের চোখের জল ভালো করে শুকোয়নি। এরই মধ্যে সারা সংসারে এমন করে বিপর্যয় ঘটে যাবে কেউ ভাবতে পারেনি। তেতলার সুখদা থেকে শুরু করে একতলার অর্জুন পর্যন্ত সকলের মুখ যেন শুকিয়ে গেল। কী হবে এবার? এবার তাহলে কোথায় যাবো আমরা? মা-মণির সম্পত্তি এখন যে সমস্তই ম্যানেজারবাবুর ওপর বর্তেছে। মালিক যে এখন ম্যানেজারবাবু।

সেদিন রাত্রে হঠাৎ কালীকান্ত বিশ্বাস এসে হাজির। বাহাদুর সিং দেখে চিনতে পেরেছে। একটা শুকনো সেলাম করলে জামাইবাবুকে।

কালীকান্ত সেলামটা ফিরিয়ে দিয়ে সোজা ভেতরে ঢুকে গেল। মা-মণি নেই, আর কাকেই বা ভয় করবে কালীকান্ত। তারপর সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার মুখেই ধনঞ্জয়ের সঙ্গে দেখা।

ধনঞ্জয় জামাইবাবুকে দেখেই দাঁড়িয়ে পড়লো। বললে—শুনেছেন তো সব জামাইবাবু?

কালীকান্ত বললে—সেই শুনেই তো এলুম। বাড়ির হালচাল কী?

—ভাগ্নেবাবুকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে, তা জানেন তো?

—সে তো জানি। তোমাদের ভাগ্নেবাবু, লোকটা তো ভালো ছিল না

ধনঞ্জয়। সত্যি কথা বলতে কী, একদিন-না-একদিন ও ধরা পড়তোই। যেমন করে ভাগ্নেবাবু ধরা পড়েছে, তেমনি করে তোমাদের ম্যানেজারবাবুও ধরা পড়বে, এই বলে রাখছি। তা তোমাদের ম্যানেজার গেল কোথায়?

ধনঞ্জয় বললে—ম্যানেজারবাবু তো সকলকে নোটিশ দিয়ে দিয়েছে

—কীসের নোটিশ?

—বাড়ি ছাড়ার নোটিশ। শুধু তরলাদি আর বাদামী বুড়ি থাকবে, আর সকলকে বিদেয় করে দেবে। বুড়োবাবুকে বাড়ি ছাড়তে বলেছে, সুখদা দিদি-মণিকে নোটিশ দিয়েছে, বাহাদুর, দুখমোচন, অর্জুন, ঠাকুর, ঠিকে-ঝি, সবাইকে। এখন কী হবে?

কালীকান্ত বললে—কেন? ম্যানেজার নোটিশ দেবার কে? এ কি ম্যানেজারের বাড়ি যে সে নোটিশ দেয়? এ শিবশম্ভু চৌধুরীর সম্পত্তি। এর এক-মাত্র মালিকানা ছিল মা-মণির। মা-মণি মারা যাবার পর এখন মালিকানা তোমা-দের সুখদা দিদিমণির। নোটিশ দিলে ঐ সুখদাই দেবে, ম্যানেজার ব্যাটা কে?

ধনঞ্জয় যেন আশা পেলে একটু। বললে—আপনি ঠিক জানেন?

—আমি ঠিক জানি। তা সুখদা কোথায়? ওপরে আছে?

ওপরে আছে শুনে আর দাঁড়ালো না সেখানে কালীকান্ত। একেবারে সোজা তর তর করে উঠে গেল তেতলায়। সুখদার ঘরের সামনে গিয়ে ডাকলে—সুখদা—

বেশ স্পষ্ট গলার ডাক। কাউকে আর ভয় করবার নেই এখন।

সুখদা বেরিয়ে এসেই বললে—তুমি? তুমি কেন এখানে এসেছ? কেউ যদি দেখে ফেলে?

কালীকান্ত বললে—কোন্ শালা দেখবে? আর দেখলেই বা কী করবে? এখন আমি কাকে পরোয়া করি? এ বাড়ি তো তোমার। তোমার মানেই আমার—

—আমার বাড়ি?

—হ্যাঁ, তোমার বাড়ি নয় তো কার? একমাত্র তো তুমিই মা-মণির নিজের লোক। নিজের লোক বলতে তো তুমি ছাড়া আর কেউ নেই।

—কিন্তু ম্যানেজারবাবু যে ওর ভাগ্নের নামে উইল করিয়ে নিয়েছে।

হঠাৎ নিচেয় কার পায়ের আওয়াজ হতেই কালীকান্ত পেছনে ফিরে দেখলে—ভূপতি ভাদুড়ী আসছে। ভূপতি ভাদুড়ী কোনও দিকে না চেয়ে একেবারে সোজা কালীকান্তর দিকে এগিয়ে এল। বললে—তুমি আবার এসেছ যে এ বাড়িতে? কে তোমাকে আসতে দিয়েছে? কেন এসেছ এখানে? কী মতলব তোমার?

বলতে বলতে একেবারে কালীকান্তর মুখোমুখি এসে দাঁড়ালো।

কালীকান্ত তৈরী ছিল। বললে—আমার খুশী আমি এসেছি, তুমি বলবার কে?

ভূপতি ভাদুড়ী তখন সত্যি সত্যিই রেগে গেছে।

বললে—দেখছি যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! বেরিয়ে যাও এখনি আমার বাড়ি থেকে, বেরিয়ে যাও—বেরিয়ে যাও বলছি—

কালীকান্তও তেমনি। বললে—বেরোব না, কী করতে পারো তুমি, করো দিকিনি—

—দেখবে? তাহলে দেখবে কী করবো?

ভূপতি ভাদুড়ী মুখে বললে বটে, কিন্তু কী করবে ঠিক করতে পারলে না।

হঠাৎ বললে—তবে দাঁড়াও আমি আসছি, এখুনি আসছি—

চেঁচামেচি শুনে তখন সবাই এসে দাঁড়িয়ে গেছে সেখানে। ধনঞ্জয়ও এক-পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। তার দিকে চেয়ে ভূপতি ভাদুড়ী বললে—ধনঞ্জয়, তুই এখানে থাকিস, যেন বেটা না পালায়, আমি এখুনি আসছি—

বলে তখনি তর তর করে আবার সিঁড়ি দিয়ে নেমে নিচের দিকে চলে গেল। একটা অনিশ্চিত আতঙ্কে সমস্ত বাড়িটা থমথম করতে লাগলো।

মানুষের আশার কি শেষ আছে? একদিন ভূপতি ভাদুড়ী চেয়েছিল এই ছ'লক্ষ টাকার সম্পত্তি সে গ্রাস করবে। পূর্ণবাবু আশা করেছিল, একদিন রাইটার্স বিল্ডিং-এ মিনিষ্টার হয়ে বসবে। সুরেন আশা করেছিল যে, একদিন কলকাতা সহর থেকে সমস্ত অশান্তি দূর হবে। সুখদা আশা করেছিল, একদিন সে স্ত্রী হবে, মা হবে, গৃহিণী হবে। কলকাতার আরো কত মানুষ কত কী চেয়েছিল, সব কি কলকাতার মনে আছে? না মনে রাখতে গেলে তার কাজ চলে?

কত লোকের কত আশা যে প্রতি মুহূর্তে ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে, কে তার হিসেব রাখছে। এক মাধব কুণ্ডু লেনের বাড়ি থেকেই শুরু হয়েছিল এ উপন্যাস। তারপর কত দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে আজ এ কাহিনী এখানে এসে পৌঁছিয়েছে। কত হাসি, কান্না, ষড়যন্ত্র আর প্রতিযোগিতা পেছনে ফেলে এ কাহিনী মানুষের জীবনের মতই এগিয়ে চলে এসেছে। কলকাতা প্রতিষ্ঠিত হবার দিনটি থেকে শুরু করে এই আজ পর্যন্ত এ নিয়ে যদি কেউ উপন্যাস লেখে তো তবু কি এব সব কাহিনী লেখা যাবে? হাজার হাজার পরিচ্ছেদ লেখা হলেও মনে হবে এর সব কিছু যেন লেখা হলো না, সব কিছু যেন বলা হলো না, যেন অনেক কিছু না-বলা রয়ে গেল।

হরনাথ উকিল সেদিন বার বার করে ভূপতি ভাদুড়ীকে বললে—ঝট করে কিছু কোর না ভূপতি, শেষকালে না একটা ক্রিমিন্যাল কেস বেধে যায়—

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—কেন, ক্রিমিন্যাল কেস কে বাধাবে?

—যে কেউ বাধাতে পারে। হয় সুধন্য বাধাতে পারে, নয় তো কালীকান্ত। কে বাধাবে কেউ কি তা আগে থেকে বলতে পারে? দেখ, হিন্দু কোড্ বিল পাশ হয়ে গেল, এখন তো পোয়া বারো। এখন মেয়েরাও সম্পত্তির ভাগ পাবে। এখন কত সংসার ভাঙে তাই দেখ—

সব কথাই বুঝিয়ে দিয়েছিল হরনাথবাবু। আর রাগারাগি করে মাথা গরম করলে চলবে না। যা করতে হবে সব ঠাণ্ডা মাথায় করতে হবে। এখন কাউকে চটিও না ভূপতি। সবাইকে খুশী রাখো। মেজাজ ঠাণ্ডা রেখে ধীরে ধীরে সবাইকে তাড়াবে। এখন দিনকাল বড় খারাপ!

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—কিন্তু উকিলবাবু, আমার সুরেনের নামে তো সব উইল করে গেছেন মা-মণি—

হরনাথবাবু বললে—তা সে সুরেন তো এখন খুনের আসামী। তার যদি ইতিমধ্যে ফাঁসি হয়ে যায়? ফাঁসি হয়ে গেলে তখন আবার তুমি ফ্যাসাদে পড়বে। তোমাকে আবার অধিকার সাব্যস্ত করতে হবে। সেও তো অনেক ল্যাঠা।

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—সেই পরামর্শ করতেই তো আপনার এখানে আমার

আসা—সেই গুণ্ডা কালীকান্ত বেটা তো ইতিমধ্যে বাড়িতে গিয়ে উঠেছে—

—বাড়ি গিয়ে উঠেছে মানে?

—মানে আমি একটু চোখের আড়াল করেছি আর ওমনি বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়েছে। ওর বিরুদ্ধে ট্রেসপাসের চার্জ আনা যায় না?

হরনাথবাবু বললে—এখন ওসব ঝঞ্ঝাটের দরকার নেই, এখন মিষ্টি কথায় কাজ সারতে হবে। তোমার উইল তো পাকা নয়, তাই মামলা করলে সব কেঁচে যাবে—

—কেন, উইল পাকা নয় কেন?

—আরে উইল তুমি পাকা আর করলেটা কখন? উইলে তো লাবণ্যবালা দাসীর সইটা পর্যন্ত করিয়ে নিতে পারলে না!

—তাহলে কী হবে?

হরনাথবাবু বললে—সেই জন্যেই তো বলছি, এখন চুপিচুপি গিয়ে দখল নাও। নিজে ওপরে অন্দরমহলে গিয়ে ঢুকে পড়ো। তারপর তো আমি আছি—

সত্যিই কী ঝঞ্ঝাট! মাথার মধ্যে হরনাথবাবুর কথাগুলো তখনও ঘুর ঘুর করছিল। এতদিনকার এত প্ল্যান, এত মতলব সব কি তবে বানচাল হয়ে যাবে?

কলকাতার রাস্তায় পিল পিল করা মানুষের ভিড়। ভূপতি ভাদুড়ী নিজের ভাবনা ভাবতে ভাবতেই আসছিল। মিছিমিছি কালীকান্তর সঙ্গে গরম গরম কথা বলাটা অন্যায় হয়ে গিয়েছিল। সত্যিই তো অমন মেজাজ গরম করলে কোনও কাজ হয় না। তার চেয়ে মিষ্টি কথায় অনেক কাজ হয়। মিষ্টি কথাতেই কাজ সারতে হবে। মিষ্টি কথা দিয়েই সুখদাকে আবার বাড়ির বাইরে পাঠিয়ে দিতে হবে। তারপর ভাগ্য!

রাস্তায় আসতে আসতে ভূপতি ভাদুড়ী বাঁদিকের গলিটার মধ্যে ঢুকলো। গলিটার মধ্যে ঢুকলে সর্টকাট হবে। সর্টকাট করে একেবারে ঠনঠনের কালী-বাড়ির সামনে গিয়ে পড়া যায়। গলি হলে কী হবে, গলির মধ্যেও মানুষ কিল-বিল করছে। এত লোক যে কোথায় জন্মায় তাও ভাবা যায় না। যেন ভেড়ার পাল একেবারে।

কালীমন্দিরের সামনে রাস্তার ওপর তখন সবাই হাতজোড় করে বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে আছে একদৃষ্টে। সকলেরই অসংখ্য চাহিদা। অসংখ্য কামনা-বাসনা তাদের। অর্থ দাও, সুখ দাও, আরোগ্য দাও। সকলের সব কামনার সঙ্গে ভূপতি ভাদুড়ীও একপাশে দাঁড়িয়ে তার গোপন প্রার্থনা মা'র কাছে জানালো—হে মা কালী, হে মা জগদ্ধাত্রী, আমার ভাগ্নেকে খালাস করে দাও মা, আমাকে মাধব কুণ্ডু লেনের বাড়িটা পাইয়ে দাও মা। আমি উইলটা ঠিকই করিয়েছিলাম। মা-মণিও রাজী হয়েছিল। মা-মণি তার সব সম্পত্তির মালিকানা সুরেনকেই দিতে চেয়েছিল। তারপর মা-মণি অসুখে পড়ে যাওয়াতে আর তার সইটা নেওয়া সম্ভব হয়নি মা। আমার কামনা পূর্ণ করো মা, আমি তোমার নামে জোড়া পাঁঠা মানত করছি মা। আমার ভাগ্য ফিরিয়ে দাও—

বলে ভূপতি ভাদুড়ী সামনের শ্বেত পাথরের বাঁধানো বারান্দার ওপর অনেকক্ষণ মাথাটা ঠেকিয়ে রাখলো। আর উঠলো না। কেবল মনে মনে কামনা-বাসনাগুলো বার বার পুনরাবৃত্তি করতে লাগলো।

সকালবেলা পুণ্যশ্লোকবাবু যথারীতি ঘুম থেকে উঠেছেন। ভোটের দিন যত এগিয়ে আসছে ততই ভোরবেলা ঘুম ভেঙে যাচ্ছে পুণ্যশ্লোকবাবুর। আগের বারে এমন হয়নি। আগের বারে নিশ্চিন্ত ছিলেন তিনি। ভোট তিনি পাবেনই এ কথা পাড়ার লোক একবাক্যে তাঁকে জানিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু এবার অন্য রকম। এবার সবাই ভাসা ভাসা উত্তর দেয়।

সমস্ত রাত ভাল ঘুম হয়নি পুণ্যশ্লোকবাবুর। এইসব ভেবে ভেবেই। ভোর-বেলা উঠেই বারান্দা দিয়ে নেমে এসে নিজের ঘরে বসলেন। সারা দিনের প্রোগ্রামটা ওই সময়েই ঠিক করে নিতে হয়। তারপরেই ভলান্টিয়াররা এসে পড়বে দলে দলে। তারা হৈ-চৈ করবে। তাদের প্রত্যেককে দৈনিক হাত-খরচ দিতে হবে। হাত-খরচের রেটও বাড়িয়ে দিতে হয়েছে এবার। আগে পাঁচ টাকা দিলেই হতো। এখন নগদ দশ টাকা তো আছেই, তার ওপর চা-জলখাবার আছে।

হরিলোচন মুহুরী তখনও আসেনি। হঠাৎ পায়ের আওয়াজ পেতেই পুণ্যশ্লোকবাবু বুঝলেন হরিলোচন আসছে। হরিলোচনেরও অনেক কাজ বেড়ে গেছে।

হঠাৎ গলার আওয়াজ শুনেই পুণ্যশ্লোকবাবু চমকে উঠলেন—একি, তুমি?

সুব্রত হাঁফাচ্ছে তখনও।

বললে—পর্মিলি কেমন করছে বাবা—

—পর্মিলি? কী করছে?

সুব্রত বললে—আমি ঘুমোচ্ছিলাম, পাশের ঘর থেকে শব্দ পেলাম।

—কীসের শব্দ?

সুব্রত বললে—তা জানি না, পর্মিলির ঘরের দরজায় গিয়ে ধাক্কা দিলাম, কিন্তু ভেতর থেকে বন্ধ, দরজা খুলতে পারলাম না। কিন্তু আমার খুব ভয় করছে।

—কেন, ভয়ের কী আছে?

সুব্রত বললে—আমার মনে হচ্ছে পর্মিলির একটা কোনও বিপদ হয়েছে, তুমি একবার চলো এখুনি—

মৃত্যু হয়ত সচরাচর সহজে আসে না। কিন্তু কখনও কখনও বড় আচমকা তার আবির্ভাব। হঠাৎ উদয় হয়ে তখন সে বলে—আমি এসেছি—

আর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সব নিয়ম, সব নিষেধ একাকার হয়ে যায়। কে জানতো পর্মিলি এমন করে তার সব কিছু সাধ, সব কিছু কামনা নিঃশেষ করে দেবে! কে জানতো সে এমন করে পুণ্যশ্লোকবাবুকে বিব্রত করে চলে যাবে! শুধু কি লজ্জা? তার সঙ্গে কলঙ্ক বদনামই কি কম হয়েছিল? ঠিক ইলেকশানের আগে পর্মিলি তার এই সর্বনাশ করে যাবে তা কেই বা ভাবতে পেরেছিল?

নার্সিং হোমের ডাক্তার শেষ পর্যন্ত অনেক চেষ্টা করেছিল।

সুব্রত দিন-রাত প্রায় সর্বক্ষণ পাশে বসে থাকতো। সে একদিন গেছে সুব্রতর। আজ এতদিন পরে সে সব কথাগুলো ভাবতে গিয়ে সুব্রত অবশ হয়ে যায়। সে কী মর্মান্তিক যন্ত্রণাকাতর অবস্থা। যখন এক একবার মুহূর্তের জন্যে জ্ঞান ফিরে আসতো তখন যেন সমস্ত নার্সিং-হোমটা আর্তনাদে কাঁপিয়ে তুলতো।

সুব্রত এবং আর একটা নার্স মিলে চেপে ধরে থাকতো পমিলিকে। যন্ত্রণায় ছটফট করতো পমিলি। বলতো—আমাকে বাঁচাও সুব্রত—বাঁচাও—

ডাক্তাররাও আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল পমিলিকে বাঁচাতে। কিন্তু যে অনেকগুলো ঘুমের বড়ি এক সঙ্গে খেয়েছে, তাকে বাঁচানো ডাক্তারের কর্ম নয়। একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া তাকে কে বাঁচাবে। কিন্তু মানুষের সে ঈশ্বর কোথায় থাকে? কোন্ অদৃশ্যলোকে গেলে তাকে পাওয়া যায়? যদি তা পাওয়া যেত তো সুব্রতর মনে হয়েছিল সেখানেই সে যাবে।

পুণ্যশ্লোকবাবু এক একবার আসতেন।

জিজ্ঞেস করতেন—কেমন আছে আজ পমিলি?

সুব্রত বলতো—ভালো নয়—

তারপর ডাক্তারবাবুর কাছে যেতেন পুণ্যশ্লোকবাবু। নানা রকম প্রশ্ন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করতেন। কিন্তু ডাক্তাররাই বা কী করবে? তাদের সাধ্যেরও তো একটা সীমা আছে! তারা তো জীবন দিতে পারে না।

চব্বিশ ঘণ্টা কাটলো, আটচল্লিশ ঘণ্টা কাটলো। শেষে হয়ত বাহাত্তর ঘণ্টাও কাটবে। কিন্তু পুণ্যশ্লোকবাবুর এত সময় নেই অপেক্ষা করবার মত। তাঁর অনেক কাজ। কাজ মানে সেইটেই তাঁর আসল কাজ। চারদিকে ঘুরে ঘুরেও তিনি বুঝতে পারছিলেন না কোন্‌দিকে হাওয়া। কেউ বলছে পূর্ণবাবু জিতবে, কেউ বলছে পুণ্যশ্লোকবাবু জিতবে। ভলান্টিয়াররা সমস্ত পাড়ার হাঁড়ির খবর রাখে। তারা হঠাৎ দৌড়তে দৌড়তে এসে বলে যায়—স্যার, আপনি এবার নির্ঘাৎ জিতবেন—

পুণ্যশ্লোকবাবু জিজ্ঞেস করেন—কীসে বুঝলে?

একটি ভলান্টিয়ার ছোকরা বলে—সবাই তো তাই বললে। আমাদের সবাই ওয়ার্ড-অব-অনার দিয়েছে—

ভলান্টিয়ারদের কথায় বিশেষ ভরসা রাখেন না পুণ্যশ্লোকবাবু। ওরা মোটা টাকা পায়, মিষ্টি কথা শুনিয়ে স্তোক দিতে চায়। কিন্তু আসলে তো কলকাতার লোক সব কিছু জেনে গেছে। তারা জানে, কেন প্রজেশ সেন খুন হয়েছে, কেন পমিলি স্লিপিং-পিল খেয়েছে। সমস্ত কলকাতার লোক জানতে পেরেছে পুণ্যশ্লোকবাবুর কীর্তি-কলাপ। কেমন করে পুলিশকে দিয়ে পার্টির মিছিলের ওপর গুলী চালানো হয়েছে। পমিলি তদন্ত কমিশনের সামনে সব ফাঁস করে দিয়েছে।

কিন্তু পুণ্যশ্লোকবাবু অত সহজে হতাশ হবার লোক নন। তাঁকে অনেক কায়দা, অনেক কসরৎ করে মানুষের ভিড়ের মধ্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হয়েছে। লাখ লাখ টাকা খরচও করেছেন তিনি দু' হাতে। এতদিনের এত টাকা খরচ করা, এত জেল খাটা কি তবে আজ সব ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে?

পমিলি নার্সিং-হোমের বিছানায় শুয়ে যখন ছটফট করে, তখন পুণ্যশ্লোকবাবুর লেকচারে কলকাতার পার্কগুলো গম গম করে ওঠে। তখন তিনি প্রজেশের কথা ভুলে যান, পমিলির কথা ভুলে যান, বিশ্ব-সংসারের সব কথা ভুলে গিয়ে শুধু নিজের অবস্থার কথাটা মনে রাখেন। মনে রাখেন শুধু নিজের পার্টির কথা। সর্বোপরি পূর্ণবাবুকে হারানো ছাড়া আর কোনও কথাই তাঁর মনে পড়ে না তখন।

খবরের কাগজগুলোকে আগে থেকে বলা ছিল। সেদিক থেকে পুণ্যশ্লোকবাবু নিশ্চিন্ত ছিলেন। সেদিক থেকে কোনও ভয় ছিল না তাঁর। কিন্তু ওদেরও

তো কাগজ আছে। ওদের কাগজ যত কমই চলুক, কিন্তু কিছু কিছু লোক তো তা পড়েই।

সেদিন ডাক্তার রায় পুণ্যশ্লোকবাবুকে ডেকে পাঠালেন।

বললেন—এসব কী শুনছি তোমার নামে পুণ্য? সহরে তো আর কান পাতা যাচ্ছে না—

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—সব ওদের প্রোপাগান্ডা—

ডাক্তার রায় বললেন—তা তোমার মেয়ে বিষ খেলে তাও কি ওদের প্রোপাগান্ডা?

এ কথার উত্তরে পুণ্যশ্লোকবাবু আর কিছু বলতে পারলেন না।

—তুমি কি মেয়েকে কিছু বকাবকি করেছিলে নাকি?

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—এমন বেশী কিছুই বলিনি—

ডাক্তার রায় রাগ করলেন। বললেন—ঠিক ইলেকশানের আগেই এই সব কেলেঙ্কারী হলো, এতে তোমার একলার শুধু নয়, পার্টিরও তো বদনাম হয়।

সবশেষে তিনি বললেন—এখন বাড়ি বাড়ি গিয়ে ক্যানভাস করো। সব ভোটারদের কাছে নিজে গিয়ে কথা বলে এসো। ভলান্টিয়ারদের ওপর ভরসা কোর না, তারা কেবল তোমাকে মুখে ব্লাফ দেবে, আর পেছনে টাকা লুটবে—

পমিলির জন্যেই তাকে চিফ-মিনিস্টারের কাছ থেকে কড়া কথা শুনতে হলো। এর চেয়ে আর লজ্জার কী থাকতে পারে!

সেদিন বাড়িতে ঢোকার মুখেই ভূপতি ভাদুড়ীর কেমন যেন সন্দেহ হলো। গলির মুখে এ কাদের লরি। ঠিক গেটের সামনেই লরিটা দাঁড়িয়ে আছে। লরির মাথায় রাজ্যের জিনিস ভর্তি। খাট আলমারী চেয়ার তো আছেই, তার ওপর আছে কুলো, ডালা, ঝুড়ি, ঝাঁটা সব কিছু। যেন কেউ সংসার বোঝাই করে চৌধুরী-বাড়ির সামনে এসে হাজির হয়েছে।

ভূপতি ভাদুড়ী প্রথমে বুঝতে পারেনি। এ বাড়িতে কে এল? কালীকান্ত নাকি? কালীকান্ত কি তার সংসার উঠিয়ে নিয়ে এখানে এসেছে, এ বাড়িতে? কালীকান্ত এই সুযোগে জাঁকিয়ে বসবে নাকি এখানে?

কুলিরা এক এক করে লরি থেকে জিনিস নামাচ্ছিল।

ভূপতি ভাদুড়ী সামনে হন্তদন্ত হয়ে গিয়ে দাঁড়ালো।

বললে—এ্যাই, এ কিসকো মাল হ্যায়? তুমলোক কৌন্ হ্যায়?

ভূপতি ভাদুড়ীর কথায় কেউ গা করলে না যেন তেমন। যেমন মাল নামাচ্ছিল, তেমনি মাল নামাতে লাগলো। ভারি ভারি মালপত্র সব। সংসারের যাবতীয় জিনিস যেন উজাড় করে তুলে এনেছে এখানে।

বাহাদুর একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল চপ করে।

ভূপতি ভাদুড়ী তার কাছে গিয়েই জিজ্ঞেস করলে—এ সব কী বাহাদুর? এ কাদের মালপত্তোর আমার বাড়ির মধ্যে ঢোকাচ্ছে?

বাহাদুর সিং ম্যানেজারবাবুকে দেখেই সেলাম করলে।

বললে—হুজুর সুধনবাবুর মাল—

সুধন্যবাবু! সুধন্যার নাম শুনেই তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলো ভূপতি ভাদুড়ী। এত বড় আস্পর্ধা তার, সে এসে ঢোকে আমার বাড়িতে! বাড়ি ফাঁকা পেয়েছে আর সে একেবারে মালপত্র নিয়ে ঢুকে পড়লো!

—কোথায় সুধন্য? কাঁহা গিয়া?

বাহাদুর বললে—হুজুর, অন্দরমে হ্যায়—

ভূপতি ভাদুড়ী আর দাঁড়ালো না। একেবারে সোজা উঠোনের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। সমস্ত উঠোনটা জিনিসপত্রে জমজমাট। পা ফেলবার জায়গা নেই একটু।

সিঁড়ি দিয়ে ওপরের দিকে উঠলো ভূপতি ভাদুড়ী। দোতলায় অনেক মেয়ে-মানুষের গলার আওয়াজ শোনা গেল। এত মেয়েছেলে কোত্থেকে এল!

ভূপতি ভাদুড়ী চিৎকার করে ডাকলে—ধনঞ্জয়—ধনঞ্জয়—

ধনঞ্জয় সাড়া দিলে দূর থেকে। খানিক পরে সামনে এল।

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—এসব কী হচ্ছে? এরা কারা?

ধনঞ্জয় বললে—আজ্ঞে, সুধন্যবাবুর বউ-মেয়ে-ছেলে এসে হাজির হয়েছে—

ভূপতি ভাদুড়ী বলে উঠলো—কেন? সুধন্য এ বাড়ির কে? সে এখানে ঢুকলো কার অনুমতি নিয়ে? কে তাকে ঢুকতে দিয়েছে?

ধনঞ্জয় বললে—আজ্ঞে, তা তো জানি না—

ভূপতি ভাদুড়ী আরো রেগে গেল।

বললে—জানি না মানে? এ আমার বাড়ি, না সুধন্যর বাড়ি? আমার অনুমতি না নিয়ে সে এ বাড়িতে ঢোকে কোন্ সাহসে? কোথায় গেল সে?

ধনঞ্জয় বললে—ওপরে আছেন—

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—চল তো দেখি, আমি তার এ-বাড়িতে ঢোকা ঘুচিয়ে দিচ্ছি—

বলে নিজেই তর তর করে ওপরে উঠতে লাগলো। পেছনে চলতে লাগলো ধনঞ্জয়।

ওপরে গিয়ে সামনেই একেবারে বুড়োবাবুর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা। প্রথমটায় ভূপতি ভাদুড়ী চিনতে পারেনি। বেশ ফর্সা আর পরিষ্কার পাঞ্জাবি পরেছে, নতুন শান্তিপুরে ধুতি পরনে। দাড়ি কামানো। বেশ ভব্যিযুক্ত চেহারা।

—কী, বুড়োবাবু, তুমি এখানে?

—আমি…

বুড়োবাবু কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারলে না। চোখ দুটো ছল ছল করে উঠলো।

ভূপতি ভাদুড়ী আবার ধমক দিয়ে উঠলো—তোমাকে এখানে কে আসতে বলেছে? কেন তুমি এখানে এলে? কার হুকুমে?

বুড়োবাবু আমতা-আমতা করে বললে—সুধন্য আমাকে নিয়ে এল—

ভূপতি ভাদুড়ী বলে উঠলো—কোথায় সুধন্য? তোমার ভাইপো?

এতক্ষণে বোধহয় সুধন্য টের পেয়ে গিয়েছিল। সেও তখন হৈ-চৈ শুনে এসে হাজির হলো।

বললে—কিছু বলছেন?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—তুমি যে হঠাৎ এখানে এসেছ মালপত্তোর নিয়ে? কে তোমাকে আসতে বললে এখানে? কার হুকুমে তুমি এলে? বুড়োবাবুকে কে নিয়ে এল, তুমি?

সুধন্য বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ, যার বাড়ি, যার সম্পত্তি তার কি বাইরের উঠোনে

পড়ে থাকা সাজে? না ভালো দেখায়? লোকেই বা বলবে কী? এত টাকার সম্পত্তি থাকতে বুড়ো মানুষ ওই উঠোনে পড়ে থাকবে?

ভূপতি ভাদুড়ী যেন আকাশ থেকে পড়লো।

বললে—এ সম্পত্তি কার বললে?

—আজ্ঞে বুড়োবাবুর।

ভূপতি ভাদুড়ী আবার জিজ্ঞেস করলে—তার মানে?

সুধন্য বললে—আজ্ঞে, কাকীমা মারা যাবার পর সব সম্পত্তি তো কাকাবাবুরই প্রাপ্য। তাই কাকাবাবুকে ওপরে নিয়ে এলুম—

ভূপতি ভাদুড়ী চিৎকার করে উঠলো—কী বললে? এ তোমার কাকাবাবুর সম্পত্তি? এ তোমার কাকাবাবুর বাড়ি?

সুধন্য বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি যা বলেছি ঠিকই বলেছি—

ভূপতি ভাদুড়ী চিৎকার করে উঠলো। বললে—বেরিয়ে যাও আমার বাড়ি থেকে, বেরিয়ে যাও বলছি। যদি বেরিয়ে না যাও তো এখুনি পুলিশ ডাকবো, বেরিয়ে যাও—

সুধন্য হাসতে লাগলো। ভূপতি ভাদুড়ীর কথায় এতটুকু ভয় পেলে না।

বললে—নিজের বাড়ি থেকে কেউ বেরিয়ে যায় ম্যানেজার? এ আমার কাকাবাবুর বাড়ি, আমি এখানে থাকবো বলেই সপরিবারে এসে উঠেছি। বেরিয়ে যেতে হয় আপনি বেরিয়ে যান—

—তাহলে বাহাদুর সিংকে ডাকবো?

সুধন্য বললে—সে আপনার খুশী। তবে এ মাস থেকে আর রাখছি না আপনাকে, আপনাকে বরখাস্ত করে দিলুম আজ থেকে। ভালোয় ভালোয় যদি এখন বেরিয়ে যান তো কিছু বলবো না, নইলে আমিও পুলিশ ডাকবো—

ভূপতি ভাদুড়ী বললে- তুমি জানো, মা-মণি সব সম্পত্তি উইল করে দিয়ে গেছে আমার ভাগ্নেকে?

সুধন্য বললে—সে আমি রেজিষ্ট্রী অফিসে গিয়ে সব খবর নিয়েছি। আর তাছাড়া আপনার ভাগ্নে তো এখন খুনের আসামী! যদি পারেন তো আমাদের উঠিয়ে দিন, দেখি আপনার কত ক্ষমতা—

হঠাৎ হৈ-চৈ শুনে সুখদাও ওদিক থেকে এসে হাজির। তার পেছনে কালীকান্ত। সেও এতক্ষণ সুধন্যর কান্ডকারখানা সব দেখছিল। এখন নতুন কোনও আশ্রয়ের ভরসায় একেবারে কাছে এসে দাঁড়ালো।

সুধন্য সুখদার দিকে চেয়ে বললে—কই, এখনও তুমি যাওনি? এখনও এ বাড়িতে রয়েছ? শিগগির যাও, আমরা কাউকে আর এখানে রাখবো না, যাও—চলে যাও সবাই—

সে এক তুমুল কান্ড বেধে গেল তখন। মাত্র ক'দিন কেটেছে মা-মণির মৃত্যুর পর। মৃত্যুর শোকের ছায়া তখনও বাড়ি থেকে যেন ভালো করে মোছেনি। বাড়ির প্রত্যেকটা ইঁট যেন তখনও ভুলতে পারেনি মা-মণির ব্যর্থ জীবনের স্মৃতিটুকু। সেই তখনই সম্পত্তি নিয়ে এক তুমুল লাঠালাঠি বেধে গেল ভাগীদারদের মধ্যে। অথচ কে যে আসল উত্তরাধিকারী তারই ঠিক নেই!

কালীকান্ত এবার আর থাকতে পারলে না। ভূপতি ভাদুড়ী আর সুধন্যর মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালো। বললে—দেখুন, আপনারা মিছিমিছি ঝগড়া করছেন, শেষকালে পুলিশ ডেকে আনলে মুশকিলে পড়বেন আপনারা, এ বাড়ি আমার বউ-এর—

—তোমার বউ? তোমার বউ এ বাড়ির মালিক? মাতাল কোথাকার! বউ-এর সম্পত্তি নিয়ে মদ খাবার মতলব করেছ? বেরোও এখান থেকে—বেরোও—

সুধন্য ঘুষি পাকিয়ে এগিয়ে এল কালীকান্তর দিকে। কালীকান্তও তৈরী ছিল। সেও দু'পা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালো—আমাকে মারবি শালা তুই? আয়, মার দিকিনি, কেমন মারতে পারিস, দেখি তোর গায়ে কত জোর?

সুধন্য সত্যিই কালীকান্তকে মারতে হাত তুলেছিল, কিন্তু ভূপতি ভাদুড়ী তার আগেই বাধা দিলে। সুধন্যকে এক হাতে ধরে টেনে রাখলে। বললে—তুমি গায়ে হাত দেবার কে হে শুনি? আর বাড়ি আমার, তাড়াতে হলে আমি ওকে তাড়াবো, তুমি কোথাকার কে?

তারপর কালীকান্তর দিকে চেয়ে বললে—তুমিও বেরিয়ে যাও আমার বাড়ি থেকে, এখুনি বেরিয়ে যাও—

কালীকান্ত বললে—বেরোতে হলে তুমি বেরোবে, আমি বেরোব কেন? এ আমার বউ-এর বাড়ি—

সুধন্য বললে—খবরদার, বাড়ি কারো নয়, বাড়ি আমার কাকাবাবুর, কাকাবাবু যদ্দিন বেঁচে থাকবে, তদ্দিন আমার হক্ আছে এ বাড়ির ওপর, কাকাবাবু মারা গেলে তখন এ বাড়ি আমার হয়ে যাবে।

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—তোমার কাকাবাবুর মানে? তোমার কাকাবাবুর বাড়ি হতে যাবে কীসের জন্যে?

সুধন্য বললে—মা-মণির সঙ্গে কাকাবাবুর তো বিয়ে হয়েছিল। মা-মণি তো আমার কাকীমা। কাকীমার বাড়িতে কাকাবাবু থাকবে না তো কে থাকবে? আপনি থাকবেন?

ভূপতি ভাদুড়ী বলে উঠলো—সে সব পুরোন কাসুন্দি ঘেঁটে আর লাভ নেই। যখন বিয়ে হয়েছিল, তখন হয়েছিল। তোমার কাকাবাবুর সঙ্গে মা-মণি ক'দিন ঘর করেছিল শুনি? ফুলশয্যার রাত্তিরে মা-মণি তোমার কাকাবাবুর সঙ্গে কি সত্যিই রাতটা কাটিয়েছিল যে, তুমি আজ সেই সব পুরোন কাসুন্দি ঘাঁটতে এসেছ?

সুধন্য বললে—রাত কাটিয়েছে কি কাটায়নি সে কথা আলাদা, কিন্তু অগ্নি সাক্ষী রেখে বিয়ে তো হয়েছিল।

—সে বিয়ে বিয়েই নয়। বিয়ে হলে মা-মণি সিঁথিতে সিঁদুর দিত, তা জানো?

সুধন্য বললে—ওসব বললে শুনবো না। হাজার হাজার লোক নেমন্তন্ন খেয়ে গেছে সে বিয়েতে। আমিও ছোটবেলায়, বেশ মনে আছে, এই বাড়ির ছাতে পাতা পেতে খেয়েছি। তারপর মা-মণি বরের সঙ্গে শোভাবাজারে আমাদের বাড়িতে গেছে 'কনে' হয়ে। সেখানে নতুন বউ-এর সঙ্গে ওই বাদামী ঝি গেছে। বৌভাত হয়েছে। সেই শোভাবাজারের দত্ত বাড়িতে কলকাতার সমস্ত বড় বড় লোকদের বাড়ির লোকরা এসে নেমন্তন্ন খেয়েছে, তারপরের দিন হয়েছে ফুলশয্যা—

ভূপতি ভাদুড়ী চেঁচিয়ে উঠে মাঝপথে বাধা দিলে।

বললে—না, ফুলশয্যা হয়নি—

সুধন্য আরো জোরে চিৎকার করে বলে উঠলো—আলবাৎ ফুলশয্যা হয়েছে। আর বিয়েতে তো ফুলশয্যাটা বড় কথা নয়। বিয়ের সম্প্রদান যখন হয়ে গেছে, তখনই বিয়ে হয়ে গেছে। ফুলশয্যা হলো কি হলো না তাতে কী এসে গেল?

—আচ্ছা, তাহলে আমি ডাকছি বাদামীকে—

মা-মণির ফাঁকা ঘরখানার এক কোণে চুপচাপ শুয়ে শুয়ে বাদামী তখন কাঁদছিল। তার যেন কান্না আর শেষই হয় না। মা-মণিকে সে একদিন শ্বশুর-বাড়িতে নিয়ে গেছে। সেই প্রথম মা-মণির শ্বশুরবাড়ি যাওয়া। সে যে কত আনন্দের, কত রোমাঞ্চের তা এখন বাদামী ছাড়া আর কেউই জানে না।

—বাদামী, অ-বাদামী!

বাদামী হুড়মুড় করে উঠে বসলো। চারদিকে চেয়ে যেন বাস্তব অবস্থাটা বুঝতে পারলে খানিকটা।

বললে—আমাকে ডাকছো নাকি?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—হ্যাঁ, আমি ডাকছি, তুমি একবার বাইরে এসো তো। বাইরে এসো। এরা আজ সবাই বলছে যে, মা-মণির নাকি ফুলশয্যা হয়েছিল। তুমি একবার এসে ওদের সব ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলে যাও তো—

বাদামীর আর সেই আগেকার মতন গতর নেই। বসতে যেমন সময় লাগে, উঠতেও তেমনি সময় লাগে। কোনও রকমে গায়ের থানটা সামলে উঠে দাঁড়ালো।

বললে—কোথায় যাবো?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—এসো, বাইরে এসো, বাইরে সবাই দাঁড়িয়ে আছে তোমার কথা শোনবার জন্যে। তুমি তো বিয়ের পর মা-মণির সঙ্গে শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিলে? যাওনি?

বাদামী যেন সমস্ত জিনিসটা মনে করবার চেষ্টা করলে।

বললে—হ্যাঁ, গিয়েছিলুম—

—বৌভাতের দিন তো তুমি শোভাবাজারেই ছিলে?

বাদামী বললে—হ্যাঁ, তা তো ছিলুম ম্যানেজারবাবু—

—বৌভাতের দিন রাত্রে যখন ফুলশয্যার ব্যাপার এল, তখনও তো তুমি ছিলে?

—হ্যাঁ, ছিলুম বটে।

—তখনকার কথা তোমার তো সব মনে আছে?

বাদামী বললে—হ্যাঁ, কিছু কিছু মনে আছে—

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—তাহলে তুমি বাইরে এসো। এসে ওই বেটাদের বুঝিয়ে বলো। তোমার কিচ্ছু ভয় নেই, আমি রয়েছি। তোমার কীসের ভয়!

বাদামী বললে—আমি কী বলবো বুঝতে পারছি না বাবা—

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—তুমি যা জানো তাই-ই বলবে, তুমি বলবে ফুলশয্যে হয়নি। ফুলশয্যে না হলে কি বিয়ে পাকা হয়? এসো এসো, বাইরে এসো—

ভূপতি ভাদুড়ী বাদামীকে দু'হাতে ধরে আস্তে আস্তে বাইরে নিয়ে আসতে চেষ্টা করলে।

কিন্তু ততক্ষণে কালীকান্ত আর সুধন্যতে হাতাহাতি শুরু হয়ে গিয়েছে।

সুধন্য তখন 'তুমি' থেকে 'তুই'-তে নেমেছে। চিৎকার করে বলছে—আমার কাকাবাবুর বাড়িতে তুই কেন ঢুকেছিস? তুই কে?

কালীকান্তও রুখে দাঁড়িয়েছে। বললে—খবরদার বলছি, মুখ সামলে কথা বলবি, আমার বউ-এর সম্পত্তি আমার ভোগ করবার হক আছে।

সুধন্য বললে—হ্যাঁ, বউ না কচু! দুর্গাচরণ মিত্তির স্ট্রীটের বেশ্যা আবার সতী-সাধ্বী হলো সম্পত্তির লোভে!

কালীকান্ত বললে—খবরদার বলছি, বউ তুলে কথা বলিসনি—

সুধন্য বললে—বউ তুলে কথা বলবো না তো কি বাপ তুলে কথা বলবো?

—তবে রে হারামজাদা!

বলে কালীকান্ত একেবারে সুধন্যর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। আর সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে একগাদা মেয়েছেলে কাঁদতে কাঁদতে এসে হাজির হলো—ওমা গো, মেরে ফেললে গো, মেরে ফেললে—

সুখদা এতক্ষণ চুপ করে ছিল। এবার সে এগিয়ে এল। বললে—বেশ করেছে মেরেছে, মারবে না? আমার বাড়ি আমি কেন ছেড়ে যাবো শুনি? যেতে হয় তোমরা ছেড়ে যাও। তোমরা কেন ঢুকেছ এ বাড়িতে?

একজন কম বয়েসী মেয়েমানুষ চিৎকার করে উঠলো—কেন বাড়ি ছাড়বো শুনি? কীসের তরে এ বাড়ি ছাড়তে যাবো? আমার খুড়-শ্বশুরের বাড়ি, আমি হাজারবার এখানে থাকবো? তোমরা এ বাড়ির কে যে, এই বাড়ি আঁকড়ে পড়ে আছ? তোমরা এখান থেকে চলে যাও না বাছা—কে তোমাদের আটকে ধরে রেখেছে?

সুখদাও কম নয়। বললে—ওমা, কথা শোন! বাড়ি আমার নয় তো কি তোমার? তোমার সাত-কুলের খুড়-শ্বশুরের? অত যদি খুড়-শ্বশুরের বাড়ি তো এতদিন কোথায় ছিলে শুনি? কোন্ চুলোয় ছিলে? তখন খুড়-শ্বশুর খেতে পাচ্ছে কি উপোষ করছে তার খোঁজ নিতে তো তোমরা কেউ আসনি বাছা? এখন মা-মণি মারা যাবার পর খুড়-শ্বশুরের জন্যে দরদ একেবারে উথলে উঠলো দেখছি—

পাশের ঘর থেকে বুড়োবাবুর ক্লান্ত গলার শব্দ শোনা গেল। বললে—ও সুধন্য, সুধন্য, কেন ঝগড়া করছিস বাবা তুই? আমার দরকার নেই বাড়ি নিয়ে, আমি যেখানে ছিলুম, সেখানেই আমাকে রেখে দিয়ে আয়—দরকার নেই আমার বাড়িতে। এর চেয়ে আমার সেই-ই ভালো ছিল—

সুধন্য হাঁপাতে হাঁপাতে বুড়োবাবুর উদ্দেশে বললে—তুমি থামো তো, তুমি আর বকবক কোর না। তোমার জন্যেই তো যত গণ্ডগোল। তুমি যদি শক্ত হতে তো আজ তোমার এই হেনস্থা হয়?

বুড়োবাবু বললে—যা বুঝিস তোরা কর বাবা, শেষকালে পুলিশ-কাছারি না করতে হয়, বুড়ো বয়সে ওসব আর পারবো না—

সুধন্য বলে উঠলো—সম্পত্তি রাখতে গেলে পুলিশ-কাছারির ভয় করলে চলবে কেন বলো দিকিনি! দরকার হলে পুলিশ ডাকবো, মামলা করবো, যা কিছু করতে হয় তাই-ই করবো, কার বাবার কী?

ভূপতি ভাদুড়ী তখন বাদামীকে ধরে ধরে নিয়ে এসেছে। বললে—শোন, এই এর মুখ থেকে শোন সবাই, এই বাদামীই মা-মণির সঙ্গে শোভাবাজারের বাড়িতে গিয়েছিল, এর মুখ থেকেই শোন তোমরা সব—

কালীকান্ত বললে—তা বিয়ে হোক আর না হোক, বুড়োবাবুর সঙ্গে মা-মণির কোনও সম্পর্কই ছিল না। মা-মণির সঙ্গে বুড়োবাবুকে একদিনও কেউ শুতে দেখেছে?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—তবে?

সুধন্যর তখন মারমূর্তি। বললে—দেখ, ওসব বাজে কথায় আমার কান দেবার সময় নেই। তোমরা বেরিয়ে যাও আমাদের বাড়ি থেকে, নইলে পুলিশ ডাকবো বলে দিচ্ছি—

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—আবার পুলিশ দেখাচ্ছে! খবরদার বলছি, পুলিশ আমরাও ডাকতে পারি, আমরাও পুলিশ ডেকে তোমাদের এ্যারেষ্ট করিয়ে দিতে

পারি—

সুধন্য বলে উঠলো—অত যদি মুরোদ থাকে তো তাই এ্যারেষ্ট করাও না, মুখে অত ফড়ফড় করছো কেন? দেখি না কত ক্ষমতা পঞ্চাশ টাকার ম্যানেজারের—

—কী, এতবড় আস্পর্ধা? আমার সঙ্গে ইয়ার্কি হচ্ছে?

সুধন্য ক্ষেপে গেল। বলে উঠলো—ইয়ার্কি? আমি ইয়ার্কি'র কথা বললাম? চাকরের সঙ্গে কেউ ইয়ার্কি করে—চাকর ইয়ার্কি'র পাত্র?

—কী, আমাকে চাকব বলা? তবে রে শালা?

বলে ভূপতি ভাদুড়ী ঝাঁপিয়ে পড়লো সুধন্যর ওপর। সুধন্য জোয়ান ছেলে। সে বুড়ো মানুষের ভয় করে না। সে কায়দা করে ভূপতি ভাদুড়ীর গলাটা টিপে ধরেছে। বুড়ো মানুষের গলা। সুধন্যর টিপুনিতে ভূপতি ভাদুড়ীর দম আটকে আসে আর কি! সে যন্ত্রণায় গোঁ গোঁ শব্দ করতে লাগলো।

তরলা চিৎকার করে উঠলো—ও গো, ম্যানেজারবাবুকে মেরে ফেললে গো—

বাড়িতে অন্য যারা মেয়েমানুষ ছিল, তখন ভয়ে চিৎকার করতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু সুধন্য ছাড়বার পাত্র নয়। সে তখন ভূপতি ভাদুড়ীর বুকেব ওপর চেপে বসে হুঙ্কার ছাড়ছে—আর করবি শালা, আব কখনও মাবতে আসবি?

ভূপতি ভাদুড়ীর গলা দিয়ে তখন ভালো করে আওয়াজ বেরোচ্ছে না। অস্পষ্ট গলায় শুধু বলতে লাগলো—আমাকে মেরে ফেললে রে বাবা, আমাকে মেরে ফেললে—

বুড়োবাবুও পাশের ঘর থেকে অসহায়ের মত চিৎকার করতে লাগলো—ওরে সুধন্য, আমার বাড়ির দরকার নেই বে, আমি যেখানে ছিলুম, সেখানেই আমায় রেখে দিয়ে আয় বাবা, আমি এত আরাম সহ্য করতে পারবো না বে, কেন এত হুজ্জুতী করতে গেলি বাবা, শেষকালে আমার জন্যে তুই যে মানুষ খুনের দায়ে পড়বি রে—

কিন্তু কালীকান্তর বুদ্ধি আছে। সে যে কখন এক ফাঁকে বাইরে চলে গিয়েছিল তা কেউ খেয়াল করেনি। একেবারে সোজা থানায় গিয়ে পুলিশ ডেকে নিয়ে এসেছে—

পুলিশ দেখেই সুধন্য চমকে গেছে। ভূপতি ভাদুড়ীব বুকের ওপর থেকে নেমে দাঁড়ালো। মেয়েমানুষরা যে যেখানে ছিল সব ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজায় খিল লাগিয়ে দিলে।

থানার ছোটবাবু জিজ্ঞেস করলে—এ কে?

কালীকান্ত বললে—আজ্ঞে, এই হচ্ছে সুধন্য দত্ত। দেশ থেকে মাগ-ছেলে-মেয়ে নিয়ে এসে হুট করে ঢুকে পড়েছে বাড়িতে। বলছে, এটা ওর বাড়ি—

—আর এই বুড়ো লোকটা কে?

—আজ্ঞে হুজুর, এ ছিল এ বাড়ির ম্যানেজার। এখন বাড়ির মালিক যেই মারা গেছে ওমনি দখলদার হয়ে পড়েছে। এও বলছে এটা ওর বাড়ি।

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—আজ্ঞে হুজুর, মা-মণি এ বাড়ি আমার ভাগ্নেকে উইল করে দিয়ে গেছে, আমি তার মামা—

কালীকান্ত বললে—না হুজুর, সব মিথ্যে কথা, উইল করে যায়নি, আমার বউ এ বাড়ির মালিকের নাতনী। আমার বউই এ বাড়িব আসল মালিক।

ভূপতি ভাদুড়ী বলে উঠলো—না ছোটবাবু, আমার ভাগ্নেই আসল মালিক—

সুধন্য বললে—না হুজুর, ওর কথা বিশ্বাস করবেন না, ওর ভাগ্নে খুনের

আসামী, খুনের আসামীকে কে বিশ্বাস করবে? কার এমন ভীমরতি ধরেছে যে বখাটে বদমাইশকে নিজের সম্পত্তি দিতে যাবে! বিশেষ করে যখন নিজের স্বামী বেঁচে রয়েছে?

—মালিকের স্বামী কোথায়?

সুধন্য উৎসাহিত হয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠলো—আজ্ঞে, এই যে ওই ঘরে রয়েছেন, আসুন, দয়া করে একবার দেখবেন আসুন—

বলে প্রায় টানতে টানতে পাশের ঘরে নিয়ে গেল ছোটবাবুকে।

বুড়োবাবু তখন একটা দামী ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে শুয়ে আছে। আজ তার গায়ে ভালো সিল্কের পাঞ্জাবি উঠেছে। পরনে দিশী কালোপাড় ধুতি। সুধন্য বাজার থেকে কাকাবাবুর জন্যে ভালো ভালো জামা-কাপড় কিনে এনে তাকে পরিয়ে দিয়েছে। যে ইজিচেয়ারে বসে একদিন শিবশম্ভু চৌধুরী আরাম করেছেন, যে ইজিচেয়ারে বসে একদিন মা-মণিও কত সকাল-বিকেল-সন্ধ্যে কাটিয়েছেন, বুড়োবাবুকে এত বছর পরে সুধন্য সেই চেয়ারেই বসিয়ে রেখেছে।

—এই ইনিই হচ্ছেন আমার কাকাবাবু স্যার, এই বাড়ির মালিক মা-মণির স্বামী—

তারপর বুড়োবাবুর দিকে চেয়ে সুধন্য বললে—কাকাবাবু, থানা থেকে ছোট দারোগাবাবু এসেছেন—

বুড়োবাবু ভয় পেয়ে গেল। বললে—আবার থানা-পুলিশ করলি কেন বাবা? আমি তো বলেইছি আমার এ-সম্পত্তিতে কাজ নেই, আমি যেমন ছিলুম আমাকে তেমনি করেই থাকতে দে বাবা। আমার এ জামা-কাপড়ের দরকার নেই, আমার সেই ছেঁড়া গামছাই ভালো—

কালীকান্ত এতক্ষণ দাঁড়িয়ে শুনছিল। বলে উঠলো—সব বাজে কথা ছোট-বাবু—এই সুধন্যই যত নষ্টের গোড়া, আপনি তো নিজের চোখেই দেখলেন, আর এই ম্যানেজার। দু'জনে মারামারি করে জোরজবরদস্তিতে আমার বউ-এর বাড়িতে ঢুকে পড়েছে—

—আপনার বউ? কোথায় তিনি?

কালীকান্ত ডেকে উঠলো—ওগো, কোথায় তুমি? এদিকে এসো—

সুখদা পেছনে দাঁড়িয়েই সব শুনছিল। ঘোমটা দিয়ে সামনে এগিয়ে এল। ছোট দারোগা তার আপাদমস্তক ভালো করে দেখে বললে—আপনি এই কালীকান্তবাবুর স্ত্রী?

—হ্যাঁ।

—আপনি এ বাড়ির মালিকের কে হন?

সুখদা বললে—নাতনী।

মুখটার দিকে ভালো করে চাইতেই ছোট দারোগাবাবুর কেমন যেন সন্দেহ হলো। আবার ভালো করে দেখতে লাগলেন। বললেন—আপনাকে আগে কোথায় দেখেছি বলুন তো?

সুখদা কোনও উত্তর দিলে না।

কালীকান্ত বললে—ওকে আর কোথায় দেখবেন হুজুর, উনি তো আমার বউ, বাড়ির মধ্যেই থাকেন—

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—আজ্ঞে, ওকে আপনি আগে দেখেছেন, ওকে আপনি চুরির অপরাধে থানায় ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন—

—না, আরও অন্য কোথাও দেখেছি।

—তাহলে স্যার, দুর্গাচরণ মিত্তির স্ট্রীটে বেশ্যা-বাড়িতে দেখেছেন। ও কালীকান্তের বউ নয় হুজুর, ও বেশ্যা, বেশ্যাকে বউ সাজিয়ে নিয়ে এসেছে—

ছোট দারোগাবাবু যেন খানিকক্ষণ কী ভাবলো। বড় জটিল কেস। তারপর বললে—আপনাদের সবাইকে থানায় যেতে হবে, আমার সঙ্গে থানায় চলুন।

ভূপতি ভাদুড়ী কেঁদে উঠলো—হুজুর, আমি কী করলুম?

সুধন্যও বলে উঠলো—হুজুর, আমার কী দোষ? এ যে আমার কাকা-বাবুর বাড়ি—

কালীকান্তও প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল আর সকলের মত। কিন্তু ছোট দারোগাবাবুর ধমকানিতে থতমত খেয়ে গেল।

দারোগাবাবু বললে—চলুন থানায় সব। কোর্টে সকলকে চালান করে দেবো, সেখানে জজসাহেব এর যা-হোক বিহিত করবেন—করুন, শিগ্‌গির করুন—

কথাটা শুনে মেয়ে-মহলে কান্নার রোল উঠলো। সুখদাও কান্নায় ভেঙে পড়লো ছোট দারোগাবাবুর সামনে।

দারোগাবাবু এক ধমক দিতেই সবাই চুপ করে গেল। তারপর সঙ্গের কনস্টেবলদের দিকে চেয়ে বললে—মিশির, লে চলো—

তখন আর কারো মুখে কোনও কথা নেই। ভূপতি ভাদুড়ী, কালীকান্ত, সুধন্য সবাই সবাইকার দিকে মুখ-চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলো।

—চলুন, চলুন, দেখছেন কী হাঁ করে? চলুন!

সুখদা যাচ্ছিল না। ছোট দারোগাবাবু তার দিকে চেয়ে বললে—কী দেখছেন, আপনিও চলুন—

সুখদা হঠাৎ ছোট দারোগাবাবুর দু'পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। বললে—আমার কোনও দোষ নেই দারোগাবাবু, আমাকে আপনি ছেড়ে দিন—

ছোট দারোগাবাবু সে কথায় কান না দিয়ে বললো—মিশির, এই মাগীটার হাতে হাতকড়া লাগিয়ে দাও তো—

সুখদা ভয় পেয়ে ছোট দারোগাবাবুর পা ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। তারপর সুড় সুড় করে চলতে লাগলো সকলের পেছন পেছন। সিঁড়ি দিয়ে নেমে উঠোন। উঠোন পেরিয়ে গেট। গেট পেরিয়ে মাধব কুণ্ডু লেন। এতদিনের চৌধুরী বংশের শেষ বংশধরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই যেন সমস্ত পাপ, সমস্ত পুণ্য একসঙ্গে এ বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে চলল। পেছনে অবাক হয়ে সে দৃশ্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো শুধু বেতনভুক ক'জন মানুষ—বাহাদুর সিং, ধনঞ্জয়, দুখমোচন, অর্জুন, তরলা, বাদামী। আর দেখতে লাগলো চৌধুরী বংশের অদৃশ্য ভাগ্যদেবতা।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হলো। সন্ধ্যে গড়িয়ে রাত। সমস্ত বাড়ি তখন নিঃঝুম। একটা চাপা অশ্রুত কান্নার রেশ যেন সমস্ত বাড়িটাকে আচ্ছন্ন করে রাখলে। একজনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বুঝি ইতিহাস এমন করে আর কখনও স্তব্ধ হয়নি আগে।

বাহাদুর সিং রোজকার নিয়মমত তখনও বোবার মত গেটে পাহারা দিচ্ছিল। হঠাৎ কার পায়ের আওয়াজে যেন চমক ভাঙলো। যন্ত্রের মত বলে উঠলো—

কোন্?

—আমি ভাগ্নেবাবু, বাহাদুর।

ভাগ্নেবাবুকে দেখে বাহাদুর সিং সেলাম করলে। কিন্তু ভাগ্নেবাবুর দৃষ্টি বাড়ির ভেতরের দিকে পড়তেই কেমন থমকে গেল। উঠোনে আলো জ্বলছে না কেন? কোথায় গেল সবাই! উঠোনের ভেতরে ঢুকে কেমন সন্দেহ হলো। কিছু বিপদ হয়নি তো! কিছু বিপর্যয়!

আস্তে আস্তে সামনে এসে দাঁড়ালো অর্জুন, দুখমোচন, ধনঞ্জয় সবাই। ভাগ্নেবাবুর একমুখ দাড়ি। এই ক'দিনেই কেমন রোগা হয়ে গেছে চেহারাটা। যেন ফাঁসিকাঠ থেকে কেউ শরীরটাকে তুলে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

ধনঞ্জয় হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো। বললে—ভাগ্নেবাবু, আপনি যে বেঁচে ফিরবেন এ আমরা ভাবতেও পারিনি—আর দু'দিন আগে এলে মা-মণিকে দেখতে পেতেন—

—মা-মণি নেই?

—না ভাগ্নেবাবু। বলে আবার হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলো।

সুরেন জিজ্ঞেস করলে—আমার মামা? মামা কোথায়?

—ম্যানেজারবাবুকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে ভাগ্নেবাবু। এ-মাসে আমরা কেমন করে মাইনে পাবো তা জানিনে। ম্যানেজারবাবু, জামাইবাবু, সুধন্যবাবু, সুখদা দিদিমণি, সবাইকে পুলিশ থানায় ধরে নিয়ে গেছে।

—কেন?

ধনঞ্জয় বললে—সবাই মারামারি করছিল যে। সবাই বলছিল বাড়ি আমার।

—তাহলে বুড়োবাবু? বুড়োবাবু আছেন তো?

ধনঞ্জয় বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ—

—কোথায় তিনি?

—আজ্ঞে তেতলায় মা-মণির আরাম-কেদারায় শুয়ে আছেন।

—তা ওখানে কেন?

—আজ্ঞে উনিই তো মা-মণির সোয়ামী। আমরা তো এসব কথা কিছুই জানতুম না এতকাল। আজকে শুনলুম। মা-মণি মাথায় সিঁদুর পরতো না দেখে আমরা ভাবতুম বুঝি মা-মণি বিধবা! এই একটু আগেই বুড়োবাবু আপনার কথা জিজ্ঞেস করছিলেন।

—তিনি কি একলা আছেন?

ধনঞ্জয় বললে—আজ্ঞে না, সুধন্যবাবুর বউ, ছেলেমেয়ে, বিধবা বোন সকলকে নিয়ে ওপরে তুলেছেন। কার বাড়ি, কে ভোগ করে তাই দেখুন!

সুরেন কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে কী যেন আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলো। তারপর পেছন ফিরে গেটের দিকে চলতে লাগলো।

ধনঞ্জয় বললে—ওপরে যাবেন না ভাগ্নেবাবু?

সুরেন বললে—না—

তারপর আর দাঁড়ালো না। সোজা গেট পেরিয়ে মাধব কুণ্ডু লেনে গিয়ে পড়লো। তারপর ট্রাম-রাস্তা। তারপর কলকাতা। সমস্ত কলকাতা যেন তাকে গ্রাস করতে এলো। একদিন তার যাত্রা শুরু হয়েছিল বাঙলাদেশের কোন্ এক অখ্যাত গ্রাম থেকে। তারপর সহর। সহর কলকাতা মানেই ইতিহাসের একটা পরিচ্ছেদের ভগ্নাংশ। মানুষের কুৎসা, কলহ, ভালোবাসা, ঘৃণা, সংগ্রাম, দলাদলি সব কিছু নিয়েই তো কলকাতা সহর। সেই কলকাতা সহরের পঙ্কিল আব-

হাওয়ার মধ্যেই অগনিত মানুষের মতই সুরেন ধোঁয়া আর অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল। স্বার্থ আর দলাদলির ধোঁয়া, ঘৃণা আর হিংসার অন্ধকার। যা নিয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে এ শহরের মানুষ বেঁচে আছে, সেই ধোঁয়া আর অন্ধকার থেকেই মুক্তি পাবার জন্যে সুরেন লম্বা লম্বা পা ফেলে অনির্দিষ্টের দিকে এগিয়ে চলতে লাগলো। পেছনে পড়ে রইল একদল মানুষের কলহ-ক্লান্ত চিৎকার, পেছনে মিলিয়ে যাক একদল মানুষের কাড়াকাড়ি করে বেঁচে থাকার কুৎসিত আকাঙ্ক্ষা। সুরেন তখনও এগিয়ে চলতে লাগলো। এগিয়ে চলতে লাগলো সামনের দিকে।

এমনি করে শেষ হয়ে গেল একটা বাড়ির ইতিহাস, একটা বংশের ইতিহাস—যে বংশের সম্পত্তি নিয়ে এত রোমাঞ্চ, এত ষড়যন্ত্র আর এত বিয়োগান্ত ঘটনা। কিন্তু তবু সব শেষ হয়েও যেন কিছু শেষ হলো না। একটা যুগের সমস্ত যন্ত্রণা যেন পরের যুগে আরো ভয়াবহ হয়ে হাজার গুণ হয়ে উঠলো।

কবে একদিন কলকাতার পত্তন হয়েছিল। দুশো কি আড়াইশো বছর আগেকার সেইসব মানুষরা কল্পনাও করতে পারেনি যে একদিন এই সহরের আধিপত্য নিয়ে এমনি করে পার্টিতে পার্টিতে লাঠালাঠি বাধবে। তারা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি যে এখানকার এক-একখানা বাড়ির এক-একখানা ইঁট নিয়েই একদিন জ্ঞাতিগুষ্ঠির মধ্যে মামলা-মোকদ্দমা-মনোমালিন্য শুরু হয়ে যাবে।

এ এক বিচিত্র সহর, এ এক বিচিত্র দেশ, এ এক বিচিত্র যুগ!

এই সহর, এই দেশ, আর এই যুগের কথা লিখতে গিয়েই সাত কাণ্ড রামায়ণ হয়ে গেল। আরো কত হাজার কাণ্ড এ নিয়ে লেখা যায় তা কে বলতে পারে! তারপরে কত জল বয়ে গেল হাওড়ার ব্রিজের তলা দিয়ে কে তার হিসেব রাখে! সেই পুরোন হাওড়ার ব্রিজও আবার নতুন করে তৈরি হলো। আরো কত পার্টি তৈরি হলো। কত দেবেশ গজালো, কত পূর্ণবাবু গজালো, কত পুণ্যশ্লোকবাবুর অন্তর্ধান হলো। সেই পুণ্যশ্লোক রায়ের রাইটার্স বিল্ডিংএর ভেতরেই কত কী বদল হলো। টুলুদের সেই ঢাকুরিয়া, বৌবাজারের দেবেশদের সেই অফিস, সুকীয়া স্ট্রীটে সুব্রতদের সেই বাড়ি। বদল কি কম হয়েছে কোনও জিনিসের? মানুষের মনও আমূল বদলে গিয়েছে এই ক'বছরে।

সেদিন সেই ভোটের সময় পূর্ণবাবুও পার্কের মীটিংএ গিয়ে হাজার হাজার লোকের ভিড়ের সামনে বলেছিল—আমাদের পার্টিকে আপনারা ভোট দিয়ে দেখুন আমরা কী করতে পারি। আমরা এই সহরের চেহারা বদলে দেবো। আমরা রাইটার্স বিল্ডিংএর ভেতরে যে পাপ জমে আছে তা দূর করবো। কলকাতার বস্তিবাসীদের জন্যে পাকা বাড়ি তৈরি করে দেবো। চাষীরা যাতে জোতদারদের অত্যাচার থেকে মুক্তি পায় তার জন্যে ভূমি আইন সংস্কার করবো। আপনারা আমাদের লাল পতাকার তলায় এসে দাঁড়ান। আমাদের যে সরকার হবে তা হবে কৃষক-মজুর-বাস্তুহারাদের সরকার। আপনারা তার সামিল হোন—ইনক্লাব জিন্দাবাদ—

আর সেই দেবেশ?

ভোটের সময় দেবেশের দল কী অক্লান্ত পরিশ্রমই না করেছে। এত যে মীটিং, এত যে প্রচার, এত মিছিল, এত ইনক্লাব জিন্দাবাদ, কিছুতেই যেন কিছু আর হয় না। কেমন যেন সন্দেহ হয় কংগ্রেসই জিতছে। যেন পুণ্যশ্লোক-

বাবুকেই সবাই ভোট দিয়ে যাচ্ছে।

জনে জনে প্রত্যেককে বলে—আপনারা ভোট দেবার আগে একবার ভালো করে ভেবে দেখবেন কাকে ভোট দেবেন। পুণ্যশ্লোকবাবু না পূর্ণবাবুকে। মনে রাখবেন, কার মেয়ে বাপের ওপর রাগ করে বিষ খেয়ে মরেছে। মনে রাখবেন, কার জন্যে প্রজেশ সেন খুন হয়েছে। আর এদিকে মনে রাখবেন, কে দেশের কাজের জন্যে আজীবন ব্রহ্মচারী। বিয়ে করেননি, সংসার করেননি। কে দেশের লোকদেরই নিজের মা-ভাইবোন মনে করে দেশের কাজ করে যাচ্ছেন—

মানুষের বিপদ কি একটা! কলকাতার মানুষ অনেক ভুগেছে, অনেক সহ্য করেছে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর যেন রূপান্তরিত হয়ে বার বার এসেছে তাদের জীবনে; যুদ্ধ, দাঙ্গা, বোমা, কোনও কিছুই তাদের জীবনে বাদ পড়েনি। যখন ইংরেজরা চলে গেছে তখন তারা অনেক আশা করেছিল। ভেবেছিল এবার বুঝি তাদের জীবনে নতুন করে সূর্যোদয় হলো। এবার কংগ্রেস তাদের সব দুঃখ দূর করবে।

ওদিকে তখন তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট বেরিয়ে গেছে। অফিসে বাসে-ট্রামে চায়ের দোকানে সর্বত্র ওই আলোচনা।

একজন বলে—এবার আর কংগ্রেস জিততে পারবে না—এবার নির্ঘাৎ হারবে—

আর একজন বলে—ঘরের শত্রু বিভীষণ, পুণ্যশ্লোকবাবুর নিজের মেয়েই বাবার বারোটা বাজিয়ে দিয়ে গেল মশাই—

কত রকম মুখরোচক আলোচনা হয় চারদিকে, কোথাও তার কোনও রেকর্ড থাকে না বলে কেউ জানতেও পারে না সে-সব কথা। কিন্তু ইতিহাস-বিধাতার চিত্রগুপ্ত কিছুই ভোলে না। তার খতিয়ানের পাতায় তা অক্ষয় হয়ে থাকে বলেই আজও চন্দ্র-সূর্য ওঠে, আজও চন্দ্র-সূর্য ডোবে!

উপসংহার

আমি এ-সব কথা কিছুই জানতাম না। আমার অবশ্য জানবার কথাও নয়। কারণ কলকাতার সঙ্গে আমার যোগাযোগ কতটুকু? আমি বাইরে বাইরেই কাটিয়েছি সারা-জীবন। কখনও বিহার, কখনও মহারাষ্ট্র, কখনও মধ্যপ্রদেশ, আবার ক্বচিৎ কখনও বাঙলাদেশ। যখন ফিরে এসেছি, হাওড়া স্টেশনের ব্রিজটা দেখেই দেশে ফেরার আনন্দে ডগমগ হয়ে উঠেছি। তারপর ভালো করে কলকাতাটাকে দেখতে পাবার আগেই আবার বাইরে চলে যেতে হয়েছে।

ঠিক এই সময়েই একদিন গুরুদেবপুর নামে এক মফঃস্বল সহরে পরিচয় হলো এই গল্পের নায়কের সঙ্গে। এই যা কিছু ঘটনা সবই গোড়া থেকে তাঁর মুখ থেকেই শুনলাম। ভদ্রলোক গুরুদেবপুরে জুনিযাব হাই স্কুলের একজন হেড্‌মাস্টার। বড় সাত্ত্বিক প্রকৃতির মানুষ। অবিবাহিত জীবন। ছাত্র-অন্ত প্রাণ।

আমি সব ঘটনা শুনে বললাম—তারপর?

সুরেনবাবু বললেন—আমি যে সময়টায় কলকাতায় ছিলাম তখন আজকের এ সমস্যাগুলো এমন করে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠেনি। সবে তখন মানুষ অসহিষ্ণু হয়ে উঠতে আরম্ভ করেছে। আমেরিকা তখন লুকিয়ে লুকিয়ে টাকার হরির লুট শুরু করে দিয়েছে। পুণ্যশ্লোকবাবুরা তখন গদি আঁকড়ে বসে থাকবার জন্যে ভোটের সময় ডান হাতে লাখ লাখ টাকা ছড়ায়, আর অন্যদিকে বাঁ হাতে লাখ লাখ টাকা উপায় করে। সুয়েজ খালের মালিকানা নিয়ে ইংরেজ আর ফরাসী গভর্ণমেণ্ট তখন যুদ্ধ বাধিয়ে ইজিপ্টের কাছে হেরে গেছে। এমন সময় কলকাতায় এসে পৌঁছুলো রাশিয়ার ক্রুশ্চেভ। কোনও মীটিং-এ যে অত মানুষেব সমাবেশ হতে পারে তা ওর আগে কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। আর সবচেয়ে বড় ঘটনা হলো হিন্দু কোড বিল পাশ হওয়া। সেই-ই প্রথম বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনসিদ্ধ হলো। আর ভাইদের সঙ্গে বোনেরাও বাপের সম্পত্তির অধিকারী হলো সেই সাল থেকে। তাতে ফল হলো এই যে, বাঙালীর চোদ্দপুরুষের সংসারের ভিত ভেঙে গুঁড়িয়ে তচনচ হয়ে গেল। আর ওই যে মাধব কুণ্ডু লেনের অত বড় চৌধুরীবংশের বাড়ি, তার সমস্তটুকু এখন ভোগ করছে সুধন্য দত্ত। বুড়োবাবুর ভাইপো—

তারপর মনে আছে ১৯৫৭ সালের গোড়াতেই ভোট হলো। সেই ভোটের সময়েই সুরেন দেখেছিল, কেমন করে মানুষ নকল মানুষ সেজে আসলের হয়ে ভোট দিয়ে যায়। সেই-ই কি কম শিক্ষা? তাহলে আমি কাদের সঙ্গে হাত মেলাবো? পুণ্যশ্লোকবাবুর দলের সঙ্গে, না দেবেশদের পার্টির সঙ্গে? দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রীট থেকে যারা গাড়ি ভর্তি হয়ে বুথে-বুথে এসে ভোট দিয়ে গেল তারা কারা? এই বুথে যার নাম সান্ত্বনা বোস, অন্য বুথে সেই মেয়েটিই আবার সুমিত্রা রায়। এক চেহারা, এক মানুষ। শুধু একবার সিঁদুর পরে, আর একবার সিঁদুর মুছে।...

—তুমি?

একটা আচমকা প্রশ্নে সুখদা একেবারে শিউরে উঠেছে।

একটু আগেই যে মেয়েটিকে সান্ত্বনা বোস নামে ভোট দিতে দেখেছে, সেই তাকেই বাইরে এসে সুরেন চেপে ধরেছে।

—বলো তুমি সুখদা কি না? বলো? নইলে আমি এখ্খুনি তোমাকে ধরিয়ে দেবো।

মেয়েটা কেঁদে ফেললে। মাথার ঘোমটাটা খসে গেল। চারদিকে পুরুষ আর মেয়েদের উত্তেজিত ভিড়। একটা বুড়ি মতন মহিলা পেছনে দাঁড়িয়েছিল। তার সঙ্গে আরো অনেক মেয়েমানুষ। সবাই ভোট দিতে এসেছে।

—কী রে, কার সঙ্গে কথা কইছিস? ও কে লা?

সুখদা কোনও উত্তর দিলে না সে কথার। সুরেনকে বললে—ও আমাদের মাসি হয়, মানদা মাসি—

তারপর একধারে সরে এল। বললে—কেমন আছ তুমি?

সুরেন বললে—আমার কথা ছেড়ে দাও। তুমি কেমন আছ?

সুখদা হাসলো। বললে—কেমন আছি তা তো দেখতেই পাচ্ছ। এক-একটা ভোট পিছু কুড়ি টাকা করে পাচ্ছি—

—কোথায় আছ?

সুখদা সে কথার উত্তর না দিয়ে বললে—কবে ছাড়া পেলে তুমি?

—এই কিছুদিন আগে!

—সব শুনেছ নিশ্চয়ই!

—সেই জন্যেই তো জিজ্ঞেস করছি কোথায় আছ?

—কিন্তু আগে বলো তুমি কোথায় আছ? ও বাড়ি তো মা-মণি মারা যাবার পর বুড়োবাবুর দখলে। সেখানে তার ভাইপো সুধন্য তার বউ, বোন ছেলেমেয়ে সবাইকে নিয়ে উঠেছে। খুব ঘটা করে মা-মণির শ্রাদ্ধ করেছে বুড়োবাবু, তা জানো বোধহয়?

সুরেন বললে—না—

—হ্যাঁ, খুব ঘটা করে শ্রাদ্ধ হয়েছে।

পেছন থেকে মানদা মাসি হঠাৎ ডাকাডাকি শুরু করে দিলে। দু'চারজন ভলাণ্টিয়ারও তাড়া দিতে লাগলো গাড়িতে ওঠবার জন্যে। রাস্তার ওপরেই কয়েকখানা গাড়ি রেডি। যাদের গাড়ি করে আনা হয়েছে, যাদের পেট ভরে লুচি-মাংস খাওয়ানো হয়েছে, ভোট পিছু যাদের কুড়ি টাকা করে দেওয়া হয়েছে, তাদের আবার যার যার বাড়ি পৌঁছে দিতে হবে।

—কই, বললে না তো কোথায় আছ?

সুরেন বললে—তুমিও তো বললে না তুমি কোথায় আছ?

—আমি যেখানে থাকি সেখানে তুমি যাবে?

সুরেন বললে—কেন যাবো না? আমাকে যেতে বললেই যাবো—

—তাহলে একটা ট্যাক্সি ডাকো—

সুরেন একটা ট্যাক্সি ডেকে আনতেই সুখদা তাতে উঠে বসলো। সুরেনও উঠে পাশে বসলো। তারপর ট্যাক্সি চলতে লাগলো। সুখদা রাস্তার নির্দেশ দিতে দিতে চললো। শেষকালে একটা গলির ভেতরে আসতেই সুখদা ড্রাইভারকে বললে—থামো।...

জীবনের যে অমোঘ গতি ভদ্রলোককে এই গুরুদেবপুরে এনে প্রশান্তি দিয়েছে, সেই একই অমোঘ গতিই আবার সুখদাকে নিয়ে গিয়েছে দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রীটের কোন্ এক অন্ধকার পাতালে। সেখানে আজও সন্ধ্যে হলে বেল-ফুলের মালাওয়ালা এসে সওদা বেচে যায়, আসে কুলফি বরফ। তাদের সঙ্গে আসে নরেশ দত্তর মত উঠতি কাপ্তেনরা। রক্তের টগবগ ক্ষিধেয় তারা ছটফট করে

করে এখানে এসে দ্বন্দ্বের তৃপ্তি খোঁজে। তারপর নরেশ দত্তর মতই আবার একদিন ক্ষয়ে ক্ষয়ে নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

সুরেন এসব জানে। যেমন করে জানে পাড়ায় পাড়ায়, পার্কে পার্কে দেবেশ-দের জ্বালা ধরানো লেকচারের জ্বালা, যেমন করে জানে পুণ্যশ্লোকবাবুদের খদ্দর মার্কা চেহারার আড়ালে ক্ষমতা-লোলুপতার ভণ্ডামি, যেমন করে জানে ভূপতি ভাদুড়ীদের সর্বগ্রাসী লালসার অক্লান্ত শয়তানি, তেমনি করে জানে সুখদার সেই পাতালের সুড়ঙ্গে তিল তিল করে মৃত্যুবরণের কাহিনী।

সুরেন জিজ্ঞেস করলে—কিন্তু কালীকান্ত? সে কোথায় গেল? সে তোমাকে এখানে আসতে অনুমতি দিলে?

সুখদা বললে—দিলে!

—তাহলে কীসের সুখে তুমি তার সঙ্গে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিলে?

—ভুল করে!

—কিন্তু এমন ভুল কেন হলো তোমার?

—মতিভ্রম! মতিভ্রম না হলে মা-মণির সঙ্গেই বা একদিন বুড়োবাবুর অত ঘটা করে বিয়ে হবে কেন বলো? আর তা না হলে মা-মণিকেই বা কেন সারা-জীবন অমন বিধবার সাজে কাটাতে হলো? আমরা কেউ কি জানতুম মা-মণির অত বড় সম্পত্তির মালিক হবে শেষকালে বুড়োবাবু!

সুরেনবাবু আরও বললেন—সত্যিই আশ্চর্য, সেদিন যদি ওই হিন্দু কোড বিলটা মা-মণি মারা যাওয়ার আগে পাশ হয়ে যেত তো ভূপতি ভাদুড়ী নিশ্চয়ই মা-মণিকে দিয়ে বিবাহ-বিচ্ছেদ করিয়ে নিত! লোকে তো প্রথমে জানতোও না বুড়োবাবু কে! মা-মণির সঙ্গে তার কীসের সম্পর্ক! মা-মণি সেই যে একদিন নতুন বরের সঙ্গে শোভাবাজারের শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে উঠেছিল, সেদিন কি কেউ কল্পনা করতে পেরেছিল যে, সে সুখ বেশিক্ষণ টিকবে না? সে সন্ধ্যেটা তো কোনও রকমে কাটলো। সে কী জাঁকজমক শোভাবাজারের দত্তবাড়িতে! কলকাতার চার-দিক থেকে আত্মীয়স্বজন এসে বাড়ি ভরে ফেলেছে। নতুন বউ লাবণ্যময়ীকে সবাই এক-একবার করে ঘোমটা তুলে দেখে যাচ্ছে। বলছে—বাঃ, বেশ বউ হয়েছে—

শুধু কি রূপ! তখন লাবণ্যময়ীর ভরা যৌবন। চাঁপাফুলের মত গায়ের বর্ণ। আর তার ওপর শিবশম্ভু চৌধুরী সোনা-হীরে-জড়োয়া দিয়ে সারা অঙ্গ মুড়ে দিয়েছেন। রসুনচৌকীর বাজনার তালে তালে তখন নতুন বউএর বুকের ভেতরকার রক্ত তোলপাড় করছে। চেনা নেই শোনা নেই একেবারে অচেনা এক পুরুষের সঙ্গে এক বিছানায় শুতে হবে, মুখ তুলে কথা বলতে হবে, এ কেমন এক রোমাঞ্চকর ব্যাপার!

বাসরঘরে লাবণ্যময়ী ভালো করে বরকে দেখেওনি। কিন্তু কী রূপ বরের! বর নয় তো যেন ফুটন্ত পদ্মফুল। তখন থেকেই অনেক কিছু কল্পনা করে নিয়েছিল বিয়ের কনে।

রাঙামাসী, মানে ওই সুখদার মা বর দেখে বলেছিল—অনেক ভাগ্য করলে অমন বর মেলে জামাইবাবু—

শিবশম্ভু চৌধুরীও মনে মনে খুশী হয়েছিলেন। একমাত্র সন্তান তাঁর। তাঁর সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র অধিকারিণী। সেই মেয়ে সুখী হলেই তিনি সুখী। নগদে গয়নায় এক লক্ষ টাকা তিনি সে যুগে খরচ করেছিলেন। কিন্তু তাতে

তার দুঃখ ছিল না। একমাত্র মেয়ের জন্যে খরচ করবেন না তো তিনি কার জন্যে খরচ করবেন! এই যে লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি রেখে যাবো এও তো সব আমার মেয়ে-জামাই-ই পাবে ভবিষ্যতে। তাদের সুখ দেখেই আমার সুখ, তাদের ভবিষ্যৎই আমার ভবিষ্যৎ।

বাদামী নতুন বউএর সঙ্গে গিয়েছিল। সেও পাত্র পক্ষের ঐশ্বর্য দেখে অবাক। বিরাট চকমিলান বাড়ি। বাড়ি নয় তো যেন রাজবাড়ি। রাজবাড়ির মত রাজসমাদর। পাত্রের মা থেকে আরম্ভ করে পাত্রের মাসী, পিসি, দিদি সবাই বাদামীকে সে কী খাতির!

বলে—তুমি চেয়ে চেয়ে নিয়ে খেও বাছা, শেষকালে বলবে কনের শ্বশুর-বাড়িতে গিয়ে পেট ভরে খেতে পেলাম না—

সত্যিই খুব খেয়েছিল সেদিন বাদামী। কত রকম তরকারী, কত মিষ্টি, কত দই, কত রকম কী সব করেছিল, সব কি একদিনে খাওয়া যায়!

তারপর অনেক রাত হয়েছে। বৌভাতের দিন সকাল থেকে লোকজনের আনাগোনা। বৌভাত হয়ে গেলেই ফুলশয্যে। সমস্ত দিন দিদিমণির পাশে পাশে থেকেছে বাদামী। সন্ধ্যেবেলা আইবুড়ো ননদ-জা'এরা এসে নতুন বৌকে সাজিয়েছে। সে কী সাজ! যেন পটে আঁকা জগদ্ধাত্রী।

যে দেখতে এসেছে, সেদিন সেই বলে গেছে—বাঃ! দত্ত-বংশে এমন বউ আর কখনও কেউ আনতে পারেনি—

দলে দলে ছাদে গিয়ে উঠেছে সব লোক। কলাপাতার ওপর ঝুঁকে পড়ে চর্বচুষ্য খেয়েছে। আয়োজনও হয়েছিল এলাহি।

তারপর সব শান্ত হয়ে গেল। কত রাত কে জানে! বৌভাতের বাড়িতে যারা সারাদিন খেটে খেটে হয়রাণ হয়ে গিয়েছিল, তারাও তখন যে যেখানে পেরেছে শুয়ে পড়েছে। নহবতখানায় নহবতওয়ালাও ঘুমে আচ্ছন্ন।

হঠাৎ নতুন বউ দরজার খিল খুলে বাইরে এল। বাদামী ঠিক ঘরখানার সামনেই বারান্দার ওপর অঘোরে ঘুমোচ্ছিল।

লাবণ্য এসে ডাকলে—বাদামী, ও বাদামী—

বাদামী ধড়মড় করে উঠে বসলো। বললে—কী দিদিমণি?

—একটা ট্যাক্সি ডাক। যা এখুনি একটা ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে আয়, যেখান থেকে পারিস—

বাদামী তো অবাক। বললে—কোথায় যাবে দিদিমণি?

—বাড়ি যাবো, আবার কোথায় যাবো! যা, শিগগির কর—

সেই অত রাতে ট্যাক্সি খুঁজে আনা কি সোজা কথা?

যা'হোক, ট্যাক্সি একটা পাওয়া গিয়েছিল শেষ পর্যন্ত। সেই ট্যাক্সিতে করেই মা-মণি বাদামীকে নিয়ে সোজা মাধব কুণ্ডু লেনে এসে হাজির।

শিবশম্ভু চৌধুরী শেষরাত্রের দিকে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। খবর পেয়ে ছুটে নেমে এলেন। মেয়েকে দেখে অবাক।

বললেন—কী মা, চলে এলে যে? আজ তো ফুলশয্যে তোমার—

লাবণ্য বললে—আমি আর ও বাড়িতে যাবো না বাবা—

—কেন মা? কী হয়েছে? ওরা কিছু বলেছে?

লাবণ্য বললে—তোমার জামাই পুরুষমানুষ নয় বাবা—

বলে আর দাঁড়ালো না সেখানে। সোজা নিজের ঘরের ভেতরে গিয়ে বিছানার ওপর লুটিয়ে পড়লো।...

সেদিন সেই অত বছর আগে শিবশম্ভু চৌধুরীর মেয়ে সেই যে বাপের বাড়ি ফিরে এল তারপর আর কখনও শ্বশুরবাড়িতে যায়নি। মেয়ের মুখের দিকে ভালো করে চেয়ে দেখতেও ভয় হতো শিবশম্ভু চৌধুরীর। শিবশম্ভু চৌধুরীকে তারপর থেকে আর কখনও হাসতে দেখেনি কেউ। তিনি বেশির ভাগ সময়ে চুপচাপ বসে থাকতেন নিজের ঘরে। ভূপতি ভাদুড়ী ভয়ে ভয়ে হিসেবের খাতা নিয়ে আসতো। শিবশম্ভু চৌধুরী বিরক্ত হতেন। সই করতে করতে বলতেন—সময় নেই অসময় নেই, তোমার কেবল হিসেব আর হিসেব—যাও, আর কখনও অসময়ে এসো না—

শিবশম্ভু চৌধুরীর কোন্‌টা যে সময় আর কোনটা যে অসময় তা ভূপতি ভাদুড়ী বুঝতো না। বিনা প্রতিবাদে সে ঘর ছেড়ে চলে যেত।

কিন্তু ষ্টেটের কাজ তো তা বলে বন্ধ রাখা চলে না। আবার এক সময়ে গিয়ে হাজির হতো শিবশম্ভু চৌধুরীর সামনে।

চিৎকার করে উঠতেন শিবশম্ভু চৌধুরী।

বলতেন—আবার কী?

—আজ্ঞে, এই হিসেবটা—

শিবশম্ভু চৌধুরী তখন একেবারে খাপ্পা। উঠে দাঁড়িয়ে বলে উঠতেন—বেরোও, বেরিয়ে যাও এখুনি—

বলে ভূপতি ভাদুড়ীর দিকে তেড়ে আসতেন। ভূপতি ভাদুড়ী ভয়ে তর-তর করে সিঁড়ি দিয়ে নিচেয় নেমে আসতো। এসে নিজের খাজাঞ্চিখানার তক্তপোষের ওপর উঠে বসতো। পাওনাদারেরা তখন হা-পিত্যেশ করে সেখানে বেঞ্চিতে বসে আছে।

তাদের দিকে তাকিয়ে বলতো—যাও, আজকে কিছু হবে না। তোমাদের জন্যে আমাকে বকুনি খেতে হলো—

তারা বলতো—আজ্ঞে, তাহলে আবার কবে আসবো?

ভূপতি ভাদুড়ী বলতো—কবে আসবে তা আমি কী জানি? আমি কি তোমাদের পয়সা দেবার মালিক? আমি হুকুমের চাকর। যেমন হুকুম হবে আমি তেমনি তামিল করবো—

এমনি করেই কিছুকাল চললো। তারপর একদিন আর চললো না। শিবশম্ভু চৌধুরী একদিন মারা গেলেন। মেয়ে লাবণ্য সেই প্রথম আড়াল ছেড়ে ঘর থেকে বেরোল। ভূপতি ভাদুড়ীকে ডেকে হুকুম দিয়ে দিলে—খুব ঘটা করে বাবার শ্রাদ্ধ করতে হবে—

এসব কত বছর আগেকার কথা। তখন জীবন ছিল সহজ, মানুষ ছিল সরল। ঊনবিংশ শতাব্দীর ঐতিহ্যবাহী হয়ে চৌধুরী বংশ ওই মাধব কুণ্ডু লেনে বিরাট এক বাড়ি ফেঁদে বসলো। ভাবলো একদিন সে বংশ শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত হয়ে কলকাতার মধ্যমণি হয়ে উঠবে। ধনেজনে লক্ষ্মীলাভে বহু দূর পর্যন্ত ছড়াবে তার নামডাক। কলকাতার ইতিহাসে চৌধুরী বংশের পূর্বপুরুষের নাম অক্ষয় হয়ে থাকবে।...

কিন্তু মানুষের ভাবা আর ভবিতব্য যদি এক হতো, তাহলে কি আজকে এই ভদ্রলোককে গুরুদেবপুরে এসে এইভাবে জীবনযাপন করতে হতো!

হয়ত এ ভালোই হলো।

একদিন বয়েস হবার সঙ্গে সঙ্গেই এদের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছিল সুরেন—এই মা-মণি, সুখদা, ভূপতি ভাদুড়ী আর বুড়োবাবু। একদিকে এরা,

আর একদিকে সুব্রত, দেবেশ, প্রজেশ সেন, পুণ্যশ্লোক রায় আর পমিলি। আর সকলের শেষে টুলু।

দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রীটের পাতাল থেকে উঠে আসবার সময় দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসে সুখদা বলেছিল—তুমি যেন আর কখনও এসো না—

সুরেন সে কথার কোনও উত্তর দেয়নি সেদিন। কিন্তু মনে মনে বলেছিল—না, আর কখনও আসবো না। শুধু তোমার কাছেই নয়। আর কারোর কাছেই কখনও আসবো না। একদিন যাদের আমি ভালোবেসেছি, তাদের অধঃপতন আমি সইতে পারবো না বলেই কখনও আসবো না। তোমাদের আসা-যাওয়ার দরজা খোলা থাকলেও আমি আসবো না। তোমাদের সম্মান দেখাতেও কখনও আসবো না, তোমাদের অন্তরাত্মার অপমান করতেও কখনও আসবো না। আমি অনেক অভিজ্ঞতার নিরিখে জানতে পেরেছি, অনেক মূল্যের বিনিময়ে উপলব্ধি করেছি যে, জীবন নিলেই জীবন পাওয়া যায় না। জেনেছি যে, জীবন পেতে গেলে জীবন দিতে হয়। যেমন করে দিয়েছে টুলু—

মৃত্যু যেখানে জীবনেরই নামান্তর, তুমি সেই মৃত্যুলোকেরই অধীশ্বরী। মৃত্যুকে তুমি অত সহজে স্বীকার করেছ বলেই আজ তুমি অমৃত পেয়েছ। এখান থেকেই আমি তোমাকে নমস্কার করি। আমি তোমার তুলনায় সামান্য মানুষ। আমার ভয় আছে, যন্ত্রণা আছে, বিচ্ছেদ ভাবনা আছে। আমার ঘৃণা আছে, লোভ আছে, সঙ্গে সঙ্গে সংস্কারও আছে। আমি আঘাত পাই, কিন্তু প্রতিবাদ করবার সাহস নেই আমার। আমি তাই তোমাকে নিষ্ঠুর ফাঁসির ভয়াবহতার মুখে ফেলে রেখে এখানে এই সংগ্রামহীন নিশ্চিন্ততার মধ্যে পালিয়ে এসে বেঁচেছি। আমি স্বার্থপর, লজ্জা আমাকে বিব্রত করে, ঘৃণা আমাকে দগ্ধ করে, লোভ আমাকে ব্যঙ্গ করে। সুখ চেয়ে সুখ পাইনি বলেই আমি সুখের বিড়ম্বনা থেকে মুক্ত হয়ে স্বস্তি চেয়েছি। কিন্তু মহৎকে আমি শ্রদ্ধা করতে জানি, প্রণম্যকে আমি প্রণাম করবার স্পর্ধা রাখি, মনুষ্যত্বের আমি পূর্ণ মূল্য দিই।...

কলকাতা সহরের অলিতে-গলিতে তখন ভোটের উত্তেজনা। কলকাতার মানুষ তখন উন্মাদ হয়ে গেছে। এক-একটা করে দিন কাটে আর মানুষ যেন আরো উন্মাদ হয়ে ওঠে। ভোটের ফলাফল কী হয়, কী হয়! তারপর যেদিন খবর বেরোল পুণ্যশ্লোকবাবু জিতে গেছেন, তখন সব উৎসাহ উত্তেজনা ধীরে ধীরে প্রশমিত হয়ে সমস্ত সহর যেন শান্ত হয়ে এল। তবে কি আবার পাঁচ বছরের জন্যে কংগ্রেসের অত্যাচার সহ্য করতে হবে? তাহলে পমিলি স্লিপিং-পিল খেতে গেল কেন? তবে সে তদন্ত কমিটির সামনে দাঁড়িয়ে বাবার বিরুদ্ধে, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে কেন?

মনে আছে, পমিলির সঙ্গে যখন সে তদন্ত কমিশনের ঘরের ভেতরে গিয়ে বসলো তখনও সে জানে না কত বড় বিপর্যয় তার জীবনে ঘটতে চলেছে। কিন্তু মুশকিল করে দিলে টুলু। দূর থেকে বোধহয় সে দেখতে পেয়েছিল তাদের। একে একে সাক্ষীদের জেরা চলছে। হঠাৎ হৈ-চৈ পড়ে গেল চারদিকে। কী হলো? কী হলো?

সুরেন একজনকে জিজ্ঞেস করলে—কী হয়েছে, জানেন কিছু?

কেউ কিছু জানে না, শুধু উত্তেজনায় সমস্ত হলটা গম্-গম্ করছে।

একজন শুধু হদিস দিতে পারলে। বললে—একটা মেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছে—

—কেন? অজ্ঞান হয়ে গেল কেন? মেয়েটা কে?

—একটা কমিউনিস্ট পার্টির মেয়ে।

তবে কি টুলু? টুলুই অজ্ঞান হয়ে গেল নাকি?

সুরেন বললে—চলো তো দেখি, কী হয়েছে ওখানে?

ততক্ষণে ভিড় হয়ে গেছে জায়গাটায়। সুরেন একলাই দৌড়ে গেল সেদিকে। খানিক পরে ফিরে এল। বললে—টুলু অজ্ঞান হয়ে গেছে পমিলি। তাকে হস্‌পিটালে নিয়ে যেতে হবে। তোমার গাড়িটা দেবে?

—আমার গাড়ি?

সুরেন বললে—নইলে এ্যাম্বুলেন্স ডেকে নিয়ে আসতে দেরি হয়ে যাবে—

আসলে টুলু অজ্ঞান হয়নি। মাথাটা শুধু একটু ঘুরে গিয়েছিল তার। সুরেন তাকে কোলে করে তুলে নিয়ে গাড়িতে ওঠালো। পমিলি নিচু হয়ে মাথার নিচেটা ধরতে গেল। চারদিকে কৌতূহলী জনতার ভিড়। তাদের দৃষ্টি এড়াবার জন্যেও তাড়াতাড়ি গাড়ি ছেড়ে দেওয়া দরকার।

পেছনের সিটের ওপরে টুলুকে শুইয়ে দিলে সুরেন। টুলু চোখ তুলে চাইলে। সুরেনকে দেখলে, তারপর পমিলিকেও দেখলে। যেন পমিলিকে দেখেই উঠে বসতে গেল সে।

সুরেন বললে—উঠছো কেন? শুয়ে থাকো—

টুলু বললে—আমার কিছু হয়নি, আমাকে নামিয়ে দাও গাড়ি থেকে—আমি নেমে যাবো—আমায় কেন গাড়িতে তুললে?

বলে বার বার উঠে বসতে চেষ্টা করতে লাগলো।

সুরেন দুই হাতে টুলুকে চেপে ধরে রইল। পমিলির দিকে চেয়ে বললে—পমিলি, তুমি একটু বুঝিয়ে বলো ওকে—

পমিলি তখন একদৃষ্টে চেয়ে দেখছে টুলুকে। এই সেই মেয়েটা যে একদিন তাকে অপমান করেছিল!

কিন্তু তখন আর বেশি দেরি করা চলে না। লোকের ভিড় ক্রমেই বেড়ে চলেছে গাড়ির চারপাশে।

সুরেন বললে—পমিলি, ওঠো, গাড়ি চালাও—

পমিলি আর দেরি না করে গাড়িতে উঠতে যেতেই হঠাৎ একটা কাণ্ড হয়ে গেল। হঠাৎ তার কাপড়ের ভেতর থেকে কী যেন শক্ত মতন একটা জিনিস পিচের রাস্তার ওপর পড়ে ঠক্ করে শব্দ হলো।

সুরেন জিনিসটার দিকে চেয়ে দেখলে—একটা রিভলবার—

কেউ দেখতে পাবার আগেই সুরেন সেটা কুড়িয়ে নিয়েছে।

—এ কি, এটা কার?

—দাও, ওটা বাবার—দাও ওটা—

সুরেন বললে—না—

সুরেনের মনে পড়লো একদিন ওই পমিলিই স্লিপিং-পিল নিয়ে ডায়মণ্ড-হারবারের মাঠের মধ্যে গিয়েছিল আত্মহত্যা করবার জন্যে। সেদিনও সুরেন সেটা কেড়ে নিয়ে নিজের পকেটে রেখে দিয়েছিল। আজও রিভলবারটা নিয়ে সে নিজের পকেটে রেখে দিলে।

বললে—ওটা তোমাকে দেবো না, আমার কাছে থাক—চলো—

পমিলি বললে—ওটা দিয়ে তুমি কী করবে?

সুরেন বললে—ওটা আমার কাছে থাকাই ভালো। কারণ তোমাকে বিশ্বাস

নেই—তুমি সব পারো।

পমিলি বললে—আমি কী পারি?

—তোমার দ্বারা সব কিছুই সম্ভব। তুমি মানুষ খুন করতেও পারো।

—তোমার ভয় হচ্ছে নাকি?

—ভয় হবে না? নইলে কতদিন তো তোমার সঙ্গে বেরিয়েছি, কোনও দিন তো তুমি ওটা সঙ্গে নিয়ে বেরোও না।

—কিন্তু কাকে খুন করবো?

সুরেন বললে—বলা যায় না। তোমার মেজাজ কখন কী রকম থাকবে তা ভগবানও বলতে পারে না। আমি তো সামান্য মানুষ।

পমিলি বললে—তোমার ভয় নেই, আর যাকেই হোক তোমাকে আমি খুন করবো না।

—কিন্তু তুমি নিজেকেও তো খুন করতে পারো! বলেছি তো তোমার দ্বারা সবই সম্ভব—ওটা আমি তোমাকে এখন দেবো না। কাল দেবো।

পমিলি বললে—কাল যদি আমি বেঁচে না থাকি?

সুরেন বললে—বেঁচে না থাকলে প্রজেশ সেনের সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে কী করে?

—তার মানে?

পমিলি হঠাৎ গাড়িটা থামিয়ে দিয়েছে রাস্তার এক পাশে। থামিয়ে দিয়ে বললে—কে বললে আমি প্রজেশকে বিয়ে করছি?

—হ্যাঁ, তোমাদের বিয়ের কথা একরকম পাকাই। প্রজেশ সেনই আমাকে বলেছে।

—প্রজেশ বলেছে? তুমি ঠিক বলছো?

সুরেন বললে—আমি এ-ব্যাপারে মিথ্যে কথাই বা বলবো কেন? তোমাদের বিয়ের ব্যাপারে আমার স্বার্থ?

পমিলি আবার জিজ্ঞেস করলে—তুমি সত্যিই বলছো?

—হ্যাঁ, সত্যিই বলছি।

—স্কাউণ্ড্রেলটা কি ভেবেছে আমার বাবার যাতে কেরিয়ার হয়, তার জন্যে আমি তার কাছে নিজেকে বলি দেবো? এতদিন এই উদ্দেশ্য নিয়ে সে আমার বাবার পেছনে ঘুরেছে? বাবার সুবিধের জন্যে আমি একটা মাতালকে বিয়ে করবো?

—কিন্তু সে তো সেই কথাই বললে!

পমিলি গাড়ি ঘুরিয়ে নিলে। বললে—চলো, এখুনি স্কাউণ্ড্রেলটার কাছে গিয়ে আমি চ্যালেঞ্জ করছি—

বলে উল্টো দিকের রাস্তা ধরে চলতে লাগলো। পমিলি যেন তখন রাগে ফুলছে।

সুরেন বললে—করলে কী, টুলু রয়েছে যে গাড়িতে! ওকে যে হসপিট্যালে নিয়ে যেতে হবে—

পমিলি বললে—ও মরে যাবে না, আগে আমি প্রজেশকে শায়েস্তা করে আসি—

বলে তীরের বেগে ভিড়ের মধ্যে দিয়ে গাড়ি চালাতে লাগলো পমিলি। যেন সে সামনে পেলে প্রজেশকে এখুনি চ্যালেঞ্জ করবে।

গ্রে স্ট্রীট দিয়ে গাড়িটা তখন হু হু করে চলেছে। সুরেনের ভয় করতে লাগলো। যদি চাপা পড়ে কেউ। কেন সে সুব্রতর কথায় পমিলির সঙ্গে দেখা

করতে গিয়েছিল! আর যদিও বা গিয়েছিল, তাহলে কেনই বা সে পর্মিলির সঙ্গে বেরোল।

গ্রে স্ট্রীট ছেড়ে বিদ্যাধর বিশ্বাস বাই লেনের মধ্যে ঢুকলো গাড়িটা। তারপর প্রজেশ সেনের বাড়ির সামনে এসে থামলো। গাড়ি থেকে নেমেই পর্মিলি সোজা গিয়ে বাড়ির দরজার কড়া নাড়তে লাগলো। ভেতর থেকে দরজা খুলে দিতেই প্রজেশ পর্মিলিকে দেখতে পেয়েছে। বললে—তুমি?

তারপর পেছনে সুরেনকে দেখে আরো অবাক হয়ে গেল।

বললে—তোমরা দুজনেই? কী মনে করে? এসো এসো—

সুরেন ভয়ে কাঁপছিল থর থর করে। রাগের মাথায় পর্মিলি হয়ত কী করে ফেলবে কে জানে! আস্তে আস্তে দুজনের পেছন পেছন চলতে লাগলো। প্রজেশ আগে আগে পথ দেখিয়ে নিজের বসবার ঘরে গিয়ে বসতে বললে দুজনকে—

কিন্তু পর্মিলি বসলো না।

সোজা বললে—তুমি সুরেনকে বলেছ, আমি তোমাকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছি?

প্রজেশ প্রথমেই এ প্রশ্ন শুনে কেমন বিব্রত হয়ে পড়লো। একবার সুরেনের দিকে তাকালো। তারপর পর্মিলিকে বললে—তুমি বোস বোস, খুব রেগে গেছ মনে হচ্ছে—কী খাবে বলো? চা না কফি?

পর্মিলি তবু বসলো না। পর্মিলি বসলো না বলে সুরেনও বসতে পারলো না।

প্রজেশ সুরেনের দিকে চেয়ে বললে—কী মিষ্টার সান্যাল, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বোস। এতদিন পরে আমার বাড়িতে এলে, আর এই রকম দাঁড়িয়ে থাকবে? বোস বোস তোমরা—

বলে নিজেই সোফার ওপর বসে পড়লো।

কিন্তু পর্মিলি বসলো না। বললে—বলো, আমার কথার উত্তর দাও আগে—উত্তর দাও—

প্রজেশ তার উত্তরে হো-হো করে হেসে উঠলো। যেন বড় হাসির কথা শুনছে সে! যেন এতদিনে একটা বড় হাসির খোরাক পেয়েছে। তার হাসি আর কিছুতে থামতেই চায় না। হাসতে হাসতে সে সোফার ওপরেই গড়িয়ে পড়ে আর কি!

পর্মিলি কিন্তু ভোলবার মেয়ে নয়।

বললে—হাসছো কী? আমার কথার জবাব দাও—

এদিকে রাস্তায় পর্মিলির গাড়ির ভেতরে টুলু তখন কেমন তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় পড়ে ছিল। নির্জন রাস্তা। গলিটা এখানে এসেই বন্ধ হয়ে গেছে। এই জায়গায়টাই গলির শেষ। হঠাৎ চোখ খুললো সে। এ কোথায় পড়ে আছে সে! ওরা গেল কোথায়? গাড়ির মধ্যেই উঠে বসলো টুলু। চারদিকে চেয়ে দেখলে। অল্প অল্প অন্ধকার হয়ে আসছে। ভালো করে সন্ধ্যে হয়নি তখনও। তাকে ফেলে রেখে কোথায় গেল তারা!

টুলু কী করবে বুঝতে পারলে না। শুধু অস্পষ্ট মনে পড়তে লাগলো ওরা দুজনে মিলে তাকে গাড়িতে তুলে দিয়েছিল। তারপর গাড়িটা চলতে আরম্ভ করেছিল আস্তে আস্তে। আর তারপর গাড়ির দোলানিতে কখন যে সে আবার আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল তার খেয়াল ছিল না।

হঠাৎ পাশের বাড়ির ভেতর থেকে একবার দুম করে একটা বিকট আওয়াজ হলো। তারপর পর পর আরো দু'বার।

কেমন যেন সন্দেহ হলো। তবে কি কেউ পিস্তল ছুঁড়ছে! পাশের বাড়ির দিকে চেয়ে দেখলে। সেদিক থেকে যেন পমিলি আর সুরেনদার কথা কাটাকাটির আওয়াজ কানে এল।

টুলু গাড়ির দরজা খুলে রাস্তায় নামলো। দুজনে ঝগড়া করছে নাকি!

হঠাৎ আবার একটা চিৎকার কানে এল। আর থাকতে পারলে না টুলু। একেবারে সোজা খোলা দরজা দিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়লো। সামনের ঘরটা অন্ধকার। বাইরের একটা বারান্দায় একটা আলো জ্বলছে দেখা গেল।

—তুমি চলে যাও, শিগগির চলে যাও—

গলাটা সুরেনদার। টুলু তাড়াতাড়ি পাশের ঘরের মধ্যে ঢুকতেই স্তম্ভিত হয়ে গেল। দেখলে সুরেনদার হাতে একটা রিভলবার। রিভলবারটার মুখ দিয়ে তখনও একটু একটু ধোঁয়া বেরোচ্ছে। আর সামনেই একটা সোফার ওপর এক ভদ্রলোক মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। আর তার বুকের কাছ থেকে গল গল করে রক্ত বেরোচ্ছে—

টুলু ভয়ে চিৎকার করে উঠলো—এ কী, তুমি খুন করলে?

সুরেনের চোখ দুটো যেন তখনও জ্বলছে।

বললে—তুমি চলে যাও এখান থেকে টুলু, এখুনি চলে যাও—এখুনি পুলিশ আসবে—

—কিন্তু ও ভদ্রলোক কে?

—প্রজেশ সেন। ও একটা স্কাউণ্ড্রেল।

হঠাৎ এতক্ষণে যেন অবস্থার গুরুত্বটা উপলব্ধি করতে পারলে টুলু। দেখলে, পমিলি কখন নিঃশব্দে ঘর থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

সুরেন আবার বললে—চলে যাও, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

—না, আমি যাবো না—

বলে খপ করে সুরেনদার হাত থেকে রিভলবারটা কেড়ে নিয়ে বললে—তুমি চলে যাও সুরেনদা, এখ্খুনি চলে যাও—

সুরেন তখন হতভম্ব হয়ে গেছে। রিভলবারটা টুলুর হাত থেকে কেড়ে নিতে গেল। কিন্তু টুলু হাত সরিয়ে নিলে। বললে—না, আমি কিছুতেই দেবো না, তুমি চলে যাও—

—কিন্তু সবাই যে দেখতে পাবে!

টুলুর গলার স্বর কঠোর হয়ে উঠলো।

বললে—দেখুক—

—পুলিশ এলে যে তোমাকেই ধরবে টুলু!

—ধরুক। আমাকে ফাঁসি দিক।

—তুমি বলছো কী টুলু? তুমি কি পাগল হয়ে গেলে? এখান থেকে পালিয়ে যাও—

—কিন্তু কেন তুমি ওকে খুন করলে? ও কী করেছিল?

সুরেন বললে—ও একটা স্কাউণ্ড্রেল, ও একটা বিস্ট, ও একটা ক্রিমিন্যাল—

ততক্ষণে বাইরে থেকে অনেক লোক এসে হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়েছে। তারা এসে দৃশ্য দেখে হতবাক্। বেশি দেরি করেনি তারা। দুজনকেই হাতেনাতে ধরে ফেলেছে। তারপর কে বুঝি এক ফাঁকে পুলিশকে খবর দিয়েছে। পুলিশও যথাসময়ে এসে গেল। তখনও টুলুর হাতে রিভলবারটা ধরা রয়েছে। সেই অবস্থাতেই দুজনকে তারা ভ্যানের মধ্যে পুরে নিলে। খবরের কাগজে সে

খবর ফলাও করে ছাপাও হলো। সারা কলকাতায় সে খবর নিয়ে হৈ-চৈও পড়ে গেল।...

আপনি জীবন দেখেছেন, মৃত্যুও দেখেছেন। আমিও জীবন দেখেছি আবার মৃত্যুও দেখেছি, কিন্তু বিভিন্ন লোকের দেখার মধ্যেও তো তফাত থাকে। এই দেখার তফাতের জন্যেই একজন মানুষ আর একজন মানুষের থেকে আলাদা হয়। নইলে বাইরে তো আমরা সবাই সমান। আমি যেমন একদিন গ্রাম থেকে কলকাতায় এসেছিলাম, তেমনি সেই ইংরেজদের গোড়ার আমলেও গ্রাম থেকে পিল পিল করে সব লোক কলকাতায় এসেছিল। গ্রামে বর্গীর অত্যাচার, মুসলমান নবাব—হিন্দু জমিদারদের উৎপীড়ন। তাদের হাত থেকে মুক্তি পেতে হলে ফিরিঙ্গিদের আওতায় আসাই ভালো। এখানে জাত যাবার ভয় নেই, ধর্ম যাবার ভয় নেই। তার ওপর চাকরি পাবারও ভরসা আছে। তারপর কত বছর কেটে গেল। সব গ্রাম সব জেলাকে আত্মসাৎ করে এই জলামাটির ওপর গজিয়ে উঠলো আর এক তাজ্জব সহর। নাম হলো কলকাতা। তারপর ফিরিঙ্গিদের দালালি করে নতুন নতুন বড়লোকের সৃষ্টি হলো। তারা সব হঠাৎ গজিয়ে ওঠা বড়লোক। কেউ শেঠ, কেউ শীল, কেউ মল্লিক, কেউ বা লাহা, আবার কেউ চৌধুরী। শিবশম্ভু চৌধুরী এদেরই একজন। সেই বংশের সমস্ত সম্পত্তির মালিকানা পেয়ে গেল পাথুরেঘাটার দত্তরা।

এখনও যদি সেখানে যান, দেখবেন বাড়িটা নতুন চেহারা নিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। সুধন্য দত্ত এখন তার কাকাবাবুর কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়ে সে-বাড়ি ভোগ-দখল করছে। কয়েক বছর ধরে মামলা হয়েছিল ভূপতি ভাদুড়ীর সঙ্গে। ভূপতি ভাদুড়ীও বড় সোজা লোক নয়। সেও মামলা করতে জানে। নিচের কোর্ট থেকে মামলা শুরু হয় প্রথমে। সেখানে ভূপতি ভাদুড়ী হেরে গেল। তারপর ডিস্ট্রিক্ট জজের এজলাস। সেখানেও ভূপতি ভাদুড়ীর হার। তারপর হাইকোর্ট। হাইকোর্টে একবার মামলা গেলে আঠারো বছরের ধাক্কা। কিন্তু সে ধাক্কা আর সামলাতে পারলে না ভূপতি ভাদুড়ী। তার স্বাস্থ্য গেল, অর্থ গেল, সর্বস্ব গেল। তারপর গড়াতে গড়াতে মামলা যখন হামাগুড়ি দিচ্ছে তখন ভূপতি ভাদুড়ী নিজেই টপ করে মরে গিয়ে একেবারে সব সমস্যার সমাধান করে দিলে।

এখন মাধব কুণ্ডু লেনের সেই বাড়িতে ঢোকবার মুখে বাহাদুর সিং আর নেই। সেও বুড়ো হয়ে গিয়েছিল। তার জায়গায় তার ছেলে চাকরিতে বহাল হয়েছে। তার নাম খড়্গ সিং।

খড়্গ সিং ঠিক বাপের মতই তেমনি করে গেটে দাঁড়িয়ে পাহারা দেয়। কেউ গেলেই সেলাম করে। তারপর গেট খুলে দেয়। ভূপতি ভাদুড়ী যে ঘরে বসে হিসেবপত্তরের কাজ করতো, সেখানে ঠিক সেই রকম করেই আর একজন বসে হিসেবপত্তর দেখে।

একদিন শিবশম্ভু চৌধুরীর আমলে যেমন করে কাজ চলতো, এখন সুধন্য দত্তর আমলেও ঠিক তেমনি করেই কাজ চলে। মা-মণি যে খাটে শুতো সেই খাটেই বুড়োবাবু শুয়ে থাকে। আর যখন সকাল হয়, তখন হাতের কাছে গড়-

গড়ার নলটা এগিয়ে দেয় ধনঞ্জয়। ধনঞ্জয় সেই পুরোন কাজেই বহাল আছে। ভাগ্যের পরিহাসে যে একদিন মা-মণির তম্বির-তদারক করতো, এখন সে-ই তম্বির-তদারক করে বুড়োবাবুর।

তামাক টানবার পর আসে চা।

আজ বুড়োবাবুকে দেখাশোনা করবারও লোকের অভাব নেই। টাকা-পয়সার শেষ নেই। অথচ একদিন একটা গামছার জন্যে লাঞ্ছনা-গঞ্জনার শেষ ছিল না ভূপতি ভাদুড়ীর কাছে।

কিন্তু কীসের জন্যে বাঁচা? কার জন্যে বেঁচে থাকা? শুধুই কি জীবন-যাপন?

কলকাতার ইতিহাস খুঁজে বেড়ালে কত মা-মণি, কত বুড়োবাবু, কত ভূপতি ভাদুড়ী পাওয়া যাবে তার কি ইয়ত্তা আছে? কত পুণ্যশ্লোকবাবু এখানে রাজত্ব করেছে, আবার কত পূর্ণবাবু তার পতন কামনা করেছে। কত সুখদা দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রীটে কত নাগরের মন ভোলাবার অভিনয় করে চলেছে, কে তার পূর্ব-ইতিহাস খুঁজে দেখছে? কত সুব্রত কত বাপকে ত্যাগ করে আবার আমেরিকায় চলে গেছে।

আর টুলু?

পুলিশ সেই একই প্রশ্ন করে যায় টুলুকে—আপনি কেন খুন করলেন প্রজেশ সেনকে? সে আপনার কী করেছিল?

টুলুর একই জবাব।

—আমি তাকে শেষ করে ফেলতে চেয়েছিলাম।

—কিন্তু জজ জানতে চান, কেন? কেন তাকে শেষ করতে চেয়েছিলেন?

—সে আমাদের শত্রু।

—কী শত্রুতা করেছে সে আপনাদের?

—আমাদের পার্টির মেম্বারদের সে গুণ্ডাদের দিয়ে খুন করিয়েছে। পুলিশের গুলী খাইয়েছে।

—কিন্তু তার জন্যে তো তদন্ত কমিশন বসেছে। সেখানেই তো তার বিচার হচ্ছে। আপনি কেন নিজের হাতে আইন নিতে গেলেন?

টুলু বললে—তদন্ত কমিশন তো একটা তামাসা—ওটা লোককে ধাপ্পা দেওয়া ছাড়া আর কিছু নয়।

—কিন্তু জানেন, আপনার এ স্বীকারোক্তির কী পরিণতি?

—খুন করার শাস্তি তো ফাঁসি। না-হয় আমার ফাঁসিই হোক।

এমনি করে দিনের পর দিন শুনানী হয় আর টুলু মাথা উঁচু করে প্রশ্ন-গুলোর জবাব দিয়ে যায়। যেন কলকাতার সমস্ত বঞ্চিত-উৎপীড়িত-বুভুক্ষিত মানুষের অন্তরাত্মার অন্তরঙ্গ কথাগুলো তার মুখ দিয়ে বেরোয়। এক-একটা কথা বেরোয় আর পরের দিন তা খবরের কাগজে ফলাও করে ছাপা হয় আর সারা সহরে হৈ-চৈ পড়ে যায়।

সে-খবর পড়ে বুড়োবাবু, পড়ে পুণ্যশ্লোকবাবু, পড়ে দেবেশদা, পড়ে পুলিশ, পড়ে কলকাতার আপামর জনসাধারণ।

আবার পরের দিন প্রশ্ন হয়—আপনি এ পিস্তল পেলেন কোথায়?

—সুরেন সান্ন্যালের কাছে।

—সুরেনবাবু কোথায় পেলেন এ পিস্তল?

—সেটা সুরেনবাবুকেই জিজ্ঞেস করবেন—

—সুরেনবাবু কি আপনাকে পিস্তলটা খুন করবার জন্যে দিলেন?

—না। তাঁর পকেটে পিস্তলটা ছিল, আমি সেটা কেড়ে নিয়ে প্রজেশকে খুন করলাম।

এরপর সেদিনকার মত কোর্ট বন্ধ হয়ে যায়।

এক-একজন মানুষের জীবনে কোথায় কখন কেমন করে যে একটি ভালবাসার অংকুর মাথা তুলে দাঁড়ায় তা বুঝি কারো বোঝবার উপায় নেই! নইলে কোথাকার কোন্ অখ্যাত অজ্ঞাত জনপদে জন্মগ্রহণ করে ইতিহাসের কী এক অমোঘ ইচ্ছার ইঙ্গিতে একটি মেয়ে এই সহরের একটা পরিত্যক্ত অংশে এসে আশ্রয় নিলে, আর সঙ্গে সঙ্গে ঘটনার কোন্ ঘনঘটায় আর একটি ছেলের জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি জড়িয়ে পড়লো, এও তো এক উপন্যাস! তার অনেক আশা ছিল, সে পার্টির কাজে আত্মনিয়োগ করে দেশে সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা করবে, উৎপীড়িতের দারিদ্র্য দূর করবে, সরকারী ষড়যন্ত্র উচ্ছেদ করে সেখানে সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিদের প্রতিষ্ঠা করবে। সে-সব কিছুই হলো না। তার বদলে মন বাঁধা দিয়ে বসলো এমন একজনকে, যে তার কোনও উপকারেই এল না। আর শুধু মনই নয়, তার জন্যে নিজের জীবনটাও উৎসর্গ করে কৃতার্থ হলো।

তারপর প্রমাণের অভাবে সুরেন সান্ন্যালকে কোর্ট অব্যাহতি দিলে। কিন্তু চরম শাস্তি পেতে হলো টুলুকে। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগের শাস্তি সে মাথায় তুলে নিলে।

একদিকে ইতিহাস তার আপন গতিতে এগিয়ে চললো সামনের দিকে লক্ষ্য রেখে, আর একদিকে একজন লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে চার-দেয়ালের গরাদের অন্ধকারে নিজেকে অন্তরালে রেখে স্তব্ধ হয়ে রইল। সে এগোবে না, আবার সে থেমেও যাবে না। এগিয়ে যাওয়া আর থেমে থাকার ঊর্ধ্বে যে আর একটা অলোক-স্থিতি তার অলৌকিক আলোতে সে উদ্ভাসিত হয়ে রইল।

কোর্ট থেকে ছাড়া পেয়ে সুরেন এসে দাঁড়ালো মাধব কুণ্ডু লেনের গেটের সামনে।

ধনঞ্জয় দেখতে পেয়ে হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলো।

বললে—ভাগ্নেবাবু, আপনি যে বেঁচে ফিরবেন তা আমরা ভাবতে পারিনি।

বলে সব ঘটনা পর পর বলে গেল। মা-মণি মারা গেছে, বুড়োবাবু বাড়ির মালিক হয়েছে। সুখদা কোথায় চলে গেছে।

সুরেন কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে সব শুনলো। ধনঞ্জয় বললে—ওপরে যাবেন না ভাগ্নেবাবু?

সুরেন বললে—না—

তারপর আর দাঁড়ালো না। সোজা গেট পেরিয়ে আবার মাধব কুণ্ডু লেনে গিয়ে পড়লো। তারপর ট্রাম-রাস্তা। সহর কলকাতা। সমস্ত কলকাতা যেন তাকে মুখব্যাদান করে গ্রাস করতে এল। একদিন তার যাত্রা শুরু হয়েছিল বাঙলাদেশের কোন্ এক অখ্যাত গ্রাম থেকে। তারপর সহর। সহর কলকাতা মানেই ইতিহাসের একটা ভগ্নাংশ। মানুষের কুৎসা কলহ ভালোবাসা, ঘৃণা সংগ্রাম দলাদলি সব কিছু নিয়েই তো কলকাতা সহর। যা নিয়ে অষ্টাদশ

শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে শহরের মানুষ বেঁচে আছে। সেই ধোঁয়া, সেই সন্দেহ আর সেই অন্ধকার থেকে মুক্তি পাবার জন্যেই সুরেন লম্বা লম্বা পা ফেলে চলতে লাগলো। তার পেছনে পড়ে রইল একদল মানুষের কলহ-ক্লান্ত চিৎকার, পেছনে মিলিয়ে গেল একদল মানুষের কাড়াকাড়ি করে বেঁচে থাকার কুৎসিত আকাঙ্ক্ষা। আর আরো পেছনে পড়ে রইল চার-দেয়ালের গরাদের আড়ালে আর একটা উজ্জ্বল প্রাণের কাতর কামনা, আমার জন্যে কখনও ভেবো না তুমি আমার জন্যে কখনও চোখের জল ফেলো না, আমার জন্যে কখনও পেছন ফিরে চেয়ো না। আমি যদি তোমার জন্যে কিছু করতে পেরে থাকি তো সে তোমার কাছেই শেখা, আমার শুধু সৌভাগ্য। আমার সেই সৌভাগ্যটুকু নিয়েই আমাকে শান্তি পেতে দাও। আমার আজ কোনও দুঃখ নেই। তোমাকে হারিয়ে আমি তোমাকেই বরং নিবিড় করে পাবো, তোমাকে পেলেই বরং আমি তোমাকে বেশি করে হারাবো। তার চেয়ে এই আমার ভালো—তোমাকে হারিয়ে আমি তোমাকে পেলাম তোমাকে পেয়েও বেশি করে হারালাম। তোমাকে পাওয়া আর তোমাকে হারানোর ঊর্ধ্বে যে অমৃতলোক, সেখানেই আমি তোমাকে সত্যি করে পাবো, এই আশা নিয়েই আমি চললাম। আমাকে তুমি আশীর্বাদ করো—

কিন্তু কাকে আশীর্বাদ করবে সে? মৃত্যুকে যে সাধ করে বরণ করে তাকে কেমন করে আশীর্বাদ করবে সুরেন সান্ন্যাল। সে যদি মৃত্যুর মধ্যেই পরম-জীবনের আশ্বাস পেয়ে থাকে তো তাকে আশীর্বাদ করাও তো নিরর্থক। এক-দিন হঠাৎ খবর এল কী এক অসুখে জেলখানার হাসপাতালেই সে শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছে। এত তাড়াতাড়ি ঘটনাটা ঘটলো যে একবার শেষ দেখার সুযোগটুকুও পর্যন্ত দিয়ে গেল না টুলু। তারপর কত বছর কেটে গেল। কত অদল-বদল। সেই দেবেশদের পার্টি ভেঙে এখন চারটে দলে ভাগ হয়ে গেছে। আরো কত নতুন নতুন পার্টি গজিয়েছে বাঙলাদেশে। সবাই মিলে মানুষের সেদিনের সমস্ত আশা-ভরসা মিথ্যে প্রমাণিত করে দিয়েছে। পুণ্যশ্লোকবাবু ভোটে হেরে গেছেন। বড় অসহায় অবস্থা হয়েছে তাঁর। মেয়ে তো আগেই গেছে, সুব্রতও আবার আমেরিকায় চলে গিয়েছে। সেখানেই সে চাকরি নিয়ে আছে। তারপর চোদ্দ পার্টির ফ্রণ্টে পূর্ণবাবু মন্ত্রী হয়েছে। তবু পার্টির ঝগড়ার সমস্ত দায় বইতে হচ্ছে সাধারণ গৃহস্থ মানুষকে। আজ মানুষই মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর চেয়ে বড় সর্বনাশ বুঝি আর কিছু নেই।

তখন অনেক রাত। আমার উঠে আসবার পালা।

বললাম—আর একটা কথা। প্রজেশ সেনকে কে আসলে খুন করেছিল? আপনি?

ভদ্রলোক বললেন—না, পমিলি—

কথাটা শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। পুণ্যশ্লোকবাবুর মেয়ে পমিলির পাপের শাস্তি মাথা পেতে নিতে চেয়েছিল সুরেন সান্ন্যালই। কিন্তু কোথা থেকে কে একজন সেই সুরেনের সমস্ত শাস্তি নিজের মাথায় তুলে নিতে গেল কেন? এই-ই বা কেমন ত্যাগ, এই-ই বা কেমন ভালবাসা! এমন ঘটনা তো কোনও উপন্যাসেও পড়িনি! এও কি সম্ভব! কথাটা বলে তিনি আর সেখানে দাঁড়ালেন না। আমি যেন এক মুহূর্তে জীবন-মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালাম। আমার মনে হলো মৃত্যু যেন শুধু মৃত্যুই নয়, জীবনও শুধুই জীবন নয়। জীবন-মৃত্যু দুই-ই যেন অমৃত। মৃত্যুকে অমৃতরূপে দেখতে পারে কেবল সেই-ই জীবনকে এমন নিরাসক্ত নিস্পৃহ, নিরুদ্বেগ আর নিশ্চিন্ত করতে পারে। চলে আসবার দিন

তাই সেই অদৃশ্য আত্মার উদ্দেশে মনে মনে মাথা নিচু করে চলে এলাম—

বলে এলাম—আপনার কথায় একটা জিনিস শিক্ষা হলো যে, মানুষের সংসারে কেউ কারো পতিও নয় কেউ কারো গুরুও নয়। যে মানুষ একটা মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে পৃথিবীতে জন্মেছে, সে সংসারে বরাবর নিঃসঙ্গ। তার কোনও দোসর নেই। সে-মানুষকে একলাই তার জীবনের ব্রত সার্থক করতে হবে। একলা চলাই তার সাধনা। ওঁ শুভায় ভবতু!

সমাপ্ত